

# শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

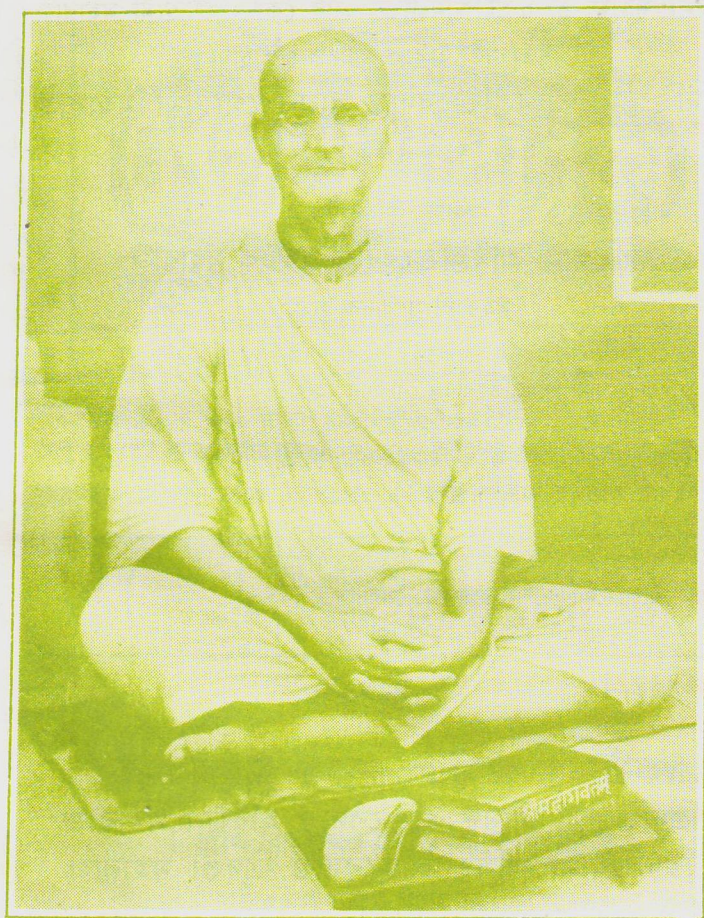
৪৯শ বর্ষ

}

চৈত্র, ১৪০৩

}

২য় সংখ্যা



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি  
জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্বক্তাপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ  
যুগ্ম-সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ

—: কার্যালয় :—

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ফোন : ৫৫৫-৮৯৭৩  
২৮, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৪



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

## শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিন্দু ও বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

—( \* )—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত পর্যাটক মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বোধায়ন মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি.এ.বি.টি. কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি.এ.

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ

শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, সেবারত্ন

শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরত্ন

—( \* )—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

—( \* )—

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যারত্ন

---

(ত্রিদণ্ডিস্বামী) শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত আচার্য্য (মহারাজ)-কর্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,  
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা  
প্রেস হইতে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।



শ্রীশ্রীগুরুগৌরাসৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

# শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

[ মাসিক ]

একোনপঞ্চাশৎ-বর্ষ [ ১ম-১২শ সংখ্যা ]

[ শ্রীগৌরাদ ৫১০ গোবিন্দ হইতে  
বঙ্গাব্দ ১৪০৩ ফাল্গুন হইতে ১৪০৪ মাঘ,  
খৃষ্টাব্দ ১৯৯৭ মার্চ হইতে ১৯৯৮ ফেব্রুয়ারী। ]

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্বক্ত্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্বক্ত্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্বক্ত্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্বক্ত্তিবেদান্ত আচার্য মহারাজ  
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

## শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিশ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

—( \* )—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বোধায়ন মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি.এ.বি.টি. কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি.এ.

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ

শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, সেবারত্ন

শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরত্ন

—( \* )—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

—( \* )—

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যারত্ন

(ত্রিদণ্ডিস্বামী) শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত আচার্য্য (মহারাজ)-কর্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,  
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা  
প্রেস হইতে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।



একোনপঞ্চাশৎ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার  
প্রবন্ধাদির সূচীপত্র

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
অনর্থ	১০।৩৮৪
অতিমর্ত্য চরিত্র	১২।৪৭৬
অর্দ্ধশত না পূর্ণশত	
১২।৫১৪	
আন্তরিক অভিনন্দন [ শ্রীল নারায়ণ মহারাজের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে ]	২।৭০
আর্তি-পুষ্পাঞ্জলি	১২।৪৫৭
আত্মারাম	৮।২৯৫
ইচ্ছাশক্তি—ভগবচ্ছক্তি	২।৬১, ৩।৯৮, ৪।১৩৪
উৎকণ্ঠা-দশকম্—শ্রী	১১।৪০১
একাদশীর জন্মকথা	১।১১, ২।৪৮
কলিযুগের শ্রেষ্ঠতা	৮।৩০৫
কার্তিক-ব্রত-মাহাত্ম্যম্—শ্রী	৭।২৪১
কার্তিক-ব্রতে বিধিনিষেধাঃ—শ্রী	৮।২৮১
কৃপা	৫।১৭৫
কেশব গোস্বামী মহারাজের উপদেশাবলী—শ্রীল	১২।৫১৯
গঙ্গাস্তোত্রম্—শ্রী	৫।১৬১
গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা—শ্রীল [ শ্রীদামোদর-ব্রতে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত ]	১।৩২, ২।৬৫, ৩।১১৬, ৪।১৪৬, ৫।১৯০, ৬।২২৯, ৭।২৬৫, ৮।৩০৮, ৯।৩৫৩, ১০।৩৮৭, ১১।৪২৮
গুরু-স্বরূপ—শ্রী [ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ]	১২।৪৪৯
গুরু-মহিমা-কীর্তন—শ্রী	১২।৪৯৪
গুরু-মহিমা-কণা—শ্রী [ কবিতা ]	১২।৫০৪
গুরুপূজা—শ্রী	১২।৫১০
গুরুসেবা	১০।৩৭৪
গোকুলানন্দ-গোবিন্দ-দেবাস্তকম্—শ্রীশ্রী	২।৪১
গৌর-গদাধরাষ্টকম্—শ্রী	৩।৮১
গৌরান্বিত-পত্র—শ্রীশ্রী	১২।৫২৫
গৌড়ীয় মঠের সকলেই প্রভু !	৯।৩৪৪
গৌড়ীয়-কেশবের দর্শনালোকে শ্রীব্যাসপূজা—শ্রী	১২।৪৭৯
চৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তর্দান-প্রসঙ্গ—শ্রী	৪।১৩৯, ৫।১৭৮, ৬।২২৩, ৭।২৬০
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [ নিমন্ত্রণ-পত্র ]	৩।১১৯



জীবের কৃত্য

৩।৯৪, ৪।১৫২, ৫।১৮৫, ৭।২৫৭,

৮।৩০০, ৯।৩৩৮, ১০।৩৮০

ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাদর আহ্বান—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] ৬।২৩৯

দশমূল-শ্লোকাঃ—শ্রী ৬।২০১

দয়িতদাসদশকম্—শ্রীশ্রী ৯।৩২১

দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ৭।২৭৮

দীনের প্রার্থনা [ কবিতা ] শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব-বাসরে ১।১৭

নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব—শ্রী [ বিবরণ ] ২।৭৪

নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব-শ্রীশ্রী [ নিমন্ত্রণ-পত্র ] ১১।৪৩৯

নবনির্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব ৫।১৯৮

পরমারাধ্যদেবের অপ্রাকৃত মহিমা-শংসন—শ্রীল ১২।৪৬১

পত্রিকার নববর্ষ—শ্রী ১।৩৫

পরাশান্তির উপায় ১।১০৯

পাশ্চাত্ত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম-প্রচার ২।৬৯, ৬।২৩৪, ৭।২৭৪

পাষাণগজৈকসিংহ—গোস্বামী শ্রীল কেশব ১২।৪৮২

পুষ্পাঞ্জলি ও প্রার্থনা [ কবিতা ] ১২।৫১৩

প্রগতির পরিণাম ১।২০, ২।৫৮, ৭।২৪৯

প্রকৃত পাণ্ডিত্য ৫।১৭০

প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্জন ১।৪

প্রতিকূল মতবাদ [ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ] ১১।৪০৮

প্রভুপাদের হরিকথামৃত—শ্রীল ১।৭, ২।৪৭, ৩।৮৭, ৪।১২৮, ৫।১৬৮

প্রশ্নোত্তর ২।৪৪, ৩।৮৪, ৪।১২৪, ৫।১৬৫, ৬।২০৫,

৭।২৪৪, ৮।২৮৩, ৯।৩২৫, ১০।৩৬৩, ১১।৪০৪

প্রাচীন নদীয়া [ কবিতা ] ৮।৩১৬

বলদেব-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী ১০।৩৬১

বাক্যবেগ ৬।২১১

বিজ্ঞাপ্তি ৬।২৪০, ৯।৩৬০, ১০।৩৭৯

বিশ্বাসঘাতক ৯।৩৩২

বিভিন্ন কালের আলেখ্য—শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের ১২।৪২১

বিনোদ ও বিনোদবিহারী ১২।৪৯৮

বিয়োগিনী বিষুণুপ্রিয়া [ কবিতা ] ১০।৩৯৪

বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব—শ্রী [ নিমন্ত্রণ-পত্র ] ২।৭৯

বেদান্তে শব্দবাদ [ শ্রীল ভক্তিপ্ৰজ্ঞান কেশব ] ১২।৪৫৪

বৈষ্ণবতা কোথায়? ১।২৯, ৩।১০৪, ৭।২৫২, ১০।৩৭৬

বৈচিত্রের হেতু ৪।১৩০

ব্যাসপূজা-স্মরণে ১২।৪৮৮

ব্যাসপূজা—শ্রী	১২।৫০৭
ভক্তির অধিকারী কে?	১।১৪, ২।৫৩
ভক্তি ব্যতীত নিস্তার নাই	৩।৮৯
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি [ কবিতা ] শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব-শতবার্ষিকী উপলক্ষে	৩।১০২
ভক্তিবিনোদবিরহদশকম্—শ্রীমদ্	৪।১২১
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব—শ্রীমদ্ [ নিমন্ত্রণ-পত্র ]	৭।২৭৯
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-শতবার্ষিকী—শ্রীমদ্	২।৭৭,
	৪।১৫৬, ৫।১৯৬, ৭।২৭০
ভক্তি-পুষ্পার্ঘ্য-নিবেদন [ কবিতা ] শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে	১১।৪৩৩
ভক্তির লক্ষণ	১০।৩৯৬, ১১।৪১৯
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি [ কবিতা ]	১২।৪৬৭
ভক্তি-অর্ঘ্য [ কবিতা ]	১২।৪৯১
ভক্তের ভগবান্	১১।৪২২
ভূত-প্রেতাদির অস্তিত্ব কি কাল্পনিক?	৮।২৮৯
ভ্রম-সংশোধন	১।১৯, ৪।১৫১
মঙ্গলাচরণ	১২।৪৪১
মহাপ্রভোরষ্টকম্—শ্রীশ্রীমন্	১।১
মহাপ্রভুর প্রেমময় ধর্ম ও প্রেমহীন প্রচার-চাতুর্য্য	১১।৪১১
মানুষই ভগবান্?	১২।৪৭০
মেঘালয় গোড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব—শ্রী [ বিবরণ ]	৮।৩১৯
রাধা-বিনোদবিহারি-তত্ত্বাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	১২।৪৪২
রূপশিক্ষা—শ্রী [ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ]	৬।২০৯, ৭।২৪৭,
	৮।২৮৬, ৯।৩২৮, ১০।৩৬৭
লিঙ্গদেহ	১।২৫
শুভাবির্ভাব-শতবার্ষিকী ও শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব [ নিমন্ত্রণ-পত্র ]	১১।৪৩৭
শুনিলেই শ্রীহরিনাম পশু-পক্ষী-কীটাদি তরে কি?	১০।৩৭১
ষড়্বেগ—ভক্তির প্রতিকূল	১১।৪১৪
সংস্কৃত কি Dead Language?	৬।২১৪
সাধুসঙ্গ	৭।২৫১
সাধুসঙ্গ [ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ]	১২।৪৪৪
সাধ্য-সাধন	৬।২১৮
সাধ্য-বস্তু	৯।৩৪৯

স্বধর্ম	৯।৩৩৬
স্বধামে শ্রীযুক্তা আরতি দেবী	৮।৩১৪
স্বধামে শ্রীযুক্তা রাধারানী দেবী	১১।৪৩৬
হরিসেবা ও জনসেবা [ শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ ]	১।৯
Cordial Reception	২।৭২
Statement about Shri Goudiya-Patrika	১।৪০

### বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকগণকে জানানো হইতেছে যে, শ্রীপত্রিকার আজীবন সদস্য গ্রহণ করা হইতেছে। যাঁহারা আজীবন সদস্য হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা ১০০১ ( এক হাজার এক ) টাকা এককালীন অথবা এক বৎসরে চারিটি সমান কিস্তিতে দিয়া সদস্য হইতে পারেন। এ ব্যাপারে কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত যোগাযোগ করুন।

বিনীত নিবেদক—

কার্য্যাধ্যক্ষ,

শ্রীগৌড়ীয়পত্রিকা





শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির উপাঙ্গ—শ্রীশ্রীগোর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

*	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।	*
ধর্মঃ স্বহৃদিতঃ পুংসাং বিধবৃক্ষেন কথ্যাত্মবঃ ।		নোংপাদয়েদ্যেদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
*	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যমাত্মা স্বপ্রসীদতি ॥	*

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।  
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্বশৃণু ॥

অন্য ধর্ম স্বরূপে পালে যেই জন ।  
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৯শ বর্ষ	২০ গোবিন্দ, গর্ভোদশায়ী, ৫১০ শ্রীগোরাঙ্গ ৩০ ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৪০৩, ইং ১৪/৩/২৭	১ম সংখ্যা
----------	--	-----------

সান্নুবাদং

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভোরফটকম্

( শ্রীস্বরূপ-চরিতামৃতম্ )

[ শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্তীঠাকুর-বিরচিতম্ ]

স্বরূপ ! ভবতো ভবত্বয়মিতি স্মিত-স্নিগ্ধয়া  
 গিরৈব রঘুনাথমুৎপুলকি-গাত্রমুল্লাসয়ন্ ।  
 রহস্যাপদিশল্লিঙ্গ-প্রণয়-গূঢ়-মুদ্রাং স্বয়ং  
 বিরাজতু চিত্রায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥ ১ ॥

হে স্বরূপ ! 'এই রঘুনাথ তোমার অধিকারে থাকুক'—এইরূপ সহাস্ত্র-  
 মধুর-বাক্যে রঘুনাথদাসকে যিনি আহ্লাদিত ও পুলকিত-গাত্র করিয়াছিলেন  
 এবং যিনি স্বয়ংই নির্জনে নিজ প্রণয়-মহিমার গূঢ় প্রণালী তাঁহাকে শিক্ষা

দিয়াছিলেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জগু বিরাজ করুন ॥ ১ ॥

স্বরূপ ! মম হৃদব্রণং বত ! বিবেদ রূপঃ কথং

লিলেখ যদয়ং পঠ তমপি তালপত্রেহক্ষরম্ ।

ইতি প্রণয়-বেল্লিতং বিদধদাশু রূপাস্তুরং

বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥ ১ ॥

হে স্বরূপ ! 'রূপ কি-প্রকারে আমার মনোব্যথা অবগত হইল ? যেহেতু এই রূপ আমার মনোগত ভাব লিখিয়াছে, তুমিও তালপত্রে লিখিত ঐ শ্লোক পাঠ কর,—এই প্রকারে যিনি কখন প্রেম প্রকাশ, কখন বা আত্ম-গোপন করেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জগু বিরাজ করুন ॥ ২ ॥

স্বরূপ ! পরকীয়-সংপ্রবর-বস্ত্র-নাশেচ্ছতাং

দধজ্জন ইহ ত্বয়া পরিচিতো নবেতীক্ষয়ন্ ।

সনাতনমুদিত্য বস্মিতমুখং মহাবিস্মিতং

বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥ ৩ ॥

হে স্বরূপ ! এখানে পরকীয়া নিত্যসিদ্ধ সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্রনাশে অভিলাষী কোন ব্যক্তি বিরাজ করিতেছে, তুমি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছ কি ?—এইরূপে যিনি মহাবিস্মিত ও আত্মদত্তে হস্তযুক্ত, লজ্জায় অবনত-বদন শ্রীসনাতন প্রভুকে প্রদর্শন করান, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকাল বিরাজ করুন ॥ ৩ ॥

স্বরূপ ! হরিনাম যজ্জগদঘোষয়ং তেন কিং

ন বাচয়িতুমপ্যাখাশকমিমং শিবানন্দজম্ ।

ইতি স্বপদ-লেহনৈঃ শিশুমচীকরং যঃ কবিং

বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥ ৪ ॥

হে স্বরূপ ! আমি সমগ্র জগদ্বাসীকে হরিনাম উচ্চারণ করাইলাম, কিন্তু ইহাতে আমার কি ফল হইল ? কারণ অবশেষে এই শিবানন্দ-পুত্রকে হরিনাম উচ্চারণ করাইতে পারিলাম না,—এই বলিয়া যিনি আপন চরণ-লেহন করাইয়া সেই শিশুকে কবিশ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জগু বিরাজ করুন ॥ ৪ ॥

স্বরূপ ! রসরীতিরষুজদশাং ব্রজে ভগ্নতাং  
 ঘন-প্রণয়-মানজা ঋতিযুগং মমোৎকণ্ঠতে ।  
 রমা যদিহ মানিনী তদপি লোকয়েতি ক্রবন্  
 বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥ ৫ ॥

হে স্বরূপ ! ব্রজে কমলাক্ষিণের গাঢ়-প্রণয়-মান-জনিতা রস-পরিপাটি  
 বর্ণনা কর, আমার কর্ণযুগল শুনিবার জন্ম উৎকণ্ঠিত হইতেছে । দেখ, এই প্রণয়-  
 মর্যাদা লাভ করিতে না পারিয়া লক্ষ্মী মানিনী হইয়াছেন ;—এইরূপে যিনি  
 স্বরূপ-সমীপে মধোদ্ব্যটন করেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে  
 চিরকালের জন্ম বিরাজ করুন ॥ ৫ ॥

স্বরূপ ! রস-মন্দিরং ভবসি মনুদামাস্পদং  
 তমত্র পুরুষোত্তমে ব্রজভুবীৰ মে বর্তসে ।  
 ইতি অপরিরন্তগৈঃ পুলকিনং ব্যধাৎ তঞ্চ যো  
 বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥ ৬ ॥

হে স্বরূপ ! তুমি আমার প্রিয়পাত্র এবং রস-মন্দির-স্বরূপ । তুমি এই  
 শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থান করাতে এই শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রেকেও আমার শ্রীবৃন্দাবন  
 বলিয়া প্রতীতি হইতেছে,—এই বলিয়া সাগ্রহে কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে  
 যিনি পুলকিত করিয়াছেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের  
 জন্ম বিরাজ করুন ॥ ৬ ॥

স্বরূপ ! কিমপীক্ষিতং ক নু বিভো ! নিশি স্বপ্নতঃ  
 প্রভো ! কথয় কিম্ন তন্নবযুবা বরাস্তোধরঃ ।  
 ব্যধাৎ কিময়মীক্ষ্যতে কিমু ন হীত্যগাৎ তাং দশাং  
 বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥ ৭ ॥

হে স্বরূপ ! আমি কি দেখিলাম ? স্বরূপ বলিলেন,—হে প্রভো ! কখন  
 দেখিলেন ? প্রভু বলিলেন,—রাত্রিতে স্বপ্নযোগে । স্বরূপ বলিলেন,—প্রভো !  
 কি-প্রকার সে ? প্রভু বলিলেন,—নবীন-নীরদ-সদৃশ তরুণ যুবা । স্বরূপ বলিলেন,  
 —তিনি কি করিতেছিলেন ? আর কি তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইবে ? প্রভু  
 বলিলেন,—আর দর্শন পাওয়া যাইবে না ।—এই বলিয়া যিনি শোকভরে  
 অপূৰ্ণ দশাপ্রাপ্ত হইলেন, সেই শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্ম বিরাজ  
 করুন ॥ ৭ ॥



স্বরূপ ! মম নেত্রয়োঃ পুরত এব কৃষ্ণো হস-  
 ন্নপৈতি ন করগ্রহং বত ! দদাতি হা ! কিং সখে !  
 ইতি জ্বলতি ধাবতি শ্বসিতি ঘূর্ণতে যঃ সদা  
 বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥ ৮ ॥

হে স্বরূপ ! আমার নয়ন-সম্মুখে কৃষ্ণ হস্ত করিয়া পলায়ন করিলেন, ধরা  
 দিলেন না। হায় হায় সখে ! কি উপায় হইবে ?—এই বলিয়া যিনি সর্বদা  
 ভূপতিত হয়েন, ইত্যন্ততঃ ধাবিত হন, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন, কখনও  
 বা ঘূর্ণিত হন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ  
 করুন ॥ ৮ ॥

স্বরূপ-চরিতামৃতং কিল মহাপ্রভোরষ্টকং  
 রহস্যতমমদ্রুতং পঠতি যঃ কৃতী প্রত্যহম্ ।  
 স্বরূপ-পরিবারতাং নয়তি তং শচীনন্দনো  
 ঘন-প্রণয়-মাধুরীং স্বপদয়োঃ সমাস্বাদয়ন্ ॥ ৯ ॥

যিনি এই অদ্ভুত রহস্যতম স্বরূপ-চরিতামৃত নামক শ্রীমন্নমোহপ্রভুর অষ্টক পাঠ  
 করিবেন, শ্রীশচীনন্দন মহাপ্রভু তাঁহাকে গাঢ় প্রেমের মাধুর্য্য আশ্বাদন করাইয়া  
 শ্রীস্বরূপের পরিকররূপে গ্রহণ করিবেন ॥ ৯ ॥

## প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্ত্তন

### জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি যাবতীয় ধর্ম্মের অন্তরালে প্রতিষ্ঠাশা

আমরা যতই আত্মোন্নতির চেষ্টা করি, যতই ধার্ম্মিক হইতে যত্ন করি, যতই  
 বৈরাগ্য-ধর্ম্ম পালন করি, বা যতই জ্ঞান চর্চ্চা করি, ততই স্বীয় প্রতিষ্ঠার আশা  
 আমাদের চিন্তকে মলিন করে এবং চরিত্রকে দূষিত করে। অনেক যত্ন করিয়া  
 কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদকে খর্ব্ব করি, কঠোর তপস্বী করিয়া ইন্দ্রিয় দমন  
 করি, তথাপি হৃদয়ে অতি গুপ্তরূপে প্রতিষ্ঠাশারূপ ব্যালশাবক সঞ্চিত হইতে  
 থাকে। অষ্টাঙ্গযোগ শিক্ষা করিয়া যোগিরূপে খ্যাত হইতে বাসনা করি। যদি  
 কেহ বলে যে, আমার যোগশিক্ষা কেবল ধূর্ত্ততামাত্র, তখনই আমি ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত  
 হই। আমি অনেক শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আপনাকে ব্রহ্ম-তত্ত্বে লীন করিবার

চেষ্টা করি। যদি কেহ বলে ঐ প্রক্রিয়াটা নিষ্ফল, তখনই আমার মনে উদ্বেগ হয়। আমার নিম্নককে নিন্দা করিতে থাকি। শম, দম, তপ, অস্তেয় প্রভৃতি দশবিধ ধর্ম শিক্ষা করি এবং নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম করিতে করতে সংসার নির্বাহ করি। যদি কেহ বলে যে, কর্মকাণ্ড কেবল নিরর্থক শ্রমমাত্র, তখনই আমার মনে দুঃখ হইয়া থাকে; কেননা আমার প্রতিষ্ঠার খর্ব হইলে আমার কিছুই ভাল লাগে না।

### ভুক্তি ও মুক্তিকামী—অশান্ত ও প্রতিষ্ঠার দাস

কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি যখন ভুক্তি ও মুক্তিফল আশায় ভ্রমণ করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের শাস্তি কোথায়? হুতরাং তাঁহারা প্রতিষ্ঠার আশাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসাশূন্য বৈষ্ণবগণের প্রতিষ্ঠার আশা নিতান্ত হয়।

### বর্তমান বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ প্রতিষ্ঠাকামী ও অসহিষ্ণু

আজকাল যাহারা বৈষ্ণবধর্মের আচার্য্য, তাঁহারা কোন প্রকার অসম্মান সহিতে পারেন না। প্রথমেই সকলের মস্তকে পদ উত্তোলন করিয়া স্বীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন। আচার্য্য বলিয়া অপরে সম্মান করে, তাহা অগ্রায় নয়; কিন্তু নিজে সেই সম্মান হস্তগত করিবার যিনি যত্ন করেন, তাঁহার শ্রেয় কোথায়? আবার কোন ব্যক্তি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম করে নাই, তাহা দেখিয়া তাহার প্রতি ক্রোধ করা নিতান্ত গর্হিত ব্যাপার। আচার্য্যদিগকে সম্মান করিবার জগৎ শিষ্ট লোক তাঁহাদের জগৎ পৃথক আসন দিয়া থাকেন। যাহারা আসন দেন, তাঁহারা যথাশাস্ত্র আচার্য্য-সম্মান করেন। কিন্তু ঐ আচার্য্যদিগের আসনে অল্প কেহ বসিলে তাঁহাদের যে ক্রোধোৎপত্তি হয়, তাহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। এই সকল কার্য কেবল প্রতিষ্ঠার আশা হইতে উদ্ভূত হয়।

### প্রতিষ্ঠাশা-ত্যাগ স্তুত্বকর

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক গৃহত্যাগ করিয়া ভেক গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠার আশা গৃহস্থ লোকের অধিক হইবে বলিয়া শাস্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সংসার ছাড়িয়া ভেক গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই অবস্থায় আবার প্রতিষ্ঠাশা অধিক বলবতী হইয়া উঠে। কোন ভেকধারীকে যদি সম্মান না করা যায়, তাহা হইলে তিনি বিশেষ রাগান্বিত হন। গৃহস্থ বৈষ্ণবাচার্য্য এবং ভেকধারী বৈষ্ণবের মধ্যে যদি প্রতিষ্ঠা-আশা রহিল, তবে আর কাহার চিত্ত সেই আশাশূন্য হইতে পারিবে?

## কৃষ্ণসেবা ব্যতীত প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ হয় না

আমরা অনেক সময় চিন্তা করিয়া এবং মহৎ লোকের উপদেশ সংগ্রহ করিয়া জানিয়াছি যে, যতদিন প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করিতে না পারি, ততদিন বৈষ্ণব হইয়াছি এরূপ মনে করিতে পারি না। কেবল কথায় দৈন্ত্য করিলে হয় না। আমি বলিয়া থাকি, আমি বৈষ্ণবদিগের দাসের দাস হইবার যোগ্য নই, কিন্তু মনে মনে কার যে, শ্রোতাগণ এই কথা শুনিয়া আমাকে শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবেন! হায়, প্রতিষ্ঠার আশা আমাদেরকে ছাড়িতে চাহে না। অতএব বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বলিয়াছেন—

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা স্থপচ-রমণী মে হৃদি নটেৎ

কথং সাধুঃ প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নহু মনঃ।

সদা ত্বং সেবন্ত প্রভু-দয়িত-সামন্তমতুলং

যথা তাং নিকান্তা ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥ (মনঃশিক্ষা-৭)

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, যতদিন আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাশারূপ নির্লজ্জ-চণ্ডালিনী নৃত্য করিতেছে, ততদিন নির্মল-সাধু-প্রেম এই মনকে কিরূপে স্পর্শ করিবে? অতএব, হে মন! তুমি তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অতুল সামন্তরূপ শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সেবা কর। তাহা হইলে তিনি সেই চণ্ডালিনীকে তোমার হৃদয়-মন্দির হইতে শীঘ্র দূর করিয়া প্রেম বস্তুরূপে প্রবেশ করাইবেন।

## বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গে প্রতিষ্ঠাশার বিলোপ

এই মহাজন-বাক্য হইতে আমরা কি সংগ্রহ করি? আমরা জানিতে পারিতেছি যে কেবল গ্রন্থচর্চা, অপ্রাপ্ত-প্রেম-ব্যক্তির উপদেশ এবং শারীর-যোগাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা কখনই দূর হইতে পারে না। কেবল বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্গ ও বৈষ্ণব-সেবার দ্বারাই তাহা নিশ্চিতরূপে দূর হয়। আমরা বিশেষ যত্ন-সহকারে বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিব—ইহাই আমাদের চরম কর্তব্য।

## সৎসঙ্গ-গ্রহণ ও অসৎসঙ্গ-ত্যাগ একই কথা

বৈষ্ণবসঙ্গে আমাদের হৃদয়ে সাধুতার উদয় হইবে এবং অসাধুতা সম্পূর্ণরূপে দূর হইবে। হৃদয় পরিকৃত হইলে সেই সাধু-বৈষ্ণবের হৃদয়স্থ প্রেম-সুখের কিরণ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করত প্রেমরূপে সমৃদ্ধ হইবে। এই উপায় ব্যতীত অণু উপায় নাই। ইহাই সাধু হইবার স্বাভাবিক উপায়। অণু প্রকার সকল-যত্নই বিফল হয়। তাৎপর্য্য এই যে, সৎসম্ভাব গ্রহণ ও অসৎসম্ভাব দূরীকরণ একই কথা।

## সাধুসঙ্গপ্রভাবে প্রতিষ্ঠাশা দূরীভূত ও কৃষ্ণপ্রেম লাভ

প্রেম যে ধর্ম তাহা কেবল বিশুদ্ধ কৃষ্ণ-পরায়ণ আত্মায় নিহিত থাকে। প্রেমের অণু আবাস নাই। এক আত্মা হইতে প্রেম অণু আত্মায় সঞ্চারিত হয়। এক মেঘ হইতে অণু মেঘে ঘেরূপ বিভ্রাঙ্কর্ম সঞ্চারিত হয়, তদ্বৎ। সঙ্গক্রমে যখন প্রেম-কলক বৈষ্ণব-আত্মা হইতে অণু জীবের আত্মায় স্বভাবক্রমে চাপিত হয়, তখনই অণু জীবের হৃদয়ে মন্দ স্বভাব দূরীভূত হইয়া সাধু স্বভাব অগ্রে সঞ্চারিত হয়। সকল মহদগুণই প্রেমের সঙ্গী। সুতরাং প্রেমের প্রবেশকালে মহদগুণগুলি অগ্রসর হইয়া হৃদয় পোষন করে। অতএব সাধুসঙ্গ-দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা দূর করা কর্তব্য।

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

## শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরহৃদয়ের শিক্ষা—কৃষ্ণ আমার নিত্যপ্রভু, আমি তাঁহার নিত্যদাস। তাঁহার শতকরা শত অংশ সেবা আমারই; অণু কাহাকেও তাঁহার অংশীদার জানিয়া আমার সেবাপ্রিয় লাগবের চেষ্টা হইতে কৃষ্ণে কখনও আমার পূর্ণ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যাইবে না। “আমি কৃষ্ণের পূর্ণ সেবাবিধানে অসমর্থ হওয়ায় অপর কেহ তৎপূর্ণতা বিধানে সমর্থ হইলে আমি আমার আংশিক সেবাদ্বারা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য করিব—কৃষ্ণকে পূর্ণ সেবালাভে বঞ্চিত করিয়া আমার ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করিব অর্থাৎ নিজেও সম্পূর্ণ সেবা করিতে পারিব না, অত্রে করিলেও তাহা দেখিতে পারিব না, ইহা আদৌ সেব্যের প্রতি সেবকের প্রীতিমূলক সেবাপ্রদর্শন নহে, উহা মৎসরতা বা সেবাপ্রদর্শনের বিপর্যয় মাত্র।

শ্রীবার্ভানবীর গণে—রূপানুগগণে গণিত হইলেই কৃষ্ণের পূর্ণ রূপালাভে সমর্থ হওয়া যায়; সেখানে সেই সেবাই সৌন্দর্য-উদার্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। মাৎসর্যের তথায় অবকাশ নাই। শ্রীবার্ভানবীদেবী তদনুগজনকে নির্বালীকভাবে কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা দেখিলে তাঁহাকে কৃষ্ণসেবাধিকার দিয়া কৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। ‘তুমি’-‘তিনি’দের বিচারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অকপট কৃষ্ণকনিষ্ঠ না হইয়া তর্কপন্থাবলম্বনে কৃষ্ণসেবাধিকার আদায় করিতে গেলে ভুক্তি ও মুক্তি-পিশাচীদ্বয়ের কবলে পতিত হয়।



আমাদের সকলের হৃদয়ে অপরিদীম আনন্দের প্রার্থনা রহিয়াছে। ‘তুমি’ ও ‘তিনি’কে পাইয়া সেই আনন্দের আকাজক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। আনন্দ পাইতে চায়—‘কৃষ্ণের আমি’ ও ‘আমার কৃষ্ণকে’; তাহা না হইলে তাহার আকাজক্ষা মিটিবে না—আশা পূরিবে না। আনন্দ চায়—কৃষ্ণের ‘আমি’ আমাকে সর্বত্র সর্বতোভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বিধান করাইতে; ‘তুমি’র মধোও চাহে—‘আমি’কে স্থাপন করিতে, ‘তিনি’র মধোও চাহে ‘আমি’কে বসাইতে। যে ‘তুমি’-‘তিনি’র মধো তাহার ‘কৃষ্ণের’ আমি নাই, সে ‘তুমি’-‘তিনি’র সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। যেদিন আমরা আমাদের বাহেন্দ্রিয়ের সকল চেষ্টা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৎপর করিতে পারিব, যেদিন ‘কৃষ্ণ আমার, আমি কৃষ্ণের’—ইহা ছাড়া আর ইতর দর্শন থাকিবে না, সেইদিনই আমার সত্য সত্য কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সঙ্গুরুপাদাশ্রয়ে সত্য সত্যই কৃষ্ণকথা শ্রবণদ্বারা সত্য সত্য কর্ণবেধ সংস্কার লাভ হইবে, সেইদিনই আমাদের কৃষ্ণবহিস্মৃখতারূপ কর্ণমল মধুকৈটভাসুর বিনষ্ট হইবে। তখন শ্রুত-বিষয়ের কীর্তন ও কীর্তনপ্রভাবে স্রবণের সুষ্টুতাক্রমে শ্রবণদশা, বরণদশা অতিক্রম-পূর্বক স্বরূপসিকি ও তৎপরে বস্তুসিকি লাভ হইবে। স্তবরাং ‘আমি’র বিচার ঠিক হওয়া দরকার। আমি ঠিক—সব ঠিক, আমি বেঠিক—সব বেঠিক।

বৈকুণ্ঠ-শব্দ—স্বরূট, অপারবর্তনশীল। বৈকুণ্ঠ-শব্দই পরমেশ্বর। বৈকুণ্ঠ-শব্দ তাঁহার নিরঙ্কুশ বৃত্তি প্রকাশ করিয়া জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয় নিয়মিত করিয়া থাকেন। অতএব তর্কপন্থার পরিবর্তে শ্রোতপন্থাই আমাদের পক্ষে গ্রহণীয়। তর্কপন্থায় কেবল সময় নষ্ট হয়। আমাদের পক্ষে বৈকুণ্ঠশব্দের সম্মুখীন হইতে হইবে, বৈকুণ্ঠ-শব্দের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে হইবে না। যখন স্বরূট বস্তু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন, তখনই আমরা বৈকুণ্ঠ শব্দ শ্রবণ করিতে পারি।

আমি স্বতন্ত্র জীব—ভগবানের সেবা করিব না,—এইরূপ দুর্বুদ্ধি প্রত্যেক কৃষ্ণবিস্মৃত জীবেরই আছে এবং এইজন্যই তাহারা এই বহিস্মৃখতার রাজ্যে এত বড় একটা field পাইয়াছে। অসত্য বস্তুকে আমরা সত্যবস্তু বলিয়া ভ্রম করিতে যাইতেছি। আমরা মায়া'র আদেশ পালন করিতে চেষ্টা করিতেছি। যদি স্মৃতির পড়তা পড়ে, তবেই মঙ্গল হইয়া যায়। কৃষ্ণের স্মৃতি কৃষ্ণের শ্রবণের দ্বারাই হইয়া থাকে। কৃষ্ণের শ্রবণের অভাবে কৃষ্ণের বিস্মৃতি ঘটে। কৃষ্ণ যে জিনিষ, সেই জিনিষটির সম্মুখীন হওয়া ব্যতীত অল্প উপায় নাই। কৃষ্ণের সহিত আমার যে বৃত্তি আছে, তাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে—কৃষ্ণ-সংস্কজ্ঞান-লাভে।

কপট হই প্রকার—ভোগী ও ত্যাগী। ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই অপরের

আত্মোপকারের প্রতি উদাসীন, ভগবান্ তাহাদিগকে দয়া করেন না। ভগবান্ বিভুচিৎ; জীব অণুচিৎ। অণুর মধ্যে আবার যদি কেহ কিছু চুরি করিয়া রাখিয়া দেয়, ভগবান্কে সবটুকু দিবে না মনে করে, তাহা হইলে বিভুচিৎ তাহার কাছে প্রকাশিত হন না।

অপরকে বঞ্চনা করার নাম কপটতা। আমার বন্ধুবান্ধব—সকলকেই বঞ্চনা করিয়া নিজের অপস্বার্থ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের জগ্গ বাস্তব হইব,—এইরূপ দুর্বুদ্ধি কপটতা। বিভুকে বঞ্চনা করিব—এইরূপ বিচারও কপটতা।

বৈষ্ণব অগ্ন জীবের মত নহেন। তিনি চৈতন্যশ্রিত,—কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত। প্রত্যেক কার্যে জীবনে-মরণে তিনি চৈতন্যচরণ ছাড়িয়া অগ্ন কোন কার্যে বাস্তব নহেন। যখন মানুষ নিজের চশমায় বৈষ্ণবকে দেখিতে যায়, তখন ঠিকভাবে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। একমাত্র তাঁহার কৃপালোকেই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

## হরিসেবা ও জনসেবা

হরি-সেবক—জন-সেবক নহেন। হরি-সেবা ও জন-সেবা দুইটা পৃথক্ বৃত্তি; শুধু তাহাই নহে, ইহাদের পরস্পরকে অন্তকূল বৃত্তিও বলা যায় না। জন-সেবকগণের ভোগ-প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় হরিসেবার বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং জনসেবকগণই জনগণের ভোগের ইন্ধন যোগাইতে গিয়া নাস্তিক হইতে বাধ্য হইয়াছে। এককথায় জন-সেবকগণ ধর্মধ্বজী ও নাস্তিক এবং হরি-সেবকগণই একমাত্র আস্তিক।

ধর্মজগতে আস্তিকগণই বিষু-সেবক এবং নাস্তিকগণই জন-সেবক। জন-সেবকগণ সাধারণ জনগণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করাকেই ‘ধর্ম’ জান করিয়া তাহাই অনুশীলন করিতে বাস্তব হইয়াছেন—ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। এমনকি ইহাও সর্ববাদিসম্মত যে, পার্থিব জনগণের চিত্তবৃত্তি, মনোবৃত্তি, ইন্দ্রিয়বৃত্তি, শারীরবৃত্তি পরস্পর পৃথক্। শুধু পৃথক্ বলিলে চলিবে না, বিষম ও বিরোধী বলিয়া অনুভূত হয়। অসম ও বিষম সাম্যস্থাপন করাই ইন্দ্রিয়পিপাসুগণের বর্তমান ধর্ম বা কলির ধর্ম। ইন্দ্রিয়জনিত ভোগ-পিপাসা-চরিতার্থের জগ্গ যে প্রাণীমাত্রেরই পরস্পরের মধ্যে আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাতির চেষ্টা লক্ষিত হয়, তাহারই ইন্ধন সংগ্রহকে ধর্মরূপে অঙ্গীকার

করাই জনমত বা জনসেবা। সুতরাং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইহাই চরম নাস্তিকতা অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ।

কলিকালে নাস্তিকগণই জন-সেবার ঢকা বাজাইয়া নাস্তিকতাকেই ‘ধর্ম’ বলিয়া প্রচার করিতেছে। হরিসেবা কখনও জনসেবা নহে। যুক্তির খাতিরে যদি জনগণকেই হরি বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে হরিসেবা ও জনসেবা একই হইতে পারে। কিন্তু স্বয়ং হরি যদি জনগণের সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ামক হন, তাহা হইলে ‘জনগণ’ ‘শ্রীহরির’ বিচারে পৃথক্ হইয়া পড়েন—এক কখনও হন না। যথা—পিতা ও পুত্র কখনও এক নহে। কেহ যদি “আত্মবৎ জায়তে পুত্রঃ” এই ত্রায় অবলম্বনে পুত্রকেও পিতা-স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করতে চাহেন, তাহা হইলেও কার্যক্ষেত্রে বা ব্যবহার ক্ষেত্রে, এমনকি প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারও পিতা-পুত্রের ভেদই স্বীকার করিয়া থাকেন, একত্ব স্বীকার করেন না। তাহার প্রধান কারণ—পুত্রকে তাহার মাতার সহিত পিতার সর্বপ্রকার ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় না; সুতরাং পিতা পুত্র কখনই এক হইতে পারে না। এই প্রকার ব্যবহারিক যুক্তি অল্পসংখ্যক সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর এবং তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ জনগণকে এক বলা যাইবে না। সুতরাং জনসেবা ও হরিসেবা কখনই এক নহে।

আধুনিক নাস্তিক-সমাজের মস্তিষ্কে হরিসেবা ও জনসেবার পার্থক্য অল্পভর করার জ্ঞানের নিতান্ত অভাব। অশিক্ষিত ব্যক্তি ঢালক সাজিলে হৈয়ালী-থেয়ালীর দ্বারাই মোড়ল সাজিয়া বসে। বিবেক-শূন্য ব্যক্তি জ্ঞানী সাজিবার চেষ্টা করিলে ভারতীয় হিন্দুধর্মের সর্বনাশকারী হইয়া পড়ে এবং হিন্দুকে মুসলমান, মুসলমানকে হিন্দু বা খৃষ্টান এবং নানকপন্থী, বৌদ্ধ প্রভৃতিকে একাকার বলিয়া মনে করে। ইহাই হিন্দুধর্মের ধ্বংসের মন্ত্র। এই প্রকার হিন্দুধর্ম-বিনাশকারী নাস্তিক অপসম্প্রদায়ের ধ্বংসসাধনের জন্ত শাস্ত্রীয় অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ ঘোষণা করা প্রয়োজন।

জীবসেবকগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া আমরা তাহাদিগকে নাস্তিকতা জাল হইতে মুক্ত করিয়া ‘জীবে দয়া’র আদর্শ প্রদর্শন করিব। প্রকৃতই যদি ‘জীবে দয়া’ করিতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ জীবসেবিকগণের প্রতি দয়া করাই বিশেষ আবশ্যক। ত্রিগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-রাধা-বিনোদ-বিহারীজীউর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠাপূর্বক অধর্ম, বিধর্ম, কুধর্ম, অপধর্ম, ছলধর্মাদি বিধ্বংস করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

—জগদগুরু শ্রীশ্রীমন্তপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

## একাদশীর জন্মকথা

চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিবার পর পরমেশ্বর জীবগণের দমনার্থ পাপপুরুষকে সৃষ্টি করেন। তাহার মস্তক—দ্বিজাতিহত্যার স্বরূপ, লোচনদ্বয়—মদিরাপান, বদন—স্বর্গচৌর্য্য, কর্ণদ্বয়—গুরুতল্লগতি, নাসিকা—স্নাইহত্যা এবং গো-হত্যা—দোষ—ব্রাহ্ম, অগ্নহত্যা—গলদেশ, স্তন্যলোকবধ—উদর, শরণাগত-হত্যা—নাভি, গুরুনিন্দা—সক্খিভাগ, পিতৃবধ—অভিযুদয়, উপপাতক—রোমাবলী। নিজসৃষ্ট মহাকায় পাপপুরুষের এই প্রকার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া পুরুষোত্তম প্রজাগণের দুঃখ দূর করিবার জন্ত চিন্তা করিতেছিলেন। অতঃপর একদিন ভগবান্ বিষ্ণু গরুড়ারোহণে যম-মন্দিরে গমন করেন। যমরাজ ভগবানকে দর্শন করিয়া উপযুক্ত স্বর্ণসিংহাসনে প্রভুকে উপবেশন করাইয়া পাতাদিদ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন।

যমরাজের সহিত উপবেশন ও কথোপকথনকালে ভগবান্ পুরুষোত্তম দক্ষিণ-দিকে ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া যমরাজকে জিজ্ঞাসা করেন—‘কাহার ক্রন্দনধ্বনি শুনা যাইতেছে?’ যমরাজ উত্তরে জানান,—‘হে দেব! পাতকী মর্ত্ত্যজীবগণ স্বহস্তাজ্জিত কর্ম্মদোষে অত্যন্ত দুঃখপ্রদ নরক ভোগ করিতেছে। পাপবৃক্ষের ফল অত্যন্ত দুঃখপ্রদ। তাহা সহ করিতে না পারিয়া পাপিগণ রোদন করিতেছে। যমরাজের বাক্য-শ্রবণপূর্ব্বক ভগবান্ স্বয়ং রোরবাদিতে দুঃখপ্রাপ্ত জীবগণের দুঃখ অবগত হইয়া সদয়-হৃদয় প্রভু চিন্তা করিয়াছিলেন—আমার সৃষ্ট প্রজাগণ আমি বর্ত্তমানে তাহাদের কর্ম্মদোষে অত্যন্ত দুঃখ পাইতেছে। এতএব ইহাদের দুঃখের অবসানের উপায় স্থির করিতে হইবে। তৎপরে ভগবান্ স্বয়ং একাদশী-তিথি হইলেন এবং সেই সমস্ত পাপিগণকে একাদশী ব্রত পালন করাইয়া পরম ধামে লইয়া গেলেন। অতএব একাদশীকে বিষ্ণুর মূর্ত্তি জানিতে হইবে এবং উহা সমস্ত ব্রতের মধ্যে উত্তম ব্রত।

একাদশীকে জগৎপাবনী জানিয়া পাপপুরুষ শঙ্কিত হইয়া ভগবানের স্তব করিতে উত্তত হইল। সে বন্ধাজলি হইয়া কোমল বাক্যে ভগবানের স্তব করিতে থাকিলে তাহার স্তবে পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—‘আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার স্তবের উদ্দেশ্য কি বল। পাপপুরুষ বলিতে লাগিল,—‘হে প্রভো, নিজস্রুগত জীবমকলকে দুঃখ প্রদানার্থ আমি আপনাকর্ত্তক সৃষ্ট হইয়াছিলাম; কিন্তু একাদশী-প্রভাবে সম্প্রতি ক্ষয়-প্রাপ্ত হইতেছি। যদি আমার মৃত্যু হয়, সমস্ত প্রাণীর ভব-বন্ধন মুক্ত হইয়া যাইবে। তাহা হইলে, এই সংসার-



কৌতুকাগারে আপনার ক্রীড়া-কৌতুক বন্ধ হইয়া যাইবে। যদি আপনি জগৎ-কৌতুক-মন্দিরে ক্রীড়ার বাঞ্ছা রাখেন, তাহা হইলে আমাকে একাদশী-তিথির ভয় হইতে ভ্রাণ করুন। অল্প শতসহস্র পুণ্য আমাকে মারিতে পারিবে না। কিন্তু একাদশীই আমাকে হননে সমর্থ; যেহেতু উহা আপনারই স্বরূপ। একাদশী-তিথি-ভয়ে আমি মহুস্তা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গমধ্যে, পর্বত, বৃক্ষ, জল, স্থল, নদী, সমুদ্র, বন, প্রান্তর, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এবং দেব-গন্ধর্বাদির নিকট পলায়ন করিয়াছি; কিন্তু কোনস্থানে নির্ভয় হইলাম না। কোটি ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে একাদশীর স্থান আছে। সুতরাং, আমার স্থান কুত্রাপি নাই। হে দেবদেব! আমি যেখানে একাদশী হইতে নির্ভয় হইয়া বাস করিতে পারি, এমন একটি স্থান নির্দেশ করিতে আজ্ঞা হয়। যেহেতু আপনিই আমাকে রক্ষা করিয়াছেন; সুতরাং আমাকে আশ্রয় প্রদান করা আপনারই কর্তব্য।”

শ্রীভগবান্ হস্ত করিয়া পাপ-পুরুষকে বলিলেন—“পাপপুরুষ! তুমি শোক ও ভয় পরিত্যাগ কর। একাদশী-তিথি সমাগত হইলে তুমি যাহাতে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাকিতে পার, তাহার জগৎ স্থান নির্দেশ করিতেছি।—তুমি একাদশীর দিন অন্নকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিবে। আমার মূর্তিষরূপা একাদশী অন্নাশ্রিত ব্যক্তির পাপ বিনাশ করিবে না। অর্থাৎ, একাদশীতে অন্ন ভোজন করিলে তাহাকে সর্বপ্রকার পাপ আক্রমণ করিবে।”—এই কথা বলিয়া পরম-পুরুষ অন্তর্দ্বান করিলেন। পাপপুরুষও ভগবদ্বাক্যে কৃতার্থ বোধ করিয়া নিজ-স্থানে গমন করিল।

অতএব একাদশীর দিন অন্ন ভোজন করা কর্তব্য নহে। কারণ, যাবতীয় পাপ একাদশীর দিন অন্নকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। মর্ত্যজীবগণ যত গ্রাস ভোজন করে, প্রতিগ্রাসে কোটি ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ ভোজন করে, সে পাপী-শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র, মধবা, বিধবা সকলের পক্ষেই এই তিথি পালন করা কর্তব্য। মাতাকে মাতা বলা যায় না; কিন্তু একাদশীই প্রকৃত মাতা। কারণ, গর্ভধারিণী মাতা কেবল ইহলোকেই পালন করেন, কিন্তু একাদশী সর্বত্র পালন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি একাদশী ব্রত ত্যাগ করিয়া অন্ন ব্রতানুষ্ঠান করে, সে হস্তস্থিত অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া লোষ্ট্রে গ্রহণ করে মাত্র। যে-ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে একাদশী-ব্রত পালন করে তাহার দ্বারা সমস্ত যজ্ঞ, দান, ব্রতাদি সকল কার্যই কৃত হয়। মোহবশতঃ যে পাপবুদ্ধি ব্যক্তি একাদশীতে অন্ন ভোজন করে, শ্রীহরি তাহার প্রতি রুষ্ট হন। যিনি একাদশী ব্রত করেন, তাঁহার সমস্ত ধর্মই কৃত হয়। আর যে

একাদশী লভন করে, সে সমস্ত অধর্ষই করিয়া থাকে। যেমন সমস্ত দেবতা-মধ্যে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ একাদশী সর্বব্রত-মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আদিত্যগণের মধ্যে সূর্য, নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র, রত্নগণমধ্যে শিব, গজগণের মধ্যে ঐরাবত, অশ্বগণ-মধ্যে উচ্চৈশ্রবা, তীর্থসকলের মধ্যে যেরূপ গঙ্গা শ্রেষ্ঠ তদ্রূপ সমস্ত ব্রত-মধ্যে একাদশী শ্রেষ্ঠ।

### একাদশী-ব্রতের নিয়মাবলী

এক্ষণে একাদশীর নিয়মাবলী কীৰ্ত্তিত হইতেছে,—একাদশীর পূর্বদিন অর্থাৎ দশমীর প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া দন্তধাবন ও তৈল ব্যতীত স্নান করিয়া বিষ্ণু-পূজাপূর্বক হরিদ্যান করিতে করিতে মধ্যাহ্নে একবার মাত্র ভোজন করিবে। আমিষ, লবণ, শাকাদি পরিত্যাগ করা কর্তব্য। দ্বি-ভোজন, পরান ভোজন, কাংসপাত্রে ভোজন, নিমপাতা, বেগুনপোড়া, জামির, অত্যন্ত ভোজন, অত্যধু-পান, তাহুদ্র ভোজনাদিও নিষিদ্ধ। দশমীর নিয়ম দ্বাদশীতেও পালন করিতে হইবে। সম্যক ফল পাইতে হইলে দশমীতে নিশি-ভোজন অকর্তব্য। ঐ দিন অপরাহ্নে পুনরায় দন্তধাবন করিবে। পরে সাংকালে শ্রীহরির মন্দিরে গমন করিয়া শ্রীহরিকে ধ্যান করত এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

এতদগৃহীতং গোবিন্দ ময়া ত্বংপুরতো ব্রতম্।

সিদ্ধিং গচ্ছতু নিক্ষিপং তব পাদানুকম্পয়া ॥

অতি-চঞ্চল-চিত্তোহহং লোভমোহময়ো নরঃ।

শক্নোম্যেতদ্ব্রতং কর্তুং কিং তবানুগ্রহাহতে ॥

অর্থাৎ, “হে গোবিন্দ, আমি আপনার সাক্ষাতে এই একাদশী-ব্রত গ্রহণ করিতেছি। আপনার কৃপায় তাহা যেন নিক্ষিপে সিদ্ধ হয়। আমি অতি চঞ্চল-চিত্ত ও লোভমোহময় প্রাণী, আপনার কৃপা ব্যতীত এই ব্রত পালনে সমর্থ হইব না” —এই বলিয়া শ্রীহরির শ্রীচরণপদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্বক দণ্ডবৎ-প্রণাম করিবে এবং কুশল্যায় শয়ন করিয়া নিশি অতিবাহিত করিবে। প্রাতে উঠিয়া আর দন্ত-মার্জন করিবে না, কেবল দ্বাদশবার জলদ্বারা কুলি করিয়া মুখশুদ্ধি করিবে এবং স্নানান্তে বিষ্ণু-পূজাদি নিজক্রিয়া সমাপন করিবে। সমস্ত দিন শ্রীহরিনাম ও হরিকথা আলোচনায় অতিবাহিত করিয়া বৈষ্ণবগোষ্ঠী লইয়া হরিনাম কীর্ত্তনদ্বারা নিশি জাগরণ করিবে। শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণাদি পাঠসহকারে রাত্রিপান করা কর্তব্য। প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে দুগ্ধদ্বারা শ্রীহরিকে স্নান করাইতে হয়। পরে দ্বাদশীমধ্যে পারণ করিতে হইবে। সামর্থ্য থাকিলে বৈষ্ণবসেবা করাইয়া পরে সময়মধ্যে পারণ করা কর্তব্য। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তস্তিভুদেব শ্রোতী মহারাজ

## ভক্তির অধিকারী কে ?

শ্রদ্ধাবান্ জীবই ভক্তির অধিকারী। ভক্তিযোগে (হরি) — “কথা-শ্রদ্ধালুরেব অধিকারী”। জগদগুরু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ‘শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু’ গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোহস্ত সেবনে ।

নাতিসন্তো ন বৈরাগ্যভাগস্বামধিকার্যসৌ ॥ ( ১।২।২ )

মহাভাগ্যবশতঃ যাহার ভগবৎ-সেবার শ্রদ্ধা হইয়াছে, বিষয়ে অত্যধিক আসক্তিও নাই এবং বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ বৈরাগ্যও আসে নাই, সেই ব্যক্তিই ভক্তির অধিকারী।

এখন প্রশ্ন,—শ্রদ্ধা বস্তুটী কি ?—

মহাজনগণ বলিয়াছেন,—শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১২.০।২ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় বলেন,— শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থবিশ্বাসঃ। শাস্ত্রঞ্চ তদশরণস্ত ভয়ং তচ্ছরণস্তাভয়ং বদতি।’ অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শাস্ত্রার্থ এই যে,—‘শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত না হইলেই জীবের ভয়, তাঁহার শরণাগত হইলে আর ভয় নাই।’ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ-দেবও বলিয়াছেন,—

‘শ্রদ্ধা’-শব্দে বিশ্বাস কহে হৃদয় নিশ্চয়।

‘কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে’ সর্ব কৰ্ম কৃত হয় ॥

যথা তরোন্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্বন্ধ-ভুজোপশাখাঃ।

প্রাণোপহারাক্ষ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্কার্হণমূচ্যতেজ্যা ॥

( ভাঃ ৪।৩।১৪ )

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।

‘উত্তম’, ‘মধ্যম’, ‘কনিষ্ঠ’—শ্রদ্ধা অনুসারী ॥

শাস্ত্রযুক্ত্যে স্থনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যার।

উত্তম-অধিকারী সেই তারয় সংসার ॥

শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।

মধ্যম-অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্ ॥

যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে কনিষ্ঠ জন।

ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম ॥ ( চৈঃ চঃ মঃ ২২।৬২-৬৭ )

উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ-ভেদে ভক্ত্যাধিকারী ত্রিবিধ। শাস্ত্রযুক্তিতে হনিপুণ গুণভক্তিতে দৃঢ়শ্রদ্ধাব্যক্তিই উত্তমাধিকারী। যিনি শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে নিপুণ নন, অথচ সাধু-গুরু-রূপায় ভক্তিতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছেন, তিনি মধ্যমাধিকারী। আর কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিই কনিষ্ঠাধিকারী।

গৌরপার্বদ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুও ভক্ত্যাধিকার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

শাস্ত্রে যুক্তো চ নিপুণঃ সৰ্ব্বথা দৃঢ়-নিশ্চয়ঃ ।

প্রৌঢ়-শ্রদ্ধোহধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ ।

যঃ শাস্ত্রাদিশনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ ।

যো ভবেৎ কোমল-শ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগততে ॥

উপরিউক্ত শ্লোক-টীকায় জগদগুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেন,— “সৰ্ব্বথেতি তত্ত্ব-বিচারেণ সাধন-বিচারেণ পুরুষার্থ-বিচারেণ চ দৃঢ়নিশ্চয়ঃ । যুক্তিশ্চাত্র শাস্ত্রানুগঠৈব জ্ঞেয়া ‘যুক্তিশ্চ কেবলা নৈব’ ইত্যুক্তে: স্বাতন্ত্র্যানিষেধাৎ ॥ অনিপুণো বলবদ্বাদে দত্তে সতি সমাধাতুমসমর্থঃ ; তথাপি শ্রদ্ধাবান্ গুরুপদিশ্চ-ভগবন্তদ্বাদৌ মনসি দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ॥ কোমলশ্রদ্ধঃ শাস্ত্রযুক্তান্তরেণ ভেদত্বং শকাঃ, ন তু সৰ্ব্বথা ভিন্নঃ,—তথাত্তে ভক্তবানুপপত্তে: । বহির্মুখকৃত-বলবদ্বাদে সতি ক্ষণমাত্রং চিন্তস্ত দোলায়মানত্বমেব কোমলত্বম্ । পশ্চাৎ স্বকৃত-বিবেকেন গুরুপ-দিশ্চার্থমেব নিশ্চিনোতি ॥”

যে ব্যক্তি শাস্ত্রসিদ্ধান্তে ও শাস্ত্রানুগত যুক্তিতে সুপটু এবং তত্ত্ববিষয়ে, সাধন-বিষয়ে ও পুরুষার্থ-বিষয়ে সৰ্ব্বতোভাবে দৃঢ়নিশ্চয়, সেই দৃঢ়-শ্রদ্ধ-ব্যক্তিই **উত্তম অধিকারী**। যুক্তি-শব্দে শাস্ত্রানুগত যুক্তিই গ্রহণীয়। শুদ্ধযুক্তি-তর্ক গ্রহণীয় নহে।

যে ব্যক্তি শাস্ত্রযুক্তিতে অনিপুণ অর্থাৎ প্রবল পূর্বপক্ষ উপস্থিত হইলে তাহা সমাধান করিতে অসমর্থ, অথচ গুরুপদিশ্চ সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-বিষয়ে দৃঢ়-নিশ্চয়, সেই ব্যক্তিই **মধ্যমাধিকারী**।

ভক্তির বিরুদ্ধে কেহ প্রবল যুক্তি-তর্ক উঠাইলে যাহার চিন্তা চঞ্চল হইয়া উঠে, সে কোমল-শ্রদ্ধ। মধ্যমাধিকারীর ত্রায় তাহার দৃঢ়তা নাই। তর্কাদিদ্বারা তাহার শ্রদ্ধা শিথিল হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও শ্রদ্ধা নষ্ট হয় না। যদি শ্রদ্ধা নষ্ট হইত, তাহা হইলে সে ভক্তি-অধিকারীর মধ্যে গণ্য হইতে পারিত না। বহির্মুখ লোকের কু-যুক্তি শুনিয়া যাহার চিন্তে সাময়িকভাবে চাঞ্চল্য বা সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং পরে নিজ বিবেকদ্বারা গুরুপদিশ্চ সিদ্ধান্তকেই মার বলিয়া ধরিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি কোমল-শ্রদ্ধ। কোমলশ্রদ্ধই **কনিষ্ঠাধিকারী**।

### এখন প্রশ্ন,—শ্রদ্ধা কি ভক্তির অঙ্গ ?—

তত্বতরে জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সঙ্জনতোষণীতে ‘শ্রদ্ধা ও শরণাগতি’ প্রবন্ধে জানাইয়াছেন—**শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নহে**। কিন্তু অনগ্র-ভক্ত্যধিকারীর কর্ম্যধিকার-নিবারক বিশেষণ মাত্র। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুও (ভা: ১১।২০।২৭-২৮ শ্লোকের টীকায়) এই কথাই বলিয়াছেন,—**শ্রদ্ধা ন ভক্ত্যঙ্গম্**। কিন্তু কর্ম্মপার্থিসমর্থবিদ্বত্তাবদনন্তাতাখ্যাতিয়াং ভক্তৌ অধিকারি-বিশেষণমেব। শ্রদ্ধাং বিনা অনন্তাখ্যা ভক্তির্ন প্রবর্ততে। কদাচিৎ কিঞ্চিৎ-প্রজ্ঞা চ নশ্চতি।’ সুতরাং শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ না হইলেও শ্রদ্ধা ব্যতীত ভক্তি লাভ করিবার কোন উপায়ও নাই।

### এখন আলোচ্য,—শ্রদ্ধা কিরূপে হয় ?—

শ্রীল চক্রবর্তিপাদ ভা: ১১।২০।৯ ও ভা: ৭।৭।১৭ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—‘শ্রদ্ধা আকস্মিক-মহৎকৃপাজনিতা। মহদহুগ্রহাৎ শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধাতো ভক্তিঃ, ভক্তে: প্রেম।’ ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ-ফলে শাস্ত্রে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীৰ্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।

তজ্জোষণাদাত্তপবর্গবন্ত্যনি শ্রদ্ধা-রতিভক্তিরহুক্রমিচ্ছতি ॥

( ভা: ৩।২৫।২৫ )

সাধুসঙ্গে পরম-মঙ্গলকর শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে ভগবৎ-পাদপদ্মে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি—প্রেমভক্তি ক্রমে ক্রমে হইয়া থাকে।

শ্রদ্ধালু ব্যক্তি ভক্ত্যধিকারী। সেই শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গ বা সাধুকৃপায় লাভ হয়। সাধুসঙ্গ বা সাধুকৃপা আবার অহৈতুকভাবে আকস্মিকই হয়। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ ভা: ৪।২৮।২৯ শ্লোকের টীকায় জানাইয়াছেন,—‘না চ ভক্তির্দাদৃচ্ছিকী যাদৃচ্ছিক-সাধুসঙ্গাৎ যাদৃচ্ছিকৈব সাধুকৃপয়া ভবতি।’

মহাভাগ্যবান্ জীবই সাধুসঙ্গলাভের সৌভাগ্য পাইয়া তদাশ্রয়ে হরিভজন করিতে করিতে চিরস্থায়ী হইতে পারেন। যাহারা বিষয়ে অত্যধিক আসক্ত, তাহারা বিষয়ে কিছু ক্ষণিক সুখ পায়; কিন্তু চিরস্থায়ী হইতে পারে না। তাহাদের আনন্দ অল্প বা ক্ষণস্থায়ী। ভক্তের ভক্তিতে শ্রদ্ধা আছে বলিয়া তিনি ভগবদহুভবানন্দী, সেবানন্দী বা নিত্যানন্দী। আর অভক্তের (বিষয়াসক্তের) বিষয়ে শ্রদ্ধা আছে বলিয়া তাহারা জড়ানন্দী, বিষয়ানন্দী বা কিঞ্চিৎস্থায়ী।

( ক্রমশঃ )

।—ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ুধ ভাগবত মহারাজ



ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতত্ৰী  
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের  
শুভাবির্ভাব-বাসরে

দীনের প্রার্থনা

তব পদে নমি আমি,                      প্রণত হইয়া ভূমি,  
ওহে বরা শ্রীকৃষ্ণা পঞ্চমী ।  
মাঘ মাসে কৃষ্ণপক্ষে,                      এ মর জগত-বক্ষে,  
প্রকাশিলে প্রভুপাদে তুমি ॥  
সর্ব্ব সুলক্ষণ-যুত,                      পরম কল্যাণ পুত,  
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ॥  
তব পদ দেবগণ,                      করে সদা আরাধন,  
সেই তুমি গুহ্যতম অতি ॥  
আমি অতি মূঢ়জন,                      নাহি ভক্তি, নাহি জ্ঞান,  
তাই হৃদে চিন্তি বার বার ।  
ওহে তিথিবরা মোরে,                      শক্তি দেহ বর্ণিবারে,  
গুরুপদ-মহিমা অপার ॥  
কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতারী,                      গোলোকবিহারী-হরি,  
সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ ।  
তঁাহার দ্বিতীয় দেহ,                      বলদেব কায়-বুহ,  
নিজ-ইষ্ট-পূর্তির কারণ ॥  
বলদেবাভিন্ন হন,                      নিত্যানন্দ মহাজন,  
দয়াময় পতিত-পাবন ।  
নিত্যানন্দাভিন্ন গুরু,                      ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু,  
'গুরুদেব' এই তত্ত্ব হন ॥  
সমস্ত শাস্ত্রেতে কয়,                      গুরু সর্ব্বদেবময়,  
গুরু কৃষ্ণাভিন্ন বলি' মান ।  
বিষয়-আশ্রয়-ভেদে,                      কৃষ্ণ আর গুরুদেবে,  
'ভগবান্' শব্দ আখ্যা জান ॥

সেব্য-কৃষ্ণ ভগবানে,                    সেধিবারে জীবগণে,  
আকর্ষিয়া সেবক-ভগবান্ ।

কৃষ্ণপদে সমপিয়া,                    গোলোকেতে যায় লৈয়া,  
গুরুতত্ত্ব এত বড় হন ॥

অপার করুণা করি',                    হেন গুরুরূপ ধরি',  
ধরাধামে তুমি প্রভুপাদ ।

তোমার আরাধ্যধনে,                    জানায়েছ সযতনে,  
ঘুচাইয়া সর্ব অবসাদ ॥

হেন গুরু-শ্রীচরণ,                    যে করয়ে বিনিন্দন,  
মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহারে ।

নাহিক নিস্তার তা'র,                    এই শাস্ত্র মর্ম্মসার,  
নরকেতে মজে চিরতরে ॥

জীব কৃষ্ণ-নিত্যদাস,                    ভুলিয়া মায়া'র বশ,  
ভোগতরে লভে গতগতি ।

জড়ানন্দ লভিবারে,                    বহু দুঃখ লাভ করে,  
তবু তার নহিল স্মৃতি ॥

শ্রীকৃষ্ণে ভজিতে মতি,                    প্রভু মোরে দেহ শক্তি,  
ছাড়ি যেন বিষয়ের আশা ।

কি আর বলিব মুই,                    কিছুই যোগ্যতা নাই,  
তব পদ আমার ভরসা ॥

কোটিচন্দ্র সূশীতল,                    তব চরণ-কমল,  
সর্ব্বতাপ নাশিতে প্রবল ।

বলহীনে বলদান,                    করিতে না আছে আন,  
কৃপা করি' দেহ মোরে বল ॥

সংসার দুঃখ জলধি,                    ভাসি তাহে নিরবধি,  
কাম-নক্র গ্রাসে অনুরঞ্জে ।

কুবাসনা বাঁধি মোরে,                    বহু দুঃখ দান করে,  
তীরে লয় কেবা তোমা বিনে ॥

লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা, কনক-কামিনী-আশা,  
মোর ছুঁই চিন্তে ভরপুর ।

করিয়া শোধিত প্রভু, কৃপা কর ওহে বিভু,  
চিন্ত যেন নাহি চাহে আর ॥

তব আবির্ভাব-দিনে, পূজিতেছে একমনে,  
আজি সারস্বত ভক্তগণ ।

ব্যাসপূজা করি' তাঁ'রা, আনন্দেতে আত্মহারা,  
উচ্চরবে করে জয় গান ॥

(ওহে) প্রভুপাদ, অন্তর্যামি ! তব শিষ্যাধম আমি,  
পাপিষ্ঠ অধম দুরাচার ।

আশীস করহ মোরে, নিত্য তোমা সেবিবারে,  
( যেন ) অগ্নি আশা না হয় আমার ॥

পত্নী ধরা, মসী সিন্ধু, হিমাদ্রি লেখনী, বিন্দু,  
তব গুণ না পারে বর্ণিতে ।

কেমতে এ ক্ষুদ্র জন, করে তব গুণগান,  
শক্তি নাই তবু আশা চিতে ॥

তব পদে করি নতি, ওহে প্রভু সরস্বতী,  
নিবেদন করি শ্রীচরণে ।

জন্মে জন্মে শ্রীচরণ, ( তব ) ভক্তসঙ্গে সেবি যেন,  
কৃপা মাগে এই অভাজনে ॥

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিকুমুদ সন্ত

### ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৪৮শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৬৪ পৃষ্ঠার ১৬ পঙ্ক্তিতে “তখন প্রভুপাদ” স্থলে “তখন তিনি ( ‘বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব’-এর লেখক )” এবং ২২ পঙ্ক্তিতে “( শ্রীল প্রভুপাদ )” স্থলে “শ্রীল ভক্তিব্রজান কেশব গোস্বামী” হইবে ।

## প্রগতির পরিণাম

মায়িক জগতে পরিবর্তন নিরন্তর ঘটতেছে। দেশ, কাল, পাত্রাদি কোন বস্তুই এখানে নিত্যতা নাই। প্রতি মুহূর্তে সর্বত্র পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। এখানে Stagnancy বা একঘেয়েতাব না থাকিলেও কথাটির প্রচলন বর্তমান। জগৎ-শব্দটির দ্বারা এই নিরন্তর পরিবর্তনকেই উদ্দেশ্য করে। কালধর্ম তজ্জন্ম বস্তুর গুণাগুণ নিত্যই পরিবর্তনশীল। দেশ-কাল-পাত্রাদির স্বভাব বা ধর্মকে তজ্জন্ম মায়িক রাজ্যে সনাতন বলিলে মিথ্যা বলা হয়। নিত্যজগতে বা বৈকুণ্ঠাদিতে এইরূপ ক্ষয়-পরিবর্তন নাই, তথায় নিত্যত্ব, নবনবায়মানত্ব ও অনন্তত্ব বিরাজিত।

মায়িক জগতে কালপ্রভাবে ধর্মেরও এই পরিবর্তন অনিবার্য। তজ্জন্মই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—“যদা যদা হি ধর্মশ্চ গ্ৰানীর্ভবতি ভারত।” সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিটি যুগে ধর্মের ক্রমশঃই অবনতি ঘটিতেছে। পরিবর্তনই জগতের নিত্যধর্ম এবং তজ্জন্ম ইহা অনিবার্য। বিচার্য বিষয়—এই পরিবর্তন উর্দ্ধমুখী না অধোমুখী। দেশ, কাল, পাত্রাদির ক্রমশঃ উন্নতি না অবনতি সাধিত হইতেছে তাহা বিচার করিলে জগতে সর্বত্র অবনতিই দেখা যায়। কালের পরিমাণ-বিচার লক্ষ্য করিলে, সত্যযুগের পরিমাণ ১৭,২৮,০০০ বৎসর, ত্রেতাযুগের কাল-পরিমাণ ১২,৯৬,০০০ বৎসর, দ্বাপরযুগের পরিমাণ ৮,৬৪,০০০ বৎসর এবং কলিযুগের পরিমাণ ৪,৩২,০০০ বৎসর। মনুষ্য-শরীরের দীর্ঘতা বিচারে দেখা যায়, সত্যযুগে ১৪ হস্ত, ত্রেতাযুগে ১০ হস্ত, দ্বাপরযুগে ৭ হস্ত এবং কলিতে মাত্র ৩৬ ( সাড়ে তিন ) হস্ত হইয়াও ক্রমশঃ হ্রাস বা ক্ষয়োন্মুখী। স্বাভাবিকভাবে মনুষ্যের দৈহিক শক্তিও সমহারে হ্রাস পাইয়াছে। ধর্মবিষয়েও হ্রাসই শাস্ত্রে নির্দিষ্ট দেখা যায়। যথা—সত্যযুগে ধর্ম চারিপাদ, ত্রেতাযুগে তিনপাদ, দ্বাপরে দুইপাদ এবং কলিযুগে একপাদ হইয়াও ক্রমশঃ ক্ষীয়মান। এই পরিণাম বা নিম্নমুখীতা বা অবনতি সর্বত্রই প্রকাশ পাইলেও কলির মনুষ্যগণ পূর্ব যুগের মনুষ্যদিগকে অহুন্নত, অসভ্য ও অজ্ঞ বলিতে দ্বিধাবোধ করে না। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সর্বত্র সংস্কার ও পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। কিন্তু এই পরিবর্তন বা সংস্কারের ফল নিম্নমুখী, উর্দ্ধমুখী নহে, তাহা স্বীকার করিতে সাধারণের কুণ্ঠা প্রকাশ পায়। বর্তমান ভারতে মানবিকতার প্রবল প্রবাহ চলিতেছে। অর্থাৎ অহুন্নত বা অধঃপতিতের প্রতি বিশেষ দরদ পরিদৃষ্ট হইতেছে। তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা উন্নত ভোগ-ব্যবস্থায় সর্বস্তরে বিধি-

প্রচলিত হইয়াছে। এমনকি তাহাই ভগবৎসেবা বলিতে অনেকের কুঠা নাই। শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহসেবার প্রতি কটাক্ষকেও সঙ্গত ও সংস্কার বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। রুদ্ধদ্বারের দেবালয়কোণ পরিত্যাগ করত চাষীভাইদের প্রতি আত্ম-নিয়োগ যথার্থ ধর্ম বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। “মহৎসেবাং দ্বারমাহবিমুক্তেন্তমো-দ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্”—এই শাস্ত্রবাক্য বিপর্যস্ত এবং অচল হইয়া পড়িয়াছে। চাষীভাইরাই সমাজের পরমার্থ প্রদাতা হইয়াছে। যতপি কোন কোন মনীষী প্রকাশ করিয়াছেন—“জ্ঞান-গরিমা-শক্তি-সাহস, আজও মোদের হয়নি শেষ।” উন্নতাভিমানিগণ ইহা স্বীকার করিতে অন্নিচ্ছুক।—এই অবনতি তাঁহাদের নিকট অগ্রাহ। এখানে আর একটি বিচার অবান্তর বলিয়া মনে করি না। এই মানবিকতা বোধকারী ধাহারা তাঁহারা বাস্তবিক দীন-দরদী কিনা? প্রায় সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয় এই দরদী মহাত্মা তাঁহার সহোদর বেকার অন্নহীন ভ্রাতা ও তাঁহার পরিবারকে নিজভোগ্য বিরীয়ানী ভোগ দূরের কথা, দুই মুঠা ডাল-ভাতেরও অংশ প্রদানে বিমুখ। দীনদরদ কতদূর নিকপট ইহাদ্বারা বোধ করা উচিত। প্রতিপক্ষে ভারত পুরাকালে একান্বর্তী থাকিয়া মানবিকতায় নিকপট ছিল কিনা তাহা সুধীগণের বিচার্য।

প্রস্তরযুগ, বঙ্গলযুগ, কাষ্ঠধ্বংসদ্বারা অগ্ন্যুৎপাদন প্রভৃতি উল্লেখ করত প্রাচীনগণকে সর্বত্রই হেয় প্রতিপন্ন করিতে ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে। পরন্তু তাঁহাদের আগ্নেয়াস্ত্র, বরুণাস্ত্র, পাণ্ডপতাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, শবভেদী অস্ত্রাদি, বিমানাদির ব্যবহার ও মনোগতিতে যথেষ্ট সূর্য্যাদি সমস্তলোক গমনাগমন, বাক্‌সিদ্ধতা, সর্বজ্ঞতা, চেতনকে অচেতন ও অচেতনকে চেতনে পরিণত করাকে বর্তমান ভারত প্রশংসার চক্ষে দর্শন করিতে নারাজ এবং শিশুমতিকে ইহার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত করে না। প্রাচীনগণের দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদির উন্নত ও অসীম বিকাশকে কলিহত এবং দুঃসঙ্গগ্রস্ত বর্তমান ভারত অনাদর ও অসত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। তাঁহাদের প্রকাশিত বেদ-উপনিষদ-মহাভারত-পুরাণ-সংহিতাদি সর্বোত্তম অভ্রান্ত মঙ্গলপ্রদ গ্রন্থকে মিথ্যা বলিয়া ধারণা করে। চরকসংহিতা, বেদাঙ্গ জ্যোতিষশাস্ত্রাদি গ্রন্থকে অনুসরণ করিয়াও তাহাতে মোহগ্রস্ত হইয়াছে, ইহা মিথ্যা নহে। তাঁহাদের জ্ঞান-যোগাদির অসীম ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াও তাহাতে বিমুখ। কবি মাইকেলের অনুশোচনাই ইহাতে স্মৃতিপটে জাগ্রত হয়।—“হে বঙ্গ! ভাঙারে তব বিবিধ রতন, তা-সবে অবোধ আমি, অবহেলা করি। পরধনলোভে মত্ত, করিছ ভ্রমণ পরদেশে, শিক্ষাবৃত্তি কৃক্ষেণে আচরি।” ইহা সত্য সত্যই বর্তমান ভারতের চিত্র। বর্তমান ভারতে যাহা



কিছু উন্নতি বলিয়া গর্বের বিষয় হইয়াছে, তাহা ভয়ঙ্কর বিশ্ববৎসিক্রমে আতঙ্কজনক হইয়া দাঁড়াইতেছে।

সমাজব্যবস্থায় যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহা মানবতাকে পশুত্বে পরিণত করিয়াছে বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যাশ্চর্য্য হয় না। বর্তমান শিক্ষাধারায় উচ্চশিক্ষিত-দিগের আচরণ হইতে ইহা সম্যক্রূপে সংবাদপত্রাদিতে প্রতিদিন প্রকাশ পাইতেছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাতে প্রেমবিলাস, ছাত্র-ছাত্রীতে প্রণয়, অবৈধ মিলন ও ধর্ষণাদি সংবাদপত্রসমূহের দৈনন্দিন সংবাদ। ইন্দ্রিয়-তর্পণই যে শিক্ষার মূখ্য উদ্দেশ্য তাহাকে প্রকৃত উন্নত শিক্ষা বলা সঙ্গত নহে। নিজের ও সমাজের অল্পমত শ্রেণীর এই ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক শিক্ষা ও ব্যবস্থাই বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানাদির প্রধান উদ্দেশ্য। উন্নতভাবে অধিকতররূপে ইন্দ্রিয়-তর্পণই মনুষ্যজন্মের প্রকৃত সার্থকতা নহে। মনুষ্যের প্রাণীও এই ইন্দ্রিয়-তর্পণকার্য্যে সুদক্ষ। এই কার্য্যটি মনুষ্যের উন্নত জীবনের পরিচায়ক নহে।—

আহার-নিদ্রা-ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভিন্নরাণাম্।

ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।

—শ্লোকটীতে ইহাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। মনুষ্যজীবন পরমার্থ বা আধ্যাত্মিকতার জন্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত, অত্যাশ্চর্য্য পশুতুল্য বলা হইয়াছে।

বহির্ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য ভোগবাদ। তজ্জগৎ তত্তদদেশে ভোগোন্নতিই বিশেষরূপে সাধিত হইতেছে—ইহা সত্য। প্রাচীন ভারত ভোগোন্নতিকে উন্নতি জ্ঞান করেন নাই; পরন্তু তাহা অবনতি-জ্ঞানে তাহাকে বিদমিত করিয়াছেন। কারণ ভোগবাদ পরমার্থ বিষয়ের পরিপন্থী। বর্তমান ভারত পাশ্চাত্যদেশের সঙ্গপ্রভাবে মোহাবিষ্ট হইয়া পাশ্চাত্যদেশীয় সমাজ-ব্যবস্থায় আকৃষ্ট হওয়ায় আর্ধ্যাশ্রমবিদের ব্যবস্থাকে হেয় বিচার করত প্রাচীন ঋষি-ব্যবস্থার পরিবর্তন বা সংস্কার সাধন করিতেছেন। এই ভবিতব্যকে অমঙ্গল বিচার করিয়া প্রাচীন ভারতে কয়েকটি বিশেষ নিষেধ প্রচলিত ছিল। যেমন, কালাপানি অতিক্রম না করা, পাপী ব্যক্তির ছায়া লঙ্ঘন না করা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি। পরন্তু এইগুলিকে কুসংস্কার-জ্ঞানে লঙ্ঘন করায় দুঃসঙ্গপ্রভাবে উন্নততম ভোগব্যাপারকেই পরম উন্নতি ও মঙ্গল জ্ঞান করিতেছে এবং সংস্কার সাধনের নামে কুসংস্কার প্রবর্তিত হইতেছে। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বিলোপসাধন, স্ত্রীস্বাধীনতার প্রবর্তন, স্কুল-কলেজে প্রাপ্তবয়স্কদিগের সহশিক্ষা, চলচিত্র, দূরদর্শন, দূরদ্রশ্য প্রভৃতিদ্বারা প্রচণ্ডবেগে প্রচার করত সমাজের পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। তজ্জগৎ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গ্রাহি গ্রাহি রব শ্রুত হইতেছে।

সনাতন-ধর্মগ্রন্থে ও আখ্যাব্যবস্থায় সর্বত্র কলিকালকে ভীতিজনক বিবেচিত হইয়াছে। পরীক্ষিত মহারাজ তজ্জ্ঞ নিগ্রহ ও নিয়মিত করিয়া “দ্যুতং, পানং, জিয়ং ও স্তনা” রূপ স্থানচতুষ্টয় কলিকে প্রদান করিয়াছেন। এই দ্যুতাদি খেলাধুলা, মদিরাদি দ্রব্যসেবন, স্ত্রীসঙ্গদ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ এবং প্রাণীহত্যাভ্রান্তিত মৎস্ত-মাংস ভক্ষণ মূর্তিকামী ব্যক্তিপক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে।—

অথৈতানি ন সেবেত বৃহসু: পুরুষ: কচিৎ ।

বিশেষতঃ ধর্মশীলো রাজা লোকপতিগুরু: ॥

অর্থাৎ ষাঁহার মূর্তিকামী, তাঁহার কখনও এই দ্যুতক্রীড়া, মদিরাদি মাদক দ্রব্য, স্ত্রীসন্তোগ ও মৎস্তাদি ভক্ষণ—কার্য্য আচরণ করিবেন না। বিশেষভাবে ধর্মশীল ব্যক্তি, দেশের রাজা, লোকনেতা এবং গুরুব্যক্তি অবশ্যই এইগুলি পরিত্যাগ করিবেন।

বর্তমান ভারতে এই বিধিবাক্য প্রবল উৎসাহে লজ্জিত ও নির্বাসিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এইগুলির প্রসারকল্পে সরকার হইতেও বহু অর্থ ব্যয়ে ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। দাবা, পাশা, ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, ভলিবল, হকি প্রভৃতি খেলাধুলায় দেশবাসীকে সর্বতোভাবে উৎসাহিত করা হইতেছে। পরন্তু এই দুর্লভ মনুষ্যজন্মের অমূল্য সময় ইহাতে কিভাবে অপব্যয়িত হইতেছে তাহা উন্নতাভিমানী ব্যক্তিগণ বিচার করেন না। কিন্তু বুদ্ধিমান পারমার্থিক ব্যক্তিগণ এই ক্রীড়াকৌতুক পরিত্যাগ করত পরমার্থ অহুশীলনদ্বারা দুর্লভজন্ম সার্থক করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত মহাপাণ্ডবালকগণ, কর্তৃক ক্রীড়নার্থে আহৃত প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি,—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ ।

দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যত্রবমর্থদম্ ॥

এই মনুষ্যজন্ম অত্যন্ত দুর্লভ এবং পরমার্থপ্রদ। মনুষ্যোত্তর জন্মে পরমার্থচেষ্টা সম্ভব নহে। পরন্তু এহেন মঙ্গলজনক হইলেও ইহা ক্ষণভঙ্গুর ও অত্যন্ত অনিশ্চিত। তজ্জ্ঞ কৌমার-কাল যদিও ক্রীড়াকৌতুকাদির কাল, তথাপি যিনি বুদ্ধিমান তাঁহার পক্ষে এই কালেও খেলাধুলায় সময় নষ্ট না করিয়া অর্থাৎ এই শ্রেষ্ঠ জন্মের মহান্ সুযোগকে সংকার করত যে ধর্ম আচরণ করিলে ভগবান্কে লাভ করা যায় তাহাই কর্তব্য।

যথা হি পুরুষশ্চেহ বিষ্ণো: পাদোপসর্পণম্ ।

যদেষ সর্বিভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বর: সুহৃৎ ॥

লোকে আপনজনকেই সেবা করে। ভগবান্ বিষ্ণুই সকল জীবের প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও হিতকারী বন্ধু। এ কারণ তাঁহাকে সেবা করাই সম্ভব।

সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্ ।

সর্বত্র লভ্যতে দৈবান্যথা দুঃখমযত্নতঃ ॥

আরও দেখ, জীবগণ দেহলাভ করিলেই পশুপক্ষী প্রভৃতি সকল জন্মেই ইন্দ্রিয়-তর্পণ-সুখ লাভ করিয়া থাকে । যাহার যেরূপ পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল, তদনুসারে তাহার সুখ এবং দুঃখ লাভ ঘটে । দুঃখের জন্ত কেহই চেষ্টা করে না, কিন্তু চেষ্টা না করিয়াও যেমন দুঃখলাভ ঘটে, তদ্রূপ সুখও চেষ্টা না করিয়াও পূর্বকর্মানুসারে যাহা প্রাপ্য তাহা অবশ্যই ঘটিবে ।

তৎ প্রয়াসো ন কর্তব্যো যত আয়ুর্ব্যয়ঃ পরম্ ।

ন তথা বিন্দতে ক্ষেমাং মুকুন্দচরণাধ্বজম্ ॥\*

ভগবান্ মুকুন্দই ( বিষ্ণুই ) একমাত্র মুক্তিদাতা ( অজ্ঞ কোন দেবদেবীর সে অধিকার নাই ) এবং এই সংসারজালা হইতে মুক্তিলাভ করত মুকুন্দের পাদপদ্ম-সেবা লাভ করাই পরম মঙ্গল । অতএব ইন্দ্রিয়সুখের নিমিত্ত জীড়াকৌতুকাদি ঘাবতীয় কার্যের প্রয়াস পরিত্যাগ করত এই পরম দুর্লভ জন্মের হরিভজন করিবার সুযোগকে নষ্ট করা কখনই কর্তব্য হইতে পারে না ।

ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভবমাশ্রিতঃ ।

শরীরং পৌরুষং যাবন্ন বিপশ্যেত পুঙ্কলম্ ॥

অতএব ভজনোপযোগী ইন্দ্রিয়যুক্ত এই মনুষ্য শরীর লাভ করত, যতদিন ইহা জরাদিদ্বারা বিপদগ্রস্ত না হয়, অর্থাৎ স্বস্থ ও সবল থাকিতে, কুশলী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির এই শরীরদ্বারা পরমমঙ্গল ভগবন্তজন করিতে যত্নবান্ হওয়া কর্তব্য ।

শ্রীমদ্ভাগবতে যদুরাজ ও অবধূত ব্রাহ্মণ-উপাখ্যানে ( ভাঃ ১১।৩।২২ ) অনুরূপ বাক্যই বর্তমান আছে :—

লব্ধাঃ সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ ।

তুর্বাং যতেত ন পতেদনুমুত্যা যাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্মৃতাঃ ॥

জীবগণ মনুষ্যেতর পশুপক্ষ্যাদি জন্মে অসহায় হইয়া বহুবিধ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে ; ইচ্ছা করিলেও সুখময় ও শ্রেষ্ঠ মনুষ্যদেহ পাইতে সক্ষম হয় না । বহুজন্ম দুঃখকষ্ট ভোগ করিবার পর অত্যন্ত দুর্লভ ও পরমার্থপ্রদ এই মনুষ্যদেহ লাভ হইয়া থাকে । পরন্তু এই মানবদেহও অনিত্য এবং ক্ষণভঙ্গুর অনিশ্চিত ; যে কোনও মুহূর্ত্তে নষ্ট হইবার যোগ্য । এই হেতু, বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, নিরন্তর মৃত্যুর দিকে ধাবিত হইয়াও, যতদিন না মৃত্যু ঘটে,

ততদিন চরমকল্যাণ লাভের জগু চেষ্টা করা উচিত। রূপ-রসাদি বিষয়ভোগের জগু মনুষ্যজন্মে চেষ্টা করা বুদ্ধিমত্তা নহে। এই বিষয়ভোগ সকল জন্মেই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু অত্র কোনও জন্মে পরমার্থ লাভ হয় না। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমন্ত্তিবেন্দাস্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

## লিঙ্গদেহ

জন্ম-মৃত্যু-বিবেক। জীবাত্মা চেতন, তাহার জন্ম, মৃত্যু ও সংসার নাই। সেই আত্মার উপাধি দুইটি—লিঙ্গ ও স্থূলদেহ। তন্মধ্যে লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহ বাসনাময় ও চিদাভাস এবং স্থূলদেহ বাসনাত্ম্যায়ী কৰ্ম্মসহায়ক ও জড়। পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়—এই ষোড়শ বিকার বিস্তৃত ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গদেহ চেতনের সহিত যুক্ত হইলেই তাহাকে ‘জীব’ বলা হয়। শ্রীভাগবতের (ভাঃ ৫।১০।১০) “স্থৌলং কাশ্যং ব্যাধয় আধর্যশ্চ” শ্লোকানুসারে স্থূল, কৃশ, আধি (মনঃপীড়া), ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, কলহ, বিষয়ভোগ-বাসনা, জরা, নিদ্রা, বিষয়াসক্তি, ক্রোধ, দেহাত্মবুদ্ধি, শোক, মোহ—এইসকল দেহাভিমানের সহিত উৎপন্ন হইয়াছে। দেহাভিমাত্রী জীবেরই ঐ স্থূলত্ব, কৃশত্বাদি হইয়া থাকে। লিঙ্গ ও স্থূলদেহ অবিচ্ছিন্ন আত্মাতে কৃত হইয়াছে। জীবাত্মায় অবিচ্ছিন্নস্থ স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধির ধারণা মূঢ়তার পরিচায়ক, আত্মবস্তু কখনই অনাগ্রপ্রতীতির সহিত এক নহে, মূঢ়তাবশতঃই তাহাদের সমন্বয় কল্পিত হয়। চিত্ত্রপগত সঙ্ঘিৎদ্বারা যখন এই উভয়দেহই আমার নয় বলিয়া বোধ হয়, তখন জীবাত্মা ভগবানকে দর্শন করেন—ইহা ভাগবতে (ভাঃ ১।৩.৩৩) শৌনকাদির প্রতি স্মৃতির উক্তি হইতে জানা যায়।

স্থূলদেহমাত্র জীবের বন্ধনের কারণ নহে। কেন না, তাহা হইলে জন্ম-জন্মান্তরের বিচার নষ্ট হয় এবং দেহনাশে সংসারদশা হইতে মুক্তি অনিবার্য্য হয়। সুতরাং স্থূলদেহ ব্যতীত অত্র কোন আত্মবস্তু উপাধির প্রয়োজন। জীবের দেহনাশ হইলেও যাহার সংসর্গহুতি হয় না, বরং যাহাকে সম্বলরূপে গ্রহণ করিয়া জীব জন্ম-জন্মান্তর ভোগ করে; সেই উপাধিই সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গশরীর। স্থূলদেহ জীবের ভোগায়তন হইলেও সেই দেহে ভোগ বা গতাগতিরূপ পুনর্জন্মাদি হয় না, উহা সূক্ষ্মদেহদ্বারা হয়। ‘স জীবো যৎপুনর্ভবঃ’ (ভাঃ ১।৩.৩২)। স্থূল-শরীরের দ্বারা কৰ্ম্মসমূহ অন্তর্গত হইলেও ঐ কৰ্ম্মের কর্ত্তা এবং ফলভোক্তা সূক্ষ্ম শরীর, স্থূলদেহ উহার সহায়ক মাত্র। কৰ্ম্মবাসনাময় সূক্ষ্মশরীরদ্বারাই দেহীজীব

কর্মসহায়ক স্থলদেহ গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে। প্রতি জন্মেই নতুন দেহ প্রাপ্তি হয়। ঐরূপ স্থলদেহের সংযোগ বা প্রাপ্তি—জন্ম এবং উহার বিয়োগই—মৃত্যু। প্রতি জন্মে ও মৃত্যুতে স্থলদেহের প্রাপ্তি ও নাশ হইলেও সূক্ষ্মদেহের বারম্বার প্রাপ্তি বা নাশ হয় না। কিন্তু সূক্ষ্মদেহ যে কোন সময়ে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব। তাই ইহাকে ‘অনাদিমান’ ( ভা: ৪।২৩।১০ ) বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ত্রীভাগবতে মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন,—

যেনৈবারভতে কর্ম তেনৈবামৃত তং পুমান্ ।

ভুঙক্তে হব্যবধানেন লিঙ্গেন মনসা স্বয়ম্ ॥ ( ভা: ৪।২৩।৬০ )

“জীব স্থলদেহদ্বারা যে সমস্ত কর্ম করেন, বাসনাময় লিঙ্গদেহই তাহার মূল কারণ। স্থলদেহ বিনষ্ট হইলেও লিঙ্গদেহের নাশ হয় না। সেই লিঙ্গদেহই স্বর্গ-নরকাদিতে ফলভোগ করিয়া থাকে।” ‘ভূ’-শব্দের অর্থ—ভূমি বা ক্ষেত্র; জীবের উপাধিভূত লিঙ্গশরীরই সেই ক্ষেত্রের গ্রায় স্থখদুঃখের উদ্ভব স্থান, উহা—অনাদি ও জীবের বন্ধনমূল—ইহা ভাগবতের ( ৬।৫।১১ ) শ্লোক হইতে পরিস্কারভাবে অবগত হওয়া যায়।

সূক্ষ্মদেহে স্থলদেহের গ্রায় হস্তপদাদি অবয়ব সংস্থান নাই; উহা স্থলদৃষ্টির গোচর বা স্থল শব্দগোচরীয়ের গ্রাহ্য নহে। এই নিমিত্ত উহাকে অব্যক্ত বলা হয়। গতিশীল যানাদির আরোহী গতিবিশিষ্ট না হইয়াও যেরূপ যানাদির গতিতে গতিবিশিষ্ট, তদ্রূপ জীবের উপাধি সূক্ষ্মদেহের গমনেই উপহিত আত্মারও গমন সিদ্ধ হয়। লিঙ্গদেহে কিরূপে বিষয়ভোগ হইতে পারে, তদুত্তরে বলিতেছেন,—

“শয়ানমিমমুৎসজ্জা স্বসন্তং পুরুষো যথা ।”

জাগ্রদেহাভিমান পরিত্যাগপূর্বক স্বপ্নাবস্থায় জীব যেরূপ মনঃকল্পিত দেব, মন্তব্য অথবা পশুদেহে বিষয়ভোগ করেন, তদ্রূপ স্বর্গাদি লোকেও জীব কর্ম-ফলাভ্যাসারে স্বপ্নসদৃশ দেহ লাভ করিয়া থাকেন।” ( লিঙ্গশরীরে ) বিষয়-ধ্যানকারি-পুরুষের যেরূপ স্বপ্নাবস্থায় বিষয়াদির অভাবসত্ত্বেও বিষয়গ্রহণরূপ অনর্থের উদয় হয়, তদ্রূপ লিঙ্গাদেহাভাবেও অর্থাৎ উহার সঙ্কোচাবস্থাতেও জীবের সংসার হইতে মুক্তি হয় না ( সংসাররূপ অনর্থ বর্তমান থাকে )। স্বপ্নকালে মানব সূক্ষ্মমনোময় দেহে অভিমান করত বর্তমান স্থলদেহের আর স্মরণ করে না এবং জাগ্রতাবস্থায়ও মনোরথে অর্থাৎ মনঃকল্পনায় ভিত্তারী রাজা সাজিয়া নিজের দুর্দশার কথা বিস্মৃত হয়, সেইরূপ বর্তমান দেহস্থ জীব পূর্বদেহের স্মরণ করে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত রহিয়াছে,—

যথাজ্ঞস্তমসা যুক্তঃ উপাস্তে ব্যক্তমেব হি ।

ন বেদ পূৰ্ব্বমপরং নষ্টজন্মস্মৃতিস্তথা ॥ ( ভাঃ ৬।১।৪২ )

“যেমন নিদ্রাভিত্ত ব্যক্তি স্বপ্নদৃষ্ট দেহের ভঙ্গনা করে অর্থাৎ তাহাতেই আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে, তদ্রূপ নষ্টজন্মস্মৃতি অবিতোপাধিগ্রস্ত জীবও পূর্ব-কৰ্ম্মাভিব্যক্ত বর্তমান দেহাদিকে ভঙ্গনা করিয়া থাকে, পূর্বাপর কিছুই জানিতে পারে না।” বাসনাময় লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহাশ্রয়ী-জীবের পূর্বদেহ সঞ্চরজনিত অহুভূতিদ্বারাই বুঝা যায় যে, স্থূলদেহ নাশেও সূক্ষ্মদেহের নাশ হয় না। বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, বিষয় (পঞ্চতন্মাত্র) ও গুণসকলের পরিণাম লিঙ্গদেহ, যে পর্য্যন্ত বর্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত জীবের ‘আমি’ ও ‘আমার’ ভাবরূপ স্থূলদেহ-সঞ্চর দূর হয় না।

### শ্রীহরি-গুরুর উপাসনাই লিঙ্গদেহনাশের সাধন

সোপাধিক জীব লিঙ্গদেহকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে ভোক্তাভিমাণে বাহে ইন্দ্রিয়ভোগ্য রূপ-রসাদি বিষয়সমূহকে ভোগার্থে গ্রহণ করে এবং অন্তরে ভোগোপস্থিত-স্ব-তৃপ্তি, শোক-মোহাদি অহুভব করে। কিন্তু লিঙ্গদেহ না থাকিলে তাহা করে না অর্থাৎ ব্যবধানরহিত হইলে জীবের স্ব-স্বরূপাহুভূতি, পরে পরেশাহুভূতি হইয়া থাকে। ইহলোকে জল-দর্পণাদি “নিমিত্ত” বর্তমান থাকিলে, বিষ ও প্রতিবিম্বের মধ্যে ভেদ সর্বত্র লক্ষিত হয়, কিন্তু জলাদির অভাবে তাহা হয় না; তদ্রূপ উপাধিরূপ লিঙ্গদেহ থাকিলে তাহাতে জীব ও পরমাত্মার মধ্যে ছদ্ম বৈষম্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু তদভাবে তাহা হয় না। ভগবৎ অনাশ্রিত কোন ব্যক্তিই লিঙ্গদেহকে নাশ করিতে সক্ষম হয় না। এই প্রসঙ্গে ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহদেবের স্তবে “মায়া মনঃ সৃজতি কৰ্ম্মময়ং বলীয়ঃ” শ্লোকে ( ভাঃ ৭।২৯।২১ ) বলিয়াছেন,—“হে অজ, স্বদীয় অংশভূত পুরুষকর্তৃক অহুমিত কালপ্রেরিতা প্রকৃতি অনন্ত বাসনাময় বৈদিক কৰ্ম্মবহুল দুর্জয় লিঙ্গদেহের সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনার অনধীন কোন ব্যক্তি সেই মায়া-নির্মিত বোভাষ বিকার-বিশিষ্ট সংসারচক্রের হেতুকে অতিক্রম করিতে পারে ?”

এই লিঙ্গশরীর ও চিত্তজাত গুণসমূহ হইতে বিমুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের অন্তরে ও বাহে বিষয়ভোগ অনিবার্য্য—ইহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ভগবৎপ্রাপ্ত জীবের পুনরায় সংসার হয় না, ইহা ভাগবতে ( ৬।৫।১১ ) স্পষ্ট বলা হইয়াছে। ভগবৎপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গভঙ্গ হয়। ভাগবতে ( ১।১।২৫।৩৫ ) হইতে স্পষ্টভাবে জানিতে পারি এবং বুঝিতে পারি যে, ভগবন্তজনেই লিঙ্গভঙ্গ



হয়। লিঙ্গদেহ অনাদি হইলেও উহা যে ভগবদ্বিশ্বিতি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে ; তাহাও সহজে অনুমেয়। শেতাখতর ( ১।১১ ) “জ্ঞাহা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ” শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—“পরমেশ্বরতত্ত্ব অবগত হইলে স্থূলদেহ-পাশ এবং লিঙ্গদেহ বা দৈহিক মমতা-পাশ ছিন্ন হয়। পাশজগৎ ক্লেশ খর্ব হইলে জন্ম-মৃত্যুরূপ পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে না।

পুরুষের স্বপ্রযত্ন ব্যতিরেকেও জঠরাগ্নি যেরূপ তাহার অজ্ঞাতসারেই ভুক্ত অন্নাদি অনায়াসে জীর্ণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভগবন্তক্তিও বাসনাময় লিঙ্গদেহকে অনায়াসে ক্ষয় বা জারিত করে, অত্ৰ কোন উপায়ে তাহা হয় না। বৈষ্ণব ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

( হে হরিনাম ) তব স্বপ্ন স্ফুর্তি পায়, উগ্রতাপ দূরে যায়,

লিঙ্গভঙ্গ হয় অনায়াসে ।

পৃথু মহারাজ পূর্বে লিঙ্গশরীরভিমানী জীব ছিলেন, পরে তিনি ভক্তির প্রভাবে ভগবৎপার্বদদেহ লাভ করিয়া লিঙ্গশরীরকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যখন পরব্রহ্মে নৈষ্ঠিকী রতি জন্মে, তৎকালে গুরুপাদপদ্ম-সেবা-পরায়ণ ব্যক্তি ভক্তির প্রভাবে, প্রজ্জলিত অগ্নি যেমন নিজ উৎপত্তি স্থান অরণি ( কাষ্ঠকে ) দগ্ধ করে ; তদ্রূপ দুর্বল অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ-রূপ পঞ্চ ক্লেশাত্মক জীবস্বরূপাবরণ-লিঙ্গদেহকে দহন করিয়া থাকেন। ভক্তপ্রবর ভরত রাজা রহুগণকে বলিয়াছেন,—

গুরোহঁরেশচরণোপাসনাস্তো জহি ব্যলীকং স্বয়মাত্মমোষম্ ॥

( ভাঃ ৫।১১।১৭ )

“হে রাজন! হরি-গুরুচরণোপাসনারূপ অস্ত্রদ্বারা সতর্কতার সহিত কপটাচরণে জীবস্বরূপ আচ্ছাদনকারী সূক্ষ্মদেহকে আপনি স্বয়ং বিনাশ করুন।” শ্রীভাগবতের (১।১।২২ ২৪) “এবং গুরুপাদনৈয়ৈকভক্ত্যা বিজ্ঞাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ” শ্লোকানুসারে যে কোন শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই সদগুরু উপাসনারূপ ঐকান্তিক ভক্তিদ্বারা ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গশরীর ছেদন করিয়া ভগবৎপাদপদ্মরূপ সম্পত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—ত্রিদিগ্ধিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

## বৈষ্ণবতা কোথায় ?

‘বৈষ্ণব ধর্ম’ সম্বন্ধে বর্তমান যুগের অধিকাংশ শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বিষয়ভোগী, স্বার্থাশ্রয়ী অপসম্প্রদায়ের লোকেরা নানাপ্রকার কুৎসা রটনা করিয়া নিজদিগকে নরক গমনের পথ স্বগম করিয়া তুলিতেছেন। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম কি, বৈষ্ণব কে এবং বৈষ্ণবতাই বা কাহাকে বলে—এ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবহিত হইতে হইলে বৈষ্ণবের দ্বারস্থ অর্থাৎ শরণাগত হইতে হইবে। গীতা শাস্ত্র বলেন,—

তদ্বিক্খি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ । ( ৪।৩৪ )

অর্থাৎ তুমি তত্ত্বদর্শী গুরুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত, সঙ্গত প্রশ্ন ও অকৃত্রিম সেবা করত সন্তুষ্ট করিয়া পূর্বোক্ত সেই জ্ঞানের কথা জানিতে পারিবে। শাস্ত্রজ্ঞানে সুনিপুণ ও পরব্রহ্ম-বিষয়ে দাক্ষ্যং অহুভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিবেন।

শাস্ত্রানভিজ্ঞ জনগণ ধর্মশাস্ত্রের কোন ধার ধারেন না ; শাস্ত্র কাহাকে বলে, তাহা না জানিয়াই শাস্ত্রের সমালোচনায় মূখর। বর্তমানে রাজনৈতিক নেতৃবর্গও ধর্ম সম্বন্ধে নানাপ্রকার সমালোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়া নিজদিগকে বহুমান করেন। আমরা মহাজন-গীতিতে পাই,—

“গহিত আচারে, রহিলাম মজি, না করিহু সাধুসঙ্গ ।

লয়ে সাধুবেশ, আনে উপদেশি, এ বড় মায়ার রঙ্গ ॥”

পাঠকগণ নিশ্চয়ই এই রঙ্গ অহঃরহ স্বচক্ষে দর্শন করিবার ও শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য অজ্ঞান করিয়াছেন বা করিয়া থাকিবেন। মহাজন-গীতিতে আমরা আরও জানিতে পারি,—

কেশব ! তুমি জগত বিচিত্র ।

করম বিপাকে, ভববন ভ্রমই,

পেখলু রঙ্গ বহু চিত্র ॥

\* \* \* \*

তব, কোই নিজ-মতে, ভুক্তি-মুক্তি ঘাচত,

পাতই নানাবিধ ফাঁদ ।

মো-সবু-বঞ্চক, তুমি ভক্তি-বহিষ্মুখ,

ঘটাণ্ডয়ে বিষম পরমাদ ॥

একটা বিষয়ে বহিষ্মুখ জীব গভীরভাবে চিন্তা করেন না যে, প্রতিটি

শিক্ষানবীশ কেন্দ্রে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হইলে তৎ তৎ শিক্ষাক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অধীনতা স্বীকার করিয়াই শিক্ষাকেন্দ্রের বিষয়বস্তু অবগত হইতে হইবে। যেমন পুলিশ বিভাগে আমাকে প্রবেশ করিতে হইলে, কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত পথেই আমাকে চলিতে হইবে। তদ্রূপ, আমি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলে, আমাকে তৎক্ষণাৎ একজন ডাক্তারের সন্ধান করিতে হইবে; কারণ ডাক্তারবাবুই আমাকে সুস্থ করবার ক্ষমতা রাখেন। গৃহে চুরি, রাহাজানি, ডাকাতি হইলে, সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী পুলিশের দ্বারস্থ হই। আবার কাহারও বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতা দেখা দিলে, কোর্টের শরণাপন্ন হইতে হইবে অর্থাৎ উকিল-মোক্তারের নিকট যাইতে হইবে। তদ্রূপ ভগবত্ত্ব বা তদীয় বস্তুর সন্ধান করিতে হইলে ভগবদ্ভক্তের শরণাপন্ন হইতে হইবে। ঈশ্বর বা ভগবত্ত্ব-সম্বন্ধীয় কথা আসিলেই সাধারণ সমাজ সর্বদাই উদাসীন থাকেন। বহিষ্কৃত জীবের ইহাই স্বভাব।

সর্ব কক্ষক্ষেত্রেই তদ্ তদ্ উপযুক্ত শিক্ষক বা কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হইতে হইবে, ইহাই প্রচলিত নিয়ম এবং ক্ষেত্রবিশেষে সাধারণ সমাজ তাহাই করিয়া থাকেন কার্যসিদ্ধির জন্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের তত্ত্ব জানিবার জন্ত ভগবদ্ভক্তের সান্নিধ্যে পৌঁছাইবার অনীহা বহুল পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা বর্তমান সমাজের বড়ই দুর্ভাগ্য।

বিষ্ণু-নারায়ণ তথা কৃষ্ণ ভগবানের বিষয়ে সাধারণ বদ্ধজীবের ধারণা—গৃহে নিজের মনোবর্ধন শাস্ত্রগ্রন্থ আমদানি করিয়া, কিছু দেবদেবীর বা তথাকথিত মহাপুরুষের আলেখ্য সংগ্রহ করিয়া আলমারীতে সুসজ্জিতভাবে সাজাইয়া ফুল, নৈবেদ্য, গঙ্গাজল দিয়া পূজা করিলে ও সুযোগমত দু'একখানা গ্রন্থের উপর চোখ বুলাইলেই ভগবানের সেবা হইবে। এজন্য সাধু বা বৈষ্ণবের শরণাপন্ন হইবার কোন প্রয়োজন নাই ইত্যাদি। ভগবান্ সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলিলে রুঢ়-ভাবেই বলিয়া উঠেন—ভগবান্ টগবান্ আবার কি? মাহুষই ভগবান্। মাহুষের সেবা করিলেই ভগবানের সেবা হয়। ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িবার কোন প্রয়োজন হয় না ইত্যাদি বহুবিধ বাগাড়ম্বর বাক্যসমূহ বহুক্ষেত্রে শুনিতে হয়। এইরূপ চিন্তাম্রোতে ধাহারা ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদিগকে বুদ্ধিমান্ বা পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কখনই আদর করিবেন না। তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ ও আজকাল এই মতবাদকেই পোষণ করিয়া থাকেন। গণগড্ডালিকা প্রবাহের ত্যগ শুধু চলিতেছেন। ভাল-মন্দ বিচারের জন্ত কোন কুজ্ঞানধন করিতে চান না।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ ।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণস্তে কার্য্যাকার্য্যাবস্থিতৌ ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তুমিহাহঁসি ॥ ( গীতা ১৬।২৩-২৪ )

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে বর্ত্তমান, সে ব্যক্তি কখনও সিদ্ধি বা সুখ বা পরমাগতি কোনটাই লাভ করিতে পারে না। অতএব, কৰ্ত্তব্য ও একৰ্ত্তব্য কৰ্ম্মের নির্ণয়-বিষয়ে শাস্ত্রাব্যাহই তোমার পক্ষে একমাত্র প্রমাণ। এই কৰ্ম্মভূমিতে শাস্ত্রবিহিত অর্থাৎ ভগবৎ সুখতাৎপর্য্যাপর কৰ্ম্ম বুঝিয়া তাহা করিতে যোগ্য হও।

শাস্ত্র কাহাকে বলে ? এর উত্তর আমরা স্কন্দপুরাণে পাই,—

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ষ্যাক্ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্ ।

মূলরামায়ণকৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥

যচ্চানুকূলমেতন্ম তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ।

অতোহগ্রগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবন্ম তৎ ॥

অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ষ—এই চারিবেদ এবং মহাভারত, মূল-রামায়ণ ও পঞ্চরাত্র এই সকল শাস্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদের অনুকূল যে-সকল গ্রন্থ, তাহাও শাস্ত্রमध्ये পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত যে-সকল গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্র ত' নহেই, বরং তাহাকে 'কুবন্ম' বলা যায়।

নিঃসংশয়েষু সর্কেষু নিত্যং বদতি বৈ হরিঃ ।

স সংশয়াক্তেহু বলান্ধ্যবসতি মাধবঃ ॥ ( মহাভারত )

যে-সকল শাস্ত্র সংশয়রহিত, সেই সকল শাস্ত্রে হরি নিত্য বাস করিতেছেন ; আর যে-সকল শাস্ত্র সংশয়যুক্ত, হেতু-বলপ্রধান অর্থাৎ তর্ক প্রধান, সে-সকল শাস্ত্রে মাধব অধিবাস করেন না।

অতএব, ভগবান্ ও তাঁহার নিজজনকে জানিতে হইলে শ্রীভগবানের রূপাপাত্র গুরু-বৈষ্ণবের শরণাগত হইতে হইবে। “ঈশ্বর-রূপালেশ হয়ত' যাহারে। সেইত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥” ( চৈঃ চঃ মধ্য ৬।৮৩ )। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের আত্মগতাই বৈষ্ণব ধর্ম্ম। শরণাগতি ছাড়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের অগ্র কোন গাত নাই। আত্মগতাহীন জীবের পদে পদে বিপন্ন হইতে হয়। আত্মগত্যা ছাড়িলে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা বহু দূরে। “ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা।” বৈষ্ণবধর্ম্ম শরণাগত ও আত্মগত্যের ধর্ম্ম। ইহা গৃহস্থ ও ত্যাগী সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। ( ক্রমশঃ )

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

# শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

( পূর্ববৃত্তান্তক্রমে )

“দামোদরেশ্বর অপর হেতু এই যে—একমাত্র ভক্তিদ্বারাই ‘বন্ধ’ বশীকৃত ।”  
ভগবান্ দামোদর একমাত্র ভক্তির দ্বারাই বশীভূত, অগ্নিকিছুর দ্বারা নয় ।  
আমরা যে যাই মনে করি না কেন—তাকে কিছু অর্থ দেব, তাকে কিছু  
দ্রব্য দেব, তাকে কিছু সাজপোষাক দেব, তাতে তিনি খুশী হন না । ভগবানকে  
মিজ্জাসা করা হোক, তিনি বলবেন ওর দ্বারা আমি খুশী হই না ।  
ভক্তরা কিন্তু বিভিন্ন রকমের জিনিষ দিয়ে, উপায়ন দিয়ে ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে  
চাইছেন ।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্লামি প্রযতাত্মনঃ ॥

পত্র, পুষ্প, ফল, জল যে আমাকে ভক্তিপূর্বক দেয়, আমি সেই দ্রব্য  
সানন্দে গ্রহণ করি । ‘অশ্লামি’-শব্দ আছে এখানে । অগ্নি কোনরকম মানে  
করা চলবে না । খান তিনি ? বললেন, হ্যাঁ । যদি কেউ পত্র দেন খান  
তিনি । পত্র মানে গাছপালা খান তিনি ? না, গাছপালা নয়, পত্র মানে  
তুলসীপত্র ।

ছাপ্পান্ন ভোগ আর ছত্রিশ ব্যঞ্জন ।

বিনা তুলসী প্রভু একো নাহি মানি ॥

সেই পত্র তুলসী পত্র । তুলসী পত্র নৈবেদ্যের পরে দিলে ধরে নেওয়া  
হবে নিশ্চয়ই ঠাকুর খেয়েছেন, এমন ব্যাপার । ‘পুষ্পম্’—পুষ্প দিলে ভগবান্ খেয়ে  
ফেলেন । পুষ্প খাওয়া যায় ?—হ্যাঁ, পুষ্প খাওয়াও যায় । গাঁদাফুল, বকফুল  
বড়া করে খাওয়া যায় । এই কাষ্টিকমাসে বকফুল ভগবানের ভীষণ প্রিয় ।  
বকপুষ্পের মালা যদি কেউ ভগবানকে দেন প্রতিদিন, তাহলে ভগবান্ অত্যন্ত  
সন্তুষ্ট হন । এক ভক্ত বকফুলের মালা গাঁথে রেখেছেন, ভগবান্ এলে গলায়  
দেবেন । কিন্তু ভাবছেন ভগবান্ এখনও আসেন নাই যখন হয়ত’ আজ নাও  
আসতে পারেন । তখন সেই ভক্ত বলসেন,—‘আসেন কৃষ্ণ গলায় দেব ;  
না আসেন ত’ ভেজে খাব ।’ মালা গাঁথে রেখেছি, যদি আসেন ভগবান্  
তাহলে তাঁর গলায় পরাব, আর যদি না আসেন, তাহলে বড়া করে, ফুলুরি  
করে ঠাকুরের ভোগ দেব । ওটা ফেলা যাবে না । তাহলে পুষ্পও খাওয়া  
যায় দেখা যাচ্ছে । ‘ফলম্’—ফল ত’ সবসময় খাওয়াই যায় । ‘তোয়ম্’—

—জল নিশ্চয়ই পান করা যায়। ব্যাপারটা কি? কোন কোন নাস্তিক বলছেন, ‘ধর ছাগল পাতা খা, পাতা খেয়ে স্বর্গে যা।’ আমি যদি ছাগলটাকে ভগবান্ মনে করি, তা তিনি আমার ভগবান্—বলছেন কেউ কেউ। আমি যা মনে করব ভগবানকে, তিনি তা নন। তিনি যা সেইভাবে যদি আমি চিন্তা করি তবে আমার কল্যাণ। ভগবান্ সচ্চিদানন্দ বস্তু, ভগবান্ আশ্রিতজন-পালক, ভগবান্ বাঞ্ছাকল্পতরু। আমি মনে করলে হবে?—না, আমি মনে করলে ওটা হবে না, ভগবান্ যা তাঁকে সেইভাবে দেখতে হবে—বর্ণনাটা এইভাবে আছে। সেই কথা এখানে বলছেন। আমার চিন্তাহুসারে ভগবান্ নন; ভগবানের চিন্তা-ভাবনা অহুসারে, ঋষিগণের চিন্তা-ভাবনা অহুসারে, একান্ত ভক্তগণের চিন্তা-ভাবনা অহুসারে যা সেই দৃষ্টিতে আমাকে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে, দেখতে হবে। এর নাম হল ভক্তি। আমার ইচ্ছামত নয়। সব জায়গায় আত্মগত্য আছে। আত্মগত্যবিহীন হলে চলবে না।

‘অমানী মানদ হইলে কীর্তনে অধিকার দিও তুমি।’ এই কথা যদি হয় তাহলে অমানী মানদ ধর্ম্মে আগে আমি দীক্ষিত হই, তবে কীর্তনে অধিকার আসবে আমার। কথাটা সত্য। কীর্তন করবেন কে? জগদগুরু শ্রীশ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের একটা প্রবন্ধ আছে। সেই প্রবন্ধটার নাম হল—কীর্তনের অধিকারী কে? আমাদের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তার ভিতরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এইসব কথাগুলো এসে গেছে—

দৈন্ত, দয়া, অন্তো মান, প্রীতিষ্ঠা বর্জন।

চারিগুণে গুণী হই’, করহ কীর্তন ॥

এরকম বহু কথা আছে। সেখানে কীর্তনের অধিকার আসছে। ধরুন, কোন সভাস্থলে কীর্তন আরম্ভ হচ্ছে, এখন সেখানে প্রধান ব্যক্তি আছেন যিনি, তিনি যতক্ষণ না বলবেন ততক্ষণ কীর্তন আরম্ভ হবে না। যখন তিনি বলবেন এই কীর্তন প্রথমে আরম্ভ হোক, আপনি ধরুন বলে নির্দেশ দিচ্ছেন, তখন কীর্তন ধরতে হবে। নিজের ইচ্ছায় আমি কীর্তন ধরলাম, গেয়ে গেলাম, তা হবে না। সেখানে কীর্তনমণ্ডলীরও একটা মর্যাদা আছে, আইন আছে, Discipline আছে। সব জায়গায় একই ব্যাপার। আত্মগত্য ছাড়া কোথায় কোনটা চলে? যেখানেই আত্মগত্যবিহীন অবস্থা সেখানেই বুঝতে হবে যেকী, ফাঁকি। আত্মগত্য যেখানে আছে সেখানে বৈষ্ণবতা আছে, ভক্তত্ব আছে, সাধন-ভজন সব ঠিক আছে। আত্মগত্য ছাড়া চলবে না। আত্মগত্য ত’ করতে শিখিনি, কি করব! ‘স্বভাব যায় না মলে, কয়লার ময়লা যায় না ধুলে।’



আমি কি করব? আমাকে প্রথমে শিখতে হবে বৈষ্ণবাহুগত্য, গুরুাহুগত্য। তবে ত' আমি এগোব। আমার নিজের ইচ্ছানুসারে আমি যা কিছু করি সব কর্ম হয়ে যায়। গুরু-বৈষ্ণবের আহুগত্যে যা কিছু করব সেটা হবে ভক্তি। এসব বুঝতে এত কষ্ট কেন?

সব জায়গায় আহুগত্য চাই। আমি এসে আগে কীর্তনটা ধরে ফেললাম, তা কেন হবে? বৈষ্ণবগণ আহুন, বলুন। যাকে প্রথমে কীর্তন করতে বলবেন তিনি করবেন। তারপর যে জাতীয় কীর্তন হওয়া দরকার মণ্ডলীতে সেই কীর্তন হওয়া দরকার। 'ধান ভানতে শিবের গীত' গাইলে ত' হবে না। যে জাতীয় সভা সেই সভার উপযোগী কীর্তন হওয়া দরকার এবং সেখানেও আহুগত্য থাকবে। বক্তৃতা হচ্ছে, সভায় সুধীমণ্ডলী বসে আছেন। চট করে কেউ যদি বলতে ওঠেন আগে তা হবে না। সেখানেও কিছু Discipline আছে। আপনি বলুন, আপনি বলুন, আগে বলতে হবে। যে যার ইচ্ছামত কিছু বলেন না। একে বলে শিষ্টাচার। এই শিষ্টাচার সব জায়গায় আমাদের বজায় রাখতে হবে। তা না হলে আমাদের কল্যাণ নাই, অকল্যাণ, অহামিকা এসে যাবে, দাস্তিকতা এসে যাবে। যখনই দাস্তিকতা এসে গেল তখনই সব শেষ।

একমাত্র ভক্তির দ্বারাই সে দামোদর বশীভূত। 'বদ্ধম্' অর্থে তাহাই প্রতিপাত। বদ্ধ-শব্দটা খারাপ; কিন্তু এখানে বদ্ধ-শব্দটা মুক্তির কারণ। এখানে শব্দটা ভালভাবে ব্যবহার হল। 'বদ্ধম্'—'বশীভূতম্'। কিসে বশীভূত?—ভক্তির দ্বারা বশীভূত। তাহলে জাগতিক কোন বস্তুর দ্বারা ভগবানকে বশীভূত করা যায় না—এটাই প্রমাণ হল।

অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করে সব ঠাকুরের কাছে সাজিয়ে দিলাম। আমি বললে ঠাকুর খাবে? আমার ক্ষমতা আছে ঠাকুরকে খাওয়ানো?—ক্ষমতা নেই। তবে সেই ক্ষমতাও প্রার্থনা করতে হয়। সেজন্ত অর্চনমার্গে এমন বিচার রয়েছে যে, আমার গুরুদেব এসেছেন, তিনি পূজা-অর্চন করছেন, তিনি ঠাকুরকে খাওয়াচ্ছেন। আবার আমি যা দিচ্ছি তা তাঁরই আদেশানুসারে, অনুজ্ঞানুসারে আমি দিচ্ছি। আমার কোন বাহানুরি নেই। ঠাকুর তুমি খাও বললেই খাবেন তিনি? যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই দ্রব্যের উপরে অমৃতদৃষ্টি পড়ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা ঠাকুরের গ্রহণযোগ্য নয়—একথা বলা আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে তাঁরই অধিকার বেশী। ঠাকুর তিনি খাবেন কি না খাবেন Discretionটা ঠাকুরের, শ্রীমুক্তির, শ্রীবিগ্রহের। আমি দিচ্ছি, সুতরাং তিনি খেয়ে নেবেন, তা নয়। (ক্রমশঃ)

## শ্রীপত্রিকার নববর্ষ

পাণ্ডুগজ ষাঁহার সিংহপ্রতাপে প্রকম্পিত হয়, মর্ত্যবাসী মানবমেধায় ষাঁহার চরিত্র হুরধিগম্য, অস্ত্রের নিকট উগ্রবিক্রম হইলেও কেশরীর ঞায় যিনি স্বীয় আশ্রিতজনের প্রতি শান্ত-কোমল-অনুগ্রহ, ত্রিতাপদঙ্ক জীবকুলের কৃষ্ণসেবা-বিমুখতায় যিনি সতত দুঃখী, স্বভজন-বিশজন-প্রয়োজনবিগ্রহ গোড়ীয়নাথ শ্রীগৌরচন্দ্রের আশ্রয়-বিগ্রহরূপে যিনি শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রেম-প্রদাতা, শ্রীরাধাপ্রেষ্ঠা শ্রীরূপানুগত্যে বিনোদ-মঞ্জরীরূপে যিনি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণকারী, ভক্তিবিনোদ-ভাগীরথীধারার সংরক্ষক পরমহংস-কুলতিলক শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ জন, শ্রীগোড়ীয়-বেদান্তে ধুরন্ধর যিনি মায়াবাদ-কুহক-কুঠারস্বরূপ, বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির সংস্থাপক ও সঙ্গীদন—সেই নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণসরোজে তাঁহার শুভ আবির্ভাব-শতবার্ষিকী উপলক্ষে অনন্তশত প্রণতি। শুভ গোড়ীয়-বর্ষারম্ভেই শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকা তাঁহার প্রতিষ্ঠাতৃ-মহারাজের অনন্ত শুভশ্রুণগানে শতমুখ। “ভক্ত-মহিমা বাড়াইতে, ভক্তে স্মৃতি দিতে। মহাপ্রভু বিনা অণু নাহি ত্রিজগতে॥” শ্রীমহাপ্রভুর পুতপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই এ-যাবৎকাল শ্রীপত্রিকা ভক্তমহিমা-কীর্তন এবং ভক্তস্মৃতি-বিধানকেই একমাত্র উপজীব্য করিয়াছেন। তথাপি যে বিশেষ শ্রীগৌরান্দ শততম শ্রীকেশবান্দরূপে কেশবীয়-গণের নিকট বহুমানিত তাঁহার বৈশিষ্ট্যই স্বাভাবিক। তজ্জন্ম সেই বৈশিষ্ট্য বিকাশমুখে শ্রীপত্রিকার প্রচ্ছদপট তাঁহার পবিত্র আলেখ্যকে বক্ষে ধারণ করিয়া পরম বিভূষিত হইয়াছে। শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকার ৪৮শ বৎসরান্তে কেশবপ্রতিগণ গৌর-বিরহের স্মৃতি লাভ করিয়া যাংতে নিশ্চেষ্ট না হইয়া পড়েন, তজ্জন্মও শ্রীল কেশব গোস্বামী প্রভু প্রচ্ছদপটে পুনঃ প্রকটিত হইয়া উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। তাঁহার অমিত তেজচ্ছটায় সমগ্র কুজবাটিকা বিদূরিত হইয়া গোলোকমুখী যে আলোকময় পথ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা অনুসরণ করিয়াই মহামহাবদান্ত শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকা গৌরবাণীর পসরা লইয়া গোড়ীয়ের ঘরে ঘরে নিত্যকাল আবির্ভূত হউন।

ভগবান্ ও তদীয় পার্শ্বদগণের আবির্ভাব এবং তিরোভাব—উভয়ই নিত্য। “এ সব লীলার কতু নাহি পরিচ্ছেদ। ‘আবির্ভাব’, ‘তিরোভাব’ মাত্র কহে বেদ।” তাঁহাদের আবির্ভাবে যেরূপ যুগ নিমেষরূপে পরিণত হয়, তজ্জন্ম

তিরোভাবেও নিমেষ যুগরূপে প্রতিভাত হয়। সেইরূপ অনুভবকারিগণের হৃদয়ে প্রাকৃত কালের গণনা কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। পুনরায়, তাঁহাদের অনুভববেগে নিত্যত্বের বিচারও প্রাকৃত ধ্যান-ধারণার অনেক উদ্বেদ। তথাপি জড়জগতের সময়ের মাপকাঠিতে নির্ণীত ‘আবির্ভাব-শতবার্ষিকী’ শতবর্ষ-পূর্বের কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে লক্ষ্য করে না। পরন্তু শতবর্ষব্যাপী এবং অনাগত অনন্তশতকাল যাবৎ তাঁহার আবির্ভাবের ভাব উহাতে অন্তর্নিহিত। জগদগুরু শ্রীল কেশব গোস্বামী প্রভু কালাতীত হইয়াও কালপ্রবাহে ভাসমান জীবের নিত্য কল্যাণ-বিধানার্থেই পত্রীরূপে নিত্য কালাবস্থিত হইয়াছেন। শুদ্ধ-গোড়ীয়গণ উহারই ছোতনা শ্রীপত্রিকার প্রাতি ছত্রে ছত্রে লাভ করিয়া অপর আনন্দে ভাপ্রুত থাকিবেন।

ত্রিগোড়ীয়-পত্রিকা একমাত্র পরাবিত্যারই বাহক। অপরা-বিচার আলোচনা এস্থলে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইয়াছে। কারণ “জড়বিজ্ঞা যত, মায়াব বৈভব, তোমার ভজনে বাধা। মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা।” বর্তমান অগোড়ীয় গোষ্ঠীতে যে শিক্ষার প্রচলন, তাহা হইতে উদ্গত বিষবাস্প সমগ্র সমাজ-জীবনকেই হৃদ্বিবহ করিয়া তুলিতেছে। এইরূপ শিক্ষা প্রকৃত অর্থে অপশিক্ষারই নামান্তর। সেই অপশিক্ষা-চর্চার কেন্দ্র স্থানে-স্থানে ব্যাঘের ছাতার ছায় গজাইয়া উঠিলেও সমষ্টি-সমাজ এক মর্মান্তিক অবক্ষয়ের আর্তনাদে ভরপুর। ক্রমবর্দ্ধমান ঈর্ষা, হিংসা, হত্যা, লুণ্ঠরাজ, বিভেদ, বৈষম্যের জগতে মানুষ ক্রমশঃ দিশাহারা হইয়া পড়িতেছে। অপস্বার্থপরতা, অপরিণামদর্শিতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, ও দুর্নৈতিকতা বর্তমানে উচ্চাচ সমগ্র সমাজ-কাঠামোর নীতিরূপে নির্দারিত হইয়াছে। রক্ষক আজ ভক্ষকের ভূমিকায় অবস্থিত। এই সকলই অপরা বিচার যথাযথ কুফল।

অপরা বিচার অর্থাৎ অপশিক্ষাদমূহের মধ্যে বর্তমানে যাহা প্রধান ভূমিকায়, তাহা হইল জড়বিজ্ঞান। ইহাতে মদমত্ত হইয়া জড়বৈজ্ঞানিকগণ আত্মরিক প্রবৃত্তির বিক্ষোভে ঘটাইতেছেন। ‘আদার ব্যাপারী’ জাহাজের খবরে আগ্রহী হইয়া পড়িলে যেরূপ বিপত্তির উদয় হয়, তাহাদের পরাবিত্যা সম্বন্ধে অনধিকার চর্চায় তদপেক্ষাও অধিক অহুবিধা সৃষ্টি হয়। ইহাদের জন্ম দুঃখ প্রকাশ করিয়া চিদ্বৈজ্ঞানিক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—“হে ভ্রাত! তোমরা আপনাপন কার্য কর। তাহাতে তোমাদের এবং জগতের উভয়ের মঙ্গল হইবে।

তোমরা অনধিকার-চর্চাপূর্বক আত্মতত্ত্বের দোষগুণ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিও না। তোমরা ভাল মানুষ হইয়া কার্য্য করিলে আমরা তোমাদিগকে নিরন্তর আশীর্ব্বাদ করিব।” শ্রীমদ্ভগবদগীতায় এই জড়বাদিগণকেই “ভূতেজ্যা” বলিয়া জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা”—এই বাক্যানুসারে মরণান্তে তাহাদের জন্ত জড়ধর্ম্ম-প্রাপ্তিই নির্দ্ধারিত। বস্তুতঃ যে বিজ্ঞান দর্শনে পর্য্যবসিত না হয়, তাহা অপরিপক্ব অথবা বন্ধা। যে দর্শন অথের আবর্ত্ত হইতে উদ্ধৃত হইয়া পরমার্থে তথা আত্মধর্মে প্রযুক্ত না হয়, তাহা মাতৃকুক্ষিতেই কালাতিপাত করে।

নিরীশ্বর নৈতিকতায় তাৎকালিক কিছু ফল লাভ হইলেও পরিণামে তাহ কুফল উৎপাদন করিতে বাধ্য। সেশ্বর নৈতিকতা ভিন্ন অনীতিদ্বারা দুর্নীতি দমন কদাপি সম্ভব নহে। “ইতিহাস-আলোচনে, ভেবে দেখে নিজমনে, কৃত আশ্রয়িক ছুরাশয়। ইন্দ্রিয়-তর্পণ মার, করি কৃত ছুরাচার, শেষে লভে মরণ নিশ্চয়॥ মরণ-সময় তারা, উপায় হইয়া হারা, অতুতাপ অনলে জ্বলিল। কুকুবাди পশুপ্রায়, জীবন কাটায় হায়, পরমার্থ কভু না চিন্তিল॥” আজ সেই ভ্রাতৃহননময় জগতে রাতারাতি শান্তি আনয়ন করিতে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী বিবোধিত হইতেছে জ্ঞাতপাত ও সাম্প্রদায়িকতা পরিবর্জনের উদ্যোগ আহ্বান চতুর্দিকে প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু বিশ্বপিতাকে অস্বীকার করিয়া বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রস্তাব অব্যবহিত চিন্তের এক প্রগল্ভতা। ‘অমৃতস্ত পুত্রাঃ’—শাস্ত্রবাণী হৃদয়ঙ্গম না করিলে স্থূল জ্ঞাতপাতের সমস্যা কেবল মুখের কথায় দূরীভূত হইবার নহে। সমগ্র নীতিশাস্ত্র ঘাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসে বাহিত হয়, সেই ভগবৎ-প্রণীত নীতি আশ্রয় না করিয়া নীতিবান হইবার ছুরাগ্রহ পোষণে দুর্ভাগ্যই উপস্থিত হয়। পরাবিচার প্রতি পরাজুথ হইয়া অপরাবিচারকে দশদিকে প্রসারিত করিলেও দশদশার করাল কবল হইতে নিস্তার নাই।

বিশ্বপিতাকে কেবল রুটি সরবরাহের যন্ত্ররূপে ভাবনামূলে যে স্বীকৃতি, তাহা নিতান্তই হীনমূল্যতা। তাঁহার নিষ্কট আত্মনিবেদন না করিয়া বাণিজ্যিক ভিত্তিতে স্বত্তি-প্রণতিতে আত্মধর্ম্মের বিকাশ ঘটে না। ‘কৃষ্ণ আমায় পালে রাখে, জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্তে ঘুচাও জঙ্ঘাল॥’ নিকপট শরণাগত ব্যক্তিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী, ত্রায়-নীতিপরায়ণ, সর্ব্বভূতে রূপালু ও সর্ব্ব সদগুণসম্পন্ন। ‘বহুধৈবকটুধকম’, ‘বিশ্বভ্রাতৃত্ব’ সমদর্শন—ইত্যাদি বিচারে তিনিই প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বর-সেবার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া বদ্ধ জীব-সেবার (?) প্রতি আগ্রহী হইলে

প্রাণহীন দেহের শুষ্কতাই সার হইয়াছে। “জীবের সম্মান দিবে জানি” কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।  
—এই শ্রীচৈতন্যবাহীকে অবলম্বন করিলেই জগতে পারস্পরিক বিভেদ-বৈষম্য  
বিগত হইবে। পরমাত্মার সম্পর্কেই পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপন হইতে  
পারে, দেহগত বিচারে নহে।

অনন্তগুণগণধাম সর্বমুন্দর শ্রীজগন্নাথদেবকে নিরাকার, নির্বিশেষ, নিঃশক্তিক-  
রূপে ধারণা করিলে স্বভাবতঃই ঈশ্বর-জীবে সেব্য-সেবক সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে  
পারে না। বস্তুতঃ ঈশ্বর সম্পর্কে বর্তমানের নিরাকারাত্মক চিন্তাধারাও জগজ্জাল  
স্থিতির অন্ততম কারণ। যাহাতে মঙ্গলের কোন অস্তিত্ব নাই—তাহা নাস্তিকতা।  
প্রেমময় শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে নিরাকারহৃচক উক্তি নাস্তিকতারই অপর এক বহিঃপ্রকাশ  
—ইহা দ্বারা জগতে প্রেমপ্রীতি স্নেহ-মমতা, সৌহার্দ্য স্থাপনের কোনই সম্ভাবনা  
নাই। সকল মঙ্গলেরও যিনি মঙ্গল, তাঁহাকে আক্ষরিক অর্থেই নির্বিশেষ  
করিয়া রাখিলে, মঙ্গলও তদ্রূপ নির্বিশিষ্ট হইয়া পড়ে। রক্ষক, পালক-ভূমিকায়  
অচিন্ত্যশক্তিমান্ ঈশ্বরের অস্তিত্ব যেরূপে স্বীকার্য, সেব্যের ভূমিকায়ও তিনি  
সেইরূপেই নিত্য বর্তমান—তৎকালে অকস্মাৎ নিঃশক্তিক, নিরাকার হইয়া পড়েন  
না। ইহাতে সংশয়, আলস্য বা জাড্যতা প্রকাশ করিলে আমরণ অমঙ্গলের  
সঙ্গী হইতে হয়।

‘সম্প্রদায়-প্রণালী’ এবং ‘সাম্প্রদায়িকতা’ এক নহে। ‘সাম্প্রদায়িকতা’-শব্দে  
এই জগতের অভিজ্ঞতার হিংসানল, কলহ-বিবাদ ও ভুল বুঝাবুঝির চিত্র মাত্র  
উদ্ভূত হয়; কিন্তু ‘সম্প্রদায়-বিচার’ আদৌ সেইরূপ নহে। ‘সংসম্প্রদায়’ বলিতে  
যাহা মূল সদবস্তু—শ্রীভগবৎপাদপদকে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যে সম্যক্ প্রদানে সমর্থ;  
ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত কোন সংঘ, গোষ্ঠী বা Party নহে।  
ভোগোপকরণ সংগ্রাহের বিচার কিংবা ভোগের ক্লেমময় পরিণামে বিরক্ত হইয়া  
আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির বিচার—উভয়কেই ‘সংসম্প্রদায়’ আত্মধর্ম-বিরোধী জ্ঞানে  
দূর হইতে দণ্ডবৎ-প্রণাম করেন। দেহ ও মনোগত সকল প্রকার উপাধি জীবের  
পক্ষে ব্যাধিস্বরূপ—উহাদিগকে সমস্তে পরিহার করিয়া পরতত্ত্বের প্রতি স্ব-স্ব-ভাবনায়  
জীবের আত্মপ্রকাশ কেবলমাত্র সংসম্প্রদায় অবলম্বনেই সংঘটিত হয়। পরম-  
কারুণিক নিত্যমুক্ত ভগবৎপাদদগণ—শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং চতুঃসন ভগবন্নির্দেশে  
জীবকল্যাণের উদ্দেশ্যে এইসকল গুহ্যতত্ত্ব ব্যক্ত করেন। তাঁহাদের নিকট হইতে  
গুরুপরম্পর-মাধ্যমে শ্রোতপন্থায় সেইসকল গুহ্যতত্ত্বের অবতরণই সম্প্রদায়-  
প্রণালীর রহস্য। ইহাদের মধ্যে পরস্পর বৈশিষ্ট্য মাত্র বিরাজমান, বিরোধিতা

নহে—ইহাই সম্প্রদায়-সৌন্দর্য। পঞ্চোপাসকগণের উপাস্ত ও উপাসনার নিত্যতা নাই—তজ্জন্ত তাঁহাদিগকে সম্প্রদায়ান্তর্গত করিতে চাহিলে বিবর্ত আদিয়া বিবর্ত করিবে। বৃত্ত অবস্থায় তাঁহাদের নিজ নিজ উপাস্ত ও উপাসনার বৈশিষ্ট্য থাকিলেও, মুষ্কার বিচারে তাঁহারা সে-সকল বৈশিষ্ট্যকে নিক্বিশিষ্ট করিয়া নির্ভেদ ব্রহ্মলয়কেই বহুমানন করেন এবং সদ্বস্তুর সম্যক প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হন।

শ্রীমহাপ্রভু ভগবন্তার সীমা হইয়াও শ্রীল ঈশ্বরপুরী গোস্বামীকে শ্রীগুরুরূপে বরণের মাধ্যমে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়কে অঙ্গীকার লীলা-প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রদায়ান্তর্গত হইয়াও কিছু কলিহত জন খোদার উপর খোদগিরি করিয়া ব্রহ্মসম্প্রদায়কে অঙ্গীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। তাঁহারা ‘শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়’-নামে এক পঞ্চম স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের আবাহন করিয়া ‘নূতন কিছু’ সৃষ্টির উদ্ভাদনায় বিভোর। “যে-সকল লোক ‘পরব্যোমেস্বরশাসীচ্ছো ব্রহ্ম জগৎপতিঃ’—ইত্যাদি বাক্যক্রমে প্রদর্শিত ব্রহ্ম-সম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদ্বক্তৃ পাণ্ড-মত প্রচারক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায় স্বীকার করত যাহারা গোপনে গুরুপরম্পরা-সঙ্ক-প্রণালী স্বীকার করেন না, তাহারা কলির গুণ্ডার, ইহাতে সন্দেহ কি?” শ্রীল কেশব গোস্বামী প্রভুর বৃহৎমুদঙ্গ—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা মুক্তকণ্ঠে শ্রীব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-মাহিমা উদ্ঘোষণা করিয়া থাকেন। আশ্রয়-বাণীকে যথাযথভাবেই সংরক্ষণ করিয়া শ্রীপত্রিকা অশ্রোত বাক্য, সকপোলকল্পনাকে দোদণ্ড-প্রতাপে প্রতিবাদ ও পরিবজ্ঞনে বন্ধপরিষ্কার। শ্রীগৌড়ীয় নববর্ষ তাহারই সরব সাক্ষী হইয়া থাকিবে।

মুদঙ্গ-ধ্বনি স্বেধাগণের নিকট সংকীর্তন-যজ্ঞের দূতস্বরূপ। তজ্জন্ত গৌড়ীয়-স্বারস্বতগণের পরিভাষায় ‘মুদঙ্গ’ কেবল বাণ্যমন্ত্র নহে—‘বৃহৎমুদঙ্গ’ ও ‘জীবন্তমুদঙ্গ’-রূপে সংকীর্তন-ধ্বনির সর্বত্র সম্প্রচারের ‘স্বয়ং’। পরমহংসবর্ষ্য শ্রীমন্তজ্জিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের মনোহীষ্ট প্রপূরণে তাঁহার পরম-অতুল্য জীবন্ত-মুদঙ্গরূপে গৌড়ীয়-বেদান্ত-বার্তা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বিতরণে ব্রতী হইয়াছেন। সেই মুদঙ্গ-নিমিত্তে কৃষ্ণকথাবিধয়ে অট্টোত্তম বিশ্বের অনাদি বধিরতা বিদূরিত হউক—শ্রীরূপ-রঘুনাথের বৈকুণ্ঠোত্তর-বাণী অকুণ্ঠভাবে প্রচারিত হইয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের বিজয়-বৈজয়ন্তী উজ্জয়মান হউন—ইহাই শ্রীগুরু-গৌরান্ধ-রাধা-বিনোদবিহারী-শ্রীলক্ষ্মীবরাহ-নৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্মে সাক্ষু প্রার্থনা।

**FORM—IV**  
**STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND**  
**PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER**  
**SHRI GOUDIYA-PATRIKA**

[ Under Rule 6 of the Registration of Newspapers  
 ( Central ) Rules 1956 ]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math,  
 Tegharipara, P. O. Nabadwip ( Nadia ), W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every  
 Bengali month i. e. once in month.
3. Printer's Name—Tridandi Swami Bhakti Vedanta  
 Acharyya Maharaj.  
 Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.  
 Address—Shri Devananda Goudiya Math,  
 Tegharipara, P. O.—Nabadwip ( Nadia ), W. B.
4. Publisher's Name— Do  
 Nationality— Do  
 Address— Do
5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti  
 Vedanta Narayan Maharaj.  
 Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.  
 Address—Shri Devananda Goudiya Math,  
 Tegharipara, P. O.—Nabadwip ( Nadia ), W. B.
6. Name and address of Tridandi-Swami Shri  
 individuals who won the Shrimad Bhakti Vedanta  
 newspapers and partners Baman Maharaj, President-  
 or share holders holding Acharyya on behalf of Shri  
 more than one percent of Goudiya Vedanta Samiti.  
 the total capital,—

I, *Swami Bhakti Vedanta Acharyya* hereby declare that  
 the particulars given above are true to the best of my know-  
 ledge and belief.

Dated—28. 2. 97

*Sd./Swami B. V. Acharyya*  
*Signature of Publisher..*





সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।

অধোক্ক্ষেজে অহৈতুকী ভক্তি বিয়শ্য ॥

অন্ত ধর্ম স্থলরূপে পালে যেই জন ।

হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪২শ বর্ষ }

২০ বিষ্ণু, বাহুদেব, ৫১১ শ্রীগোরাঙ্গ  
৩০ চৈত্র, রবিবার, ১৪০৩, ইং ১৩/৪/২৭

{ ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগোকুলানন্দ-গোবিন্দ-দেবায়কম্,

[ শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-বিরচিত্তম্ ]

গোটিকন্দর্প-সন্দর্প-বিশ্বসন-

স্বীয়রূপামৃতাপ্লাবিতস্মাতল ।

ভক্তলোকেক্ষণং সক্ষণং তর্ষয়ন্

গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তুভ্যং নমঃ ॥ ১ ॥

হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তুমি ভক্তগণের নয়নানন্দ বিধানপূর্বক কোটি  
কোটি কন্দর্পের দর্প বিনাশন স্বীয় রূপামৃতে ধরাতল আপ্লাবিত করিতেছ;  
তোমাকে নমস্কার ॥ ১ ॥

যস্য সৌরভ্য-সৌলভ্যভাগ্-গোপিকা-

ভাগ্যলেশায় লক্ষ্ম্যাপি তপ্তং তপঃ ।

নিন্দিতেন্দীবরশ্রীক ! তস্মৈ মুহু-

র্গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তুভ্যং নমঃ ॥ ২ ॥

হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তোমার সৌরভ্যসুখভাগিনী গোপীগণের কিঞ্চি-  
মাত্র ভাগ্যলাভের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মীদেবীও তপশ্চারণ করিয়া থাকেন,  
হে নীলকমল-শোভা-তিরস্কারি ! তোমাকে মুহুমুহুঃ নমস্কার ॥ ২ ॥

বংশিকাকণ্ঠয়োর্থ্যঃ স্বরস্তে সচেৎ

তাল-রাগাদিমান্ শ্রুত্যানুভ্রাজিতঃ ।

কা সুধা ? ব্রহ্ম কিং ? কা হু বৈকুণ্ঠমুদ্ ?

গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তুভ্যং নমঃ ॥ ৩ ॥

হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তোমার বংশী বা কণ্ঠের তাল ও রাগাদিযুক্ত  
স্বর যদি কণ্ঠগোচর হয় তাহা হইলে কি অমৃত, কি ব্রহ্মজ্ঞান, কি বৈকুণ্ঠ-সুখ এ  
সকলই শিক্ত ( বিফল ) হইয়া থাকে ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

যৎ পদস্পর্শমাধুর্যমজ্জংকুচা

ধৃত্যতাং যাস্তি গোপ্যো রমাতোহপ্যলম্ ।

যদ্ যশো হৃন্দুভির ঘোষণা সর্ববজিদ্

গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তুভ্যং নমঃ ॥ ৪ ॥

হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! ব্রহ্মঙ্গনাগণ, তোমার শ্রীচরণ-যুগলের মাধুর্য্যে  
স্তন্যার্পণ করিয়া বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী হইতেও পরম কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন,  
এবং তোমার যশঃ হৃন্দুভির ঘোষণা সকলকেও জয় করিয়া থাকে ; তোমাকে  
নমস্কার ॥ ৪ ॥

যস্য ফেলালবাস্বাদনে পাত্রতাং

ব্রহ্মরুদ্রাদয়ো যাস্তি নৈবাহুকে ।

আধরং শীধুমেতেহপি পিবন্তি নো

গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তুভ্যং নমঃ ॥ ৫ ॥

হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবগণ তোমার ভোজনাবশেষের কিঞ্চি-  
মাত্র কণা আশ্বাদনে যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু তদিতর জনসাধারণের  
পক্ষে তাহা দুর্লভ, এবং এই ব্রহ্মাদিদেবগণও অধরসম্বন্ধি মধু পান করিতে পারেন  
না ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

যস্য লীলামৃতং সর্বথাকর্ষকং  
ব্রহ্মসৌখ্যাদপি স্বাত্ম সর্বৈ জগুঃ ।  
তৎপ্রমাণং স্বয়ং ব্যাসমুখ্যঃ গুরু-

গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তুভ্যং নমঃ ॥ ৬ ॥

হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! ভক্তগণ ব্রহ্মসুখ হইতেও তোমার লীলামৃত  
লক্ষণরূপে চিত্তাকর্ষক বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন, স্বয়ং বেদবাসনন্দন শ্রীশুকদেব  
গোস্বামী তাহার প্রমাণস্বরূপ রহিয়াছেন ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৬ ॥

যৎষড়ৈশ্বর্যমপ্যার্য্যভক্তাশুনি

ধ্যাতমুগ্ধচমৎকারমানন্দয়েৎ ।

নাথ ! তস্মৈ রসাস্তোদয়ে কোটিশো-

গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তুভ্যং নমঃ ॥ ৭ ॥

হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তোমার সেই ষড়ৈশ্বর্য সজ্জন-ভক্তগণের দ্বারা  
ধ্যাত হইয়া অতি অপূর্ব আনন্দোৎপাদন করিয়া থাকে । হে প্রভো ! রসসাগর  
স্বরূপে প্রসিদ্ধ সেই তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার ॥ ৭ ॥

গোকুলানন্দ-গোবিন্দ-দেবাষ্টকং

যঃ পঠেন্নিত্যমুৎকৃষ্টিতত্ত্বৎপদোঃ ।

প্রেমসেবাশ্রয়ে সোহচিরান্মাধুরী-

সিন্ধুমজ্জন্মনা বাঞ্ছিতং বিন্দতাম্ ॥ ৮ ॥

যিনি ভবদায় চরণযুগলের প্রেমসেবা প্রাপ্তির নিমিত্ত উৎকৃষ্টিত হইয়া এই  
গোকুলানন্দ-গোবিন্দাষ্টক নিত্য পাঠ করিবেন, তিনি অবিশেষে মাধুর্য্য-সিন্ধুতে  
নিমগ্নাস্তঃকরণ হইয়া স্বীয় বাঞ্ছিত প্রেমসেবাদিলাভ করিবেন ॥ ৮ ॥

“রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সর্ববিষয়েই  
ঋষিনীতি অবলম্বিত হইলেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে । ঋষিনীতি  
অবলম্বন করিতে হইলে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থরাজি আলোচনা  
ও অধ্যয়ন করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে শিক্ষা-বিভাগের গুদাসীত  
পরিহার করা প্রয়োজন ।

—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

# প্রশ্নোত্তর

## শরণাগতি

১। জীবের স্বভাবসিদ্ধ নিত্যধর্ম কি ?

“শরণাপত্তি ও আত্মগতাই জীবের স্বভাবসিদ্ধ নিত্যধর্ম।”

—‘প্রয়াস’, সঃ তোঃ ১০:৩

২। কিরূপে শুদ্ধভক্তিয়োগ সিদ্ধ হয় ?

“গীতার চরম-শ্লোকে যে শরণাগতির উপদেশ আছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থকে ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া কর্মাঙ্গ ও জ্ঞানাঙ্গ ত্যাগ করত আচরণ করিলে শুদ্ধভক্তিয়োগ সিদ্ধ হয়।”

—‘অত্যাহার’, সঃ তোঃ ১০:৩

৩। বিগুহ্ণ ভজনের মূল কি ?

“কেবল শাস্ত্র পড়িয়া বা সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ ভগবৎপ্রসাদ লাভ করিতে সক্ষম হয় না। তাদৃশ জ্ঞান-কর্ম-পরিচাঙ্গ করত ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই বিগুহ্ণ ভজনের মূল ; তাহাতেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম-পুরুষার্থ-লাভ হয়।”

—‘বিশুদ্ধ ভজন’, সঃ তোঃ ১১:৭

৪। শরণাগতিহীন জীবনের কোন সার্থকতা আছে কি ?

“শরণাগতি ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা। সর্বদা শরণাগত হইয়া জীব কৃষ্ণভজন করিবে।”

—‘তত্ত্বকর্মপ্রবর্তন’, সঃ তোঃ ১১:৬

৫। সাধক-জীবনের ভূষণ কি ?

“সাধকের সমস্ত জীবনই শরণাগতিতে মগ্নিত থাকিবে।”

—‘তত্ত্বকর্মপ্রবর্তন’, সঃ তোঃ ১১:৬

৬। প্রতিষ্ঠাশা-ত্যাগের একমাত্র উপায় কি ?

“শ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণব মোরে দিলেন উপাধি।

ভক্তিহীনে উপাধি হইল এবে ব্যাধি ॥

যতন করিয়া সেই ব্যাধি নিবারণে।

শরণ লইলু আমি বৈষ্ণব-চরণে ॥”

—‘শোকশাতন’ ( শ্রোতৃগণের প্রতি নিবেদন )—১২, গীঃ মাঃ

৭। নশ্বর সুখ-দুঃখে অভিভূত হইলে কি গতি হয় ?

“কেবা কার পতি-সুত, অনিত্য-সম্বন্ধ-কৃত,

চাহিলে রাখিতে নারে তারে ।

করম-বিপাক-ফলে, সুত হ’য়ে বসে কোলে,

কর্মজ্ঞয়ে আর রৈতে নারে ॥

ইথে সুখ-দুঃখ মানি, অধোগতি লভে প্রাণী,

কৃষ্ণপদ হৈতে পড়ে দূরে ।

শোক-সম্বরিয়া এবে, নামানন্দে মজ্জ সবে,

ভকতিবিনোদ-বাঞ্ছা পূরে ॥”

—‘শোকশাতন’—২, গীঃ মাঃ

৮। শরণাগত শুদ্ধভক্তের প্রার্থনা কিরূপ ?

“অন্তর-বাহিরে, সম ব্যবহার, অমানী মানদ হ’ব ।

কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ণনে, শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে, সতত মজিয়া র’ব ॥

—কঃ কঃ ‘প্রার্থনা’ ( লালসাময়ী — ৬

৯। বৈকুণ্ঠযাত্রী বৈষ্ণবদিগের কোন ব্যবহারিক দুঃখানুভূতি আছে কি ?

“বৈষ্ণবদিগের সে-সকল ব্যবহার-দুঃখ বাস্তবিক দুঃখ নয় ; কিন্তু, বৈকুণ্ঠযাত্রীর পান্থ-দুঃখের তায় অস্থায়ী এবং সুখবৎ কাটিয়া যায় ।”

—‘বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ’, সঃ তোঃ ১০।২

১০। শরণাগতি কয় প্রকার ও প্রত্যেকটির ত্রিবিধ ভেদ কি কি ?

“শরণাগতি ছয় প্রকার, যথা—(১) আনুকূল্য-সঙ্কল্প, (২) প্রাতিকূল্য-বর্জন, (৩) কৃষ্ণ অবশ্য আমাকে রক্ষা করিবেন,—এই বিশ্বাস, (৪) কৃষ্ণই আমার পালয়িতা—এই বুদ্ধি, (৫) আত্ম-নিষ্কেপ, (৬) কার্পণ্য,—এই ছয় প্রকার শরণাগতিই কায়িক, বাচনিক ও মানস-ভেদে তিন-তিন-প্রকার ।”

—‘শ্রদ্ধা ও শরণাগতি’, সঃ তোঃ ৪।২

১১। শরণাগত ভক্ত কিরূপ আচার-বিচারে প্রতিষ্ঠিত ?

“ভক্তি-অনুকূল যাহা, তাহাই স্বীকার ।

ভক্তি-প্রতিকূল সব করি পরিহার ॥

কৃষ্ণ বই রক্ষাকর্ত্তা আর কেহ নাই ।

কৃষ্ণ সে পালন মোরে করিবেন, ভাই ॥

আমি আমার যত কিছু কৃষ্ণে নিবেদন ।

নিষ্কপট দৈত্রে করি জীবন যাপন ॥”

—ভঃ রঃ তৃতীয় যামদাধন

১২। শরণাগতের কোন্ বিষয়ে দার্ঢ্য ও কোন্ বস্তুতে অনাসক্তি আবশ্যক ?

“ভজনের যাহা, প্রতিকূল তাহা, দৃঢ়ভাবে তেয়াগিব।

ভজিতে ভজিতে, সময় আসিলে, এ দেহ ছাড়িয়া দিব ॥”

—কঃ কঃ ‘প্রার্থনা’ ( লালসাময়ী )—৬

১৩। শরণাগত ভক্ত কি নিজ-পোষণের চিন্তা করেন ?

“নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব, রহিব ভাবের ভরে।

ভকতিবিনোদ, তোমারে পালক, বলিয়া বরণ করে ॥”

—শরণাগতি

১৪। শুদ্ধভক্ত কাহার সম্বন্ধে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া নিজকে ও জগৎকে দর্শন করেন ?

“তুমি জগতের পিতা, তুমি জগতের মাতা,

দয়িত, তনয়, হরি তুমি।

তুমি স্নহমিত্র, গুরু, তুমি গতি কল্পতরু,

ঈদীয় সম্বন্ধমাত্র আমি ॥”

—‘যামুন ভাবাবলী’ ২৬, গীঃ মাঃ

১৫। ভবজলধিতে নিমজ্জমান জীবের আশাবীজ কি ?

“নিমগ্ন হইলু যবে, ডাকিলু কাতর যবে,

কেহ মোরে করহ উদ্ধার।

সেই কালে আইলে তুমি, তোমা জানি’ কূল-ভূমি,

আশাবীজ হইল আমার ॥”

—‘যামুন-ভাবাবলী’ ১০ গীঃ মাঃ

১৬। কৃষ্ণেচ্চার অনুকূলে বা প্রতিকূলে গমন করিলে কিরূপ ফলোদয় হয় ?

“যাহা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ, তাই জান ভাল।

তাজিয়া আপন-ইচ্ছা ঘুচাও জগ্গাল ॥

দেয় কৃষ্ণ, নেয় কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ সবে।

রাখে কৃষ্ণ, মারে কৃষ্ণ, ইচ্ছা করে যবে ॥

কৃষ্ণ-ইচ্ছা-বিপরীত যে করে বাসনা।

তার ইচ্ছা নাহি ফলে, সে পায় যাতনা ॥”

—‘শোকশাতন’ ৩, গীঃ মাঃ

( ক্রমশঃ )

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

## শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

শ্রীমদ্ভাগবতের মত গ্রন্থ জগতে আর নাই ; ইহা একটা গল্পের কথা নহে, মানুষ যদি সত্য সত্য নিরপেক্ষ বিচারক হইয়া ইহার অনুধাবন করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, ভাগবতের মত গ্রন্থ জগতে হয় নাই আর হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে কোনপ্রকার হেয়তা নাই। ইহা সুনির্মল, সুপক, কেবল রস-স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ অখিলরসামৃতসিন্ধু কৃষ্ণ। মুক্তাবস্থায়ও এই ভাগবতরস আশ্বাদ্য। মুক্তকুলই এই শ্রীমদ্ভাগবতের নিত্য আশ্বাদন করিয়া থাকেন। অতন্নিসন বা অনুকূল গ্রহণেই আবদ্ধ থাকিলে আমরা হরিভক্তজনের কথায় অগ্রসর হইতে পারিব না। সহজিয়া-দম্প্রদায় বলিতেছেন,—আমরা নামাপরাধ ছাড়িব না ; আমাদের লোকেরা বলিতেছেন,—আমরা তোমাদের গ্রাম নামাপরাধ করিব না, ইহাতে অনুকূল ক্রিয়ামাত্র হইতেছে ; হরিভক্তন হইতেছে না ! অনুকূল গ্রহণমাত্র হইলেই হইবে না, কৃষ্ণানুশীলন হওয়া চাই, নতুবা যুগী-ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তির গ্রাম অনুকূলমাত্র গ্রহণ করিয়া পথে চলিতে চলিতে সময়ে সময়ে মাঝপথে অকস্মাৎ এক একটা মুর্ছা উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে ফেলিয়া দিবে। প্রতিকূল কিছু আসিলেই আমরা হৌচট খাইয়া পড়িয়া যাইব—হয়ত' একভাঙ কুরন্ খাইয়া ফেলিব। অনুকূল ক্রিয়াতে জন্ম-জন্মান্তরে সুবিধা হইবে বটে, কিন্তু এই জীবনেই বিদেহ মুক্তি, সিদ্ধিলাভ বা প্রকৃত হরিভক্তন হইবে না। কৃষ্ণের রূপ-গুণে মুগ্ধ না হইলে কৃষ্ণ হইতে অনেক দূরে থাকিতে হইবে। রূপের জগৎ যাহাদের লোভ্য জন্মিয়াছে—যাহারা সৌন্দর্য্যপিপাসু, তাঁহারা কৃষ্ণের সন্নিধানে যাইতে পারিবেন। আমি প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছি না। এইরূপ সৌন্দর্য্যপিপাসু ব্যক্তিগণের জগৎ দশম স্ফের ভাগবত বিবৃতি লেখা আবশ্যক। আমরা প্রাকৃত সহজিয়াগণের ভ্রমরগীতা, গোপীগীতার পাঠ ব্যাখ্যাগুলির অনুমোদন করি না, কিন্তু ঐ সকলের যথার্থ ব্যাখ্যাও তৎসঙ্গে প্রদান করা কর্তব্য। কেবল 'ইহা নহে'—'ইহা নহে', বলার সঙ্গে সঙ্গে 'ইহা হয়' বলাও আবশ্যক।



## একাদশীর জন্মকথা

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩ পৃষ্ঠার পর ]

### একাদশী-ব্রত-মাহাত্ম্য

অতঃপর একাদশী-ব্রত-মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে। পূর্বকালে ‘কোটিরথ’ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পরম ধর্মজ্ঞ, রাজনীতিবিৎ, সভ্যবাদী, জিতক্রোধ, জিতবৈরি, নারায়ণার্চক ও হরিবাসরত্নপর ছিলেন। তাঁহার পত্নী সুপ্রজ্ঞা ও প্রিয়বাদিনী ও সর্বস্বলক্ষণ-সম্পন্ন নারী ছিলেন। তিনি একাদশী ব্রতপরায়ণা ও জ্ঞাতিস্মরা ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে একদিন একাদশী-নিশিতে রাত্রি জাগরণ করিতে উগত হইয়াছেন। এমন সময়ে শৌরি-নামক ব্রাহ্মণ সেই জাগরণমুখে আসিয়া উপস্থিত হন। রাজা পরম সমাদরে পাণ্ডাদি দ্বারা ব্রাহ্মণকে পূজা করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ অখিল তত্ত্ববিৎ ছিলেন। তিনি তথায় বহু ব্রতীকে বিষ্ণুপূজাপরায়ণ দেখিতে পাইলেন। কেহ নানা মনোরম পুষ্পে শ্রীহরির পূজা করিতেছেন, কেহ দিব্য গন্ধ, ধূপ, দীপাদি প্রদান করিতেছেন, কেহ কেহ করতাল সহযোগে নৃত্যগীত কীর্ত্তন করিতেছেন, কেহ চামর ব্যঞ্জন, কেহ কোমলাক্ষরে স্তুতি পাঠ, কেহ বাণীবন্দনদ্বারা কেশবের সন্তোষ বিধান করিতেছেন। সেই রাজদম্পতীও অত্যন্ত হর্ষসহকারে ললিত গীত গান করিয়া শ্রীহরির অগ্রে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে নৃত্য-গীত নিরত দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হে মহীপাল! আপনারা উভয়েই ধত্ত। আপনাদের গায় সুচরিত্রবান্ বৈষ্ণব জগতে দুর্লভ। সপ্তদ্বীপপতি হইয়াও আপনি যেরূপ নৃত্য-গীতাদি করিতেছেন আপনার গায় চরিত্রবান্ নরলোকে বিরল। আপনাদের এইরূপ বুদ্ধি কি-প্রকারে জন্মিল?”

ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুপ্রজ্ঞা ঈষৎ হাস্তদ্বন্দ্বকারে বলিতে লাগিলেন,—“আমরা পূর্বজন্মে মহাপাতকী ছিলাম; কিন্তু একাদশী-প্রভাবে যমরাজের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছি। পূর্বজন্মস্মৃতিপ্রভাবে শ্রীহরির অক্ষয়লোক লাভের জন্ত একাদশী ব্রতানুষ্ঠান করিতেছি।” ব্রাহ্মণ বলিলেন,—“যদি আপনারা পূর্ব-জন্মের কথা স্মরণ করিতে পারেন, তবে তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। উহা শুনিবার জন্ত আমার বিশেষ কৌতুহল জন্মিয়াছে।” সুপ্রজ্ঞা বলিলেন,—“যদিও ইহা অপ্ৰকাশ্য, তথাপি আপনি বৈষ্ণবোক্তম বলিয়া আপনার নিকট বর্ণন করিব।”—“আমি পূর্বজন্মে চিত্রপদা-নাম্নী বারবনিতা ছিলাম এবং বহুবিধ পাপানুষ্ঠান

করিয়াছিলাম। এই রাজাও সর্বশ্রকার আচার-বর্জিত, পরদ্রব্যাপহারক, পরদারয়ত, অহংকারী ও ধর্মনিন্দক ‘নিত্যদয়’-নামক এক শূদ্র ছিলেন। ইহার অনাচার জগৎ জ্ঞাতিবন্ধুগণ ইহাকে পরিত্যাগ করিলে ইনি আমার আশ্রয়ে অবস্থান করেন। তদবধি আমরা উভয়ে স্বামী-স্ত্রীর গ্রাম বাস করিতে থাকি। একদিন কোন একাদশী-তিথিতে অত্যন্ত জরপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া আমি অন্ন-পানাদি গ্রহণ না করিয়া দিনরাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলাম এবং পীড়ায় কাতর হইয়া, হে হরি! হে গোবিন্দ! হে নারায়ণ! আমাকে রক্ষা করুন— এইরূপে কাতরভাবে শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করিয়া, যতপ্রদীপ জালাইয়া সমস্ত নিশি জাগরণ করি। আমার প্রতি শ্রীতিহেতু এই রাজাও অন্ন-পানাদি গ্রহণ করেন নাই। প্রভাতে সূর্যোদয় হইলে আমি মৃত্যুমুখে পতিত হই। ইনিও অতি কাতরতাবশে পঞ্চতুপ্রাপ্ত হন। তৎপরে যমদূতগণ আমাকে দৃঢ়-পাশে বন্ধন করিয়া দুর্গমপথে যমপুরীতে লইয়া যায়। যমরাজ চিত্রগুপ্তকে আমাদের শুভাশুভ কর্মসকল জানাইতে আদেশ করেন। চিত্রগুপ্ত বলিলেন—“ইহারা মহাপাতকীশ্রেষ্ঠ হইলেও একাদশী-উপবাস প্রভাবে সর্বপাপমুক্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি অনিচ্ছাসত্ত্বেও একাদশী উপবাস করে, সে সর্বপাপ-বর্জিত হইয়া পরম ধামে গমন করে।” চিত্রগুপ্তের বাক্য শ্রবণপূর্বক যমরাজ অকস্মাৎ আসন হইতে উখিত হইয়া আমাদের বন্দনা করিলেন এবং স্বগন্ধি চন্দন, দিব্য-পুষ্প, বস্ত্রালঙ্কার-মণ্ডিত করিয়া নানাবিধ সুস্বাদু ফল ও অমৃতোপম ভোজন প্রদান করিয়া আমাদের স্তুতি করিলেন এবং দিব্যরথে স্থাপনপূর্বক বলিলেন,—আপনারা পুণ্যবন্তগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। যেখানে ভগবান্ বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন আপনারা তথায় গমন করুন।

আমরা তখন যমরাজকে জানাইলাম যে, আমরা নরকস্থ প্রাণীগণকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। যমরাজ আমাদের রথে চড়াইয়া নরকস্থ জীবগণকে দেখিতে পাঠাইয়া দেন। আমরা তথায় দুঃশ্রেষ্ঠ নরক সকল দর্শন করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনারা তথায় পাপাত্মাগণের যা’ যা’ দুর্দশা দর্শন করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট বিস্তৃতভাবে বলুন। পাপাত্মা ও পুণ্যবান্গণ কোন্ পথে গমন করে এবং তাহাদের প্রতি যমরাজের ব্যবহার কীদৃশ, পাপিগণ কি-ই বা বলে, এই সমস্ত কথা বিস্তৃতভাবে বলুন। তদন্তরে স্বপ্রজ্ঞা যমপুরী ও যমরাজের বিচারাদি সম্যক্ কীৰ্ত্তন করেন।

### পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মার পরিচয়

স্বপ্রজ্ঞা বলিলেন,—সর্বপ্রথমে পুণ্যাত্মা প্রাণীগণের কথা বলিতেছি।

পুণ্যবস্ত্র জীবগণের যমপুরী-গমনের পন্থা সর্বপ্রকার উপদ্রব-বর্জিত। পশ্চিমধ্যে কোনস্থানে গন্ধর্ব্বা-কন্তাগণ গান গাহিতেছেন, কোথাও সুকোমলা অপ্সরীগণের নৃত্য, কোথাও বীণাবাদ্য, কোনস্থানে পুষ্পবৃষ্টি, কোন জায়গায় শীতল বালুকা, শীতল নীর-বিশিষ্ট জলপ্রপাত, কোনস্থানে গন্ধর্ব্বগণ স্তুতি পাঠ করিতেছেন, কোথাও প্রফুল্ল পদ্ম-পুষ্প-শোভিত দীর্ঘিকা বা সুচ্ছায়া-বিশিষ্ট পাদপ ;—এই প্রকার সুন্দর মার্গে পুণ্যাত্মাগণ কেহ রথে, কেহ বোড়ায়, কেহ হাতীতে অলঙ্কার-মণ্ডিত হইয়া দিব্য ছত্রাতপ-তলে যম-পুরীতে গমন করেন কাহাকেও দেবাদ্বনাগণ চামর ব্যঞ্জন করেন, কোন কোন ব্যক্তি দেবর্ষি-ঋষিকর্তৃক স্তুত হইতেছেন—কেহ কেহ নিজ অঙ্গের জ্যোতিতে দশদিক্ আলোকিত করিয়া চলিতেছেন। কেহ পায়স, কেহ সুধাপান, কেহ দুগ্ধ, কেহ-বা ইক্ষুরসাদি, কেহ দধি, কেহ মধুপান করিতে করিতে চলিতেছেন। যমরাজ তাহাদিগকে দেখিয়া নারায়ণ-তুল্য চতুর্ভূজ মূর্তি হইয়া সম্ভাষণ করেন। চিত্রগুপ্ত এবং যম-কিঙ্করগণও নারায়ণ-তুল্য-বপু হইয়া থাকেন। ধর্ম্মরাজ তাহাদিগকে মধুর-ভাষণে সন্তুষ্ট করিয়া দিব্য অন্নাদি ভোজন করাইয়া বলেন,—আপনারা নরক-ক্লেশ-ভয়ে যে শুভ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে পরম উন্নত স্থানে গমন করুন। এই বলিয়া যমরাজ সেই প্রাণীসকলকে পরম-ধামে প্রেরণ করেন।

অতঃপর পাপাত্মগণের গতি শ্রবণ করুন। তাহাদের মার্গ ৮৬ হাজার যোজন দীর্ঘ, অতি দুঃখপ্রদ ও দুর্গম। কোথাও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে, কোথাও সন্তপ্ত কর্দম, কোনস্থানে শিলাবৃষ্টি, অঙ্গার বৃষ্টি, উষ্ণাবৃষ্টি, কোথাও অত্যন্ত উষ্ণ, কোনস্থান তৃণাবৃত অন্ধকূপাচ্ছন্ন, কোথাও কণ্টক বৃক্ষ, নারায়ণ তুল্য কণ্টকপূর্ণ বৃক্ষ, ছুরারোহ পাষণ-শ্রেণী, কোথাও গাঢ় অন্ধকার, কোনস্থানে শোণিত বৃষ্টি, কোথাও দুর্গন্ধ মাংসরাশি, অস্থিরাশি স্তূপীকৃত, কোন কোন স্থানে ভয়ঙ্কর জন্তুসকল গর্জন করিতেছে ;—এইরূপ বহু ক্লেশপূর্ণ ছায়া-জল-শূন্য ভয়ঙ্কর পথে প্রেতসকল ‘নিজ নিজ দুষ্ট কর্ম্ম-চিন্তা করিয়া’ অনুতাপ করিতে করিতে যাইতেছে। যতদূতগণ কাহারও গলায়, কাহারও বাহুতে, কাহারও নাসিকায়, কর্ণরন্ধ্রে চর্ম্মপাশে বন্ধন করিয়া অক্লুশ প্রহার করিতে করিতে টানিয়া লইতেছে। কাহারও কাণে গুরুভার পাষণ ঝুলাইয়া, কাহারও শিলাগ্রে লৌহখণ্ড বাঁধিয়া দিয়া—কাহারও কর্ণে, পায়ের বাহুতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিতেছে। কাহারও গ্রীবদেশে কর-প্রহার করিতে করিতে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করত লইয়া যাইতেছে। কেহ উর্দ্ধপদে অধঃশির হইয়া, কেহ পায়

সাহায্যে, কেহ একপদে গমন করিতেছে। তাহারা আসিলে ধর্মরাজ দিব্য-মূর্তি ত্যাগ করিয়া ত্রিংশৎ যোজন দীর্ঘ বাপীদশ ধূস্রবর্ণ লোচন, মহাতেজা প্রলম্ব-কালীন মেঘের গ্রায় গর্জনশালী, বৃক্ষসদৃশ লোমবিশিষ্ট নাসারন্ধ্রে উষ্ণশ্বাস প্রবাহকারী মহিষারুঢ় হইয়া ক্রোধে নয়ন রক্তবর্ণ ও অট্টহাস্যসহকারে বিরাজ করেন। চিত্রগুপ্ত ও যম-কিঙ্করগণেরও ভয়ঙ্কর মূর্তি হয়। ধর্মরাজ তাহাদিগকে কালদণ্ডে তাড়ন করিতে করিতে বলেন,—রে পাপিষ্ঠ! ছুরাচার! অবিবেকী! মন্তকোপরি দণ্ডদাতা আমাকে না জানিয়া আত্মপীড়াকর অত্যাচারার্থে অল্পাঙ্গন করিয়াছ, তাহার উপযুক্ত ফল গ্রহণ কর। আমি পুণ্যাঙ্গগণের বন্ধু ও পাপাঙ্গ-দিগের রিপু। তোমরা কি ইহা শ্রবণ কর নাই যে, পাপাঙ্গাঙ্গন করিলে দুঃসহ নরক ভোগ করিতে হইবে? তোমরা এ সকল মিথ্যা মনে করিয়া বিভ্রা-ধন-বয়োমদে মত্ত হইয়া ছুরাচার করিয়াছ; এখন দুষ্ট-কর্মের ফল ভোগ কর—ক্রন্দন করিয়া কি লাভ হইবে? তৎপরে যমরাজ চিত্রগুপ্তকে আজ্ঞা করেন—ইহাদের পাপসকল বর্ণন কর।

চিত্রগুপ্ত আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত পাপাঙ্গাঙ্গন বর্ণন করিলে, পাপিগণ যমপাশ-যন্ত্রিত অবস্থায় বলে—আমরা যে পাপাঙ্গাঙ্গন করিয়াছি, তাহার সাক্ষী কে? কে আপনার নিকট ঐ সকল নিবেদন করিল? আমাদের যদি কোন শুভাশুভ কর্মের কেহ দ্রষ্টা থাকেন, তবে বলুন। তখন যমরাজ হাস্য করত সাক্ষীসকলকে আহ্বান করিলে সূর্য্য, চন্দ্র, অনল, অনিল, আকাশ, পৃথিবী, জল, তিথিসকল, দিন, রাত্রি, উভয় সন্ধ্যা এবং ধর্ম—সকলে উপস্থিত হইয়া পাপীদের অল্পাঙ্গিত কর্মসকলের যথাযথ অল্পাঙ্গন ফলাদি বর্ণন করেন। পাপীসকল তাহা শুনিয়া ভীত ও কম্পিত-হৃদয়ে মৃতবৎ অবস্থান করে।

ধর্মরাজ দন্ত কড়মড় করিয়া তাহাদিগকে দণ্ডদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ তাড়ন করেন। সেই পাতকীসকলও নিজ কৃত কর্মের জ্ঞাত অল্পতাপ করিতে থাকে। যমাদেশে কিঙ্করগণ পাপীসকলকে বিভিন্ন নরকে নিক্ষেপ করে। কাহাকেও অসিপত্রবনে, কাহাকেও লালভক্ষ্য স্থানে, কাহাকেও বিষ্ঠাগর্ভে, কাহাকেও তপ্ত কূপে, তুষারগিতে, অস্থিপূর্ণ হ্রদে বা কণ্টকপূর্ণ গর্ভে নিক্ষেপ করে। কেহ নিজ মাংস ভক্ষণ, কেহ মল ভোজন, শুক্রপান, রক্তপান, মূত্রপানাদি করে। কাহাকেও সর্প-গর্ভে, জলোকা-গর্ভে, দংশক-মশকাদি-পূর্ণ স্থানে ফেলিয়া দেয়। কাহারও মুখে, নাকে, কর্ণরন্ধ্রে তপ্ত তৈল ঢালিয়া দেয়। কাহাকেও জলন্ত অঙ্গার-মধ্যে, কাহাকেও নারাচতুল্য শয্যায়, তপ্ত কর্দমে, শমন-কিঙ্করগণ শোয়াইয়া থাকে। কাহারও গলায় পাষণ বাঁধিয়া পূজ-রক্তপূর্ণ গর্ভে নিক্ষেপ

করে। কাহারও কাহারও মস্তক পাষণোপরি আছড়াইতে থাকে, কাহারও চক্ষু তীক্ষ্ণ বড়িশের দ্বারা উৎপাটন করে, কাহারও নাকে বৃশ্চিক পুরিয়া দেয়, কাহাকেও বৃক্ষশাখায় বাঁধিয়া বৃক্ষতলে আঙুন জ্বালাইয়া পোড়ায়, কাহাকেও ধূম্রপান করায়, কাহাকেও হেঁটমুণ্ডে উদ্ধপদে দীর্ঘকাল বুলাইয়া রাখে, কাহাকেও বা মুষল-মুদগরাদি দ্বারা পুনঃ পুনঃ তাড়ন করে; তাহার প্রহার ফলে রক্তবমন করিতে থাকে। কোন পাপীকে পুতিগন্ধময় মশকপূর্ণ অন্ধকার গৃহে রাখিয়া দেয়। কাহাকেও ভয় ভোজন, কাহাকেও কুমি ভক্ষণ, কাহাকেও দুর্গন্ধ মাংস ভক্ষণাদি করাইয়া থাকে। কাহারও চক্ষু বড়িশাদি দ্বারা উৎপাটিত করায়। কাহাকেও ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি জন্তুদ্বারা ভক্ষণ করায়। উগ্রবিষ-সর্প কাহাকেও দংশন করে। কোনও পাপীকে ভূতলে শয়ন করাইয়া তথুলোহ, পাষণাদি দ্বারা যন্ত্রণা দেয়। কাহারও শ্বাসবায়ু নিরোধ-জন্তু মুখে বা নাসিকায় বস্ত্র পুরিয়া দেয়। কাহারও কেশে ধরিয়া মহীতলে নিক্ষেপ করে—কাহাকেও পদাঘাত করিয়া তাড়না করে। কোন কোন পাপীকে চিল, গৃধাদি পক্ষীসকল গ্রাস ও উদ্‌গীরণ করিতে থাকে। কোন কোন পাপীকে বিকৃত-বদন রাক্ষসের খড়্গাতুল্য নখদ্বারা শরীর বিদীর্ণ করাইতে থাকে। কাহাকেও ক্ষারজল সর্বদা সিক্ত ও পান করায়। কাহাকেও শয়ন করায়। কাহাকেও পিত্ত পান, কাহাকেও স্নুহীক্ষীর (মনসাগাছের ক্ষীর) পান করায়। কাহাকেও শয়ন করাইয়া বক্ষে পর্বততুল্য গুরুভার পাষণ চাপাইয়া দেয়। কাহারও গ্রীবা ও গলদেশে দুই খণ্ড দীর্ঘ কাষ্ঠ ধরিয়া দৃঢ় পাশের দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখে। কোন পাপীর নাকে বড়শিহারা আকর্ষণ করিয়া জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। কাহাকেও বৃক্ষশাখায় চাপাইয়া নিয়ে নিক্ষেপ করিতে থাকে।

এইরূপে পাপী ক্ষুৎ-পিপাসা-কাতর হইয়া পাপফল ভোগ করিতে করিতে 'ত্ৰাহি ত্ৰাহি' রবে চীৎকার করিতে থাকে। দীর্ঘকাল পাপ ভোগ করিয়া পাপ-শেষ ভোগের জন্ত পাপ-ঘোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ব্যাধি-পীড়িত, হীনান্দ্র, অধিকান্দ্র, দুঃখী, পরসেবক, অতিমূর্খ, পরহিংসা-পরায়ণ, অল্লাঘ্য, অল্পমতি, কু ভাৰ্য্যা-পতি প্রভৃতি হইয়া জন্মগ্রহণ করত কায়মনোবাক্যে নিরন্তর পাপ কার্য করে এবং পুনরায় নরকে গমন করে। নারকীদের কোনদিন নিষ্কৃতি হয় না। এজন্ত কাহারও পাপকার্য করা উচিত নহে।

এইরূপে পাপীদের দুর্গতি দর্শন করিয়া আমরা দুইজনে রথে চড়িয়া ভগবদ্ধামে গমন করিয়াছিলাম। কোটি-কল্পকাল তথায় বাস ও অখিল সম্পদ উপভোগ করিয়া রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এ-জন্মে একাদশী-

ব্রহ্ম আচরণ ও ভগ্নাহাওয়া প্রচার করিয়া সুখমুখ্য লাভ করত বৈকুণ্ঠে গমন করিব ।

একাদশীর সমান কোন ব্রত জগতে নাই । অনিচ্ছাসঙ্গেও একাদশীব্রত অহুষ্ঠিত হইয়া যখন আমাদের এইরূপ গতি হইয়াছে, তখন ভক্তিতাবে এই ব্রতানুষ্ঠানের ফল বর্ণনাতীত ।

- ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

## ভক্তির অধিকারী কে ?

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৬ পৃষ্ঠার পর ]

বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তি দুঃখকর সংসারকে সুখকর মনে করে বলিয়া বিষয়ে প্রীতিবশতঃ কিঞ্চিৎ সুখলাভ করিয়া থাকে কিন্তু যাহার বিষয়ে শ্রদ্ধা নাই এবং ভক্তিতেও দৃঢ়-বিশ্বাস নাই, এইরূপ সংশয়াত্মা ব্যক্তি কোন সুখই না পাইয়া ক্রেশ ভোগ করিয়া থাকে । শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

যশ্চ মৃত্তমো লোকে যশ্চ বৃদ্ধে পরং গতাঃ ।

তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিষ্টাত্যস্তরিতো জনঃ ॥ ( ভাঃ ৩।৬।১৭ )

শ্রীবিষ্ণুনাথ-টীকা—‘মৃত্তমঃ পশুরিব বিষয়াসক্তঃ । বৃদ্ধে প্রকৃতেঃ পরং ঈশ্বরং প্রাপ্তঃ । তৌ সুখং যথাস্তাদেবমেধেতে । সংশয়-ক্লেশাভাবাৎ বিষয়ানন্দেশ্বরা-নন্দাভ্যাং বৃদ্ধেতে । যশ্চ দুঃখাহুসন্ধানেন সংসারং জিহাসতি, ভগবন্তুক্ত্যভাভা-দাতুঞ্চ ন শক্নোতি, সত্যস্তরিতো মধাবর্তী আনন্দদয়াভাবেন সংশয়সিকুনিমগ্নঃ ক্লিষ্টাতি ।’

সংশয়াত্মার দুঃখ অনিবার্য্য । এই প্রসঙ্গে গীতাও বলেন,—

অজ্ঞানশ্রদ্ধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশতি ।

নাযং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ( গীঃ ১৪০ )

গুরুপদেশানভিজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন, সংশয়াত্মার বিনাশ হয় । সংশয়াত্মার ইহলোকে সুখ নাই, পরলোকেও সুখ নাই ; এমন কি বৈষয়িক সুখও নাই ।

মাধু-গুরু-চরণাশ্রয় ব্যতীত কাহারও ভক্তিতে প্রকৃত অধিকার আসে না । সদগুরু-চরণাশ্রয়ই ভক্তির প্রথম কথা । তাই ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের প্রথমই সদগুরু-চরণাশ্রয়ের উল্লেখ আছে । সুতরাং মাধুসূদনদ্বারা শ্রদ্ধা হইবামাত্র সজ্জন-

গণ সঙ্গুর-চরণাশ্রয় করিয়া থাকেন। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ ভাঃ ১২।১৬ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—‘যাদৃচ্ছিকমহৎ-কৃপাজনিতয়া মহতাং সেবয়া শ্রদ্ধানস্ত জাত-শ্রদ্ধস্ত পুংসঃ পুণ্যতীর্থং সঙ্গুরকৃত্য নিষেবণং চরণাশ্রয়ং স্যাৎ ।’ ভাঃ ৬২।২-১০ শ্লোকের টীকায় আরও বলিয়াছেন,—‘গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত ভগবান্কে স্তুত পাওয়া যায় না। অতএব ভাগ্যক্রমে জন্মান্তরে গুরুচরণাশ্রয় ঘটিলেই তাহাদের ভক্তি-ফলে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। অল্প উপায়ে ভগবৎপ্রাপ্তি অসম্ভব। অজামিলের দৃষ্টান্ত দেখিয়া কেহ যদি মনে করেন,—‘আমার গুরুকরণরূপ শ্রমের আবশ্যকতা কি ? শ্রীনাম-কীর্ত্তনদ্বারাই আমার ভগবৎপ্রাপ্তি হইবে।’ তাহা হইলে তিনি গুরুবজ্জা-লক্ষণময় মহাপরাধহেতু ভগবান্কে কোন দিনই লাভ করিতে পারেন না। পরন্তু সেইজন্মে কিংবা পরজন্মে সেই অপরাধ ক্ষয়ের পর সঙ্গুর-চরণাশ্রিত হইয়া ভগবান্কে প্রাপ্ত হন।’ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন,—

আশ্রয় লইয়া ভজে,

তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,

আর সব মরে অকারণ।

ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তের সেবানুষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের যে বৃত্তি, তাহাই ভক্তি। নিজের খেয়ালমত মনঃকল্পিত ভজনের নাম ভক্তি নয়। ‘ভক্তিস্তু ভগবন্ত-সঙ্গেন পরিজায়তে’। সঙ্গ অর্থে আশ্রয়। সঙ্গী অর্থে আশ্রিত। সঙ্গুর-চরণাশ্রিত ব্যক্তিই বৈষ্ণব, বিষ্ণুভক্ত বা ভগবচ্চরণাশ্রিত। শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর ভাঃ ৩২৫। ৩২-৩৩ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—‘একান্তমনসো বৈষ্ণবস্তে এব যা ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তিঃ সা ভক্তিঃ। ন চ স্বচ্ছন্দেনৈব প্রবর্তমানানাং তেষাং বৃত্তিভক্তিঃ, কিন্তু শ্রীগুরুপদিস্ত-মস্তোচিতাচরণবতাম্।’

শ্রীভগবানের উক্তিভেদেও আমরা ভক্ত্যধিকারীর কথা শুনিতে পাই। একদিন শ্রীউদ্ধব কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া তাহার অধিকারী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—

নির্বিগ্নানাং জ্ঞানযোগো ত্ৰাসিনামিহ কৰ্ম্মসু ।

তেষনির্বিগ্নচিত্তানাং কৰ্ম্মযোগস্ত কামিনাম্ ॥

যদুচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্ত যঃ পুমান্ ।

ন নির্বিগ্নো নাস্তিসক্তো ভক্তিযোগোহস্য সিদ্ধিঃ ॥

( ভাঃ ১১।২০।৭-৮ )

সংসার-বিরক্ত ত্যাগিগণ জ্ঞানযোগে অধিকারী। অত্যধিক বিষয়াসক্ত,—দেহ-গেহ-স্ত্রী-পুত্রাদিতে অত্যাশক্ত ব্যক্তিগণ কৰ্ম্মযোগে অধিকারী। ভোগিগণ কৰ্ম্মাধিকারী এবং ত্যাগিগণ জ্ঞানাদিকারী। ত্যাগিগণ দেহ-গেহ-কুটুম্বাদিতে অনাসক্ত বা বিরক্ত। কিন্তু ভক্ত ভোগীও নন, ত্যাগীও নন। বাহার সাধুসঙ্গ-

ফলে ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা হইয়াছে এবং সংসারে অত্যাশক্তি বা অত্যধিক বিরক্তি নাই, তিনিই ভক্তিযোগে অধিকারী।

সংসারে যাহার সম্পূর্ণ বিরক্তি আসিয়াছে, তাহার জ্ঞানে অধিকার। বিষয়ে যাহার অত্যাশক্তি আছে, তাহার কৰ্মে অধিকার। আর অত্যাশক্তি-রাহিত্যে ভক্তিতে অধিকার। অনাদিকাল হইতে অবিভা—ভগবদ্বিশ্বাসিত্ব বা ভগবদ-বিশ্বাসিত্বতাই অত্যাশক্তির কারণ। নিকাম কৰ্মহেতু অন্তঃকরণশুদ্ধিই নির্বেদ বা বিরক্তির মূল। আর যাদৃচ্ছিক-মহৎসঙ্গই অত্যাশক্তি-রাহিত্যের হেতু। ‘যদৃচ্ছা’ অর্থে শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—“অযত্নতোহকস্মাৎ প্রাপ্তং বা অযত্নাতুপস্থিতম্।” অর্থাৎ বিনা যত্নে অনায়াসে অকস্মাৎ প্রাপ্ত সাধুসঙ্গফলেই হরিকথায় জীবের শ্রদ্ধা হয়। ‘জাতশ্রদ্ধ’ অর্থে—‘হরিকথা হি কেবলং পরমং শ্রেয় ইতি জাতবিশ্বাসঃ।’ অর্থাৎ হরিকথাই একমাত্র মঙ্গললাভের উপায় এইরূপ বিশ্বাস যাহার হইয়াছে, সেই হরিকথা-শ্রদ্ধালু ব্যক্তিই ভক্তিযোগে অধিকারী।

উপরি-উক্ত ‘নির্বিশ্বাসাং জ্ঞানযোগে’ ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর জানাইয়াছেন,—“ভক্তিযোগে কথাশ্রদ্ধালুরেব অধিকারী। অত্র তু ভিন্নোপক্রম ইত্যস্য জ্ঞানভ্যঃ কস্মিভ্যশ্চ বৈশিষ্ট্যং একবচনেন বিরল-প্রচারত্বঞ্চ ধ্বনিতং। নির্বিশ্বাসে জ্ঞানেহধিকারঃ। নির্বেদস্য কারণং নিকাম-কৰ্মহেতুকান্তঃ-করণশুদ্ধিরেব। অত্যাশক্তেঃ কারণমনাত্মবিজ্ঞেব। অত্যাশক্তিরাহিত্যস্য কারণং যাদৃচ্ছিক-মহৎসঙ্গ এব।”

এখন প্রশ্ন,—অনাদিকাল হইতে ভগবদ্বিশ্বাসিত্ব জীব স্বভাবতঃ বিষয়ে অত্যাশক্ত। অতএব তাহার কৰ্মাধিকারও স্বাভাবিক। তাহা হইলে **জীবকে কতদিন পর্য্যন্ত কৰ্ম করিতে হইবে ?**

তদ্বত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

তাবৎ কস্মাপি কুর্বাতি ন নির্বিশেষত যাবত।।

মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ( ভাঃ ১১।২০।২ )

যতদিন পর্য্যন্ত সংসারে নির্বেদ বা বিরক্তি না আসে অথবা ভাগ্যক্রমে মৎসঙ্গফলে ভগবৎ-কথা-শ্রবণ-কীর্তনাদিতে শ্রদ্ধা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্ম করিতে হইবে। নিকাম কৰ্ম করিতে করিতে **চিন্তাশুদ্ধি হইলে সংসারে বা বিষয়ে বিরক্তি আসিবেই।** তখন কৰ্মস্পৃহা থাকিবে না। আকস্মিক মহৎকৃপাহেতু ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধা হইলে জীবের ভক্তিতে অধিকার হইল। শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে কৰ্ম করিতে হইবে। ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধা হইলে আর কৰ্ম করিতে হইবে না। “ভগবৎ-কথা শ্রবণাদিদ্বারাই



আমার জীবন সার্থক হইবে, আমি নিশ্চয়ই নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারিব। কর্ম-জ্ঞানাদি দ্বারা আমার নিত্যমঙ্গল হইতেই পারে না”—এরূপ স্বদৃঢ় বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। দৃঢ়শ্রদ্ধা শুদ্ধভক্তের সঙ্গ হইলেই এইরূপ শ্রদ্ধা লাভ হয়। তখন সংসার-স্পৃহা বা কর্মে অধিকার থাকে না।

আর একটা প্রশ্ন,—সাধুর সঙ্গ ও রূপায় যাহারা ভক্তিতে অধিকার লাভ করিয়া অর্থাৎ শ্রদ্ধালু হইয়া ভক্তিপথ আশ্রয় করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রাথমিক স্বভাব বা অবস্থা কিরূপ হয়? সেই দুর্বলচিত্ত প্রাথমিক সাধক কিভাবে হরিভজন করেন?

তদুত্তরে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধবকে বলিলেন,—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিগ্নঃ সর্বকর্মসু ।

বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেহপ্যনীশ্বরঃ ॥

ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

জঘমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাশ্চ গর্হয়ন্ ॥

( ভাঃ ১১।২০ ২৭-২৮ )

মহাভাগ্যক্রমে অকস্মাৎ ভগবৎপ্রেরিত সাধুর সঙ্গফলে যাহার ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধা হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্তনই চিরশান্তি-লাভের একমাত্র উপায়, ইহা যিনি নিজে অনুভব করিয়া সৎগুরু-চরণাশ্রয়পূর্বক শ্রবণ-কীর্তনাদি ভজন করিতেছেন, তাঁহার আর বিষয়ে অত্যাসক্তি নাই; আবার বিষয়ে সম্পূর্ণ বৈরাগ্যও হয় নাই। সংসারে কিছু কিছু আসক্তি আছে কিন্তু সংসার তাঁহার ভাল লাগিতেছে না, দুঃখের মনে হইতেছে। অথচ দুর্বলতাবশতঃ সংসার ছাড়িবারও সামর্থ্য নাই। কর্ম উদ্বোধনক বলিয়া কর্মের প্রতি তাঁহার নির্বেদ আসিয়াছে। এজন্ত আর কর্ম করিতে ইচ্ছা নাই। কিন্তু কর্ম-ফলের প্রতি সম্পূর্ণ বিরক্তি আসে নাই। “কর্মসু নির্বিগ্নঃ দুঃখবুদ্ধ্যা উদ্বিগ্নঃ, ন তু তৎফলেষু বিরক্তঃ” (শ্রীধরস্বামিপাদ)—এতাদৃশ প্রাথমিক ভক্তসাধক স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গকে দুঃখের জানিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া সেই অবস্থা হইতেই দৃঢ়তার সহিত শ্রীনাম-কীর্তনাদি ভজন করিবার সৌভাগ্য হউক অথবা ভজনে কোটি কোটি বিঘ্নই আসুক, অপরাধবশতঃ আমার নরক হয় হউক, দুর্বলতাবশতঃ যখন আমি বিষয় ছাড়িতে পারিতেছি না তখন বিষয় ভোগ করিলেও আমি ভক্তি কখনও ছাড়িব না। জ্ঞান-কর্মাদি কখনও গ্রহণ করিব না, যদি স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়াও বলেন।”—এইরূপ দৃঢ়তা সাধুর সঙ্গ-ফলে তাঁহার আসিয়াছে। সাধুসঙ্গফলে ভক্তিতে যেরূপ দৃঢ়তা আসিয়াছে, ভক্তি-প্রতিকূল-বিষয়ে তাঁহার

সেইরূপ দৃঢ়তা আসে নাই ; এজ্ঞ গর্হণ করিতে করিতে তিনি স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গ অর্থাৎ বিষয় ভোগ করিতেছেন । বিষয়ভোগ অনর্থকর ও ভগবৎ-প্রাপ্তির বাধক । সুতরাং আমি আর অসংসঙ্গ ও বিষয়ভোগাদি কিছুই করিব না ।—এইরূপে মধ্যে মধ্যে বহু শপথ করিয়াও তিনি কার্যকালে ভোগ না করিয়া থাকিতে পারেন না । ‘নিন্দামি চ পিবামি চ’ গায়ে তাঁহার বিষয়-ভোগ হইয়া থাকে ।

শ্রীচক্রবর্তী-টীকা—“অথ ভক্ত্যধিকারিণঃ প্রাথমিকং স্বভাবং দর্শয়ন, ভক্তিমাহ.—জাতশ্রদ্ধ ইতি দ্বাভ্যাং । সর্বকৰ্ম্মসু লৌকিক-বৈদিকেসু কৰ্ম্মসু নিক্ষিপঃ হুঃখবুদ্ধ্যা উদ্বিগঃ । কামান্ স্ত্রীপুত্রাদি-সঙ্গোথান্ কামান্ হুঃখাত্মকান্ বেদ অথচ তৎপরিত্যাগেহ্যাসমর্থঃ । ততস্তামবস্থামারভৌব দৃঢ়নিশ্চয় ইতি গৃহা-  
ত্বাসক্তির্মে নশতু বদ্ধতাং বা, ভজনেহপি মে বিয়কোটীর্ভবতু নশতু বা অপরাধে নরকং চেষ্টবতু কামমঙ্গীকূর্ষে তদপি ভক্তিং ন জিহাসামি জ্ঞান-কৰ্ম্মাদিকং নৈব জিঘৃক্ষামি যদি স্বয়ং ব্রহ্মাপ্যগত্য বদেদিতোবাং দৃঢ়নিশ্চয়ো যশ্চ সঃ । আরঙ্ক-ভজনশ্চ তস্ত ভক্তৌ যথা নিশ্চয়দাঢ্যং ন তথা তৎপ্রতিকূল-বস্ত্তনি । হুঃখোদর্কান্ কলত্র-পুত্রাদি-সঙ্গোথান্ কামান্ গর্হয়রেব জুযমাণঃ । অহো অমী বিষয়ভোগা এব মম অনর্থকারিণো ভগবৎপদপ্রাপ্তি-প্রতিকূলা যদেতে বহুশো নামগ্রাহমপি সশপথমপি তাত্কাপি সময়ে ভোক্তব্য্য এব ভবন্তীতি নিন্দামি চ পিবামি চ গায়েন ভুঞ্জানম্ ।”

এতাদৃশ প্রাথমিক সাধক ভক্তগণও ভক্তিদ্বারা কৃতার্থ হইয়া থাকেন । তাঁহারা দুর্ক্লমতাবশতঃ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেও সাধুসঙ্গকলে ভক্তিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছেন—দৃঢ়তার সহিত ভক্তিযাজন করিতেছেন বলিয়া বিষয় তাহাদিগকে কিছুই করিতে পারে না । এ-সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্তু বলিয়াছেন,—  
বাধ্যমানোহপি মন্ত্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥ ( ভাঃ ১১।১৪।১৮ )

শ্রীচক্রবর্তী-টীকা—“ভক্তৌ প্রথমবর্ত্তমানোহপি ভক্তঃ কৃতার্থ এব । প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া প্রায়ঃনৈব প্রবলীভবন্ত্য কিং পুনঃ প্রগল্ভয়া । জ্ঞানিপ্রকরণে যথা দুরাচারজ্ঞানী নিদ্রিত্যে ভক্তপ্রকরণে দুরাচারো ভক্তো ন নিদ্রো ভক্তত্বঞ্চ তস্ত ন নিষিদ্ধম্ । বিষয়ৈর্বাধ্যমানোহপি বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ইত্যুভয়ত্রাপি বর্ত্তমান-নির্দেশাৎ বিষয়বাস্তবদশায়ামপি বিষয়াবাস্তবং ভক্তি-সম্ভাবাৎ । যথা বৈরিকৃত-কিকিচ্ছজ্ঞাভাতং প্রাপ্তস্ত ন পরাভবিষুতা শৌর্য্য-সম্ভাবাৎ যথা বা পীতজ্বরস্ত-মহৌষধস্ত তদ্বিবসে আয়াতোহপি জ্বরো বাধকোহপ্যবাধক এব তস্ত বিনশ্চ-দবস্থত্বাৎ দিনান্তরে চ সমাঙ্ নষ্টীভাবিত্বাচ্চ ।”

আর একটী প্রশ্ন,—সাধক ভক্তগণ কি চিরকালই দুর্বলচিত্ত থাকিয়া হরিভজন করিবেন ? তাঁহাদের কি নিরুদ্ধেগে মানন্দে হরিভজন করিবার সৌভাগ্য হইবে না ?

তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকুন্মুনে ।

কংমা হৃদয্যা নশ্চন্তি সর্বৈ ময়ি হৃদি স্থিতে ॥ ( ভাঃ ১১।২০।২২ )

সাধক ভক্তগণ চিরকাল বিষয়-বাধিত হইয়া থাকিতে পারেন না । সাধুসঙ্গে দৃঢ়তার সহিত পুনঃ পুনঃ ভজন করিতে করিতে তাঁহাদের কামাদি যাবতীয় অনর্থ নষ্ট হইবে । শ্রবণ-কীর্তনাদি করিতে করিতে হৃদয়-দেবতার স্মৃতি চিন্তে উদ্ভিত হইলে হৃদয় শুদ্ধ হইবে । তখন দুঃখকর স্ব-হৃথবাহু তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না । তখন তাঁহারা শ্রীশঙ্কর-গোবিন্দের কৃপায় অনর্থনিবৃত্তির পর নিষ্ঠাক্রুচি প্রভৃতি লাভ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবেন ।

—ত্রিদিগ্ভিম্বামৌ শ্রীমন্তুক্তিময়ুখ ভাগবত মহারাজ

## প্রগতির পরিণাম

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৫ পৃষ্ঠার পর ]

প্রহ্লাদ মহারাজ ব্যতিরেকমুখেও মনুজ্ঞান্নয়ে একমাত্র হরিভজন ব্যতীত বিষয়-ভোগ করা কর্তব্য নহে, সবিস্তারে বর্ণন করিতেছেন ।—

পুংসো বর্ষশতং হায়ুস্তদর্দ্ধং অজিতান্ননঃ ।

নিফলং যদসৌ রাজ্য্যাং শেতেহন্ধং প্রাপিতস্তমঃ ॥

মনুষ্যের পরমায়ু শতবর্ষ হইলেও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির ইহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর হইয়া থাকে ; যেহেতু সে রাজিকালে অন্ধতমসাক্ষর হইয়া নিদ্রামগ্ন থাকে ।

দিবাভাগের পঞ্চাশ বৎসরও কিভাবে হরিভজন বিনা নষ্ট হয়, তাহা বলিতেছেন ।—

মুগ্ধস্ত বাল্যে কোমারে ক্রীড়তো যাস্তি বিংশতিঃ ।

জয়য়া গ্রাস্তদেহস্ত যাত্যকল্পস্ত বিংশতিঃ ॥

দুরাপূরণ কামেন মোহেন চ বলীয়সা ।

শেষং গৃহেষু সন্তস্ত প্রমত্তস্তাপযাতি হি ॥

অর্থাৎ বাল্যকালে আচ্ছন্নজ্ঞান হইয়া এবং কুমারকালে ক্রীড়াকৌতুকে আসক্ত হইয়া কুড়ি বৎসর এবং শেষভাগে জরা-ব্যাদিগ্রস্ত হইয়া কুড়ি বৎসর দাবুল্যে  $(২০ + ২০ = ৪০)$  ৪০ বৎসর মনুষ্যের পরমার্থচেষ্টি বিহীনভাবে অতিবাহিত হয় ; অবশিষ্ট মাত্র ১০ ( দশ ) বৎসর সর্বোত্তম কালে দুরাপুর কামনা-বাসনা ও মোহের বশবর্তী হইয়া গৃহিণীরূপ গৃহাসক্ত হইয়া অবिवেকতায় বিফলভাবে অতিবাহিত হইয়া থাকে ।

কো গৃহেষু পুমান্ সন্তমাস্তানমজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

স্নেহপাশৈর্দৃষ্টৈর্বন্ধমুংসহেত বিমোচিতুম্ ॥

দারাপুত্রাদিযুক্ত গৃহে আসক্ত এবং অত্যন্ত দুঃশ্চেত স্নেহরঞ্জুদ্বারা আবদ্ধ অজিতেন্দ্রিয় কোনও পুরুষ নিজচেষ্টিদ্বারা নিজকে আবদ্ধদশা হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম হয় না ।

কো স্বর্থতৃষ্ণাং বিশ্বজ্ঞেং প্রাণেভ্যোহপি য ঈপ্সিতঃ ।

যং ক্রীণাত্যত্নভিঃ প্রেষ্টৈস্তদ্বরঃ সেবকো বণিক্ ॥

চোর, সৈনিক ও বণিকগণ অর্থলিপ্সু হইয়া প্রাণের বিনিময়েও যে অর্থোপার্জন করে । সেই অর্থপিপাসাকে কোন্ ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ ?

গৃহিব্যক্তিগণের পত্নী ও সন্তানাদিতে আসক্তিজনিত যে মোহ জন্মে তাহা কিরূপ ভয়ঙ্কর প্রবল ও দুস্ত্যজ্য তাহা বর্ণন করিতেছেন ।—

কথং প্রিয়ায়া অমুকম্পিতায়াঃ সঙ্গং রহন্ত্যং রুচিরাংশ্চ মন্থান্ ।

স্বহৃৎসু চ তৎস্নেহমিতঃ শিশুনাং কলান্ধরাণামনুরক্তচিত্তঃ ॥

পুত্রান্ স্রবন্তা হৃহিতৃহৃদয্যা ভ্রাতৃন স্বস্বর্ক্য পিতরো চ দীনো ।

গৃহান্ মনোজ্ঞোরুপরিচ্ছদাংশ্চ বৃত্তীশ্চ কুল্যাঃ পশুভূত্যবর্গান্ ॥

তজ্জেত কোশঙ্কদিবেহমানঃ কস্মাণি লোভাদবিতৃপ্তকামঃ ।

ওপস্ব্যজৈহব্যং বহুমণ্ডমানঃ কথং বিরজ্যেত দুরন্তমোহঃ ॥

স্নেহশীলা ও অনুরক্তা প্রিয়ার সহিত নির্জনে সঙ্গ ও তাহার মনোহারী আলাপনে বিমোহিত ব্যক্তি ক্রীকে কিরূপে পরিত্যাগ করিবে ? কলভাষী শিশুগণের স্নমিষ্ট অক্ষুট বাক্যাকৃষ্ট গৃহী তাহাদের চিন্তা হইতে মুক্ত হইতে পারে না । পুত্র ও শব্দরালয়স্থিত স্নেহপালিতা কন্যা, ভ্রাতা-ভগিনী এবং বুদ্ধাতুর অসমর্থ ও অসহায় পিতামাতায় আসক্তচিত্ত কিরূপে তাহাদের পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতে পারে ? অপিচ রুচিকর মূল্যবান্ পরিচ্ছদে সজ্জিত বাসগৃহ, পৈত্রিক সম্পত্তির আয়, হস্তী, ষোটক-গবাদি পশু ও অনুরত সেবকগণে আসক্তচিত্ত ব্যক্তি তাহাদিগকে বিশ্বস্ত হইতে পারে না । সে কোষকার বা গুটীপোকার ত্রায় চেষ্টিযুক্ত হইয়া গৃহস্থিত

ব্যক্তি ও বস্তুকে ভোগরত থাকিয়া ভোগবৃত্তিকে শাস্ত করিতে অপারগ হয় এবং শিশ্রোদরপরায়ণতাবশতঃ দ্রুন্তমোহগ্রস্ত হইয়া গৃহাদি পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয় না।

কুটুম্বপোষায় বিষমিজায়ুর্ন বুধ্যতেহর্থং বিহতং প্রমত্তঃ ।

সর্বত্র তাপত্রয়দুঃখিতাত্মা নিক্ষিপ্ততে ন স্বকুটুম্বরামঃ ॥

কুটুম্বাদিতে আসক্তব্যক্তি কুটুম্বপালনরত থাকিয়া নিজপরমায়ুক্ষয় এবং পরমার্থ-চেষ্টা যে ব্যাহত হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারে না। অতিতুচ্ছ কপর্দকের জ্ঞাত্ব হিসাবনিকাশে মনুষ্যজন্মকে নষ্ট করে এবং সর্বত্র ত্রিতাপজালায় দগ্ধ হইতে থাকে।

অতঃপর জীলোক হইতে সর্বাধিক অনিষ্ট ও পরমার্থবিয়িত হইয়া থাকে তৎসম্বন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি।—প্রহ্লাদ সত্যযুগে একটি হইয়াছিলেন এবং তৎকালে কলিকে প্রদত্ত স্থান বিচারে জীসঙ্গ-বর্জনের বিষয় ছিল না; তথাপি সর্বযুগে এবং সর্বকালে জীসঙ্গ পরমার্থচেষ্টার পরম অনিষ্টকর বিষয় সত্যাদিকালেও জীসঙ্গ বর্জনের জ্ঞাত্ব শাস্ত্রে সর্বত্র উপদেশ বর্তমান। কলিকালে জীসঙ্গকে কলিস্থান বলিয়া অধিকতর দোষাবহ জানিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে গৃহীদিগকে কেবলমাত্র পুত্রোৎপাদন করিতে যতটুকু প্রয়োজন তাহার বিধি দিয়াছেন, রতি-সুখের জ্ঞাত্ব জীসঙ্গ নিষিদ্ধ করিয়াছেন ( এবং ব্যাঘ্রঃ প্রজয়া, ন রতৌ ) ।

যতো ন কশ্চিৎ ক চ কুত্রচিদ্ভা দীনঃ স্বমাত্মানমলং সমর্থঃ ।

বিমোচিতুং কামদশাং বিহার-ক্রীড়াযুগো যম্নিগড়ো বিসর্গঃ ॥

অর্থাৎ—যাহারা দৃষ্টিপাত করিলে অথবা যাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত হেতু পুরুষগণ কামগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের নিকট বেদিয়ার খেলাপ্রদর্শনের বানরতুল্য বশীভূত হয়, এবং তাহাদের মোহ হইতে নিজকে বিমুক্ত করিতে অসমর্থ হইয়া থাকে, এবং যাহাদের সঙ্গকালে বন্ধনের শৃঙ্খলস্বরূপ পুত্রকন্টার উৎপত্তি ঘটে, সেই জীজনের সঙ্গ দূরের কথা, যে পুরুষগণ ঐরূপ জীসঙ্গী, তাহাদিগকেও অতিদূর হইতে বর্জন করত আদিদেব নারায়ণের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। এই নারায়ণই অনাসক্ত ভক্তগণের কাজ্জিত পরম পুরুষার্থ।

সুতরাং যে কালপ্রগতিতে সর্বাপেক্ষা অধঃপাতরূপ জীসঙ্গের স্বযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা প্রধানরূপে বিহিত হয়, সেই প্রগতি অধঃপাত সাধক হয় না কি ?

( ক্রমশঃ )

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্মুক্তিবেন্দান্ত্রিবিক্রম মহারাজ

## ইচ্ছাশক্তি—ভগবচ্ছক্তি

কোন ঘটনার প্রতি আমাদের রাগ, ঘেব, দুঃখ বা অভিমান কিছুই হয় না, যদি আমরা সেই ঘটনার যথাযথ কারণ জানিতে পারি। বস্তুর স্বরূপ-বোধ হইলে, তাহার প্রতি যথার্থ আদর বা অনাদর উপস্থিত হয়। ধারণা একবার বন্ধমূল হইলে তাহা আর সহজে উৎপাটিত হইতে চাহে না। ধারণা জন্মাইতে হইলে তদুৎপত্ত ঘটনার সম্মুখীন হইতে হয়। ঘটনাবলীই জীবের পরীক্ষাক্ষেত্র, আর তাহাই তাহার পরবর্তী কার্যাবলীর কারণ।

কায়িক, বাচিক ও মানসিক প্রধানতঃ এই তিনপ্রকার কার্যাবলীর মধ্যে মানসিক কার্যই প্রধান। মানসিক কার্য মনদ্বারা সংঘটিত হয়। মন ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভরশীল এবং ইচ্ছার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগই জীবের একমাত্র স্বতন্ত্রতা। ইচ্ছাশক্তি পরিচালিত হয় জীবের পূর্ব-সংস্কার, বর্তমান পরিবেশ এবং পরিচালকের উপর। জীব যে কোন কিছু করিতে পারে না, সে যোগ্যতা তাহার নাই; কিন্তু ইচ্ছা করিবার স্বাধীনতা তাহার আছে। ইহাই জীবের পরতাত্ত্বিক স্বতন্ত্রতা, ইহাই জীবের পরিচয়। শ্রীভগবান্ জীবের এই স্বতন্ত্রতায় কখনও হস্তক্ষেপ করেন না। ইহাই তাহার লীলারস-আস্বাদক হিসাবে রসিকশেখরতা ও পরমকরুণা।

জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেকদ্বারা ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে বোধোদয় না লইলে ইচ্ছা-মদিচ্ছা হয় না। বোধই হইল অধিকারের মাপকাঠি। এই অধিকারানুযায়ী জীব বিভিন্ন বস্তু বা অবস্থাকে বিভিন্নভাবে গ্রহণ করে। জীবের মায়াবদ্ধ বা মায়ামুক্ত হইবার উভয়বিধ কারণেরই মূল কারণ হইল—ইচ্ছাশক্তি। ইহা চিচ্ছক্তিরই অন্তর্গত। বোধের অপর নাম অনুভব; ইহারই নাম বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান। ইহা স্বয়ং ভগবান্ নিজ রূপাদ্বারা কাহাকেও অনুভব করাইলে তবেই তিনি কিছু অনুভব করিতে পারেন এবং অনুভব কি বস্তু, তাহা তখন বুদ্ধিতে পারেন। যেমন ব্রহ্মার হৃদয়ে রূপা করিয়া তিনি স্বয়ং অনুভব করাইয়াছিলেন,—

“জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান-সমম্বিতম্।

সরহস্তং তদঙ্গং গৃহাণ গদিতং ময়া ॥”

“যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ।

তথৈব তদ্বিজ্ঞানমন্ত তে মদন্তগ্রহাৎ ॥”

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমার সম্বন্ধে পরম গোপনীয় যে তদ্বিজ্ঞান, তাহা আমি তোমাকে (কথায়, শব্দদ্বারা) বলিতেছি, তুমি—গ্রহণ কর। ওই জ্ঞান আমি তোমার হৃদয়ে অনুভবও করাইয়া দিতেছি, তুমি

গ্রহণ কর। তাহাতে যে রহস্য আছে, তাহাও বলিতেছি, গ্রহণ কর। আর ওই জ্ঞানের যে যে সহায় আছে, তাহাও বলিতেছি, গ্রহণ কর।

আমার যে স্বরূপ আছে, আমার যে লক্ষণ আছে, শ্যাম-চতুর্ভূজাদি আমার যে-সকল রূপ আছে, ভক্তবাৎসল্যাদি আমার যে-সকল গুণ আছে, রূপানুযায়ী যে-সমস্ত লীলা আমার আছে, আমার অল্পগ্রহে সে-সকলের যথার্থ অনুভব তোমার সর্বপ্রকারে হউক।

অনুভব বা ধারণার আশ্রয় মন। মন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইচ্ছার দৃঢ়তার নাম আসক্তি বা অভিনিবেশ। আলো—থারাপ, ভাল, বীভৎস, সুন্দর প্রভৃতি যে বস্তুর ওপর যেমনভাবে পতিত হয়, তাহা দর্শন করিয়া মনও তদনুরূপ হুঃখ, আনন্দ, ভয়, শান্তি প্রভৃতিরূপে বিকারলাভ করে। ইহাতে আলোর দায় কোথায়? আবার আলোর আধার-স্বরূপ প্রদীপ ইত্যাদিকে সরাইয়া লইলেই আলো যেরূপ আপনা আপনি অন্তর্হিত হয়, তদ্রূপ সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের ইচ্ছারূপ অভিনিবেশকে দেহাদি জড়ীয় বিষয় হইতে অগ্ৰত চিদ্রাজ্যে সরাইয়া লইলে, সর্ববিধ অমঙ্গল আপনিই নাশ হইবে।

মেধার দ্বারা ও শ্রবণাদি দ্বারা কেহ কিছু স্মরণও রাখিতে পারে, কিন্তু অনুভব করিতে পারে না। শ্রীভগবানের একান্ত অল্পগ্রহেই একমাত্র তাহা সম্ভব হইতে পারে। অত্থায় ভুলবাবুঝির অবকাশে উৎপাতের আশঙ্কা প্রবল। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বহুষ্টিতাৎ ।

স্বধর্মো নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ( গী: ৩।৩৫ )

আবার পরক্ষণেই বলিলেন,—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । ( গী: ১৮।৬৬ )

অর্থাৎ একবার বলিলেন—সর্বাদীনভাবে অহুষ্টিত পরধর্মোপেক্ষা কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন হইলেও স্বধর্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম অহুষ্ঠানকারীর মরণও ভাল পরধর্ম ভয়সঙ্কুল। নিজধর্ম-প্রতি পরিনিষ্ঠিতা হইতে বলিয়াও আবার বলিলেন,—সমস্তরকমের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও। এইরূপ—“সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।” এইকথার সঙ্গে—“যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্” ( গী: ৯।২২ ) অর্থাৎ—আমার দ্বেষ বা প্রিয় কেহই নাই এবং সর্বভূতে আমি সমভাবে পন্ন হইলেও যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজন করেন, তাঁহারা আমাতে থাকেন এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে থাকি।

“এক কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে।

পাপীর সাধ্য নাহি তত পাপ করে ॥”

আবার—“কোটিজন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্তন ।

তবুও না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥”

শাস্ত্রে এইরূপ অজস্র আপাত-বিরোধী বাণী দৃষ্ট হয় এবং বিভিন্ন অধিকারাত্মযায়ী বিভিন্ন জীব তাহা বিভিন্নভাবে গ্রহণ করে । তাহার উপর-ভিত্তি করিয়া অজস্র কোতুহল, অজস্র জিজ্ঞাসা এবং বাক-বিতণ্ডারও স্রোত প্রবাহিত হয় ।

কৃষ্ণ-বহিন্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে ।

নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥ ( শ্রীপ্রেমবিবর্ত )

অর্থাৎ—জীব তাহার স্বতন্ত্রতাকে ভোগবাঞ্ছাতে ব্যবহার করিবার ফলেই তাহার মায়াবদ্ধতা । আবার—

“আপন ইচ্ছায় জীব কোটিবাঞ্ছা করে ।

কৃষ্ণ ইচ্ছা বিনা তাহে ফল নাহি ধরে ॥”

এইস্থলে বলা হইল,—জীব নিজেচ্ছায় অজস্র বাঞ্ছা করিলেও কৃষ্ণের ইচ্ছায়ই সব কিছু হয় । তাহার ইচ্ছা বিনা নাকি গাছের একটি পাতাও নড়ে না । তাহা হইলে জীবের মায়াবদ্ধতা ও সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা এবং যত অধর্ম, অপরাধ সমস্তই ত’ কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই হইয়া থাকে, ইহাতে জীবের কোন দায় থাকে না, ইহাই সিদ্ধ হয় । কৃষ্ণের ইচ্ছায়ই যদি সবকিছু সংঘটিত হয়, তবে আবার সামান্য ভোগেচ্ছার জন্য মায়াবদ্ধতার দায় জীবের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হয় কেন ? সমস্তই যদি কৃষ্ণেচ্ছারই ফল, তাহা হইলে এই ভোগেচ্ছা এবং মায়াবদ্ধতা—ইহাও কৃষ্ণেচ্ছারই ফল বলিতে হয় । অতএব কৃষ্ণই ইচ্ছা করিয়া জীবকে মায়াবদ্ধ করান । ইহাতে জীবের দায় কোথায় ? বা তাহার স্বতন্ত্রতাই বা কোথায় ?

এইরূপ পূর্বপক্ষের যথাযথ সহস্রর খুঁজিতে গিয়াই যতকিছু বাদ-বিতণ্ডা ও অজস্র মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে । যাহাদের স্বয়ং ভগবান্ অবতারী শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর “অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব”-দ্বারা পূর্বপক্ষ এবং উত্তরপক্ষ—উভয়পক্ষেরই স্তম্ভীমাংসা পরিদৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদের মতবাদগুলি ধীরে ধীরে সামান্য বিশ্লেষণ করিলেই সত্যদর্শন পরিকৃত হইবে ।

জীবের মায়াবদ্ধতার কারণ হিসাবে বলা হইল,—“কৃষ্ণ বহিন্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে । নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥” আবার এই মায়া হইতে মুক্ত হইয়া, স্বরূপে অবস্থিত হইয়া তাহার যে সাধ্যবস্ত প্রেমলাভ, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ-সংবাদে তাহাও বলা হইল । সেই প্রেমের সাধ্যাবধি যে রস এবং তাহার পরে যে আরও কিছু থাকিতে পারে তাহাও দেখানো হইয়াছে ।—

প্রভু কহে,—“এহো উত্তম, আগে কহ আর ।”

রায় কহে,—“কান্ত্যভাব—প্রেমসাধ্যসার ॥” ( চৈঃ চঃ মঃ ৮।৭৩ )



প্রভু কহে,—এই ‘সাধ্যাবধি’—হুনিচয় ।

রূপা করি’ কহ, যদি আগে কিছু হয় ॥

রায় কহে,—ইহার আগে পুছে হেন জনে ।

এতদিন নাহি জানি, আছয়ে ভুবনে ॥

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম—‘সাধ্যাশিরোমণি’ ।

যাহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি । ( চৈঃ চঃ মঃ ৮৯৫-৯৭ )

প্রভু কহে,—আগে কহ, শুনিতে পাই শুথে ।

অপূর্যামৃত-নদী বহে তোমার মুখে ॥ ( চৈঃ চঃ মঃ ৮১০০ )

অতএব বুঝা যাইতেছে, চরম সাধ্যসারের পরও আরও কিছু আছে—যাহার জ্ঞাত শ্রীভগবানের অনন্ত গুণাবলীর মধ্যে সাধ্যবস্তুর অসীম ও অনন্ত ; যাহা সাধারণ সাধকের পক্ষে সিদ্ধাবস্থায়ও হৃদয়পরাহত ।

এই সাধ্যবস্তুর কিভাবে লাভ হয় ? তাহার ক্রম হিসাবে বলা হইল—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া ।

ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ শ্রাৎ ততো নিষ্ঠা কচিস্ততঃ ।

অধাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাত্মদৃষ্টি ।

সাধকানাময়ং প্রেমণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

( ভঃ রঃ সিঃ পুঃ বিঃ ৪।১১-১২ )

অর্থাৎ—প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ, তাহা হইতে ভজনক্রিয়া, তাহা হইতে অনর্থনিবৃত্তি, পরে নিষ্ঠা, তাহা হইতে রুচি ও আসক্তি—এই পর্যন্ত সাধন-ভক্তি ; তাহা হইতে ক্রমশঃ ‘ভাব’, অবশেষে ‘প্রেম’ উদ্ভিত হয় । সাধকদিগের প্রেমোদয়ের এই ক্রম জানিবে ।

প্রেম কাহাকে বলে ? রতি বা ভাবের গাঢ়তর অবস্থার নামই হইল ‘প্রেম’ ; অথবা ভাবরূপী পুষ্প যথাসময়ে পরিপুষ্ট হইয়া প্রেম-ফলরূপে আত্মপ্রকাশ করে ।

সম্যগ্‌হৃদিতস্বাস্তো মমত্বাতিশয়াক্তিতঃ ।

ভাবঃ স এব সাদ্ভাত্মা বৃধৈঃ প্রেমা নিগচ্ছতে ॥

( ভঃ রঃ সিঃ পুঃ বিঃ ৪।১ )

অর্থাৎ—ভাব যখন চিত্তকে সম্যকরূপে মগ্‌ন করিয়া অত্যন্ত মমতাব্যায় পরিচিত হয় এবং স্বয়ং গাঢ়স্বরূপ হয়, তখনই পণ্ডিতগণ তাহাকে ‘প্রেম’ বলিয়া উক্তি করেন । ( ক্রমশঃ )

—শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরত্ন

## শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৪ পৃষ্ঠার পর ]

আমি কিছু করতে পারি না, আমার কিছু করার বাহাহুরি নেই। সব বাহাহুরি ঠাকুরের। তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই ভোগের উপরে অমৃতদৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা ঠাকুরের খাওয়ার অযোগ্য। তাহলে বাহাহুরিটা কার? বাহাহুরিটা ঠাকুরের থেকে গেল, আমারটা পরে। আমি কিছু অহুনয়-বিনয় করতে পারি। সে অহুনয়-বিনয় যদি অন্তর থেকে হয় তবে ঠাকুর আমার হাতে থাকেন। নইলে চূপ করে বসে থাকবেন।

একজন মায়াবাদী সন্ন্যাসী কিছুতেই মহাপ্রসাদে বিশ্বাস করতেন না। একদা তিনি পুরীতে গিয়েছেন এবং এক ধর্মশালায় উঠেছেন। কি জানি, জগন্নাথদেবের তাঁর পরে রূপা হয়েছে। বড় পাণ্ডাকে স্বপ্ন দিয়েছেন, আদেশ করেছেন—ওই সন্ন্যাসীকে ভোগের সময় এখানে নিয়ে আসবে। মন্দিরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন সেই সন্ন্যাসীকে। এদিকে জগন্নাথদেবের ভোগ নিবেদন হয়ে গেছে। তখন সন্ন্যাসী দেখেছেন—লক্ষ্মীদেবী নেমে এসেছেন। এসে পরিবেশন করছেন। জগন্নাথ, বলদেব খেলেন। তারপরে লক্ষ্মীদেবী খাচ্ছেন। খাওয়া-দাওয়ার পর যখন আচমন দিয়েছেন তখন লক্ষ্মীদেবীর হাতে অনেকগুলি স্বর্ণাঙ্গুরী (সোনার আংটা) ছিল, সেই অঙ্গুরীগুলো ঠক ঠক করে হাঁড়ির মধ্যে পড়ে গিয়েছে। সন্ন্যাসী তা সব দেখলেন এবং দেখে অজ্ঞান। তারপরে পূজারী ঠেকে ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্মশালায় পৌঁছে দিয়ে এলেন। প্রসাদ চলে গেছে তাঁর কাছে। আপনি প্রসাদ পাবেন? বললেন,—হ্যাঁ, আমি প্রসাদ পাব। এর আগে পর্যন্ত কোনদিন তিনি প্রসাদ পেতেন না, প্রসাদে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তিনি খুব কান্নাকাটি করতে লাগলেন এবং বললেন—হ্যাঁ, সত্যিই ঠাকুর খায়। আমাকে ভগবান্ করুণা করেছেন, তাই আমাকে ভগবান্ এখানে নিয়ে এসে করুণা করে সাক্ষাৎ দেখিয়ে দিলেন যে দেখ, আমি খাই। ভগবান্ কার পরে কিরকম করুণা করবেন, তা কে বলতে পারে?

কুকুরস্ত মুখাদ্ভ্রষ্টং তদন্নং পততে যদি।

ব্রাহ্মণেহপি ভোক্তব্যং সর্বপাপাপনোদনম্ ॥

ব্রহ্মবনির্বিকারং হি যথা বিযুক্ত্তৈব তৎ।

বিকারং যে প্রকুর্বন্তি ভক্ষণে তদ্বিজাতয়ঃ ॥

কুষ্ঠব্যাদি সমায়ুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জিতাঃ।

নিরয়ং যাস্তি তে বিপ্রা যস্মান্নাবর্ততে পুনঃ ॥

নৈবেদ্যং জগদীশস্ত অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ ।

ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদুৎক্ষেপে দ্বিজাঃ ॥

কথাগুলো বলা আছে শাস্ত্রে । অন্ন পুণ্যবান্ ব্যক্তির চারটে জিনিষে বিশ্বাস হয় না । আমরা প্রত্যেকদিন প্রসাদ পাওয়ার সময় জয়ধ্বনি দিয়ে থাকি,—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে ।

অন্নপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥

চারটে জিনিষ হল—মহাপ্রসাদে অবিশ্বাস, গোবিন্দে অবিশ্বাস, নামব্রহ্মে অবিশ্বাস এবং বৈষ্ণবে অবিশ্বাস । অন্ন পুণ্যবান্ ব্যক্তি—যাদের স্মৃতি কম আছে তাদের এই চার জিনিষে বিশ্বাস হবে না । আর যাদের একটু স্মৃতি জোরদার আছে, তাদের এতে বিশ্বাস হবে । মানুষ সংসারে সেই পর্য্যন্তই প্রাকৃত কর্মে আসক্ত থাকে যতদিন পর্য্যন্ত গোবিন্দের শরণাপন্ন না হয় । ততদিন পর্য্যন্ত উন্টোপান্টা করে যায় ।

তাবৎ কর্ম্মণি কুর্ব্বীত ন নির্বিজ্ঞেত যাবত ।

মংকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

আমার কথায় যতদিন তার শ্রদ্ধা না হয়, আমার ভক্তের কথায় যতদিন তার শ্রদ্ধা না আসে, ততদিন মানুষ কর্ম্মমার্গে বিচরণ করে এই সংসারে পাপ-পুণ্য, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি করে । তার থেকে ভাল কথা কিছু শেখেনি, গুনল না, বুঝল না ।

মা যশোমতীর এখানে সংশয় হচ্ছে । তাঁর সংশয়ের কোন কারণ নেই । ঈশ্বর ভাগ্যের প্রশংসা করছেন স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ভাগবতে, তাঁর আবার কিসের সংশয় ?

নন্দঃ কিমকরোদ্ধক্ষন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্ ।

যশোদা চ মহাভাগা পর্পো যন্তাঃ স্তনং হরিঃ ॥

শ্রুতিমপরে স্থিতিমিতরে ভারতমস্ত্রে ভজন্তু ভব-ভীতাঃ ।

অহমিহ নন্দং বন্দে যশ্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥

নন্দমহারাজ এবং যশোদাদেবী এমন কি কাজ করেছিলেন যে শ্রীহরি তাঁর স্তনপান করেছিলেন । নন্দমহারাজ এমন কি কাজ করেছিলেন ঈশ্বর অলিন্দে ( বারান্দায় ) কৃষ্ণ হায়াগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছেন । ভবভীত মানবগণ কেউ শ্রুতির উপাসনা করুন, কেউ স্থিতির উপাসনা করুন, কেউ মহাতারতের উপাসনা করুন, আমার গুণস্বরূপের নেই, আমি নন্দ মহারাজকে বন্দনা করি । নন্দ মহারাজকে বন্দনা করার সময় কি মা যশোদা বাদ গেছেন ?—নিশ্চয় নয়, মা যশোমতী সঙ্গে

আছেন। ‘যন্তালিন্দে পরং ব্রহ্ম’—যাঁর অলিন্দে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছেন পরম-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। কেন এ কথা? ভগবানকে বন্দনা করলেন না, বন্দনা করলেন ভগবানের পিতা-মাতাকে। কেন?—কৃষ্ণের মাতাপিতাকে বন্দনা করলে কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে—কথাটা এই। তথ্য, তত্ত্বসিদ্ধান্ত। কথায় বলে—‘কান টানলে মাথা আসে।’ ‘বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।’ এখানে গুরু-বৈষ্ণব যেমন **Medium** ঠিক তেমন মা যশোদা আর নন্দমহারাজ **Medium**। এঁদের দুজনকে ধরলে আমরা কৃষ্ণকে পেতে পারি—এমন কথা বলছেন। এটাও বুঝতে হবে।

নন্দমহারাজ এমন কি সৌভাগ্য করেছেন, মা যশোদা এমন কি সৌভাগ্য করেছেন! ব্যাপারটা কি? এঁদের আবার ভুল বুঝাবুঝি আছে না কি কিছু ভগবান্ সন্দেহ?—নাই কিছু। তাঁদের অধিকারটা ত’ বিচার করছেন ভাগবত।

নেমং বিরিক্ষো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গনংশ্রয়া।

প্রসাদং লেভিরে গোপী যন্তং প্রাপ বিমুক্তিদাং ॥

‘লেভিরে গোপী’ অর্থে এখানে মা যশোদা। ইনি যে সৌভাগ্য লাভ করেছেন সেই সৌভাগ্যের কা কথা, সেই সৌভাগ্য কেউ পায়নি। ব্রহ্মা নন, শিব নন, এমন কি ভগবানের অঙ্কশায়িনী লক্ষ্মীদেবীও নন। এই সৌভাগ্য হয়েছে মা যশোদার—এগুলো বর্ণনা আছে। তাহলে সেই যে তত্ত্ববস্ত্ত তাঁদের ত’ কোন ভুল বুঝাবুঝি নেই। তাঁর কি কোন প্রাকৃত অহমিকা আছে?—নেই। কিন্তু মনটা খারাপ করেছেন নিজের ছেলেকে বাঁধতে পারেন নি বলে। গোপীরা ঠাট্টা করতে লাগল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার ছেলেকে তুমি বাঁধতে পার না, তুমি কত বাহাহুর তা বুঝা গেছে। মা যশোদা তাদের সঙ্গে একটু হাসলেন বটে কিন্তু ভিতরে ভিতরে চিন্তা হচ্ছে আমি আমার ছেলেকে বাঁধতে পারছি না কেন? আসলে ছেলে যে স্বয়ং ভগবান্ তা তুমি বিগুহ বাৎসল্য প্রেমে বুঝতে পারছ না তাঁর ভগবত্ত্ব। যদি বিগুহ বাৎসল্যপ্রেম না হত তাহলে কিছুটা বুঝতে তাঁর ভগবত্ত্ব। তাহলে হাত জোড় করতে। কিন্তু হাত জোড় যখন করছ না তখন বুঝতে হবে অন্ম ব্যাপার। তুমি বিচারে অনেক উপরে আছ। ঐশ্বর্য্যশিখিল প্রেম—এখানে বাৎসল্য যেটা মেটা স্থান পাচ্ছে না। সুতরাং মা যশোদা ভগবান্ বলে মনে করতে পারছেন না। মা যশোদার আর মাতৃত্ব থাকে না, নন্দমহারাজের ভিতরেও পিতৃত্ব ভাব থাকে না যদি তাঁদের ভিতরে ঐশ্বর্য্যভাব এসে যায়। বহুদেব-দেবকীর যে ঐশ্বর্য্যভাব সেই ঐশ্বর্য্যভাব নন্দ-যশোদার মধ্যে নেই। বহুদেব-দেবকী বহুবার হাতজোড় করেছেন নারায়ণরূপী কৃষ্ণের কাছে, বলরামের কাছে। কিন্তু মা যশোদার এমন কোন ইতিহাস নেই যেখানে তিনি হাতজোড়

করেছেন কৃষ্ণ-বলরামের কাছে। বরং আমার ছেলে হয়ে এসেছ যখন তখন দুষ্টমি করলে, অত্যাচার করলে আমি ধরে মারব, পেটাব—এই ভাব। এটা হল বিসৃদ্ধ বাৎসল্য প্রেমের স্বভাব।

সেই ভগবান্ ভক্তির দ্বারাই বশীকৃত। তাতেও বস্তুতঃ পূর্বের অর্থই পর্যাবসিত হচ্ছে। তৎসম্বন্ধে ( ভাঃ ১০।৯।১৮-২১ শ্লোক ) যথা—“(মাতা যশোদা কৃষ্ণকে বন্ধনকালে) পুনঃ পুনঃ রজ্জু যোজনা দি পরিশ্রমে তাঁর শরীর ঘর্ম্মাক্ত এবং কেশ-বন্ধনস্থিত মালা স্থলিত হচ্ছিল। বালক শ্রীকৃষ্ণ তখন মাতাকে পরিশ্রান্ত দেখে কৃপাপূর্বক স্বয়ং বন্ধন স্বীকার করলেন। ‘কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে’র অর্থ হল এই—তিনি কৃপা করে নিজে বন্ধন স্বীকার করলেন। ভগবান্ ধরা না দিলে আমরা তাঁকে কিছুতেই পেতে পারি না, তাঁর কৃপালাভ করতে পারি না। তিনি যদি কৃপা করেন তাহলে আমাদের সকল প্রচেষ্টা সফল হবে। কিন্তু চেষ্টা দরকার। আমি চুপ করে বসে থাকব, ভগবান্ এসে সব করে দেবেন, তা হবে না। ভগবান্ চেষ্টা দেখতে চান। চেষ্টাযুক্ত লোককে, সাধন-ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তিকে ভগবান্ কৃপা করেন। অলসকে সাহায্য করেন না।

বাচ্চা বয়সে একটা গল্প পড়েছিলাম। আপনারাও হয়তো পড়েছেন। গল্পটার নাম হল ‘Hercules and the wood cutter’। শ্রমদেবতার নাম হল Hercules। পাড়াগাঁয়ের একজনের একটা গরুর গাড়ী আছে। সে বন থেকে কাঠ কেটে এনে বাজারে বিক্রী করত। একদিন গাড়ীতে এত কাঠ চাপিয়েছে যে বলদগুলো আর টানতে পারছে না। তার উপর রাস্তা কাদা। কাদার মধ্যে গাড়ীর চাকা বসে গেছে। আর উঠছে না কিছুতেই। বলদ দুটোকে খুব মারছে। বলদদুটো টানতে পারছে না, শুয়ে পড়ছে। তখন তা দেখে লোকটা কান্নাকাটি শুরু করে দিল। শ্রমদেবতা Hercules তখন এসে গেছেন। কাদছ কেন? আমার এই গাড়ী উঠছে না। গাড়ী উঠানোর চেষ্টা করেছ? “Just put your shoulder to the wheel”—চাকায় কাঁধ লাগাও, চাকা মারো। যখন চাকা মারছে কাঁধ দিয়ে তখন শ্রমদেবতা গাড়ীটা স্পর্শ করে আছেন অর্থাৎ শক্তিসঞ্চার করছেন। হড়্ হড়্ করে গাড়ী উঠে গেল।

ভগবান্ শক্তিসঞ্চার করেন। যে চেষ্টা করে, সাধন-ভজন করে, তাকে সাহায্য করেন—‘এতদ্ভূতং মম’—এটা তাঁর ব্রত বলছেন। যে চেষ্টা করে, সাধন-ভজন করে, তাকে সাহায্য করা আমার বিশেষ সদৃশ। ও গুণ আমি ছাড়তে পারি না। ‘অল্প সেবা বহু করি মানি।’—ভগবানের বিশেষ স্বভাব। ভক্তেরও

এ স্বভাব রয়েছে। সামান্য কিছু করেছে, বলছেন যথেষ্ট হয়েছে, ভুরি ভুরি। আবার ‘ভুরিদ’ হলেন ভগবান্। ভগবানের ভক্তও ভুরিদ। ভগবানের বিশেষণ ভক্ত পায়। একথা নিয়ে বর্তমানে আলোচনা হয়, আমার কাণেও মাঝে মাঝে আসে। “কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে।”—এর অর্থ কি? ভগবানের যত গুণ সব গুণ ভক্তের মধ্যে এসে যায় **compulsory**? ভগবান্ পূর্ণ, তাঁর গুণও পূর্ণ। তাহলে ভক্তের মধ্যে কি গুণ সব পূর্ণরূপে আসে?—জীবাত্মা অণুচৈতন্য, ভগবান্ বৃহচ্চৈতন্য। অণুচৈতন্য জীবে ভগবানের যে পরিমাণ গুণ তা সেই পরিমাণে আসবে—এটা কি রকম কথা! তাহলে ত’ জীবের জীবত্ব থাকে না। জীব তখন ভগবান্ হয়ে যান। এটা জীবব্রহ্মৈক-বাদের বিচার, নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদীর বিচার। তা ত’ নয়। সেখানে সেবাভাব, সেবকভাব পৃথক্ পৃথক্ থাকবে। ‘নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিতা’,—এটাই হল **Theory**—সিদ্ধান্ত। ( **ক্রমশঃ** )

## পাশ্চাত্যে শ্রীমন্নহাপ্রভুর প্রেমধর্ম-প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহ-সভাপতি এবং সাধারণ-সম্পাদক ব্রিহত্তিস্বামী শ্রীমন্ত্বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ গত ২২।১।২৭ তারিখে দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে শ্রীমন্নহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া মালয়েশিয়া অষ্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন স্থানে বিপুলভাবে প্রচার করিয়া গত ৮।৩।২৭ তারিখে এ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ২২।১।২৭ হইতে ২৯।১।২৭ তারিখ পর্যন্ত মালয়েশিয়া, ৩০।১।২৭ হইতে ২০।২।২৭ পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া, ২১।২।২৭ হইতে ২৭।২।২৭ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া এবং ২৮।২।২৭ হইতে ৭।৩।২৭ পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে প্রচারকার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

মালয়েশিয়া সম্বন্ধে শ্রীল মহারাজজী বলেন,—এশিয়া মহাদেশের যে অঞ্চলে মলয় চন্দন উৎপন্ন হইত, সেই স্থানের নামই মলয় পর্বত বা মালয়েশিয়া। পূর্বে কলিঙ্গরাজ ( উড়িষ্যার রাজা ) শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার জন্ত এই স্থান হইতে মলয় চন্দন লইয়া যাইতেন। এই পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়া তথাকার বয়স্ক ব্যক্তিগণ বলেন,—আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়াছি। কলিঙ্গরাজের নামানুসারে এখানে ‘কলঙ্গ স্ট্রীট’ অত্যাপিও তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কিন্তু বর্তমানে বায়বহুল চন্দনের পরিবর্তে লাভজনক রাবারের চাষ হইতেছে। এখানে শ্রীধাম নবদ্বীপ ও শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলের সমন্বয়

প্রকৃতিতে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। বৃক্ষ, লতা, ফল-ফুল, পশু-পক্ষী প্রভৃতি শ্রীগৌড়মণ্ডল ও শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলের গ্রায়ই। সারাদিন কোকিলের সুমধুর কুহু-ধ্বনি এখানে শুনিতে পাওয়া যায়।

মালয়েশিয়াতে সপ্তাহব্যাপী প্রচারে ‘অগ্নাভিলাষিতাশূন্যম্’ শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে কর্ম, জ্ঞানের অবরতা, হেয়তা প্রতিপাদনপূর্বক কৃষ্ণানুকূল অম্বুশীলনই যে উত্তমা ভক্তি, তাহা জানান। জীবের দুর্গতি ও সদগতি সম্বন্ধে ‘Law of Gravitation’ এর আলোচনা করেন শ্রীল মহারাজজী। পরবর্তিতে সম্পূর্ণ প্রচার-সংবাদ প্রকাশিত হইবে।

প্রচারান্তে ৮/৩/৩৭ তারিখে শ্রীল মহারাজজী সিঙ্গাপুর হইতে কলিকাতাস্থ শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠে শুভাগমন করিলে শ্রীসমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। উক্ত অভিনন্দন-বার্তার প্রতিলিপি (বাংলা ও ইংরাজী) প্রকাশিত হইল।—

**শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ( রেজিঃ )র সহ-সভাপতি পরিত্রাজকাচার্য্য  
ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের  
প্রাচ্যে শ্রীগৌরবাণী প্রচারান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে**

## আন্তরিক অভিনন্দন

হে দীনবৎসল ! মালয়েশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও সিঙ্গাপুর প্রমুখ প্রাচ্য দেশসমূহে শ্রীগৌরবাণীর বিপুল প্রচারান্তে আপনার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে আপনাকে জানাইতেছি আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আপনার এইরূপ প্রচার-ভ্রমণ সাধারণ প্রমোদ-ভ্রমণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। “মহাস্তরের স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ কার্য্য নাই তবু যান পরঘর ॥”—ইহাই সাধুগণের প্রচার যাত্রার একমাত্র কারণ। ‘সাধবো দীনবৎসলাঃ’—দীনবৎসল, পরহুঃখহুঃখী সাধুগণ জীবের ভগবদ্বিস্মৃতি-হেতু তাহাদের অশেষ দুর্গতি দেখিয়া তাহাদের প্রতি স্বাভাবিকরূপে দয়াদ্রুচিত হন। তাহাদের প্রতি সাধারণ পরাধিতার প্রকাশ না ঘটাইয়া পরম-করুণ সাধুগণ তাহাদিগকে আত্মধর্ম্মে উদ্ধার করেন।

হে কেশবানুগজন ! আপনি পরমারাধ্যতম জগদগুরু শ্রীশ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুর মনোহীষ্ট পূরণার্থে স্বীয় স্বহৃৎ-থের প্রতি দৃকপাত না করিয়াই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বার্তা প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। তজ্জগৎ আপনি অশেষ ধন্যবাদার্থ। “জগৎ ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্য-খ্যাতি। স্বধী হইয়া লোক

মোর গাহিবেক কীর্তি ॥” শ্রীগৌরহুন্দের স্বীয় ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থক রূপায়ণ-কল্পে তদন্তুগত ভক্তগণের হৃদয়ে প্রেরণা ও সামর্থ্যের সঞ্চার করেন। নতুবা বার্কাকোর বাধা অতিক্রম করিয়া অনিশ্চিত শারীরিক-অবস্থায় এরূপ দোদাঁড়প্রতাপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের বাণী প্রচার সম্ভব হইত না।

**হে বৈকুণ্ঠ বার্তাবাহক !** বিশ্বব্যাপী গোড়ীয় মঠ-মিশনের মূল প্রতিষ্ঠাতা জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ নিজকে শ্রীচৈতন্য-বাণীর পিণ্ডন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যবাণীর ধারণ, বহন ও যথাযথ পরিবেশনই গোড়ীয় প্রচারকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাঁহারা কোন স্থবিধা আদায় করিয়া লইতে কিংবা স্বীয় দুর্বলতা প্রকাশিত হইয়া যাইবার ভয়ে অথবা নিজ প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধিকল্পে শ্রোতবাণীর পরিবর্তন, পরিবর্জন, কিংবা কোন কষ্ট-কলনায় নিযুক্ত হন না। অকৈতব গৌর-সারস্বত বাণীর অবিকৃতরূপেই প্রচারে আপনার অনমনীয়তায় সকল কেশবীয়গণ অত্যন্ত আনন্দিত।

**হে প্রাচ্য-প্রতীচ্য-বিজয়িন্ !** বিশ্বস্তর শ্রীগৌরচন্দ্র প্রেমবন্তার প্রাবনের দ্বারা সমগ্র বিশ্ব-ভরণের যে সূত্র রাখিয়া গিয়াছেন, উহা অল্পসরণ করিয়াই আপনার প্রাচ্য-প্রতীচ্য বিজয়। ইতঃপূর্বে অনেক ভারতীয়ই কর্ম, জ্ঞানের কথা লইয়া মহাসাগর অতিক্রম করিয়াছেন। কর্মবীর নায়কগণের কর্মের আহ্বান নিত্যশান্তির ছলনা মাত্র। নির্কিশেষ-জ্ঞানের আলোচনায় বস্তু-সত্তাকে স্তব্ব করিয়া ভূত্বের নিবৃত্তিতেই শান্তির ভ্রম বহমানিত। কিন্তু কেবলমাত্র নিত্যসেবা শ্রীভগবানের প্রতি নিত্য সেবক জীবের অহৈতুক-সেবার ভূমিকায়ই পঞ্চম পুরুষার্থ—কৃষ্ণপ্রেম অন্তর্নিহিত। আপনি সেই প্রেম-প্রয়োজন বাণীদ্বারাই তদ্দেশবাসিগণকে নূতন আলোক প্রদানের মাধ্যমে তাঁহাদিগকে জয় করিয়াছেন। ইহাতে সকল গৌরভক্তবৃন্দ আনন্দে আপ্লুত।

**হে পরোপকারিন্ !** “ভারত-ভূমিতে হৈল মহুয়া জন্ম যার। জন্ম সার্থক করি’ কর পর-উপকার ॥” ভারতভূমিই পরোপকারিত্বের প্রস্তুতিসদন। এস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভারতবাসিগণকেই পরোপকারের অধিকার প্রদান করিয়াছেন। ‘পর’ অর্থাৎ যাহা শ্রেষ্ঠ—সুতরাং শ্রীগৌরহুন্দের মনোহরীষ্ট স্থাপনকারী শ্রীরূপগোস্বামীর আত্মগোচ্যেই শ্রেষ্ঠ-উপকারের নির্দেশ উহাতে ব্যক্ত। শ্রীরূপপ্রভু ও তদন্তুগজন ভূতলে শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীর গুহ্যতম তত্ত্ব ও সেবা প্রকাশ করিয়া যে পরোপকারিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন, আপনি তাঁহারই যথার্থ উদ্ঘোষক।

**হে আন্মায় বাণী প্রচারকবর !** পাশ্চাত্যবাসিগণকে পরোপকারী



ভারতবাসিগণের বহু কিছু দান করিবার আছে, কিন্তু তাঁহাদিগের নিকট হইতে লইবার কিছুই নাই। সর্ব্বেশ্বরের ভক্তগণের জাগতিক কোন অভাব নাই—যাহা পূরণ করিতে পাশ্চাত্যবাসিগণের মুখাপেক্ষি হইতে হইবে। ‘সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম’—বাক্যানুসারে সমগ্র জগৎই ভগবৎ-সেবক ও সেবোপকরণ—ইহাতে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া পাশ্চাত্য ভক্ত সম্প্রদায় স্বীয় লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা হারাইবার আশঙ্কায় আপনার গৌরবাণী-প্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছেন। “করীন্দ্রে ভ্রাজমানেন্ধি স্তূয়মানে সুপুরুষৈঃ। বুদ্ধন্তি সারমেয়াশ্চ কা ক্ষতিস্তস্য জায়তে ॥” সুবিজ্ঞগণ আপনার আয়ায় বাণী প্রচারের মর্ম্ম ও উদ্দেশ্যে উদ্দীপিত হওয়ায় উহাদের শোরগোল নিষ্ফল হইতেছে। পরিশেষে আপনি দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য লাভ করিয়া শ্রীব্রহ্ম-মাদ্ব-গৌড়ীয়-সারস্বত-সম্প্রদায়ের শাস্ত্র বাণী যথাযথরূপে সমগ্র বিশ্বে প্রচার করুন—ইহাই শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারী, শ্রীগিরিরাজ, শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহদেবের চরণে সকাঙ্ক্ষ প্রার্থনা। ইতি—

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ

শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদ্যম—

কলিকাতা-৪

শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

২৫শে ফাল্গুন, ১৪০৩ ( ৫ই মার্চ, ১৯৯৭ )

## CORDIAL RECEPTION

To His Holiness Paribrajacharyya Tridandi Swami  
SHRI SHRIMAD BHAKTI VEDANTA NARAYAN  
MAHARAJ

Revered Swamiji !

My heartiest congratulations to you at your happy return to India after completion of your successful preaching tour to Malaysia, Australia, Indonesia and Singapore. Few months ago, you had to pay visit to the West in response to the calls of the devotees at Holland, England, America and Canada. Your preaching tour is far different from that of excursion made by the people for sensual pleasure or that of loitering about by worthless vagabonds. It is because, the Vaishnavas are causelessly merciful to all enfeathered souls and alone grieved by their misery—misery due to indifference towards The Transcendental Truth. Inspite of having no

business of their own, they roam about to relieve humanity from the terrible afflictions of births and rebirths.

Shrila Vrindavan Das Thakur left us an invaluable prediction made by Shri Chaitanya Mahaprabhu, the Original Fountain-Head that His Name would be introduced in every village and town on the earth. And again Shrila Sachchidananda Bhakti Vinode Thakur, the greatest pioneer of the pure unalloyed Devotion in the modern age, professed that the movement of pure devotion would very soon be broadcast all over the world by a specially empowered individual. This prophecy is found to be fulfilled in the Divine Personage of Shrimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupad, who at that time moved heaven and earth to establish pure theism in large scale. He time and again employed his Gaudiya-expounders of extraordinary merit to dispel all nescience prevailing on the lands of Eastern and Western hemisphere. Shri Shrimad Bhakti Prajnan Keshav Goswami Maharaj, the most affectionate disciple of Srila Saraswati Prabhupad, had founded the world-reputed Shri Gaudiya Vedanta Samiti to preserve Shri Chaitanya Mahaprabhu's message of unflinching devotion. Knowing his inner desire, You stepped forward to carry the responsibility of conveying the Gaudiya-Vedanta expositions beyond the seas, ignoring the bondage of your old age. Such is your benevolence.

India has always been the homeland of Spiritual movement. In times like the present, when the minds of men were distracted by multiplicity of material considerations, it has become the utmost necessity for the mankind to be spiritually awakened. No other doctrine can really bring eternal bliss to the distressed souls but the Divine Message of Love, propounded by Shri Chaitanya Deva, Who has appointed Shrila Swarup Damodar Goswami and Shrila Rup Goswami as the Original Apostle. You being the worthy messenger of them, would certainly be successful in imparting the true spirit of their teachings to fallible beings by the Divine Grace of Shri Guru-Gour-Radha-Binodebehari, Shri Lakshmi-Varaha-Nrisinghadev. I earnestly pray to Them, so that you remain hale and hearty and be blessed with long life to broadcast the Sublime Message of Shri Chaitanya Mahaprabhu all the world over.

Amen.

Shri Binode Behari Goudiya Math,

28 Halder Bagan Lane,

Calcutta-700004

9th March, 1997.

Vaishnav-Dasanudas—

Tridandi-Bhikshu

BHAKTI VEDANTA BAMAN

# শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

আগুন! আগুন! আগুন! চারিদিকে শুধু আগুন! বিশ্বময় শুধু কামনার আগুন, ক্রোধের আগুন, লোভের আগুন, হিংসার আগুনের দেদীপ্যমান লেলিহান শিখা! আগুনে বৎসর, আগুনে আসাম, আগুনে বিহার, আগুনে উড়িষ্যা, আগুনে রাজধানী, আগুনে বইমেলা, আগুনে বারিপদায় শান্তির বারি বহন করিয়া অবশেষে ফাল্গুন উপস্থিত হইল। পরমপিতার আগমনী বার্তা পাইয়া অস্থখ বৃক্ষ, দেবদারু বৃক্ষগুলি মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাদের পুরাতন, জীর্ণ পত্র, পুষ্প, বকলগুলি ঝরাইয়া ফেলিয়া, নবীন পত্র-পুষ্পের পোষাকে স্নসজ্জিত হইয়া, সমস্ত প্রকৃতি যেন আরতি করিয়া—রাজ্যধিরাজকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে লাগিল।

দোলযাত্রা আসিল। বারো মাসে তের পার্কণের ঞায় ইহা একটা সাধারণ পার্কণ বিশেষ মাত্র নহে; পরন্তু সর্বৈশ্বরেশ্বর স্বয়ং অবতারীর—কলিহত জীবের পরিত্রাণের জ্ঞাত করণায় অবতীর্ণ হওয়া। স্কন্দপুরাণেও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত জীব-জগৎও তাই সমস্ত পাপ-কালিমা, কলিকল্মষ নাশ করিয়া, সমস্ত বিভেদ ভুলিয়া হৃদয়কে প্রীতি ও মোহাদ্যের রঙীন আবির রাঙাইয়া, নবীন, নির্মল আনন্দে মাতিয়া উঠিবার আরও এক স্বেচ্ছা লাভ করে। সেই স্বেচ্ছাগের সন্ধ্যাবহার করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হইতে শাধুসঙ্গ-লাভী স্বেচ্ছাগণ চরম শান্তি ও পরম মঙ্গল-লাভোদ্দেশ্যে নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে অগ্ৰাণ্ণ বৎসরের ঞায় এ বৎসরও যথাকালে আসিয়া উপস্থিত হন।

অগ্ৰাণ্ণ বৎসরের তুলনায় এ বৎসর যাত্রীসংখ্যা অনেক বেশী ছিল। আমাদের সমিতির সহ-সভাপতি ও শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক ত্রিদিগ্‌ন্বামী শ্রীমন্তক্‌তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ এই বৎসর প্রচারোদ্দেশ্যে এশিয়া, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও ইউরোপ মহাদেশে ভ্রমণ করিয়া আসিলেন। তাহার অনিবার্য ফলস্বরূপ তত্তৎ মহাদেশ হইতে শ্রী মহারাজের রূপাধি প্রচুর বিদেশী ভক্ত সমাগম হইয়াছিল।

গত ৪ঠা চৈত্র ( ইং ১৮।৩।২৭ ), মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রী ভক্তিশ্রদ্ধা কেশব গোস্বামী মহারাজাহুগৃহীত সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদিগ্‌ন্বামী ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তক্‌তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আহুগতো, সহ-সভাপতি ত্রিদিগ্‌ন্বামী শ্রীমন্তক্‌তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় এবং শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক—ত্রিদিগ্‌ন্বামী শ্রীমন্তক্‌তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের সহৃদয় উপস্থিতিতে বিপুল সংখ্যক সন্ন্যাসী, মঠবাসী ও গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ প্রচুর উৎসাহ ও উদ্বীপনার সহিত শ্রীমঠে শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার

সঞ্চল গ্রহণ করেন। পরিক্রমা সূষ্ঠভাবে পরিচালনা করিবার জন্ত যোগ্যতাভ্যায়ী প্রায় সকলেই কিছু কিছু সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এই বৎসর পরিক্রমার প্রথম দিবসে একাদশীর উপবাস থাকায় অল্পাধীন-সুচারি সামান্য পরিবর্তন করিতে হয়। ৫ই চৈত্র (ইং ১৯৩৯) বুধবার অতি প্রত্যুষে শ্রীশচীনন্দনের বিজয়বিগ্রহ সুসজ্জিত পাঙ্কীতে লইয়া বিশাল পরিক্রমামণ্ডলী সঙ্কীৰ্ত্তনমুখে শ্রীমঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। শ্রীকোলদ্বীপস্থ প্রৌঢ়ামায়াস্থান—পোড়ামাতলা, বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধিস্থল দর্শনপূর্বক নিদয়ার ঘাটে উপস্থিত হইয়া তথায় প্রচুর হরিকথা পরিবেশন, গঙ্গান্নান ও তথা হইতে শ্রীকদ্রদীপ ও শ্রীযোগপীঠের উদ্দেশে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করা হয়। সন্ধ্যায় সহ-সভাপতি মহারাজের বিশ্বব্যাপী প্রচারের জন্ত এক বিশেষ বর্ণাঢ্য অল্পাধীন-মাধ্যমে তাঁহাকে বিপুল সঞ্চরনা স্তাপন করা হয়।

৬ই চৈত্র (ইং ২০।৩।৩৯), বৃহস্পতিবার গঙ্গা অতিক্রম করিয়া শ্রীগোক্রম কানন স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রূপালাভোদ্দেশে পরিক্রমা-মণ্ডলী প্রবেশ করেন। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের পুত্র জীবনচরিত ও তাঁহার অপাখিব অবদান কীর্তনান্তে তাঁহার রূপাভিষ্কাপূর্বক শ্রীহরিরহস্যে ও সুবর্ণাবহার পরিক্রমা করিয়া সকলে শ্রীশ্রীসিংহদেবের পাদপীঠ শ্রীসিংহপল্লীতে উপস্থিত হন। অসংখ্য ধামবাসী ও পরিক্রমাকারী ভক্তগণ এইস্থানে মহাপ্রসাদ সেবনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করেন। সন্ধ্যায় শ্রীল আচার্যদেবের সভাপতিত্বে ত্রিদিগুসন্ন্যাসিগণ ও বৈষ্ণবগণ ধাম-পরিক্রমার উদ্দেশ্য, বিধি-নিষেধ ও ধামতত্ত্ব সংক্ষেপে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-সম্মত ও সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদানপূর্বক উপস্থিত সকলকে চমৎকৃত করেন।

৭ই চৈত্র (ইং ২১।৩।৩৯), শুক্রবার শ্রীকোলদ্বীপস্থ সমুদ্রগড়ে রাজা সমুদ্রসেন ও ভীমসেনের উৎকর্ষতা প্রদর্শন করত যথাক্রমে শ্রীল সহ-সভাপতি মহারাজ এবং শ্রীপত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক মহারাজ অত্যাগ বৎসরের ছায় যথারীতি কপট বাগ্যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া উপস্থিত সকলকে নির্মল আনন্দে আপ্লব্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর অপ্রাকৃত কবি শ্রীল জয়দেবের পদাঙ্কধরা টাপাহাটি পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-গদাধর দর্শন করিয়া যাত্রিগণ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করেন। সন্ধ্যায় যথারীতি শ্রীগৌরজন্মের অবদান সম্পর্কে অতুলনীয় হরিকথা পরিবেশিত হয়।

৮ই চৈত্র (ইং ২২।৩।৩৯), শনিবার শ্রীকদ্রদ্বীপান্তর্গত রাধাকুণ্ডট, শ্রীজহ্নুদ্বীপান্তর্গত বিহানগর—শ্রীল সার্বভৌমের শ্রীপাট, শ্রীজহ্নুম্নির অবলুপ্ত আশ্রম এবং শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট পরিক্রমা সূষ্ঠভাবেই সম্পন্ন হয়।

৯ই চৈত্র (ইং ২৩।৩।৩৯), রবিবার অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্নহাপ্রভু ও

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর প্রথম মিলনস্থলী—শ্রীনন্দনাচার্য্য-ভবন, শ্রীসঙ্কীর্্তন-রাসস্থলী—শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীচৈতন্য-বিনোদ-বাগী-বিগ্রহ জগদগুরু শ্রীশ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, বৈরাগ্য-বিগ্রহ শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির, কংসাংশে অবতীর্ণ শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতি দর্শনাশ্বে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহনুরের আবির্ভাবস্থলী দর্শন, হরিকথা শ্রবণ, কীর্তন ও সর্বসাধারণে খেচরাম মহাপ্রসাদ বিতরণান্তে বাৎসরিক পরিক্রমা সমাপ্ত হয়। কোন এক অজ্ঞাত কারণে শ্রীচৈতন্য মঠ-কর্তৃপক্ষ এ বৎসর শ্রীযোগপীঠে ভক্তগণের প্রসাদ বিতরণের স্থান দিতে অস্বীকার করায়, সেই বিশেষ সঙ্কটের মুহূর্ত্তে শ্রীভক্তিবিনোদ ইনস্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সহায় সহযোগিতায় স্কুল-প্রাঙ্গনে প্রসাদের ব্যবস্থা করায় অবশেষে সেই সমস্যার সমাধান হয়।

১০ই চৈত্র ( ইং ২৪।৩।২৭ ), সোমবার শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির শুভাবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ সমগ্র দিবস যথারীতি শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ করেন। অপরদিকে নিকপটে শুদ্ধভক্তিদ্বারায় অনুপ্রাণিত হরিতভঞ্জেচ্ছ ভক্তগণ অধিকারাহুযায়ী শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। গোধূলিলগ্নে শুভক্ষণে সঙ্কীর্্তনমুখে শ্রীশচীনন্দনের অভিষেক-ক্রিয়া, অর্চন, ভোগরাগ ও আরাট্রিকাদি আরম্ভ করিয়া যথাসময়ে স্তম্পন্ন হয়।

১১ই চৈত্র ( ইং ২৫।৩।২৭ ), মঙ্গলবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব-উপলক্ষে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে শ্রীমঠের মহাপ্রসাদের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই মহোৎসবের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত লক্ষাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও ধামবাসী সকল বৈষ্ণবগণের সর্বপ্রকার আন্তরিক সহানুভূতি ও সহায়তা ব্যতীত এই সুবিশাল যজ্ঞ সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভব নহে। সর্বোপরি মহাবদান্ত শ্রীমন্নহাপ্রভুর অর্হেতুকী করুণা ত' আছেই। তাঁহার অমৃতময়ী করুণাবারি সকলের উপর অঝোর ধারায় বর্ষিত হইয়া বর্ষে বর্ষে শ্রীবৃদ্ধিলাভ করুক ও পরাশান্তি লাভ করুক—ইহাই তাঁহার শ্রীসরণসরোজে একান্ত প্রার্থনা।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি  
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতাব্দী  
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের  
শুভাবির্ভাব-শতবাষিকী

( ১৮৯৮-১৯৯৭ )

বর্তমান বর্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি জগদগুরু  
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের



শুভাবির্ভাব-শতবাষিকী উপলক্ষে বর্ধব্যাপী সমিতির সদস্যগণ বর্তমান সভাপতি  
আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের  
আত্মগতো ও সহ-সভাপতি ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের  
পরিচালনায় বিশেষভাবে হরিকথা প্রচারকার্যে ব্রতী হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে  
সমিতির সকল প্রচারকেন্দ্রে ও বিভিন্ন স্থানে বিশেষ ধর্মসভা ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে  
তাঁহার অতিমর্ত্য চরিত্র ও অবদান-বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা এবং বিভিন্ন ভাষায় পত্র-  
পত্রিকা ( বিশেষ সংখ্যা ) ইত্যাদি প্রকাশিত হইবে। সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম  
নবদ্বীপ হইতে বিশিষ্ট প্রচারকগণ নিম্নলিখিত অনুষ্ঠান-সূচী অনুযায়ী বিভিন্ন  
প্রচারকেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া সভার কার্য পরিচালনা ও নগর-সঙ্কীর্ণনাদি করিবেন।  
উক্ত সভা-সমিতিতে যোগদানের জন্ত তদন্তরাগী ও তদন্তগামী স্থধী ভক্তবৃন্দকে  
আহ্বান জানানো হইতেছে।

## অনুষ্ঠান-সূচী

৩১/৩/২৭—	১৪/২৭ ও ২৪/২৭—
শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে হুগাঁপুরস্থ	নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন ও ধৰ্ম্মসভা
শ্রীকৃষ্ণচরিত্ত গোড়ীয় মঠে শুভবিজয়	
২৭/৪/২৭—	২৮/৪/২৭, ২৯/৪/২৭
শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে শিলিগুড়ি	ও ৩০/৪/২৭—
শ্রীকেশব গোস্বামী গোড়ীয় মঠে	নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন ও ধৰ্ম্মসভা
ও শ্রীশ্যামসুন্দর গোড়ীয় মঠে শুভবিজয়	
১/৫/২৭—	১/৫/২৭ ও ২/৫/২৭—
শিলিগুড়ি হইতে মাথাভাঙ্গা	নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন ও ধৰ্ম্মসভা
( কুচবিহার )	
শ্রীমদনমোহন গোড়ীয় মঠে শুভবিজয়	
৩/৫/২৭—	৩/৫/২৭ ও ৪/৫/২৭—
মাথাভাঙ্গা হইতে কুচবিহার-সহরস্থ	নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন ও ধৰ্ম্মসভা
শ্রীনরোত্তম গোড়ীয় মঠে শুভবিজয়	
৫/৫/২৭—	৫/৫/২৭ ও ৬/৫/২৭—
কুচবিহার হইতে আশামের গোলকগঞ্জস্থ	নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন ও ধৰ্ম্মসভা
শ্রীগোলকগঞ্জ গোড়ীয় মঠে শুভবিজয়	
৭/৫/২৭—	৮/৫/২৭ হইতে ১০/৫/২৭
গোলকগঞ্জ হইতে ধুবড়ী-সহরস্থ	শ্রীনিমানন্দ গোড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির
শ্রীনিমানন্দ গোড়ীয় মঠে শুভবিজয়	ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব
	এবং নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন ও ধৰ্ম্মসভা
১১/৫/২৭—	১১/৫/২৭ ও ১২/৫/২৭
ধুবড়ী হইতে বাঙ্গালীও-সহরস্থ	নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন ও ধৰ্ম্মসভা
শ্রীবাসুদেব গোড়ীয় মঠে শুভবিজয়	
১৩/৫/২৭ তারিখে বাঙ্গালীও হইতে	
নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন ।	

\* পরবর্তী অনুষ্ঠান-সূচী পরে প্রকাশিত হইবে ।

\*\* বিশেষ সংখ্যা পত্র-পত্রিকার জন্ম প্রবন্ধ লেখকগণকে প্রবন্ধ পাঠাইতে  
অনুরোধ জানানো হইতেছে ।

শ্রীশ্রীগুরুগোৱাঙ্গো জয়তঃ

## শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(রেজিষ্টাৰ্ড)

ফোন—৪০০৬৮

শ্রীনিমানন্দ গৌড়ীয় মঠ

গাড়ীখানা ৰোড়, পোঃ বিত্তাপাড়া

ধুবড়ী—৭৮৩৩২৪ (আসাম)

সাদৰ সন্তোষপূৰ্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিৰ প্ৰতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক জগদগুৰু নিত্যলীলাপ্ৰবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্ৰী শ্ৰীমন্তুক্তিপ্ৰভাৱন কেশব গোস্বামী মহাৰাজেৰ শুভানীৰ্বাদে ও সমিতিৰ বৰ্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পৰিব্ৰাজকাচাৰ্য্য শ্ৰীশ্ৰীমন্তুক্তি-বেদান্ত বামন গোস্বামী মহাৰাজেৰ আত্মগত্যে আগামী ২৬শে বৈশাখ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ (ইং ২৫।১২২৭) শুক্ৰবাৰ শ্ৰীসমিতিৰ অন্ততম প্ৰচাৰকেন্দ্ৰ শ্ৰীনিমানন্দ গৌড়ীয় মঠেৰ নবনিৰ্ম্মাণমান শ্ৰীমন্দিৰে শ্ৰীশ্ৰীগোৱ-ৰাধা-বিনোদবিহাৰী জীউৰ শ্ৰীবিগ্রহগণ প্ৰতিষ্ঠিত হইবেন।

এতদুপলক্ষে ২৫শে বৈশাখ (ইং ৮।৫।২৭) বৃহস্পতিবাৰ হইতে ২৭শে বৈশাখ (ইং ১০।৫।২৭) শনিবাৰ পৰ্য্যন্ত দিবসত্ৰয়ব্যাপী শ্ৰীমন্দিৰ-প্ৰতিষ্ঠা, শ্ৰীবিগ্রহ-প্ৰতিষ্ঠা, অভিষেক, বৈষ্ণব-হোম, ধৰ্ম্মসভা ও নগৰ-সঙ্কীৰ্ত্তনাদি অৰুষ্ঠিত হইবে। সমিতিৰ ও বিভিন্ন মঠেৰ বিশিষ্ট ত্ৰিদিগুপাদগণ শ্ৰীবিগ্রহ-তৰ্ব্বাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্ৰদান কৰিবেন।

অতএব, ধৰ্ম্মপ্ৰাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুক্লভক্ত্যৰুষ্ঠানে সবাৰুৰ যোগদান কৰিলে সমিতিৰ সদন্তগণ পৰমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদৰুষ্ঠানে যোগদান কৰিতে অসমৰ্থ হইলে প্ৰাণ, অৰ্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বাৰা সমিতিৰ সেবাকাৰ্য্যে সহায়ৰুতি প্ৰদৰ্শন কৰিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী স্মৃতি অৰ্জ্জিত হইবে। ইতি—  
৩০শে চৈত্ৰ, ১৪০৩

শুক্লভক্ত-ৰূপালেশপ্ৰাৰ্থী—

সত্যব্ৰন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

---

দৃষ্টব্য :—কোন বিষয়ে জানিতে বা আত্মকল্যাণি পাঠাইতে হইলে শ্ৰীমদন-মোহন দাস ব্ৰহ্মচাৰীৰ নিকট উপৰিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্ৰেৰিতব্য।



## —: অনুষ্ঠান-সূচী :—

২৫শে বৈশাখ ( ইং ৮।৫।২৭ ), বুহস্পতিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্তন ।

অপরাহ্ণে—শ্রীনগর-সঙ্কীৰ্তন শোভাযাত্রা ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে মহাজন-পদাবলী ও অধিবাস-কীর্তন এবং ধর্মসভা ।

২৬শে বৈশাখ ( ইং ৯।৫।২৭ ), শুক্রবার—

মঙ্গলারতি—প্রাতঃ ৪-৩০ টায় ।

সকাল—৬-৩০ মিঃ হইতে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণব-হোমাদি ।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে ধর্মসভা—‘শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব’ ও ‘সনাতন ধর্ম’ সম্বন্ধে বক্তৃতা ।

২৭শে বৈশাখ ( ইং ১০।৫।২৭ ), শনিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি ও কীর্তন ।

মধ্যাহ্নে—ভোগরাগ ও আরতি-কীর্তন ।

অপরাহ্ণে—মহাজন-পদাবলী কীর্তন ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে ধর্মসভা—শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি—শ্রীমন্তপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-শতবার্ষিকী উপলক্ষে তদীয় অতিমর্ত্য চরিত্র ও অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা ।

---

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যাহুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্তন স্বীকার্য্য ।



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।

অধোক্কে অহৈতুকী ভক্তি বিষমৃণ্য ॥

অন্য ধর্ম স্বরূপে পালে যেই জন ।

হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই ভ্রম ॥

১৯৩৭ বর্ষ }

২২ মধুসূদন, অনিরুদ্ধ, ৫১১ শ্রীগোরাঙ্গ  
৩১ বৈশাখ, বুধবার, ১৪০৪, ইং ১৪/৫/৩৭

{ ৩য় সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রীগৌর-গদাধরাষ্টকম্,

[ শ্রীমদচ্যুতানন্দ-গোস্বামি-বিরচিতম্ ]

ক্ষিতৌ লুঠদেগৌর-কলেবরাভ্যাং

সদা মহাপ্রেম-বিলাসকাভ্যাম্ ।

সমুদ্রতীরে নট-নাগরাভ্যাং

নমোহস্ত মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্ ॥ ১ ॥

গৌর-কলেবরদ্বয় ধাঁহারা সর্বদা মহাপ্রেমবিলাসে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেন,  
সমুদ্রতীরে শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন-গান- নর্তনপরি ধাঁহারা ব্রজের নাগর-  
নাগরী, সেই শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর প্রভুকে আমার অনন্ত নমস্কার ॥ ১ ॥

হা হা ক রাধেতি মুহুঃ স্থিতাভ্যাং

শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ-বপুর্ধরাভ্যাম্ ।

আনন্দ-লীলারস-রঞ্জিতাভ্যাং

নমোহস্ত মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্ ॥ ২ ॥

আনন্দঘন-লীলারসে রঞ্জিত ষাঁহারা, 'হা রাধে হা কৃষ্ণ তোমরা কোথায় ?'—  
এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত ভাবাবিষ্ট হইতেন, সেই শ্রীরাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহাভিন্ন  
শ্রীগৌর-গদাধর প্রভুদ্বয়কে আমার অশেষ প্রণাম ॥ ২ ॥

অদ্বৈত-চিন্তাহর-সন্তুবাভ্যাং

সদা ভবানন্দ-মনোহরাভ্যাম্ ।

অচিন্ত্য-লীলা-পরিপূরিতাভ্যাং

নমোহস্ত মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্ ॥ ৩ ॥

"কলিহত জীবগণ কিরূপে উদ্ধার লাভ করিবে"—শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর  
এরূপ দুশ্চিন্তা হরণ করিতে ষাঁহারা আবির্ভূত, সর্বদা প্রেমানন্দময়, মনোহর,  
অচিন্ত্য-লীলা পরিপূরণকারী শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর প্রভুদ্বয়কে আমার অসংখ্য  
প্রণতি ॥ ৩ ॥

জীবৈক-নিস্তার-ধৃতব্রতাভ্যাং

শ্রীকৃষ্ণনাম্না-জন-তার কাভ্যাম্ ।

হরে হরে কৃষ্ণ মুখানুজ্ঞাভ্যাং

নমোহস্ত মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্ ॥ ৪ ॥

জীবোদ্ধার-ব্রতাবলম্বী ষাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-নামদ্বারা কৃষ্ণ-বিমুখজন-তারণে রত,  
শ্রীমুখপদ্মে সদা 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র সংকীৰ্ত্তনরত, সেই শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর প্রভুদ্বয়ের  
শ্রীচরণকমলে আমার নমস্কার ॥ ৪ ॥

অশেষ-দুঃখাময়-ভেষজাভ্যাং

কিরীট-কেয়ুর-বিভূষিতাভ্যাম্ ।

গ্রৈবেয়-মালা-মণি-রঞ্জিতাভ্যাং

নমোহস্ত মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্ ॥ ৫ ॥

ষাঁহারা অশেষ ভব-যন্ত্রণার সৃচিকিৎসক, কিরীট-কেয়ুর-বিভূষিত ও গলদেশে  
মণিখচিত মালা-শোভিত শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর প্রভুদ্বয়ের পদারবিন্দে আমার অনন্ত  
প্রণাম ॥ ৫ ॥

শ্রীবৎস-রোমাবলি-রঞ্জিতাভ্যাং

বক্ষঃস্থলে কৌস্তভ-ভূষিতাভ্যাম্ ।

ত্রৈলোক্য-সম্মোহন-সুন্দরাভ্যাং

নমোহস্ত মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্ ॥ ৬ ॥

রোমাবলী-শোভাবিত বক্ষঃস্থলে কৌস্তভযুক্ত, ত্রিলোক-সম্মোহনকর সৌন্দর্য্য-  
কন্দ সেই শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর প্রভুদয়ের শ্রীচরণে আমার প্রণতি ॥ ৬ ॥

সুরচলৎ-কাঞ্চন-কুণ্ডলাভ্যাং

সদাষ্টভাবৈঃ পরিশোভিতাভ্যাম্ ।

শ্বেদাশ্র-কম্পাদি-বিভূষিতাভ্যাং

নমোহস্ত মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্ ॥ ৭ ॥

খাঁহারা দীপ্যমান চঞ্চল স্বর্ণ-কুণ্ডলে সুশোভিত, শ্বেদ-অশ্র-কম্পাদি অষ্ট-সাত্ত্বিক-  
ভাবে পরিশোভিত, সেই শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর প্রভুদয়ের শ্রীপদকমলে আমার  
পুনঃ পুনঃ প্রণাম ॥ ৭ ॥

শ্রীমচ্ছিবানন্দ মনোরথাভ্যাং

সদা সুখানন্দ-রস-সুখাভ্যাম্ ।

মদীয়-সর্ব্বস্ব-পদাশ্রুজাভ্যাং

নমোহস্ত মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীশিবানন্দ প্রভুর মনোরথে অধিষ্ঠিত, সর্ব্বদা চিৎসুখানন্দাত্মক রসে  
দেদীপ্যমান সেই আমার প্রাণসর্ব্বস্ব পদকমলযুগল শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর প্রভুদ্বয়কে  
আমার অসংখ্য দণ্ডবরতি ॥ ৮ ॥

পঠন্তি যে গৌর-গদাধরাষ্টকং

পঢ়ং লভন্তে ব্রজযুগ্ম-পাদম্ ।

অদ্বৈত-পুত্রোণ ময়োক্তমেত-

ব্রাহ্মাচ্চ্যুতানন্দ-জনেন ধীমতা ॥ ৯ ॥

শ্রীঅচ্যুতানন্দ-নামক শ্রীল অদ্বৈতভনয়-কৃত এই গৌর-গদাধরাষ্টক যিনি পাঠ  
করেন, তিনি ব্রজযুবদ্বন্দ্ব-পাদপদ্ম লাভ করেন ॥ ৯ ॥

## শ্রোতব

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৪৬ পৃষ্ঠার পর ]

১৭। কৃষ্ণকে কিরূপভাবে গোপ্তৃষে বরণ করিলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইয়া থাকে ?

“কৃষ্ণের চিংকণ নিত্যদাস আমি, কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ আমার রক্ষাকর্তা বা পালনকর্তা নাই ; আমি অতি দীন ও হীন ; কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্তনাদি করিতে করিতে পূর্ব কর্মফল-ভোগস্বরূপ জীবনযাত্রা নির্বাহ করিলে অবশ্য কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করিব—এইরূপে কৃষ্ণ-সংসারে স্থিতির দ্বারা আমরা কৃষ্ণপ্রেম-ফল পাইয়া থাকি ।”

—বৃ: ভা, তাৎপর্য্যানুবাদ

১৮। ভক্তের পক্ষে কৃষ্ণকৃপা-নির্ভরতা কিরূপ বাঞ্ছনীয় ?

“কৃষ্ণ আমাকে অত্ন বা একশত বৎসরে বা কোন জন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন । আমি দৃঢ়তাপূর্বক তাঁহার চরণ আশ্রয় করিব, কখনও ছাড়িব না’—এই প্রকার ধৈর্য্য ভক্তি-সাধকদিগের পক্ষে নিতান্ত বাঞ্ছনীয় ।” —ধৈর্য্য, স: তো: ১১।৫

১৯। ‘আত্ম-নিষ্কেপ’ কাহাকে বলে ?

“‘আজ হইতে আমি আমার নই,—আমি কৃষ্ণের’—এই বুদ্ধির নাম আত্মনিষ্কেপ ।” —শ্রদ্ধা ও শরণাগতি, স: তো: ৪।৩

২০। শরণাগত ভক্ত কি পূর্ব-ইতিহাসে আসক্ত থাকেন ?

“পূর্ব ইতিহাস, ভুলিষ্ট সকল, সেবা-স্বথ পেয়ে মনে ।

আমি ত’ তোমার, তুমি ত’ আমার, কি কাজ অপর ধনে ?” —শ:

২১। শরণাগত-সেবক কৃষ্ণসেবার্থ স্বথ-দুঃখকে কিরূপ মনে করেন ?

“তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত, সেও ত’ পরম স্বথ ।

সেবা-স্বথ-দুঃখ, পরম সম্পদ, নাশয়ে অবিজ্ঞা-দুঃখ ॥” —শ:

২২। শরণাগত-জন কি কৃষ্ণের সংসারে বাস করিয়া কোন ফল-ভোগকামনা করেন ?

“তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া, ছাড়িষ্ট ভবের ভয় ॥

তোমার সংসারে, করিব সেবন, নহিব ফলের ভোগী ।

তব স্বথ যাহে, করিব যতন, হয়ে পদে অহুরাগী ॥” —শ:

২৩। নামকীর্তনকারী সাধক বৈষ্ণব-ঠাকুরের নিকট কিরূপ দৈন্ত জ্ঞাপন করেন ?

“একাকী আমার, নাহি পায় বল, হরিনাম-সঙ্কীর্ণনে ।

তুমি রূপা করি’, শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া, দেহ’ কৃষ্ণনাম-ধনে ॥

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শক্তি আছে ।

আমি ত’ কাদ্যাল, ‘কৃষ্ণ’ ‘কৃষ্ণ’ বলি’, ধাই তব পাছে পাছে ॥” —শঃ

২৪ । নামকীর্ণনেচ্ছ সাধকের পক্ষে শ্রীগুরুদেবের নিকট কি কি প্রার্থনীয় ?

“গুরুদেব !

রূপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে, তৃণাপেক্ষা অতি হীন ।

সকল সহনে, বল দিয়া কর, নিজ মানে স্পৃহা-হীন ॥

সকলে সম্মান, করিতে শক্তি, দেহ’ নাথ যথাযথ ।

তবে ত’ গাহিব, হরিনাম স্তুত্রে, অপরাধ হ’বে হত ॥” —শঃ

২৫ । অনন্ত ভজনকারী কি কখনও শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ত্যাগ করেন ?

“অন্ত আশা নাহি যার, তব পাদপদ্ম তার,

ছাড়িবার যোগ্য নাহি হয় ।

তব পদাশ্রয়ে নাথ ! করে সেই দিন পাত,

তব পদে তাহার অভয় ॥”

—‘যামুন-ভাবাবলী’ ১১, গীঃ মাঃ

২৬ । আমরণ কিভাবে কৃষ্ণভজন করা উচিত ?

“এ দেহে যাবৎ স্থিতি, কর কৃষ্ণচন্দ্রে রতি,

কৃষ্ণে জান ধন-জন-প্রাণ ।

এ দেহে অন্তঃ যত, ভাই-বন্ধু-পতি-স্বত,

অনিত্য সম্বন্ধ বলি’ মান ॥”

—‘শোকশাতন’ ২, গীঃ মাঃ

২৭ । নিকপট হরি ভজনকারী কি কখনও নিজকে গুরু-বুদ্ধি করেন ?

“তোমার কিঙ্কর, আপনে জানিব, ‘গুরু’-অভিমান ত্যজি’ ।

তোমার উচ্ছিষ্ট, পদজল-রেণু, সদা নিকপটে ভজি ॥”

—কঃ কঃ ‘প্রার্থনা’ ( লালসাময়ী )—৮

২৮ । বাস্তব-সত্য কাহার নিকট প্রকাশিত হয় ?

“The Bhagabat teaches us that God gives us truth when we earnestly seek for it. Truth is eternal and unexhausted. The soul receives a revelation when it is anxious for it.”

—The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology

২২। শরণাগত ভক্ত কি কখনও কর্তৃত্বাভিমান করেন ?

“যোগ্যতা বিচারে, কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার।

করুণা না হৈলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, প্রাণ না রাখিব আর ॥” —শঃ

৩০। ভবাটবীতে পথভ্রষ্ট জীবের পক্ষে একমাত্র কাহার আশ্রয় প্রার্থনা করা কর্তব্য ?

“অবিবেকরূপ ঘন, তাহে দিক্ আচ্ছাদন,

হৈল তাতে অন্ধকার ঘোর।

তাহে দুঃখ-বৃষ্টি হয়, দেখি' চারিদিকে ভয়,

পথভ্রম হইয়াছে মোর ॥

নিজ অবিবেক-দোষে, পড়ি' হৃদ্বিনের রোষে,

প্রাণ যায় সংসার-কান্তারে।

পথ-প্রদর্শক নাই, এ দুর্দ্দেবে মারা যাই,

ডাকি তাই অচ্যুত ! তোমারে ॥”

—‘যামুন-ভাবাবলী’ ১৮, গীঃ মাঃ

৩১। শুদ্ধভক্ত কিরূপে সর্বদা কৃষ্ণ-রূপার প্রার্থী হন ?

“অতি অপকৃষ্ট আমি, পরম দয়ালু তুমি,

তব দয়া মোর অধিকার।

যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়’,

তা’তে আমি স্থপাত্র দয়ার ॥”

—‘যামুন-ভাবাবলী’ ১৯, গীঃ মাঃ

৩২। অকিঞ্চন ভক্ত কীর্তনাধিকার-প্রার্থনায় কিরূপ আৰ্ত্তি জ্ঞাপন করিয়া থাকেন ?

“অমানী মানদ, হইলে কীর্তনে, অধিকার দিবে তুমি।

তোমার চরণে, নিরূপটে আমি, কাঁদিয়া লুটিব ভূমি ॥”

—কঃ কঃ ‘প্রার্থনা’ ( লালসাময়ী ), —৮

৩৩। বৈষ্ণব কতদূর দুঃসঙ্গ-রহিত দেখিলে জীবগণকে কৃপা করেন ?

“আমার এমন ভাগ্য কতদিনে হ’বে।

আমারে আপন বলি’ জানিবে বৈষ্ণবে ॥

শ্রীগুরুচরণামৃত-মাধ্বিক-সেবনে।

মত্ত হ’য়ে কৃষ্ণগুণ গা’ ব বৃন্দাবনে ॥

কর্মী, জ্ঞানী, কৃষ্ণদেবী—বহিঃস্থ-জন ।  
 ঘৃণা করি' অকিঞ্চনে করিবে বর্জন ॥  
 কর্মজড়-স্মার্তগণ করিবে সিদ্ধান্ত ।  
 আচার-রহিত এই নিতান্ত অশাস্ত ॥  
 বাতুল বলিয়া মোরে পণ্ডিতাভিমানী ।  
 ত্যজিবে আমার সঙ্গ মায়াবাদী জ্ঞানী ॥  
 কুসঙ্গ-রহিত দেখি' বৈষ্ণব-সুজন ।  
 কৃপা করি' আমারে দিবেন আলিঙ্গন ॥”

—ক: ক: ‘প্রার্থনা’ ( লালসাময়ী )—২

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

## শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

প্রত্যেক মানুষের ধীর হওয়া আবশ্যক—প্রাকৃত চাঞ্চল্য যাহাতে না আসে, সে বিষয়ে বিশেষ সচেতন হওয়া কর্তব্য । শ্রেয়ঃ যাহাতে লাভ হয়, মরণের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত জগতের সমস্ত কথা ছাড়িয়া দিয়া অর্থাৎ Summarily reject করিয়া কেবলমাত্র ভগবদ্ভজন করিব । জগতের সকলেই আমার সর্বনাশ করিবার জন্ত প্রস্তুত । এই বান্ধবহীন দেশে ‘আত্মীয়-নামধারী’ সকলেই ভগবদ্ভজনের প্রতিকূল । আত্মীয়রূপে বৈষ্ণবের আশ্রয় ছাড়া আর আমাদের উপায় নাই । কোন মানুষের অথবা কোন কাজই করিবার দরকার নাই, সকলে মিলিয়া কেবলমাত্র ভগবানের সেবকগণের সেবা করুক ।

বৈষ্ণবগণ পতিতপাবন । ইহ জগতে আমার পবিত্রতা-কারক আর কেহই নাই । এখানে একজনের সহিত অপরের দেখা হইলে ঈর্ষামূলে অহঙ্কার আসে । একজন অপরকে নিজাপেক্ষা ক্ষুদ্র, নীচ, দরিদ্র, মূখ, কুৎসিত ইত্যাদিভাবে দর্শন করে, কিন্তু বৈষ্ণবঠাকুর সেরূপ নহেন । এহেন জীবকে তিনি উদ্ধার করিতে ব্যস্ত । জীবে দয়া ব্যতীত তাঁহার অস্ত্র কার্য্য নাই । তাঁহার আশ্রয় ছাড়া আমার আর কর্তব্য নাই—তাঁহার আশ্রয় ছাড়া আমার গতি নাই ।

বৈষ্ণব অস্ত্র জীবের মত নহেন । তিনি চৈতন্যপ্রাপ্ত—কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত । প্রত্যেক কার্য্যে জীবনে-মরণে তিনি চৈতন্যচরণ ছাড়িয়া অস্ত্র কার্য্যে ব্যস্ত নহেন । যখন মানুষ নিজের চশমায় বৈষ্ণবকে দেখিতে যায় তখন ঠিকভাবে তাঁহাকে দেখিতে পায় না । একমাত্র তাঁহার কৃপালোকে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় ।



যে মুহূর্তে জীব ভগবানের সেবা ক'রবে না, সেই মুহূর্তে ভোগ এসে গ্রাস ক'রবে। কৃষ্ণ সর্বদা কৃপা ক'রবার জ্ঞাত—আমাদিগকে আকর্ষণ ক'রবার জ্ঞাত প্রস্তুত, কিন্তু অন্ধরূপে পতিত আমরা তাঁর ফেলা দড়িগাছা যদি স্বতন্ত্রবুদ্ধিহেতু না আঁকড়ে ধরি, তাঁর প্রতি পেছন দিয়ে দি', তা' হ'লে পতিতই থাক'লুম—ভগবৎসেবাবিমুখ হ'য়ে অন্ধরূপে প'ড়ে রইলুম। এ জগতে কৃষ্ণের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেব জীবকে এই অন্ধরূপ হইতে ওঠা'তে আসেন। যাঁরা তাঁর কৃপারজ্জুগাছা হাত দিয়ে ধরেন, তাঁরাই মঙ্গললাভ ক'রতে পারেন—পরশান্তির ধামে যেতে পারেন।

কপটতা হ'তে উদ্ধারের জ্ঞানই শ্রীগুরুপাদপদের আবশ্যকতা ও অবতারণা। বাহির জগতের চিন্তাস্রোতে যে বিপদ তা' হ'তে উদ্ধারের জ্ঞান শ্রীগুরুপাদপদ সেই সকল কথা আলোচনা করেন। শ্রীগুরুপাদপদের বাণীতে যখন শ্রীকৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা হয়, তখন বাস্তবতা ও কপটতার পার্থক্য ধরা পড়ে। তখন যা'তে মেকি জিনিষ গ্রহণ না ক'রে আসল জিনিষের অহুসন্ধান হয়, তজ্জ্ঞাত যত্ন ক'রবার চেষ্টা উদ্ভূত হয়।

বহু বহু যোনি ভ্রমণের পর মানবজীবন লাভ হয়। তাড়াতাড়ি নিজের পূর্ণ মঙ্গলের জ্ঞাত যত্ন ক'রতে হ'বে। কবে মরণ আস'বে, তা'র ত' স্থিরতা নাই। মানবজীবন ছাড়া ত' আর পরমার্থ পা'বার উপায় নাই। হেলায় হারানটা কখনও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আবার লক্ষ লক্ষ যোনিভ্রমণ ত' অনিবার্য! যা'তে ঐ পাক এড়িয়ে যেতে পারা যায়, তা'র যত্ন না ক'রলে মানুষকে বুদ্ধিমান ব'লবে কে ?

যিনি যেখানে আছেন, সেখান থেকেই কাণ দিয়ে শুন্তে পারেন। নমস্কার ক'রবার তিনটে Medium ( অবলম্বন )—কায়, মন ও বাক্য। আত্মগত্য স্বর্গ শু'নবার কাণ নিয়ে নিরহঙ্কার হ'য়ে শু'ন্তে হ'বে। জগতে বিভিন্ন কথা আছে, সে-সব কথা হ'তে ভিন্ন ভগবৎস্বাক্ষরীয় কথা শু'ন্তে হ'বে। নিত্যকালস্থায়ী কথা শ্রবণ ক'রতে হ'বে—যাহা একমাত্র সাধুই বলেন। সাধু নিত্যকথা অবলম্বন ক'রে বাস করেন, যে কথা অপ'রবর্তনশীল। বৈদিক পন্থায় শ্রবণ ক'রতে হ'বে। তজ্জ্ঞাত Submissive temper ( আত্মগত্য স্বভাবের ) আবশ্যক। যেটার নিকটবর্তী হ'তে পা'র'ছি না, সেটার নিকটবর্তী হ'তে হ'বে, তা'র অত্মগত হ'য়ে। যদি অহঙ্কারী হই, তা' হ'লে নিত্যমঙ্গলের কথা শু'ন্তে অবকাশ পা'ব না। যিনি জানেন তা'র কাছ থেকে জান'তে হ'বে। যদি আমি জানি—এই অভিমান হয়, তা' হ'লে জান'তে পা'রবো না।

আমার দুর্দেব অপনোদনের অত্ম কোনও উপায় নাই—শ্রীনামভজন ব্যতীত। বহির্জগতের নাম হইতে পৃথক বৈকুণ্ঠনাম প্রপঞ্চে অবতরণ ক'রে আমাদের কর্ণবেধ সংস্কার করান। সংস্কৃতিফলে জীব কৃষ্ণনাম শ্রবণের অধিকারী হন। বৈকুণ্ঠনাম শ্রুত হইলে বৈকুণ্ঠরূপের জ্ঞান, অবস্থান ও তদুদ্ভূত আনন্দ আমাদিগকে জড়ানন্দ অর্থাৎ ভোগের চিন্তা হ'তে রক্ষা করে।

## ভক্তি ব্যতীত নিস্তার নাই

ভগবানের প্রতি শুদ্ধভক্তিই জীবের উত্তম অর্থাৎ পরমলাভ। জল যেমন সমস্ত লোকের জীবন, তদ্রূপ ভক্তিই যাবতীয় মঙ্গলের আকর। ইহজগতে বিঘ্নাভিজনিত ভয়শূন্য এই মঙ্গলময় ভক্তিমাগিই একমাত্র সমীচীন পথ, এই পথেই ভক্তিপরায়ণ রূপালু নিকাম সাধুগণ বিচরণ করেন। কৃষ্ণভক্তির দ্বারা ধনী, নিধন, মুখ, পণ্ডিত—সকলেরই প্রকৃত নিত্যমঙ্গল-লাভ হইতে পারে। ইহার দ্বারা সার্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক গরোপকার এবং পরার্থপরতা নিঃস্বার্থপরতা ও স্বার্থপরতার অপূর্ব সম্মেলন সাধিত হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে কপিল-দেবহুতি-সংবাদে (ভা: ৩২৫।১৯) পাণ্ডা যায়,—‘অথিলান্ন ভগবানে ভক্তিযোগ-সদৃশ অত্র মঙ্গলময় পথ আর নাই। অপ্রতিহত শুদ্ধভক্তিযোগাবলম্বনে ভগবানে সমস্ত অর্পণ করিলে জীবের চঞ্চল মন স্থির হয়। ইহলোকে ইহাতেই জীবগণের সর্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গলের উদয় হয়।’ স্বন্দপুরাণে ব্রহ্মা-নারদ-সংবাদেও পাণ্ডা যায়,—‘এই জন্মমৃত্যু সমাকুল ভয়ঙ্কর সংসারে বাহুদেবের পূজাই শাস্ত্র-বিচারকগণকর্তৃক একমাত্র পরিত্রাণের উপায় বলিয়া কথিত।’ স্বন্দপুরাণে সনৎকুমার-মার্কণ্ডেয়-সংবাদের মধ্যেও উল্লিখিত আছে,—‘ভগবানে ভক্তিলাভকামী জনগণের ইহলোকে কিংবা পরলোকে কোন অন্তত ত’ থাকেই না, পরন্তু ভগবানের প্রতি ভক্তি তাহাদের কোটিকুলকে দিয়া বৈকুণ্ঠলোকে লইয়া যায়।’ শ্রীভাগবতে (ভা: ১০।৮২।৪৪) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—‘মায়ী ভক্তিহি তূতানামমৃতত্বায় কল্পতে’ অর্থাৎ ‘আমার প্রতি ভক্তি জন্মিলেই জীবগণের অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে।’

যিনি ভক্তিবিরোধী হইয়া অপরাধী হন, তাহার ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি আদৌ থাকে না। সেবানুষ্ঠান ব্যক্তি ব্যতীত অপরের ভক্তিস্বখোদয়ের কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাঁহারা ভগবানকে নিজের ভোগ্য জ্ঞান করায় সেবা-বুদ্ধির অভাবে নিত্যস্থ লাভ করিতে অসমর্থ হন। এই প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণে উক্ত রহিয়াছে,—‘যে পর্য্যন্ত মানব পৃথিবীতে অনন্ত রসের মধ্যে একমাত্র সারপদার্থ হরিভক্তিকথাস্বধারস সেবন না করেন, সে পর্য্যন্ত সে বহুদেহ ধারণজনিত জরা, মরণ, জন্ম, যাতনাদি দুঃখসমূহ প্রাপ্ত হন।’ গীতায় (৯।৩) শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকেও বলিয়াছেন,—‘হে পরম্পর! ভক্তিধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন পুরুষগণ আমাকে না পাইয়া মৃত্যুবাপ্ত সংসারমার্গে পরিলম্বন করেন।’ যাহারা নিজস্ব ভোগের জন্ত ভগবৎসেবায় বাধা প্রদান করে, তাহাদের অনিত্য বস্তুতে চিত্ত প্রধাবিত হইয়া নানাপ্রকার অশান্তি উৎপাদন

করায়। ভক্তিহীন হইলে দেববন্দ জীবগণকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতিতে অভিভূত করেন, শীতোষ্ণবর্ষণাদিতে ক্রেশ দেন এবং জিহ্বা, উপস্থ প্রভৃতি বেগ বিধানদ্বারা নানাপ্রকারে জীবের ইন্দ্রিয়দমনে বাধা প্রদান করিয়া থাকেন। বিষ্ঠাভোজী শূকর যেরূপ ক্ষীর ও খণ্ডাদি পরিত্যাগ করিয়া পুরোষ গ্রহণ করে, তদ্রূপ দৈবকর্তৃক প্রতারিত হইয়া জীবগণ হরিকথারূপ স্বধা পরিত্যাগপূর্বক ক্রোধেতর অসংকথা শ্রবণ করে। যে গাভী দুগ্ধ দেয় না, তাহার পালনকারী যেরূপ সেবার বিনিময়ে কিছুই লাভ করিতে পারে না; তদ্রূপ শব্দশাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেও ভগবৎ-সেবানিষ্ঠ না হওয়ায় উক্ত পাণ্ডিত্যদ্বারা তাঁহার কোন ফলোদয় হয় না। এই প্রসঙ্গে শ্রীগৌর-হৃন্দর বলিয়াছেন,—

প্রভু কহে,—সর্বকাল সত্য কৃষ্ণ নাম।

সর্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বই না বলয়ে আন ॥

কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি' যে আর বাখানে।

বৃথা জন্ম যায় তার অমত্য-বচনে ॥

আগম, বেদান্ত আদি যত দরশন।

সর্বশাস্ত্রে কহে, কৃষ্ণপদে ভক্তি-ধন ॥

হেন কৃষ্ণগানে যার নাহি রতি মতি।

পড়িয়াও সর্বশাস্ত্র তাহার দুর্গতি ॥ ( ১৫: ভা: মধ্য ১ম পরিচ্ছেদ )

বৃহন্নরদীয় ও পদ্মপুরাণের মধ্যে পাওয়া যায়,—“বিষ্ণুভক্তিবিহীন জনগণের চারিবেদ ও শাস্ত্রাদির অনুশীলনে, তীর্থসেবায়, তপস্শাচরণে বা যজ্ঞানুষ্ঠানাদিতে লাভ কি?” ভাবার্থদীপিকা ( ১০।৮৭।২৭ ) “তপস্ত্য তাপৈঃ প্রপত্তস্ত” শ্লোকে বলিয়াছেন,—“তাপক্লিষ্ট হইয়া বহুবিধ তপস্যাই করুন, ভৃগুপাতের অনুষ্ঠান করুন, বহু বহু তীর্থে বিচরণই করুন, বেদসমূহ অধ্যয়নই করুন, বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানই করুন, বহু তর্কই করুন, ত্রিহরির আরাধনা ব্যতীত কেহই মৃত্যুকে জয় করিতে পারে না।” ভগবানের আরাধনাই মন, চক্ষু, বাক্য ও অগাধ্য ইন্দ্রিয়ব্যাপারের সাক্ষাৎ ফল। ভগবানের আরাধনা ব্যতীত কোনও জীবই কৃতান্তপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

একমাত্র ভক্তিই ষাঁহাদের পুরুষার্থ, তাঁহাদের সেবাপথে শ্রম নাই, সর্বদা সেবানিরত থাকিয়া তাঁহারা পরমানন্দ অনুভব করেন এবং আনুষঙ্গিক ফলে তাঁহাদের নিজ ভোগময় জড় সংসারবন্ধ হইতে মুক্তিলাভ হয়। সুপ্রজ্জলিত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠসমূহ ভস্মমাংস করে, ভগবন্তুষ্টিও সেইরূপ সংসার বন্ধনের মূল কারণ অবিচ্ছাদকে তৎক্ষণাৎ দহন করিয়া ফেলে। সেবাপ্রবৃত্তিদ্বারাই পার্থিব ভোগরত

জনগণ নিজ নিজ জড়াভিনিবেশ হইতে মুক্তিলাভ করেন। মহাপুরুষগণ ভগবানের অখিল লোকপাপবিনাশক-কীর্তিস্বধাসমুদ্রে অবগাহন করিয়া যাবতীয় সন্তাপ দূরীভূত করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতের ( ভাঃ ১০।৩।২৭ ) “মর্ত্যো মৃত্যু-ব্যালম্বীতঃ পলায়ন” শ্লোকে দেবকীদেবী ভগবানের স্তবে বলিয়াছেন,—“এই মর্ত্যলোকে মৃত্যুরূপ সর্পভয়ে ভীত এবং ব্রহ্মাদি যাবতীয় লোকে আশ্রয়লাভের জগৎ ধাবমান হইয়াও নির্ভয় হয় নাই। অগ্নি যদৃচ্ছাক্রমে মহৎরূপালক ভক্তিবলে আপনার পাদপদ্মের আশ্রয়লাভ করিয়া সুস্থভাবে অবস্থান করিতেছে এবং এই মর্ত্যলোকে হইতে মৃত্যু দূরে পলায়ন করিতেছে।”

### ভক্তিপথ ব্যতীত কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি পথ শ্রেয়ঃ নহে

লবণ বিনা শাক অর্থাৎ সর্বপ্রকার ব্যঞ্জন, ক্ষুধা ব্যতীত খাদ্যবস্তু, অর্থবোধ ব্যতীত শাস্ত্রপাঠ, ফল বিনা বাগানসকল যেমন সুখ দান করিতে পারে না ; তদ্রূপ ভগবন্তুক্তি ব্যতীত জ্ঞান-কর্ম-যোগাদি কখনও সুখদায়ক হয় না। মানুষের ত্রিবিধ জন্ম—বিশুদ্ধ মাতাপিতা হইতে উৎপত্তির নাম শৌক্রে জন্ম, উপনয়নদ্বারা সাবিত্র্যজন্ম, সর্ববৈশ্বর্য বিষ্ণুর আরাধনারূপ যজ্ঞদীক্ষার দ্বারা যাত্তিক বা দৈক্ষ্যজন্ম। কিন্তু শ্রীহরির সেবা ব্যতীত এই জন্মত্রয়ে কি ফল ? ভগবন্তুক্তিই জীবের প্রবমাত্র নিত্য বৃত্তি। সেই বৃত্তির অভাবে বেদান্ত কর্মকাণ্ড বা ব্রহ্মার আয়ুর্পর্যমিত জীবন বা ত্রিবিধ জন্ম মহিমা ফলপ্রসূ হয় না। তাই হরিসেবা ব্যতীত বেদপ্রতিপাদ্য কর্মসকল ও দেবতাগণের গ্রায় দীর্ঘায়ুতেই বা কি ফল ? সত্য, দয়া, ধর্ম, তপস্যা, জ্ঞান—ইহারা ভগবদ্বক্তিরহিত মানবচিন্তকে সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ করিতে পারে না। অনেকে মনে করেন—বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, জড়বস্তু ভোগের অভিনিবেশ ত্যাগ, সাংখ্য, দেশ্বর সাংখ্য ও বেদান্ত প্রভৃতিদ্বারা আমাদের মঙ্গল হয়, কিন্তু ঐগুলি ভগবানের সেবায় অত্যাবশ্যক নহে। কেবলা ভক্তিই ভগবানকে লাভ করাইতে একমাত্র সমর্থ। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীগৌরহরি বলিয়াছেন,—

প্রভু বলে,—“ধীর মুখে নাহি ভক্তিকথা।

তপ শিখা-সুত্ব-ত্যাগ তার সব বুখা ॥

প্রভু কহে,—তপঃ করি’ না করিহ বল।

বিষ্ণুভক্তি—সর্বশ্রেষ্ঠ, জানহ কেবল ॥

কোটিজন্ম যদি যাগযজ্ঞ তপ করে।

ভক্তি বিনা কোন কর্মে ফল নাহি ধরে ॥”

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও ‘কল্যাণকল্পতরু’ গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

কৃষ্ণ-অর্থে কায় ক্লেশ,      তার ফল আছে শেষ,  
কিন্তু তাহা সামান্য না হয় ।

ভক্তির বাধক হলে,      ভক্তি আর নাহি ফলে,  
তপ ফল হইবে নিশ্চয় ॥

কিন্তু ভেবে দেখ ভাই,      তপস্যায় কাজ নাই,  
যদি হরি আরাধিত হন ।

ভক্তি যদি না ফলিল,      তপস্যার তুচ্ছ ফল,  
বৈষ্ণব না লয় কদাচন ॥

শ্রীভাগবতে অম্বরবালকগণের প্রতি ভক্ত প্রহ্লাদের উক্তি হইতে পাওয়া যায়,  
—“হে অম্বরকুলনন্দন! ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সদাচার ও বহুজ্ঞতা কোন কিছুই  
ভগবান্ শ্রীমুকুন্দের প্রীতি উৎপাদনের যোগ্য নহে। দান, তপস্যা, যজ্ঞ, পূজা,  
শৌচ ও ব্রতাদি প্রভৃতিও ভগবানের প্রীতির কারণ নহে। কেবলমাত্র নির্মল  
ভক্তির দ্বারাই ভগবান্ শ্রীহরি প্রীতি লাভ করেন। ভক্তি ব্যতীত অন্ম সমস্তই  
অকিঞ্চিৎকর তথা বিড়ম্বনা মাত্র।”

ভক্তি ব্যতীত কোন পন্থারই চরম প্রয়োজন লাভ হয় না, কণ্ঠ-জ্ঞান-যোগাদি  
দ্বারা প্রাকৃত বিষয়ে উদানীনতা মাত্র সিদ্ধ হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-  
চরিতামৃতের ‘অনুভাষ্যে’ জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,  
—“ভক্তি ব্যতীত অন্মপ্রকার সাধন নিতান্ত নিষ্ফল, কখনই ফল প্রসব করিতে  
পারে না। যেমন অজাগলন্তন দুগ্ধ দিতে পারে না, কেবল অনভিজ্ঞ লোকের মিথ্যা  
ব্রমেরই বিষয় হয়, তদ্রূপ ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান ও কণ্ঠের সাধনে কোন ফল হয় না।”

ভক্তি বিহু কোন সাধন দিতে নারে ফল ।

সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥ ( চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৯২ )

ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে ‘প্রেমোদয়’ ।

প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্ম হৈতে নয় ॥ ( চৈঃ চঃ অঃ ৪।৫৮ )

ভক্তি বিনা মুক্তি নহে, ভাগবতে কয় ।

কলিকালে নামাভাসে স্মৃতে মুক্তি হয় ॥ ( চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৩০ )

ভক্তি বিনা কেবলজ্ঞানে ‘মুক্তি’ নাহি হয় ।

ভক্তি সাধন করে যেই ‘প্রাপ্ত ব্রহ্মলয় ।’ ( চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১০২ )

যাহারা সংসারে আসক্তচিত্ত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে বহুবিধ প্রাকৃত কাম্য ও  
নিত্যকণ্ঠের অনুষ্ঠান করেন এবং যাহারা রজোগুণদ্বারা কুণ্ঠিতমনা, কামাত্মা,  
ইন্দ্রিয়াসক্ত ও গৃহমেষীয় কার্যে নিরত হইয়া প্রতিনিয়ত পিতৃগণের অর্চনা করিয়া

থাকেন, সেইসকল মানব সংসারনাশক শ্রীহরির গুণকীর্তনে বিমুখ হইয়া কেবল ত্রিবিধ সাধনেই ব্যস্ত থাকেন। এই প্রসঙ্গে স্বন্দপুরাণে উক্ত রহিয়াছে,—  
 “ব্যভিচারিণী স্ত্রী যেরূপ বহু পরপুরুষের মনোরঞ্জন করিতে গেলেও কোন পুরুষেরই মনোবাঞ্ছা পূরণ বা সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারে না, তদ্রূপ বিষ্ণুভক্তিহীন ব্যক্তি-  
 গণের যে শ্রোত ও স্মার্ত্ত ক্রিয়া দেখা যায়, সেই সমস্ত ক্রিয়ার ফল বুঝা দৈহিক পরিশ্রম ব্যতীত আর কিছু নহে।” ভক্তিমার্গে জ্ঞানমার্গের হ্রাস অসহায়তা নিমিত্ত ভয় অথবা কৰ্ম্মকাণ্ডের মৎসরাদিষুক্ত ব্যক্তি হইতে ভয় নাই। যেরূপ শস্ত্রহীন ধানের তুষকে পরময়ত্রে নিষ্পেষণ করিলেও তাহা হইতে শস্ত্র (তণ্ডুল) লাভের সম্ভাবনা নাই, তদ্রূপ যাহারা কল্যাণপথ ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কৈবল্যজ্ঞান-  
 লাভের জগু কুরুসাধন করে, তাহাদের উহা ক্রেশেই পর্য্যবসিত হয়, জ্ঞানের ফল যে মোক্ষ, তাহা লব্ধ হয় না।

### কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি আশ্রয় অবশ্য কর্তব্য

ধন, সৎকুলে জন্ম, সৌন্দর্য্য, তপশ্চা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়নৈপুণ্য, কাঙ্ক্ষা, প্রতাপ, শারীরিক বল, উত্তম, প্রজ্ঞা ও অষ্টাঙ্গ-যোগ ইত্যাদি দ্বাদশটি গুণ ভগবানের আরাধনার বিষয়ে যোগ্য নহে। ভগবান্ শ্রীহরি কেবলভক্তি প্রভাবেই গজেন্দ্রের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। নানা দুঃখদাবানলে দগ্ধ হইয়া যে ব্যক্তি অতিশয় দুস্পার সংসার-মাগরে উদ্ভীর্ণ হইতে ইচ্ছুক, তাহার পক্ষে ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোন সংসারোত্তরণের উপায় নাই। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণবহিস্মুখতা দোষ মায়া হৈতে হয়।

কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হৈতে মায়ামুক্তি হয় ॥ ( চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১৩১ )

ভক্তি ব্যতীত সংসারমুক্তি হয় না, অবশ্য সংসারমুক্তি ভক্তির আত্মবঙ্গিক ফল, মুখ্যফলই কৃষ্ণপদে প্রেমলাভ। সাধুসঙ্গ ব্যতীত সেই ভক্তিলাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই। কেননা ভগবানই সাধুগণের প্রকৃষ্ট গতি ও আশ্রয় এবং ‘কৃষ্ণভক্তিজন্যমূল হয় সাধুসঙ্গ।’ সুতরাং সংসঙ্গ-প্রভাবে ভগবৎ-সেবাসম্মে অবস্থিতি হইলে সৰ্ব্বতো-  
 ভাবে অভিধেয়ের সিদ্ধি হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

## জীবের কৃত্য

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪৮শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩১ পৃষ্ঠার পর ]

**অর্থাদি ও জড় বৈজ্ঞানিক গবেষণা—জড়স্বার্থ ও অনর্থের বাহক**

আমরা শিশুকাল থেকে যখনই লেখাপড়া শুরু করি, তখনই আমাদের পিতা-মাতা বা অভিভাবকগণ আমাদেরকে অর্থ রোজগারের উপযুক্ত করে তোলার মানসিক ইচ্ছা ও আগ্রহ পোষণ করেন। নামী স্কুল-কলেজে সন্তানদের পড়বার জন্ত অভিভাবকগণ ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সন্তান উচ্চশিক্ষা লাভ করে সাবালক হয়ে উচ্চবেতনে চাকুরী বা উচ্চ ধরনের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ রোজগার করবে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে—এই বাসনায় অভিভাবকগণ সন্তানদের মাহুষ করার স্বপ্ন দেখেন। স্কুল-কলেজের শিক্ষক মহাশয়গণও ছাত্র-ছাত্রীদিগকে অর্থ রোজগারের জন্ত ভালভাবে পড়াশুনা করে সফলতা লাভ করতে উৎসাহিত করে থাকেন। কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করে ডিগ্রী নিয়ে চাকুরী পাওয়াটাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে পারে না। মাহুষের দেহ, মন, আত্মা—এই তিনটির যাতে সমুন্নতি হয়, সে-বিষয়ে যত্নবান হওয়াই প্রকৃত শিক্ষার তাৎপর্য। স্কুল জড়দেহ ও সূক্ষ্মদেহ বা চিদাভাস মন জীবের স্বরূপ নয় বা জীব নয়; কাজেই দেহমনের স্বার্থ দেখা অর্থাৎ দেহের পুষ্টি ও দেহ সুস্থ-সবল রাখার চেষ্টা করা এবং মনের স্বার্থ—অর্থ রোজগার করে সুন্দর সুন্দর বাড়ী ও গাড়ীর মালিক হয়ে সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করা, নানা হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ স্থাপন, বস্ত্রদান, অন্নদান প্রভৃতি কার্যে ব্যস্ত থাকা জড়ের দিকে মাহুষকে প্রধাবিত করে। দেহ-মনের প্রয়োজনই প্রকৃত প্রয়োজন—এই ভ্রান্ত ধারণা হতেই আজ জাতিতে-জাতিতে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে, দেশে-দেশে, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, নানা প্রকার স্বার্থ নিয়ে হিংসা, বিবাদ, সংঘর্ষ সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। দেহটা ব্যক্তি,—এই ভ্রান্ত বিচার পোষণ করে দেহের স্বার্থ ও দৈহিক বিষয়ের স্বার্থের প্রয়োজনীয়তা দেখতে গিয়ে অহেতুক পরস্পরের মধ্যে নানাপ্রকার মনোমালিন্য, বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ি এবং দেহী আত্মার স্বার্থের দিকে দৃষ্টি থাকে না। এজন্ত আমরা শাস্তিও পাচ্ছি না। দেহটা জীবের প্রকৃত স্বরূপ নয়, আত্মাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। তাই আত্মার স্বার্থ দেখাই মুখ্য কর্তব্য। আত্মার স্বার্থের অনুকূলে দেহ ও মন ব্যবহৃত হলে তদ্বারাই মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব হয়। আত্মাকে বাদ দিয়ে বা আত্মার স্বার্থ না দেখে কেবলমাত্র দেহ-মনের স্বার্থ নিয়ে চলা বিচক্ষণতার পরিচয় নয়, বরং তাতে বিবেকহীনতারই পরিচয় পরিস্ফুট হয়। আত্মার অনুশীলন না করা পর্যন্ত এবং

আত্মপক্ষে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন মতেই আমাদের প্রকৃত স্বথ-শান্তি আসবে না। এমতাবস্থায় স্কুল-কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষার দ্বারা জীবের স্বরূপোদ্বোধন হয়, সেই শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হলে জীবের তথা মানুষের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হবে।

আমরা দেহ-মনের শিক্ষাকে মুখ্য মনে করে সন্তানদের সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে থাকি। তবে সকল সন্তানদের ক্ষেত্রে লেখাপড়া উচ্চ ধরনের হয় না, কারণ সকলের বুদ্ধি-বিবেক সমান নয়; সকল পিতা-মাতার বা অভিভাবকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। অনেক চেষ্টার পর যখন কোন সন্তান উচ্চশিক্ষা লাভ করেও চাকুরী পায় না অথবা সন্তান ভাল career নিয়ে কৃতিত্বের সাথে শিক্ষা লাভ করতে অসমর্থ হয় অথবা সন্তান-কর্তৃক অর্থ রোজগার মনোমত হয় না, তখনই আমরা অনেকে হতাশ হয়ে বলি—ভগবানকে অনেক ডেকেও কিছু ফল হল না। অনেক চেষ্টা করেও বিফলাভ হয় না কেন? অথবা অনেক চেষ্টা করেও ধনী হওয়া যায় না কেন? এর সমস্তর শাস্ত্র দিয়েছেন,—

“পূর্ব্বেজ্ঞান্যজ্জিতা বিত্তা পূর্ব্বেজ্ঞান্যজ্জিতং ধনম্।

পূর্ব্বেজ্ঞান্যজ্জিতং কৰ্ম্ম অগ্রে ধাবতি ধাবতি ॥”

অর্থাৎ—পূর্ব্বেজ্ঞান্যজ্জিত ধন, বিত্তা ও কৰ্ম্ম পরবর্ত্তী জন্মে অগ্রে অগ্রে ধাবিত হয়। দেহধারী জীবগণ তার অনুবর্ত্তন করে। কিন্তু সংসঙ্গ বা ভক্তসঙ্গ থাকলে প্রকৃতির প্রাবল্য সত্ত্বেও তাকে নিবর্ত্তিত করা যায়। পূর্ব্বেজ্ঞানের স্বভাব আধুনিক জন্মের সঙ্গদ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু আমরা বদ্ধাবস্থায় বহুকাল অভ্যস্ত চেষ্টারূপা প্রকৃতিকেই অবলম্বন করে থাকি—ইহাই আমাদের দুর্দশা।

আমাদের কামনা পূরণ না হলেই ভগবানের প্রতি আমাদের অনেকের বিশ্বাস থাকে না। তাই দেখা যায় কেউ এক দেবতার পূজা করছে; কিন্তু সেই দেবতাকে অনেক ডেকেও যখন তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না তখন সেই দেবতার পূজা ছেড়ে অন্য দেবতার পূজা করতে থাকে; আবার সেই দেবতার পূজা করেও কামনা সিদ্ধ না হলে আরও নানা দেবতার পূজা বহু অর্থব্যয়ে করে থাকে। এই ভাবে কোন দেবতার পূজা করেও যখন নিজের জড়স্বার্থ সিদ্ধি হয় না, তখন ঈশ্বরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস পোষণ করে। ফলে কেউ কেউ পরিশেষে নাস্তিক হয়ে পড়ে। উক্ত তথাকথিত সন্দেহবাদীরা ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও স্বথ পায় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলেছেন,—

“অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশতি।

নাযং লোকোহস্তি ন পরো ন স্বথং সংশয়াত্মনঃ ॥” (গীতা ৪।১০)



“অজ্ঞ, প্রকারহিত ও সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হন। তন্মধ্যে সংশয়াত্ম-  
ব্যক্তির ইহলোক নাই, পরলোক নাই, আর স্বথও নাই।”

নাস্তিকেরা আবার বলে থাকেন,—‘পরলোক’ বলে কিছু আছে নাকি ?  
তদুত্তরে শাস্ত্র বলেছেন,—‘পরলোক আছে বৈকি !’ যথা, শাস্ত্র-প্রমাণ,—

“পরন্তুস্মাতু ভাবোহুতোহব্যাক্তোহব্যাক্তাং সনাতনঃ।

যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশুংস্তু ন বিনশতি।” ( গীতা ৮।২০ )

অর্থাৎ—পূর্বোক্ত অব্যক্তভাবে হতে অগ্ন স্বতন্ত্র যে হিরণ্যগর্ভেরও কারণভূত  
সনাতন অব্যক্তভাবে আছে তাহা শ্রেষ্ঠ ও নিত্য; পরন্তু যাবতীয় ভৌতিক  
পদার্থের নাশ হলেও সেই তত্ত্ব বিনষ্ট হয় না। জড়জগৎ ধ্বংসের পরেও বাস্তব  
সেই অপ্রাকৃত জগৎ অবিকৃতভাবে নিত্যকাল থাকে। সেই অব্যক্ততত্ত্ব জড়-  
ইন্দ্রিয়ের আগোচর। পরতত্ত্ব পরমেশ্বরের অবিনাশত্ব-বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ,—

“অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।” ( গীতা ৮।২১ )

অর্থাৎ—সেই অব্যক্তভাবেকে জন্মাদি-রহিত অক্ষরতত্ত্ব বলে ও প্রতিগণ তাঁকে  
ভূতসমূহের পরমাগতি বলে থাকেন। যাকে প্রাপ্ত হলে জীবগণ সংসারে প্রত্যাবর্তন  
করেন না, সেই অব্যক্ত আমার পরমধাম। এই অব্যক্ত অবস্থায় স্থিত পুরুষ  
শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ তত্ত্ব।

ইহলোক বা জড়জগৎ আমরা সকলেই স্বীকার করি। আমাদের জড়দৃষ্টির  
অন্তরালে যে জগৎ আছে, সেটা আমরা দেখতে পাই না, চিন্তা করতে পারি  
না, তাই সেই পরজগৎকে আমরা অনেকে জানি না। যে জগৎ সম্বন্ধে আমরা  
জানি না, সেই পরজগৎকে মানি না বলা কি উচিত ? পরজগতের নামান্তর  
চিঞ্জগৎ। ইহলোকে যা কিছু পদার্থ সবই জড়ীয় ব্যাপার। আর পরলোকের  
বা চিঞ্জগতের সমস্ত বস্তুই চিন্ময়। জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যেমন জড় বস্তুর দর্শন,  
মনন হয়ে থাকে; তেমনই চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চিঞ্জগতের চিদ্বস্ত্ব সকলের  
দর্শন, স্পর্শন, মনন সম্ভব। এই জড় জগতেই আমাদের দৃষ্টির মধ্যে যে সূর্যালোক  
রয়েছে, সেই সূর্যালোকে আমরা এই স্থূল জড় দেহ নিয়ে যেতে পারি না, পারবোও  
না। আমরা দূর হতে সূর্যকে দর্শন করি, কিন্তু তাকে স্পর্শ করার মত যোগ্যতা  
আমাদের নেই, কারণ এই পার্থিব শরীরের দ্বারা তাঁকে স্পর্শ করা আদৌ সম্ভব  
নয়। এই প্রাকৃত জগতেই আমরা একস্থান হতে অগ্ন দূরবর্তী উদ্ধলোকে  
এই পার্থিব স্থূল শরীর নিয়ে যেতে পারি না। এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভেদ  
বিরাজমান ব্রহ্মলোক বা সত্যলোকে এই স্থূল শরীরে যাওয়া সম্ভবই নয়; সেখানে

যেতে গেলে সোপাধিক সূক্ষ্মশরীর প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয়সখা অৰ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাবার পূর্বে বলেছেন,—

“ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশু মে যোগমৈশ্বরম্ ॥” ( গীতা ১১৮ )

“কিন্তু তুমি এই চক্ষুর দ্বারা আমাকে দর্শন করতে সমর্থ হবে না, অতএব তোমাকে দেব-বপু দর্শনের উপযোগী দিব্যচক্ষু প্রদান করছি, তুমি আমার ঐশ্বরিক শক্তি দর্শন কর।” যদিও ভক্তপ্রবর অৰ্জুন প্রেমময় নিরুপাধিক চক্ষে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য মাধুর্যময় রূপ দর্শন ও আশ্বাদন করেন, কিন্তু তাঁর বিশ্বরূপ দর্শনের ইচ্ছা হওয়ায় তা দর্শনের উপযোগী দিব্যচক্ষু প্রদানের কথা উল্লিখিত হয়েছে। উক্ত দিব্যচক্ষু সাধারণ স্থূল চক্ষু হতে শ্রেষ্ঠ হলেও অৰ্জুনের স্বাভাবিক প্রেমময় নিরুপাধিক চক্ষুর তুল্য হতে পারে না ও তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। ভগবান্ স্বীয় ভক্ত অৰ্জুনকে লক্ষ্য করে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্থূল জড়চক্ষুর দ্বারা ঐশ্বরিক রূপ বা দেব-বপু দর্শন হয় না। স্থূল জড়চক্ষু অপেক্ষা সোপাধিক চক্ষু শ্রেষ্ঠ এবং তদপেক্ষা নিরুপাধিক চক্ষু আরও শ্রেষ্ঠ। দেবলোকে অথবা উর্দ্ধ সত্যলোকে যেতে হলে সোপাধিক চক্ষুর প্রয়োজন। সুতরাং আমাদের এই জড় স্থূলশরীরে সত্যলোক বা ব্রহ্মলোকে যাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক হতে ৬২ লক্ষ কোটি যোজন দূরে অপ্ৰাকৃত জগৎ বা পরজগৎ বৈকুণ্ঠলোক বিস্তারিত। সত্যলোক হতে বৈকুণ্ঠের দূরত্বের পরিমাপে শাস্ত্রমধ্যে ‘প্রায়’ বা ‘সম্ভবতঃ’-এরূপ কোন শব্দ প্রযুক্ত হয়নি। অতএব সহজেই ধারণা হয় যে, শাস্ত্র কত অত্যন্ত সত্য কথা বলেছেন! আধুনিক জড় বিজ্ঞানের পরিভাষায় উচ্চলোক তথা সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদির দূরত্ব গণনা করে সঠিক ব্যবধানের পরিমাপ নির্ণয়ে অসমর্থ হয়ে ‘প্রায়’, ‘সম্ভবতঃ’, ‘হতে পারে’—এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করে দূরত্ব নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে।

জড়বিজ্ঞানীগণ মহাবিস্ফোরণের পরেই বিশ্বসৃষ্টির কথা বলে থাকেন। তাঁরা যাকে “বিগ্-ব্যাং” বলে অভিহিত করেন, সেই ‘বিগ্-ব্যাং’-এর পূর্বে কি ছিল, কেন এই মহাবিস্ফোরণ ঘটল এবং কে-ই বা মহাবিস্ফোরণ ঘটালো—এর যথাযথ সন্তোষজনক সহুত্তর পাওয়া হুঁহু। আমরা দেখছি অসংখ্য নক্ষত্র, গ্রহ, প্রভৃতি যেন সাজানো গুছানো রয়েছে, নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীনে সব কিছুই চলছে। এ সমস্ত যদি বিস্ফোরণের ফলেই হয়ে থাকে, তাহলে তো এলোমেলোভাবে অবস্থান করবে। কিন্তু তা তো হয়নি। সব কিছু আশ্চর্যজনকভাবে নিয়মের মধ্যেই ঘটে চলেছে। বিশাল সমুদ্রই বা এল কোথা থেকে? পৃথিবীর বিশাল মৃত্তিকাই বা এল কোথা থেকে? তথাকথিত বিজ্ঞানীগণ-কণ্ঠক একটা অটালিকা,

একটা উড়োজাহাজ, একটা কম্পিউটার বা একটা কোন কিছু বড় ধরনের বস্তু তৈরী করতে বহু যন্ত্রপাতি, বহু লোকজন, বহু অর্থ প্রভৃতির প্রয়োজন দেখা দেয় এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি, লোকজন ও অর্থাদি না পাওয়া গেলে কিছুই তৈরী করা বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু এই বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করার জন্য সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রাদি, সমুদ্র, বায়ু, মাটি ইত্যাদি এল কোথা থেকে? এগুলি কোথা থেকে সরবরাহ হয়েছিল? বিজ্ঞানীদের কথামত “বিগ্ ব্যাং” থেকে নিশ্চয়ই এই সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রাদি সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে পারে না; আর যদি ‘বিগ্ ব্যাং’ স্বীকার করা হয়, তাহলেও তার সৃষ্টিকর্তা তো একজন অবশ্যই থাকবেন! কর্তা ব্যতীত কার্য হয় না। বৈজ্ঞানিকগণ যান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা একটা নির্দিষ্টস্থানে অবস্থান করে বহু হাজার কিলোমিটার দূরের দেশ ধ্বংস করে দিতে পারেন—ইহা যদি সম্ভব হয়, তাহলে এমন কোন মহাবিজ্ঞানী নিশ্চয়ই থাকতে পারেন যিনি ইচ্ছামায়েই কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে পারেন, আবার ধ্বংসও করতে পারেন। সেই মহাবিজ্ঞানীই সর্ব-শক্তিমান স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ( ক্রমশঃ )

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

## ইচ্ছাশক্তি-ভগবচ্ছক্তি

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৪ পৃষ্ঠার পর ]

“শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসুখ্যাংগুসাম্যভাক্।

রুচিভিশ্চিন্তামাস্থ্যাকুদমৌ ভাব উচ্যতে ॥”

অর্থাৎ—প্রেমসুখ্যের কিরণস্থলীয় বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ রুচিদ্বারা চিন্তকে যে তত্ত্ব মন্থন করে, তাহাকেই ‘ভাব’ বলে। ভাবেরই অপর নাম প্রেম ইহা স্থির হইল। এখন যদি সাধনার ক্রমানুসারে প্রশ্ন করা যায়,—ভাব কিভাবে আসিবে? উত্তর আসিবে—ইষ্টে প্রগাঢ় ‘আসক্তি’ হইতে। ‘আসক্তি’ কিভাবে হইবে? ‘রুচি’ হইতে। ‘রুচি’ কিভাবে হইবে? ‘নিষ্ঠা’ হইতে। ‘নিষ্ঠা’ কিভাবে হইবে? ‘অনর্থনিবৃত্তি’ হইলে। ‘অনর্থনিবৃত্তি’ কিভাবে হইবে? ‘ভজনক্রিয়াদ্বারা’। ‘ভজনক্রিয়া’ কিভাবে জানিবে? ‘সাধুসঙ্গদ্বারা’। ‘সাধুসঙ্গ’ কেমনভাবে জানিবে? ‘শ্রদ্ধা’র উদয় হইলে। ‘শ্রদ্ধা’ কিভাবে উদিত হইবে? ‘স্মৃতি’ হইতে। ‘স্মৃতি’ কেমনভাবে হইবে? জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে কৃত সংকল্প ও সদিচ্ছাদ্বারা।

শাস্ত্রকার ‘শ্রদ্ধা’ হইতেই জীবের সাধক-জীবনের শুরু ধরিয়াছেন। আমরা ইহার আরও মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া পাই,—

“‘শ্রদ্ধা’-শব্দে বিশ্বাস কহে সূদৃঢ় নিশ্চয়।

কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয় ॥”

ইষ্টে অর্থাৎ কৃষ্ণে সূদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসই হইল ‘শ্রদ্ধা’। এখন প্রশ্ন হইবে—কোন বস্তুতে ‘বিশ্বাস’, কিভাবে সম্ভব? মায়িক মনের স্বাভাবিক ধর্মই হইল সন্দেহ, অবিশ্বাস। কোন কিছুর প্রতি বিশ্বাস সহজে জন্মে না। আর একবার বিশ্বাস জন্মিলে, তাহা আর সহজে নষ্ট হয় না। ‘বিশ্বাস’ উৎপন্ন হয় ‘প্রমাণ’ের দ্বারা। ‘প্রমাণ’ উভয়বিধ—‘প্রত্যক্ষ’ ও ‘পরোক্ষ’। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি উহা ‘প্রত্যক্ষ’ প্রমাণ। ‘শ্রুতিপ্রমাণ’ হইল—‘পরোক্ষ’ প্রমাণ।

এখন প্রশ্ন হইবে,—‘প্রমাণ’ কিভাবে পাইব? উত্তর হইবে,—পরীক্ষার দ্বারা। আমরা সর্বদা নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তির সীমা অনুযায়ী সমস্ত কিছুকেই পরীক্ষা করিয়া, —মাপিয়া লইতে চাই। একেবারেই নির্দিধায় কোনও কিছুই গ্রহণ করি না। এবার প্রশ্ন,—পরীক্ষা করিতে যাইব কেন? উত্তর—‘প্রয়োজন’ হইতে। ‘প্রয়োজন’ কেন অনুভূত হয়? ‘ইচ্ছা’ হইতে। এই ইচ্ছাই জীবকে পৃথিবীতে বাঁচাইয়া রাখে এবং বিভিন্ন দিকে ধাবিত করায়। ইচ্ছাই চেতনের পরিচয় বা তাহার অস্তিত্ব জানাইয়া দেয়। ইহাই নিত্য-নবায়মানরূপে জীবের স্বতন্ত্রতা। ইহার অপব্যবহারেই জীবের মায়াবদ্ধতা-রূপ দুঃখ এবং ইহারই যথাযথ প্রয়োগে জীবের স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তৃসিক্তিরূপ সাধ্যবস্তু বা নিত্যানন্দলাভ। শ্রীভগবান্ এই ইচ্ছাশক্তিটুকুমাত্র জীবকে দিয়াছেন তাহার স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা-স্বরূপ। ইহা শ্রীভগবানের চিহ্নিত্তির অন্তর্গত—তাঁহার একেবারে নিজস্ব সম্পদ; তাই তিনিও ইহার ষোল আনাই ফেরৎ চাহেন, ইহা ভিন্ন আর কিছুই চাহেন না। তিনি তাঁহার প্রাপ্য এই ষোল আনা পাইলেই, স্বাভাবিকভাবেই জীবেরও আর কিছুই পাইতে বাকি থাকে না। অপর সব কিছুই আপনা-আপনি হইয়া যায়। জগৎসৃষ্টির মূল কারণই হইল ‘ইচ্ছা’।—

ইচ্ছাদেবসমুৎথেন দন্দমোহেন ভারত।

সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ (গীতা ৭।২৭)

অর্থাৎ—হে পরন্তপ! হে ভারত অর্জুন! সৃষ্টি আরম্ভকালে যাবতীয় জীব ইচ্ছা ও দেহজনিত সুখ-দুঃখাদি দন্দবিষয়ে সম্যক্ মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব সৃষ্টির প্রথমাবস্থা হইতে ইচ্ছাশক্তির প্রভাবই প্রধান। ইচ্ছার প্রতিক্রিয়া

প্রতিফলিত হয় মনে। মনের কার্যাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটে ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে। ইন্দ্রিয়াদি মনদ্বারা পরিচালিত হয়। মন বা মতি পরিচালিত হয় বুদ্ধিদ্বারা। যে মন কেবল ইচ্ছার উদ্ভবমাত্রেই ইন্দ্রিয়াদি পরিচালন করে, সেই মনসম্পন্ন জীব পশু বা পশুতুল্য। মানুষ উন্নত জীব, কারণ তাহার মতি বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হয়। বুদ্ধি আবার বিবেকদ্বারা পরিচালিত হয়।

বিবেক হইল চিন্তা বা চেতনের আভাস। বস্তুতঃ এইস্থান হইতেই মনুষ্যের গতি নির্দ্ধারিত হয়। **আবরণাঙ্ঘ্রিকা-চেতন** এই বিবেকের কোন সাড়া বা হৃদিস পায় না। কদাচিৎ পাইলেও তৎক্ষণাৎ তাহা অন্তর্হিত হয়। তজ্জগৎ ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তিও দুর্ব্বুদ্ধি বা কুবুদ্ধিতে পরিণত হয় এবং তদনুসারে বিভিন্ন যোনিতে নিষ্কিপ্ত হয়। আবার **আবরণোন্মোচন-উন্মুখী-চেতন** বিবেকের দ্বারাই তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও সমস্ত কার্যকলাপই নিয়ন্ত্রিত করেন। তাহার বুদ্ধিও তজ্জগৎ সদ্বুদ্ধি-স্বরূপ। ইহা সর্ববিধ মঙ্গলের কারণ। যে-কোনভাবেই হউক, পুঞ্জীভূত স্মৃতি ও সাধুসঙ্গই সদ্বুদ্ধি বা সদিচ্ছা উৎপত্তির মূল। এই অবস্থা হইতে জীবের সাধক-জীবনের সূত্রপাত হয়। ক্রমশঃ তাহার সাধুসঙ্গ, শ্রীবিগ্রহ-দর্শন, ধাম-দর্শন ও পরিক্রমাদি করিতে ইচ্ছা জন্মিবে।

ইচ্ছাশক্তির নিত্য স্বতন্ত্রতা-হেতু এইসকল কার্যও তাহার ভাল বা মন্দ লাগিতে পারে। এই ভাল বা মন্দ লাগার অপর নাম রুচিবোধ। ইহা ভাবাবস্থা পর্য্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে কার্য করিয়া জীবের গতি নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। তজ্জগৎ ভাবপ্রাপ্ত হইয়াও, তদবস্থা হইতে চ্যুত হইবার ঘটনা শ্রুত হয়। আবার ইহার মধ্যবর্তী অসংখ্য স্তরের মধ্যে যে-কোন স্তরে স্বতন্ত্র ইচ্ছাহেতু সাধক ম্লামোত্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া বিভিন্ন দিকে ইত্যন্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে পারে।

কেহ কোনও ঘটনাটিকে সাধুর গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িল এবং সাধুর বেশভূষা ও আচার-আচরণ অনুকরণ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার সাধুর মূল প্রয়োজনের দিকে কোনও ইচ্ছা নাই। তাহার ইচ্ছা ধাবিত হইতে লাগিল পূর্ব-পূর্ব সংস্কারানুযায়ী অসাধুর গ্রাম নিকৃষ্ট ভোগের দিকে। আবার প্রারম্ভ-সারে কেহ কোনও অসাধু পরিবেশে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার এসব কিছুই ভাল লাগে না। তাহার ইচ্ছা প্রকৃত সাধুসঙ্গ এবং প্রকৃত প্রয়োজন-লাভ ইহাদের উভয়ের বিচারানুযায়ী গতি কি হইবে?

একপক্ষ বলেন—এইনব সাধুবেশী কপটদিগের কোনও লাভ হইতেছে না। শুধু ভোগের ছলনায় জগৎকে বঞ্চিত করিয়া ও নিজেরা বঞ্চিত হইয়া উৎসন্ন

পথে যাইতেছে। অপরপক্ষ বলেন,—‘ইহাদের সকলেরই অবশ্যই প্রকৃত কল্যাণ হইবেই হইবে।’ ইহা বড়ই আশার কথা! এই দুই মতবাদ লইয়া তুমুল বাদ-বিতণ্ডারও অন্ত নাই।

একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলে, উভয় মতেরই সত্যতা নিরূপিত হইবে। “অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার” অর্থাৎ অন্তর্নিষ্ঠাই হইল আসল কথা। এখানে কোন ফাঁকি চলিবে না। সেইজন্য যাহারা কপট, তাহাদের কোনদিনই মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। ‘ভাবগ্রাহী জনার্দন’—যাহার যেমন অন্তরের ইচ্ছা তাহাকে সেইমত ফলপ্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ নিজেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,—“যে যথা মাং প্রপত্তস্তে তাস্তুত্থৈব ভজাম্যহম্।” আবার, “কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া। কভু ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥” (চৈঃ চঃ আঃ ৮।১৮) অতএব ইতর ইচ্ছা লইয়া সে যেখানেই থাকুক বা যাহাই করুক না কেন, তাহার কখনওই শ্রেয়ঃ লাভ হইতে পারে না—ইহা একেবারে একশোভাগই প্রায় স্থনিশ্চিত। সংস্কার প্রতীদান-স্বরূপ বড়জোর ইহজগতের কিছু সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকে মাত্র।

অপরদিকে যিনি দৈবানুরোধে অসং গুণীর মধ্যে পড়িয়া গিয়াছেন, অথচ ঈশ্বরের বা তদন্তরঙ্গ-স্বভাবের জগৎ হৃদয়ে তাঁর উৎকট ইচ্ছা-পোষণ করেন, তাঁহার অবশ্যই শ্রেয়োলাভ ঘটিবেই ঘটিবে, ইহাও শতকরা একশোভাগই স্থনিশ্চিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের, ১ম অধ্যায়ের, ২য় শ্লোক “ধর্মঃ প্রোজ্জিতকৈতবোহত্র.....” শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—“ততশ্চ তৎক্ষণাদেব শুশ্রুভিরিতি। তৎক্ষণমাত্র তেষাং শ্রবণেচ্ছা চ ভবেদ্বিতি শ্রদ্ধাতঃ পূর্বমেব শ্রবণে প্রেমা ভবেৎ। কিং পুনঃ শ্রদ্ধায়াং সত্যামিতি ভাবঃ।” অর্থাৎ—শ্রবণেচ্ছুক (শ্রবণ করিবার ইচ্ছামাত্র করিয়াছে, এখনও শ্রবণ করে নাই এইরূপ) জনগণের হৃদয়ে শ্রীভগবান্ তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হন, অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত অল্পশীলনের ইচ্ছাদ্বারা সেইক্ষণ হইতেই আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের শ্রবণের দৃঢ় ইচ্ছা উৎপন্ন হয় এবং শ্রদ্ধার পূর্ব হইতেই শ্রবণ করিতে থাকিলে প্রেম উৎপন্ন হয়, আর যদি শ্রদ্ধাপূর্বক কেহ শ্রবণ করেন, তাঁহাদের ‘ত’ কথাই নাই। আবার শ্রীভক্তিরসামুতসিদ্ধির পূর্ববিভাগ ২য় লহরীর ১১০ শ্লোকে বলিতেছেন,—“যত্র স্থলোহপি সন্ধিয়াং ভাবজন্মন ইতি ঈশ্বরে মনঃ স্থিরীক্রিয়তে ইত্যেব পরম পুরুষার্থ উচ্যতে। অত্র ঈশ্বরো মনসি অবরুদ্ধস্তে ইতি ততস্তদ্বিগমনাসামর্থ্যং তচ্চাবরোধনং সত্ত্ব এব বিনাপি শ্রদ্ধয়েতি ক্বাপি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণীয়ং মহাবিদ্ভেতি গম্যতে।”

অর্থাৎ—ঈশ্বর নিজেই শ্রবণেচ্ছুর হৃদয়ে অপরূপ হন, তাহা হইতে নির্গমনের অসামর্থ্যবশতঃ এবং সেই অবরোধ তৎক্ষণাৎ, শ্রদ্ধা ব্যতিরেকেই হইয়া থাকে, অতএব ইহা ( শ্রীমদ্ভাগবত ) শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিবার অনির্বচনীয় কোন মহাবিভা ।

শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধে, ৩য় অধ্যায়, ১০ম শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।

তীৱেণ ভক্তিয়োগেন যজ্ঞেত পুরুষঃ পরম্ ॥

অর্থাৎ—পূর্বে অকামই থাকুক, সর্বকামই থাকুক বা মোক্ষকামই থাকুক, উদারবুদ্ধি হইবামাত্র মানুষ তীৱ শুদ্ধভক্তিয়োগে পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের যজ্ঞন করিবেন। এইস্থলে তীৱ ভক্তিয়োগ বলিতে স্মৃতিৱ ভজনেচ্ছার কথাই বলা হইয়াছে। অতএব জীবের ইচ্ছাশক্তিই তাহার সর্ব প্রকার গতির মূল।

( ক্রমশঃ )

—শ্রীবীরভজ দাস ব্রহ্মচারী

জগদগুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

শুভাবির্ভাব-শতবার্ষিকী উপলক্ষে

## ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

হে গুরুদেব !

তব আগমন যেন,

মম উদ্ধারণ হেন,

জগ ভরিয়া হইল খ্যাতি ।

পুরীষ কীটও ভাল,

জগা-মাধাইও পেল,

আমি অতি অন্ধকার রাতি ॥

পতিত পাবন তুমি,

অধম পতিত আমি,

জাতি-কুল না কর বিচার ।

তব অনুগত জন,

পাইল যে প্রেমরতন,

আমি হে দুর্জ্জন অপার ॥

তোমার চরিত্র হেন, অতিমর্ত্য ভাব যেন,  
জগজনে তোমা নাহে চিনে ।

সিংহভাবে পুত্রপ্রতি, করেন অধিক প্রীতি,  
অসংকে ত্যজ ভক্তি বিনে ॥

জড় বিষয় তুচ্ছ, বুঝাইতে ইহ গুহ্য,  
লভিলে জনম রাজকুলে ।

কৃষ্ণপ্রেম নামধন, সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম,  
দেখাইলে ইহ জীবকুলে ॥

তোমার দয়ার সীমা, নহে জগতে উপমা,  
অনাথ দুঃখী নহে বঞ্চিত ।

গায় তব গুণগান, দীন-দুঃখী ভাগ্যবান,  
আছে যার স্মৃতি সঞ্চিত ॥

দেখাইলে গুরুভক্তি, মো অধম শিষ্য প্রতি,  
প্রাণাপেক্ষা গুরু যে আপন ।

ধাম-পরিক্রমাকালে, প্রাণ দিয়া সেবা কৈলে,  
যাহা হৈতে বাঞ্ছিত পূরণ ॥

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার, স্থাপিয়াছ শাস্ত্র সার,  
কলিতে গৌরঙ্গ-কৃপা লাগি' ।

বিপ্রলম্ব মহাভাব, রাধ—মান, কৃষ্ণ—তাপ,  
ধরে কৃষ্ণ রাধাভাবকান্তি ॥

মায়াবাদী যতজন, তা সব কর খণ্ডন,  
প্রকাশি' মায়াবাদ-জীঘনী ।

খণ্ডি' সব কুসিদ্ধান্ত, স্থাপিয়াছ সুসিদ্ধান্ত,  
বিজয় ঘোষে তব লিখনী ॥

স্থানে স্থানে স্থাপি' মঠ, প্রবর্তিলে ভক্তিপথ,  
ভক্তিহীন জগজন তারে ।

কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ধ্যান, নাহি করে পরিত্যাগ,  
ভক্তি বিনা উদ্ধারিতে নারে ॥



পড়ে জীব মায়া ফাঁদে,      তোমার অন্তর কাঁদে,  
 ( দেখি' ) জড় রসে ডুবে জগজন ।  
 বাংলা হিন্দী ভাষা ধরি,      ভিন্ন দেশে কেন্দ্র করি,  
 প্রচারিলে প্রেমমহাধন ॥  
 প্রভুপাদের শিক্ষা,      জগজনে দিলে ভিক্ষা,  
 স্থাপিয়াছ ধাম পরিক্রমা ।  
 হাজার হাজার যাত্রী,      আসে তব কৃপা লাগি',  
 নাহি রহে আনন্দের সীমা ॥  
 তব আদর্শ লাগি',      রাখি' গেলা তব মূর্তি,  
 বিশ্বব্যাপী কীর্তি গাহিবারে ।  
 তব মহিমা অপার,      নাহি তার পারাবার,  
 অর্প' শক্তি পারি লিখিবারে ॥

—ত্রিদিগ্ভিক্ষু ত্রীভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু

## বৈষ্ণবতা কোথায় ?

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩১ পৃষ্ঠার পর ]

ভক্তিস্ব ভগবন্ততসঙ্গেন পরিজায়তে ।

সংসঙ্গ প্রাপ্যতে পুংতি স্কৃত্তৈঃ পূর্বসঙ্কিতৈঃ ।

অর্থাৎ ভগবন্তত্বের সহিত সঙ্গ হইলে ভক্তির উদয় হয় । পুরুষসকল পূর্ব পূর্ব জন্মের সঙ্কিত স্কৃত্তির ফলে শুদ্ধভক্তের সঙ্গ প্রাপ্ত হন ।

মহৎকৃপা বা ভগবৎ ভক্তসঙ্গদ্বারাই ভক্তিলভ হয় । সমস্ত শাস্ত্রই তারম্বরে ভক্তসঙ্গের কথা কীর্তন করিয়াছেন । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—“কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ ।”

ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে হইলে সর্বাগ্রে সাধু কে ? সঙ্গ কি ? এসব জ্ঞানার প্রয়োজন আছে । লোককল্যাণকামী মহাপুরুষগণ সদাচার হইতে চ্যুত হন না । শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন,—

ন কিঞ্চিৎ কশ্চচিৎ সিদ্ধোৎ সদাচারং বিনা যতঃ ।

তস্মাদবশ্যং সৰ্বত্র সদাচারোহপেক্ষতে ॥

সাধনরাজ্যে সদাচার ব্যতীত কাহারও কোন প্রকার সিদ্ধিলাভ হয় না । অতএব, সকল প্রকার সাধক-সাধিকাগণেরই সদাচার পালন করা অবশ্য কর্তব্য । যাহারা সিদ্ধদশায় উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও সদাচার মানিয়া চলা আবশ্যক । কারণ, তাঁহারা আচরণ করিয়া না দেখাইলে সাধকগণ সদাচার-প্রতি অনুরাগী হইবেন না । ভগবান্ বলিলেন,—

যদ্‌ষদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ( গীতা ৩।২১ )

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠলোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনুবর্তন করেন । তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহাতে অনুবর্তী হয় ।

স্বয়ং গৌর ভগবান্ আচরণশীল শিক্ষা জগজ্জীবের কল্যাণের জন্ত প্রচার করিলেন । আচার বলিতে সাধুগণের আচরণকে বুঝায় ।

আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে ।

আপনে না কৈলে ধর্ম শিখান না যায় ।

এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায় ॥ ( চৈঃ চঃ ১।৩।২০-২১ )

শ্রীহরিভক্তিবিলাস সাধুগণের আচরণের কথাই বলেন । সাধু কাঁহার?—

সাধবঃ ক্ষণদোষান্ত সচ্ছন্দ সাধুবাচকঃ ।

তেষামাচরণং যন্তু সদাচার স উচ্যতে ॥

যাহারা সাংসারিক দোষ ক্ষয় করিয়াছেন, এবস্থিধ সাধুদিগকে ‘সৎ’-শব্দে অভিহিত করা হয় । ইহাদের আচারকে সদাচার বলা হয় ।

সিদ্ধ মহাপুরুষগণ সাধন-ভজনের যে আচরণ করেন, তাহা নিজের উদ্দেশ্যেই করেন, লোকশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে করেন না । কিন্তু ফলতঃ তাহা লোকশিক্ষার জন্তই হয় । ঠাকুর হরিদাসকে সেবক গোবিন্দের মাধ্যমে শ্রীমন্নহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ ও অধরামৃত পাঠাইলেন । হরিদাস ঠাকুর বলিলেন,—

সংখ্যা কীর্ত্তন পুরে নাহি কেমনে খাইমু ?

মহাপ্রসাদ আনিয়াছে কেমনে উপেক্ষিমু ॥ ( চৈঃ চঃ অঃ ১।১।১৯ )

শ্রীমন্নহাপ্রভুর পার্শদগণ তাঁহাদের আচরণদ্বারাই জগজ্জীবকে শিক্ষাদান করিয়াছেন । তাঁহাদের সাধন-ভজনের ক্রমপদ্ধতি পাষণ্ডের রেখার মত ।

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান ।

যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর-ভগবান ॥ ( চৈ: চ: অ: ৬।২২০ )

“আচার প্রভবো ধর্ম”—আচার হইতে ধর্মের বৃদ্ধি পায় । যেমন দেহ নষ্ট হইলে প্রাণ থাকে না, সেইরূপ আচার না হইলে ধর্ম থাকে না । “একরূপেণ হবস্থিতো যোহর্থঃ স পরমার্থঃ”—যাহা সর্বত্র সর্বদা একরূপে অবস্থিত, তাহাই পরমার্থ, তাহাই সত্য ।

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের উপদেশামৃত হইতে ‘সাধু’ সম্বন্ধে ছ’ একটা বাণী উদ্ধৃত করিলাম, যাহা শ্রবণে মনোদর্শনপরকথা বিদূরিত হইবে ।

“সর্বক্ষণ হরিকথা-নিরত ব্যক্তির নামই সাধু, সর্বক্ষণ শ্রীভগবানের সেবার জন্ত ব্যস্ত ব্যক্তিই সাধু, নিত্যকাল সর্বক্ষণ যিনি সকল চেষ্টার মধ্যে কৃষ্ণের জন্ত ব্যস্ত আছেন, সকল চেষ্টাই বাঁহার ভগবানের সেবার জন্ত, তিনিই সাধু ।”

“জীব নিজে শত শত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বা নিজের মনোমত ভজনের অভিনয় করিয়া নিজের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না ।” সেইহেতু শাস্ত্র বলিলেন,—

“যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে ।

একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥” ( চৈ: চ: অ: ৫।১৩১ )

বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ।

নিজের মঙ্গলের জন্তই সাধুসঙ্গ করিতে হইবে । শাস্ত্র বলেন,—

“সাধুসঙ্গ”, ‘সাধুসঙ্গ’ সর্বশাস্ত্রে কয় ।

লব মাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥ ( চৈ: চ: ম: ২২।৫৪ )

জগদগুরু শ্রীল শঙ্করাচার্য সাধুসঙ্গ প্রসঙ্গে বলিলেন,—

“ক্ষণমপি সজ্জন-সঙ্গতিরেকাঃ ভবতিভবার্ণব তরণী নৌকাঃ ॥”

“সংসঙ্গ” বা “সাধুসঙ্গ” কি বস্তু ? সং কাহাকে বলে ?—অস্-ধাতু হইতে সং-শব্দ নিপ্পন্ন হইয়াছে । অস্-ধাতু অন্ত্যর্থ । স্ততরাং সং-শব্দের অর্থ হইল—যিনি আছেন । যিনি সকল সময়েই আছেন । সৃষ্টির পূর্বেও যিনি ছিলেন, সৃষ্টির সময়েও যিনি ছিলেন, সৃষ্টির পরেও যিনি ছিলেন বা আছেন, ভবিষ্যতেও থাকিবেন ; বাঁহার অস্তিত্ব নিত্য, শাস্ত্রত, তিনিই মুখ্য সং । তিনিই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণ । স্ততরাং ‘সং’-শব্দের মুখ্য অর্থ হইল শ্রীকৃষ্ণ ।

আবার ‘সং’-শব্দের অর্থ সত্যও হয় । যিনি মূল সত্য বস্তু । যিনি সত্য জ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম । সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যমিতিবাচ্যং ব্রহ্ম-ব্রহ্মাদি

দেবগণ যাহাকে স্তব করিয়া থাকেন ; সেই ষয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই মূল সং বস্তু ।

সংসঙ্গের মহৎ ফল—“তীর্থদেবাদিসঙ্গাদপি সংসঙ্গ শ্রেয়ানিতি ।” ‘সঙ্গ’-শব্দ আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি—সনজ্-ধাতু হইতে সঙ্গ-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । সনজ্-শব্দের অর্থ আসক্তি । স্ততরাং সঙ্গ-শব্দের অর্থও আসক্তি । শ্রীল বিষ্ণনাথ চক্রবর্তিপাদ শ্রীমদভাগবতের টীকায় “সঙ্গমাসক্তিং” অর্থে লিখিয়াছেন—সঙ্গ আছে যার তিনি সঙ্গী । সঙ্গী-শব্দের অর্থ হইল আসক্তি-যুক্ত ।

বৈষ্ণবের আচার ও অবৈষ্ণবের নির্দেশ সম্বন্ধে শাস্ত্রালোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি,—

অসংসঙ্গত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার ।

জ্ঞীসঙ্গী—এক অসাধু, ‘কৃষ্ণাভক্ত’ আর ॥ ( চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪ )

ন তথা ভবেম্মোহ বন্ধশ্চাত্ত প্রসঙ্গতঃ ॥

যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥

( ভাঃ ৩।৩১।৩৫ )

অর্থাৎ, অস্ত্র প্রসঙ্গে জীবের তদ্রূপ মোহবন্ধ হয় না, যেরূপ জ্ঞীসঙ্গে এবং জ্ঞীসঙ্গিসঙ্গে হইয়া থাকে ।

“মহৎ-সেবাং দ্বারমাহর্বিমুক্তেন্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্ ॥” ( ভাঃ ৫।৫।২ )

অর্থাৎ পণ্ডিতগণ বৈষ্ণবসেবাকে সংসারমুক্তির দ্বার এবং জ্ঞীসঙ্গীর সঙ্গকে তমোদ্বার বলিয়াছেন ।

যাহা কৃষ্ণভক্তির বাধক তাহাই কৈতবপ্রধান বা দুঃসঙ্গ । নিজকে বঞ্চনা করিবার উপায় মাত্র । কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তির কামনা ছাড়া, অস্ত্র কামনা-বাসনাই দুঃসঙ্গ । এই দুঃসঙ্গ করিলে নিজকে শ্রীকৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত করা হয় ।

‘দুঃসঙ্গ’ कहिये ‘कैतव’, ‘आत्मवञ्चना’ ।

কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অস্ত্র কামনা ॥ ( চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৩৪ )

সাধুসঙ্গ, বৈষ্ণবসঙ্গ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিলাম শাস্ত্রযুক্তির মাধ্যমে । সাধারণ বিচারে বৈষ্ণবের সংজ্ঞা—

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ ।

বৈষ্ণবোহভিহিতোহভিজ্ঞৈরিতরোহস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥ ( পদ্মপুরাণ )

অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ-কর্তৃক ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া কথিত হন, তদ্ব্যতীত অপরে ‘অবৈষ্ণব’ ।

সাধারণী ভক্তি বা বৈধীভক্তির উদাহরণ—

স্বরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদিশা যা ক্রিয়া ।

সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেদ ॥

( পঞ্চরাত্র ভঃ রঃ সিঃ )

হে দেবর্ষে ! হরিকে উদ্দেশ্য করিয়া শাস্ত্রে যে ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, সাধুগণ তাহাকেই বৈধীভক্তি বলেন, এই বৈধীভক্তি যাজন করিতে করিতে প্রেমভক্তি লাভ হয় ।

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, বিষ্ণুপূজাপর ও বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ক্রিয়াকলাপ করিলেই কি সাধ্য বস্তুর সন্ধান পাওয়া যাইবে ? শ্রীমন্মহাপ্রভু এ সম্বন্ধে আরও কঠোর হইয়াছেন । শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব রায় রামানন্দ-সংবাদে সাধ্য-সাধন-জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করিলে জানিতে পারিব ।

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।

বিষ্ণুরাধ্যতে পশ্বা নাশ্রুততোষকারণম্ ॥ ( বিষ্ণুপুরাণ )

পরমেশ্বর বিষ্ণু বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্মের আচারযুক্ত পুরুষকর্তৃক আরাধিত হন । বর্ণাশ্রমাচারব্যতীত তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার অশ্রুত কোন কারণ নাই ।

ইহার উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন,—

প্রভু কহে,—এহো বাহু, আগে কহ আর ।

উন্নত উজ্জল রসের আলোচনা হইতে বিরত হইয়া এক্ষণে কৃষ্ণভক্তি লাভের উপায় কি সে-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কীর্তন করিবার জ্ঞাত যত্নশীল হইতেছি । সাধুসঙ্গের ফলেই কৃষ্ণভক্তিলাভ । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায় ।

সব ত্যজি তবে তিঁহো কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ( চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৩০৫ )

ভগবন্তভক্তি-সাধনের আদি দ্বার শ্রীগুরুপদাশ্রয়ই । জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে পাই,—“শ্রীগুরুপাদপদে আশ্রয় গ্রহণ করিলে আমি নিম্নোহ, নির্ভয় ও অশোক হ’তে পারি । যদি আমরা নিরুপদে প্রাণভরা আশীর্বাদপ্রার্থী হই, তা’ হ’লে শ্রীগুরুপাদপদ অমায়্য সর্ববিধ মঙ্গল দান করেন । সাধারণ গুরুগণ আমাদের মরণ থেকে বাঁচা’তে পারেন না—নিত্যজীবন দিতে পারেন না ; এজন্য তাঁ’দের আংশিক গুরুত্ব । কিন্তু যিনি আমাদের মরণ ধর্ম হ’তে রক্ষা ক’রছেন—আমাদের নিত্যত্বের উপলব্ধি দিয়েছেন, তিনিই পূর্ণ ও নিত্যগুরু ।”

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

শুক্লং স স্ত্রীং স্বজনো ন স স্ত্রীং

পিতা ন স স্ত্রীজ্ঞানী ন স স্ত্রীং ।

দৈবং ন তং স্ত্রীং পতিশ্চ স স্ত্রীং

ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুং ॥ ( ৫।৫।১৮ ) ( ক্রমশঃ )

শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী ( ভক্তিভূষণ )

## পরশান্তির উপায়

আমরা সকলেই শান্তিলাভ করিবার জন্য বহু প্রকারের চেষ্টা করিতেছি । কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে যে, আমরা শান্তির পরিবর্তে অশান্তির দাবানলে সর্ব্বদাই দগ্ধীভূত হইতেছি । কারণ, যে উপায় অবলম্বন করিলে অথবা যে পথে অগ্রসর হইলে আমরা দুঃখের হাত হইতে ছুটি লাভ করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারিব তাহার সন্ধান কেহই করিতেছি না ।

“স্বথের লাগিয়া,

আনন্দে হাসিয়া,

বাঁধি মনোরম ঘর ।

দারুণ অনল,

কোথা হতে এল,

ছাই হল আশা মোর ॥

অনেক যতনে,

সঞ্চিছু কাঞ্চনে,

হবে ইহকালে ভোগ ।

গলা চেপে ধরি’,

চোরে কৈল চুরি,

অথবা জন্মিল রোগ ॥”

সুতরাং সংসারে সুখ-শান্তি অপেক্ষা আমরা দুঃখই বেশী পাইতেছি । আমরা সকলেই ভাবিতেছি যে, এই শরীরের সুখ বিধান করিলে আমরা শান্তি পাইব । কিন্তু এই জড় শরীরের উন্নতির দ্বারা আমরা নিত্যসুখ বা শান্তি কোনমতেই পাইতে পারি না । এই জড় শরীর বিকারগ্রস্ত । জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা ও ব্যাধি—শরীরের এই ছয়টি দোষ রহিয়াছে । “শরীরং ব্যাধি-মন্দিরম্ ।” একটা রোগ দূর করিলে আর একটা রোগ আনিয়া উপস্থিত হয় । শরীর দুই প্রকার—স্থূলশরীর এবং সূক্ষ্মশরীর । ক্ষতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোমাস্থক—স্থূল

শরীর, এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাশ্রক—স্বল্প শরীর । কিন্তু এ সকলই পরিবর্তনশীল ও বিকারগ্রস্ত ।

“এ দেহ পতন হ’লে কি হবে আমার ।

কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার ॥

শাশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে ।

পতঙ্গ বিহঙ্গ তাহে বিহার করিবে ॥

কুকুর শৃগাল সবে আনন্দিত হইয়া ।

মহোৎসব করিবে আমার সাধের দেহ লইয়া ॥”

তজ্জ্ঞ শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

“যাবজ্জননং তাবন্নরণং তাবজ্জননী জঠরে শয়নম্ ।

ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষ কথমিহ মানব তব সন্তোষ ॥”

সুতরাং এই জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধিযুক্ত শরীরের উন্নতির দ্বারা কোনও দিনই আমরা নিত্য শান্তিলাভ করিতে পারিব না ।

তথাকথিত পণ্ডিতগণ ভাবিতেছেন যে, জড় বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের দ্বারা জগতে সুখশান্তি আনিবেন । কিন্তু সে আশা বিফল । কারণ ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, জড় বিজ্ঞানের যতই সমৃদ্ধি হউক না কেন, উহার পরিণাম ধ্বংসকর এবং তাহা নিত্যস্থায়ী নয় । জড় বিজ্ঞানের উন্নতির দ্বারা প্রকৃত সুখ বা শান্তি কখনই সম্ভব নয় ।

কেহ কৰ্ম্মের মাধ্যমে, কেহ জ্ঞানের মাধ্যমে, কেহ বা যোগপন্থা অবলম্বনের দ্বারা জগতে শান্তি আনিবার জন্য জনসাধারণের নিকট পুষ্পিত বাক্য প্রয়োগের দ্বারা বিভ্রান্ত করিতেছেন । কিন্তু শান্তিলাভ ত’ দূর অন্ত । সর্বত্রই অশান্তির আগুন । সুতরাং অনেক যতন হইল বিফল ।

যে পন্থা অবলম্বন করিলে আমরা নিত্য শান্তি বা পরা শান্তি লাভ করিতে পারি তাহা হইল স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অভয়চরণারবিন্দে একান্ত ভক্তিযোগ ।

কৰ্ম্মমার্গের দ্বারা অনেকে সুখ শান্তিলাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন । আমরা যাহাতে সুখ ও শান্তি পাই তজ্জ্ঞ কৰ্ম্ম করি । কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে নিমি-নবযোগেন্দ্র-সংবাদে মহারাজ নিমিকে নবযোগেন্দ্রের অগ্রতম শ্রীশ্রবুদ্ধ বলিয়াছেন,—

“কৰ্ম্মণ্যারভমানানাং দুঃখহতৌ সুখায় চ ।

পশুং পাক বিপর্ধ্যাসং মিথুণিচারিণাং নৃনাম্ ॥”

অর্থাৎ—জগতে মানবগণ দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির জন্ত একত্র হইয়া কার্য-সমূহে প্রবৃত্ত হইলেও ফলবিষয়ে সর্বদা বিপরীত ভাব ঘটিয়া থাকে।—ইহা নিপুণভাবে বিচার করিবে।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

“যজ্ঞার্থাৎ কৰ্মণোহুগ্ৰত্ লোকোহয়ং কৰ্মবন্ধনঃ।

তদর্থং কৰ্ম কৌন্তেয় মুক্তনঙ্গ সমাচার ॥”

ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—হরিতোষণার্থ নিষ্কাম কৰ্মকে “যজ্ঞ” বলে। সেই যজ্ঞের উদ্দেশ্যে যে কৰ্ম করা যায় তদ্ব্যতীত অগ্র যত কৰ্ম সে সমুদয়ই কৰ্মবন্ধন বলিয়া জানিবে। তুমি যজ্ঞার্থ সমুদয় কৰ্ম আচরণ কর। কামনার উদ্দেশ্যে হরিতোষণার্থ কৰ্মও বন্ধনহেতু হয়। অতএব কৰ্ম-ফলাকাজ্জ্বারহিত হইয়া ভগবত্তুষ্টির জন্ত কৰ্ম কর।

গীতাতে পুনরায় দেখিতে পাই,—

“তে তং ভুক্ত্বা স্বৰ্গলোং বিশালং

ক্ষীণে পুণ্যে মৰ্ত্যালোকং বিশস্তি।

এবং ত্রয়ীধৰ্মমতুপ্রপন্ন-

গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥”

প্রভূত সুখজনক স্বৰ্গভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মৰ্ত্যালোকে আগমন করে। ফলকামী ব্যক্তিগণ বেদত্রয়ীর অনুগত হইয়া পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন,—

“তাবৎ সমোদতে স্বৰ্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।

ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্কাগনিচ্ছন্ কাল চালিতঃ ॥”

যে-পর্যন্ত জীবের পুণ্যক্ষয় না হয়, সে-পর্যন্ত স্বৰ্গে আনন্দ লাভ হয়। কিন্তু পুণ্য শেষ হইলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কালপ্রেরিত হইয়া অধোগতি হয়।

কৰ্মের হেয়ত্ব সম্বন্ধে মুণ্ডক শ্রুতিতে বলিয়াছেন,—

“প্রবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তম্ অবরং যেষু কৰ্ম।

এতচ্ছ্রয়ো যেহভিনন্দতি যুচ্চা জরা মৃত্যুং তে পুনরেবাপি যাস্তি ॥”

যজ্ঞধর বিষুর উদ্দেশ্যে যাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই সেইরূপ যজ্ঞরূপ নৌকা ভবসমুদ্র পারের জন্ত দৃঢ় নহে। কেননা ঐ সকল যজ্ঞ ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া উহা অপকৃষ্ট। যে-সকল অবিবেকী ব্যক্তি উহাকেই চরম কল্যাণলাভের উপায় মনে করিয়া উহাতেই আগ্রহ প্রকাশ করে তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও



মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সুখ-শান্তি লাভ করিবার জন্য জীব যে কর্ম করে তাহা দ্বারা তাহাদের বন্ধন, দুঃখ ও অধোগতি লাভ হয়।

জ্ঞানিগণ জ্ঞানের বিচার লইয়া নিত্য সুখ-শান্তিলাভ করিবার জন্য মত্ত রহিয়াছেন। নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানী বা মায়াবাদিগণের উদ্দেশ্য ভগবান্ হইয়া যাওয়া। তাঁহারা বলেন—“অহং ব্রহ্মস্মি”। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত এই প্রকার বিচারের হেয়ত্ব প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—

“যেহুত্তরবিদ্যাক্ষ বিমুক্তমানিন স্ব্যান্তত্বাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।

আরুহ কৃচ্ছেন পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোহিনাদৃতযুদ্ধদজ্যয়েঃ ॥”

অর্থাৎ—হে পদ্বলোচন! আপনার ভক্ত ব্যতীত অন্তে যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করে আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নয়। তাহারা শম দমাদি অত্যন্ত কুসুমাধনের ফলে জীবমুক্তবোধ করিয়াও পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

“শ্রেয়ঃস্বতিং ভক্তিমুদস্ত তে বিত্তো ক্লিশস্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে ।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নাগ্ৰদ্যথা স্থলত্বাবঘাতিনাম্ ॥”

অর্থাৎ—হে বিত্তো! চরমকল্যাণরূপ আপনাকে লাভ করিতে হইলে একমাত্র ভক্তি শ্রেষ্ঠ উপায়। যাহারা তত্ত্বল পাইবার জন্য ধাত্ত পরিত্যাগ করিয়া তুষ্ণে (আগড়ায়) আঘাত করে, তাহাদের সেই প্রচেষ্টা যেমন অকারণ হয় অর্থাৎ কষ্টই সার হয়, লাভ কিছুই হয় না, সেইরূপ ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র জ্ঞান লাভের চেষ্টা ক্লেশকরই হইয়া থাকে।

ক্লেশোপনিষদেও নির্বিশেষ জ্ঞান সম্বন্ধে বলিলেন,—

“অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যানুপাসতে ।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিত্যাগং রতাঃ ॥”

যিনি অবিচার সেবা করেন তিনি অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন। ঐ প্রকার জ্ঞানিগণের অনেক বেশী দুঃখ হয়। এ সম্বন্ধে গীতায় বলিয়াছেন,—

“ক্লেশোহধিকতরস্তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতনাম্ ।

অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবস্তিরবাপ্যতে ॥

নির্বিশেষস্বরূপে আসক্তচিত্তদের কষ্ট অত্যধিক। যেহেতু নির্বিশেষ গতি বা পথ দেহী জীবকর্তৃক অতি দুঃখে লাভ হইয়া থাকে। অর্থাৎ—জ্ঞানযোগী সর্বদা অব্যক্ত তত্ত্বে নির্ভ হইয়া উপায়কালে ব্যতিরেক চিন্তায় যে কষ্ট, তাহা ভোগ করিতে থাকেন। সুতরাং ব্যতিরেক চিন্তা অর্থাৎ সহজ প্রতীতির বিপরীত

চিন্তা জীবের পক্ষে দুঃখজনক। এই মার্গে নিত্য শান্তিলাভ করা যায় না।  
বরং দুঃখই লাভ হইয়া থাকে। জীব কখনও ব্রহ্ম নয়। জ্ঞানীদের ব্রহ্ম হইয়া  
যাওয়ার চিন্তাধারা আকাশকুসুম।

“কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,  
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।

নানা যোনি ভ্রমণ করে, কদর্য ভক্ষণ করে,  
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥”

যোগমার্গেও স্নখ-শান্তি নাই। ইহার দ্বারা অনিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি,  
প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিতা, বশিতা ও কামবসায়িতা—এই অষ্টসিদ্ধি লাভ হইতে  
পারে। কিন্তু ইহার কল অনিত্য। উহা দ্বারা স্নখ ত’ হইবেই না, বরং চরমে  
দুঃখ লাভ হইয়া থাকে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

“যোগী, তাসী, কর্মী, জ্ঞানী, অগ্ৰদেব-পূজক ধ্যানী,  
ইহলোক দূরে পরিহরি।

কর্ম, ধর্ম, দুঃখ, শোক, যেবা থাকে অগ্নি যোগ,  
ছাড়ি’ ভজ গিরিবরধারী ॥”

সুতরাং কর্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি পন্থার দ্বারা কোনমতেই পরশাস্তি লাভ  
হইবে না। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র তারতম্যে ঘোষণা করিতেছেন  
যে,—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অশোক, অভয়, অমৃত আধার-  
স্বরূপ শ্রীপাদপদ্মে যদি কেউ শরণাগত হন এবং ভক্তি অহুশীলন করেন, তাহা  
হইলে তিনি অবশ্যই পরশাস্তি লাভ করিতে পারিবেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র  
রসস্বরূপ।

“রসো বৈ সঃ। রস ছেবাংগ লরানন্দী ভবতি।

কো ছেবাংগাৎ। কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ

আনন্দো ন স্যাৎ। এষ ছেবানন্দয়াতি।”

সেই রসিক শেখর ভগবানের নাম, গুণগাথা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ; তাঁহার  
পাদপদ্ম সেবন, অর্চন, বন্দন; তাঁহার দাস্য, সখ্য এবং তাঁহাকে আত্মনিবেদন  
—এই নবধা ভক্তি অহুশীলনের দ্বারাই নিত্য আনন্দ, নিত্য শান্তি লাভ হইবে।  
ভ্রমধ্যে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্নহাপ্রভু বিশেষভাবে কলিযুগে নাম-  
সঙ্কীর্ণনেরই প্রাধান্য দিয়াছেন। নাম-সঙ্কীর্ণন কলৌ পরম উপায়। নাম  
সঙ্কীর্ণনের দ্বারা সর্বানুগ্রহ দূরীভূত হইয়া পরশাস্তি লাভ হয়।

শ্রীভগবান্ অৰ্জুনকে পরাশান্তি লাভের উপায় বলিয়াছেন,—

“তমেব শরণং গচ্ছ সৰ্বভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শান্তম্ ॥”

হে ভারত! তুমি সৰ্বভাভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও। তাঁহার প্রসাদেই পরমা শান্তি লাভ করিতে পারিবে এবং নিত্য ধাম প্রাপ্ত হইবে। স্মরণ্য আমরা যদি ভগবানের পাদপদ্মে শরণাগত হইতে পারি তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা পরাশান্তি লাভের অধিকারী হইতে পারিব।

রোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবা স্মৃত গোস্বামী মূনিগণকে বলিলেন,—

“স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা স্প্রসাদতি ॥”

যে ধর্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রতিহতা (বিঘ্নাদি দ্বারা অনভিভূতা), অহৈতুকী (ফলাভিসন্ধান রহিতা) আত্মপ্রসাদ জননী ভক্তি জন্মে সেই ধর্মই জীবের পরম ধর্ম। শ্রীভগবৎপাদপদ্মে ভক্তি-বলেই আমাদের প্রসন্নতা লাভ হইবে এবং আমরা পরাশান্তি লাভ করিব।

আমরা হরিভজ্ঞন না করিয়া পিতৃদ্রোহী হইয়া পড়িবার জগৎ নিত্য শান্তি লাভের পরিবর্তে অশান্তি লাভ করিতেছি এবং ত্রিতাপে দগ্ধীভূত হইতেছি।

“জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ ।

পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ ॥

আমরা যদি ভগবানকে লাভ করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের সকল প্রকারের অশান্তি দূরীভূত হইয়া পরাশান্তি লাভ হইবে। নিত্যশান্তি প্রদাতা শ্রীভগবানকে লাভ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে ভক্তি। ভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিতেছেন,—

“ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধবঃ ।

ন স্বাধ্যায়স্তপন্ত্যাগো যথা ভক্তি-র্মমোক্ষিতা ॥”

হে উদ্ধব! মদীয় সাধনাত্মিকা প্রবলা ভক্তি আমাকে যেরূপভাবে বশীভূত করিতে পারে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, বেদপাঠ, তপশ্চা কিম্বা দানক্রিয়া আমাকে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন,—

“এতাবানেব লোকেহস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ ।

ভক্তিযোগো ভগবতি তন্মাম-গ্রহণাদিতিঃ ॥”

নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনাদি দ্বারা শ্রীভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ—তাহাই ইহ জগতে জীবনকালের পরম ধর্ম বলিয়া কথিত ।

“হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্তথা ॥”

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

“নাম সঙ্কীৰ্ত্তনে হয় সৰ্বানর্থ নাশ ।

সৰ্ব শুভোদয় কৃষ্ণ প্রেমের উল্লাস ॥

সঙ্কীৰ্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন ।

চিন্তাশুদ্ধি সৰ্ব ভক্তি সাধন উদগম ॥

কৃষ্ণ প্রেমোদগম প্রেমামৃত আশ্বাদন ।

কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥”

ভগবানের ভজন বাতীত পরশাস্তি লাভের কোন উপায় নাই । তাই ভক্ত গাহিয়াছেন,—

“এ ঘোর সংসারে, পড়িয়া মানব, না পায় দুঃখের শেষ ।

সাধুসঙ্গ করি’ হরি ভজে যদি, তবে অন্ত্য হয় ক্লেশ ॥

সংসার-অনলে, জলিছে হৃদয়, অনলে বাড়য়ে অনল ।

অপরাধ ছাড়ি’, কৃষ্ণনাম, লয় অনলে পড়য়ে জল ॥

নিতাই-চৈতন্ত, চরণ-কমলে, আশ্রয় লইল যেই ।

কৃষ্ণদাস বলে, জীবন-মরণে, আমার আশ্রয় সেই ॥”

ব্রহ্মহটভাষ্য মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের সর্বশেষে আমাদের সর্ব দুঃখ বিনাশের ও পরশাস্তি লাভের উপায় নির্ধারণ করিয়া বলিলেন,—

“নাম সঙ্কীৰ্ত্তনং যন্ত সৰ্ব পাপপ্রণাশনম্ ।

প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্ ॥”

অর্থাৎ—যাহার নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন সর্বপাপবিনাশন এবং নমস্কার সর্বদুঃখহর, সেই পরমপুরুষ শ্রীহরিকে প্রণাম করিতেছি ।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনমূলক ভক্তিই আমাদের একমাত্র পরশাস্তি লাভের উপায় ।

—শ্রীহরিনাম ভক্তিশাস্ত্রী

## শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬২ পৃষ্ঠার পর ]

ভগবান্ এবং ভক্ত দুজনে এক হয়ে যাবে, ত্রিপুটী বিনাশ হয়ে যাবে, জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা; উপাস্ত-উপাসক-উপাসনা সব এক হয়ে যাবে?—না, তা হবে না। এখানে পার্থক্য থেকে যাবে। বহু জায়গায় একটা শব্দ ব্যবহার হয়েছে। শব্দটা হল ‘বৈশিষ্ট্য’। অপ্রাকৃত দর্শনে এই শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে। তা না হলে ভুল বুঝাবুঝি হবে। ভগবান্ আর সাধক এক হয়ে যাবে?—না, তা কখনও হয় না, হবে না। ‘কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে।’ অর্থাৎ কৃষ্ণের সব গুণ পূর্ণমাত্রায় ভক্তের মধ্যে প্রবেশ করবে, এমন কথা নয়। তাত্ত্বিক দর্শনের কথাটা বলা হয়েছে।

৬৪টা গুণ সমন্বিত ভগবান্, ৬০টা গুণযুক্ত তত্ত্ব হলেন নারায়ণ, ৫৫টা গুণযুক্ত তত্ত্ব তাঁরা হলেন ব্রহ্মা শিবাদি দেবতা। আর জীবাত্তার স্বরূপে বিন্দু বিন্দু মাত্রায় ৫০টা গুণ আছে। আছে অর্থে ধরে নেওয়া হয়েছে যে ইঁা আছে, কিন্তু সকলের মধ্যে সবটা থাকবে এমন ত’ কথা নয়। ৫৫টা গুণ অধিক পরিমাণে রয়েছে ব্রহ্ম-শিবাদি দেবতার মধ্যে—একথা বলা হয়েছে। কিন্তু নারায়ণ তত্ত্বের বেলায় **Universal good qualities** ৬০টা আছে। ৬০টা গুণযুক্ত তত্ত্ব নারায়ণ বা বিষ্ণুতত্ত্বকে বলা হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে ৬০টা গুণ এবং ২৫ রস বিদ্যমান। এখানে গুণ নয়, রস। শান্ত, দাশ্য আর সখ্যের অর্ধেক। সখ্য দুইরকম—বিশ্রান্ত সখ্য ও গৌরব সখ্য। গৌরব সখ্য ভাবটা শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে আছে, লক্ষণের মধ্যে আছে। এখানে বড়দা, ছোটদা ভাবটা আছে। হাত-জোড় ভাবটাও আছে। চারজনই ত’ বিষ্ণু। নারায়ণকে চার টুকরো করে কাটলে প্রত্যেকটা হল পূর্ণ। প্রত্যেক **Part** সমান—**equal in all respect**. সেই চারজন এসেছেন রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। এখানে যদি কোন খণ্ডিত বিচার করা হয় ভুল হবে। তাহলে লক্ষ্মণ আবার শ্রীরামচন্দ্রের কাছে হাতজোড় করছেন কেন? তাহলে আবার চিত্রকূটে গিয়ে ভরত মহারাজ দাদা রামচন্দ্রকে স্তব-স্তুতি করছেন কেন? দাদা, তুমি কার পরে রাগ করে এলে? ভগবত্তার ভিতরেও এরকম ধরণের বিচারটা আছে।

“অল্ল করি না মানিহ দাস হেন নাম।

অল্ল ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্।”

জিনিষটা বুঝতে হবে। স্বয়ং বিষ্ণুতত্ত্ব হলেও সেখানে একটা সেবার মনোভাব আছে। তাই বলে শুদ্ধদর্শনটা উঠে যায়নি। তত্ত্বদর্শনে ঠরা সবাই নারায়ণ।

সমাজ আজ এ শিক্ষা পাচ্ছে না কেন? **Grey hair should be respected**—‘তিন মাথা যার, বুদ্ধি নেবে তার’—কথাটা বলা আছে। এখন ওসব চলবে না। এখন গুরু তুর্কী নেতার রাজত্ব। সেই নেতার রাজত্বে বাস করি আমরা। সুতরাং বর্তমানের নীতি—**‘Those old haggard should be banished from the society’**। এইসব বুড়ো-বুড়ীদের সমাজ থেকে নির্বাসিত করে দাও, তা না হলে এইসব নব্যপন্থীদের স্থবিধা হচ্ছে না আজকাল। এদের সমাজ থেকে হটিয়ে দাও, নির্বাসিত কর—এইসব বিচার ত’ আসবে! কি হবে! যেমন শিক্ষা তেমনই কর্ম। কোন ভবিষ্যৎ চিন্তা সেখানে নেই। কেন নেই? আমাদের দেশের মুনিঋষিগণের যে বিচার পাশ্চাত্যদেশে সেই বিচারগুলো নিয়েছে। তার ইংরেজী অনুবাদ হয়েছে। সেই কথাটা আমাদের দেশে এল। কথাটা কি?—**‘We think our forefathers and superiors fool, ours wiser sons and daughters will no doubt think us so.’** আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণ, আমাদের মাতাপিতা, আমাদের **Guardian**কে সব বোকা ভাবছি। কি হবে আমাদের?—আমাদের বংশধর যারা, তারাও আমাদের পরে ঠিক ঐ নীতি প্রয়োগ করবে।

ভয়ঙ্কর গালাগালি! কেন সমাজ আজ এসব চিন্তা করে না? এগুলো কি তারা পড়ে না? না পড়ে চুপ করে বসে থাকে? কেন সমাজ এসবগুলো দেখছে না! আমরা যদি আমাদের মুনি-ঋষিগণকে বোকা মনে করি, আমাদের পিতৃ-পুরুষগণকে বোকা মনে করি, আমাদের মাতাপিতাকে বোকা মনে করি, তাহলে আমাদের কোন মান-সম্মান থাকবে না, আমাদের কোন পরিচয় থাকবে না। যদি আমরা আমাদের অস্তিত্ব সংরক্ষণ করতে চাই, তাহলে **Guardian**-দের মানতে হবে। তা না হলে ‘তোমার শীল তোমার নোড়া, তোমারই ভাদ্রি দাঁতের গোড়া’—ঐ অবস্থাই হবে। এর জন্ত অপেক্ষা কর। যারা আজ ঠিক এই ধরনের আচরণগুলো করছেন তাদের জন্ত ঐ রকম ধরনের আচরণ অপেক্ষা করছে। তোমরা ত’ এই শিক্ষা দিয়েছিলে, তোমাদেরও এই অবস্থা হবে। রেহাই নেই কারো সমাজে। এসব শিক্ষাগুলো আজ মানুষ পায় না কেন?

আমরা কথায় বলি—‘এক মাঘে শীত যায় না।’ যদি আবার মাঘমাস বার বার ঘুরে ঘুরে আসে তবে কেন আমরা উন্টোপান্টো করব? কেন আমরা

শান্তশিষ্ট হয়ে শিষ্টাচার বজায় করে চলব না? কথাটা ত' এই। এটা ভুলে যাচ্ছি কেন আমরা? এই নাস্তিকতা আবার আমাদের স্বাড়ে চেপে বসবে। তখন কি করব আমরা? তখন কেঁদে আকুল। স্বতরাং সাধু সাবধান!

“হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! আধিকারিক দেববৃন্দের সহিত—এই নিখিল বিশ্ব ধীর বশীভূত, স্বতন্ত্র হরি শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে নিজের ভক্তের বশুত। প্রদর্শন করলেন।” কি দরকার পড়েছে তাঁর? তিনি ত' সর্বস্বকর্ষ। ‘ন তং সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে’—ধীর সমান কেউ নেই, অধিকও কেউ নেই, সেই তত্ত্ববস্তু হলে ভগবান। তাঁকে অস্বীকার করছি কেন? আমরা আমাদের বাহ্যহরি ফলাতে যাচ্ছি কার কাছে? নিখিল বিশ্ব ধীর বশীভূত সেই স্বতন্ত্র হরি। শুধু স্বতন্ত্র বললে একটু কম হয়, সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, স্বরাট বিশেষণ আছে তাঁর। তাঁর Autocracy আছে। Autocracy কাকে বলে?—Rules self Government। ভগবানের যে Autocracy তা কারও সঙ্গে তুল্যমূল্য নয়। সেখানে কোন কিছু চলবে না, তিনি কাকে কোনও ব্যাখ্যা দিতে প্রস্তুত নয়। Show cause করার পাত্র নন তিনি, তিনি সকলের Show cause করবেন। তাঁকে কেউ Show cause করতে পারবেন না—সেই তত্ত্ববস্তু হলেন ভগবান। সেই ব্যক্তি আবার ভক্তের বশুতা স্বীকার করছেন। যিনি স্বরাট, স্বাধীন, তিনি আবার পরাধীনতা স্বীকার করছেন। কিরকম পরাধীনতা?—তত্ত্ববশুতা—ভক্তের পরাধীনতা স্বীকার করছেন। শুনলেও ত' অবাক লাগে, তিনি আবার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছেন গোপীগণের কাছে ‘ন পারয়েহহম্’ বলে। এই শ্লোক রয়েছে ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে। আবার অগ্রাগ্র ভক্তগণের কাছেও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছেন যে, আমি তোমাদের কাছে ঋণী। এই সদৃশগুণটা যদি সর্বশক্তিমান ভগবানের থাকে, প্রেমের ঠাকুরের যদি থাকে, তাহলে আমাদের কেন থাকবে না? “অল্প সেবা বহু করি’ মানি।”—এতে সন্তুষ্ট হওয়া যাবে না কেন?

অলঙ্কে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদন সাধনে।

অবিক্রমমতিভূঁষা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ ॥

—এই যদি আমাদের জগৎ লেখা আছে শাস্ত্রে তাহলে আমরা কেন যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট হতে পারছি না? যথালাভে সন্তুষ্ট হতে পারছি না কেন? “সমঃ শর্জো চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।” কই মেনে নিতে পারছি না ত'। সেখানে ত' অনেক বক্তব্য। কি হবে? সবটা বিচার করে চলতে হবে আমাদের। অমানী মানদ ধর্মের ভিতরে এগুলো আছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগোরাক্ষো জয়তঃ

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা

ও

# শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-

মহোৎসবে আস্থান

( পুরীধামের প্রথানুসারে )

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য,

১০৮শ্রী শ্রীমন্তিক্রীষ্ণজ্ঞান কেশব

গোস্বামী মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

তেমরিপাড়া,

পোঃ নবদ্বীপ ( নদীয়া ) ।

৩১শে বৈশাখ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

অগ্ন্যায় বৎসরের ণায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উত্তোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাহুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আগামী ১২শে আষাঢ়, ১৪০৪ ( ইং ৪।৭।২৭ ) শুক্রবার হইতে ২২শে আষাঢ়, ১৪০৪ ( ইং ৪।৭।২৭ ) সোমবার পর্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীৰ্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের বিশেষ সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাট্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যহুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহৎ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্যে সহায়ভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবানুখী স্বকৃতি অর্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন সেবাপদ্ধি প্রদত্ত হইল।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সত্যব্রত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ( রেজিঃ )



## —: সেবাপঞ্জী :—

১। ১৯শে আষাঢ় (ইং ৪।৭।২৭), শুক্রবার—অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সন্ধিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে পাঠ, কীর্তন, আরতি ও বক্তৃতা।

২। ২০শে আষাঢ় (ইং ৫।৭।২৭), শনিবার—পূর্বাহ্ন ৭ ঘটিকায় নগর সঙ্কীৰ্তনমুখে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠান্তে গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন এবং মঠে প্রত্যাবর্তন।

৩। ২১শে আষাঢ় (ইং ৬।৭।২৭), রবিবার—শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা; অপরাহ্ন ৫টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সঙ্কীৰ্তনযোগে শোভাযাত্রাসহ রথাক্রম শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যায় আরাত্রিক, সঙ্কীৰ্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।

৪। ২২শে আষাঢ়, ৭ই জুলাই, সোমবার হইতে ২৪শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই বুধবার পর্যন্ত দিবসত্ৰয় প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত সঙ্কীৰ্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।

৫। ২৫শে আষাঢ় (ইং ১০।৭।২৭), বৃহস্পতিবার—হেরাপঞ্চমী-দিব সে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও নগর-সঙ্কীৰ্তন। অপরাহ্ন ৫টা হইতে সঙ্কীৰ্তন, সন্ধ্যায় আরাত্রিক, তদন্তর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

৬। ২৬শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই, শুক্রবার হইতে ২৮শে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই, রবিবার পর্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীৰ্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে বক্তৃতা।

৭। ২৯শে আষাঢ়, (ইং ১৪।৭।২৭), সোমবার—অপরাহ্ন ৩টা হইতে সঙ্কীৰ্তন ও শোভাযাত্রাযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা। পরে শ্রীমঠে সঙ্কীৰ্তন, আরতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সাধারণ মহোৎসব।

---

দ্রষ্টব্য: কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে “সাধারণ-সম্পাদক” শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম্ ।

অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিল্লশৃণু ॥

অত্ৰ ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।

হরি-কথায় রতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

৪৯শ বর্ষ

২৪ ত্রিবিক্রম, বাসুদেব, ৫১১ শ্রীগোরাঙ্গ  
৩২ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৪০৪, ইং ১৫/৬/৯৭

৪র্থ সংখ্যা

সান্নুবাদং

## শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদবিবরহদশকম্,

[ ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক-শ্রীধর-মহারাজ-কৃতম্ ]

হা হা ভক্তিবিনোদঠাকুর! গুরো! দ্বাবিংশতিস্তে সমা

দীর্ঘদুঃখভরাদশেষবিবরহাদুঃস্বীকৃতা ভূয়িম্ ।

জীবানাং বহুজন্মপুণ্যানিবহাকৃষ্টো মহীমণ্ডলে

আবির্ভাবকুপাং চকার চ ভবান্ শ্রীগৌরশক্তিঃ স্বয়ম্ ॥ ১ ॥

হা হা! ভক্তিবিনোদ ঠাকুর! হে পরমগুরো! এই দ্বাবিংশবর্ষকাল দীর্ঘদুঃখময় আপন অপরিদ্রীম বিরহে এই পৃথিবী হৃদশাগ্রস্ত হইয়াছে। জীব-গণের বহুজন্ম-স্মৃতিপুঞ্জদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শ্রীগৌরশক্তি আপনি স্বয়ং এই ভূমণ্ডলে কৃপাপূর্বক আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

দীনোহং চিরহৃৎকৃতির্নহি ভবৎপাদাজ্জধূলিকণা-  
 স্নানানন্দনিধিং প্রপন্নশুভং লব্ধুং সমর্থোহভবম্ ।  
 কিস্তেন্দোদার্য্যগুণাত্ত্বাতিযশসঃ কারুণ্যশক্তিঃ স্বয়ম্  
 শ্রীশ্রীগৌরমহাপ্রভোঃ প্রকটিতা বিশ্বং সমগ্রহীৎ ॥ ২ ॥

আমি দীন ও অতি হৃৎকৃতি, তজ্জগুই আর পাদপদ্মধূলিকণায় স্নানানন্দরূপ  
 প্রপন্নমঙ্গলপ্রদ নিধিলাভ আমার ভাগ্যে ঘটিল না । কিন্তু আপনার উদারতাগুণে  
 মহাপ্রভু শ্রীগৌরাক্ষের করুণাশক্তি স্বয়ং মহাযশা আপন হইতে প্রকাশিত হইয়া  
 এই বিশ্বকে অগ্রগ্রহ দান করিলেন ( অর্থাৎ বিশ্বের অন্তর্গত হওয়ায় আমি  
 তাঁহার অগ্রগ্রহ প্রাপ্ত হইলাম ) ॥ ২ ॥

হে দেব ! স্তবনে তবাখিলগুণানং তে বিরিঞ্চাদয়ে  
 দেবা ব্যর্থমনোরথাঃ কিমু বয়ং মর্ত্যধমাঃ কুর্মহে ।  
 এতন্মো বিবুধৈঃ কদাপ্যতিশয়ালঙ্কার ইত্যাচ্যতাং  
 শাস্ত্রেষেব 'ন পাররেহ'মিতি যদগীতং মুকুন্দেন তৎ ॥ ৩ ॥

হে দেব ! আপনার নিখিল গুণরাশির ( হুত্বাবে ) স্তব করিতে যখন সেই  
 ব্রহ্মাদি দেবগণও ব্যর্থমনোরথ হন, তখন অধম মনুষ্যমাত্র আমাদের কা কথা ।  
 এই উক্তিকে পণ্ডিতগণ কখনও অতিশয়ালঙ্কার বলিবেন না । কারণ ভগবান্  
 স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই ( তোমাদের ভক্তির প্রতিদান দিতে ) “আমি পারি না” বলিয়া  
 শাস্ত্রসমূহে সেই প্রসিদ্ধ গান গাহিয়াছেন ॥ ৩ ॥

ধর্ম্মচর্ম্মগতোহজ্ঞতৈব সততা যোগশ্চ ভোগাত্মকে  
 জ্ঞানে শূন্যগতির্জপেন তপসা খ্যাতির্জিঘাংসৈব চ ।  
 দানে দাস্তিকতাহনুবাগভজনে দুষ্টাপচারো যদা  
 বুদ্ধিং বুদ্ধিমতাং বিভেদ হি তদা ধাত্রা ভবান্ প্রেষিতঃ ॥ ৪ ॥

যে সময়ে ধর্ম্ম চর্ম্মবিচারময়, অজ্ঞতাই সাধুতা এবং যোগ ভোগাত্মক  
 —যখন জ্ঞানাত্মীলনে শূন্যমাত্র গতি এবং জপ ও তপস্যার যশঃ ও পরহিংসাই  
 অব্যবধানের বিষয়—যখন দানে দাস্তিকতার অনুশীলন এবং অনুবাগ ভক্তির নামে  
 ঘোরতর পাপাচার প্রভৃতি বিচার বুদ্ধিমান জনগণেরও বুদ্ধিভেদ ঘটাইতেছিল,  
 ঠিক সেই সময়ে বিধাতাকর্তৃক আপনি প্রেরিত হইলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বহস্মিন্ কিরণৈর্ঘথা হিমকরঃ সঞ্জীবয়ন্মোবধী-  
 নক্ষত্রাণি চ রঞ্জয়ন্নিজসুধাং বিস্তারয়ন্ রাজতে ।  
 সচ্ছাত্রাণি চ ভোষয়ন্ বুধগণং সম্মোদয়ন্তে তথা  
 নূনং ভূমিতলে শুভোদয় ইতি হ্লাদো বহুঃ সাত্বতাম্ ॥ ৫ ॥

এই বিশ্বে হিমকর চন্দ্র যেরূপ কিরণসমূহদ্বারা ওষধিসকলকে সঞ্জীবিত ও তারাগণকে রঞ্জিত করিয়া নিজ জ্যোৎস্নামৃত বিস্তার করিতে করিতে শোভা পাইতে থাকেন, তদ্রূপ শুদ্ধ শাস্ত্রসমূহের (অনুশীলনদ্বারা) তোষণ এবং পণ্ডিতগণের (শ্রীত সিদ্ধান্তদ্বারা) পূর্ণানন্দ বিধান করিয়া নিশ্চিতই এই পৃথিবীতে আপনার শুভোদয়। ইহাতে সান্ত্বতগণের স্বথের সীমা নাই ॥ ৫ ॥

লোকানাং হিতকাম্যসা ভগবতো ভক্তিপ্রচারস্তয়া

গ্রন্থানাং রচনৈঃ সতামভিমতৈর্নানাবিধৈর্দর্শিতঃ।

আচার্যোঃ কৃতপূর্বমেব কিল তদ্ভামানুজ্ঞাতৈবুধৈঃ

প্রেমান্তোনিধিবিগ্রহসা ভবতো মাহাত্ম্যাসীমা ন তৎ ॥ ৬ ॥

লোকসমূহের কল্যাণার্থে আপনি বহু গ্রন্থের রচনাদ্বারা এবং সাধুসম্মত নানাবিধ উপায়ে শ্রীভগবন্ত্তি প্রচার প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরামানুজ প্রভৃতি মনীষিগণ ও অগ্রান্ত অনেক আচার্য্যও এই প্রকার কার্য্য পূর্বকালে করিয়াছেন, এইরূপ শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু প্রেমামৃত-মূর্ত্তিস্বরূপ আপনার মাহাত্ম্যাসীমা তাহাতেই (আবদ্ধ) নয় ॥ ৬ ॥

যদ্ব্যমঃ খলু ধাম চৈব নিগমে ব্রহ্মোতি সংজ্ঞায়তে

যস্যংশস্য কলৈব দুঃখনিকরৈর্যোগেশ্বরৈর্মুগ্যতে।

বৈকুণ্ঠে পরমুক্তভূঙ্গচরণো নারায়ণো যঃ স্বয়ম্

তস্যংশী ভগবান্ স্বয়ং রসবপুঃ কৃষ্ণো ভবান্ তৎপ্রদঃ ॥ ৭ ॥

ঐহার চিকামের জ্যোতির্মাত্র 'ব্রহ্ম' সংজ্ঞায় বেদে সংজ্ঞিত হইয়াছেন, ঐহার অংশাংশের অংশমাত্র যোগেশ্বরগণ বহুদুঃখ স্বাকার করিয়া অন্বেষণ করেন, পরমমুক্তকুল ঐহার পাদপদ্মে মধুকরস্বরূপে শোভমান, সেই পরব্যোমনাথ সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণেরও যিনি অংশী স্বয়ং ভগবান্ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ—তাহাকেই আপনি প্রদান করেন ॥ ৭ ॥

সর্ব্বাচিন্ত্যময়ে পরাৎপরপুরে গোলোক-বৃন্দাবনে

চিল্লীলারসরঞ্জিনী পরিবৃত্তা সা রাধিকা শ্রীহরেঃ।

বাৎসল্যাতিরসৈশ্চ সেবিত-তনোর্মাদুর্ধ্যাসেবাসুখং

নিত্যং যত্র মুদা তনোতি হি ভবান্ তদ্ব্যমসেবাপ্রদঃ ॥ ৮ ॥

সর্ব্বপ্রকারে অচিন্ত্যগুণময় পরব্যোমের পরমোচ্চ প্রদেশে গোলোক-নামক শ্রীবৃন্দাবনধামে, যেখানে সখীজনে পরিবৃত্ত হইয়া সেই চিন্ময়লীলারস-বিলাসিনী শ্রীমতী রাধিকা বাৎস্যাদি-রসচতুষ্টয়সেবিত-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্যরসময়

সেবাহুত নিত্যকাল পরমানন্দের সহিত বিস্তার করিতেছেন, আপনি সেই ধামের সেবা প্রদান করিতে পারেন ॥ ৮ ॥

শ্রীগৌরাহুমতং স্বরূপবিদিতং রূপাগ্রজেনাদৃতং  
রূপাত্মৈঃ পরিবেশিতং রত্নগুণৈরাশ্বাদিতং সেবিতম্ ।  
জীবাতৈরভিরক্ষিতং শুক-শিব ব্রহ্মাদি-সম্মানিতং  
শ্রীরাধাপদসেবনামৃতমহো তদাতুমীশো ভবান্ ॥ ৯ ॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের অল্পজ্ঞানকৃষ্ণ শ্রীস্বরূপ দামোদর যাহার মধ্যজ্ঞ, শ্রীসনাতন গোস্বামী যাহার আদরকারী, শ্রীরূপপ্রমুখ রসতত্ত্বাচার্য্যগণ যাহা পরিবেশন করিতেছেন, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রমুখ যাহা আশ্বাদন ও সমৃদ্ধ করিতেছেন, শ্রীজীবপ্রভু প্রভৃতি যাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন এবং শ্রীশুক, দেবাদিদেব মহাদেব ও লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রভৃতি যাহা ( দূর হইতে ) সম্মান করিতেছেন—অহো সেই শ্রীরাধাপদপরিচর্য্যারনামৃত—তাহাও দান করিতে আপনি সমর্থ ॥ ৯ ॥

কাহং মন্দমতিস্তৃতীবপতিতঃ ক জ্ঞ জগৎপাবনঃ  
ভো স্বামিন্ কৃপয়াপরাধনিচয়ো নুনং ত্বয়া ক্ষম্যতাম্ ।  
যাচেহং করুণানিধে ! বরমিমং পাদাজমূলে ভবৎ-  
সর্ব্বস্বাবধি-রাধিকা-দয়িত-দাসানাং গণে গণ্যতাম্ ॥ ১০ ॥

কোথায় আমি মন্দমতি, অতি পতিতজন, আর কোথায় আপনি জগৎপাবন মহাজন ! হে প্রভো ! কৃপাপূর্ব্বক ( এই স্তবকারী ) আমার অপরাধসমূহ আপনি নিশ্চিতই ক্ষমা করিবেন । হে করুণাসাগর ! আপনার পাদপদ্মমূলে এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনার প্রাণসর্ব্বস্ব শ্রীবার্ধভানবীদয়িতদাসগোষ্ঠীমধ্যে আমাকে গণনা করিয়া কৃতার্থ করুন ॥ ১০ ॥

## প্রস্তোত্তর

### নামকীর্তন

১। শুদ্ধ হরিনাম-কীর্তনকারীর কি কি লক্ষণ থাকা আবশ্যক ?

“নিরপরাধেন হরিনামকৃতং বিষয়বিরক্তিজ্ঞানিতদৈগ্য়ং নির্ম্মৎসরতালঙ্ঘতা দয়া, মিথ্যাভিমানশূন্যতা, সর্ব্বেষাং যথাযোগ্যসম্মাননা চৈতানি লক্ষণানি ।”

—শ্রীশিঃ—সঃ ভাঃ ৩

২। হরিকীর্তন কিরূপ ক্রম-বিধিতে প্রপঞ্চে বিজয় লাভ করেন ?

“জাতয়া শ্রদ্ধয়া গুরুচরণাশ্রয়রূপ-সৎসঙ্গপ্রভাবাৎ তত্ত্বশ্রবণং ঘটতে । শ্রবণানন্তরং

যদা তৎকীর্তনং ভবতি, তদা মায়াদমনপ্রক্রিয়ারূপ-জীবস্বরূপ-বিক্রম এব লক্ষ্যতে—  
প্রপঞ্চে হরিকীর্তনবিজয়াসৌম্য প্রক্রিয়া ।” —শ্রীশিঃ—সং ভাঃ ১

৩। সঙ্কীৰ্তনের তাৎপর্য কি ?

“সঙ্কীৰ্তনাদির প্রয়াস—কেবল হৃদয় উদ্ঘাটনপূর্বক প্রভুর নামোচ্চারণ ।”

—‘প্রয়াস’, সং ভাঃ ১০।২

৪। কিরূপ বিধি অবলম্বন করিলে বিষয়-প্রতিবন্ধক দূর হইয়া নামানুশীলনের  
নৈরন্তর্য্য হয় ?

“প্রথমে অভ্যাসকাল নির্জনে একাগ্র হইয়া নাম করিবে। ক্রমে নামসংখ্যা  
বৃদ্ধি করিতে করিতে নামানুশীলনের নৈরন্তর্য্য এবং বিষয়-প্রতিবন্ধকের ক্ষয় অবশ্য  
হইবে ।” —‘ভজনপ্রণালী’, হঃ চিঃ

৫। অমর্থগ্রস্ত সাধকের পক্ষে নামানুশীলনে কোন উপায় অবলম্বনীয় ?

“প্রতিদিন নির্জনে কিয়ৎকাল বিষয়োৎপাত ত্যাগপূর্বক ভাবের সহিত নাম  
করিবে, ক্রমে ক্রমে ঐ কার্যের সময়ের পরিমাণকে বৃদ্ধি করিবে। অবশেষে  
সকল-সময়েই এক অদ্ভুতভাব উদ্ভিত হইবে; তখন উৎপাত নিকটে আসিতে  
ভয় করিবে ।” —জৈঃ ধঃ ৪০শ অঃ

৬। নিরন্তর নামকীর্তন কাহাকে বলে ?

“নিদ্রাকাল ব্যতীত দেহব্যাপারাদির নির্বাহকালে ও অন্য সময়ে সর্বদা শ্রীনাম-  
কীর্তন করার নামই নিরন্তর নামকীর্তন ।” —জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

৭। শ্রীতুলসীর সংস্পর্শ কিরূপ বুদ্ধিতে হরিনাম গ্রহণীয় ?

“তুলসী-হরিপ্রিয়-বস্ত্র, সূতরাং তৎসংস্পর্শে নামের অধিক বল অনুভব করা  
যায়। নাম করিবার সময় ক্রমের স্বরূপ ও নামে অভেদবুদ্ধিপূর্বক নাম  
করিবে ।” —জৈঃ ধঃ ২৩শ অঃ

৮। অপ্রতিহীন হইয়া অধিক নামগ্রহণ করা শ্রেয়ঃ কি ?

“নাম অধিক সংখ্যা হইবে—এই চেষ্টা অপেক্ষা নিরন্তর স্পষ্টাক্ষরে ভাবযুক্ত  
নামকীর্তন হয়—ইহার জগ্ন যত্ন করা উচিত ।” —‘প্রমাদ’, হঃ চিঃ

৯। জগতে কোন ধর্ম্মে সর্বধর্ম্মের পরিণতি হইবে ?

“জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, সে-সমস্তই পরিপক্যাবস্থায় এক নাম-সঙ্কীৰ্তন-  
ধর্ম্ম হইয়া পড়িবে,—ইহা নিশ্চয়-সত্য বলিয়া বোধ হয় ।”

—‘নিত্যধর্ম্ম-স্বর্ঘ্যোদয়’, সং ভাঃ ৪।৩

১০। শ্রীভক্তিবিনোদের সম-সাময়িক যুগে কলিকাতায় কোন সময় প্রথম  
সঙ্কীৰ্তন প্রচারিত হয় ? শুদ্ধভাবে কিরূপে হরিকীর্তন অনুষ্ঠিত হইতে পারে ?

“শ্রীগৌরঙ্গ-সমাজের নেতৃপক্ষদিগের মনে একটা ভাব উঠিল, সেই ভাবদ্বারা চালিত হইয়া নগরবাসীদিগের সাহায্যে বিড়ন্ স্ট্রীটে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মদিনে প্রথম সঙ্কীর্তন হয়। অনেকানেক বৃদ্ধলোকের মতে—এরূপ সঙ্কীর্তন-মহোৎসব কলিকাতা মহানগরীতে আর কখনও হয় নাই। \* \* কি পাষণ্ড, কি ভগবদ্ভক্ত—সকলেই এক মনে শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর জন্মদিনে এইরূপ সমারোহে সর্বদেশে নামসঙ্কীর্তন হওয়া আবশ্যক। সেই মহোৎসব হইতে নগরবাসিগণ কীর্ত্তনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। এমত কি, অল্প সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বহু-ব্যয়পূর্ব্বক প্রত্যেক পল্লীতে একটা কীর্ত্তন দল স্থাপিত হইল। \* \* এটা বড় সুখের বিষয় যে, ভারতের সর্ব্বপ্রদেশস্থ লোকেরা কলিকাতায় থাকিয়া শ্রীনাম-কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছেন। বিশেষতঃ পশ্চিমের লোকের, যাহারা কখনও মহাপ্রভুর নাম শুনে নাই, তাহারাও শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনে যোগ দিয়া নিত্যানন্দ-গৌরঙ্গ নামে উন্নত হইয়াছে। বড়বাজারের বহুতর দোকানদার ও দালাল প্রভৃতি পশ্চিম-নিবাসিগণ বহু যত্নে ও বহু অর্থ ব্যয়ের দ্বারা নগর-কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীর নিবাসিগণ আপন আপন পল্লীতে মহাসমারোহে কীর্ত্তন করিয়াছেন। \* \* আমরা শ্রীগৌরঙ্গ-প্রভুর জন্মদিবসে কীর্ত্তনের জন্মভূমি মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে জন্ম-মহোৎসবে নিযুক্ত ছিলাম। কয়েকদিন পরে কলিকাতায় আসিয়া \* \* কয়েকটা কীর্ত্তন দেখিয়া আমাদের মনে এই প্রকার ভাব হইল, \* \* যে কলিকাতায় ধর্ম্ম একেবারে উঠিয়া যাইতেছিল, সেই কলিকাতায় প্রভুর শক্তিক্রমে সর্ব্বধর্ম্মের সারধর্ম্ম যে হরিকীর্ত্তন, তাহাই প্রবল হইয়াছে; কিন্তু মহাপ্রভু এই সকল কার্য্যে উৎসাহ দিয়াও তাঁহার অতি গুণ্ড রহস্য যে প্রেম, তাহা এই মহানগরীতে বিতরণ করেন নাই। যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছেন ও আপনাকে প্রচার করিবার জগৎ সর্ব্বপ্রকার লোককে মতি দিয়াছেন, এমত অগাধ সুখ-পরিত্যাগেরও শক্তি দিয়াছেন; কিন্তু বিস্তৃত প্রেমভক্তির দ্বার উদ্ঘাটন করেন নাই। কীর্ত্তনকারীদিগের হৃদয়ে কীর্ত্তনস্পৃহা দিয়াছেন; কিন্তু পূর্ব্ব-মহাজনদিগের পথে অক্লান্ত হইবার জগৎ প্রবৃত্তি আজও দেন নাই। চর্ম্ম-পাত্ৰকা ছাড়িয়া অনেকে খোল-করতালের সহিত কীর্ত্তন করিতেছেন, তথাপি অনেকের গলায় ভুলসীমালা দেখিলাম না। যদিও কেহ কেহ ধারণ করিয়াছেন, সে মালাগুলিও নূতন, তাহাতে অনেক সন্দেহ হয়। অনেকের অঙ্গে দ্বাদশ তিলক শোভা করিতেছে না। আজ নিমতলার ঘাটে, কল্যা জোড়াসাঁকোয়, আবার একদিন স্বামাপুরে মহাজনী-প্রণালীতে

কীৰ্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্ত গিয়া দেখি, কোথাও মেইরূপ পাইলাম না।  
 জাড়া, বাউল, যাত্রা, থিয়েটার, এই সকল সুরে রঙ্গের গান শুনিলাম, তাহাতে  
 আমাদের যে-পরিমাণ দুঃখ হইল, তাহা মধ্যে মধ্যে 'হরি', 'কৃষ্ণ', 'রাম' এই  
 সকল নিত্য নাম শ্রবণ করিয়া কথঞ্চিৎ দূর হইল। যাহাদের হৃদয়ে প্রেমভক্তি  
 আছে, তাঁহারা প্রায়ই প্রাচীন নামের সুর ভালবাসেন। তাঁহারা বাজে কথা  
 গান করিতে বা শুনিতে চান না। তাঁহারা প্রাচীনভাবে শুদ্ধ হরিনাম গান  
 করেন ও শ্রবণ করেন। এই মহানগরীর পল্লীবাসিগণ আজকাল সংস্কারভাবে  
 শুদ্ধভক্তির স্বভাব সহজে লাভ করেন না। কাজে কাজেই তাঁহারা স্বকপোল-কল্পিত  
 পদ্ধতি অবলম্বন করেন। \* \* যাহাই হউক, আমাদের শ্রীগোরাঙ্গ-প্রভু বড়ই দয়ালু।  
 তিনি যখন কলিকাতা মহানগরীর প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিয়া কীৰ্ত্তনে মতি  
 দিয়াছেন, তখন আমরা ভরসা করি যে, এই মহানগরবাসিগণের হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে  
 শুদ্ধভক্তির সঞ্চার করিবেন। কতকগুলি লোকে বলেন যে, নগরবাসিগণ প্লেগের  
 আগমনে এই সকল কীৰ্ত্তনপ্রথা সৃষ্টি করিয়াছেন। \* \* যে-সকল লোক কীৰ্ত্তন-  
 বিরোধী তাহারা দেশের যে পরম শত্রু, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের  
 আর একটা কথা আছে। সঙ্কীৰ্ত্তন হউক, কিন্তু পূৰ্ব্বদিন অবলম্বন করা আবশ্যিক।  
 দশ পৌৰ্ণমাসী, একাদশী, গৌর-পূর্ণিমা, কৃষ্ণাষ্টমী, কার্তিক মাস, বৈশাখ মাস,  
 ভগবানের যাত্রা-সকল, সংক্রান্তি—এই সকল পূৰ্ব্বদিন অবলম্বন করিয়া হরিকীৰ্ত্তন  
 হইলে ভাল হয়। প্রাচীন মহাজনীসুরে খোল-করতাল ইত্যাদি প্রাচীন যন্ত্র লইয়া  
 নিজে নিজে পবিত্র বৈষ্ণব-ভাবে শ্রীনাম-কীৰ্ত্তন করিয়া নগরবাসিগণ আমাদের  
 হৃদয়ে পরমানন্দ দান করুন। \* \* \* শ্রীগোরাঙ্গ—জগদগুরু। তিনি তাহাদিগকে  
 ইচ্ছামত ফল অবশ্য প্রদান করিবেন।” —‘কলিকাতায় কীৰ্ত্তন’, পৃ: তো: ১১৩

১১। শ্রীনামকীৰ্ত্তনকারীর ভিক্ষা কি ?

“(রাধা) কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল,

এইমাত্র ভিক্ষা চাই।

(যায়) সকল বিপদ, ভক্তিবিনোদ,

বলেন, যখন ও নাম গাই।”

—গী:

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর



## শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

মূল মালিকের উপর নির্ভর করিলেই সকল মঙ্গল। আমরা যে যতটা যতক্ষণ অশরণাগত, সে ততটা ততক্ষণ অমঙ্গলকে আলিঙ্গন ক'রে র'য়েছি। যে মুহূর্তে আমরা শরণাগত, সেই মুহূর্তেই মঙ্গল আমাদের হস্তামলক। কৃষ্ণ আমাদের ক্রেশ দিতে আনেন নাই। আমরা নিজের কর্তৃত্বে নিজের অমঙ্গল ও ক্রেশ বরণ ক'রেছি। তাঁর মঙ্গলময়ী বাণীতে শ্রদ্ধা হ'লেই আমাদের কর্তৃত্বাভিমান বিদূরিত হয়; তখন আর আমরা কর্মবীর সা'জতে ধাবিত হই না, তাঁর বাণী শ্রবণের জগ্ন তাঁর শ্রীচরণে শরণাগত হই।

মাছুষ যেকাল-পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবৎ-পাদপদ্মেবায় নিযুক্ত না হ'বে, সেকাল-পর্যন্ত মায়াদেবী তাঁকে গ্রাস ক'রবে—বহুরূপিনী মায়া তাঁর ইন্দ্রিয়জ্ঞানের পদার্থ হবেন।

অনর্থ নিবৃত্তি না হ'লে কেহ ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হ'তে পারেন না। শ্রবণ-অভাবে শ্রদ্ধা হয় না। ভক্তের কথায় যা'দের মনোযোগ নাই, যা'রা ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত, ভোগে কি ক'রে সুবিধা হ'বে, তা'তে মনোযোগী; তা'দের নিজ মঙ্গলের জগ্ন চেষ্টা নাই। অনর্থ থাকলে কেবল ভোগের কথা ভাল লাগে, প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রয়োজনতত্ত্ব ভাল লাগে না। অসংসঙ্গপ্রভাবে এই দুর্বুদ্ধি হয়; আর সংসঙ্গে কৃষ্ণ—ভোক্তা, এই জ্ঞান হয়।

অনর্থযুক্ত ব্যক্তিকে জোর ক'রে প্রসাদ খাওয়াতে হ'বে, যা'র আদৌ ইচ্ছা নাই, তা'কে প্রসাদ দিতে হ'বে। প্রসাদ খেতে খেতে কনিষ্ঠাধিকার লাভ হয়। ভক্তি কিছুমাত্র থাকলে ভগবান্ এমন বন্দোবস্ত ক'রে দেন যে, অনেক জিনিষ আপনা হ'তে আসে। ভগবান্ ভাল মন্দ অনেক দ্রব্য পাঠিয়ে দেন। তিনি যা' দেবেন, তা'ই মাথা পেতে পাওয়া দরকার। স্বাধ্যমাধিকারীর দরকার ভগবান্-হিমা, ভগবৎপ্রসাদ-মহিমা অগ্ন লোককে জানান।

তর্কপথ পরিত্যাগ ক'রে শ্রোতপথ গ্রহণ ক'রতে হ'বে—শ্রবণ ক'রতে হবে। আগেই চোখ দিয়ে দেখতে হ'বে না। তা' হলে কাজিল হ'য়ে প'ড়তে হ'বে। মহাজনের আচরণ আগেই চোখ দিয়ে দেখতে গেলে আলোকরশ্মিক হ'য়ে অসুবিধায় প'ড়তে হ'বে। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম হ'তে শ্রোতপরম্পরাক্রমে আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম পর্যন্ত সুনির্মলতা আছে।

যিনি বিষ্ণুসেবা করেন, তাঁরই চক্ষু আছে। আমার ক্ষুদ্র চক্ষু। যা' সামনে

আছে, আমি কেবল তা'ই দেখতে পাচ্ছি—যেসব খারাপ কাজ ক'রেছি তা' ভুলে গিয়ে নিজেকে ভাল ব'লে অভিমান ক'রছি।

যা'দের দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় নাই, তা'রা নিজে প্রভু হ'য়ে সেবা গ্রহণ করে। যা'রা ভগবদ্ভক্তিবিধিষ্ট ব্যক্তির ভজনে সাহায্য করেন, তাঁ'র দেবা করেন, তাঁ'রা ধন্য। যা'রা মুক্তজীবের আশ্রয়ণীয় ভক্তি আশ্রয় না ক'রবেন, তাঁ'রা ভিন্ন জন্মে বধ্য পশুর জায় অহুতাপ ক'রবেন। যখন কোন ব্যক্তি কর্মকাণ্ডে, জ্ঞানকাণ্ডে ও অজ্ঞাভিলাষিতায় আবদ্ধ থাকে, তখন আমরা জান'তে পারি যে, সে ম'রে গিয়েছে।

প্রয়োজনসম্বন্ধিতে কৃষ্ণ আনন্দিত হন। তদনুগত ব্যক্তিগণের অস্তিত্ব যদি তাঁ'র সহিত dovetailed (যথাযথ সম্বন্ধযুক্ত) হ'য়ে যায়, তা' হ'লে সেই আনন্দের অংশ অনুগত ব্যক্তিদিগের লভ্য হ'বে।

ভগবানকে আশ্রয় করা এক জিনিষ, আর সেবার নামে নিজের খেয়ালে চলা আর একটা জিনিষ। যিনি শ্রেয়ঃপথের কথা বলেন,—বিষ্ণু-বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, তিনি বাস্তবিক উপদেশক। যিনি তাহা না করেন, অথ কিছু উপদেশ দেন, তিনি দুঃসঙ্গ। যা'রা নিরন্তর ভগবৎসেবা করেন এবং অপরকে ভগবৎসেবায় উদ্বুদ্ধ করেন, তাঁ'রাই প্রকৃত সাধু, তাঁ'হাদের সঙ্গ ক'রতে হ'বে।

গুরুদেব দেবা গ্রহণ করুন, ইচ্ছা হয় না করুন, আমি কিছু নিকপটে কায়-মনো-বাক্যে সর্বদা সর্বতোভাবে তাঁ'র ঐকান্তিকী সেবা ক'রবার জন্ত প্রস্তুত থাক'ব। তিনি যদি পদাঘাত করেন, তা' হ'লে জান'ব—আমার অযোগ্যতা, কিন্তু গুরুপাদপদ্ম সত্য। কণ্ঠভঙ্গুর বিষয় যেন আমাকে গুরুপাদপদ্মের সেবা হ'তে—বাস্তবসত্য গুরুপাদপদ্ম হ'তে ফণিকের জগুও বিমুখ ক'রতে না পারে। গুরুদেব আমার সেবা গ্রহণ করুন—আমার যেন কোন দুঃসঙ্গ না হয়—আমি যেন গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্যুত না হই। আমার পূজা ক'রবার জন্ত চেষ্টা গুরুদেব করুন। গ্রহণ ক'রবেন জানি না, কিন্তু অযোগ্যকে তিনি অধিক দয়া ক'রে থাকেন—এই আমার ভরসা। আমি তাঁ'র অহৈতুকী দয়ার আশাবদ্ধ নিয়ে গুরুপাদপদ্মের সেবায় অধিকতর লোভাযুক্ত হব।

যিনি দিব্যজ্ঞানদ্বারা আমার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে regulate ক'রে কৃষ্ণসেবায়—হৃদীকেশের সেবায় নিযুক্ত করেন, তিনি গুরুদেব। গুরুদেব যে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তা' বিশ্বস্ত হ'লেই নানারূপ অনর্থ এসে আমাদের সর্বনাশ সাধন করে। তখন আবার সেই বৈকুণ্ঠ দেবতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট সেই দিব্যজ্ঞান-ধন-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জানাতে হ'বে। কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্যলীলার অবিস্মৃতি হ'তে আমাদের **positive** মঙ্গল হ'বে।

## বৈচিত্র্যের হেতু

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত তথা চিং ও অচিদ্রাজ্যে সর্বত্রই বৈচিত্র্যের বর্তমানতা অনস্বীকার্য। শুধু তাহাই নহে, এই বৈচিত্র্যকে বিদূরীত করত সাম্যসাধন-চেষ্টাও প্রবল দেখা যায়। অণু ও বৃহৎ, অস্ত ও বিজ্ঞ, বিদ্বান্ ও মূর্থ, ধনী ও দরিদ্র, সুখী ও দুঃখী, উচ্চ ও নীচ প্রভৃতি ভেদ অব্যাহিত হইলেও সর্বত্র বিद्यমান। দেবতা, মনুষ্য ও মনুষ্যোত্তর সকল প্রাণীর মধ্যেই এই বৈষম্য বিরাজিত এবং সর্বত্রই ইহার বিলোপসাধনের চেষ্টা চলিতেছে। এই বৈচিত্র্য দূরীভূত হইলেই শান্তিলাভ সম্ভব—বিচারও প্রবাহিত। পরন্তু এই প্রচেষ্টা অনাদিকাল হইতে প্রসূত হইলেও অতাবধি সফল হয় নাই, এবং এই প্রচেষ্টা পরিত্যক্তও হইতেছে না। এই রহস্যের উৎস যাহারা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা ই ধর্ম ও শান্তিলাভে সক্ষম বলিয়া জানা যায়।

ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিন্নস্তে সর্বসংশয়াঃ।

ক্ষীয়েন্তে চাস্য কৰ্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেহখিলাত্মনি ॥ ( ভাঃ ১১।২০।৩০ )

অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত না শ্রীভগবানের দর্শনলাভ ঘটে, ততদিন পর্য্যন্ত এই প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয় না ; ভগবদ্দর্শনেই সমস্ত সংশয় বিদূরীত হয়।

শ্রীমদ্ব্যাহরভূর বাণী—“স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্।” অর্থাৎ জীব স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। সুখ-দুঃখ, শোক-শান্তি জীব স্বীয় কর্ম্মানুসারেই ভোগ করে। অতএব ইহার জন্ত দায়ী নহে। জীব পরন্তু হইয়াও স্বতন্ত্র হওয়ায় নিজেই তাহার সুখ-দুঃখের হেতু। ভগবান্ বা ঈশ্বর ইহাতে কর্তৃত্ব করেন না। বিষয়টি সাধারণতঃ উপলব্ধি হয় না বলিয়া জীব স্বীয় সুখ-দুঃখের জন্ত ঈশ্বরকে দায়ী করে ; কিন্তু ইহা সঙ্গত বা সত্য নহে।—

সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়ঃ।

যে ভক্তন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

( গীঃ ৯।২২ )

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহাতে কোন বৈষম্য নাই ; জীব যেরূপ আচরণ করে, তিনি তদ্রূপই তাহার প্রতিদান প্রদান করেন। পরন্তু সকল জীবের প্রতি তাঁহার ব্যবহার একই প্রকার দৃষ্ট হয় না। এই বৈষম্যের হেতু জীব নিজেই। জীব ভগবানে ভক্তিমান্ হইলে ভগবানের প্রিয় হইবেন ; এবং উদাসীন ও বিরোধী হইলে তিনিও তাহার প্রতি উদাসীন ও বিরোধী হইবেন। যে ছাত্র ভাল উত্তর দিয়াছে পরীক্ষক তাহাকে অধিক নম্বর

দেওয়ায় পরীক্ষকের বৈষম্য হয় না, পরন্তু যে ছাত্র ভাল লেখে নাই তাহাকে ভাল নম্বর দেওয়াই বৈষম্য। নিজে ভাল না হইয়া বলপ্রয়োগ বা চাতুর্য্যদ্বারা উন্নত বা স্থগী হওয়া সম্ভব নহে। উন্নতের অধিকার খর্ব করত অন্তঃকর্তাকে বস্তুদ্বারা প্রকৃত সাম্যসাধন হয় না। ভাল ছাত্রের নম্বর কাটিয়া লইয়া অকৃতকার্ষ ছাত্রকে প্রদান করিলে অত্যাচার হয়।

অশান্তি হইতে মুক্তি ও শান্তিলাভ সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধতে কামান্।

তমাশ্বস্থং যেহুপশান্তিঃ শীরাশ্চেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥

(কণ্ঠ ২।২।১৩)

গীতায় ইহারই পুনরাবৃত্তি—“যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেযু চাপ্যহম্”

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।

পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ ॥

—ইহাই শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ ভাগবতের বিচার—

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাপ্রভবমীশ্বরম্।

ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভট্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ (ভাঃ ১।১।৫।৩)

জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করায় মায়াগ্ৰস্ত হইয়াছে। জীবের অবস্থা ও একান্ত কর্তব্য ভগবদ্ভজন। যে কালে জীব স্বতন্ত্রতাংশে ভগবানের সেবাবিশিষ্ট হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ সে মায়াকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সর্বত্রই ভীতিগ্ৰস্ত এবং মোহাচ্ছন্ন হইয়া স্বরূপভ্রম ও বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার নিত্যকর্তব্য পরিত্যাগ করত অকর্তব্যকে কর্তব্যজ্ঞান করিয়া নরকাদি দুঃখে ও ক্লেশ ভোগ করিতেছে। ইহাতে ঈশ্বরের বিষম ব্যবহার নাই।

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।

স্বকর্ম করিতেও সে রোরবে পড়ি' মজে ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৬)

এইরূপে জীব ভগবদ্ভিমুখ হইয়া পুত্রকলত্রাদি, দেশবাসী ও দীনদরিদ্রের প্রতি কর্তব্যপারায়ণ হইয়া তাহাদের সুখসাধনচেষ্টা করিয়াও সর্বত্র অকৃতকার্ষ্য হইতেছে, তথাপি তাহার ক্রটি কোথায় তাহা বোধ করিতে অক্ষম হইতেছে।

জীবের এই বিমূঢ়াবস্থাকে সত্যভ্রষ্টাগণ প্রধানতঃ অধিকারভেদে চারিটা ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি—এই চার প্রকার অধিকারীর অধিকারানুযায়ী কর্তব্য শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাগুলি আচরণ করিলে জীব ক্রমশঃ চরম কর্তব্য সাধনে সক্ষম হইবে—ইহাই ঐ চারিটা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। কর্মপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করাইবার জগুই কর্মাচরণের উপদেশ—‘তাবৎ

কর্ম্মাণি কুর্বাতি ন নির্বিক্তেত যাবতা', 'কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধন্তে হৃগধং যথা'। জ্ঞানী সন্থকে উক্তি—'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্জতি। সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তুস্তিং লভতে পরাম্ ॥' পরাভক্তিতে উন্নত করিবার জন্তু জ্ঞানোপদেশ জানিতে হইবে। যোগাধিকারী সন্থকেও বিচার—'যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনান্তরাশ্রনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥' সকল অধিকারীকেই প্রেমসেবায় উন্নীত করিবার জন্তুই কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির উদ্দেশ্য। সকল শ্রেণীর ছাত্রকে বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক পড়াইবার উদ্দেশ্যে এম.এ. ক্লাসে উন্নীত করা। 'মম্মনা ভব মন্তুক্তো মম্মাজী মাং নমস্করু। মামেবৈম্মাসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥' "সর্ব্বধর্ম্মাং পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—ইহাই গীতায় চরম উপদেশ। গীতাশাস্ত্রে ভক্তের চরম পরিচয় প্রদত্ত হয় নাই; তাহা শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতেই বর্ণিত আছে। "ন পারয়েহহং নিরবন্তসংযুজ্যং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধ্যাষ্যাপি বঃ। যা মাইভজন্ তুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্য তদ্বঃ প্রতিঘাতু সাধুনা ॥" (ভাঃ ১০।৩২।২২)। হে গোপীগণ, আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নির্মল; বহু জীবনেও বা দেবোচিত পরমায়ু লাভ করিয়াও তোমাদের প্রতিকর্ষবান্ধন করিতে পারিব না, যেহেতু তোমরা অতি কঠিন সংসারশৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ। আমি তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম। অতএব তোমরা নিজ সাধুকৃত্যদ্বারাই পরিতুষ্ট হও।

শ্রীকৃষ্ণকে গোপীগণ যেরূপ সেবা করিয়াছেন হৃদীর্ঘ পরমায়ু পাইয়াও তাহা পরিশোধ করিতে কৃষ্ণ সক্ষম নহেন বলিয়া গোপীদের ভক্তিকেই পরাকাষ্ঠা বলিয়াছেন।

বিচার্য্যবিষয়—বাস্তববস্তু বৈচিত্র্যের আকর। তাহাকে নির্বিশেষ জ্ঞানই অসত্য। নির্বিশেষ-জ্ঞানেরই নামান্তর মায়াবাদ। অদ্বৈতবাদ—নির্বিশেষবাদ মতে; তাহা চিদচিং যাবতীয় বিলাসময়। তাহার চরম প্রকাশ রসময়তা। কর্ম্মজ্ঞানাদি পন্থার চরম ফল প্রেমবৈচিত্র্য। ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধি প্রভৃতি আত্মসঙ্গিক ফল। এই প্রেমবৈচিত্র্যের পূর্ণতম প্রকাশ শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী ও শ্রীমন্নহাপ্রভু শ্রীগৌরানন্দদেব। মহাভাবই বৈচিত্র্যের চরমাবস্থা। মহাভাবস্বরূপিনী রাধা-ঠাকুরাণী। মহাপ্রভু তাহারই আশ্বাদক।

পরতত্ত্বস্বতন্ত্র জীবকে বিমুখতা হইতে উদ্ধার করিয়া প্রেমভাগী করিবার উপায়-স্বরূপে শাস্ত্রের নির্দেশ,—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োহস্বতিঃ।

তন্মায়য়াতো বৃধ অভজেত্তং ভক্তৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥

অর্থাৎ জীব মায়িক জগতে প্রবেশের পূর্বে তটস্থাবস্থাতে তাহার ক্ষুদ্র স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার হেতু ভগবদ্ধিমুখী ও মায়াভিমুখী হওয়ায় নিজ আত্মস্বরূপের মায়িক আবরণে বা জড়দেহে আত্মাভিনিবেশ বা অহংমমাদিতাবযুক্ত হইয়া বা বিবর্তাশ্রয়ে মায়ানিমিত্ত দেহাদির অনিত্যতা ও নশ্বরত্ব ধর্মহেতু সর্বদা ভয়াকুল হইয়াছে। সে নিজ প্রকৃত স্বরূপ ও বাস্তব প্রিয়কে বিস্মৃত হইয়া, যাহারা তাহার প্রিয় ও আপন নহে, তাহাদের প্রিয় ও আপন জ্ঞান করে। তাহার এই দুর্দশা হইতে পরিত্রাণ পাইতে বুধ বা বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই বিমোহিনী মায়া়ার অধীশ্বরকে অনন্তাভিভাবিত সম্যকরূপে ভজনা করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব ও শাস্ত্ররূপী ভগবানের অহুগ্রহে জীব মোহমুক্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে এবং আশ্রয়ানুগত্যে ভজন করিতে করিতে পরিশেষে শ্রীভগবানে প্রেমভক্তি লাভ করত মৃত্যু হয়।—

মাধু-শাস্ত্র-রূপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয় ।

সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২০)

মায়ামুক্ত জীবের নাহি কৃষ্ণস্বভি জ্ঞান ।

জীবেরে রূপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২২)

মাধু-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান ।

কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা—জীবের হয় জ্ঞান ॥

শাস্ত্র, গুরুদেব ও চৈত্যাগুরু পরমাশ্রয় রূপাতেই জীব তাহার নিত্যস্বভাব বা ধর্ম লাভ করিতে সক্ষম হয়। তখন জীব জড়বৈচিত্র্যের মোহ পরিত্যাগ করত চিৎতৈচিত্র্যের আনন্দন-যোগ্য হয়। জীব যদি অসৎ গুরু ও অসচ্ছাত্রে আশ্রিত হয়, তাহাতে তাহার ফলবৈপরীত্য ঘটে। মায়াবাদ অসচ্ছাত্ত্র এবং মায়াবাদী গুরুও অসৎগুরু। তাহাদের সঙ্গ করিলে জীবের সর্বনাশ বা আত্মার অনিত্যতা প্রকাশ পায়। “অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্ত্রতোহয়ং”—বাক্যের মিথ্যাত্ব প্রকাশ পায়। সচ্ছাত্রে অর্থাৎ বেদ-উপনিষৎ-পুরাণাদিতে ব্রহ্মকে নিরুপাধি বলা হয় নাই। ব্রহ্মকেই সকল তত্ত্বের মূল বা হেতু বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত তত্ত্বের প্রকাশ হইয়াছে। সকল তত্ত্বই ব্রহ্মের পরিণাম। পরিণামই ব্রহ্মের স্বভাব। ব্রহ্ম পরিণত হইলেও অবিকারী থাকেন। পরিণামে ব্রহ্মের কোন হানি হয় না। প্রাকৃত জগতে চিন্তামণি ইহার দৃষ্টান্ত। ব্রহ্মের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি সকলই অপ্রাকৃত। প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্বেও ব্রহ্মের মন ও নেত্রদ্বারা মায়াবিলোকন দেখা যায়। অতএব ঐ মন ও চক্ষু প্রাকৃত নহে; তাহা অপ্রাকৃত, চিন্ময় বৃত্তিতে হইবে। ব্রহ্মা যাবতীয় বৈচিত্র্যের ও আকারের আকর

হওয়ায় তাহা হইতে প্রসূত তত্ত্বও আকারের বর্তমানতা । বৈচিত্র্যহীন ব্রহ্মবাদীও সবিশেষ ব্রহ্মে আকৃষ্ট হইয়া নিবিশেষ ব্রহ্মবাদ পরিত্যাগ করিয়াছেন ; কিন্তু কোনও বৈচিত্র্যোপাসকের নিবিশেষবাদকে আশ্রয় করার দৃষ্টান্ত নাই ।

মায়াবাদী বা নিবিশেষবাদীর বিচার অপরাধজনক । তাহারা শ্রীকৃষ্ণের অপ্ৰাকৃত ও সচ্চিদানন্দ নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিকে সম্বন্ধগাত্মক ধারণা করে । ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে মায়িক জ্ঞান করা হেতু অপরাধকলে পরমমঙ্গল ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয় । তাহার এই মূঢ়তাকে সে বিজ্ঞতা বলিয়া মনে করে । “অবজ্ঞানস্তি মাং মূঢ়া মানুষাঃ তনুমাশ্রিতম্ । পরং ভাবমজ্ঞানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥” গীতার ইহা স্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে । এই মূঢ়তাজনিত অপরাধকলে তাহার “আনন্দং ব্রহ্ম” বাক্য ফকাকার দাড়ায় । ভ্রাণশক্তিহীন তত্ত্বের পক্ষে সৌগন্ধ ও বিষ্ঠাগন্ধের বোধ কোথায় ? ব্রহ্ম আনন্দময় না হইয়া বিষ্ঠাময় হইলেও তাহার ক্ষতি কি ? আশ্বাত্ত ও আশ্বাদকরহিত ব্রহ্ম-ধারণা দুর্ভাগ্যজনক । ব্রহ্মকে এইরূপ বিচারের ফলে সে তামসী ও রাজসী গতি লাভ করিয়া বিকলকর্মা ও অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হয় । শ্রীকৃষ্ণই যে সর্বপিতা অর্থাৎ সকলের জনক ও মূল তাহা বুঝিতে অক্ষম হয় । তাহাদের জ্ঞানী অভিমান বুঝা ও অপরাধ-ময় ।—“পিতাহমস্মৈ জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ”, “গতির্ভূত প্রভুঃ নাক্ষী নিবাসঃ শরণং হৃদয়ং । প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥”—প্রভৃতি বাক্যগুলি চক্ষুর্গের গোচরীভূত হয় না । এহেন পরাংপর শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের প্রতি নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, নিরাকার প্রভৃতি ধারণা কতদূর অপরাধ ও অমঙ্গলজনক তাহা নিবিশেষবাদী বুঝিতে পারে না । তাহাদের বিচার অসত্য বা মিথ্যা এব ভয়ঙ্কর অপরাধজনক হওয়ায় তাহাদের গতি অতীব ভয়ঙ্কর ও দুঃখজনক ।—

“অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহরনীশ্বরম্ ।

অপরম্পরসত্ত্বতং কিমগ্ৰং কামহেতুকম্ ।”

—এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ “জগন্মিথ্যা” বাদীর স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহাদের প্রতি তাঁহার ব্যবহার বলিয়াছেন—“তানহং দ্বিষতঃ কুরান্ সংসারেষু নরাধমান্ । ক্ষিপ্যামাক্রশ্যমন্তানাহরীষেব যোনিষু ॥ আহরীং যোনিমাপন্নো মূঢ়া জন্মনি জন্মনি । মামপ্রাপ্তিষ্যব কৌন্তেয় ! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ( গী: ১৬।১২-২০ )

অপরাধীর মুখে শুদ্ধ নাম কখনও উচ্চারিত হয় না ।—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নস্থানামনামিনোঃ ॥

—এই বাক্যের সার্থকতা তাহাদের নিকট কোথায় ? আনন্দাপুষ্টির সেবা

লাভ তাহাদের ভাগ্যাতীত। শ্রীমন্নহাপ্রভুর অবদান—শিক্ষাষ্টক তাহাদের সাধ্যাতীত।—

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাণং  
শ্রেয়ঃ কৈরবচলিকাবিতরণং বিজ্ঞাবধুজীবনম্ ।  
আনন্দানুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং  
সর্বাভ্যুদয়নং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্তনম্ ॥

অর্থাৎ—শ্রীকৃষ্ণ অর্থে ‘হরেকৃষ্ণ’ নামই সর্বাধিকরূপে জয়যুক্ত আছেন। এই ‘হরেকৃষ্ণ’-মহামন্ত্রদ্বারা জীবের চিত্তদর্পণ নিখল অর্থাৎ অগ্ন্যাভনাশ-কর্মজ্ঞানযোগাদি মুক্ত হয়। জীবের জন্মমৃত্যুমালা ছিন্ন হয়। ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য যে—“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস” তাহা সে বুঝিতে সক্ষম হয়। “মঠেবাংশোজীবলোকে”, “অপরেয়মিতত্ত্বাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্”—বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য যে ‘কৃষ্ণদাস্য’, তাহা জীবের অবগতি হয়। তখনই সে বিবর্তবিচার পরিত্যাগ করে এবং ভক্তি আশ্রয় করত ভক্তিমগ্নতা অমৃতভব করে। ক্রমশঃ প্রেমভক্তিতে অধিকার জন্মে এবং বিশেষ ভক্তসঙ্গে ভজনোচিত গোপীদেহ প্রাপ্ত হয়। ইহাই আনন্দসমুদ্রে উদ্বেলিত করে। অর্থাৎ কৃষ্ণচন্দ্রে পরমানন্দ প্রদান করে। তখন জীব কামগন্ধহীন হইয়া প্রেমসমুদ্রে নির্মজ্জিত হইয়া থাকে। “না গণি আপন সুখ, সবে বাঞ্ছি তার সুখ, তার সুখ মোর ভাংপার্থ্য”—বাক্যানুসারে কৃষ্ণসুখই জীবের শুদ্ধস্বরূপের প্রেমধর্ম প্রকাশিত হয়।

—ত্রিভুগুপ্তামা শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

## ইচ্ছাশক্তি—ভগবচ্ছক্তি

[ পূর্বপ্রকাশিত ৫৯শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০২ পৃষ্ঠার পর ]

সেইজন যিনি বা বাঁহারা বলেন,—‘কোন মঙ্গললাভই হইতেছে না’; আবার যিনি বা বাঁহারা বলেন, ‘নিশ্চয় মঙ্গললাভ হইতেছে’; তাহাদের এই দুইটা দর্শনই যুগপৎ সিদ্ধ হইল। অপরদিকে ইচ্ছারূপী জীবের স্বতন্ত্রতাও সিদ্ধ হইল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের ত্রিশ নম্বর শ্লোকটির গূঢ়ার্থেও ইহাই স্থলরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।—

অপি চেৎ সুদুর্ভাগারো ভজতে মামনত্তাৎক ।

সাম্যেব ন মন্তব্যঃ সমাগ্রাবসিতো হি সঃ ॥



অর্থাৎ—যিনি অনন্ত-ভজনপরায়ণ হইয়া আমাকে ভজন করেন, তিনি যদি নিরতিশয় দুরাচারবিশিষ্টও হন, তথাপি তাঁহাকে সাধু বলিয়াই মানিবে, যেহেতু তিনি মস্তকান্তে সম্যকপ্রকারে নিশ্চয়-বুদ্ধিবিশিষ্ট।

এই শ্লোকটিকে লইয়া বিবেকহীন কপটবেষধারী স্বযোগ-সন্ধানীগণ সর্বত্র চাপাইয়া কতই না উৎপাতের সৃষ্টি করিয়া থাকে, যেহেতু সদিচ্ছা মাপবার কোনও মাপকাঠি নাই। কিন্তু সদিচ্ছাসম্পন্ন কৃষ্ণেকানিষ্ঠ শরণাগত ভক্তের দুরাচারের জগৎ বিবেক-দংশনের জালা অনুভব হইবে। আবার বিবেকহীন প্রবন্ধকের, ততোধিক নিকৃষ্ট আচার করিয়াও ভোগানন্দে নিজকে বুদ্ধিমান্ ভাবিয়া আনন্দে আপ্ত হইবে। সেই নির্লজ্জকে সমালোচনার কঠোর তীর-নিষ্ক্ষেপ করিলেও সে তাহা হইতে পাশ কাটাইবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইবে, অথবা গগণের দূরত্ব তাহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া পূর্ণোত্তমে পুনরায় সেই পাপাচারই করিবে। তাহার উৎসাহে কোনরূপ ভাটা পড়িবে না; কারণ তাহার বিবেকের কোনও বলাই নাই অতএব সে এইসব জটিল বিচারের অঙ্কের ধার দিয়াও চলিবে না। পরন্তু অপরকে হয় প্রতিপন্ন করিতে যত্নশীল হইবে।

কোনও একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক মনে করেন,—“কোন এক হেমন্তের হিমেল হাওয়ায়, হেলে পড়া সূর্যের সোনালী বিকালে নিরালোচন নৈসর্গিক নদীর কিনারে কিংবা কোন এক ঝিরঝিরে ঝরণার ধারে দাঁড়াইয়া, ভগবানের সৃষ্টির রূপে বিমুগ্ধ হইয়া, অবাক বিস্ময়ে শুধু বাঃ বাঃ বলিয়া জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিলেই—জীবন সার্থক হইবে। ভগবানের অত সূক্ষ্ম তত্ত্ব-বিচারের প্রয়োজনটা কি?” ইহাও এক ধরণের সূক্ষ্ম ভোগেচ্ছা, যাহা অতি সাধারণ স্তর বা নিকৃষ্ট স্তর হইতে অনেক উন্নত। কিন্তু রাজাধিরাজের অতুল সম্পদও, সৌন্দর্যের একটা কণা দেখিয়া উল্লসিত হওয়া অনভিজ্ঞের নিকট ত’ স্বাভাবিক—তাহাতে রাজাধিরাজের কি হইল? অথবা তাহার দেবার কতখান উৎকর্ষ সাধিত হইল? গীতার শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন,—

অথবা বহনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জুন।

বিশ্ণুসাহস্রনাম কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ( গীতা ১০।৪২ )

অর্থাৎ—হে অর্জুন! অথবা এইরূপ বহুবিধ জ্ঞানের দ্বারা তোমার কি হইবে? আমি এই সমগ্র জগৎ একাংশদ্বারা ব্যাপিয়া অবস্থিত আছি, ইহাই জ্ঞান। এই বহুবিধ জ্ঞানের অর্থে—তাঁহার অনন্ত বৈভব বা ঐশ্বর্য্যকেই বুঝান হইয়াছে; তাঁহার সম্বন্ধ-জ্ঞানকে নহে।

আবার ওই সাহিত্যিক বলিলেন,—“স্নানবস্ত্রের উপর কোন কিছু চাপাইয়া

দেওয়ার প্রয়োজন নাই। শুধু তাহার আইডিয়ার বাধাগুলিকে সরাইয়া দিতে হইবে। যেমন একটা গোলাপ গাছের বৃদ্ধির জন্ত বাধাস্বরূপ আগাছাগুলিকে সরাইয়া দিলেই আমরা একটা সুন্দর পুষ্ট গোলাপ ফুল পাইব।—ইহাই যদি হইত, তাহা হইলে উষর মরুপ্রান্তরে যথায় কোনও আগাছা হইতে পারে না, সেথায় অজস্র পুষ্ট গোলাপ ফুলের চাষ হইত; কিন্তু বাস্তবে তাহা হয় না। পরন্তু আমরা পাহাড়ী অঞ্চলে দেখি,—অনাদরে, অবহেলায়, অযত্নে অসংখ্য আগাছার সাথে সাথে অজস্র রাশি রাশি পরিপুষ্ট গোলাপ ফুটিয়া আছে!

প্রকৃত সুস্থ হইয়া বাড়িয়া উঠিবার জন্ত প্রয়োজন—যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য, উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, রোগ-জীবাণু-আদি বহিঃশক্তির হস্ত হইতে রক্ষা, জিন বা বংশগতি, সর্বোপরি তাহার প্রকৃত বড় হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার সুদৃঢ় ইচ্ছা। বস্তুতঃ কে কেমনভাবে বাঁচিয়া রহিল ইহাই কথা নহে; কে কি লইয়া বাঁচিয়া রহিল ইহাই বড় কথা। কাহারও সমস্ত ইচ্ছা প্রতিহত হইতে হইতে অবশেষে পরিণতি প্রাপ্ত হইতেছে আত্মহত্যার পথে; আবার প্রাচুর্যের পরিমাণে কাহারও ইচ্ছা—“মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।” এইভাবে ইচ্ছা-অনিচ্ছার ভালমন্দের নাগরদোলায় চড়িয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া পাঞ্জা কষিতে কষিতে জীব বেগে ছুটিয়া চসিয়াছে অনন্ত সংসার পরিক্রমার পথে। সদ্ব্যবস্তার সহিত যতদিন মধ্যস্থের ইচ্ছা না জাগরিত হইতেছে, ততদিন এই বেড়াঝালের দৌল্যমান্ পরিভ্রমণেরও পরিশেষ হইতেছে না।

ইহজগতে সাধারণতঃ দুই প্রকার মানুষ থাকে—‘অজ্ঞ’ ও ‘বিজ্ঞ’। বিজ্ঞ-জনগণ আচরণ, অলুশীলন ও বাক্যদ্বারা অজ্ঞলোকের সদিচ্ছা সৃষ্টি করিবেন। আদর্শ শিক্ষক শুধুমাত্র রাশি রাশি তত্ত্ব ছাত্রদের উপর চাপাইয়া দিয়াই তাঁহার কর্তব্য সমাপ্ত করেন না। ইহা আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ, যথা—প্লেস্তাৎসমী, মন্টেসরী, ফ্রেয়েল এবং ফরাসী চিন্তানায়ক রুশোও তাঁহার “এমিল” গ্রন্থে দেখাইয়াছেন। একজন আদর্শ শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে জানিবার জন্ত অদম্য কৌতূহল ও ইচ্ছা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ক্ষুধার বলবতী ইচ্ছাই হইল ভক্ষণের প্রধান কারণ। “যাবৎ ক্ষুদ্রস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা। তাবৎ স্থায়্য ভবতো ননু ভক্ষ্য-পেয়ে ॥ (১৫: চ: ২।৮।৬২)

অর্থাৎ—যেমত জঠরে যে-পৰ্য্যন্ত তীব্র ক্ষুধা-পিপাসা থাকে, ততক্ষণই ভক্ষ্য পেষ বস্তুসকল সুখদায়ক হয়। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও সেইজন্ত সাতদিন সময়ের মধ্যেও পাঁচদিনই শুধু শ্রীভগবানের ভক্তের মহিমা বর্ণনা করিয়া দ্বাদশ স্বল্প

ভাগবতের নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত তাঁহার কথা শুনিবার জগু অদম্য আগ্রহ ও ইচ্ছা জন্মাইলেন। তাঁহার বিচার-বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের প্রতি নামকরা সমস্ত পণ্ডিত-মণ্ডলীরই অগাধ বিশ্বাস ও গভীর আস্থা ছিল।

সাইডিয়া যত বড়ই হউক, অতিতুচ্ছ বাস্তবের নিকটও সে একেবারে ম্লান হইয়া যায়। ইচ্ছাই আমাদের যাহা কিছু প্রাপ্তির মূল। যে যেমন ইচ্ছা করিবে, তাহার তেমন গতি হইবে ও তদনুসারে কর্ম ও তাহার ফলভোগ হইবে।

“যং যং বাপি শ্রমন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।

তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।” (গীতা ৮৬)

অর্থ—হে কৌন্তেয়! যিনি যে যে-বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অস্তিম-কালে শরীর ত্যাগ করেন, তিনি সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হন, কারণ সর্বদা সেই ভাবনা-দ্বারা তাঁহার চিত্ত তন্ময়ীভূত হইয়াছে।

চিন্তা-ভাবনা, মনকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত অজস্র রঙিন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া চলে। মন ইচ্ছাদ্বারা পরিচালিত হয়। অতএব চিন্তা শুরু হইলেই তাহাকে সুসংযত করিয়া বুদ্ধিদ্বারা সদিচ্ছায় পরিচালিত করিতে হইবে। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা জাগিলে, প্রথমেই ইহার মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে এবং ঈশ্বরই একমাত্র মঙ্গলময় বস্তু, তজ্জগৎ তাহাতেই মনোনিবেশ বা অভিনিবেশ করিতে হইবে।

ঈশ্বরকেই একমাত্র নিষ্কপটে ভালবাসিতে সমর্থ হওয়াই হইল ‘সিদ্ধি’; আর কেমনভাবে তাঁহাকে ভালবাসিতে হয়, কেমনভাবে তাঁহাকে ভালবাসিবার জগু লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদিতে হয়, ইহা জানিতে ও শিখিতে ইচ্ছা করাই হইল ‘সাধন’। ইহাই হইল ‘ভজন-রহস্য বা ‘ভজন-কৌশল’। ইহা জানাইবার ইচ্ছা লইয়া স্বয়ং অবতারী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এই ধরাধামে কল্পণা করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

এই ইচ্ছার প্রভাবেই অনেক সময় এমন কি, নৃত্য-মহাআগণও পারিষদস্ব লাভ করিয়াও জীবোদ্ধারের কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সাক্ষাৎ সেবালাভে বিলম্ব ঘটান। আমরা অগ্ৰহইতেই প্রতিজ্ঞাপূর্বক সূ-ইচ্ছার বীজ বপনোদ্দেশ্যে কু-ইচ্ছাগুলির বিরুদ্ধে অগ্নোপচার অভিযান চালাইব। স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তিকে ভগবচ্ছক্তিতে পরিণত করিব।

—শ্রীবীরভদ্রদাস ব্রহ্মচারী, তত্ত্ববিদ

## শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তর্দ্বান-প্রসঙ্গ

কথায় আছে,—‘ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না কয়।’ ইহাতে ছাগল এবং পাগল একই শ্রেণীর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটু স্থির হইয়া ভাবিলে দেখা যায়—ছাগল আর যাহাই হউক, সর্বভুক্ নহে। কিন্তু পাগলের মুখের কোন অর্গল নাই। সেই বিচারে পাগল ছাগল অপেক্ষাও অধম। বর্ষমান প্রবন্ধের খলনায়কগণ কেবল পাগলই নহে, পাষণ্ডও বটে। ‘ধর্ম্মের কথা, স্বযুক্তির কথা কিছুতেই শুনিব না-না-না’—তাহাদের এই গোয়ারতুমি বণ্ডের স্বভাবকেও অতিক্রম করিয়াছে। ষণ্ড তথাপি বশু—সেই অবস্থাও পার হইয়া তাহারা পাষণ্ডে পরিণত হইয়াছে।

পাষণ্ডগোষ্ঠীর প্রজন্ম পূর্বে গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ হইতে দেখা যাইত। আজকাল উহা প্রথম শ্রেণীর এক বিশেষ দৈনিক সংবাদপত্রে ক্রমাগত প্রকাশিত করিয়া উহাকে সার্বজনীন করিবার হিড়িক দেখা যাইতেছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, উহাদের বিরুদ্ধে বহু প্রতিবাদ-লিপি প্রেরিত হইলেও কলিকাতার প্রফুল্লচন্দ্র সেন ষ্ট্রীটে ‘গুমথুন’ হইয়া উহা রহসোই রহিয়া যায়। কারণ উহা নাস্তিকগণেরই একচ্ছত্র আনন্দের বাজার। উহাতে আন্তিকগণের আদর্শ প্রচারিত হইলে তাহাদের নৈরীশ্বরিক আনন্দের নেশা যে ছুটিয়া যাইতে পারে! প্রায় পচাত্তর বৎসর পূর্বে ‘শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ’ করিয়া উক্ত দৈনিক পত্রিকা যে গৌরচন্দ্রিকা করিয়াছিল—আজ সেই পত্রিকাই শ্রীগৌরচন্দ্রকে ‘গুমথুন’ করিবার স্পদ্ধায় মাতিয়া উঠিয়াছে। বরং বলা যায়—পিপীলিকার পাখা গজাইয়াছে।

‘নীচ যদি উচ্চ ভাবে, স্ববুদ্ধি উড়ায় হেসে।’ ইতর-নমাজের অভদ্র আচরণ, কটুক্তি, গালিগালাজকে ভদ্রশ্রেণীর ব্যক্তিগণ স্বাভাবিকভাবেই এড়াইয়া চলিতে চাহেন। ইহাতে ইতরগণ পাইয়া বসে। তাহারা ভাবিয়া থাকে,—ভদ্রলোকেরা স্বভাবতঃই দুর্বল, কিংবা তাহাদের কুযুক্তির তোপে বুদ্ধি ভদ্রলোকদের স্বযুক্তিসকল উড়িয়াই গিয়াছে। ভণ্ডপণ্ডিতের ভণ্ডামিতে স্থপণ্ডিত তিতিবিরক্ত হইয়া সভা ত্যাগ করিলে এক দঙ্গল মূখ-শ্রোতা তাহাদের ভণ্ড প্রতিনিধিকে মাথায় লইয়া নাচিতে থাকে, আনন্দে বগল বাজাইতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে স্ববুদ্ধিগণ না হাসিয়াই বা কি করিবেন?

মিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করা সহজ, কিন্তু অনিদ্রিতের ঘুম ভাঙাইবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত এই প্রকার ব্যক্তিকে উপেক্ষাই করিতে বলিয়াছেন। এইজন্যই স্ববুদ্ধিগণ এই ইতর-পাষণ্ডগণকে সঘনো পরিহার করিয়াই চলেন। ভগবানের প্রতি প্রেম, ভগবন্তগণের সহিত মৈত্রী, অজ্ঞানের উপর কৃপা

বিরোধিগণের সম্বন্ধে উপেক্ষা—ইহাই ভগবন্তের জীবন-চরিত্র। পাষাণগণ অজ্ঞ (পড়ুন মহা-অজ্ঞ) হইলেও মৎসরতা, দান্তিকতায় তাহারা অত্যন্ত শোচনীয়। তাহারা জিজ্ঞাসু নহে—কারণ পণ্ডিতমগ্ন। তাহাদের প্রশ্নে প্রণিপাত নাই—আছে কেবল মাপিয়া লইবার ধৃষ্টতা। এমতাবস্থায় ইহারা কেবল সংশোধনের অযোগ্যই নহে—পরন্তু উপেক্ষার পাত্র। সুতরাং পাষাণগুলির চীৎকারে ভগবন্ত-গণের বধির হইবার অভিনয়কে তাহাদের কোন দুর্বলতা ভাবিতে হইবে না। কিন্তু পাষাণগণের প্রলাপে অজ্ঞগণ প্রতারিত না হয়—তজ্জগুই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

পাঠকগণ! ‘পাষাণ’ বলিতে কোন কিছুতকিমাকার প্রাণী বলিয়া ভাবিয়া লইবেন না। ইহারা মনুষ্যাকার ভয়ঙ্কর জন্তু-বিশেষ। বরং ‘স্বাটেড্ বটেড্’ হইয়া সভ্যতার আদলে অসভ্যতারই ঘনমুষ্টি। তাহারা মনে করে—পৃথিবীর সর্ব বিষয়েই তাহাদের নাক গলাইবার অধিকার হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ধর্মাবিসং-  
ত’ কথাই নাই। আহা-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনসর্বস্ব এইসকল মনুষ্যাকৃতি-পশুগুলির নিকট ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। বরং সাধারণ মানুষকে ধর্মবিষয়ে সন্দিহান করিয়া কলির আধিপত্য বিস্তার করা যাউক—নিরাময়ের অযোগ্য তাহাদের এই পাষাণতার ব্যাধিকে সমাজের সকল স্তরে সংক্রামিত করিয়া দেওয়া যাউক—উদর-উপস্থের যথেষ্টাচারিতায় সকলকে অনুপ্রাণিত করিয়া সমগ্র জগতকে নরক-গুলজারে পরিণত করা যাউক। তজ্জগু ধর্মের প্রতি তাহারা বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা অর্জন না করিয়াই—ধর্মবিজ্ঞানের সাধারণ অ-আ জ্ঞান লাভ না করিয়াই কলম লইয়া ধর্মবিষয়ে খামখেয়ালীপনায় মত্ত। ইহা কেবল দণ্ডযোগ্য অপরাধই নহে—জামিনেরও অযোগ্য।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবতায় এইসকল পাষাণগণ অবিশ্বাসী। ইহাতে আমাদের বিশেষ উদ্বেগ নাই। কারণ দৈবভাব এবং আত্মরতাব-সম্পন্ন ব্যক্তির অস্তিত্ব জগতে সর্বদাই যুগপৎ বিরাজমান।—“দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহশ্মিন্ দৈব আত্মর এব চ” (গীতা)। কিন্তু সমগ্রাটী হইল—ইহারা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অলৌকিক লীলাসমূহকে বিকৃত করিয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে অযথা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিতেছে। তাহারা মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত অন্তর্দান-লীলাকে অত্যন্ত ঘৃণ্যরূপে সর্বদমক্ষে প্রতিপাদন করিতে চাহিতেছে। ইহাদের সংকলিত তথ্যের যে সামান্যতমও প্রামাণিকতা কিংবা ভিত্তি নাই, তাহা ইহারা ভাল করিয়াই জানে। তথাপি উদ্বেগ-প্রণোদিত হইয়াই শ্রীমদমহাপ্রভুকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় ইহারা বিভোর।

কিরূপ উদ্দেশ্যে তাহারা প্রণোদিত, তাহা ব্যাখ্যা করিতেছি। পাষণ্ডকুল শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এবং তাঁহার অল্পগগণের উপর প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত, কারণ তাঁহারা উহাদের ভোগের গ্রাস কাড়িয়া ভগবানকে দিয়া দিয়াছেন—মায়ার ভোক্তা হইবার পরিবর্তে ভগবৎ-দাসত্বের ঝামেলা নিত্যতালের জন্য স্বক্কে চাপাইয়া দিয়াছেন—ত্যাগের ছলনায় প্রচ্ছন্ন ভোগী বনিবার গোমর ফাঁক করিয়া কেলিয়াছেন—‘ব্রহ্ম’ হইবার স্বপ্নসৌধ নির্মাণে প্রবল বাধা দিয়াছেন—কেবল ‘প্রেম-প্রয়োজন’-বাণীর প্রচার করত ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের বাসনাকে পিশাচীস্বরূপ বলিয়াছেন—‘তুমিও ভাল, আমিও ভাল’র বিচারে প্রতিষ্ঠিত ‘যত মত তত পথের’ আন্তর্জাতিক খ্যাতিকে নাস্তানাবুদ করিয়াছেন—বহু-ঈশ্বরবাদ ও চৌদ্দ-পুরুষের পঞ্চোপাসনাকে নিরাকৃত করিয়াছেন—পাঁচমিশালী ভক্তিকে বারবণিতার আচরণের সহিত তুলনা করিয়াছেন—বড়ৈশ্বর্যশালী নারায়ণের দারিদ্র্য অসম্ভবহেতু ‘দরিদ্র-নারায়ণের’ সেবায় ব্যাঘাত ঘটাইয়াছেন—জীব পরমমুক্ত বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শিবের দাস, ইহা ব্যাখ্যা করিয়া ‘জীব-শিব’-মতবাদ সমূলে উৎপাটন করিয়াছেন—প্রকৃতি-পুরুষের নিত্যতা ঘোষণা করিয়া জীব-ব্রহ্মেকবাদের বিচার ধূল্য মিশাইয়াছেন—রাজসু-তামসু শাস্ত্রের কথা বিশেষ আমল দেন নাই—শ্রীমদ্ভাগবতকেই কেবল প্রমাণ শিরোমণি-রূপে স্থাপন করিয়াছেন—‘ত্রিপুটী-বিনাশের’ বিচার বিনাশ করিয়া সেব্য-দেবক-সেবার নিত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন—অম্বরমোহনকারী শ্রীশঙ্করাচার্যের মায়াবাদকে অবৈদিক বলিয়া প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন—বৈশেষিক, ত্রায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্বমীমাংসার বিচারসমূহ অশ্রোত এবং তদ্বারা ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম অসম্ভব বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—দেহধর্ম-মনোধর্মের বিচারকে কোনরূপেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই—নিজ-ইন্দ্রিয়তর্পণকে কিছুমাত্র প্রশ্রয় না দিয়া কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের কথা গাহিয়া গিয়াছেন—বিষ্ণুভক্তিহীন ‘ব্রাহ্মণ’ প্রকৃতপক্ষে ‘অদৈব’ এবং ‘বরাহপুরাণ’-বচনোক্তসারে ‘রাক্ষস’ বলিয়া হাটে হাড়ি ভাঙ্গিয়াছেন—বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণত্ব স্বাভাবিকরূপেই অল্পম্যত প্রমাণ করায় এতদিনের একচেটিয়া ব্রাহ্মণত্ব হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে—অজ্ঞসমাজের স্বক্কে বসিয়া ব্রহ্মণ্যধর্মের ছড়ি ঘুরাইয়া গুরুগিরি করিয়া খাইবার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন—বহুল প্রচলিত কণ্ঠজড়-স্মার্তবাদ ও চিহ্নজড়-সম্বয়বাদকে বিভিন্ন শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছেন—শ্রীভগবানের প্রতি অহৈতুক সেবাদর্শ ব্যতীত কর্ম্ম-জ্ঞানী-যোগী প্রভৃতির ধর্মকে ছলধর্মরূপে ব্যাখ্যা করত উহাদিগকে বর্জন করিতে বলিয়াছেন—শাস্ত্রোক্ত শ্রী-ব্রহ্ম-কৃষ্ণ-নন্দ—সাত্ত্ব-রসপ্রদায়চতুষ্টয় ব্যতীত কলিয়ুগে আর সকলকে অপসম্প্রদায়রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। ইত্যাদি নানারূপে

বিদগ্ধরূটি বিচারে শাস্ত্রকথিত নিরপেক্ষ অপ্ৰিয়-সত্যের উদ্ঘাটন করায় পাষণ্ডকুলের পাষণ-হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে। তজ্জগৎ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তগণের প্রতি পাষণ্ডদের গোসা। তাই স্বয়ং শ্রীমন্নমহাপ্রভুকে কাগজে-কলমে ‘গুম্‌থুন’ না করাইলে, তাঁহার পদাঙ্কানুসারিগণকে যে চিট্‌ করা যাইবে না—‘ন রহেগা বাঁশ, ন বাজেগী বাঁশরী’। সেই বাঁশরীর শাসন-স্বর চিরন্তরে বন্ধ হইয়া গেলে পূর্বের ভ্রায় পুনরায় ধর্ম-অধর্মের ককটেল ঘটাইয়া স্বেচ্ছাচারিতাকে সার্বলৌকিক করা যাইবে। পাঠকগণ! ইহাই শ্রীচৈতন্য-বিরোধিতার মূখ্য কারণ।

তাহাদের বক্তব্য হইল,—শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ভক্তগণ ভাববাদী-বলয়ে আবদ্ধ এবং তাহারা নিজেরা অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ। তাহারা মনে করে—উদর-উপস্থ লইয়াই ত’ মানবজীবন। তজ্জগৎ ধর্ম (লৌকিক ধর্ম, সামাজিক ধর্ম), অর্থ এবং কাম—এই ত্রিবর্গের যুক্তিই হইল যুক্তি। দেহধর্ম, মনোধর্ম লইয়াই যখন বন্ধ হইতে পারা যায়—তখন আবার আত্মধর্ম লইয়া টানাটানি কেন? এই ত্রিবর্গের খাদে নাক পর্য্যন্ত ডুবিয়া থাকিতে থাকিতে অতিষ্ঠ হইয়া গেলে তখন না হয় মোক্ষের বিচার যুক্তিগ্রাহ্য। তখন না হয়, যাহা কিছু করিয়া নিব্বিশেষ ব্রহ্মে মিলিয়া যাওয়া যাইবে। কিন্তু চৈতন্যদেবের ভক্তগণ সম্পূর্ণ অগ্ন্য কথ্য বলেন—তাঁহার ধর্ম-অর্থ-কাম, এমনকি মোক্ষকেও ‘তাল্লাক্’ দিয়া কেবল ‘প্রেম’, ‘ভক্তি’, ‘সেবাকেই’ এক ‘জৈবধর্ম’ বলিয়া চালাইতে চাহেন। ইহার মধ্যে চতুর্বর্গের কোন যুক্তিই নাই—অতএব ইহার অর্থোক্তিক। আমরা ইহাকে বালচপলতা ছাড়া আর কিছু বলিতে চাহি না। পুতুল-খেলার আনন্দ ছাড়িয়া বিজ্ঞানলয়ে যাইবার যুক্তি শিশু খুজিয়া পায় না। তজ্জগৎ পিতামাতার এত তাড়ন-ভৎসনের কারণও তাহার ক্ষুদ্র-মস্তিকে প্রবেশ করে না। বরং পুতুল-খেলা পরিত্যাগ করিয়া পিতামাতার উদয়াস্ত পরিশ্রম শিশুর নিকট অর্থোক্তিক ও হাস্যকর বলিয়াই মনে হয়।

ভাব এবং যুক্তিকে পরস্পর অত্যন্ত বিরোধী বলিয়াই তাহারা জানিয়া থাকে; কিন্তু জানে না যে, ভাবহীন যুক্তি নিছক্ গুহ্যযুক্তি। অপরদিকে ‘ভাব’ কোন যুক্তির অধীন নহে—কিন্তু কিছু বিধিকে স্বীকার করিয়া চলে মাত্র। তাই বলিয়া সে-সকল বিধি গণমতের দ্বারা পরিচালিত হয় না—শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র প্রভৃতিদ্বারাই পূর্ব-নির্দ্ধারিত। শ্রীমন্নমহাপ্রভুর সমসাময়িক তৎকালীন কাশীবাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতীও নিজকে এইরূপেই প্রচণ্ড যুক্তিনিষ্ঠ বলিয়া অভিমান করিয়া মহাপ্রভুর সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন,—“মূখ’ সন্ন্যাসী নিজ-ধর্ম নাহি জানে।

ভাবুক হইয়া ফেরে ভাবকের সনে ॥” পরমকারুণিক সর্বতত্ত্বস্বতন্ত্র ভগবান্ তথাপি তাঁহাদের সংশয়মোচনে ব্রতী হইয়াছিলেন,—“কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত’ স্বভাব। যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজন্মে ভাব ॥ কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ। যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায়, নাচায়। গাহি, নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায় ॥” (চৈঃ চঃ আঃ ৭ম পরিচ্ছেদ)। শুষ্ক-মরুভূমিতে আজন্ম বসবাসকারী ব্যক্তি যেরূপ সুজলা-সুফলা-শস্ত-শ্রামলাময় দেশের কথা শুনিলেও যেমন কল্পনায় আনিতে পারে না, তদ্রূপ শুষ্কযুক্তি-সর্বস্ব পাষণ্ড কিরূপে অপ্রাকৃত ভাব-রাজ্যের কথা বুঝিবে? কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপার কৃপায় সেই শুষ্কজ্ঞানি-সন্ন্যাসিগণ অবশেষে বুঝিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট ক্ষমতা শিক্ষা করিয়া তাঁহারও সেই অপ্রাকৃত ‘ভাববলয়ে’ প্রবেশের জন্ত আকাজক্ষী হন।—“বেদময় মূর্ত্তি তুমি—সাক্ষাৎ নারায়ণ। ক্ষম অপরাধ, পূর্বে যে কৈলু নিন্দন ॥ সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন। ‘কৃষ্ণ’, ‘কৃষ্ণ’ নাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥” (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১৪০-১৪২)।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবন্তা গণমতের ভোটে নির্বাচিত হইয়া হয় নাই—তাহা সর্বশাস্ত্রে বিধোষিত হইয়াছে। “তন্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতৌ ॥” গীতা ১৬।২৪। সমস্ত প্রকার কার্য্য-অকার্য্যের বিধি-নিষেধ শাস্ত্রেই পূর্ব-উল্লিখিত হইয়া আছে—এ জগতের ভ্রম-প্রমাদ-করণপাটব-বিপ্রলিপ্তাময় পণ্ডিত-অভিমানিগণের সিদ্ধান্তের জন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকে নাই। ভগবান্ কে, কোন রূপে, কখন, কি বিশেষ কার্য্যে, কোথায় অবতীর্ণ হইবেন—তাহা শাস্ত্রেই পূর্ব-নির্দেশিত হইয়া আছে। বৈষ্ণবকুল-মুকুটমণি শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে “কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার?”—প্রশ্ন করিলে তিনি তদন্তরে তাহাই ব্যাখ্যা করেন। “প্রভু কহে—অষ্টাবতার শাস্ত্র-দ্বারে জানি। কলিতে অবতার তৈছে, শাস্ত্রবাক্যে মানি ॥ সর্বজ্ঞ মুনির বাক্য—‘শাস্ত্র-পরমাণ’। আমা-সবা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা ‘জ্ঞান’ ॥ অবতার নাহি কহে—আমি-অবতার। মুনি সব জানি’ করে লক্ষণ বিচার ॥ ‘স্বরূপ-লক্ষণ’, আর ‘তটস্থ-লক্ষণ’। এই দুই লক্ষণে ‘বস্তু’ জানে মুনিগণ ॥ আকৃতি, প্রকৃতি, স্বরূপ—স্বরূপ-লক্ষণ। কার্য্যদ্বারা জ্ঞান,—এই তটস্থ-লক্ষণ ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩৫২-৩৫৭)। সর্বশাস্ত্র-বিশারদ শ্রীসনাতন গোস্বামী তৎকালে বিচার করিলেন, কলিকালে যুগাবতারের স্বরূপ লক্ষণ—পীতবর্ণ আকার এবং তটস্থ-লক্ষণ—প্রেমদান ও সঙ্কীর্ণ কার্য্য। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত (১।১।৫।৩২) এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে,—“কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাইকৃষ্ণং সাদ্রোপাদ্রাস্তপার্বদম্। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ণনৈঃ প্রার্থৈবজন্তি হি স্ত্রমেধসঃ ॥”



গৌরঃ সর্বাঙ্গা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপো “ভক্তিং লোকে-কাশ্যতীতি”—( অথর্ব-বেদান্তগত শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ ) ।

সত্যে দৈতুকুলাধিনাশ-সময়ে স্কৃজ্জন্মরকেশরী-

স্নেতায়াং দশকন্ধরং পরিভবন্ রামেতি নামাকৃতিঃ ।

গোপালান্ পরিপালয়ন্ ব্রজপু্রে ভারং হরং দ্বাপরে

গৌরান্নঃ শ্রিয়কীৰ্ত্তনঃ কলিয়ুগে চৈতন্যনামা হরিঃ ॥

( বৃসিংহ-পুরাণ )

ইহা ছাড়াও অথর্ববেদ পুরুষ-বোধিনী-সূক্ত, সামবেদান্তর্গত-ব্রহ্মভাগ, খেতাশ্বতর-উপনিষৎ, ছান্দোগ্য-উপনিষৎ, মহাভারত, বায়ুপুরাণ, ভবিষ্য-পুরাণ, কৃষ্ণযামল, ব্রহ্মযামল, অনন্তসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে শ্রীমদ্রহস্যপ্রভুর ভগবত্তা-বিষয়ে ভূরিভূরি প্রমাণ উল্লিখিত আছে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার ভয়ে তাহা এইস্থলে উল্লিখিত হইল না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ থাকে যে, মহাপ্রভু লীলাবতার নহেন, যুগধর্ম—কৃষ্ণপ্রমাত্মক নাম-সংকীৰ্ত্তনের প্রবর্তকরূপে তিনি ভক্তভাব-অঙ্গীকারকারী স্বয়ং ভগবৎ-তত্ত্ব। সুতরাং ভক্তোচিত লীলারই প্রাধান্যবশতঃ তিনি ‘ছন্দাবতার’-রূপে কীৰ্ত্তিত। ইহাই ‘ছন্দঃ কলৌ’ ( ভাঃ ৭।৩।৩৮ ) বাক্যের তাৎপৰ্য্য। কিন্তু “দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উল্কে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ ॥”

আজকাল স্থানে স্থানে দক্ষায় দক্ষায় শাস্ত্র-বহির্ভূত বৃজ্জকি-সিদ্ধ ভগবান্‌সকল গজাইয়া উঠিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য তাহাদের ভগবত্তা-বিষয়ে পাষণ্ডগণের তৎকালে কোন সংশয় জাগ্রত হয় না, প্রমাণ-অল্পসঙ্কানের যুক্তি-নিষ্ঠা তখন অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। জন্ম-মৃত্যুর অধীন এইসকল ভগবানের (?) আচার-বিচার সহজেই উহাদের শিশু-মস্তিষ্কের যুক্তিগ্রাহ্য হয় দেখিয়া উহারা ভাবিয়া নেয়—ভগবান্ বলিতে এইপ্রকারই বুঝায়। মুখগণ ভেজাল দুধ-পানে অভ্যস্ত হওয়ার নির্ভেজাল দুধের স্বরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারে না—অবশেষে নির্ভেজালকেই ভেজাল করাইয়া উহাকে তাহাদের গ্রহণযোগ্যতায় আনয়ন করে। তদ্রূপ সকল যুক্তিতর্কাতীত ও অচিন্ত্যশক্তিমান্ ভগবানের অন্তর্দান পাষণ্ডদের নিকট রহস্যময় হইয়া পড়ে—ওজ্জ্বল তাঁহার মৃতদেহ অল্পসঙ্কানের হিড়িক পড়িয়া যায়—অবশেষে তাঁহাকে গুমথনের গল্প খাড়া করাইয়া নিজেদের ক্ষুদ্র যুক্তিতর্ককে চরিতার্থ করিয়া তৃপ্তি লাভ করে। হায় রে অপরিণামদর্শী পাষণ্ড! তাহারা একটা বারও ভাবে না—ইহাতে নিজেদের এবং অত্র দশজনের নিত্য কল্যাণের পথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল। ভগবান্ সেই বিদেবী ক্রুর নরাদমণ্ডলিকে এই সংসার-

মধ্যেই অশুভ আশ্রয়ধোনিতে নিষ্ক্ষেপ করেন এবং সেই মূঢ়সকলের পক্ষে ভগবৎপ্রাপ্তি তখন আরও অসম্ভব হওয়ায় তাহারা তদপেক্ষাও অধম গতি লাভ করিতে থাকে।—

তানহং দ্বিষতঃ কুরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।

ক্ষিপ্যাম্যজশ্রমশুভানাহরীষেব যোনিষু ॥

আশ্রয়ী যোনিমাপন্ন্য মৃঢ়া জন্মনি জন্মনি ।

মামপ্রাপ্যৈব কোন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥

( গীতা ১৭/১২-২০ )

স্বরাষ্ট ভগবান্ কোন নিয়মের মধ্যেই আবদ্ধ নহেন। The king is bound by no law. প্রজাগণকে নিয়ম-নিষ্ঠ করাইতেই তিনি নিয়ম আচরণ করিয়া দেখান মাত্র। কিন্তু স্বয়ং তিনি নিয়মের অধীন নহেন—নিয়ম তাঁহার অধীন হইয়া চলে। সুতরাং জন্মগ্রহণ করিলেই মৃত্যুবরণের নিয়ম ভগবানের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। “এতদীশনমীশস্ত প্রকৃতিস্বোহপি তদগুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাঐশ্বর্যধা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥” ( ভাঃ ১/১১।৩৮ )। ঈশ্বরের ঈশিতা এই যে, তিনি সর্বতোভাবে প্রকৃতির অতীত। প্রকৃতিস্থ হইয়াও তিনি গুণময় প্রকৃতিতে আবদ্ধ হন না। ইহাই শাস্ত্রকথিত ভগবান্ এবং শাস্ত্র-বহির্ভূত ভেদ্বিরাজ ভগবান্ (?) বা সাধারণ জীবের মধ্যে পার্থক্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অন্তর্দান-বিষয়ে অস্ত্র-জীবকুলের যে ভ্রম রহিয়াছে, তাহা দূরীভূত করিতে ভাগবত-বক্তা শ্রীশুকদেব গোশ্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,— “মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটশ্চ” ( ভাঃ ১/১৩১/১১ )। যে শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে তৎক্ষণাৎ সেই ‘জরাব্যাধ’ দশরীরে স্বর্গগমন করিয়াছিল, যিনি গুরুপুত্রকে গুরু-দক্ষিণারূপে যমালয় হইতে ফেরত আনিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুবরণ নট-পুরুষের মায়া-বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কি? ঐন্দ্রজালিকের যিনি ঐন্দ্রজালিক, সেই তাঁহার পক্ষে ইহা কি কিছুমাত্র অসম্ভব? প্রকৃতপক্ষে বালী-পুত্র অঙ্গদের প্রতি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের প্রদত্ত বচন-অনুসারেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উক্ত ব্যাধরূপী অঙ্গদের দ্বারা এরূপ অশ্রমোহন লীলার উদ্ঘাটন করেন। ইহা ছাড়া শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীবামনদেব, শ্রীবরাহদেব, শ্রীনৃসিংহদেব কিংবা কোন ভগবৎ-স্বরূপেই মন্বন্তোচ্চিহ্ন মৃত্যু ত’ দূরের কথা, উক্ত মায়াবিড়ম্বিত-মৃত্যুবরণও দৃষ্ট হয় না—তাঁহারা কেবল-মাত্র অশুভিত হইয়াছেন। সুতরাং সর্ব অবতারেরও যিনি অবতার, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র কিরূপে অকালমৃত্যু কিংবা হত্যার স্বীকার হইবেন? ( ক্রমশঃ )

—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

## শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৮ পৃষ্ঠার পর ]

রহস্য করে আমরা বলি—‘বৈষ্ণব হৈতে মনে ছিল বড় সাধ। তুণাদপি শ্লোকে পড়ে গেল বাদ ॥’—এটা রহস্য নয়, বাস্তব। সাধন-ভজন শুনতে খুব সোজা। অগ্রসর হলে দেখা যায় এ ত’ ভীষণ জিনিষ। অত্যাশ্রয় যুগে যোগ, তপস্যা কত কি ছিল। কিন্তু কলিকালে হরিনাম করলে সব হয়ে যাবে।

হরিনাম করলে ত’ সব হবে, কিন্তু এখন আবার শুনছি সব নামাপরাধ, নামাপরাধ। এসব আবার কি? নামাপরাধ, ধামাপরাধ, সেবাপরাধ ইত্যাদি কত কি সব টেনে এনেছেন। দশরকমের নামাপরাধ ছেড়ে হরিনাম করতে হবে। মহামুন্সিলের কথা! তার মধ্যে আবার সবথেকে বড় নামাপরাধ হল ‘অহং-মমবুদ্ধি’। ‘আমি আমার’, ‘আমি আমার’ তা চলবে না। ভগবানকে আমার করতে হবে। আমি ভগবানের এ ভাবটা থাকা চাই। এ ত’ অনেক ব্যাপার! কি করে করব? আবার ধামে বাস করছি, ধামাপরাধ হয়ে যাচ্ছে দশ রকমের! সেবা করতে যাচ্ছি, সেবাপরাধ হয়ে যাচ্ছে বত্রিশ রকমের! তাহলে যাই কোথায়? শুনেছিলাম যেমন তেমন করে দিনান্তে একবার নাম করলে হয়। অত সস্তা! কঁাকিবাজি! ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমরা ২৪ ঘণ্টা দোঁড়াদোঁড়ি করছি, কিন্তু ভগবানের নাম নাকি দিনান্তে একবার করলে হবে! যখন শুতে যাবি তখন কেইবিটুর নাম একবার বলে নিস্, আর কিছু দরকার নেই। এত সস্তার বাজার নাকি? হবে না তা, সুন্দর বিচার রাখতে হবে ভিতরে—কাদতে হবে অন্তরে, প্রার্থনা রাখতে হবে। আমার দোষ-ত্রুটি হচ্ছে, ঠাকুর, সব ক্ষমা করে নিজেকে গ্রহণ কর—একথা অন্তর থেকে বলতে হবে। তা না হলে হবে না। তাহলে সাধন-ভজন মানে কি হচ্ছে?—আকুলতা, ব্যাকুলতা, আকুল ক্রন্দনের নাম হল সাধন-ভজন।

নিজের ভক্তের কাছে ভগবান বক্তৃতা স্বীকার করলেন। “গোপী (যশোদামাতা) জগতের মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হতে যেরূপ অল্পগ্রহ লাভ করেছিলেন—ব্রহ্মা, মহেশ্বর, এমন কি সর্বদা ভগবানের অধ্বাঙ্গ-বিলাসিনী লক্ষ্মী-দেবীও তাদৃশ অল্পগ্রহ লাভ করেন নাই।” তাহলে মাতা যশোমতীর এখানে কেমন মহিমা-মাহাত্ম্য বলছেন। ‘মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ’—একটা কথা আছে। ভগবান কি কেবল মুক্তি দিয়েই শেষ? এইটুকুই তিনি করেন? না, তারপর

আরও কিছু আছে ? ভগবান্ মুক্তি দিতে চাচ্ছেন ভক্তকে । ভক্ত বলছেন,—  
না চাই না মুক্তি, মুক্তি আমার দরকার নেই । সে কি, এমন দুর্ভাগ মুক্তি তা  
তুমি নেবে না ! কেন নেবে না ?—মুক্তি চাইতে গেলে যদি তোমাকে হারিয়ে  
ফেলি ঠাকুর । ‘যেই জন কৃষ্ণ ভজে সেই বড় চতুর ।’ মুক্তি দিতে চাইলেও  
ভক্ত নিচ্ছেন না ভগবান্কে হারাবার ভয়ে ।

কিন্তু ভক্ত যিনি তিনি চাররকমের মুক্তি পেয়েই যাচ্ছেন *already* ।  
সালোক্য—ভগবানের সমান লোক, সামীপ্য—ভগবানের কাছে না থাকলে  
তঁার সেবা করতে পারছেন না, তাই তঁার সমীপে বাস, সাক্ষ্য—ভগবানের  
শ্রায় রূপ লাভ হচ্ছে । আশ্রয় ব্যাপার । ভগবানের মত রূপ হয়ে যায় ?—হ্যাঁ ।  
সাক্ষী—ভগবানের মত ঐশ্বর্য লাভ হয় । এখানে আবার কথাটা এসেছে—“কৃষ্ণ  
ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে ।” যদি ভগবানের যে ঐশ্বর্য সে ঐশ্বর্য  
ভক্তের সবটা লাভ হয়ে যাবে তাহলে ভগবানের ভগবত্তা কোথায় রইল ।  
‘ভগবান্’-শব্দের যে ব্যাখ্যা শাস্ত্রে দেওয়া আছে, তা হল,—

ঐশ্বর্যশ্চ সমগ্রশ্চ বীৰ্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানবৈরাগ্যমোক্ষৈশ্চ ব্ধাং ভগ ইতীক্ষ্ণনা ॥

এটা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের হাতের মুঠায় আছে । যদি সব সমান হয়ে গেল  
তাহলে ভগবানের দরকার নেই, আমি ভক্তের উপাসনা করব । ভক্তের উপাসনা  
কিজন্য করবে, ভগবানের জগত’ করবে । ব্যাপারটা কি ? শক্তিছাড়া যেমন  
শক্তিমানের পরিচয় নেই, শক্তিমান্ ছাড়া যেমন শক্তির পরিচয় নেই, এখানেও  
একই কথা । আমি ঈশ্বর রূপা প্রার্থনা করছি তাঁকে বাদ দিয়ে ত’ ভগবান্ নন,  
তাঁকে নিয়েই ভগবান্ । মূল উদ্দেশ্য কি ?—ভগবৎসেবা, হরিসেবা । হরিসেবা  
পাওয়ার জন্য ভক্তসেবা করতে হবে । উভয়ে উভয়ের পরিপূরক । ভক্তসেবা  
ছাড়া ভগবানের সেবা নয় ; ভগবানের সেবা ছাড়া ভক্তসেবা নয় । ভগবান্  
ছাড়া ভক্ত নন ; ভক্ত ছাড়া ভগবান্ নন—এই কথা বুঝানো হয়েছে ।

“গোপীকা-সুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের পক্ষে যেরূপ স্নাত দেহাভিমাত্রী  
তাপস ( অষ্টাঙ্গ-যোগসাধকগণের কিম্বা আত্মদর্শী জ্ঞানিগণের পক্ষে সেরূপ নছেন ।”  
ভক্তের পক্ষে যেটা স্নাত—ভক্তিলাভ, ভগবৎপ্রেম-প্রীতি লাভ, জ্ঞানিগণের পক্ষে,  
যোগী-তপস্বিগণের পক্ষে তেমন স্নাত নয় । কোথায় আছে ?—ভাগবতের  
উদ্ধব-সংবাদে আছে । কি আছে ?—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহঃ ।

মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাক্ষাত্মা ন শাম্যতি ॥

আরও আছে। কোথায় আছে ?—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।

ন স্বাধ্যায়ন্তপন্ত্যাগো যথা ভক্তি-স্মমোজ্জিতা ॥

আমার প্রতি অজ্জিতা ভক্তি, ঐকান্তিক ভক্তি, একনিষ্ঠ ভক্তি আমাকে যেমন বশীভূত করে, হে উদ্ধব! কোন যোগী, তপস্বী, কর্মী, জ্ঞানীর প্রতি তেমন দৃষ্ট হই না। এসব কথা বুঝানো আছে। “অর্থাৎ তপস্বী ও জ্ঞানী অতিকষ্ট স্বীকার করলেও তাঁরা ভগবানকে লাভ করবার পরিবর্তে কৃষ্ণের অসম্যক বা আংশিক প্রভাবকে লাভ করে মাত্র।” তাঁদের সম্পূর্ণ লাভ, পূর্ণ লাভ ত’ হয় না। অতএব “এই সমস্ত শ্লোকের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অর্থ বুঝাচ্ছে।” তাগবতের অন্তর্ভুক্ত (১০।১০।২৫) শ্লোকেও বলছেন,—

“যেহেতু দেবর্ষি নারদ আমার প্রিয়তম ভক্ত এবং এরা দুজনও কুবেরের পুত্র, সেইজন্ত মহাত্মা নারদ পূর্ব্বের যেরূপ বলেছিলেন, সেরূপেই আমি এদের উদ্ধার সাধন করব।” দেবর্ষি নারদ আমার প্রিয়তম ভক্ত। কথাটা কার ?—ভগবান্ কৃষ্ণের। কোন কৃষ্ণ বলছেন ?—উদুখলের সঙ্গে কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে যে কৃষ্ণ সেই দামোদর কৃষ্ণ কথাটা বলছেন। কুবেরের ছেলে দুটো যখন স্তব করছিলেন, সেই স্তবের পর বলছিলেন ঐ বাচ্চা শিশু। ‘এ ছেলে ত’ ছেলে নয়, দেবতা নিশ্চয়।’ মানুষ ত’ নয়; পরব্রহ্ম—নররূপী পরব্রহ্ম। সে নররূপটা প্রাকৃত নয়, অপ্রাকৃত। সে রূপ কি ?—‘জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপম্, অতুলং শ্রামহন্দরম্’, ‘বিভূজং শ্রামহন্দরম্’, ‘পরব্রহ্ম নরাকৃতিঃ’, ‘গৃঢ়ং তৎ মনুষ্যানলিঙ্গম্’। সেইরূপ কে দেখেন ?—ভক্ত দেখেন। সব সময় ভক্তের Screen-এ আছেন তিনি। কেমন দেখেন ?—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন, সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।

যং শ্রামহন্দরমচিস্ত্যাগুণস্বরূপং, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

সাধুসন্তগণ নিত্যকাল সেই ভগবানের রূপমাবুঝী দর্শন করছেন, সেই বিভূজ মুরলীধর শ্রামহন্দর মূর্ত্তি নিত্যকাল তাঁরা দর্শন করছেন। কখনও দেখেন, কখনও দেখেন না এমন নয়, সবসময় দর্শন করছেন। ‘গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি’—আমি সেই আদিদেব গোবিন্দকে ভজনা করছি। প্রণাম করছেন কে ওখানে ?—যে সে ব্যক্তি নন, চার মাথাওয়ালা লোক—বীকে আমরা বলি লোকপিতামহ ব্রহ্মা। আমাদের একটা মাথা, তাই নিয়ে আমাদের কত বড়াই, কত অহঙ্কার; আর চারটে মাথা নিয়ে বসে আছেন ব্রহ্মাজী। চার মাথা অর্থাৎ সম্পূর্ণ জ্ঞান। আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো চোখ বসানো আছে সামনে, পিছনে

কি হচ্ছে তা কেউ দেখতে পাচ্ছি না। সামনের অর্দ্ধেক (Semi circle) দেখতে পাচ্ছি। তাও এই যে চশমা এতে অর্দ্ধেকও দেখা যাচ্ছে না। ব্রহ্মাজীর (৩০° × ৪) 360° অর্থাৎ পূর্ণ দর্শন। সবটা দেখা যাবে। সেই জ্ঞান আছে নারদ ঋষির, সেই দর্শন রয়েছে ব্রহ্মাজীর। চার মাথা নিয়েও ব্রহ্মাজী সব জানতে, বুঝতে পারছেন না। বলে ফেললেন,—

“অথাপি তে দেব পদাযুজ্জ্বল্য-প্রসাদ-লেশাহুগৃহীত এব হি।

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্ন একোহপি চিরং বিচিন্ম ॥”

“জানন্ত এব জানন্ত কিং বহুভ্য ন মে প্রভো।

মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥”

ঠাকুর! চার মাথা নিয়েও বুঝতে পারলাম না তোমার তত্ত্ব। ক্ষমা কর আমরা। ব্রহ্মাজী কৃষ্ণের সম্পর্কে কে হন?—নাতি হন। নারায়ণের ছেলে ব্রহ্মাজী, সেজ্ঞান সম্পর্কে নাতি হয়ে গেছেন ওখানে। স্তব করছেন তিনি,—

নারায়ণস্তং ন হি সর্বদেহিনামাত্মান্শ্রবীশাখিললোকসাক্ষী।

নারায়ণোহঙ্কং নরভূজলায়নাং তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব ময়া ॥

কৃষ্ণলীলায় ব্যাখ্যাত করার অল্প ব্রহ্মা ক্ষমা চেয়েছেন কৃষ্ণের কাছে। আমি ত' সম্পর্কে নাতি হই। ছেলে যদি মা-বাবার কাছে কোন দোষ-ত্রুটি করে ফেলে, তাহলে মা-বাবা ক্ষমা করেন, আর আমি ত' নাতি, তাহলে নিশ্চয় তাড়াতাড়ি ক্ষমা পাব।

“দেবর্ষি নারদ আমার প্রিয়তম ভক্ত (কোমরে দড়ি বাঁধা ঐ বাচ্চা ছেলেটা বলছে) এবং এরা দুজনেই কুবেরের পুত্র, সেইজন্ম মহাত্মা নারদ পূর্বে যেমন বলেছিলেন, সেইরূপেই আমি এদের উদ্ধার সাধন করব।”—এটাও ভগবানের প্রতিজ্ঞা। নারদ ঋষি যেমন বলেছেন ঠিক সেইভাবেই কাজটা আমাকে করতে হবে। ভক্তবাৎসল্য কি রকম! “শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির তাৎপর্যও শ্রীনারদের ভক্তিকে অপেক্ষা করেই (অর্থাৎ নারদের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়েই) যমলার্জুন-ভজনাদি সেই সেই নীলা প্রবর্তন করেছিলেন। এই অর্থও ‘ভক্তিবদ্ধ’—এই বিশেষণদ্বারা সূচিত হচ্ছে।

ইতি শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকের দ্বিতীয়স্কন্ধের শ্রীশ্রীল-সনাতন-গোস্বামিকৃত

দিগ্দর্শিনী-নামক টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ইতীদৃক্ স্ব-লীলাভিরানন্দকুণ্ডে স্ব-ঘোষণা নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।

তদীয়েশিতজ্জেষু ভক্তৈজ্জিতত্বং পুনঃ প্রেমতন্ত শতাবৃতি বন্দে ॥ ৩ ॥

“এই প্রকার দাম্ববন্ধনাদি-রূপ বালা-লীলাসমূহদ্বারা যিনি নিজ-লীলাশক্তি-প্রকটিত গোহুলবাসিগণকে আনন্দকুণ্ডে নিত্যকাল নিমজ্জিত করেছেন, যিনি ঐশ্বর্য-জ্ঞানপর ভক্তগণের নিকট ‘আমি আমার নিজ ঐশ্বর্য-ভাবহীন প্রেমিক ভক্তগণের দ্বারা জিত হয়েছি’—এইরূপ ভাব জ্ঞাপন করছেন, আমি প্রেমভক্তি-ভরে পুনরায় সেই দামোদর কৃষ্ণের শত-শতবার বন্দনা করি।

টীকানুবাদ :—গুণবিশেষের দ্বারা উৎকর্ষ-বিশেষ বলছেন—‘ইতীতি’। এই প্রকার ভক্তবজ্রতাহেতু অথবা ‘ইতি’—এই দামোদর লীলার দ্বারা, ‘দ্বৈদীনীভিষ্ট’—এবং এই দামোদর-লীলাসমূহ শ্রীকৃষ্ণের অন্ত্যন্ত পরম মনোহর বালালীলাসমূহ-দ্বারা, ‘স্বস্ত’—নিজের অসাধারণী, ‘লীলাভিঃ’—ক্রীডাসমূহদ্বারা ( গোহুলবাসী সমস্ত প্রাণীগণকে যিনি আনন্দে নিমগ্ন করেন )। ( ভাগবত ১০।১১।৭-৮ ) যথা—

যদি তুমি নৃত্য কর, তাহলে এই খণ্ড-লড্ডু-কাডি ( গুড়ের লাড্ডু ) তোমাকে প্রদান করব—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা, অথবা করতালি দ্বারা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে উৎসাহিত করতেন। তখন তিনি অখিল ঐশ্বর্যসম্পন্ন ভগবান্ হয়েও সামান্ত বালকের আশ্রয় মুগ্ধ হয়ে গান করতেন।” গোপীগণ বালক কৃষ্ণকে নিয়ে আনন্দ করছেন, যদি তুমি নাচ তাহলে তোমাকে এই লাড্ডু দেব, আবার যখন নৃত্য আরম্ভ করেছেন তখন গোপীগণ করতালি দিচ্ছেন, তাঁকে নৃত্যে উৎসাহিত করছেন। অখিল ঐশ্বর্যসম্পন্ন ভগবান্ সামান্ত বালকের আশ্রয় মুগ্ধ হয়ে গান করছেন—এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তিনি সব পারেন। Graduate, Post Graduate পিতা তিনি কি তাঁর লাল্যপাল্য বালককে লেখাপড়া শেখাতে পারেন না?—নিশ্চয় পারেন। কিন্তু যিনি অল্প শিক্ষিত তিনি Graduate, Post Graduate ক্লাসে পড়া ছেলেকে ত’ শিক্ষা দেন না। স্বয়ং ভগবান্ সর্ববিশক্তি-মান্, তাঁর পক্ষে সবটা সম্ভব। কিন্তু সাধারণের পক্ষে ত’ সেটা সম্ভব নয়। ভগবানের লীলার এটা বৈশিষ্ট্য। সব জায়গায় তাঁর প্রকাশ নেই। সব তত্ত্বের মধ্যে, দর্শনের মধ্যে তাঁর প্রবেশাধিকার আছে, কিন্তু ইচ্ছা করে কোন জায়গায় তিনি প্রকাশ করেন, কোন জায়গায় তিনি গুপ্ত রাখেন—এটা তাঁর লীলার বৈশিষ্ট্য। ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান্ তিন, তথাপি সামান্ত বালকের আশ্রয় গান করছেন, গোপীগণের করতালির সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করছেন।

“কখনও বা সূত্রবদ্ধ কাষ্ঠ-পুস্তলিকার আশ্রয় তাঁদের ( গোপীদের ) বশীভূত হয়ে নৃত্য করতেন। কখনও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পাছকা, পীঠ ( আসন বা পীড়ি ), উয়ান ( পরিমাপ-পাত্র বা দাড়ী বাটকারা ) প্রভৃতি দ্রব্য আনয়ন করতে আদেশ

করতেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ঐসকল দ্রব্য যেন আনতে অসমর্থ।” কখনও কখনও বাচ্চাকে পরীক্ষা করছেন—ঐ পীড়িখানা নিয়ে এস ত’। পীড়িখানা তুলতে পারছেন না, বড় ভারী লাগছে তাঁর কাছে—এরূপ ভাব দেখাচ্ছেন কৃষ্ণ। আবার কখনও দাড়ী বাট্‌কারাগুলো নিয়ে আসতে বলছেন। পারছেন না আনতে। এই কৃষ্ণ আবার গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ধারণ করছেন! কৃষ্ণের বয়স তখন কত?—৬ই থেকে ৭ বছরের মধ্যে। কৃষ্ণের যখন ৬ই থেকে ৭ বছর বয়স তখন গিরি-গোবর্দ্ধন তুলেছেন, তাহলে তাঁর পক্ষে অসম্ভব কি? সবই সম্ভব। “এই ভাব প্রকাশ করে ঐ দ্রব্যগুলো ধারণ করে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং আত্মীয়বর্গের হর্ষোৎপাদন করতে করতে পুনঃ পুনঃ ভুজঙ্গ উত্তোলনপূর্বক স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন করতেন।” আবার দেখাচ্ছেন—না, আমি পারব বোধ হয়, আবার একটু চেষ্টা করছেন। পারলেন না। তাঁর কাছে আশ্চর্যের কি আছে, সবটা সম্ভব। কৃষ্ণের—বালগোপালের ধ্যানের মধ্যে একটা শ্লোক আছে, সেই শ্লোকের ভিতরে এটা বর্ণনা আছে।—

সজল-জলদ-নীল-গুক্ত-শ্যামলাঙ্গং

করতল-ধৃত-শৈলং বেণুবান্ধুশীলনম্ ।

মধুর-মধুর-লীলং শ্রীল-গোপাল-মল্লং

ব্রজজন-কুল-পালং ধীমহি ব্রহ্মমূলম্ ॥

তিনি যখন গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ধারণ করেছেন তখন তাঁর বয়স ৬ই থেকে ৭ বছর। এটা সাধারণ মানুষের পক্ষে ত’ সম্ভব নয়। ৬-৭ বছরের সাধারণ ছেলে কি গিরিরাজ-গোবর্দ্ধন ধারণ করতে পারবে?—না, অসম্ভব, কিন্তু কৃষ্ণ অন্যাসে তাকে উত্তোলন করেছেন। কিভাবে?—আমরা যখন ছাত্তা নিয়ে চলি, ছাত্তাটা খুলছি যেমন অতি স্বাভাবিকভাবে, কৃষ্ণও তেমন অতি স্বাভাবিকভাবে গিরিরাজকে তুলে হাতে ধারণ করলেন। আবার দেখাচ্ছেন কি?—বাম হাতে। আবার কি দেখালেন?—কড়ে (কনিষ্ঠ) আঙুলে। সম্পূর্ণ অসম্ভব অগ্র লোকের পক্ষে। কিন্তু তাঁর পক্ষে সম্ভব সবটা। (ক্রমশঃ)

### ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকার ৪৯শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৩ পৃষ্ঠার ১৯ পঙ্ক্তিতে ‘রাধ—মান’ স্থলে ‘রাধা—মান’ হইবে।



## জীবের কৃত্য

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৮ পৃষ্ঠার পর ]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সত্ত্বষ্টি ব্যতীত বিজ্ঞানীদের কোন গবেষণাই পৃথিবীতে শান্তি, আনন্দ ও প্রেম এনে দিতে পারে না। কোটি কোটি অর্থ ব্যয় করে বিজ্ঞানীদের বহু আবিষ্কারের মধ্যে কিছু কিছু আবিষ্কার মানুষের কিছু কল্যাণ সাধন করেছে; যেমন—রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, উড়োজাহাজ প্রভৃতি। ঐ সকল বিভিন্ন বস্তুর মাধ্যমে মানুষ যে আরাম, আনন্দ, স্বচ্ছন্দতা উপভোগ করছে তাহা জড়স্বার্থ বিজড়িত। মানুষ নিজ নিজ স্বভাবে অল্পস্বাধে আরাম, আনন্দ, স্বচ্ছন্দতা প্রভৃতি উপভোগ করতে ইচ্ছা করে। টেলিভিশন, সিনেমার পর্দায় অশ্লীল বিজ্ঞাপন কোমলমতি তরুণ-তরুণীদের কুপথ্যগামী করে। ফলে দেশে অনাচার, যৌন-কেলেঙ্কারী, খুন, হিংসা প্রভৃতি বেড়ে চলেছে। টেলিফোনের মাধ্যমেও অনেক সময় অশ্লীলতা, ভয় দেখানো প্রভৃতি নানাপ্রকার কুরুচিকর কথাবার্তা, অমানুষিক কার্য ঘটে থাকে। উড়োজাহাজের মাধ্যমেও কখনও কখনও চোরাচালান, প্রভৃতি নানাপ্রকার দুর্ভিক্ষমূলক কার্যের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত দেখা যায়। এইভাবে মানুষ নিজ নিজ জড়স্বার্থ চরিতার্থ করে আনন্দ পাবার চেষ্টা করে। আবার বিজ্ঞানের আবিষ্কার অ্যাটমবোম্, প্যাট্রিয়ট প্রভৃতি ভয়াবহ আগ্নেয়াস্ত্র বিশ্ব ধ্বংস করে দিতে পারে। বিশ্বধ্বংসী পরমাণু বোমা তৈরী করতে যে অর্থ ব্যয় হয়, সেই অর্থ অমঙ্গল বা অনর্থ আবাহন করে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে আমাদের ভোগের উপকরণ বৃদ্ধি হয়েছে—সন্দেহ নেই; অতদিকে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের কুফল আমাদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে। পরমাণু বোমা প্রভৃতি আবিষ্কারের মাধ্যমে এক দেশ অথবা দেশের উপর প্রভূত বিস্তার করতে চায়। এক জেগীর উগ্র তামসিক প্রকৃতির মানুষ অথবা দুর্বল সরল প্রকৃতির মানুষকে দাবিয়ে রাখতে চায়। জড়বস্তুর উন্নতির ফলে মানুষের কামনা-বাসনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির আশায় মানুষ হীন কার্য করতেও দ্বিধা করে না। মানুষ আজ বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধ ভুলে পরস্পরের মধ্যে হিংসা, লোভ, শত্রুতা প্রভৃতির দিকে ঝুঁক পড়ছে। কোটি কোটি অর্থ ব্যয় করে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে জড়ের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু আত্মবস্তুর কোন কল্যাণ হয় নি। ভগবৎ-স্বখোদ্দেশ্য ব্যতীত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে ধনী ব্যক্তিগণ যে উন্নত ধরনের

স্বথের সামগ্রী ভোগ করছেন ও আনন্দ পাচ্ছেন তা তাঁদের দৈহিক ও মানসিক স্বথ, তদ্বারা আত্মার স্বথ বা আনন্দ লাভ হয় না। বৈজ্ঞানিক আবিস্কৃত সামগ্রী ভগবান্ কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত না হলে মানুষের আত্মা স্থখী হয় না। চিদ্বস্ত জীবাত্মার চাহিদা চিৎ সম্প্রাপ্ত। জড় সম্পত্তির দ্বারা চিদ্বস্ত আত্মার চাহিদা পূরণ হয় না; আত্মা তৃপ্ত হয় না। জড়জগতে উন্নতির সুফল ধনী ব্যক্তিরাই বেশী উপভোগ করেন। দরিদ্র ব্যক্তিগণ তদনুরূপ স্বথ-স্ববিধা না পাওয়ায় তাঁদের মধ্যে লোভ, হিংসা, প্রভৃতি তামসিক গুণগুলি বৃদ্ধি পায়। ধনীরা ইচ্ছামত স্বথ-স্ববিধা ভোগ করায় মদ-মাংসখ্যাতি তামাসিক গুণ তাঁদের মধ্যেও প্রকাশিত হয়। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবধান গড়ে ওঠে ও ক্রমশঃ তাহা বৈরীতায় পর্যাবসিত হয়। মানুষ ক্রমশঃ প্রেমধর্ম থেকে দূরে সরে গিয়ে স্বার্থপর হয়ে ওঠে। কেহ কেহ নাস্তিক হয়ে পড়ে। তাই কোটি কোটি অর্থ ব্যয়দ্বারা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ভগবান্ অচ্যুতের সন্তোষ বিধানের জন্য নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক।

ভোগের দিকে দৃষ্টি গেলে ভগবানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় না। জড়দেহের ভোগ্য বিষয়-পিপাসাই অসন্তুষ্টি। ইহা একপ্রকারের অনর্থ। একসময় পরীক্ষিত মহারাজ ধর্মবলে কলিকে নিগ্রহ করলে কলি তাঁর থাকবার স্থান যাজ্ঞা করল। তখন পরীক্ষিত মহারাজ কলিকে চারিটা অর্ধের স্থান প্রদান করলেন;—

“অতর্খিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।

দ্যুতং পানং প্রিয়ঃ স্থনা যত্রাধর্মশ্চতুর্বিধঃ ॥” (ভাঃ ১।১৭।৩৮)

অর্থাৎ—পরীক্ষিত মহারাজ কলির প্রার্থনা শুনে তাঁকে দ্যুতক্রীড়া, তাহুল, মন্ত, গাঁজা, তামাক প্রভৃতি পান, স্ত্রী-সঙ্গ তথা অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ বা স্ত্রীতে অত্যাশক্তি ও প্রাণীবধ—এই চারিটা অসৎ কার্য যে স্থানে ষটে, সেই স্থানগুলিকে দিলেন। কিন্তু কলি ঐ স্থানগুলি পেয়েও সন্তুষ্ট হতে পারল না। কলি পুনরায় মহারাজের নিকট আরও স্থান যাজ্ঞা করল;—

“পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।

ততোহনৃতং মদং কামং রাজৌ বৈরঞ্চ পঞ্চকম্ ॥” (ভাঃ ১।১৭।৩৯)

তখন রাজা কলিকে স্বর্ণ দান করলেন। কেননা মানুষের সর্বদাই স্বর্ণ বা অর্থের প্রয়োজন। পরে রাজা তাঁকে অনৃত, মদ, কাম, রজঃ, বৈর—এই পাঁচটা দান করলেন। কলি এইবার খুশী হল। অর্থ যেখানে থাকে, সেখানেই ঐ পঞ্চ অনর্থ অবস্থান করে। অনৃত অর্থাৎ মিথ্যাভাবণ ও কপট ব্যবহার; জড়ীয় রূপ, সৌন্দর্য্য, বিভূতি, উত্তম কুলে জন্ম, অভিমান, জড়ীয় বিদ্যা, সম্মান, রূপ

ও বল,—এই ছয় প্রকার মদ হতে বৈষ্ণব-অপরাধ হয়। কান অর্থাৎ জড় কামনা-বাসনা তথা নিজ স্বত্বভোগ কামনা; রজঃ থেকে অর্থ লোভ হয়; আর বৈর অর্থাৎ শত্রুতা—এইগুলি কলির বাসস্থানরূপে নির্ণীত হয়েছে। যেখানে অর্থে আসক্তি আছে, সেখানেই কলি বাস করে, ভগবান হরি সেখানে থাকেন না।

অর্থের দ্বারা কি হয়? নিজের স্থূল শরীরের স্বত্ব-ভোগ চেষ্টা, নিজের বিভাজন-চেষ্টা প্রভৃতি হয় আর অপরের উপকার করার ইচ্ছাও হয়। স্থূল শরীরকে আত্মা বলে বিচার করলে নিজ শরীরের স্বত্ব-স্ববিধা ভোগে আমরা আকৃষ্ট হই; আর সূক্ষ্ম শরীর চিন্তাভাব মনকে আত্মা বলে বোধ করলে আত্মীয়-স্বজনের উপকার করা, জনহিতকর কার্যাদি করা প্রভৃতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। মনের ধর্ম বিবাদ-বিসম্বাদ, স্বার্থ-মিদ্ধি, জাগতিক ভাব-ভাগবাসা প্রভৃতি বিরাজ করে। মনের ধর্ম পরিবর্তনশীল। দেহের ধর্মে ব্যাধি, জরা, মৃত্যু আছে। দেহের ধর্মও পরিবর্তনশীল। দেহ-মনের বৃত্তি যদি আত্মার বৃত্তি হও, তাহলে দেহ-মন অনিত্য বস্তুর প্রতি ধাবিত হত না। “শরীরমাখং থলু ধর্ম-সাধনম্”—ইহা আত্মার বৃত্তি বা ধর্ম নয়। হরিভজনের পরিপাকের জন্ত জীবন ধারণ বা দেহরক্ষার্থে যথাযোগ্য কৃষ্ণসেবানুকূল-বিষয় গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য। যাদের ভোগাশারূপ কপটতা থাকে, তারা হরিভজনের জন্ত দেহ সূস্থ রাখার নামে দেহারামী হয়ে পড়ে। এজগতে দেহ সূস্থ রেখে শুধু বলবান হয়ে বেঁচে থাকার আশা ভক্তের থাকে না। দেহারামীগণ নিজেদের শরীর চিন্তায় সর্বদা মগ্ন থাকে। ‘দেহই ধর্ম সাধনের মূল’—এই বাক্য চার্লীকের গ্রন্থ নাস্তিক, অসংযমী ব্যক্তিরাই বলতে পারেন। নাস্তিকগণ পশু-পক্ষীর গ্রন্থ আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি ইন্দ্রিয়স্বখে সর্বদা প্রমত্ত থাকে। ভাল আশ্রয় ও ভাল ভাল দ্রব্য খাওয়ার জন্ত বা ভোগ করার জন্ত ব্যস্ত হলে আমরা দেহারামী হয়ে পড়ব;—আত্মারাম হতে পারব না। শরীর পুষ্টির জন্ত ব্যাকুল হলে ধর্ম-সাধন হয় না, তাহা ধর্মের ছলনায় হরিসেবার পরিবর্তে মায়াবী সেবা হয়ে যায়। ‘আত্মারাম’-অর্থে ‘আত্মনি যঃ রমতে’—যিনি আত্মাতে সম্যক রমণশীল। দেহারামীর আনন্দ-উপভোগে শব্দাদি বাহ্যবিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়। আর আত্মারামের আনন্দপ্রাপ্তিতে কোন প্রকার বাহ্যবস্তুর প্রয়োজন হয় না। তাঁরা স্বরূপানন্দেই পরিপূর্ণ ও আনন্দিত। আত্মারামতা লাভ হলে বিষয়-মুক্ত অনারামেই হয়ে থাকে ও আত্মস্বরূপানন্দে তৃপ্তি হয়। প্রসঙ্গতঃ দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে মহা-প্রয়াণের পূর্বে ভগবান শ্রীমন্নহাপ্রভুর নিকট হুঃখ নিবেদন করে বলছেন,—

“আর দিন মহাপ্রভু তাঁর ঠাঞি আইলা ।  
 ‘স্বস্থ হও, হরিদাস’ বলি’ তাঁরে পুছিলা ॥  
 নমস্কার করি’ তেঁহো কৈলা নিবেদন ।  
 শরীর স্বস্থ হয় মোর, অস্বস্থ বুদ্ধি-মন ॥  
 প্রভু কহে—কোন্ ব্যাধি, কহ ত’ নিশ্চয় ।  
 তেঁহো কহে—সংখ্যা-কীর্তন না পুরয় ॥  
 প্রভু কহে—বুদ্ধ হইলা সংখ্যা অল্প কর ।  
 সিদ্ধ-দেহ তুমি, সাধনে আগ্রহ কেনে কর ??  
 লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতারণা ।  
 নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার ॥”

( চৈঃ চঃ অধ্য ১১।২১-২৫ )

উক্ত ঘটনা থেকে উপলব্ধি হয় যে, তত্ত্ববিৎ মহাভাগবতগণ সর্বদা নিগুণ পরমানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের চিন্তায় রত থাকায় তাঁরা শারীরিক দুঃখ-কষ্ট ও বৈষয়িক লাভ-লোকমানের প্রতি উদাসীন থাকেন। হরিভজন স্বেচ্ছাভাবে না করতে পারলে তাঁরা দুঃখ পেয়ে থাকেন।

দেহ-মন অনাত্মা ;—আত্মা নয়। আত্মা কখনও অনাত্মার অনুশীলন করে না। আত্মার বৃত্তি হল আত্মার অনুশীলন করা, পরমাত্মার অনুসন্ধান করা। উপনিষদে আত্মার দ্বারা আত্মার অনুশীলনের কথা কীৰ্তিত হয়েছে—“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যঃ, মন্তব্যঃ, নিদিধ্যাসিতব্যঃ ॥” (বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬)। আত্মা যাতে অনাত্মবস্তুর নিয়ুক্ত না হয় ও বিপর্যস্ত না হয়ে পড়ে, সেজন্য আত্মতত্ত্ববিদ সদগুরুচরণে কায়মনোবাক্যে শরণাগত হয়ে তাঁর উপদেশ-মন্ত্র গ্রহণ করে সেইমত পরমবস্তুর অনুশীলন করতে হবে। সদগুরুর আত্মগত্যে ভগবৎ-সেবায় উন্মুখ হয়ে শ্রবণ-কীর্তনাদিতে অর্থের সদ্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য। জীবগণকে কৃষ্ণ-ভক্তিতে উন্মুখী করাই অর্থের সাফল্য।

“এতাবজ্ঞানসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।

প্রাণৈরর্থৈশ্চিহ্না বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥” ( ভাঃ ১০।২৩।৩৫ )

অর্থাৎ—“ইহলোকে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা পরের প্রতি নিরন্তর শ্রেয়ঃ আচরণ করাই দেহধারি-জীবের জ্ঞান-সাফল্য।

উড়িষ্যা-সম্রাট তক্ত প্রতাপরুদ্র যখন তাঁর সমস্ত বিষয় বৈষ্ণব-সেবায় ও শ্রীহরি-কীর্তন প্রচারে নিয়োজিত করেন, তখনই ভগবান্ শ্রীম্মহাপ্রভু রাজাকে দর্শন দান করে রূপা বিতরণ করেছিলেন ;—

“পূর্ব-সেবা দেখি’ তাঁরে কৃপা উপজিল ।

অহুসন্ধান বিনা কৃপা-প্রসাদ করিল ॥

\* \* \* \*

রাজা কহে—আমি তোমার দাসের দাস ।

ভূত্যের ভূত্য কর মোরে এই মোর আশ ॥

তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য দেখাইল ।

‘কারেহ না কহিবে’ এই নিষেধ করিল ॥”

( চৈঃ চঃ মধ্য ১৪।১৫, ১৮-১৯ )

জাগতিক নীতি ও পরার্থিতার নামে যে-সকল প্রচ্ছন্ন ভোগ-পরিচর্যায় অর্থ ব্যয়িত হয়, তাকে অর্থের সদ্ব্যবহার বলা যায় না,—তাহা ভোগী মনুষ্যকুলের বিলাসিতা বর্দ্ধনের পন্থা মাত্র । ( ক্রমশঃ )

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

শুভাবির্ভাব-শতবার্ষিকী

যাহারা ভক্তিপথের পথিক, শ্রীগুরুপূজা তাঁহাদের নিত্যকৃত্য । যদিও প্রতি দিনে, প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি মিনিটে, প্রতি সেকেন্ডে সর্বক্ষণ তাঁহারা শ্রীগুরুসেবা করিতেছেন, তথাপি বিশেষ পূর্বদিন বা বিশেষ কোন উপলক্ষে শ্রীগুরুপূজা ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা-মাহাত্ম্য অধিকভাবে প্রচার করা ঐশ্বর্যশী ভূত্যের অবশ্য কর্তব্য । বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সদস্তগণ তদীয় পরমারাম্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-শতবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ষব্যাপী যে বিশেষ হরিকথা প্রচারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত বাস্তবায়িত হইতেছে । শ্রীসমিতির বিশিষ্ট প্রচারকগণ বিভিন্ন প্রচারকেন্দ্রে ও বিশেষ বিশেষ স্থানে নগর-সমীকর্তন ও ধর্মসভাদি দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা-মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন ।

### শ্রীকৃষ্ণভিরত্ন গোড়ীয় মঠ, দুর্গাপুর ( বন্ধমান )

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার অব্যবহিত পরে বিগত ৩১/৩/২৭ তারিখে শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে শ্রীসমিতির সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদিগুণ্ডামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় প্রায় পঞ্চাশ জন সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী দুর্গাপুরস্থ শ্রীকৃষ্ণভিরত্ন গোড়ীয় মঠে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীমঠের প্রতিষ্ঠা দিবস ও শুভাবির্ভাব-শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৪/২৭ ও ২৪/২৭ তারিখে বিশাল নগর-সঙ্কীর্তন শোভাযাত্রা দুর্গাপুরের বিশেষ বিশেষ রাজপথসমূহ পরিক্রমা করেন। দিবসদ্বয় সন্ধ্যায় শ্রীল নারায়ণ মহারাজের সভাপতিত্বে এক বিরাট ধর্মসভা আয়োজিত হয়। উক্ত সভায় “শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অতিমর্ত্য চরিত্র ও অবদান-বৈশিষ্ট্য” এবং “শ্রীমন্নহাপ্রভুর অবদান বৈশিষ্ট্য ও সনাতন ধর্ম”-বিষয়ে ত্রিদিগুণ্ডাপদগণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

২৪/২৭ তারিখে সাধারণ-মহোৎসবে প্রায় পঞ্চ-সহস্রাধিক আহুত, অনাহুত ও রবাহুত জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

### শ্রীশ্রামহন্দর গোড়ীয় মঠ, শিলিগুড়ি ( দার্জিলিং )

পূর্বপ্রচারিত অনুষ্ঠান-সূচী অনুযায়ী গত ২৭/৪/২৭ শ্রীসমিতির যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদিগুণ্ডামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত আচার্য মহারাজ ও শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী প্রভুর পরিচালনায় শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে প্রায় পঞ্চাশ জন সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী শিলিগুড়িস্থ শ্রীশ্রামহন্দর গোড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য তথা অস্মদীয় গুরুপাদপন্ন—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ পূর্ব হইতেই এখানে অবস্থান করিতেছিলেন। পরমপূজ্যপাদ ত্রিদিগুণ্ডামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদিগুণ্ডামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ, ত্রিদিগুণ্ডামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজও এই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

১৫ই বৈশাখ, ১৪০৪ ( ইং ২৮/৪/২৭ ) সোমবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় সুসজ্জিত গাড়ীতে শ্রীগুরুপাদপন্নের অর্চালেখ্য লইয়া এক বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করেন। ২২/৪/২৭ অর্থাৎ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আয়োজিত ধর্মসভায় শ্রীশ্রীল সভাপতি মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলে পর পরমপূজ্যপাদ শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত আচার্য মহারাজ, শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ, শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত ত্রিদিগুণ্ডী মহারাজ, শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ “শ্রীগুরুত্ব ও শ্রীশ্রীমন্তক্ৰিপ্রজ্ঞান

কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-শতবার্ষিকী” সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর সভাপতির ভাষণে শ্রীল গুরু-মহারাজ তাঁহার স্বভাবমূলভ ওজস্বিনী ভাষায় শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। দিবসদ্বয় সহস্রাধিক ভক্তকে মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

### শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ, শিলিগুড়ি ( জনপাইগুড়ি )

১৭ই বৈশাখ, ১৪০৪ ( ইং ৩০।৪।২৭ ) বুধবার শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিদিগ্বী মহারাজের পরিচালনায় ও শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারীর ব্যবস্থাপনায় দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাজীউ-এর বিশেষ ভোগারতির পর সহস্রাধিক ভক্তকে বিচিত্র সুস্বাদু মহাপ্রসাদ দান করা হয়। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের সভাপতিত্বে অহুষ্ঠিত ধর্মসভায় শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমৎ ত্রিদিগ্বী মহারাজ, শ্রীমৎ পর্যটক মহারাজ, শ্রীমৎ সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, শ্রীনিরুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ “শতবার্ষিকী উৎসবের প্রয়োজনীয়তা ও তার প্রকৃত মূল্যায়ন, গুরু-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত ব্যবহার ও শ্রীগুরুপাদপদের মহিমা-মাহাত্ম্য” সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিশেষে শ্রীশ্রীল সভাপতি মহারাজ মায়াবাদ-নির্বিশেষবাদ নিরাসপন্ন শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব স্থাপন করেন। তিনি জানান—“যতদিন মায়াবাদ-নির্বিশেষবাদ এ জগতে থাকবে, ততদিন শুদ্ধভক্তির কথা লোকে জানতে পারবে না, শুনেতে পারবে না। তাদের কোন সুযোগ নেই।.....গুরুবর্গের অপার মহিমা, অনন্ত মহিমা। আজ আমরা যে উপলক্ষে এখানে সমবেত হয়েছি; সেই গুরুবর্গের উপদেশ-নির্দেশ পালন করে যেন আমাদের জীবন সফল করতে পারি, ধন্য হতে পারি।”

### শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠ, মাথাভাঙ্গা ( কোচবিহার )

শিলিগুড়িতে ধর্মসভা ও নগর-সঙ্কীর্ণনের পর শতবার্ষিকী-প্রচার পাটীগুতে বহু ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্ত যোগদান করেন। তাঁহারা মূল প্রচারপাটীর সহিত ১৮ই বৈশাখ, ১৪০৪ ( ইং ১৫।৪।২৭ ) বৃহস্পতিবার বাসযোগে শিলিগুড়ি হইতে মাথাভাঙ্গা শহরস্থ শ্রীসমিতির প্রচারকেন্দ্র শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিলে পর মঠাধ্যক্ষ শ্রীবিজ্ঞানিধি ব্রহ্মচারী ও স্থানীয় ভক্তগণ সাদর অভ্যর্থনা

জ্ঞাপন করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীকালিদাস সাহা মহাশয় তাঁহার গৃহে বৈষ্ণব-সেবার ব্যবস্থা করেন। বৈকাল ৪ ঘটিকায় নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন করিতে করিতে মাথাভাঙ্গা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করা হয়। নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন-শোভাযাত্রা ও ব্রহ্মচারিগণের উৎসাহ-উদ্বীপনা দর্শন করিয়া স্থানীয় জনসাধারণ প্রশংসা করিতে থাকেন।

১২শে বৈশাখ ( ইং ২/৫/২৭ ) শুক্রবার মাথাভাঙ্গা-নিবাসী শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ সাহা মহোদয় তাঁহার গৃহে মধ্যাহ্নে ধামবাসী বৈষ্ণবগণের সেবার এক বিশেষ আয়োজন করেন। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় মাথাভাঙ্গা শ্রীশ্রীমদনমোহন ঠাকুরবাড়ীর নাট্যমন্দিরে শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজের সভাপতিত্বে অহুষ্ঠিত ধর্মসভায় শ্রীমৎ পর্যটক মহারাজ ও শ্রীমদ্ আচার্য মহারাজ “শ্রীশ্রী ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাঁহার অতিমর্ত্য লীলার” বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করেন। পরিশেষে শ্রীল সভাপতি মহারাজ “শ্রীমদনমোহন ঠাকুরবাড়ীর শ্রীমন্দিরে শ্রীমতী রাধারাগী নাই কেন এবং ‘দরিদ্র-নারায়ণ সেবা’ ও ‘জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর’—এই ভ্রান্ত মতবাদ নিরসনপূর্বক শাস্ত্রীয় সুসিদ্ধান্ত-পূর্ণ মতবাদ স্থাপন করেন।

নিশিগঞ্জ-নিবাসী শ্রীগৌরপদ মালাকার মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে ২০শে বৈশাখ ( ইং ৩/৫/২৭ ) শনিবার একাদশী-তিথিতে প্রচারপাটী তাঁহার গৃহে শুভাগমন করেন। বেলা ৮ ঘটিকায় নিশিগঞ্জ এবং আশেপাশের কয়েকটা গ্রামে নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন করা হয়।

অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় ব্রহ্মচারিগণ মহাজন-পদাবলী কীৰ্ত্তন করেন। কীৰ্ত্তনান্তে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলে পর পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণকুপা ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত আচার্য মহারাজ, শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ “গোড়ীয়ার তিন ঠাকুর—গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহন-তত্ত্ব”, “একাদশী-ব্রত মাহাত্ম্য” সম্পর্কে শাস্ত্রীয় তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিশেষে সভাপতি মহারাজের অসাধারণ বাগিতাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে উপস্থিত সকল শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন।

মাথাভাঙ্গা হইতে নিশিগঞ্জ এবং নিশিগঞ্জ হইতে কোচবিহার পর্যন্ত সকল বৈষ্ণবগণের যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত ও একাদশী-তিথিতে অহুঙ্কর ও দ্বাদশীতে পারণের ব্যবস্থা করিয়া সঙ্গীক শ্রীমালাকার মহোদয় সমিতির ধন্যবাদাই হন।



# শুভাবিভাব-শতবাষিকীর

অনুষ্ঠান-মুচী ( ২ )

১২।৬।২৭—

শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে মঠচণ্ডীপুরে  
( মেদিনীপুর ) শুভবিজয় ।

১৪।৬।২৭—

চণ্ডীপুর হইতে ডেবরা (মেদিনীপুর)

১৬।৬।২৭—

ডেবরা হইতে সবং ( মেদিনীপুর )

১৮।৬।২৭—

সবং হইতে খড়্গপুরস্থ (মেদিনীপুর)  
শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ আশ্রমে শুভবিজয়

১৯।৬।২৭—

খড়্গপুর হইতে পুরীস্থ ( উড়িষ্যা )  
শ্রীনীলাচল গোড়ীয় মঠে শুভবিজয়

২২।৬।২৭—

পুরী হইতে কোরটস্থ ( উড়িষ্যা )  
শ্রীগোপালজী গোড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে  
শুভবিজয়

২৪।৬।২৭—

কোরট হইতে বালেশ্বর সহরস্থ  
( উড়িষ্যা ) শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথজী  
গোড়ীয় মঠে শুভবিজয়

২৭।৬।২৭—

বালেশ্বর হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপে  
প্রত্যাবর্তন ।

১২।৬।২৭ ও ১৩।৬।২৭—

নগর-সংস্কার্তন ও ধর্মসভা ।  
( ১৩।৬।২৭ পূর্বাঙ্কে শ্রীপিছলদা গোড়ীয়  
মঠে ধর্মসভা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ । )

১৪।৬।২৭ ও ১৫।৬।২৭—

নগর-সংস্কার্তন ও ধর্মসভা ।

১৬।৬।২৭ ও ১৭।৬।২৭—

নগর-সংস্কার্তন ও ধর্মসভা ।

১৮।৬।২৭—

নগর-সংস্কার্তন ও ধর্মসভা ।

১৯।৬।২৭ হইতে ২১।৬।২৭—

নগর-সংস্কার্তন ও ধর্মসভা ।

২২।৬।২৭ ও ২৩।৬।২৭—

নগর-সংস্কার্তন ও ধর্মসভা ।

২৪।৬।২৭ হইতে ২৬।৬।২৭—

নগর-সংস্কার্তন ও ধর্মসভা ।



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।  
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিলশৃণু ॥

অন্য ধর্ম স্তূষ্টরূপে পালে যেই জন ।  
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪২শ বর্ষ

}

২৬ বামন, অনিরুদ্ধ, ৫১১ শ্রীগোবিন্দ  
৩১ আষাঢ়, বুধবার, ১৪০৪, ইং ১৬/৭/২৭

}

৫ম সংখ্যা

সান্দুবাদং

শ্রীগঙ্গাস্তোত্রম্

[ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতম্ ]

দেবি ! সুরেশ্বরী ! ভগবতি ! গঙ্গে !

ত্রিভুবন-তারিণি ! তরল-তরঙ্গে !

শঙ্কর-মৌলি-নিবাসিনি ! বিমলে !

মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥ ১ ॥

সুরেশ্বরী, ভগবতী, ত্রিভুবনতারিণী, তরলতরঙ্গযুক্তা, শঙ্কর-মৌলিনিবাসিনী,  
বিমলা, দেবী গঙ্গা, তোমার পাদপদ্মে আমার স্তমতি হউক ॥ ১ ॥

ভাগীরথি ! সুখ-দায়িনি ! মাত-

স্তব জল-মহিমা নিগমে-খ্যাতঃ ।

নাহং জানে তব মহিমানং

ত্ৰাহি কৃপাময়ি ! মামজ্ঞানম্ ॥ ২ ॥

ভাগীরথী সুখদায়িনী মা, তোমার জলের মহিমা নিগমে খ্যাত ; আমি তোমার মহিমা জানি না ; হে কৃপাময়ি, অস্ত্র আমাকে ত্রাণ কর ॥ ২ ॥

হরি-পাদপদ্ম-বিহারিণি ! গঙ্গে !

হিম-বিধু-মুক্তা-ধবল-তরঙ্গে ! ।

দূরীকুরু মম দুষ্কৃতি-ভারং

কুরু কৃপয়া ভব-সাগর-পারম্ ॥ ৩ ॥

হরির পাদপদ্ম হইতে তরঙ্গাকারে নির্গতা এবং হিমচন্দ্র ও মুক্তার তায় শুভ্র-তরঙ্গযুক্তা গঙ্গে, আমার দুষ্কর্মের ভার দূর কর এবং কৃপাপূর্বক আমায় ভবসাগর হইতে উদ্ধার কর ॥ ৩ ॥

তব জলমমলং যেন নিপীতং

পরম-পদং খলু তেন গৃহীতম্ ।

মাতর্গঙ্গে ! স্বয়ি যো ভক্তঃ

কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥ ৪ ॥

তোমার অমল জল যে পান করিয়াছে, সে সর্বশ্রেষ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হইয়াছে । মা গঙ্গে, যে তোমার ভক্ত তাহাকে যম নিশ্চয়ই দেখিতে অসমর্থ ( অর্থাৎ সে অমর ) ॥ ৪ ॥

পতিতৌদ্ধারিণি ! জাহ্নবি ! গঙ্গে !

খণ্ডিত-গিরিবর-মণ্ডিত-ভঙ্গে ! ।

ভীষ্ম-জননি ! খলু মুনিবর-কণ্ঠে !

পতিতৌদ্ধারিণি ! ত্রিভুবন-ধন্থে ! ॥ ৫ ॥

হে পতিত-উদ্ধারিণী, জাহ্নবী, খণ্ডিত গিরিবরের দ্বারা মণ্ডিত-তরঙ্গশালিনী, ভীষ্মজননী, জহ্নুকণ্ঠা, পতিত-নিবারিণী গঙ্গা, তুমি ত্রিভুবনে ধন্থা ॥ ৫ ॥

কল্পতামিব ফলদাং লোকে ।

শ্রণমতি যন্তাং ন পততি শোকে ।

পারাবার-বিহারিণি ! মাতর্গঙ্গে !

বিমুখ-বনিতাকৃত-তরলাপাঙ্গে ॥ ৬ ॥

পারাবারবিহারিণী, দেববধুগণকর্তৃক চঞ্চল কটাক্ষে অবলোকিতা গঙ্গা,

পৃথিবীতে কল্পলতার ন্যায় ফলদা তোমাকে যে প্রণাম করে সে ইহলোকে পতিত হয় না ॥ ৬ ॥

তব কৃপয়া চেৎ শ্রোতঃস্নাতঃ

পুনরপি জঠরে সোহপি না জাতঃ ।

নরক-নিবারিণি ! জাহ্নবি ! গঙ্গে !

কলুষ-বিনাশিনি ! মহিমোত্তুঙ্গে ! ॥ ৭ ॥

নরকনিবারিণী, কলুষবিনাশিনী, স্বমহিমায় অতি যশস্বিনী জাহ্নবী গঙ্গা, তোমার কৃপাবশতঃ কেহ যদি তোমার শ্রোতে স্নান করে তবে সে পুনর্বীর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে না ॥ ৭ ॥

পরিসরদঙ্গে ! পুণ্য-তরঙ্গে !

জয় জয় জাহ্নবি ! করুণাপাঙ্গে ! ।

ইন্দ্র-মুকুটমণি-রাজিত-চরণে !

সুখদে ! শুভদে ! সেবক-শরণে ॥ ৮ ॥

উজ্জ্বল অঙ্গবিশিষ্টা, পবিত্রতরঙ্গা, রূপাকটাক্ষময়ী, ইন্দ্রের মুকুটমণির দ্বারা রাজিতচরণা, সুখদা, শুভদা, সেবকের আশ্রয়স্বরূপা, জাহ্নবী, তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও ॥ ৮ ॥

রোগং শোকং তাপং পাপং

হর মে ভগবতি ! কুমতি-কলাপম্ ।

ত্রিভুবন-সারে ! বস্তুধা-হারে !

ভ্রমসি গতির্মম খলু সংসারে ॥ ৯ ॥

ভগবতি, তুমি আমার রোগ, শোক, পাপ, তাপ ও কুমতিকলাপ দূর কর । ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠা, বস্তুধার হারস্বরূপা তুমি নিশ্চয়ই সংসারে আমার একমাত্র গতি ॥ ৯ ॥

অলকানন্দে ! পরমানন্দে !

কুরু ময়ি করুণাং কাতর-বন্দ্যে ।

তব তট-নিকটে যস্য নিবাসঃ

খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥ ১০ ॥

স্বর্গের আনন্দবিধায়িণী, পরমানন্দরূপিণী, কাতরজনের বন্দিতা তুমি আমার প্রাপ্তি করুণা কর । তোমার তটসমীপে যাহার বাস, তাহার বৈকুণ্ঠেই নিবাস বলিতে হইবে ॥ ১০ ॥

বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ

কিন্মা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ ।

অথবা গব্যুতি-স্বপচো দীন-

স্তব ন হি দূরে নৃপতিঃ কুলীনঃ ॥ ১১ ॥

এই জল বরং কচ্ছপ বা মৎস্য, কিংবা এই তীরে ক্ষুদ্র টিকটিকি অথবা দুই-কোশ মধ্যে দীন কুকুরভোজী হইয়াও থাকা ভাল, তথাপি তোমা হইতে দূরে নৃপতিশ্রেষ্ঠ হওয়াও ভাল নহে ॥ ১১ ॥

ভো ভুবনেশ্বরি ! পুণ্যো ! ধন্যে !

দেবি ! দ্রবময়ি ! মুনিবর-কন্তো ! !

গঙ্গা-স্তবমিমমমলং নিত্যং

পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥ ১২ ॥

হে ভুবনেশ্বরি, পুণ্যময়ি, ধন্যে, দ্রবময়ি, মুনিবরকন্তা দেবি, যে মন্ত্ৰস্ত এই অমল গঙ্গাস্তব নিত্য পাঠ করে সে অবশ্যই জয়যুক্ত হয় ॥ ১২ ॥

যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি-

স্তেবাং ভবতি সদা সুখ-মুক্তিঃ ।

মধুর-মনোহর-পঙ্কটিকাভিঃ

পরমানন্দ-কলিত-ললিতাভিঃ ॥ ১৩ ॥

গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং

বাঞ্ছিত-ফলদং বিগলিত-ভারম্ ।

শঙ্করসেবক-শঙ্কর-রচিতং

পঠতি চ বিষয়ীদমিতি সমাপ্তম্ ॥ ১৪ ॥

যাহাদের হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি আছে তাহারা সর্বদা অনায়াসে মুক্ত হয় । সংসারের সারস্বরূপ, বাঞ্ছিত ফলপ্রদ, বিখ্যাত এবং উদার এই গঙ্গাস্তোত্রটি পরমানন্দে নিবদ্ধ, সুন্দর, মধুর ও মনোমুগ্ধকর পঙ্কটিকাছন্দে মহাদেবের সেবক শঙ্করের দ্বারা রচিত হইয়াছে ; এবং যে ব্যক্তি বিষয়ভোগে নিমগ্ন, সে ইহা পাঠ করুক ॥ ১৩-১৪ ॥

# প্রশ্নোত্তর

## নামাভাস ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। নামাভাসের দ্বারা কি শুভোদয় হয় ?

“নামাভাসের দ্বারা সর্ব পাপ ক্ষয় হয়। সর্ব পাপ ও অনর্থ দূর হইলে শুদ্ধ নাম ভক্তের জিহ্বায় নৃত্য করেন ; তখন শুদ্ধ নাম তাহাকে কৃষ্ণপ্রেম দান করেন।”

—নামগ্রহণ-বিচার, হং চি:

২। মায়াবাদীর মুখোচ্চারিত কৃষ্ণনামাক্ষর কি কৃষ্ণনাম নহে ?

“মায়াবাদীর মুখ হইতে যে কৃষ্ণনাম নিঃসৃত হয়, তাহা কৃষ্ণনাম নয়। তাহা কেবল কৃষ্ণনামের প্রতিবিম্ব আভাস মাত্র। অতএব তাহা উচ্চারণ করিয়াও মায়াবাদী নামাপরাধ-দোষে পতিত।” —মায়াবাদী কাহাকে বলে ? স: তো: ৫।১২

৩। প্রতিবিম্ব ও ছায়া-নামাভাসের ভেদ কি ?

“শাস্ত্রে অনেক স্থানে এইরূপ শব্দসকল পাওয়া যায়—নামাভাস, বৈষ্ণবাভাস, শ্রদ্ধাভাস, ভাবাভাস, রত্যাভাস প্রেমাভাস, মুক্ত্যাভাস ইত্যাদি। সর্বত্র ‘আভাস’ শব্দের একটি সুন্দর অর্থ আছে, তাহাই এই প্রকরণে বিচারিত হইয়াছে। প্রকৃত-প্রস্তাবে ‘আভাস’ দুই প্রকার—অর্থাৎ স্বরূপ-আভাস ও প্রতিবিম্বাভাস। স্বরূপাভাসে বস্তুর পূর্ণকান্তি সঙ্কুচিতভাবে প্রকাশিত হয়; যথা—মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের স্বল্লকান্তিদ্বারা স্বল্ল আলোক। প্রতিবিম্বাভাস—স্বরূপের বিকৃত মাত্র অন্মাকারে উদ্ভিত হয়; যথা—‘আভাসস্ত মুখা-বুদ্ধিরবিভা কার্যমুচ্যতে।’ জল হইতে প্রতিবিম্বিত আলোক উচ্ছলিত হইয়া যেমন প্রকাশিত হয়, তদ্বৎ। নাম-সূর্য্য জীবের অজ্ঞান ও অনর্থরূপ কুজ্বাটিকা ও মেঘকর্ডুক যতক্ষণ আচ্ছাদিত, ততক্ষণ সেই সূর্য্যের সঙ্কুচিত অতি ক্ষুদ্র আলোক পরিদৃশ্য হয়। এই অবস্থায় জগতে নামাভাস অনেক শুভ ফল প্রদান করেন। সেই নাম জ্যোতিঃ মায়াবাদ-ব্রহ্ম হইতে প্রতিবিম্বিত হইলে প্রতিবিম্ব-নামাভাস হয়। তাহাতে শাযুজ্যাদি ফল হইলেও নামের চরম ফলরূপ প্রেম উৎপন্ন হয় না। এ নামাভাসটী একটি প্রধান নামাপরাধ, এই জন্য ইহাকে নামাভাস বলা যায় না। কেবল ছায়া-নামাভাসকেই নামাভাস বলিয়া চারি প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। হেয় প্রতিবিম্ব নামাভাসকে দূর করিয়া নামাভাসেরও পূজা সর্বশাস্ত্রে দেখা যায়। অজ্ঞানজনিত অনর্থ হইতে ছায়া-নামাভাস, দুষ্ট-জ্ঞানজনিত অনর্থ হইতে প্রতিবিম্ব-নামাভাসরূপ ভক্তিবান্ধব অপরাধ বিচারিত হইয়াছে। বৈষ্ণবপ্রায় অর্থাৎ বৈষ্ণবাভাস ব্যক্তিকে বৈষ্ণব না বলিলেও তাহার মায়াবাদ অপরাধ না থাকা প্রযুক্ত তাহাকে কনিষ্ঠ বা

প্রাকৃতভক্ত বলিয়া সম্মান করা যায়। কেন না, সংসঙ্গে তাহার শীঘ্রই মঙ্গল হইতে পারে। সুতরাং শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাকে মিত্রবর্গগত বালিশ বলিয়া কুপা করিবেন। বিদেবী মায়াবাদীর গ্রায তাঁহাকে উপেক্ষা করিবেন না। তাঁহার লৌকিকী শ্রদ্ধায় অর্চা-মাত্র পূজা-প্রবৃত্তিকে সম্বন্ধিত করিয়া ভগবৎ ভাগবত-সেবোপযোগী সম্বন্ধজ্ঞান-সম্বলিত ভক্তি দান করিবেন। তবে যদি তাঁহার অচ্ছেদ্য মায়াবাদ-বিশ্বাস দেখা যায়, তবে তাঁহাকে অবশ্য উপেক্ষা করিবেন।”

—নামাভাস-বিচার, হঃ চি:

৪। অনর্থ থাকিতে কি শুদ্ধনাম হয় ?

“অসতৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্বল্য, অপরাধ।

অনর্থ—এ সব মেঘরূপে করে বাধ ॥

নাম-সূর্য—রশ্মি ঢাকে, নামাভাস হয়।

স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণনামে সদা আচ্ছাদয় ॥”

—হঃ চি: ৩য় প:

৫। সর্বশুভকর্মাপেক্ষা নামাভাস প্রশস্ততর কেন ?

“নামাভাস জীবের প্রধান স্মৃতির মধ্যে গণ্য হয়। ধর্ম, ব্রত, যোগ, হতাদি সর্বপ্রকার শুভকর্ম অপেক্ষা নামাভাস শ্রেষ্ঠফল-প্রদ।”

—নামাভাস-বিচার, হঃ চি:

৬। নামাভাসের ফল কি ?

“বৈকুণ্ঠাদি লোকপ্রাপ্তি নামাভাসে হয়।

বিশেষত: কলিযুগে সর্বশাস্ত্র কয় ॥ —নামাভাস-বিচার, হঃ চি:

৭। নামাভাস কয় প্রকার ও তাহাদের তারতম্য কি ?

“সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ ও হেলা—এই চারি প্রকার কার্যের সহিত নাম উচ্চারিত হইলে নামাভাস হয়। অতএব সেই সেই কার্য-সহযোগে নামাভাস চারি প্রকার। হেলা অপেক্ষা স্তোভ, স্তোভ অপেক্ষা পরিহাস এবং পরিহাস অপেক্ষা সঙ্কেত অল্প-দোষাবহ।”

—নামাভাস-বিচার, হঃ চি:

৮। নামাভাসের নিবৃত্তিকাল কখন ?

“সম্বন্ধতত্ত্বের জ্ঞান যাবৎ না হয়।

তাৎবং সে নামাভাস জীবের আশ্রয় ॥”

—হঃ চি: ৩য় প:

৯। আভাস কত প্রকার ?

“নামরূপ স্বর্ষের দুই প্রকার আভাস অর্থাৎ নাম-ছায়া ও নাম-প্রতিবিম্ব। বিজ্ঞগণ ‘ভক্ত্যাভাস’, ‘তাবাভাস’, ‘নামাভাস’, ‘বৈষ্ণবাভাস’—এইসকল অমূল্য ব্যবহার করেন। সর্বপ্রকার আভাসই ‘প্রতিবিম্ব’ ও ‘ছায়া’-ভেদে দুই প্রকার।”

—জৈ: ধ: ২৪শ অ:

১০। 'বৈষ্ণবপ্রায়' কাহাকে বলে ?

“বৈষ্ণবপ্রায়” শব্দের অর্থ এই যে, প্রাকৃত বৈষ্ণবের গায় মালা-মুদ্রাদি ধারণ-পূর্বক ‘নামাভাস’ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত বা ‘শুদ্ধ বৈষ্ণব’ নন।”

—জৈ: ধ: ২৫শ অ:

১১। নামাভাস কোন্ অবস্থায় নামাপরাধ বলিয়া গণ্য হয় ? উহার ফল কি ?

“শুদ্ধনাম না হইলেই ‘নামাভাস’ হইল। এই নামাভাস কোন অবস্থায় ‘নামাভাস’ বলিয়া উক্ত হয়, কোন অবস্থায় ‘নামাপরাধ’ বলিয়া উক্ত হয়। যে-স্থলে অজ্ঞতাবশত: অর্থাৎ ভ্রম-প্রমাদবশত: নামের অন্তর্ক লক্ষণ হয়, সে-স্থলে কেবল ‘নামাভাস’; যে-স্থলে মায়াবাদাদিজনিত ধূর্ততা, মুমুক্ষা ও ভোগবাঞ্ছা হইতে অন্তর্ক নামের উদয়, সে-স্থলে নামাপরাধ হয়। যে দশটি নামাপরাধ তোমাদিগকে বলিয়াছি, তাহা যদি সরলতা, অজ্ঞতা হইতে হইয়া থাকে, তবে সে-সমস্তই ‘নামাভাস’ মাত্র। জ্ঞাতব্য এই যে, নামাভাস যতদিন অপরাধ-লক্ষণ না পায়, ততদিন নামাভাস বিদূরিত হইয়া শুদ্ধ-নামোদয়ের আশা থাকে, অপরাধ-লক্ষণ হইলে আর সহজে নামোদয় হয় না, নামাপরাধ ক্ষয়ের যে পদ্ধতি বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আর অগ্নি উপায়ে মঙ্গল উদিত হয় না।”

—জৈ: ধ: ২৫শ অ:

১২। সাক্ষ্যে-নামাভাসের উদাহরণ-স্থল কি ?

“অজামিল মরণ সময়ে স্বীয় পুত্রকে ‘নারায়ণ’ নামে আহ্বান করিয়াছিল—কৃষ্ণের নাম নারায়ণ বলিয়া অজামিলের সাক্ষ্যে-নাম-গ্রহণের ফল লাভ হইয়াছিল।”

—জৈ: ধ: ২৫শ অ:

১৩। স্তোত্র-নামাভাসের উদাহরণ কি ?

“একজন হুঁবৈষ্ণব হরিনাম উচ্চারণ করিতেছেন, তখন একজন পাষণ্ড আসিয়া কদর্য্য-মুখ-ভাঙ্গ করত বলিল—‘হৌ তোর হরিকেষ্ট সকলই করিবে।’ ইহাই স্তোত্রের উদাহরণ; তাহাতেও সেই পাষণ্ডের মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে—নামাক্ষয়ের এরূপ স্বাভাবিক বল।”

—জৈ: ধ: ২৫শ অ:

১৪। কিরূপ ‘হেলনে’ নামাভাস হয় ?

“ধূর্ততার সহিত হেলন হইলে ‘অপরাধ’, আর অজ্ঞতার সহিত হেলন হইলে ‘নামাভাস’।”

—জৈ: ধ: ২৫শ অ:

১৫। নামাভাসে কি কি লাভ হইতে পারে ?

“ভুক্তি, মুক্তি, অষ্টাদশ সিদ্ধির অন্তর্গত সকল ফলই নামাভাস হইতে লাভ হয়, কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম-পুরুষার্থ নামাভাস হইতে লাভ হয় না।” —জৈ: ধ: ২৫শ অ:

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর



## শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথায়ত

যিনি হরিসেবা করেন, তিনি নিজেকে সর্বোপেক্ষা হীন-জ্ঞান করেন। হীন-অভিমান হইলেই সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হইতে পারা যায়—সর্বশ্রেষ্ঠ হরি<sup>১</sup> নর কথা বলা যায়। সর্বোত্তম হইলেও নিজের অযোগ্যতা পরীক্ষা করা প্রকার। নিজের পরীক্ষা হইতেছে না অথচ পরছিদ্রানুসন্ধানে এত প্রবৃত্তি কেন? এই কি বৈষ্ণবের স্বভাব? বৈষ্ণবের পাদপদ্মের আদর্শে অন্তর্নতও উন্নত হয়।

নিজের শ্রেষ্ঠতালভের জন্ত যদি ভগবন্তকে অসম্মান করি, অবজ্ঞা করি, তাহা হইলে অপরাধ হইবে। আমি ভাল হইব, আমার মঙ্গল হউক—এই বিচারই ভাল। নিজের শ্রেষ্ঠতা লইয়া ভক্তের পূজ্যতাকে বাধা দেওয়া উচিত নহে।

ভগবন্তু কাহাকেও দুর্বীক্য বলেন না। ভগবন্তুকের বাক্যকে যাহারা দুর্বীক্য বলিয়া শ্রবণ করে, তাহাদেরই শ্রবণ-ভ্রান্তি ও দুর্ভাগ্য। ভগবন্তু কখনও ভূতোদ্বিগ্ন প্রদান করেন না। তাঁহারা ভূতমঙ্গলের জন্ত যে ভূতোদ্বিগ্নের আচরণ দেখান, তাহা অনন্ত মঙ্গলের জনক। ভগবন্তুকের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি আমাদের অনুসরণীয়, অনুকরণীয় নহে।

হরিকথা কীর্তনই বিশ্রাম, তাহাতেই যাবতীয় ক্লেশ বা শ্রম বিনষ্ট হয়। কীর্তন ছাড়িয়া মুহূর্তের জন্ত অপর চেষ্টা ভগবদ্ভিমুখতা। মহাভাগবতগণ ও তদনুগণ সকলেই সর্বক্ষণ সর্বতোভাবে হরিকথা কীর্তন করেন। তাঁহাদের অন্ত কোন কৃত্য নাই। শ্রীচৈতন্যদেব আদেশ করিয়াছেন,—“কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ”। কায়মনোবাক্যদ্বারা নিখিল অবস্থায় হরিকীর্তন না করাই জীবিত অবস্থায় মৃতের লক্ষণ।

রাস্তাঘাটে বৈষ্ণব পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব অত মৌজা নয়। পৃথিবী উজাড় হ'য়ে যা'বে, বৈষ্ণব পাওয়া যা'বে না।

ভগবৎসেবা ব্যতীত অত্যান্ত যাবতীয় পথ কালক্ষেপণ এবং জন্মজন্মান্তর ক্লেশ-রাজ্যে পরিভ্রমণের হেতু। অতএব আমরা আমাদের শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত মানব-জীবনের সর্বোত্তম বা একমাত্র স্বার্থের—ভগবৎসেবার অনুসন্ধান কর'ব। প্রত্যেক জন্মে আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অবকাশ হ'বে, কিন্তু অল্প জন্মে ভগবৎসেবার একরূপ স্নযোগ হ'বে না। আমরা হরিসেবা ব্যতীত অল্প কোন কার্যে এক মুহূর্তও নষ্ট কর'ব না। যেখানে স্বরাট পুরুষোত্তমের পূর্ণ ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা, সেইখানে আমরা আত্মবিক্রয় কর'ব।

বৈকুণ্ঠ শব্দই পরমেশ্বর। বৈকুণ্ঠ-শব্দে নিয়ামকত্বশক্তি অনুসৃত। বৈকুণ্ঠশক্তি তাহার নিরঙ্কুশ বৃত্তি প্রকাশ করিয়া জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয় নিয়মিত করিয়া থাকেন। অতএব তর্কপন্থার পরিবর্তে শ্রৌতপন্থা আমাদের গ্রহণীয়। তর্কপন্থায় কেবল সময় নষ্ট হয়।

নামগ্রহণ ক'রতে ক'রতে অনর্থ অপদারিত হইলে শ্রীনামের রূপ-গুণ ও লীলা আপনা হইতেই স্ফুর্তি হ'বে। নাম ও নামী অভিন্ন বস্তু। আমাদের অনর্থ ঘুচিয়া গেলে উহা বিশেষ উপলব্ধি হ'বে। শ্রীনামই জীবের স্বরূপ উদয় ক'রে কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করান।

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পাদপদ্মই আমাদের একমাত্র ভরসা। স্বয়ং প্রকাশবস্তু কৃষ্ণের প্রেষ্ঠবস্তু শ্রীনিত্যানন্দের আকর্ষণে এই ঘোর সংসার হ'তে মুক্তি পাব। যে-কাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণসেবা বিস্মৃত হ'য়ে থাকি, সেইকাল পর্য্যন্তই সংসার। শ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্ম আশ্রয় না ক'রলে হরিভজ্ঞন হয় না। হরিভজ্ঞন না হ'লে মৃত্যুর পর যমালয়ে যেতেই হ'বে। হরিবিমুখ ব্যক্তি পুণ্যফলে স্বর্গে এবং পাপফলে নরকাদি যন্ত্রণা লাভ করে। ত্রিতাপে তাপিত হ'য়েও যদি আমাদের বুদ্ধির উদয় না হয়, তা' হ'লে কি-প্রকারে আমাদের সদগতি হ'বে?

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কথা এজন্মেই আলোচিত হওয়া উচিত। আমরা জগতে ছোট-বড় সর্বপ্রকার অভিমান ভুলে যেন শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর পাদপদ্মে নিত্যরেণুরূপে নিত্য অবস্থান ক'রতে পারি, ইহাই প্রার্থনা। আমাদের শ্রীকৃপাভাগ হওয়াই একমাত্র কাম্য হউক। শ্রীল-রূপ-রঘুনাথভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের রূপা ব্যতীত কখনও যুগলভজনের সন্ধান পাওয়া যায় না।

আমরা দুর্বল—সামান্য শক্তিতাবের জন্য আমরা কত যত্ন করি। কিন্তু শ্রীগৌরহৃদয় ব'লেছেন,—তুণ্যদপি স্থনীচ হও, বৃক্ষের ত্রায় সহগুণসম্পন্ন হও, নিজের চেষ্টায় বলবান হ'বার দুর্বুদ্ধি না ক'রে যিনি বলপ্রদাতা, সেই বলদেব প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ কর। যা'র বল, তিনি বলদেব প্রভু। কৃষ্ণচন্দ্র বলদেবের অহুগত জনকর্তৃক সেবিত হ'তে ইচ্ছা করেন। বলদেবপ্রভুর অহুগ্রহ ব্যতীত কৃষ্ণসেবা পা'বার উপায় নাই। যা'রা বলদেব প্রভুর সেবক হ'তে পারেন, তাঁ'রাই প্রকৃতপক্ষে বলবান। আমরা যদি অগ্র কাধ্যে নিযুক্ত হ'য়ে যাই, তা' হ'লে বলদেব প্রভুর সেবা ক'রবার পরিবর্তে আমরা নিজেদের সেবাপ্রার্থী হ'য়ে যা'ব।

আমি দরিদ্র, আমি ধনী ইত্যাদি জ্ঞানই অনর্থ বা স্বরূপবিস্মৃতি। কেবল ভক্তি বা সেবাশ্রুতি নিয়ে, *Approaching tendency* নিয়ে কাণ দুটোকে সর্বদা সাধুর কাছে খাড়া করে রা'খলে সে জগতের বস্তুর খবর পাওয়া যায়।

## প্রকৃত পাণ্ডিত্য

বেশ কিছু সংস্কৃত শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়া তাহা লোকের নিকট আওড়াইতে পারিলেই ইহজগতে ‘পণ্ডিত’ বলিয়া সহজেই স্থখ্যাতি অর্জন করা যায়। প্রায়শঃ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অথবা পঞ্জিকার মধ্যে পণ্ডিতগণের বিরাট তালিকা পরিদৃষ্ট হয়। ‘ক-অক্ষর গো-মাংসদের’ নিকট শব্দের শেষে অনুস্বার বিসর্গ যোগ করিয়া সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করিতে সক্ষম হইলেই নিজকে পণ্ডিত বলিয়া জাহির করা যায় সত্য, কিন্তু প্রকৃত বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট সমস্ত চাতুরীই ধরা পড়িয়া যায়। ‘অসারের তর্জন গর্জনই সার।’ *Empty vessels sound much.* সামান্য বিদ্যা অতীব ভয়ানক, তাহাতে লোকের মনে অহঙ্কারাদি প্রবৃত্তিসকল আনিয়া উপস্থিত হয়। সকল বিষয়ের মধ্যে যেরূপ মূল্য হয় না, তদ্রূপ সকলপ্রকার পণ্ডিতকেও প্রকৃত পণ্ডিতের আখ্যা দেওয়া যায় না। *“All is not gold that glitters.”* নিজের গুণন না বুঝিয়া মূর্থলোকও অপরকে উপদেশ দেওয়ার সময়ে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে চাহে।

‘পণ্ডিত’-শব্দে সাধারণতঃ শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানী, বিদ্বান্ প্রভৃতিকে বুঝায়। এই হিসাবে জড় সাহিত্যিক, কবি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রভৃতিকে জগতের লোক পণ্ডিত বলিয়া জানে। বুদ্ধজীব নিজকে যতই সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করুক বা জগতের লোক তাহাকে যতই দ্বিগিজয়ী পণ্ডিত বলিয়া জাহ্নুক, হরিসেবাবিমুখ হইবার ফলে সে কখনও মৃত্যুকে জয় করিতে পারে না। জড় পাণ্ডিত্যের দ্বারা শাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার স্পর্শ প্রকাশ করিতে গেলে জীবনের শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়া থাকে। জড় পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াও কার্যকালে মায়ার জেলখানায় কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হয়। ‘আমি বিখ্যাত পণ্ডিত’—এইরূপ অহঙ্কার জীবের পতনের মূল।

### জড় পাণ্ডিত্য—অজ্ঞানতা বুদ্ধিকারক ও ভীতিপূর্ণ

ভোগজনিত জাগতিক পাণ্ডিত্য, নশ্বর ধনসমূহ প্রভৃতি বিবিধ বন্ধনের কারণ। উহাতে মানবগণ আবদ্ধ থাকে এবং নিত্যসত্যের উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না। ‘সুকরী ফবুফরায়তে’র গায় কৃষ্ণবিমুখ পণ্ডিতগণ ভোগজনিত স্বল্প-প্রাপ্তিকেই বহুমান করিয়া অপরের নিকট বিনয় প্রদর্শন করিতে পরাভূত হন। প্রাপঞ্চিক উন্নতিকামী যশ, কুল, রূপ, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি বুদ্ধি হউক—এইরূপ বাসনা করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণে মত্ততাবশতঃ বৈষ্ণবের জাগতিক পাণ্ডিত্যের ও জাগতিক ঐশ্বর্যের

অভাব দর্শন করেন এবং তাদৃশ অভাবদর্শনে উপহাস করেন। মতিভ্রষ্ট হইলেই জীব বৈষ্ণবকে কৰ্ম্মকলভোগবাদীর স্থায় নানাবিধ অভাবপীড়িত জ্ঞান করেন।

আরোহবাদীর বিচালাভ—মৃত্যুকালের পূর্ব পর্য্যন্ত। জীবদশার অধিকৃত বিজ্ঞা জীবিতোত্তর-কালে ফলপ্রদ হয় না। অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও অসামান্য পাণ্ডিত্য—জীবদশা পর্য্যন্তই স্থায়ী অর্থাৎ অনিত্য। পাণ্ডিত্য, মোন, ব্রতাদি দশটি অপবর্গের হেতু বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু ইহারা প্রায় অজ্ঞিতেন্দ্রিয় গো-দাসগণের ইন্দ্রিয় ভোগার্থ জীবনোপায় হইয়া থাকে—ইহা ( ভা: ৭।২।৪৬ ) “মোন-ব্রত-শ্রুত” শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ভাগবত ৭ম স্কন্ধে ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজ দানবগণকে “বিতানপীথং দম্বজা: কুটুম্বম্” শ্লোকে বলিয়াছেন,—“হে দানবগণ, ইহা আমার, আর ইহা অণ্ডের—এইরূপ ভিন্নতাব পোষণ করিয়া পণ্ডিতব্যক্তিও অত্যাশক্তিনিবন্ধন কুটুম্ব পালন করিতে করিতে আত্ম-বিষয়ের পরামর্শ লইতে সমর্থ হন না, কিন্তু বিমূঢ় হইয়া অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হন।”

জাগতিক পণ্ডিতেরা কাল্পনিক প্রদেশে লক্ষ্যপ্রদান করিতে গিয়া কোন জায়গায় যে পতিত হইবে, তাহার কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা নাই। “লাগে তাক্ না লাগে তুক্” তাহারা এই বিচার করিয়া অন্ধকারে হাতড়াইতে থাকে। যাহারা জাগতিক পাণ্ডিত্য বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেন, তাহাদের ধারণাও অসম্পূর্ণ ও বিকৃত। প্রত্যক্ষ ও অনুমানজ্ঞানের দ্বারা ভগবানের পরিপূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে। ভগবানকে দর্শন না করিয়াই পণ্ডিতাভিমান-গণ ভগবানকে নিরাকার ও জড়সাকার প্রভৃতি যাহা কিছু বলেন, তাহা সমস্তই ভ্রান্ত। জড় পাণ্ডিত্য তর্কপন্থার উপর নির্ভরশীল। তর্কপন্থারী মনোদর্শনজীবী, তাই তাহারা সংশয়াত্মা। তাহাদের নশ্বরতা অবশ্যস্বত্বা। মনোদর্শনজীবী—ভোগী বা নির্বিশেষবাদী ভোগী। ‘বুভুক্ষু’ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত পণ্ডিতগণের লক্ষ্য ঐহিক এবং পারাত্রিক সুখ। ঐহিক ও পারাত্রিক ভোগত্যাগই ‘মুমুক্ষু’ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত পণ্ডিতগণের লক্ষ্য। ‘বুভুক্ষু’ ও ‘মুমুক্ষু’ উভয় শ্রেণীর পণ্ডিতগণের বিচারকে চরম বলিয়া কখনও ধরা যাইবে না। এই প্রসঙ্গে জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ভা: ১।১২।৮।৩৭ বিবৃতিতে লিখিয়াছেন,—“জড়জগতে নাম, রূপ, আকার প্রভৃতি ও তাহার বিরুদ্ধ বিচার উভয়ই পাণ্ডিত্যভিমানিগণের আলোচ্য হয়। কিন্তু প্রকৃত পণ্ডিতের দ্বারা উহা অনুমোদিত নহে। \* \* \* \* অচিন্মাত্রকে যাহারা প্রয়োজন বিচার করেন, অথবা চিহ্নিলাসহীন চিন্মাত্রকে যাহারা প্রয়োজন বিচার করেন—এই দ্বিবিধ পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি চিহ্নিলাসকে স্বীকার না করায় প্রকৃতপ্রস্তাবে ‘পণ্ডিত’-শব্দবাচ্য নহেন।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানগ্রাহ পদার্থই ভোগের উপযোগী, তদ্বিপরীত ত্যাগের কল্পনা। সুতরাং অধোক্ষজসেবা ব্যতীত আধ্যাত্মিকতা পণ্ডিতমহাগণেরই বৃত্তি মাত্র।”

কাঠনির্মিত গাভী যেরূপ ছদ্ম প্রদান করিতে পারে না, তদ্রূপ কেবলমাত্র জড় পাণ্ডিত্যের দ্বারা কাহারও মঙ্গললাভ হইতে পারে না। ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে কৰ্ম ব্যতীত কাহারও আত্মকল্যাণলাভের দ্বিতীয় কোন রাস্তা উন্মুক্ত নাই। অনেকশাস্ত্র অধ্যয়নের অভিনয়ের দ্বারা সংসাররূপ মৃত্যু জয় অসম্ভব। শ্রীচৈতন্যদেব ব্যাকরণের প্রত্যেক সূত্র, বৃত্তি ও টীকার তাৎপর্য যে একমাত্র হরিনামপর, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কৃষ্ণনাম স্বয়ং কৃষ্ণ, কৃষ্ণের সেবা করাতোই পাণ্ডিত্য, কৌলীজ্ঞ ও ঐশ্বর্যের সার্থকতা। যিনি মনে করেন যে, সংস্কৃত অক্ষর চিনিলেই বা পাণিনির সূত্র কণ্ঠস্থ থাকিলেই বা অমরকোষ মুখস্থ করিলেই বা সংস্কৃত কয়েকটা কথা কপচাইতে পারিলেই শাস্ত্রের মর্মার্থ বুঝিয়া লইতে পারিব, তিনি অত্যন্ত অপরাধী জীব। ভক্তি ব্যতীত জড়বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্যদ্বারা শাস্ত্রের মর্মার্থ জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব। “তত্য়া ভাগবতং গ্রাহং ন বুদ্ধা ন চ টীকয়া।” ভাগবত পাঠক দেবানন্দ পণ্ডিত পাণ্ডিত্যে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতের পাঠ শুনিয়া ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন,—

ভাগবতে মহা-অধ্যাপক লোকে বোষে।

মর্ম অর্থ না জানে ভক্তিহীন-দোষে ॥

এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার ?

গ্রন্থরূপ ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার ॥

ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বরবুদ্ধি যার।

সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ—ভক্তিনার ॥

( চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১৯, ১৪, ২৫ )

সংস্কৃত ‘পণ্ডা’-শব্দের উত্তর জাতার্থে ‘ইতচ্’ প্রত্যয় করিয়া ‘পণ্ডিত’-শব্দ নিস্পন্ন হইয়াছে। ‘পণ্ডা’ শব্দের অর্থ—বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। যাহার বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তিনিই পণ্ডিত। যিনি জড়ে অভিনিবিষ্ট, তাহাকে ‘পণ্ডিত’-পদবাচ্য বলা যাইতেপারে না। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু পণ্ডিতভানিগণের স্থান সকলের নিম্নে দিয়াছেন। জড় পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে যিনি মত্ত, তিনি ভারবাহী গর্দভ ও যমপাশে আবদ্ধ।

পড়িয়া সকললোক গেল ছারেখারে।

কৃষ্ণমহামহোৎসব বঞ্চিল তাহারে ॥

শাস্ত্রের না জানে মর্ম, অধ্যাপনা করে।

গর্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি\* মরে ॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১১৫৮-১৫৯)

যে বা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্তী, মিশ্র সব ।  
 তারাও না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব ॥  
 শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কৰ্ম্ম করে ।  
 শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি' মরে ॥

( টী: ভা: আ: ২।৬৭-৬৮ )

কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি' যে আর বাথানে ।  
 বুথা জন্ম যায় তার অমত্য-বচনে ॥  
 আগম-বেদান্ত আদি যত দরশন ।  
 সৰ্ব্বশাস্ত্রে কহে 'কৃষ্ণপদে ভক্তিধন' ॥  
 মুক্ত সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায় ।  
 ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অগ্র পথে যায় ॥  
 করুণাসাগর কৃষ্ণ জগত-জীবন ।  
 সেবক-বৎসল নন্দগোপের নন্দন ॥  
 হেন কৃষ্ণনামে যার নাহি রতি-মতি ।  
 পড়িয়াও সৰ্ব্বশাস্ত্র, তাহার দুর্গতি ॥  
 দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম ।  
 সৰ্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম ॥  
 এইমত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায় ।  
 ইহাতে সন্দেহ যার সেই দুঃখ পায় ॥  
 কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি' যে শাস্ত্র বাথানে ।  
 সে অধম কভু শাস্ত্র-মৰ্ম্ম নাহি জানে ॥

( টী: ভা: ম: ১।১৪২-১৫৭ )

### কৃষ্ণভক্তিলভই পাণ্ডিত্যের চরম সীমা

জড়জগতে ঘেরুপ বিষের কিরায় জীবের মৃত্যু ঘটে, আবার অমৃত-সেবনে জীবের নিত্যজীবনপ্রাপ্তি ঘটে ; তদ্রূপ কৃষ্ণভক্তি উদয়হীন জড় পাণ্ডিত্যের-দ্বারা জড়মোহই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কৃষ্ণভক্তিবৃত্ত পাণ্ডিত্যের দ্বারা কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করা যায় । ভগবন্তভিহীন মূৰ্খতা ও পাণ্ডিত্য উভয়েই পরিত্যাজ্য ভক্তিবৃত্ত ব্যক্তিই পণ্ডিত । এই প্রসঙ্গে মহাভারতে পাওয়া যায়,—

পাঠকাপাঠকশ্চৈব যে চাত্তো শাস্ত্র-চিন্তকা:

সৰ্ব্বৈ ব্যাসনিনো মূৰ্খা: য: ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিত: ॥

“যে-সকল অধ্যাপক কলিপঞ্চকের সেবনকারী, তাহারা মূর্থ, কিন্তু যাহারা শাস্ত্রের নির্দেশানুযায়ী আচরণ করেন, জড়ীয় পাণ্ডিত্য না থাকিলেও তাহারা পণ্ডিত।” “পণ্ডিতো বদ্ধমোক্ষবিৎ” অর্থাৎ বন্ধন ও মোক্ষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই পণ্ডিত ও সমদর্শী। কৃষ্ণভক্তই একমাত্র অপ্ৰাকৃত পাণ্ডিত্যে ভূষিত, অন্য কাহাকেও পণ্ডিত আখ্যায় আখ্যায়িত করা যায় না। ছান্দোগ্য উপনিষদে পাওয়া যায়,—“পদ্মপত্র যেরূপ জলে নিলিপ্ত থাকে, পণ্ডিত তথা বৈষ্ণব সেইরূপ পাপে নিলিপ্ত থাকেন।” যে ব্যক্তি মাংসদ্ব্য ও ঈর্ষার বশবর্তী হইয়া বৈষ্ণবকে পরাজিত করিবার তুরভিসন্ধি হৃদয়ে পোষণপূর্বক পাণ্ডিত্য জাহির করিবার প্রয়াস করেন, তাহাকে বৈষ্ণব তথা পণ্ডিত বলা যাইবে না। বৈষ্ণবের কোন মৎসরতা দোষ নাই। পণ্ডিতাভিমানী নাস্তিক সমাজ বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

বিষয় মদাঙ্ক সব কিছুই না জানে।

জাতি-বিতা-ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে।

ধন নহে, জন নহে, না চাহে পাণ্ডিত্য।

কে চিনিবে এ সকল চৈতন্তের ভূত্যা।

বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শক্তি ?

আছয়ে সকল সিদ্ধি দেখয়ে দুর্গতি ॥ ( চৈ: ভা: )

পাণ্ডিত্য বড়ই শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু পাণ্ডিত্যের দ্বারা যদি কৃষ্ণভক্তি-লাভ নাই হয়, তবে পাণ্ডিত্য অর্জনের চেষ্টায় বৃথা কাংশ্বেপ করিয়া লাভ কি ? পণ্ডিতগণ যদি কৃষ্ণভজন না করেন, তাহা হইলে পাণ্ডিত্যদ্বারা ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের বা জগতের কাহারও যথার্থভাবে মঙ্গল সাধিত হয় না। প্রকৃত পণ্ডিতগণ একমাত্র কৃষ্ণের ভজনই করিয়া থাকেন।

ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্ত।

হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অগ্নি ॥

( চৈ: চ: ম: ২২।৩৫ )

শ্রীভাগবতে ( ভা: ১০।৪৮।২৬ ) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদ্ধবের স্তবে পাওয়া যায়,—  
“ক: পণ্ডিতশূদ্রপং শরণং সমীয়াত্তত্ত্বপ্রিয়াদৃতগির: স্বহৃদ: কৃতজ্ঞাৎ” অর্থাৎ  
“প্রিয়, সত্যবাক, স্বহৃৎ, কৃতজ্ঞস্বরূপ আপনাকে ছাড়িয়া কোন পণ্ডিত অপরের শরণাপন্ন হয় ?”

বৃথা পাণ্ডিত্য প্রতিভায় মত্ত না থাকিয়া হরিভজন করাই শ্রেয়:। শ্রীগৌর-সুন্দর বলিয়াছেন,—“যাবতীয় পাণ্ডিত্য, ধারণা ও সম্পদসমূহ হরিসেবায় নিযুক্ত

করিলেই জীবের পরমমঙ্গল লাভ হয়। এই মহোপদেশ প্রপঞ্চে নিত্যকাল শ্রীবিষ্ণুসেবার যথার্থ্য স্থাপন করিবে। জগতে সকল কথাই কালে কালে পরিবর্তিত ও বিনষ্ট হইবে, কিন্তু ভগবানের নিত্যদেবা-প্রবৃত্তি চিরকাল অচলা থাকিবে।” জগদগুরু শঙ্করাচার্য্য জড় পাণ্ডিত্যের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডিত্যগণকে কৃষ্ণভজন করিবার উপদেশ করিয়াছেন।—

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মৃচমতে।

প্রাপ্তে সন্নহিতে মরণে ন হি, ন হি রক্ষতি ডুক্করং ॥

—“হে মৃচমতে! তুমি গোবিন্দের ভজনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে ‘ডুক্করং’ ব্যাকরণের এই সূত্র অর্থাৎ পাণ্ডিত্য তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।”

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্তিবেন্দান্ত বোধায়ন মহারাজ

## কৃপা

আমরা সাধু, গুরু, ভগবানের নিকট কৃপা পাইবার আকাঙ্ক্ষায় যাই এবং বলি আমাদের কৃপা করুন। কিন্তু সত্য সত্যই কি আমরা কৃপালাভ করিবার জন্ত আগ্রহী হইয়াছি।

শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ বিবিক্তানন্দী, পরমহংস, কৃষ্ণে গাঢ় অনুরাগবিশিষ্ট ছিলেন। তিনি নৌকার ছই-এর নীচে থাকিয়া ভজন করিতেন। নবদ্বীপের ধর্মশালার মালিক গিরিজাবাবুর শ্রী বাবাজী মহারাজকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি বাবাজী মহারাজকে একটি কুটার নির্মাণ করিয়া দিতে চাহিলে বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—“ছই-এর নীচে থাকতে আমার কোন কষ্ট হয় না। কেবল আমার একটি কষ্ট। বহুলোক কপটতা করে আমার নিকট এসে সর্বদা কৃপা কর, কৃপা কর বলে আমাকে ভজন করতে দেয় না। তাহারা নিজের মঙ্গল চায় না...”। সূত্রময়্য আমরা সত্যি সত্যি কৃপা চাই না।

একসময় একজন ভক্ত শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজকে প্রশ্ন করিলেন,— “বাবা! কৃষ্ণের কৃপা, ভক্তের কৃপা বুঝ কি করে? শ্রীল বংশীদাস বাবাজী বলিলেন,—“যে করে তোমার আশ, তার কর সর্বনাশ। কাহাকেও টাকা দেয়, কাহারও টাকা নেয়। তোমাস্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান। ঠেকাবি কি করে?”



পরিজ্ঞাপন করবে কে ? কাকেই বা বলি, কেই বা শুনে, বৈষ্ণববতে লেশমাত্র রতি না হৈল ।”

ভক্ত বলিলেন,—“রূপা পাব কি করে ?”

বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—“কাঁদলে ত’ রূপা পাবে ! কাঁদে কই ? প্রেম কাঁদা কাঁদলে ত’ পাবে । মুখে বলি হরি, কাজে অগ্র করি । প্রেমবারি চোখে এল না ।” এই অল্প কথায় শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ রূপা পাইবার উপায় কেমন সুন্দর বলিলেন । সুতরাং আমরা যদি অভিমান পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কণ্ট-ভাবে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে প্রণম হই তবেই তাঁহার রূপা করিবেন ।

শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর আশ্চরিতে ইহা আমাদের কাছে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন । তিনি সম্ভ্রান্ত বংশে আবিভূত হইয়াছিলেন । তাঁহার আজ্ঞাভাষিত বাহু, মহাপুরুষোচিত অনিন্দ্য-সুন্দর শ্রীমূর্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল । তিনি সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন । কিন্তু এতাদৃশ গুণশালী হইয়াও তিনি বাহুবিচারে নিরক্ষর শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া গললগ্নী কৃতবাসে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা জানাইলেন,—“প্রভো ! আমার রূপা করুন । কিন্তু শ্রীল গৌরদাস কিশোরদাস বাবাজী মহারাজ তাঁহার কথায় কর্ণপাতই করিলেন না । এইভাবে দ্বাদশবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও শ্রীল প্রভুপাদ নিরস্ত হন নাই । তিনি মন্ত্রদীক্ষাদানে রূপা করিবার জন্ত বার বার আর্তি জানাইতে থাকিলে একদিন শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—“আমি মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করে দেখব । তিনি যদি বলেন তবে আমি তোমাকে মন্ত্র দিব ।” কিছুদিন পরে শ্রীল প্রভুপাদ পুনরায় আসিলে বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—“আমি মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি ।” প্রভুপাদ ফিরিয়া গেলেন । কিন্তু তিনি এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে তাঁহাকে রূপালাভ করিতেই হইবে । পুনরায় একদিন আসিয়া নিবেদন জানাইলে বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—“আমি মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম । তিনি আপনার মত ঐশ্বর্যশালী, নীতিজ্ঞ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকে আমার স্থায় কাঙ্গালের গ্রহণের অযোগ্য বলে বললেন ।” এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়াও শ্রীল প্রভুপাদ ঘাবড়াইলেন না । তিনি বলিলেন,—“প্রভো ! আপনার রূপা না পাইলে আমি আমার এই জীবন রাখিব না ।” ইহা শুনিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং নিজে তাঁহার পদধূলি স্বহস্তে শ্রীল প্রভুপাদের মস্তকে এবং সর্কাদ্দে দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন,—“তুমিই যোগ্যপাত্র । সমগ্র বিশ্বে শ্রীমন্নমোহাপ্রভুর বাণী প্রচার কর ।”

ইহা কৃপালাভের একটি জলন্ত উদাহরণ। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের শ্রীমমহাপ্রভুর কৃপালাভের জন্ত কি-প্রকার আশ্চি ছিল তাহা প্রতাপরুদ্রের বাক্যেই জানা যায়,—

“যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।

কিবা রাজ্য, কিবা দেহ—সব অকারণ ॥”

আমাদের এই প্রকার আশ্চি কি বিন্দুমাত্র আছে? যদি এই প্রকার আশ্চি জন্মে তবে ভগবান্ অবশ্যই কৃপা করিবেন।

মহারাজ প্রতাপরুদ্র সর্বগুণসম্পন্ন হইয়াও নিরতিমানী ছিলেন। শ্রীমমহাপ্রভু কোনমতেই তাঁহাকে দর্শন দিবেন না—এইরূপ কঠোরভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই কঠোরতা সত্ত্বেও রাজ্যের বাড়ুদাররূপ তুচ্ছ সেবা দেখিয়া তাঁহার সন্তোষ হয় এবং তাঁহাকে মহাপ্রভু পরোক্ষ কৃপা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই,—

“তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন।

সুবর্ণ মার্জ্জনী লঞা করে পথ-সম্মার্জন ॥

চন্দন জলেতে করে পথ নিষবনে।

তুচ্ছ সেবা করে বসি’ রাজ্য সিংহাসনে ॥

উত্তম হঞা রাজ্য করে তুচ্ছ সেবন।

অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন ॥

মহাপ্রভু স্বপ্ন পাইল সে সেবা দেখিতে।

মহাপ্রভুর কৃপা হইল সে সেবা হইতে ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ১৩।১৫-১৮ )

ভগবানের কৃপা অহৈতুকী। কখন কাহাকে কিভাবে তিনি কৃপা করিবেন তাহা তিনিই জানেন। সাক্ষাতে না করিয়া অনেক সময় পরোক্ষেও তিনি কৃপা করিয়া থাকেন। প্রতাপরুদ্রের তুচ্ছ সেবা দেখিয়া মহাপ্রভু প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তিনি পরোক্ষে এমন কৃপা করিলেন যে দেব-মুনীন্দ্রগৃহ তাঁহার নিজ স্বরূপ রাজ্যকে দেখাইয়াছিলেন। এই প্রকার কৃপায় রাজ্য ধৃত হইয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ অঙ্কভাষ্যে লিখিয়াছেন,—“প্রত্যক্ষভাবে রাজা নামের প্রতি আচার্য্যনীলাভিনয়কারী প্রভুর তীর বিতুষা, কিন্তু পরোক্ষভাবে তাঁহার প্রতি এত কৃপা যে, রাজা প্রভুর কৃপায় তাঁহার গুঢ় লীলারহস্ত পর্য্যন্ত ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন। বাস্তবিক মহাপ্রভুর এই কৃপা ও বঞ্চনলীলা অর্থাৎ যুগপৎ দৈব ও জীবৎ লীলার তাৎপর্য্য—তাঁহার ঐকান্তিক ভক্ত ব্যতীত অপর কেহই বুঝিতে সমর্থ নহে।”

জগন্নাথের রথযাত্রার সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু সাত সপ্তদ্বারের কীর্তনের মধ্যে যুগপৎ একসঙ্গে প্রত্যেকটী সপ্তদ্বারে নৃত্য করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সপ্তদ্বারের ভক্তগণ মনে করিলেন যে,—প্রভু আমার সপ্তদ্বারেই আছেন। এই অভূত রহস্যের প্রকাশ মহাপ্রভুর কৃপায় রাজা বৃন্দিতে পারিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার ভৃত্য হরিচন্দনের কাঁধে হাত রাখিয়া প্রেমবিস্ময়চিন্তে মহাপ্রভুর নৃত্য দেখিতেছিলেন। এমন সময় শ্রীবাস পণ্ডিত রাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বাহুজ্ঞানশূন্য হইয়া নির্ণিমেষ নেত্রে মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন। রাজার দর্শনে ব্যাঘাত হইতেছে দেখিয়া হরিচন্দন বার বার শ্রীবাসকে হাত দিয়া সরিয়া যাইতে বলিলে শ্রীবাস পণ্ডিত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে চড় মারিলেন। ইহাতে হরিচন্দন ক্রোধান্বিত হইলে রাজা প্রতাপরুদ্র তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন,—

“ভাগ্যবান তুমি ইহার হস্ত স্পর্শ পাইলা।

আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হইলা ॥”

( চৈঃ চঃ মঃ ১৩।২৭ )

অর্থাৎ—বৈষ্ণবকর্তৃক অপমান বা আঘাতও সৌভাগ্যসূচক এবং উহাই তাঁহার কৃপা। আমাদের হৃদয়ে যেদিন এরূপ ভাবের উদয় হইবে সেদিন আমরা অবশ্যই কৃপা লাভ করিতে পারিব। আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত দীন না হইতে পারি ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবানের বা গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিতে পারিব না। কারণ,—

“দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান।

কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥”

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

## শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তর্দ্বান-প্রসঙ্গ

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৫ পৃষ্ঠার পর ]

পাণ্ডুগণের মধ্যে কাহারও ধারণা,—রাজপথে সংকীর্ণনের সময় নৃত্যকালে পথের ইষ্টকথণ্ডে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে আঘাত লাগায় প্রচুর রক্তক্ষরণ ও পরবর্তিতে ক্ষতস্থানে বিষক্রিয়ায় তাঁহার অকালমৃত্যু হইয়াছে। ইহা যে কত প্রকারে অর্থোক্তিক হইতে পারে, তাহা আমরা এক এক করিয়া দেখাইতেছি। ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞানতা হইতেই এই সকল দুর্ভুজির উদয় হইয়া থাকে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের ভগবত্তা শাস্ত্র-প্রমাণিত—সাম্প্রতিক কালের ( গত দুইশত বৎসরের ) মধ্যে গজাইয়া উঠা স্বঘোষিত বা পরঘোষিত অশাস্ত্রীয় ভগবান্গণের ন্যায় নহে। তাঁহার শ্রীঅঙ্ক পাক্‌ভৌতিক দ্রব্যজাত নহে—অপ্রাকৃত। “প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর। বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর ॥” ( চৈঃ চঃ আদি ৭।:১৫ )। আবার ‘মহাবারাহে’ আছে,—

সর্বৈ নিত্যাঃ শাস্ততশ্চ দেহান্তরা পরাশ্রয়নঃ ।

হানোপাদান-রহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কচিৎ ॥

পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্বতঃ ।

সর্বৈ সর্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্বদোষবিবর্জিতাঃ ॥

—‘সেই পরমাশ্রয় দেহসকল সমস্তই নিত্য ও শাস্ত ; তাঁহার প্রাকৃত-দেহের ন্যায় দেহ-পরিত্যাগ বা দেহান্তর গ্রহণ করেন না ; ভগবানের দেহসকল কখনও প্রকৃতি-জাত নহে—স্বতরাং সর্বপ্রকারে পরমানন্দস্বরূপ ও চিন্ময়—সমস্ত অঙ্ক-প্রত্যঙ্ক সকলপ্রকার গুণে পরিপূর্ণ ও সমস্ত দোষবিবর্জিত।’ পাঠকগণ ! এমতাবস্থায় মহাপ্রভুর ইষ্টকথণ্ডে ক্ষত হইয়া বিবক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ কি-প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? ভগবান্ অথচ তিনি প্রাকৃত-শরীর যুক্ত—ইহা সোনার পাথরবাটীর ন্যায়ই অসত্য ও অযৌক্তিক ।

শ্রীমন্নমহাপ্রভুর অভূতপূর্ব নৃত্যের ধারণা পাষাণগণের ভৌতিক ভাবনারাজ্যে কখনই প্রবেশ করে না। সাধারণ মর্ত্যজীবের কা কথ্য, বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ নটরাজ শম্ভুর শ্রীকৃষ্ণনামাবেশে উদ্গত নৃত্যও তাঁহার সেই সর্ব-মনোহর ও যুগপৎ ভয়ঙ্কর নৃত্যের সহিত তুলনা করা যায় না।—“গুণিলে কীর্তন মাত্র প্রভুর শরীরে। বাহ নাহি থাকে পড়ে পৃথিবী উপরে ॥ হেন সে আছাড়, প্রভু পড়ে নিরন্তর। পৃথ্বী হয় খণ্ড খণ্ড সবে পায় ডর ॥”—( চৈঃ ভাঃ মধ্য ৮।:১২৩, ১২৪ )। “নৃত্যে প্রভুর বাঁহা বাঁহা পড়ে পদতল। সমাগর-শৈল মহী করে টলমল ॥”—চৈঃ চঃ মধ্য ১০।:৮৩ )। শচীমাতা শ্রীমন্নমহাপ্রভুর শ্রুতি অত্যন্ত বাৎসল্যাব-বশতঃ তাঁহার নৃত্যকালীন আছাড় সহ করিতে পারিতেন না—চক্ষু মূদিয়া গোবিন্দের নিকট পুত্রের রক্ষার জন্ত প্রার্থনা করিতেন।—“সে কোমল শরীরে আছাড় বড় দেখি। গোবিন্দ স্রয়ে আই মৃদি দুই আঁখি ॥”—( চৈঃ ভাঃ মধ্য ৮।:১২৫ )। পুনরায়, শ্রীমন্নমহাপ্রভু বৃন্দাবন-উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে রামকলিগ্রামে উপস্থিত হইয়া উদ্গত নৃত্যরত হইলে স্থানীয় যবন-কতোয়াল তাহা দর্শন করিয়া অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়েন। পশ্চাৎ তিনি হুসেন শাহ বাদশাহের নিকট গিয়া

বিস্ফারিত নেত্রে ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া তাহা বর্ণনা করিলেন,—“নবনীত হৈতেও কোমল সর্ব অঙ্গ । তাহাতে অদ্ভুত গুন আছাড়ের রঙ্গ ॥ একদণ্ডে পড়েন আছাড়ে শত শত । পাবান ভাঙ্গয়ে তবু অঙ্গ নহে ক্ষত ॥”—( চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪১৩৫-৩৬ ) । এমতাবস্থায় তাঁহার নৃত্যকালে সামান্য এক ইষ্টকথণ্ডে আহত হইয়া অকালে মৃত্যুবরণের গল্প কি নিতান্তই হাস্যকর নহে ?

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে ‘সুদীপ্ত’ সাত্ত্বিক বিকার লক্ষ্য করিয়া নির্বিশেষ-পর্যী সার্বভৌম বাহুদেব ভট্টাচার্য্যও প্রথমদর্শনে পরমবিস্মিত হইয়াছিলেন । মহাপ্রভুর ভগবত্তা তাঁহার তখনও বিদিত হয় নাই—কিন্তু শাস্ত্রবিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকায় তিনি উপস্থিত অঙ্গ পড়িছাগণের গায় আচরণ করেন নাই । বরং পরমাদরে পড়িছাগণের দ্বারা নিজ-গৃহে লওয়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—“‘সুদীপ্ত সাত্ত্বিক’ এই নাম যে প্রলয় । নিতসিদ্ধ ভক্তে সে ‘সুদীপ্ত ভাব’ হয় ॥ অধিরূঢ় ভাব ধীর, তাঁর এ বিচার । মহেশ্বরের দেহে দেখি—বড় চমৎকার ॥”—( চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১২-১৩ ) । অষ্ট-সাত্ত্বিকবিকার ‘ধূমায়িতা’, ‘জলিতা’, ‘দীপ্তা’—এই ক্রমে উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইয়া ‘উদীপ্তা’ অবস্থাও অতিক্রম করিয়া যখন সাত্ত্বিক ভাবসমূহ কোটি-গুণিত হইয়া পরমোৎকর্ষতা সহকারে প্রকাশিত হয়, তখন তাহা ‘সুদীপ্ত’ সংজ্ঞা লাভ করে । ইহা পাঞ্চভৌতিক মহেশ্বরদেহে কদাপি সম্ভব নহে—তজ্জগুই শাস্ত্র-অভিজ্ঞ সার্বভৌম মহাপ্রভুকে মহেশ্বরমাত্র বুদ্ধিতে তাঁহার দেহে অবিস্থ হইলেও উহা দর্শন করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছিলেন । সেস্থলে শাস্ত্র-বিচারে ‘ক-অক্ষর গোমাংস’ এইসকল পাষণ্ড কিরণেই বা তাহা উপলব্ধি করিয়া চমৎকৃত হইবে ? নেইসকল অপ্রাকৃত বিকারের বর্ণনার দিগ্‌দর্শন পাঠকগণের যৎকিঞ্চিৎ ধারণার জগা উল্লিখিত হইল ।—

“ক্ষণে ক্ষণে আপনে যে গায় উচ্চধ্বনি ।

ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত গুলি ॥

ক্ষণে ক্ষণে হয় অঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের ভর ।

ধরিতে সমর্থ কেহ নহে অল্পচর ॥

ক্ষণে হয় তুলা হৈতে অত্যন্ত পাতল ।

হরিষে করিয়া কান্ধে বুলয়ে সকল ॥

ক্ষণে ক্ষণে সর্ব অঙ্গে হয় মহাকম্প ।

মহা শীতে বাজে হেন বালকের দন্ত ॥

ক্ষণে ক্ষণে মহাশ্বেদ হয় কলেবরে ।

মৃতিমতী গঙ্গা যেন আইলা শরীরে ॥

কখন বা হয় অঙ্গ জলন্ত অনল ।  
 দিতে মাত্র মলয়জ গুথায় সকল ॥  
 ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত বহয়ে মহাশ্বাস ।  
 সম্মুখ ছাড়িয়া সবে হয় একপাশ ॥  
 গৌরবর্ণ দেহ—ক্ষণে নানাবর্ণ দেখি ।  
 ক্ষণে ক্ষণে দুই গুণ হয় দুই আখি ॥  
 ক্ষণে ক্ষণে সর্ব অঙ্গ হয় স্তম্ভাকৃতি ।  
 তিলান্দেক নোঙাইতে নাহিক শক্তি ॥  
 সেই অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে হেনমতে হয় ।  
 অস্থিমাত্র নাহি যেন নবনীতময় ॥  
 কখনো দেখি যে অঙ্গ গুণ-দুই-তিন ।  
 কখনো স্বভাব হইতে অতিশয় ক্ষীণ ॥”

( চৈঃ ভাঃ মধ্য ৮ম অধ্যায় )

“উদ্দগু নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার ।  
 অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাব উদয় হয় সমকাল ॥  
 মাংস-ব্রণ সম রোমবৃন্দ পুলকিত ।  
 শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টক-বেষ্টিত ॥  
 এক এক দন্তের কম্প দেখিতে লাগে ভয় ।  
 লোকে জানে, দন্ত সব খসিয়া পড়য় ॥  
 সর্বদাঙ্গ প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদগম ।  
 ‘জঙ্গ গগ’ ‘জঙ্গ গগ’—গদগদ বচন ॥  
 জলযন্ত্র-ধারা যৈছে বহে অশ্রুজল ।  
 আশ-পাশে লোক যত ভিজিল সকল ॥  
 দেহ-কান্তি গৌরবর্ণ দেখিয়ে অরুণ ।  
 কতু কান্তি দেখি যেন মল্লিকা-পুষ্পসম ॥  
 কতু স্তম্ভ, কতু প্রভু ভূমিতে লোটায় ।  
 শুষ্ক কাষ্ঠসম পদ-হস্ত না চলয় ॥  
 কতু ভূমে পড়ে, কতু শ্বাস হয় হীন ।  
 যাহা দেখি ভক্তগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ ॥”

( চৈঃ চঃ মধ্য ১৩ পরিচ্ছেদ )

এইসকল বর্ণনা আপাতঃ শ্রবণে পারশ্র উপস্থাসের অপেক্ষাও অলৌকিক

বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিকই লোকাভীত এইসকল ব্যাপারসমূহ লোকান্তর্গত অভিজ্ঞতাদ্বারা বিচার করা যায় না—কারবার চেষ্টাও মূঢ়তা। শিশুবিদ্যা লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে সমালোচনা করিতে যাওয়া অত্যন্ত অনুরচিত। এইসকল অপ্ৰাকৃত-বিকারসমূহের অধিষ্ঠান কখনও ভৌতিক দেহে সম্ভবপর নহে—বিশুদ্ধ-সত্ত্বই উহারা প্রকাশিত হয়। ভগবানের এইপ্রকার দিব্য আনন্দময়রূপ দর্শন-শ্রবণ করিয়াও মায়ামূঢ় লোক তাঁহাকে ভৌতিক বলিয়া মনে করে—অহো, তাহাদের ইহা কিরূপ ভ্রান্তি !

আনন্দরূপ দৃষ্টাপি লোকে ভৌতিকমেব তু।

মত্ততে বিষ্ণুরূপং চ অহো ভ্রান্তির্বহাংস্থিতা ॥ ( স্বন্দপুরণ )

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু জীবের ভবব্যাধির এক অত্যন্ত হৃদক্ষ চিকিৎসক—তাঁহার সেই পরমপূত চরিতামৃত শ্রবণেই জীবের অজ্ঞানাদি দোষ নিম্মূল হইয়া যায়। —“তুনিলে খণ্ডবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ। কৃষ্ণ গাঢ় প্রেম হবে, পাইবে সম্ভোষ ॥”—( চৈ: চ: আদি ১।১০৭ )। সেই মহাবৈষ্ণব মহাপ্রভুর অঙ্গস্পর্শমাত্রেই জীব কৃষ্ণপ্রেমামৃত্তে নিমগ্ন হইবার সাথে সাথে শারীরিক ব্যাধিও তাহাদের দূরীভূত হইয়া যাইত। ‘বাস্তদেব’ নামে এক বিপ্র ষাঁহার “সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ, তাতে কীড়াময়”—এইরূপ তিনিও শ্রীমদমহাপ্রভুর আলিঙ্গন-স্পর্শ লাভ করিবামাত্র কুষ্ঠ-রোগ হইতে মুক্ত হইয়া সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইলেন। —“প্রভু-স্পর্শে হুঃখ সঙ্গ কুষ্ঠ দূরে গেল। আনন্দ সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল ॥”—( চৈ: চ: মধ্য ৭।১৪১ )। শ্রীসনাতন গোস্বামী বৃন্দাবন হইতে পুরুষোত্তম-ধাম-উদ্দেশ্যে ব্যারিখণ্ড-বনভূমি দিয়া গমনকালে তিনি ‘কণ্ডুয়ন’-রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর মহাপ্রভু-কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলে তিনি উক্ত ব্যাধি হইতে নিম্মুক্ত হইয়া স্বর্ণবর্ণ-তুলা কান্তি লাভ করিয়াছিলেন। —“এত বলি’ পুনঃ তারে কৈলা আলিঙ্গন। কণ্ডু গেল, অঙ্গ হৈল স্ববর্ণের সম ॥”—( চৈ: চ: অন্ত্য ৪।২০১ )। পুনরায়, শ্রীচৈতন্য-নিন্দাবশতঃ বিস্মটিকা-ব্যাধিতে আক্রান্ত সার্কভোম-জামাতা অমোঘের বক্ষে পরম-করণাময় শ্রীচৈতন্যদেব হস্ত স্থাপন করিলে তৎক্ষণাৎ সে ব্যাধিমুক্ত হইয়া ‘কৃষ্ণ’ ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এইরূপ সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত তাঁহার শ্রীচরিতামৃত আলোচনাকালে দেখা যায়। ‘সক্তিদানন্দ-ঘনবিগ্রহ’ সেই শ্রীমদমহাপ্রভু ষাঁহার স্পর্শমাত্রে কুষ্ঠ, কণ্ডুয়ন, বিস্মটিকা প্রভৃতি ব্যাধিসহ ভবব্যাধি দূরীভূত হইয়া ‘কৃষ্ণপ্রেমে’ জীব উন্নত হয়—সেই তিনি ইষ্টকথণ্ডে আহত হইয়া রক্তক্ষরণ, পশ্চাৎ বিষক্রিয়ার জ্বালা হইতে স্বয়ং মুক্ত হইতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন ! এরূপ ‘আঘাতে গল্প’ নাস্তিকতার নেশা হইতেই যে উদ্ধৃত হইয়াছে—ইহাতে সন্দেহ কি ?

আর এক প্রকার পাষণ্ডগোষ্ঠীর প্রলাপ এই যে, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু পুরীর পাণ্ডাগণের দ্বারা 'শুমথুন' হইয়াছেন। মহাপ্রভুর ভক্তগণ তাঁহার প্রতি এইসকল অত্যাঘ্য শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া স্বভাবতঃই ব্যথিত হন। আলোচ্য প্রবন্ধে এইসকল আত্মরিক শব্দ অনিচ্ছুক হইলেও প্রসঙ্গক্রমে ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেছি। শ্রীপত্রিকায় এইপ্রকার পাষণ্ডাঙ্কিত উল্লেখের জগৎ আমরা বিশেষ দুঃখিত। আমরা এক এক করিয়া বিভিন্ন-দিক্ প্রদর্শনদ্বারা উহাদের জিহ্বা স্তম্ভন করিয়া দিব।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, তাহা অস্ত্র-শস্ত্রদ্বারা ছিন্ন হয় না, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, জলদ্বারা সিক্ত কিংবা বায়ুদ্বারা শুষ্ক হয় না। —“নৈনং ছিন্তস্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥” (গীতা ২।২৩)। ভগবান্ সেইসকল আত্মারও আত্মা, —“নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্” (কঠোপনিষৎ)—সকল নিত্যবস্তু-সমূহেরও তিনি নিত্যবস্তু, সকল চেতন জীবসমূহেরও তিনি মুখ্যচেতন। কেবল তাহাই নহে, জীবের যেরূপ দেহ ও দেহীর (আত্মার) মধ্যে ভেদ থাকে, ভগবৎ-স্বরূপে সেইপ্রকার কখনও ভেদ থাকে না। —“দেহ-দেহি-বিভাগোহয়ং নৈশ্বরে বিত্ততে কচিৎ”—(কুর্ষপুরণ)। এইস্থলে ‘কচিৎ’-শব্দের অর্থ ‘কুত্ৰাপি’—অর্থাৎ-কোথাও নহে। সেই ভগবৎস্বরূপ গোলোকে বা পরব্যোমে বিরাজিত থাকুন বা এই দেবীধাম বা চতুর্দশ-ভুবনমধ্যে অবতীর্ণ হউন—কোথাও জীবের ত্রায় তাঁহার দেহ-দেহীর পার্থক্য থাকে না। অর্থাৎ তিনি স্বয়ংই সম্পূর্ণ বিতু-আত্মস্বরূপ,—“চবিশ মহন্তত্বের” গন্ধমাত্রও বাঁহাতে নাই সেই তিনি কি-প্রকারে অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন হইতে পারেন? বাঁহার রূপায় প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর্নও অবধ্য হইয়াছিলেন, বাঁহার রূপায় নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর যবন জল্লাদগণের দ্বারা ‘বাইশ-বাজারে’ অত্যন্ত নিশ্চয়ভাবে প্রহৃত হইয়াও সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং নিজকে রক্ষা করিতে অসমর্থ!—এইরূপ উক্তি পাষণ্ডপ্রজন্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মহাপ্রভুর সহিত তৎকালীন পুরীবাসিগণ, পাণ্ডাগণ এবং উৎকল-রাজের সম্পর্ক কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে আলোচনা করা যাউক। মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে অত্যন্ত অনাড়ম্বর-ভাবেই নীলাচলে প্রবেশ করিয়া সর্বপ্রথমই শ্রীনারায়ণ-ভোম-বাহুদেব ভট্টাচার্য্যকে মায়াবাদ-অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করিলেন। সার্বভৌম তদানীন্তন ভারতে ত্রায় ও বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যাপনায় বিখ্যাত ছিলেন এবং রাজ্য-প্রতাপরূপে তিনি ছিলেন রাজপণ্ডিত ও দক্ষিণহস্ত। স্তত্রাং



তাহার গায় পরমপণ্ডিতকে মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান-রূপে স্বীকার করিতে দেখিয়া এবং নিজ-গাভীর্ষ্য পরিত্যাগপূর্বক মহাপ্রভুর সংকীৰ্ত্তন-বিলাসে যোগ দিতে দেখিয়া স্বয়ং রাজা এবং সকল নীলাচলবাসী মহাপ্রভুর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইলেন। অবশেষে ভট্টাচার্য্যের আবেদন তাহারা শ্রীমন্নমোহন-কর্তৃক অঙ্গীকৃত হইয়া পরমকৃতার্থ হইয়াছিলেন।

“তবে সার্বভৌম প্রভুর দক্ষিণ পার্শ্বে বসি।

মিলাইতে লাগিল সব পুরুষোত্তমবাসী ॥

এইসব লোক প্রভু বৈসে নীলাচলে।

উৎকণ্ঠিত হঞাছে সবে তোমা মিলিবারে ॥

তুষিত চাতক যৈছে করে হাহাকার।

তৈছে এইসব—সবে কর অঙ্গীকার ॥”

( চৈঃ চঃ মধ্য ১০।৫৮-৪০ )

পুরীর পাণ্ডাগণ পাষণ্ড নহেন—তাহারা সেই ধন্য নীলাচলবাসী, বাহারা শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় নিত্য নিযুক্ত এবং ভগবন্তের রাজ্যের আশ্রয়বাহী দাস। তাহারা শ্রীজগন্নাথদেবের সেবক-স্থত্রে জগন্নাথভিন্ন শ্রীগৌরবিগ্রহের সেবায়ও সতত আকৃষ্ট। তাহার উপর মহাপ্রভুর আশ্রয় শীঘ্র পালনের রাজ-আশ্রয় লাভ করায় তাঁহাদের জগৎ সোনার সোহাগা হইয়াছিল।

“পড়িছা কহে,—আমি সব সেবক তোমার।

যে তোমার ইচ্ছা, সেই কর্তব্য আমার ॥

বিশেষে রাজ্যের আশ্রয় হঞাছে আমারে।

প্রভুর আশ্রয় যেই, সেই শীঘ্র করিবারে ॥

( চৈঃ চঃ মধ্য ১২।৭৪-৭৫ )

শ্রীমন্নমোহনপ্রভুর প্রতি গঙ্গাবংশীয় ( গঙ্গপতি ) উৎকল-সম্রাট শ্রীপ্রতাপরুদ্রের শতকরা শতভাগ আকর্ষণ সর্বত্রই অবিসংবাদিতরূপে বিদ্যমান। রাজদর্শন করিবেন না বলিয়া মহাপ্রভু যেখানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, রাজা প্রতাপরুদ্র সেখানে তাহার কৃপাধন লাভ না করিলে নিজ জীবন পরিত্যাগে দৃঢ় সঙ্কল্পিত। তাহার কৃপা বিনা রাজ্যের রাজ্য—মরুময়, দেহ—অন্তঃসারশূন্য। “তার প্রতিজ্ঞা—মোর না করিবে দরশন। মোর প্রতিজ্ঞা—তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন ॥ যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন। কিবা রাজ্য, কিবা দেহ—সব অকারণ ॥”—

( চৈঃ চঃ মধ্য ১১।৪৮-৪৯ )। অবশেষে তিনি অনেক সেবা ও উৎকর্ষ্যের পর রামানন্দরায় ও সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সাহায্যে শ্রীগৌরকৃপা লাভ করিয়া

ধন্য হন। ‘গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়’ তাঁহার সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে,—‘পুরাকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ নামে যিনি ত্রিজগন্নাথদেবের প্রধান সেবক ছিলেন, অর্থাৎ ঐহার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া স্বয়ং পরব্রহ্ম দাক্ষর্যরূপে জগতে প্রকটিত, অধুনা তিনিই সেই প্রতাপরুদ্ররূপে জাত হইয়াছেন।’—‘ইন্দ্রদ্যুম্নো মহারাজো জগন্নাথার্চকঃ পুরা। জাতঃ ‘প্রতাপরুদ্রঃ’ সন্ সম ইন্দ্রেণ সোহধুনা।’—(গৌঃ গঃ ১১৮ শ্লোক)। পরবর্তিতে তাঁহার ইচ্ছাক্রমে কবি কর্ণপূর ‘শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়’ নাটক রচনা করেন এবং তাঁহারই প্রযত্নে অতিশীঘ্র উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্মের বিলক্ষণ প্রসার হইয়া উঠে। (দ্রষ্টব্যঃ)

—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী

## জীবের কৃত্য

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৬ পৃষ্ঠার পর ]

শ্রীমন্মহাপ্রভু পরোপকারের কথা বলেছেন। জীবের প্রতি শারীরিক, মানসিক ও আত্মিকভাবে উপকার বা দয়া করা যায়। জীবের দুঃখে দুঃখিত হয়ে দুঃখ মোচনের জন্য যে জীব আকাঙ্ক্ষা জাগে তাহাই দয়া নামে অভিহিত। জীবকে খাত, বস্ত্র, গৃহ প্রভৃতি দিয়ে তার যে অভাব পূরণ করা হয়, তাহা জীবের প্রতি শারীরিক দয়া। দিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি দেখিয়ে জীবের মনে যে আনন্দের সঞ্চার করা হয়, তাহা জীবের প্রতি মানসিক দয়া। কিন্তু এই দুই প্রকার দয়ার জীবের প্রকৃত কল্যাণ লাভিত হয় না। জীবের আত্মস্বরূপ প্রকাশের জন্য বা জীবকে কৃষ্ণোন্মুখী করার জন্য তার প্রতি যে দয়া করা হয়, তাহাই আত্মিক দয়া বা পারমাথিক দয়া। এই আত্মিক দয়া উক্ত দুই প্রকার দয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শারীরিক ও মানসিক দয়ায় জীবের ভোগাশা বৃদ্ধি হয়। ফলে জীবকে কর্মফল ভোগের জন্য জন্ম-জন্মান্তর নানা যোনিতে গতয়াত করতে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবকে কৃষ্ণভক্তিতে উন্মুখী করাকেই জীবের প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার বা আত্মিক দয়া বলে ঘোষণা করেছেন।

মানুষের মন এমনই বিষয়-লোলুপ যে হাতে অর্থ এলেই তাহা দেহ-মনের সৃষ্ণের জন্য ব্যয় করে থাকে। মানুষ শত শত প্রকার আশা-বন্ধনে বদ্ধ ও কাম-ক্রোধ-লোভপরায়ণ হওয়ায় অগ্নায় পথেও অর্থ উপার্জন করে সঞ্চয় করার চেষ্টা করে। তাদের মনের প্রবৃত্তি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে,—

“চিন্তামপরিমেয়াক প্রলয়ান্তানুপাশ্রিতাঃ ।

কামোপভোগপরমা এতাবদ্বিতী নিশ্চিতাঃ ॥

আশাপাশশতৈর্বন্ধাঃ কামক্ৰোধপরায়ণাঃ ।

ঈহন্তে কামভোগার্থমগ্নায়ৈনার্থসংকল্পান্ ॥

ইদমগ্ন ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্যো মনোরথম্ ।

ইদমস্তাদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ( গী: ১৬।১১-১৩ )

অর্থাৎ—“আমৃত্যু অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয়পূর্বক কামের উপভোগকে চরম—এইরূপ নিশ্চয় করে শত শত আশা-পাশে আবদ্ধ, কাম ও ক্রোধপরায়ণ সেই ব্যক্তিগণ কামভোগের জগ্ন অগ্নায়রূপে অর্থ সংকয়ের চেষ্টা করে। আজ আমি ইহা লাভ কবুলাম, এই মনোভীষ্ট অর্থাৎ মনঃপ্রিয় লাভক অর্থ আমিই স্ববলে প্রাপ্ত হব; নিজ-বলে লব্ধ এই ধন আমার দৃষ্টিতে আছে এবং কামিত ধন আমার বলেই পুনরায় আমার লাভ হবে, কিন্তু অদৃষ্ট-বল বা ঈশ্বর-অহুগ্রহের দ্বারা হবে না।”

কামোপভোগ বা বিষয়চিন্তাকেই যারা পরম প্রয়োজন বলে মনে করে, তাদের উক্তরূপ ধন-তৃষ্ণা ব্যতীতও নিজেদের স্বতন্ত্র ঈশ্বর হবার বাসনা জাগে। তাদের মনের অভিপ্রায় সন্ধ্যা শাস্ত্র আরও জানিয়েছেন,—

“অমো ময়া হতঃ শত্রুর্হনিমিত্তে চাপরানপি ।

ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বসবান্ সুখী ॥” ( গী: ১৬।১৪ )

অর্থাৎ—“আমি এই শত্রুকে বধ করলাম, অগ্নায় শত্রুগণকেও বধ করব, আমি ঈশ্বর অর্থাৎ কর্তা, আমি ভোগী অর্থাৎ ভোক্তা, আমি সিদ্ধ অর্থাৎ কৃতকার্য আমি বসবান্ ও সুখী।”

ভগবদ্ অবিস্বাসী, মোহজালাবৃত, বিষয়ভোগী উক্ত প্রকার ব্যক্তিগণের কুরুপ গতি হয়, সে সন্ধ্যা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উক্ত হয়েছে,—

“অনেকচিত্তবিস্রান্তা মোহজালসমাবৃত্তাঃ ।

প্রমত্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহুচো ॥” ( গী: ১৬।১৬ )

“নানান্ননোরথদ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্ত, মোহজাল-সমাবৃত্ত, বিষয়ভোগে স্রান্ত আত্মক, সেই ব্যক্তিগণ বৈতরণ্যাদি অন্তর্গত নরকে পতিত হয়।” সেই অপবিত্র বৈতরণী নরক কেমন? তদন্তরে ‘প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে’ কথিত হয়েছে—“যমদ্বার-সমীপস্থ পাপতোয়া নদীর নাম বৈতরণী। বৈতরণী নদী দুর্গন্ধযুক্তা এবং শোণিত-বহা, ইহা তপ্ত-বারিপূর্ণ, মহাবেগা এবং অস্থি ও কেশযুক্তা তরঙ্গ-মহিতা।”

অর্থ মানুষের জড়ীয় কামভোগ ও বিষয়ভোগ বাসনায় ইন্ধন দিয়ে থাকে। মহারাজ যযাতির উপাখ্যানে আমরা জানতে পারি যে, শুক্রাচার্য্য-কর্তৃক মহারাজ যযাতি অভিশপ্ত হয়ে জরাগ্রস্ত হলেও তাঁর প্রার্থনায় শুক্রাচার্য্য কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ করেন যে—যদি তাঁর কোন পুত্র জরা গ্রহণ করেন তাহলে রাজা পুনরায় সেই পুত্রের যৌবন নিয়ে ভোগ করতে পারবেন। তখন যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার আজ্ঞাক্রমে জরা গ্রহণ করলে রাজা যযাতি সহস্র বৎসর যৌবন ভোগ করেন। কিন্তু পরিশেষে যযাতি তৃপ্তি না পেয়ে উপলব্ধি করলেন যে—ভোগে শান্তি নেই। জড়জগতে জীবের ভোগ করার প্রবণতা পরিশেষে দুঃখেই পর্যাবসিত হয়। মহাজন-গীতিতে জানা যায়,—

“ইন্দ্রিয়-তর্পণ বই,                      ভোগে আর সুখ কই,  
সেও সুখ অভাব-পূরণ।

যে সুখেতে আছে ভয়,              তা’কে সুখ বলা নয়,  
তা’কে দুঃখ বলে বিজ্ঞজন।”

( নির্বেদ-লক্ষণ-উপলব্ধি—৩ কঃ কঃ )

শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হয়েছে,—

“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষ্ণ বস্ত্রৈব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥” ( ভাঃ ৯।১৯।১৪ )

“কামের উপভোগের দ্বারা কামের শান্তি হয় না। অগ্নিতে ঘৃত পড়লে যেমন অগ্নি বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ ভোগের দ্বারা কামনা বর্দ্ধিত হয়।” তবে ভগবানকে পেলে তার বিষয়-ভোগের কামনা থাকে না এবং পুনর্জন্মও হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে আমরা জানতে পারি ;—

“ন ময্যাবেশিত দ্বিযাং কামঃ কামায় কল্পতে।

ভজিতাঃ কথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেয্যতে ॥”

( ভাঃ ১০।২২।২৬ )

“যাদের বুদ্ধি আমাতে ( ভগবানে ) আবিষ্ট হয়েছে, তাদের কামনা হতে অল্প কামনার উদ্ভব হয় না। যবকে যদি ভাজা হয়, তারপর গুড় দিয়ে পাক করা হয়, তা’হতে আর অঙ্কুর উদ্গত হয় না।”

অর্থ মানুষকে ভোগের দিকে প্রলুব্ধ করে থাকে। তাই জগদগুরু শ্রীল ভক্তিনিকান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গেয়েছেন,—

“তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব ॥”

মানব-জীবনে দুই পথ—একটি প্রেয়ঃ পথ, অত্রটি শ্রেয়ঃ পথ। প্রেয়ঃ পথ ধনাদি ভোগবিলাসে মত্ত করায়, ফলে সংসার-বন্ধন হয়। আর শ্রেয়ঃ পথ জাগতিক বস্তুসমূহে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়ে চিত্তকে ভগবন্মুখী করে দেয়। এই শ্রেয়ঃ পথ নিত্য, কিন্তু প্রেয়ঃ পথ অনিত্য।

পুরাকালে রাজা উদ্ধালকি স্বর্গে যাবার জন্তু বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের ভাল ভাল বস্তু দান করতে হয়। কিন্তু রাজা তা না করে রুগ্ন দুর্বল গাভী সংগ্রহ করে তা ব্রাহ্মণদের দান করতে লাগলেন। তাই দেখে তাঁর শিশুপুত্র নচিকেতা ভাবলেন,—‘যে গাভী প্রসব করবে না, দুগ্ধও দেবে না, সেই রুগ্ন গাভী নিয়ে ব্রাহ্মণরা শুধু ভারই বহন করবেন, তাতে ব্রাহ্মণদের কোনই উপকার হবে না। কাজেই এরূপ দানে পিতা যজ্ঞকল থেকে বঞ্চিত হবেন।’ এরূপ চিন্তা করে নচিকেতা তাঁর পিতাকে বললেন,—‘পিতা আপনি আমাকে কার কাছে দান করবেন?’ নচিকেতা-কর্তৃক এরূপ প্রশ্ন তাঁর পিতা বারম্বার শ্রবণ করে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন,—‘তোমাকে যমকে দান করব।’ এইবার নচিকেতা যমপুরী যাওয়ার জন্তু পিতার অহুমতি প্রার্থনা করলেন। রাজা তখন আর বিরুদ্ধি না করে অহুমতি দিলেন। নচিকেতা যমালয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন। যমরাজ সেই সময় ব্রহ্মলোকে ছিলেন। নচিকেতা যমালয়ে যমরাজকে না দেখতে পেয়ে সেখানে তিনরাত্রি অনশনে অবস্থান করলেন। তৎপরে যমরাজ এসে নচিকেতাকে দর্শন দিয়ে নচিকেতার এবিধ ভক্তি দেখে প্রীত হলেন এবং নচিকেতাকে তিনটা বর দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। নচিকেতা প্রথম বরে তিনি যমালয়ে আমার জন্তু তাঁর পিতার চিন্তা দূর করার প্রার্থনা জানালেন এবং দ্বিতীয় বরে পিতা তাঁর উপর যে ক্রুদ্ধ হয়েছেন, সেই ক্রোধ প্রশমনের জন্তু প্রার্থনা জানালেন। যমরাজ নচিকেতার উক্ত দুইটা প্রার্থনাই অহুমোদন করলেন। এইবার নচিকেতা তৃতীয় বরে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব বা ব্রহ্মবিজ্ঞা জানবার জন্তু প্রার্থনা করলেন। তখন যমরাজ বললেন,—‘নচিকেতা, তোমার ঐ প্রার্থনার পরিবর্তে ত্রিভুবনের ধনরত্ন ও শতবৎসর পরমাষু যাজ্ঞা কর।’ কিন্তু নচিকেতা তাতে প্রলুব্ধ না হয়ে ব্রহ্মবিজ্ঞা জানবার জন্তু কৃতাজ্জলিপুটে প্রার্থনা জানালেন। অবশেষে যমরাজ সন্তুষ্ট হয়ে নচিকেতাকে ব্রহ্মবিজ্ঞার উপদেশ দান করলেন। অর্থাৎ যদি জীবের চরম প্রয়োজন হত, তাহলে নচিকেতা নিশ্চয়ই অর্থাৎ যদি প্রার্থনা করতেন। নচিকেতা কেন অর্থাৎ প্রার্থনা করলেন না? তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, অর্থাৎ অস্থায়ী, তুচ্ছ ও অনিত্য বস্তু; ইহাতে নিত্য মঙ্গল হয় না, পরন্তু ভগবানই সব কিছু—যত কিছু ধনসম্পদ, ঐশ্বর্য,

বীৰ্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য—সমস্ত তাঁ'তেই বিজ্ঞান। তাঁকে পেলে সবই পাওয়া যায়—“স্বেনৈব লাভেন পরিপূৰ্ণকামম্”—( ভাঃ ৬।৩।২১ )।

মানুষ ধনের নেশা সহজে ত্যাগ করতে পারে না, কিন্তু ধন ব্যতীত অন্য নেশা অনেকে ইচ্ছা করলে ত্যাগ করতে পারে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যমলাজ্জুন-ভঞ্জন-লালায় নলকুবর ও মণিগ্রীব-নামক কুবেরের দুই পুত্রের কনক ও কামিনী মদে মত্ত হওয়ার পরিণাম বৃক্ষ-যোনি প্রাপ্তি এবং কৃষ্ণের অল্পগ্রহে তাদের বৃক্ষ-যোনি হতে মুক্তির কথা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে। নারদমুনি প্রতিদিন শিবের সভায় হরিকীর্ত্তন করতেন ও কোন কোনও দিন কুবেরের গৃহেও যেতেন। বৈষ্ণবরাজ কুবের মুনিবর নারদকে অতিশয় ভক্তি করতেন এবং নারদমুনি কুবেরের পুত্রদ্বয়কে স্নেহ করতেন। কুবেরের পুত্রদ্বয় অর্থাৎ নলকুবর ও মণিগ্রীব শিশুকাল হতে ভক্ত-সঙ্গী হলেও তারা যখন যৌবনে পদার্পণ করল তখন অসংসঙ্গ-প্রভাবে তারা বিষয়-ঐশ্বর্য্য ও কামিনীগণের সঙ্গে মদান্ধদিগের হ্যায় স্বভাব প্রাপ্ত হল। একদিন কুবেরের ঐ পুত্রদ্বয় মন্দাকিনীর তটে বিবস্ত্রা নারীগণসহ নগ্ন অবস্থায় মদিরা পান করে নৃত্য-গীত করছিল। তখন তাদের দ্বেহের লজ্জা-বোধ আদৌ ছিল না। সেই সময় মন্দাকিনীর তট দিয়ে দেবর্ষি নারদ হরিগুণগান করতে করতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি কুবেরের পুত্রদ্বয়কে ঐভাবে নগ্ন হয়ে বিবস্ত্রা নারীগণসহ নৃত্য-গীত করতে দেখে মন মনে ভাবলেন,—‘কুবেরের এই পুত্রদ্বয়ের একি অবস্থা! এরা যদি কৃষ্ণ-প্রেমে একপ নৃত্য-গীত করত, তাহলে এদের জীবন সার্থক হত।’ ভক্তগণের প্রতি বস্তুর দর্শনে কৃষ্ণ-স্মৃতির উদয় হয়।

“সর্বত্র কৃষ্ণের মূর্ত্তি করে ঝলমল।

সে দেখিতে পায় যার আঁখি নিরমল ॥”

“স্বাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তা'র মূর্ত্তি।

সর্বত্র হয় তাঁ'র ইষ্টদেব-স্মৃতি ॥”

যাঁর যেমন দর্শন, তাঁর তেমনই স্মৃতি হয়ে থাকে। ভক্তগণ অদোষদর্শী। দেবর্ষি নারদকে দেখে বিবস্ত্রা নারীগণ অভিশাপের আশঙ্কায় বসন পরিধান করল, কিন্তু কুবের-পুত্রদ্বয় ঐশ্বর্য্যমদে ও মদিরাপানে এতই মত্ত যে, বসন পরিধান করল না।

“কুবেরের পুত্র হৈয়া শিবের কিঙ্কর।

করিয়া মদিরা পান মত্ত এত বড় ॥

যে-জন শ্রীমদে মত্ত হয় মূঢ়মতি।

সে যদি উত্তম হয় তবু অধোগতি ॥

বিভ্রামদ, কুলমদ; হর্ষমদ হয় ।  
 তাহা হৈতে এত বড় বুদ্ধিভ্রম নয় ॥  
 যেরূপ শ্রীমদে হৈতে হয় বুদ্ধিনাশ ।  
 কেবল কুসঙ্গে হয় কুমতি প্রকাশ ॥  
 নারীসঙ্গ দ্যুতক্রীড়া হয় পান দোষ ।  
 এই পরকারে তার হয় মতি শোষণ ॥  
 শ্রীমদ হইলে নানা পশুবধ করে ।  
 দেব-পিতৃযজ্ঞ-ছলে দস্ত অহঙ্কারে ॥  
 অনিত্য শরীর মানে অজর অমর ।  
 পরহিংসা পরপীড়া করে নিরন্তর ॥  
 কিবা দেবদেহ কিবা নর কলেবর ।  
 অন্ত্যকালে হয় সব ক্রিমি-ভস্ম-মল ॥” ( শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী )

শ্রীমদের ভয়ঙ্কর পরিণাম চিন্তা করে নারদমুনি ভাবলেন,—“এরা ভক্ত কুবেরের পুত্র, এরা শিশুকালে আমাকে খুব সেবা করেছে ও ভক্তিসহকারে প্রণামও করেছে। আজ এরা আমাকে দেখে দণ্ডবৎ করে না এবং আমাকে স্বাগত অভিনন্দনও জানায় না। এদের এই হৃদিশার কারণ—“শ্রীমদাক্ষর্যোঃ”— ( ভাঃ ১০।১০।১২ )। অনেক বস্তুতে নেশা হয় বটে, কিন্তু ঐশ্বর্য্যমদের মত নেশা আরও কোনও বস্তুতে নেই। এদের ঐশ্বর্য্য্যমদের সাথে আবার কামিনী যুক্ত আছে! কনক ও কামিনী এদের মতিভ্রম করেছে। এদের প্রতি দয়া করতে হবে।” ( ক্রমশঃ )

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

## শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫১ পৃষ্ঠার পর ]

“ভাগবতের উক্ত বাণ্যসমূহ অবলম্বন করেই বলছেন যে,—‘স্ব-ঘোষঃ’—নিজ গোকুলবাসী প্রাণিসমূহকেই, ‘আনন্দ-কুণ্ডে’—আনন্দ-রসময় গভীর জলাশয়-বিশেষে, ‘নিমজ্জন্তুম্’—অত্যন্ত নিমগ্ন করতেন। এতে বলা হল,—আত্মীয়বর্গের সম্যক প্রীতি জন্মাইতেন। ‘ঘোষঃ’—শব্দের কীর্ত্তি ও মাহাত্ম্যের উৎকীৰ্ত্তন অর্থও হয়। সেইমতে ‘স্বস্ত জ্ঞানাং বা’—নিজের বা গোপ-গোপীদের যাহাতে কীর্ত্তি প্রভৃতি

ঘোষিত হয় (প্রকাশ পায়) সেইভাবে যিনি নিজেই আনন্দকুণ্ডে, ‘নিমজ্জন্তম্’—  
পরম-সুখবিশেষ অল্পভব করতেন।

পুনরায় বিশেষণান্তর বলছেন—‘তদীয়েশীভজ্যে’—(পূর্বোক্ত সেইসব লীলা-  
দ্বারাই) ভগবানের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানপর উপাসকগণের মধ্যে, ‘ভক্তিজিতম্’—নিজ  
ভক্তজনের নিকটেই যে তিনি সম্পূর্ণ পরাজিত অর্থাৎ নিজের ভক্তবশতা,  
‘আখ্যাপয়ন্তম্’—সম্যক্ প্রকার যিনি প্রকাশ করেছেন। (তাৎপর্য্য এই যে)  
ভক্তিপর সেবকগণের নিকটেই আমি বশতা স্বীকার করি; জ্ঞানপর জনগণের  
কখনও বশীভূত হই না।”

ভক্তের কাছে ওটা প্রকাশ, অভক্তের নিকট নয়। ‘বুঝিবে রসিকজন, না  
বুঝিবে মূঢ়।’ ভক্তের কাছে তিনি সবটাই প্রকাশ করে দিচ্ছেন, আর অভক্তের  
কাছে চেপে যাচ্ছেন, গোপন করছেন। এটাই ত’ স্বভাব। ভগবানের যে স্বভাব  
ভক্তেরও সেই স্বভাব। ভক্ত কাকেও জানতে দেন না। ভগবান্ জানতে দেন না  
আমি আমার ভক্তকে ভালবাসছি। তাতে ক্ষতি আছে। এ জগতে স্নেহ-মমতার  
লড়াই আছে, আপনারা দেখছেন। ভগবানের রাজ্যও ওটা আছে। পাখির  
জগতে যে স্নেহ-মমতার লড়াই আছে অপাখির জগতেও সেই স্নেহ-মমতার লড়াই  
আছে।

এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছিলেন আমাকে—ভগবান্ ত’ সকলকে সমান  
ভালবাসেন, তাহলে আমরাও ত’ সবাইকে সমান ভালবাসব? আমি বললাম,  
—হবে না ওটা। কেন হবে না? ওর মধ্যে বৈশিষ্ট্য থাকবে, **Speciality**  
থাকবে। এ সংসারেও দেখতে পাওয়া যায়, মাতাপিতার যদি তিন চারটা  
ছেলেমেয়ে থাকে, তাহলেও সকলের প্রতি সমান ভাব থাকে না। কোন  
একটা বিশেষ সন্তান বা কন্যার প্রতি একটু বেশী টান থাকে। কেন?  
—তারা নিশ্চয়ই তাদের সেবাদ্বারা বা ব্যবহারের দ্বারা পিতামাতাকে সন্তুষ্ট  
করেছে। সেজন্য তার প্রতি একটু বিশেষ স্নেহ থাকে। এ সংসারে যেমন  
এটা আছে ভগবানের ক্ষেত্রেও তেমন আছে। ভগবান্ও তার থেকে বাদ  
যাচ্ছেন না।

অর্জুন যখন প্রশ্ন করেছেন—তোমার প্রতি ত’ সকলের সমান ব্যবহার, কখনও  
কখনও দেখা যাচ্ছে যে, বিষম ব্যবহারও তুমি কর। তখন এই মতটা খণ্ডন  
করবার জন্য ভগবান্ও যেন উঠে পড়ে লেগেছেন। তিনি বলেন,—না, না।

“সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বৈত্বোহস্তি ন প্রিয়ঃ।”

আমার সর্বভূতে সমব্যবহার। আমার কেউ দ্বৈতও নয়, কেউ প্রিয়ও নয়।



ওটা বলেও আবার রাশ টেনে রেখেছেন। “যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেযু চাপ্যাহম্ ॥” কিন্তু সর্বজীবে আমার সমান ব্যবহার হলেও আমার যে ছেলেটা, যে মেয়েটা আমার প্রতি বেশী টান টানে, আমিও তার প্রতি একটু বেশী স্নেহ সেখানে থাকে। এটা এড়িয়ে যাওয়ার কোন কথা নেই, এ বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু জগতের লোক সবসময় স্নেহ-মমতার একটা লড়াই নিয়ে চলে। আমি আমার অভিভাবক-অভিভাবিকার স্নেহদৃষ্টি সবথেকে বেশী পেতে চাই। এ জিনিষটা কোন্ ছেলেটা, কোন্ মেয়েটা না চায়? সাধন-ভজনক্ষেত্রেও আমি গুরু-বৈষ্ণবের সব থেকে অধিক স্নেহ-মমতার মধ্যে থাকতে চাই। কোন্ সাধক-সাধিকা এটা না চান? আছে ত’ ব্যাপারটা। সুতরাং এই স্নেহ-প্রীতির লড়াই পার্থিব ও অপার্থিব দুই জগতে আছে, থাকবে। পার্থিব অবস্থায় জড়ীয়, অপার্থিব অবস্থায় এটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আছে, থাকবে।

“ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানপর ভক্তগণকে জ্ঞানান যে, তিনি তাঁহার নিজস্ব ভক্তগণের দ্বারাই সম্যকরূপে বশীভূত হয়ে থাকেন।” তাহলে ভক্ত, অভক্ত বিচার একটা আছে। সব জায়গায় সবটা প্রকাশ করা চলে না। সাধক-সাধিকার ক্ষেত্রেও একটা বিচার আছে। সাধন-সম্পত্তি যখন কোন সাধক-সাধিকা লাভ করছেন, তিনি ওটা কারও কাছে জাহির করেন না, প্রকাশ করেন না, করতেও চান না। কেন? কারণটা কি?—প্রকাশ করলে অত্রে আবার যদি তায় ভাগ বসান, যদি তার সমালোচনা করেন, ক্ষতি হয় সেখানে। ধারা বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমতী তাঁরা ওটা প্রকাশ করবেন না। আবার কোন ভাল জিনিষ কেউ কিছু লাভ করছেন সেটা যদি বলে দেওয়া যায়, তাহলে ওটার আর ক্ষমতা থাকে না। মন্ত্র—গুরুপদিষ্ট মন্ত্র সম্বন্ধে একথা শাস্ত্রে লেখা আছে। ওটা সকলের কাছে বলবেন না। বললে আপনার ক্ষতি হবে। কি ক্ষতি হবে?—মন্ত্রের ফল হবে না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বললেন,—“আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা তথা।” কেন বললেন?—ওর ভিতরেও গোপনীয়তা আছে। সকলের কাছে বলে ফেললে মন্ত্রের ফল থাকবে না। এগুলো Discipline-এর মধ্যে পড়ে, এগুলো মানতে হয়।

আর একটা দিক হচ্ছে—এতে অহঙ্কার আসে, গর্ব্ব, অভিমান আসে। সেজন্ত বলা নিষেধ। জড় দম্ভ, দর্প, অহঙ্কার যদি এসে যায় আমাদের তাহলে সাধনক্ষেত্রে পরাজয়। সে কারণে নিষেধ আছে ওটা বলবে না। লক্ষ লক্ষ টাকা আছে আমার, আমি যদি সকলের কাছে বলি তাহলে চুরি, ডাকাতি হবে। আমার প্রাণনাশের সম্ভাবনা আছে। বুদ্ধিমান্ মহন্ত সেজন্ত ওটা বলবে না।

সাধন-সম্পত্তি ধারা লাভ করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁর সাধন-সম্পত্তি লুকিয়ে রাখবেন, প্রকাশ করবেন না। মুস্কিল আছে। **Musk-deer**—যে-সব হরিণের নাভিতে কতুরী হয়েছে তারা তা জানতে পারে না, বুঝতে পারে না। কিন্তু যখন ওটা **Mature**—পরিণত হয় তখন সমস্ত বন সোঁগন্ধে, সৌরভে ভরপুর হয়ে যায়। বুঝতে পারে একটা লোক—সে হল ব্যাধ। যখন পাগলা হয়ে হরিণটা চারদিকে দৌড়াতে থাকে, সে-সময় ব্যাধ বুঝতে পারে যে এর নাভিতে কতুরী **Mature** করেছে, তখন তাকে মারে। আবার সে নিজেও মরে ব্যাধ না মারলেও। কি রকম?—পাগলের মত যখন দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে তখন সিং-এ লতাপাতা জড়িয়ে পড়ে মারা যায়। অতএব সাধন-সম্পত্তি বলা নিষেধ যেমন, তেমন বললেও বিপদ। সাধন-সম্পত্তি প্রকাশ করতে নেই, প্রকাশ করলে গুয় ফলটা চলে যায়। যে জিনিষটা প্রাপ্তি হল সেটা নষ্ট হয়ে যায়, হারিয়ে যায়। সে কারণে বলা নিষেধ।

বাজারে অনেক মন্ত্রের বই পাওয়া যায়। ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কন্মযোগ, তপস্কার বহু বই, আবার সাঁওতালী বশীকরণ মন্ত্র, কামান্ধ্য-তন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রের বইও আছে। বই কিনলাম, পড়ে নিলাম, পড়ে পড়ে মুখস্থ করে আঙুড়ালাম, কোন ফল হবে না। কিন্তু যার মন্ত্র সিদ্ধি হয়েছে, তার কাছ থেকে সেই মন্ত্র নিয়ে যদি জপ করা যায় তাহলে ফল হবে। সিদ্ধমন্ত্র আলাদা, এটা বুঝবেন। সিদ্ধমন্ত্র অর্থাৎ পরম্পরাক্রমে যে মন্ত্র আসে। একটা বংশপরম্পরা জাগতিক বিচার, আর পারমাথিক ক্ষেত্রে গুরুপরম্পরা। গুরুপরম্পরাক্রমে যেটা আসে তাকে বলে ‘আমায়’।

আমায়: শ্রুতয়: সাক্ষাদ্ভুক্তবিত্তেতি বিস্তৃতা:।

গুরুপরম্পরাপ্রাপ্তা বিশ্বকর্তৃহি ব্রহ্মণ: ॥

গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত যে শিক্ষা, যে বেদবাণী, বেদসংজ্ঞিতা বাণী, তাতে শক্তি নিহিত আছে। **Shakti infused** সেই মন্ত্র জপ করলে সাধনায় সিদ্ধি আসে। অগ্রথায় ফল হবে না।

সাধারণভাবে যে মন্ত্রগুলো আছে তার আবার **Positive** এবং **Negative** দুটো দিক আছে। কেন?—পরীক্ষা করার জন্ত। গুরুদেব মন্ত্র দিচ্ছেন—সেখানে **Positive** মন্ত্র দিলেন একটা, আর **Negative** মন্ত্র দিলেন তিনটে। ঠিক ঠিক কাজ করবে যে মন্ত্রে সে মন্ত্র একটা দিয়েছেন। **Negative** মন্ত্রে কাজ হবে, কিন্তু খারাপ হবে। মন্ত্র দেওয়ার পর বলে দিলেন যে, এই মন্ত্র তুমি কারও কাছে প্রকাশ করবে না। ভাল, খারাপ দুটো তোমাকে বলে দিচ্ছি,

যাতে তুমি সংযত হও। খারাপ মন্ত্ৰটা তুমি কারও কাছে প্রকাশ করবে না। যদি কর তাহলে তাদের ক্ষতি হবে এবং ভাল যে মন্ত্ৰটা তোমাকে দিলাম সেটাও নষ্ট হয়ে যাবে—এ ব্যাপারও আছে। ওটা পরীক্ষা করা হয়। যাকে মন্ত্ৰ দেওয়া হচ্ছে তার ঐশ্বর্য্য-ঐশ্বর্য্য পরীক্ষা করবার জন্য এ নিয়ম আছে। ভাল একটা দেবেন, খারাপ তিনটে দেবেন। যদি তুমি Misuse কর, তাহলে তোমার ভালটাও শেষ, কোন ফল হবে না এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ এক বিচার গেল। আমার মন্ত্ৰের শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার। তার উদাত্ত, অনুদাত্ত যে স্বর আছে, সে স্বর যদি ঠিক না হয় তাহলে মন্ত্ৰের ফল উন্টো হয়ে যাবে। তার প্রমাণ,

ঐষ্টা ঋষির ছেলে বিশ্বরূপের যে অবস্থা হয়েছিল। ইন্দ্র বিশ্বরূপকে খুন করলেন। তাকে যখন গুরুপদে বরণ করেছেন তখন তার মা ছিলেন অশ্বর-পক্ষের। পিতা হচ্ছেন ঋষি। তিনি মন্ত্ৰ যখন পড়ছেন তখন দেবতাগণকে দিচ্ছেন ৭৫% এবং মায়ের পক্ষে (অশ্বরপক্ষে) ২৫% দিচ্ছেন। ইন্দ্র ওটা জানতে পারলেন। দেবতাগণের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে না কেন? এঁরা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? কি ব্যাপার? যজ্ঞের হবি হচ্ছে দেবতাগণের আহার। কম পড়ছে এঁদের ভাগে। তখন ইন্দ্র বিশ্বরূপকে বধ করলেন। ঐষ্টাঋষি তখন খুব ক্রোধান্বিত হলেন—আমার ছেলেকে গুরুপদে বরণ করল দেবতারা আর এর প্রতি এরূপ দুর্ব্যবহার করল। তিনি ঠিক করলেন—ইন্দ্রকে বিনাশ করব। যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। রাগে গর গর করছেন ঐষ্টা ঋষি। মন্ত্ৰ ঠিকমত উচ্চারণ হচ্ছে না। যজ্ঞে আহুতি দিচ্ছেন মন্ত্ৰ বলে। “ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব”—এটা বলছেন। শত্রু-শব্দের পরে যদি জোর পড়ে তাহলে ইন্দ্রের শত্রু জন্মাবে সেই যজ্ঞান্নি থেকে। কিন্তু উচ্চারণ অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ইন্দ্রের পরে জোর হয়ে যাচ্ছে। তার অর্থ ইন্দ্র যার শত্রু হবে সে এই যজ্ঞ থেকে উঠুক। সুতরাং ব্রহ্মাস্ত্রের উৎপত্তি হল। ফলটা উন্টো হয়ে গেল। ইন্দ্রকে যে মারবে সে এই যজ্ঞ থেকে উঠুক—এটা ঐষ্টা ঋষির ইচ্ছা, কিন্তু হয়ে যাচ্ছে উন্টো। উদাত্ত, অনুদাত্ত স্বরের গুণগোল হয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের বিচার দেখাচ্ছেন ঐ উপাধ্যানে,—

মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বা বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তদর্থমাহ।

যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোহপরাধাৎ স বাথজ্ঞো যজমানং হিনস্তীতি ॥

আমি মন্ত্ৰ উচ্চারণ করব, কিন্তু যদি তার স্বরের গুণগোল হয় তাহলে তার অর্থ ঠিক দেবে না, ফলটা ঠিক দেবে না সেই মন্ত্রোচ্চারণে। উদাহরণ—“যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোহপরাধাৎ স বাথজ্ঞো যজমানং হিনস্তীতি ॥” যেমন, ‘ইন্দ্রশত্রুঃ’ এই লাইন

উন্টোকল দিয়ে দিল ‘স্বরতোহপরাধাৎ’-স্বরের গুণগোলের জন্ত, ‘স বাথজো’—সেই বাক্ উন্টো ক্রিয়া করল—যজ্ঞমানকে মারল।

এখন কথা হচ্ছে, মশায়! আমি লেখাপড়া জানি না, সংস্কৃত জানি না, তাহলে কি করে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করব? সেখানে কি করা হবে? সেখানে বিচার রয়েছে—যদি আমার শরণাগতি থাকে, আত্মসমর্পণ থাকে, **Submission** থাকে তাহলে ভগবান্ ঐ দোষটা নেবেন না। কেন?—বাচ্চা ছেলের যে আধো আধো বুলি এটা নিশ্চয় পিতামাতা মেনে নেন, বরং ভালবাসেন। বাচ্চা ছেলেটা আধো আধো স্বরে কি বলছে, কি চাইছে, মাজাপিতা, **Guardian** ধারা, তাঁরা তা বুঝতে পারেন। অত্যা আর পাঁচজন ধারা পাশে আছেন, তাঁরা তা বুঝতে পারেন না। ঠিক তদ্রূপ যে ভগবান্ সর্বভূতান্তর্ধামী, নিখিল বিশ্বান্তর্ধামী যে ভগবান্ অনন্ত বিশ্বে অনন্ত জীবাত্মা সবই তাঁর পুত্র-কন্যা, সবই তাঁর সন্তান। তারা কে কি বলতে চাইছে তা তিনি বুঝে বসে আছেন। বুঝছেন, জানছেন কোন্ ছেলেটা কঁদছে, কেন কঁদছে। কোন্ ছেলেটা চালাকি করে কঁদছে, আর কোন্ ছেলেটা ঠিক ঠিক অন্তর থেকে কঁদছে—এটা তিনি বুঝতে পারেন।

সেখানে বলছেন—‘মূর্খো বদতি বিষ্ণায়’। সংস্কৃত পড়েনি ত’ সে। ‘বিষ্ণায় নমঃ’ বলে ফেলল। বিষ্ণায় ত’ হবে না, ‘বিষ্ণবে নমঃ’ হবে। এখন ভগবান্ কোন্টা নেবেন। একজন খুব সংস্কৃত জানেন, বিভক্তি ইত্যাদি ঠিক করে তিনি মন্ত্রটা বললেন—‘ওঁ বিষ্ণবে নমঃ’। কিন্তু তার ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই। তবে সংস্কৃত উচ্চারণটার উপর খুব জোরদার। ভগবান্ তার দেওয়া ফুল-তুলসী নেবেন, না যে বলেছে ‘বিষ্ণায় নমঃ’, কিন্তু শ্রদ্ধা-ভক্তি তার অটুট, সংস্কৃত পড়েনি সে, তার ফুল-তুলসী গ্রহণ করবেন। ভগবান্ তাহলে কোন্টা গ্রহণ করবেন? তুলনামূলক বিচারস্থলে বলছেন—যাঁর সংস্কৃত ভুল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে, ভগবানের পরে নির্ভরতা আছে, কান্নাকাটি ঠিক আছে, ভগবান্ তার দেওয়া ফুল-তুলসী নেবেন। আর যিনি সংস্কৃত ঠিক করে বললেন, কিন্তু শ্রদ্ধা-ভক্তি নেই, তারটা নেবেন না ভগবান্।

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।

উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনাৰ্দ্দনঃ ॥

তাহলে জনাৰ্দ্দন ভাবগ্রাহী। তিনি বাচ্চা ছেলেমেয়ে কি বলছেন তা বুঝতে পারেন এবং ঠিক সেই অঙ্গসারে ব্যবস্থা নেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি  
নিভ্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতত্ৰী  
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের  
শুভাবির্ভাব-শতবাষিকী

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫২ পৃষ্ঠার পর ]

শ্রীমরোত্তম গৌড়ীয় মঠ (কোচবিহার)

নিশিগঞ্জস্থ শ্রীগৌরপদ মালাকার মহাশয়ের বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া ২১শে বৈশাখ, ১৪০৪ ( ইং ১৮৫১২৭ ) রবিবার বৈষ্ণবগণ বেলা ১০ ঘটিকায় শ্রীসমিতির প্রচারকেন্দ্র শ্রীমরোত্তম গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন। শ্রীমঠে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় স্থানীয় পৌরসভা-কর্তৃক পরিচালিত “পাছ-নিবাস”-এ বৈষ্ণবগণের থাকিবার ব্যবস্থা করা হয়।

কামেশ্বরী রোড-নিবাসী ভক্তপ্রবর শ্রীঅনিল সাহা মহোদয় মধ্যাহ্নে তাঁহার গৃহে বৈষ্ণবসেবার আয়োজন করেন। শুভায় মহাজন-পদাবলী কীর্তন, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি অন্তে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্বক অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় নগর-সঙ্কীর্তন যোগে প্রচারপার্টি কোচবিহারের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করত পশ্চিম খাগড়া-বাড়ীতে শ্রীমঠের জন্ত সংরক্ষিত স্থানে—সভাপ্রাঙ্গনে উপনীত হন। অতঃপর সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় আয়োজিত ধর্মসভায় ব্রহ্মচারিগণ স্থললিত কণ্ঠে মহাজন-পদাবলী কীর্তন করেন। কীর্তনান্তে শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত্রিবিধ মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত্রিবিধ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত্রিবিধ আচার্য মহারাজ “সনাতন-ধর্ম ও শ্রীমন্ন্যাসপ্রভুর অবদান বৈশিষ্ট্য” সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিশেষে শ্রীল সভাপতি মহারাজ তাঁহার স্বভাবস্বলভ ভাবগম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় “শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও তাহার প্রচার-বৈশিষ্ট্য” সম্পর্কে আলোচনা করেন।

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, গোলকগঞ্জ (ধুবড়ী) আসাম

২২শে বৈশাখ, ১৪০৪ ( ইং ১৮৫১২৭ ) সোমবার কোচবিহার হইতে বাসযোগে প্রচারপার্টি বেলা ২ ঘটিকায় শ্রীসমিতির অগ্রতম প্রচারকেন্দ্র তথা শ্রীশ্রী প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি মহারাজের স্বহস্ত-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিলে পর মঠরক্ষক ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত্রিবিধ মহারাজ ও ভক্তবৃন্দ

সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। শিলিগুড়ি হইতে ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত ত্রিদিগ্বী মহারাজও সদলবলে শ্রীমঠে উপস্থিত হন।

অপরায় ০ ঘটিকায় সুসজ্জিত গাড়ীতে শ্রীশ্রীল ভক্তিব্রজান কেশব গোস্বামী মহারাজের অর্চালৈখ্য লইয়া শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল, করতাল ও ব্যাণ্ডযোগে এক বিশাল বর্ণাঢ্য নগর-সঙ্কীর্তন শোভাযাত্রা গোলোকগঞ্জ শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেন। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় গোলকগঞ্জ বাজারের ধানহাটী প্রাঙ্গনে অহুষ্ঠিত মহতী ধর্মসভায় ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত ত্রিদিগ্বী মহারাজ, শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ, শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ প্রমুখ বক্তৃৎস্বন্দ “শ্রীশ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের অতিমর্ত্য চরিত্র” সম্পর্কে আলোচনা করেন।

পরদিবস অর্থাৎ ২০শে বৈশাখ (ইং ৬।৫।২৭), মঙ্গলবার বেলা ৮ ঘটিকায় পুনরায় নগর-সঙ্কীর্তন করা হয়। অল্প ১০-৩০ ঘটিকায় শিলিগুড়ি হইতে শ্রীমমিত্তির সভাপতি-আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ শুভবিজয় করিলে পর মঠবাসী এবং উপস্থিত সকল ভক্তবৃন্দ তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। বহুদিন অপেক্ষার পর শ্রীশ্রুৎপাদ-পদ্মকে পাইয়া ভক্তগণ তাঁহাদের হৃদয়ের আতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শ্রীশ্রুৎপাদপদ্মে।

বৈকাল ৫ ঘটিকায় ধানহাটী প্রাঙ্গনে অহুষ্ঠিত সভায় ব্রহ্মচারীবৃন্দ বিভিন্ন মহাজন পদাবলী কীর্তন করেন। কীর্তনান্তে শ্রীশ্রীমন্ত্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। অনন্তর ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, প্রধান অতিথি—শ্রীযুত জীবেশচন্দ্র প্রধানী (প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, জগমোহন বিদ্যাপীঠ) ও শ্রীযুত বীরেন্দ্র চন্দ্র প্রধানী (প্রবক্তা চিলারায় মহাবিদ্যালয়) অসমীয়া ভাষায় “বর্তমান পরিস্থিতি এবং ধর্মের প্রয়োজনীয়তা” বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিশেষে শ্রীল সভাপতি মহারাজ বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও ধর্মই একমাত্র উদ্ধৃত সমস্যার সমাধান-সূত্র বিষয়ে শাস্ত্রীয় তত্ত্ব, তথ্য ও যুক্তি-সিদ্ধান্তপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার ভাষণ শ্রবণ করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন।

দিবসব্যয় শ্রীমঠে প্রায় দ্বি-সহস্রাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ দান করা হয়।

শ্রীনিমানন্দ গোড়ীয় মঠ, ধুবড়ী ( আসাম )

## নবনির্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অশেষ অনুমোদনায় তাঁহারই শুভাবির্ভাব-শতবাধিকীর পূর্ণাঙ্গনে তৎপ্রতিষ্ঠিত শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আহুগত্যে আসাম প্রদেশের ধুবড়ী-শহরস্থ শ্রীনিমানন্দ গোড়ীয় মঠে গত ২৬শে বৈশাখ, ১৪০৪ ( ইং ৩।৫।২৭ ), শুক্রবার অক্ষয়-তৃতীয়া-তিথিতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরান্দ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইলেন ।



এতদ্ব্যপেক্ষে ২৪শে বৈশাখ, বুধবার ও ২৫শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার দিবসদ্বয় বৈকাল ৪ ঘটিকায় শ্রীসমিতির বিভিন্ন প্রচারকেন্দ্র হইতে আগত সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-বৃন্দ ও শতবাধিকী-প্রচারপার্টির এক বিশাল বর্ণাঢ্য নগর-সঙ্কীর্ণন শোভাযাত্রা ধুবড়ী

শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেন। বাঁকর-কাঁসর, খোল-করতাল, শঙ্খধ্বনি ও ব্যাণ্ডসহযোগে মহামন্ত্রের উচ্চনিাদে সমগ্র শহর ও শহরবাসিগণ উচ্ছ্বসিত হইতে থাকেন। শোভাযাত্রার শোভা ও জনসমুদ্র দর্শন করিয়া শহরবাসিগণ মন্তব্য করিতে থাকেন,—“ধুবড়ী শহরে বহু সম্প্রদায়ের নগর-সঙ্কীর্তন শোভাযাত্রা আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু গোড়ীয় মঠের এ ধরনের অভূতপূর্ব এবং উৎসাহ-উদ্বীপনাপূর্ণ শোভাযাত্রা ইতঃপূর্বে আমরা কখনও দর্শন করি নাই।”

পরিক্রমাস্তে সন্ধ্যায় শ্রীমঠে আয়োজিত ধর্মসভায় ২৪শে বৈশাখ, বুধবার “শ্রীমন্তাগবতোক্ত কলিযুগ-ধর্ম বর্ণন প্রসঙ্গে ধর্মসভার শুভ উদ্বোধন ও উদ্বোধন” ব্যাখ্যা করেন শ্রীমন্তজিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ, শ্রীমন্তজিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ ও শ্রীমন্তজিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ।

২৫শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার অধিবাস-দিবসের শুভসূচনায় কাঞ্চগণ পরমোল্লাসে প্রাতঃকাল হইতেই বিবিধ রঙ্গিন কাগজ, বস্ত্রাদিনির্মিত পতাকা, আশ্রপল্লব, পূর্ণকুন্তসহ কদলীবৃক্ষ, পুষ্পমালাদিদ্বারা শ্রীমন্দিরসহ উৎসব-প্রাঙ্গন ও প্রবেশদ্বার সজ্জিত করিতে থাকেন। অপরদিকে বৈষ্ণব পুরোহিতগণ পরমোৎসাহে শ্রীবিগ্রহের সেবাপীঠ সংস্থাপন করেন।

সন্ধ্যায় আরাত্রিকাস্তে ত্রিদিগ্ভিমামী শ্রীমন্তজিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীমন্তজিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ, শ্রীমন্তজিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমন্তজিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ ও প্রধান অতিথি—শ্রীকালীন্দ্রনাথ নাথ (প্রাক্তন অধ্যক্ষ—বি, এন, কলেজ, ধুবড়ী) মহোদয় “শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য শ্রীমন্তজিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অতিমর্ত্য চারিত্র ও শ্রীব্রহ্ম-মাধব-গোড়ীয়-সারস্বত ভক্তিধারা প্রবর্তনের ঐতিহাসিক ভূমিকা” বিষয়ে আলোচনা করেন।

বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-দিবসে অর্থাৎ ২৬শে বৈশাখ, শুক্রবার প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় নগর-সঙ্কীর্তনযোগে কুমারী কল্যাণ ব্রহ্মপুত্র হইতে ১০৮ কলস পবিত্রোদক লইয়া আসেন। তৎপরে শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা কার্য্য আরম্ভ হয়। পুরুষস্বত্বাদি বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ ও নামাবতারের সঙ্কীর্তনার্চন-সহযোগে পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, গঙ্গা-যমুনা এবং বিভিন্ন তীর্থের ১০৮ ঘটপূর্ণ জলদ্বারা অর্চাবতারের অভিব্যেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তদনন্তর শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, ভোগরাগ এবং আরাত্রিকাদি ক্রমাহুসারে সূচুভাবে সম্পন্ন হইলে সমাগত প্রায় ত্রিশহস্রাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দান করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকাস্তে শ্রীশ্রী আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে বিরাট ধর্মসভা আয়োজিত



হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি শ্রী এল, সি, সিংহী (D. C. Dhubri Dist.) শ্রীনিমানন্দ গোড়ীয় মঠ নির্মাণ সমিতির সাধারণ-সম্পাদক শ্রীনিখিলচন্দ্র রায়, শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী (সুইজারল্যান্ড), পরম পূজাপাদ ত্রিদিগন্তস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিদিগন্তী মহারাজ, শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত মধুসূদন মহারাজ, শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ “শ্রীবিগ্রহসেবা ও ভাগবত-ধর্ম (সনাতন ধর্ম)” সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর শ্রীল সভাপতি মহারাজ শ্রীনিমানন্দ গোড়ীয় মঠ বাহার নামানুসারে হইয়াছে সেই শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ সম্প্রদায় বৈভবাচাৰ্য্য প্রভুর অতিমর্ত্য চরিত্র ও শ্রীবিগ্রহসেবা এবং ভাগবত ধর্ম প্রসঙ্গে তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণের জগু শ্রোতৃমণ্ডলী অধীর আগ্রহে রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্যন্ত সভাপ্রাঙ্গনে অপেক্ষমান ছিলেন।

২৭শে বৈশাখ, শনিবার ( ইং ১০।৫।২৭ ) অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় ব্রহ্মচারিগণ ও স্থানীয় অসমীয়া ভক্তগণ অসমীয়া, বাংলা ও হিন্দী ভাষায় মহাজন-পদাবলী কীৰ্ত্তন করেন। কীৰ্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীল আচাৰ্য্যদেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলে পর প্রধান অতিথি শ্রী এম, কে, নাগ (A. D. C. Dhubri Dist. ও বর্তমান মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের Administrator), শ্রীদীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য (শ্রীনিমানন্দ গোড়ীয় মঠ নির্মাণ-সমিতির সভাপতি), শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত আচাৰ্য্য মহারাজ, শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত পুরী মহারাজ, শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ, শ্রীরঘুনন্দন ব্রহ্মচারী প্রমুখ বক্তৃগণ “শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অবদান” সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। তদনন্তর শ্রীশ্রীল সভাপতি মহারাজ আলোচ্য বিষয়ে স্মৃতিপূর্ণ বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানান যে,—শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রদত্ত শিক্ষা এবং পথই বর্তমান বিশ্বের উদ্ধৃত সমস্ত সমাধানের একমাত্র উপায়। তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত শ্রীনাম-কীৰ্ত্তনদ্বারাই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবা ও তাঁহাদের আত্মগত্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদন সম্ভব। ইহাই কলিহত জীবের একমাত্র আত্মকল্যাণের পথ।

পরিশেষে এই শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীসমিতির তথা শ্রীনিমানন্দ গোড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ, শ্রীমঠ-নির্মাণ-সমিতির সদস্যবৃন্দ, আত্মকল্যাণকারী সুধী ভক্তবৃন্দ ও প্রশাসন বিভাগের সহযোগিতা বিশেষ প্রশংসার্হ। তাঁহাদের এইরূপ সহযোগিতার জগু শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

নিজস্ব-সংবাদ



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।

অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিরশূন্য ॥

অন্ত ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।

হরি-কথায় রতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

৪২শ বর্ষ	}	<p>২৮ শ্রীধর, বাহুদেব, ৫১১ শ্রীগোরাঙ্গ ৩২ শ্রাবণ, রবিবার, ১৪০৪, ইং ১৭/৮/২৭</p>	{	৬ষ্ঠ সংখ্যা
----------	---	--	---	-------------

সামুবাদং

## শ্রীদশমূল-শ্লোকাঃ

[ জগদ্বগুরু-শ্রীল-সক্তিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-কৃতাঃ ]

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্বশক্তিং রসাদ্বিৎ

ভক্তিমাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাং ।

ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং

সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেতু্যপদিশতি জনান্ গোরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ ॥ ১ ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমদ্গোরাঙ্গ প্রদ্যাবান্ জীবগণকে দশটি তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন,  
—গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত বেদবাক্যই আম্নায় । বেদ ও তদনুগত শ্রীমদ্ভাগবতাদি  
বৃত্তিশাস্ত্র ভবা তদনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণই প্রমাণ । সেই প্রমাণদ্বারা স্থির  
হয় যে, শ্রীহরিই পরম তত্ত্ব, তিনি সর্বশক্তিসম্পন্ন, তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু ;

মুক্ত ও বদ্ধ—দুই প্রকার জীবই তাঁহার বিভিন্নাংশ ; বদ্ধজীব মায়াশ্রুত ও মুক্তজীব মায়ামুক্ত ; চিদচিং সমস্ত বিষয়ই শ্রীহরির অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রকাশ ; ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং শ্রীকৃষ্ণপীতিই সাধ্যবস্তু ॥ ১ ॥

স্বতঃসিদ্ধো বেদো হরিদয়িত-বেধঃ প্রভৃতিতঃ

প্রমাণং সংপ্রাপ্তং প্রমিতি-বিষয়ান্ তান্নববিধান্ ।

তথা প্রত্যক্ষাদি-প্রমিতিসহিতং সাধয়তি নঃ

ন যুক্তিস্তর্কাখ্যা প্রবিশতি তথা শক্তিরহিতা ॥ ২ ॥

শ্রীহরির রূপাপাত্র ব্রহ্মাদিক্রমে সম্প্রদায়ে যে স্বতঃসিদ্ধ বেদ পাওয়া গিয়াছে, সেই আশ্রয়বাক্য তদনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহচর্যে নববিধ প্রমেয়-তত্ত্বকে সাধন করেন । যে যুক্তিতে কেবল তর্ক, সেই যুক্তি অচিন্ত্য বিষয়-বিচারে অক্ষয়, অতএব তর্ক সেই বিচারে প্রবেশ করিতে পারে না ॥ ২ ॥

হরিস্বৈকং তত্ত্বং বিধি-শিব-সুরেশ-প্রণমিতঃ

যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতি-রহিতং তত্ত্বমহং ।

পরাত্মা তস্যংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ

স বৈ রাধাকান্তো নবজলদকাস্তিশ্চিদহঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র-প্রণমিত শ্রীহরিরই একমাত্র পরমতত্ত্ব । শক্তিশূন্য নিক্রিশেষ যে ব্রহ্ম, তিনি শ্রীহরির অঙ্গকাস্তিমাাত্র । জগৎকর্তা জগৎপ্রবিষ্ট যে পরমাত্মা, তিনি শ্রীহরির অংশমাাত্র । সেই শ্রীহরিরই আমাদের নবনীরদকাস্তি চিংস্বরূপ শ্রীরাধাবল্লভ ॥ ৩ ॥

পরাত্মায়াঃ শক্তেরপৃথগপি স স্মে মহিমনি

স্থিতো জীবাত্মাং স্বামচিদভিহিতাং তাং ত্রিপদিকাম্ ।

স্বতন্ত্রেচ্ছাশক্তি সকলবিষয়ে প্রেরণপরঃ

বিকারাত্তৈঃ শূণ্যঃ পরমপুরুষোহয়ং বিজয়তে ॥ ৪ ॥

তাঁহার অচিন্ত্যপরাশক্তি হইতে তিনি অভিন্ন হইয়াও স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় । সেই পরমপুরুষ স্বমহিমাস্বরূপে নিত্য অবস্থিত । জীবশক্তি, চিহ্নশক্তি ও মায়াশক্তিরূপ-ত্রিপদিক শক্তিকে উপযুক্ত বিষয়-বাপারে সর্বদা প্রেরণ করিতেছেন । তাহা করিয়াও স্বয়ং নিক্রিকার পরমতত্ত্বস্বরূপ ভগবান্ পূর্ণরূপে নিত্য বিরাজমান ॥ ৪ ॥

স বৈ হলাদিদ্বায়াঃ প্রণয়বিকৃতেহ্লাদিনরতঃ

তথা সস্বচ্ছক্তি-প্রকটিত-রহোভাব-রসিতঃ ।

তয়া ত্রীসঙ্কিষ্ঠা কৃতবিশদতদ্ধামনিচয়ে

রসাস্তোদৌ মগ্নো ব্রজরসবিলাসী বিজয়তে ॥ ৫ ॥

স্বরূপশক্তির তিনটি প্রভাব—হ্লাদিনী, সখিৎ ও সন্ধিনী। হ্লাদিনীর প্রণয়-বিকারে কৃষ্ণ সর্বদা অম্লরক্ত এবং সখিচ্ছক্তি-প্রকটিত অন্তরঙ্গভাবদ্বারা সর্বদা রসিত-স্বভাব। সন্ধিনীশক্তি-প্রকটিত নির্মল বৃন্দাবনাদিধামে নিত্য রসমাগরে মগ্ন সেই স্বেচ্ছাময় ব্রজরসবিলাসী কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ॥ ৫ ॥

ফুলিঙ্গাঃ ঋদ্ধাগ্নেয়িব চিদণবো জীবনিচয়াঃ

হরেঃ সূর্য্যাসৌবাপৃথগপি তু তন্ত্বেদবিষয়াঃ ।

বশে মায়া যস্য প্রকৃতিপতিরবেশ্বর ইহ

স জীবো মুক্তোহপি প্রকৃতিবশযোগ্যঃ স্বগুণতঃ ॥ ৬ ॥

জলন্ত অগ্নি হইতে যেরূপ বিস্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, সেইরূপ চিৎসূর্য্যস্বরূপ ত্রীহরির কিরণ-কণস্থানীয় চিৎপরমাত্মস্বরূপ অনন্ত জীব। ত্রীহরি হইতে অপৃথক হইয়াও জীবসকল নিতাপৃথক। মায়াশক্তি দ্বাংহার নিত্য বশীভূতা ও যিনি স্বভাবতঃ প্রকৃতির অধীশ্বর, তিনি ঈশ্বর; যিনি মুক্ত-অবস্থাতেও স্বভাবাত্মসারে মায়াপ্রকৃতির বশযোগ্য, তিনি জীব ॥ ৬ ॥

স্বরূপার্থেহীনান্ নিজস্বখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্

হরের্মায়্যা দণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি ।

তথা শুলের্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধাবরণৈঃ ক্লেশনিকরৈ-

র্মহা-কর্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গনিরয়ো ॥ ৭ ॥

স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণাঙ্গত দাস। সেই স্বরূপহীন, নিজস্বখপর, কৃষ্ণবিমুখ, দণ্ড্য জীবসকলকে মায়াশক্তি সত্ত্বরজন্তুমোঞ্চ-নিগড়সমূহদ্বারা কবলিত করেন। শূল ও লিঙ্গদেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্লেশসমূহে পরিপূর্ণ কৰ্মবন্ধনের দ্বারা তাহাদিগকে নিপতিত করিয়া কখনও স্বর্গে এবং কখনও নরকে লইয়া বেড়ান ॥ ৭ ॥

যদা ভ্রামং ভ্রামং হরিরস-গলদ্বৈক্ষ্যবজ্রং

কদাচিৎ সংপশ্যন্ তদভুগমনে স্যাদ্ রুচিরিহ ।

তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্মায়িকদশাং

স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং স কুরুতে ॥ ৮ ॥

সংসারে উচ্চাচ ঘোনিসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন হরিরস-বিগলিত বৈষ্ণবের দর্শন হয়, তখন মায়াবদ্ধ জীবের বৈষ্ণবাত্মগমনে রুচি জন্মে

কৃষ্ণনামাদি আবৃত্তিক্রমে অল্পে অল্পে মায়িক-দশা দূর হইতে থাকে—জীব ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করত বিমল কৃষ্ণসেবারস ভোগ করিতে যোগ্য হন ॥ ৮ ॥

হরেঃ শক্তেঃ সর্বং চিদচিদখিলং স্যাৎ পরিণতিঃ

বিবর্তং নো সত্যং শ্রুতিমত-বিরুদ্ধং কলিমলম্ ।

হরের্ভেদাভেদৌ শ্রুতিবিহিততত্ত্বং সুবিমলং

ততঃ প্রেমঃ সিদ্ধির্ভবতি নিতরাং নিত্য-বিষয়ে ॥ ৯ ॥

সমস্ত চিং-অচিং জগৎ কৃষ্ণশক্তির পরিণতি ; বিবর্তবাদ সত্য নহে—তাহা কলিষুগের মল ও শ্রুতিজ্ঞানবিরুদ্ধ ; অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বই শ্রুতিসম্মত সুবিমল তত্ত্ব—তাহা হইতে সর্বদা নিত্যতত্ত্বে প্রেমসিদ্ধি হয় ॥ ৯ ॥

শ্রুতিঃ কৃষ্ণাখ্যানং স্মরণ-নতি-পূজাবিধিগণাঃ

তথা দাস্যং সখ্যং পরিচরণমপ্যাশ্রদদনম্ ।

নবান্নাগ্নোতানীহ বিধিগত-ভক্তেরহুদিনং

ভজন্ শ্রদ্ধাযুক্তঃ সুবিমলরতিং বৈ স লভতে ॥ ১০ ॥

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্ত, সখ্য ও আশ্রয়নিবেদন—এই নববিধা বৈধীভুক্তি যিনি শ্রদ্ধাসহকারে অহুদিন অহুশীলন করেন, তিনি বিমল কৃষ্ণরতি প্রাপ্ত হন ॥ ১০ ॥

স্বরূপাবস্থানে মধুররস-ভাবোদয় ইহ

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-স্বজনজনভাবং হৃদি বহন্ ।

পরানন্দে প্রীতিং জগদতুলসম্পৎ সুখমহো

বিলাসাখে তত্ত্ব পরমপরিচর্যাং স লভতে ॥ ১১ ॥

সাধনভক্তির পরিপক্বাবস্থায় জীব যখন স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হয়, তখন হ্লাদিনীশক্তিবলে মধুররসে ভাবোদয় হয়—ব্রজে রাধাকৃষ্ণের স্বজনগণের অঙ্গুগত ভাব হৃদয়ে উদ্ভিত হয় ; ক্রমশঃ পরানন্দতত্ত্বে জগতের মধ্যে অতুল সম্পদস্বত্ব ও বিলাসাখ্যতত্ত্বে পরমপরিচর্যা লাভ হয়—ইহাপেক্ষা জীবের আর লাভ নাই ॥ ১১ ॥

প্রভুঃ কঃ কো জীবঃ কথমিদমচিদ্বিশ্বমিতি বা

বিচায়ে্যতানর্থান্ হরিভজন-কৃচ্ছ্রাস্তচতুরঃ ।

অভেদাশাং ধর্মান্ সকলমপরাধং পরিহরন্

হরের্নামানন্দং পিবতি হরিদাসো হরিজনৈঃ ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণ কে? আমি জীবই বা কে? এই অচিৎ বিখই বা কি? এইসকল বিষয় বিচারপূর্বক হরিভজনশীল শাস্ত্রচতুর ব্যক্তি অভেদাশা, সমস্ত ধর্মার্থ ও সকলপ্রকার অপরাধ পরিহার করত হরিজনসঙ্গে হরিদাস-স্বরূপে হরিনামানন্দ পান করিতে থাকেন ॥ ১২ ॥

সংসেব্য দশমূলং বৈ হিত্বাহবিভ্যাময়ং জনঃ ।

ভাবপুষ্টিং তথা তুষ্টিং লভতে সাধুসঙ্গতঃ ॥ ১৩ ॥

এই দশমূল সেবন করত জীব অবিভ্যাহর আময় ধ্বংসপূর্বক সাধুসঙ্গদ্বারা ভাবপুষ্টি ও তুষ্টি লাভ করেন ॥ ১৩ ॥

## প্রশ্নোত্তর

### নামাপরাধ

১। নামাপরাধের গুরুত্ব কতদূর?

“নাম যেক্রপ সর্বোত্তম তত্ত্ব, নামাপরাধ সেইরূপ সকল-প্রকার পাপ ও অপরাধ অপেক্ষা কঠিন। সর্বপ্রকার পাপ ও অপরাধ নামাশ্রয়-মাত্রেই দূর হয়; নামাপরাধ তত সহজে যায় না।”

—জৈ: ধ: ২৪শ অ:

২। কোনও প্রকার পাপের সহিত নামাপরাধের তুলনা হয় কি?

“পঞ্চবিধ পাপ কোটিগুণিত হইলেও নামাপরাধের তুল্য হয় না।”

—জৈ: ধ: ২৫শ অ:

৩। অপরাধ পরিত্যাগে যত্ন না করিয়া নাম গ্রহণের অভিনয়ে নামের ফল পাওয়া যায় কি?

“নামাভাস ও নামের ভেদ না বুঝিয়া অনেকে মনে করেন যে, নাম—অক্ষরময়। অতএব শ্রদ্ধা না করিয়া নামাদি গ্রহণ করিলেও ফল হইবে। তাঁহারা অজ্ঞ-মিলের ইতিহাস ও ‘সাক্ষেত্যং পারিহাস্যং বা’ ইত্যাদি শাস্ত্র-বচনের উদাহরণ দেন। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, নাম—চৈতন্তরসবিগ্রহ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। সে-স্থলে নিরপরাধে নামরস আশ্রয় না করিলে নামের ফলোদয় সম্ভব হয় না। শ্রদ্ধাবিহীন লোকের নাম উচ্চারণ করার ফল এই যে, পরে সশ্রদ্ধ নাম হইতে পারে। অতএব দুষ্টরূপে অর্থবাদ করিয়া নামকে জড়াত্মক অক্ষর-স্বরূপে বাহারা কণ্ঠকাণ্ডের অঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা নিতান্ত বহিস্মৃৎ ও নামাপরাধী।”

—শ্রীহরিনাম

৪। অবৈধ যোষিংকে নামাশ্রিত করিবার অভিনয় করিয়া নাম-বলে যোষিং-সঙ্গের স্থযোগ করিয়া লওয়া কি নামাপরাধ নহে ?

“কোনও ভিক্ষুদ্বাশ্রমগত বৈষ্ণব-পুরুষ কোনও সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া লোভ করিলেন। অবশেষে পাপপ্রবৃত্তিদ্বারা চালিত হইয়া এই স্থির করিলেন—‘যখন আমি নিরন্তর হরিনাম করি, তখন ঐ যুবতীকে হরিনাম-শিষ্ট করিয়া তাহার সেবা গ্রহণ করিলে যে কিছু পাপ হইবে, তাহা উভয়ের কৃত হরিনামে অবশ্যই ক্ষয় হইবে ; বিশেষতঃ ঐ স্ত্রীলোক বৈষ্ণবী হইল, বৈষ্ণব-সঙ্গ—দুর্ভাগ ; আবার উহার সঙ্গে গোপীভাবেরও অনেক শিক্ষা হইবে ; এরূপ দুর্ভাগ-সঙ্গ কোথায় পাওয়া যায় ?’—এই মনে করিয়া সেই স্ত্রীকে বৈষ্ণবী করিয়া বৈষ্ণবসেবা গ্রহণ করিলেন। এস্থলে নামাপরাধের পরাকাষ্ঠা হইল।”

—‘নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটা নামাপরাধ’, স: তো: ৮৯

৫। হরিনাম শীঘ্র ফলজনক না হইবার কারণ কি ?

“সেই সর্বশক্তিসম্পন্ন নাম দেহ, গেহ, অর্থ, জনতা, লোভ প্রভৃতি পাষণ্ডমধ্যে পতিত হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না। এই প্রতিবন্ধক দুই প্রকার অর্থাৎ সামান্য ও বৃহৎ। সামান্য প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম ‘নামাতাস’ হয়, কিছু কিছু বিলম্বে ফলদান করে ; বৃহৎ প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম ‘নামাপরাধ’ হয়, তাহা অবিশ্রান্ত নামোচ্চারণ ব্যতীত বিগত হয় না।” —জৈ: ধ: ২৪শ অ:

৬। অনন্তভক্তিহীন ব্যক্তির লক্ষণ কি ?

“শুদ্ধ বৈষ্ণবের অনাদর, অসৎসঙ্গ অর্থাৎ অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ও অভক্তসঙ্গ, গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, ভক্তিশাস্ত্রের নিন্দা, নাম-নামীতে ভেদ-জ্ঞান, অগ্র্য শুভ কর্মের সহিত নামের সাম্য, জড় দেহের অহংতা-মমতাবশতঃ নামে প্রীতির থর্বতা, নাম-বলে পাপাচরণ প্রভৃতি যে-সকল ভক্তি-বিরুদ্ধ আচার নিন্দিত আছে, তাহা যে ব্যক্তিতে দেখা যাইবে, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণে অনন্ত ভক্তি লাভ করিয়াছেন—এরূপ বলা যায় না।”

—‘কুটীনাট্য’, স: তো: ৬৭

৭। দশবিধ নামাপরাধ কি কি ?

“নামাপরাধ দশবিধ—(১) সাধুনিন্দা—তঁাহারা একান্তভাবে নামাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিন্দা বা দ্বেষ করা। তাঁহারা কেবল নাম-তত্ত্বই জানেন, জ্ঞান-যোগ প্রভৃতি কিছুই জানেন না, এরূপ মনে করিয়া তাঁহাদিগকে অবহেলা করিলেও অপরাধ হয়। (২) দেবাস্তরে স্বতন্ত্র-জ্ঞান—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, সর্বেশ্বর, অগ্র্যাত্ম দেব-দেবী তাঁহার বিধিকর, কৃষ্ণকে ভজন করিলেই অগ্র্যাত্ম দেবদেবীর ভজন হয়—এইরূপ স্বতন্ত্র-শক্তি-সিদ্ধ বহু ঈশ্বর কল্পনা

করিলে নামাপরাধ হয়। (৩) গুরুবজ্ঞা—যিনি নামতত্ত্বের সর্বোৎকর্ষতা শিক্ষা দেন, তিনি নামগুরু। যদি মনে করা যায়, তিনি নাম-শাস্ত্রেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন, অল্প সাধন-বিষয়ে কিছুই জানেন না, তাহা হইলেই অপরাধ হয়। সকল কর্মের চরমফল নামতত্ত্ব লাভ, তাহা বাঁহার হইয়াছে, তাঁহার অল্প কিছুই প্রয়োজন নাই। কিছু জানিতেও তাঁহার বাকী নাই। (৪) শ্রুতিনিন্দা—বেদে নামের অনেক মাহাত্ম্য বলিয়াছেন, সেই সমস্ত নাম-মাহাত্ম্যসূচক বেদ-বাক্যে অবিশ্বাসমূলক দ্বেষভাব বহন করিলে নামাপরাধ হয়। (৫) হরিনামে অর্থবাদ—অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ, হরি প্রভৃতি নাম কল্পিত, ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-কর্ম নাই—এইরূপ মনে ভাবিলে অপরাধ হয়। (৬) নাম-বলে পাপ—নাম করিলে পাপ থাকিবে না, অথবা নাম করিতে করিতে ক্রমশঃ চিন্তা শুদ্ধ হইয়া আর পাপে রুচি থাকিবে না, আপাততঃ স্বার্থের জন্ত একটি পাপ করিয়া লই, এইরূপ নামের ভরসায় যে পাপ করা যায়, তাহা বড় কঠিন অপরাধ। (৭) শুভকর্ষনামা—অর্থাৎ ধর্ম, ব্রত, তপঃ প্রভৃতি যেরূপ শুভকর্ম, নামও তদ্রূপ একটি শুভকর্ম-বিশেষ, অতএব কোন একটি শুভকর্ম আশ্রয় করিলে আত্মশুদ্ধি হইতে পারে, এইরূপ মনে করিয়া নাম আশ্রয় না করা অপরাধ। (৮) প্রমাদ—নামে অনবধান, অর্থাৎ উদাসীন্য, জাড্য ও বিক্ষিপ্ত থাকিলে প্রমাদাপরাধ হয়। নামগ্রহণকালে নামের প্রতি উদাসীন হইয়া মুখে নাম ও মনে নানারূপ বিষয় চিন্তা করাই উদাসীন্য, নামগ্রহণে অরুচি এবং কতক্ষণে সংখ্যা নাম শেষ হইবে, এইরূপ মনে করিয়া বারম্বার জপমালার স্মরণ-প্রতি কটাক্ষপাত প্রভৃতি জাড্যের লক্ষণ। প্রতিষ্ঠাশা বা শাঠ্য-বশবর্তী হইয়া নাম গ্রহণই বিক্ষিপ্ত। (৯) অজ্ঞ অশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে নাম-মন্ত্র-দান—অজ্ঞ ও অশ্রদ্ধজনের নিকট নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া, নামে তাহার বিশ্বাস হইলে তবে তাহাকে নাম-মন্ত্র প্রদান করা উচিত। সামান্য অর্থলোভে অযোগ্য শিশুকে নাম দিলে গুরু অপরাধে অধঃপতিত হন। (১০) ‘অহং মম’ ভাব—নাম মাহাত্ম্য জানিয়া শুনিয়াও বিষয়াসক্তির আধিক্যবশতঃ নাম-ভজনে প্রবৃত্ত না হওয়া বিশেষ অপরাধ। এই দশবিধ নামাপরাধ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্তন করিলে নামের ফলে প্রেমলাভ হয়।”

—‘বিশুদ্ধভজন’, সঃ তোঃ ১১।৭

৮। প্রথম নামাপরাধের স্বরূপ কি ?

“প্রথম অপরাধ এই যে, যে-সকল সাধু একমাত্র নাম আশ্রয় করিয়াছেন এবং সমস্ত কর্ম, ধর্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিন্দা করিলে বৃহদপরাধ হয়; কেননা, বাঁহার নামের যথার্থ মাহাত্ম্য জগতে বিস্তার



করিতেছেন, তাঁহাদের নিন্দা হরিনাম সহিতে পারেন না। নামাপরাধ সাধুদিগের নিন্দা পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাদিগকেই সর্বোত্তম সাধু বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে নাম-কীৰ্ত্তন করিলে নামের শীঘ্র কুণা হয়।”

—ভৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

২। দ্বিতীয় নামাপরাধের কয়টি ভেদ ?

“দ্বিতীয় অপরাধের ব্যাখ্যা দুই প্রকার—প্রথম প্রকার এই যে, দেবাগ্রগণ্য সদাশিব ও শ্রীবিষ্ণু ইহাদের গুণ-নামাদি সকলই বুদ্ধিদ্বারা পৃথকরূপে দেখিলে নামাপরাধ হয়; তাৎপর্য্য এই যে, সদাশিব একটা পৃথক্ স্বতন্ত্র-শক্তিসিদ্ধ ঈশ্বর—এবং বিষ্ণু একটা পৃথক্ ঈশ্বর—এরূপ কল্পনা করিলে বহুশ্বরবাদ আসিয়া পড়ে, তাহাতে ভগবানের প্রতি অনন্ত-ভক্তির বাধা জন্মে, অতএব শ্রীকৃষ্ণই সর্বেশ্বর এবং তাঁহার শক্তি হইতেই শিবাদি দেবতার ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ সেই সেই দেবতার পৃথক্ শক্তি-সিদ্ধতা নাই, এইরূপ বুদ্ধির সহিত হরিনাম করিলে অপরাধ হয় না। দ্বিতীয় অর্থ এই যে—শিবস্বরূপ অর্থাৎ সর্বমঙ্গল-স্বরূপ শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে তাঁহার নিত্যগুণ বিগ্রহ হইতে পৃথক্ বলিয়া দেখিলে নামাপরাধ হয়। অতএব কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা—সকলই অপ্ৰাকৃত ও পরম্পর অপৃথক্, এরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণনাম করিবে, নতুবা নামাপরাধ হইবে। এইরূপে সম্বন্ধ-জ্ঞানলাভ করত কৃষ্ণনাম করিবার বিধি।”

—ভৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

১০। তৃতীয় নামাপরাধ—গুরুবজ্জার লক্ষণ কি ?

“নামগুরুর প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা করেন যে, তিনি নামশাস্ত্রই অবগত আছেন মাত্র, কিন্তু ঋহাংরা বেদান্ত-দর্শনাদি অধিক জানেন, তাঁহারা নাম-শাস্ত্র-গুরু অপেক্ষা শাস্ত্রার্থ অধিক অবগত; তিনি নামাপরাধী। বস্তুতঃ নামতত্ত্ববিদ গুরু অপেক্ষা আর উচ্চ গুরু নাই, তাঁহাকে তদ্রূপ লঘু মনে করিলে নামাপরাধ হইবে।”

—ভৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

১১। শ্রীগুরুদেবকে কিরূপ মনে করা উচিত ?

“শ্রীগুরুতে সামান্য জীব-বৃদ্ধ করিবে না—কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি-পুষ্ট ‘কৃষ্ণপনিকর’ বলিয়া গুরুকে ভক্তি করিবে। গুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করাও মায়াবাদীর মত—শুদ্ধ বৈষ্ণবের মত নয়।”—‘গুরুবজ্জা’, হঃ চিঃ (ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

## শ্রীরূপ-শিক্ষা

“নমো মহাবদাতায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরব্ধবে নমঃ ॥”

এই মত ব্রহ্মাও তাঁর অনন্ত জীবগণ ।

চৌরাশী লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥

শ্রীমন্নহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে প্রয়াগে দশাশ্বমেধ-যাটে শিক্ষা দিচ্ছেন—  
ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত জীব চৌরাশী লক্ষ যোনিতে বহু প্রকার শরীর ধারণ ক’রে ভ্রমণ ক’রছে । জীব অহুচিং, অতি সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য । তার মধ্যে স্থাবর-জঙ্গম-ভেদ । জঙ্গমে তিৰ্য্যাক, জলচর ও স্থলচর । স্থলচরের মধ্যে মহন্তজাতির সংখ্যা অনেক কম । তন্মধ্যে কতক স্নেহাদি, কতক বেদনিষ্ঠ । বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অধিকাংশ বেদ মুখে মানে, বাস্তবিক স্বীকার করে না, সম্প্রদায়ান্তরোধে বৈদিক সম্প্রদায় ব’লে পরিচয় দেয় । তা’রা বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করে, বেদান্তশাসন মানে না । ধৰ্ম্মধারণা যাহা হওয়া উচিত, গ্রাসবিরুদ্ধ যাহা নহে তাহা গণনা করে না, বেদনিষিদ্ধ পাপ করে । ধৰ্ম্মাচারী মধ্যে বহুত (majority) কৰ্ম্মনিষ্ঠ । ‘কৰ্ম্মনিষ্ঠ’ বল্লে বুঝায় যে ধারা কৰ্ম্ম ক’রে ফল লাভ করেন । কৰ্ম্মে অকৰ্ম্ম, বিকৰ্ম্ম, সংকৰ্ম্ম প্রভৃতি ভেদ আছে । ‘কৰ্ম্মনিষ্ঠ’ বল্লে সংকৰ্ম্মনিষ্ঠকে লক্ষ্য করা হয় ।

প্রকৃতে: ক্রিয়মাণানি গুণৈ: কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশ: ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কৰ্ম্মাহমিতি মত্ততে ॥

প্রাকৃত জগতে অধিকাংশ ব্যক্তি বিচার করেন যে আমরা কৰ্ম্মের কর্তা, কিন্তু কৰ্ম্মসকল গুণের দ্বারা সাধিত হয় । প্রাকৃত জগতে গুণই প্রধান জিনিষ । জ্ঞানিগণ তদুচ্চ শ্রেণীতে । কৰ্ম্মী অপেক্ষা জ্ঞানীর সংখ্যা কম । কৰ্ম্মীরা অহঙ্কারবিমূঢ়, তারা মনে করে, আমি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ে বিষয়সকল গ্রহণ করতে পারি । কৰ্ম্মে নিষ্ঠা হ’লে গুণজাত জগতে ভ্রমণের যত্ন হয় । সংকৰ্ম্মী ব্যতীত অসং-কৰ্ম্মীও অনেক । তারা অহঙ্কারী । কৰ্ম্মনিষ্ঠ ব্যতীত ধৰ্ম্মাচারী মধ্যে জ্ঞান-নিষ্ঠ ও ভক্তিনিষ্ঠ আছে । কৰ্ম্মনিষ্ঠা জগতে বহুলোকের । দেশভেদে কৰ্ম্মের নিষ্ঠা বিভিন্ন প্রকার । কোন দেশের সংকৰ্ম্ম অল্পদেশে অসংকৰ্ম্ম ব’লে স্থির হয় । যেমন এদেশে একটি পুরুষ বহুবিবাহ করতে পারে, স্ত্রীলোক পারে না । যে দেশে স্ত্রী-পুরুষের সমতা বিচার, তা’রা একটি মাত্র বিবাহ করতে পারে, অধিক বিবাহ পাপ ব’লে গণ্য হয় । পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রীর ভগ্নীকে বিবাহ করা

পাপের কথা। দক্ষিণদেশে মাতুলকন্যাকে বিবাহ করা যায় ইত্যাদি। তা'তে দেশভেদে কৰ্মনিষ্ঠার বিভিন্নতা বুঝতে পারা যায়।

কালভেদেও কৰ্মনিষ্ঠার বিভেদ লক্ষিত হয়। যেমন—

অশ্বমেধং গবালন্তং সন্মাসং পলপৈতৃকম্ ।

দেবরোণ স্ততোংপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবৰ্জয়েৎ ॥

ঘোড়া, গরু প্রভৃতিকে যজ্ঞে বধ করা কলিতে নিষিদ্ধ। কৰ্ম-জ্ঞান-সন্মাসও নিষেধ; কিন্তু ভক্তিসন্মাস নিষিদ্ধ নয়, তা'হ'লে রামানুজাদি আচার্য্য-চতুষ্টয় এবং শ্রীমদ্রামানুজ সন্মাস গ্রহণ ক'রতেন না। 'সন্মাস' অর্থে ক্রমোত্তর পদার্থে বিরাগ। সকল পদার্থে বিরাগবিশিষ্ট হ'লে ক্রমোত্তর প্রতিও বৈরাগ্য হয়। যা'রা সন্মান-রক্ষার্থ প্রস্তুত, তা'দের নিয়ামিকারে কিছু বৈরাগ্যের কথা থাকতে পারে। কিন্তু উচ্চাধিকারে ভক্তি করা অগ্রায়—এটা জ্ঞানীর বিচার। পঞ্চোপাসকগণের বিচার—কলিত মূর্তির উপাসনা ক'রে বেশী বুদ্ধি হ'লে তা'কে ভেঙ্গে ফেলা হ'বে। কার্য্য শেষ হ'লে দরকার নাই। গণিতের অঙ্ক সাধনের মত। সন্দেশ যা'রা খান তাঁ'দের বিচার আর মোদকের বিচার অনেক তফাৎ। কৰ্ম করা হয় ফলপ্রাপ্তির জন্ত। কে পাবে? যিনি কর্তা, আর ঈশ্বর বঞ্চিত হ'বেন। এদেশে মোকদ্দমা করতে হ'লে কোর্ট ফি দিতে হয়, উকীল দিতে হয়। যা'রা কৰ্মের কর্তা তাঁ'রা প্রত্যেক সময়ই কিছু চান। মোদক সন্দেশ প্রস্তুত করার জন্ত পারিশ্রমিক নেয়। ব্রাহ্মণগণ ভোজন ক'রলে দক্ষিণা পান, সং বা অসং বিচারে ফল লাভ করেন। কিন্তু ভক্ত উত্তরাপথে গমন করেন। তাঁ'দের দক্ষিণাপথ নাই, স্তবরাং যমদ্বারে যেতে হয় না। দক্ষিণাপথে যমদ্বারে যেতে হয়। অসংযতের ফল যমরাজ দেন। সংযতকে পুরস্কার দেন। ফলাকাজীই কৰ্ম করেন। অজিজ্ঞাস ফল খরচ হ'লে কিছুই থাকে না। ভোজন একটা কৰ্ম; বহির্দেশে সেটা খতম হ'লে আরও খেতে হয়, কৰ্মের পর কৰ্ম, আর বিরাম নাই।

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নন্তং ব্যাব্যেন চ বা ব্যায়ঃ ।

দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ॥

শান্তি নাই। কৰ্ম ক'রে ফল লাভ হ'লে নিবৃত্ত হয়। ভাগবত কৰ্মনিষ্ঠকে গর্হণ ক'রে ব'লছেন,—

প্রায়েণ বেদ তদ্বিদং ন মহাজনোহয়ং

দেব্যা বিমোহিতমতিবর্ত মায়য়ানম্ ।

ত্রযাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিভায়াং

বৈতানিকে মহতি কৰ্ম্মণি যুজ্যমানঃ ॥

মেপে নেওয়া ধৰ্ম্মে মূঢ়তাবশতঃ ভুল হ'য়েছে। মায়াধারা বিমোহিতমতি ব্যক্তিগণ মহাজন নন। স্বফল পাব যা'দের বিচারপ্রণালী, তারা যজ্ঞেশ্বর খাড়া ক'রে কৰ্ম্মফল-প্রাপ্তির আশা রাখেন।

কোটা কৰ্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।

“কৰ্ম্মভ্যাঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুজ্ঞানিন-

স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠান্ততঃ।

তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাত্যোপি সা রাধিকা

প্রেষ্টা তদ্বদীয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥”

কৰ্ম্মাসকলকে একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠতা। জ্ঞানী হ'তে জ্ঞানশূন্য ভক্ত তদপেক্ষা প্রেমনিষ্ঠ, তা' হ'তে গোপরামাগণ, তা'দের থেকে শ্রীমতী বার্ষভানবী সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠা। বার্ষভানবীর হৃদয়ত ভাব-চেষ্টা সব শ্রীরাধা-কুণ্ডে বর্তমান—যেখানে মহুশুজ্ঞাতির সকল পাপ বিনাশ ক'রে মঙ্গলোদয় হয়। এমন কোন্ মূঢ় আছে যে, কুণ্ডতীরে বাসস্থান নির্মাণ না করে।

অনেকে বলেন,—বিরজায় অবগাহন করলে গুণজাত চেষ্টাসকল নষ্ট হয়। যেখানে ত্রিগুণ সমতা লাভ করে সেটা বিরজা। গুণ সেখানে পৌঁছিতে পারে না। তথায় সাম্যাবস্থা। মানবজ্ঞানে যত চিন্তা সব গুণত্রয়ের অন্তর্গত।

“দ্বৈতে ভদ্রাতন্ত্রজ্ঞান সব মনোধৰ্ম্ম ॥”

বৈকুণ্ঠ হ'তে পৃথক্ বিচারে যে জগৎ সেখানে যে-কাল পর্য্যন্ত ব্রজ-অনুভূতি না হয়, ক্ষেত্র বা নবদ্বীপ অনুভূতি না হয়, ততদিন ধামসকলকে কাদামাটা-জল-পূর্ণস্থান বা গরু-গাধা চরার স্থান মনে হয়। ( ক্রমশঃ )

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শ্রদ্ধুপাদ

## বাক্যবেগ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত ‘শ্রীবৈষ্ণব-কৃপা-প্রার্থনা’ মহাজন-পদাবলীতে পাওয়া যায়—“ছয় বেগ দমি, ছয় দোষ শোধি, ছয় গুণ দেহ দাসে। ছয় সংসঙ্গ, দেহ হে আমারে, বসেছি সঙ্গের আশে ॥” প্রথমে তিনি ছয় বেগ দমন করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বাক্যবেগ, মনবেগ, ক্রোধবেগ,

জিহ্বাবেগ, উদরবেগ এবং উপশ্ববেগ—এই ছয় প্রকার বেগ বৈষ্ণবের দমন থাকে ।  
সর্বপ্রথমে বাক্যবেগ দমনের কথা তিনি লিখিয়াছেন ।

‘বাক্য’ অর্থে মনের ভাবপ্রকাশকারী হৃৎস্থলিত শব্দের সংযোজন । যাহার দ্বারা একজন অথবা একজনের মনের (অন্তরের ভাব) বুঝিতে পারে । বাক্যের দ্বারা ভক্ত ভগবানকে বশীভূত করিতে পারে ; আর বাক্যের দ্বারা জীব নরকের পথ পরিত্যাগ করিতে পারে । বাক্যের ধ্বংস নাই । বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের মাধ্যমে বাক্যকে সংরক্ষিত করিতে পারিলে তাহা সেই ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও বার বার শুনিতে পাওয়া যায় । বাক্যগুলি আকাশমার্গে ভাসমান অবস্থায় ঘুরিতে থাকে । কখনও নষ্ট হয় না । যে ব্যক্তি সারা জীবন ভাবের সহিত হরিকথা, হরিকীর্তন, ভক্তমহিমা, গুরু-মহিমা দি কীর্তন করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তাহার প্রতি ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া যথাযথ পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকেন । আর যে ব্যক্তি সারা জীবন কুকথা, বিষয়কথা, সংসারের স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজনাদির কথা, ভোগ-ত্যাগের কথা, পরনিন্দা, পরচর্চা, জীবহিংসাদি ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথা কীর্তন করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, তাহার মৃত্যুর পর ‘স্বকর্মফলভুক্ পুমান্’ নীতি অনুসারে জন্ম-মৃত্যুরূপ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে । সাধুদিগের বাক্যবেগ দমন থাকা একান্ত আবশ্যক । বাক্যবেগ দমন না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি সাধু বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না ।

বাক্যের দ্বারা ব্যক্তি জীবের মনের ভাব প্রকাশিত হয় । ভগবৎ-শরণাগত ব্যক্তির বাচিক দৈন্যতা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনেক পদাবলী কীর্তনে আমরা দেখিতে পাই । যথা,—

“ভুলিয়া তোমারে, সংসারে আসিয়া, পেয়ে নানাবিধ ব্যথা ।

তোমার চরণে, আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা ॥

জননী-জঠরে, ছিলাম যখন, বিষম বন্ধনপাশে ।

একবার প্রভু, দেখা দিয়া মোরে, বঙ্কিলে এ দীন দাসে ॥

তখন ভাবিল, জন্ম পাইয়া, করিব ভজন তব ।

জন্ম হইল, পড়ি’ মায়াজালে, না হইল জ্ঞান লব ॥

আদরের ছেলে, স্বজনের কোলে, হাসিয়া কাটাছু কাল ।

জনক-জননী, স্নেহেতে ভুলিয়া, সংসার লাগিল ভাল ॥

ক্রমে দিন দিন, বালক হইয়া, খেলিল বালক-সহ ।

আর কিছু দিনে, জ্ঞান উপজিল, পাঠ পড়ি অহরহঃ ॥

বিতার গোঁরবে, আমি’ দেশে দেশে, ধন উপার্জন করি ।

স্বজন পালন, করি একমনে, ভুলিল তোমারে হরি ॥

বান্ধকে এখন, ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া কাতর অতি ।  
না ভজিয়া তোরে, দিন বৃথা গেল, এখন কি হ'বে গতি ।”  
“সর্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া, পড়েছি তোমার ঘরে ।  
তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর, বলিয়া জানিহ মোরে ।”

“মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর ।  
অপিলু তুয়া পদে নন্দকিশোর ।”  
“তুমি সর্বোৎকর্ষের ব্রজেন্দ্রকুমার ।  
তোমার ইচ্ছায় বিশেষ স্বজন সংহার ।”

ঠাকুর শ্রীল ভকতিবিনোদের উপরিউক্ত দৈন্ত্যভামূলক বাক্যদ্বারা ভগবান্ নিশ্চয়ই ভক্তের প্রতি আকর্ষিত হইয়া থাকেন ।

পূজার পূর্বে ভূতপুঙ্খের প্রয়োজন । আমি স্বরূপতঃ নিত্য-কৃষ্ণদাস, কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ কৃষ্ণবিমুখ হইয়া অনাদিকাল হইতে দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া মায়ায় সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-চক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে ত্রিতাপ জালায় দগ্ধ হইতেছিলাম । শ্রীল গুরুপাদপদের রূপায় এখন বুঝিয়াছি যে, আমি স্থূল লিঙ্গ শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । এইরূপ ভ্রমণা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ ও আত্মধ্যান অবশ্য করণীয় । যথ,—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি ষোড়শো ন শূদ্রো

নাহং বর্ণা ন চ গৃহপাতির্নো বনো য যতির্বা ।

কিন্তু প্রোতোম্মিখিলপরমানন্দপূর্ণায়ুতাক্ষে-

গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োদাস-দাসাত্মদাসঃ ।

অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কোন বর্ণমধ্যে নহি, আমি সন্ন্যাসী, বাণপ্রস্থ, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী আদি কোন আশ্রমী মধ্যে নহি, আমি রাজা, মন্ত্রী, জ্ঞী, পুরুষ আদিও নহি, আমি ভগবন্তুভক্তের দাসের দাস ।

এই প্রকৃত দৈন্ত্যভাব যখনই ভক্তের ভাব-বাক্যে প্রকাশিত হইবে, তখনই তিনি অপ্রাকৃত বৈষ্ণবরাজ্যের রাস্তায় প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবেন ।

পদকর্ত্তা প্রেমানন্দ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

“দিবস-রজনী, আবোল তাবোল, পচাল পাড়িতে পার ।

ভাহার ভিতরে, কখন কেন কি, ‘গোবিন্দ’ বলিতে নার ।

ভজিব বলিয়া, কহিয়া আইলি, ভুলিলি কি স্থখ পাইয়ে ।

বুঝিহু আবার, শমন-নগরে, নরকে মজিবি যাইয়ে ।”

এইভাবে বদ্ধজীব সারাজীবন বিমোহিত, ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথা বলিতে

বলিতে অন্তে জীবন ত্যাগ করে। অথবা বাক্যব্যয়দ্বারা (যদিও বন্ধজীবের পক্ষে ইহা খুবই আনন্দদায়ক) আত্মার বন্ধনদশা লাভ বাতীত আর কিছুই হয় না।

ভগবান্নামকে শব্দব্রহ্ম বলা হইয়াছে। অর্থাৎ শব্দ হইলেও শব্দ নয়, তাহাতে ব্রহ্ম অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ বিরাজ করেন। যাহারা শব্দব্রহ্মরূপ ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিচর-বৈশিষ্ট্যাদি সারাজীবন কীর্তন করিতে করিতে অন্তে দেহ-ত্যাগ করেন, তাহারা নিশ্চয়ই ভগবদ্ধামে গমন করিয়া চিরশান্তি লাভ করিতে পারিবেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তজিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

## সংস্কৃত কি DEAD LANGUAGE ?

বর্তমান যুগ মেকিরই যুগ। সেকারণে এই যুগে আসুলের অপেক্ষা নকলেরই প্রাচুর্য ও সমাদর সমধিক পরিলক্ষিত হয়। বড় দুঃখের বিষয় যে, বর্তমানে একশ্রেণীর লোক সংস্কৃতাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হইয়া সংস্কৃত ভাষার অস্তিমশয়া নিশ্চয় করিতে গিয়া নিজেদের, দেশের ও দেশের অশেষ অকল্যাণ সাধন করিতেছেন। ‘সংস্কৃতাতঙ্ক রোগের’ ইংরেজী নাম ‘Sanskrit Fobia’। পাগলা কুকুরের দংশনের কারণে যেরূপ জলাতঙ্ক রোগীর প্রাণদায়ী জল হইতে ভীতি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানাতঙ্কতার কারণে সংস্কৃতাতঙ্ক রোগী অদ্বিতীয় ভাবগর্ভ ভাষা সংস্কৃতকে মূল্যহীন ও বিষবৎ পরিত্যজ্য বলিয়া মনে করেন। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া আমাদের নিজেদের সংস্কৃত সভ্যতার বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা এবং উহাতে গ্রহণীয় কিছু আছে কিনা তাহা বিচার করা পর্যন্ত আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তোজ্ঞান মনে করি। জননী সংস্কৃতভাষার সুপবিত্র মন্দির-প্রাঙ্গণকে অপবিত্র করিবার জন্ত আমাদের ছলচাতুরীর কোন অভাব নাই। ‘সংস্কৃত পঠন-পাঠন বর্তমান যুগে সম্পূর্ণ নিরর্থক এবং ইহার জন্ত সামান্য মাত্রও শ্রম স্বীকার করা পণ্ডশ্রম মাত্র’— এই দুষ্টবুদ্ধি মাথার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের সর্বনাশ করিতেছে। আশ্চর্যের কথা এই যে, আমরা সেক্সপীয়ার পড়িবার জন্ত ইংরাজী, গ্যেটে পড়িবার জন্ত জার্মান ও দান্তে পড়িবার জন্ত ইতালীয় শিখিতে পশ্চাৎপদ নহি, কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত পড়িবার জন্ত সংস্কৃত শিখিতেই আমাদের মস্তকে বজ্রাঘাত হয়। ‘সংস্কৃত ভাষার জন্ত সময় ও শক্তি ব্যয় অতি সার্থক, ফলপ্রসূ ও প্রয়োজনীয়’

বলিয়া রাশিয়ান, জার্মান, ইংরাজী প্রভৃতি বিদেশীগণ পর্যন্ত নানাভাবে সংস্কৃত সংস্কৃতির চর্চা করিতেছেন, কিন্তু আমরা সংস্কৃত ভুলিতে পারিলেই যেন বাঁচিয়া যাই। একেই বলে ভাগ্যের নিদাক্ষণ পরিহাস।

সংস্কৃত সভ্যতাই ভারতীয় সভ্যতা অর্থাৎ সমগ্র ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্কৃত ভাষাই বাহন। আমাদের পূর্বপুরুষগণ ধর্ম, দর্শন, নীতি, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা প্রভৃতি বিষয়ে যে অপূর্ণ জ্ঞানগরিমা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই কিয়দংশ উত্তরপুরুষগণের মঙ্গলার্থে তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ সংস্কৃতের গায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন হুমধুর ভাষা জগতে দ্বিতীয় আর নাই। সংস্কৃতই ভারতের সর্বাপেক্ষা সার্বজনীন ভাষা, তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভারতীয় ভাষাসমূহ সংস্কৃতের সহিত আত নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ ও সংস্কৃত ভাষার দ্বারাই পরিপুষ্ট। অপরপক্ষে তামিল, তেলুগু প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষার উপরও সংস্কৃতের প্রভাব কম নহে। সনাতন হিন্দুধর্মের বাহন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা কোনক্রমেই নিষ্পয়োজন নহে, বরং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা প্রথম কর্তব্যরূপেই গ্রহণ করা উচিত। মাতার নিকট সন্তানের ঋণ স্বীকারে যেরূপ লজ্জা নাই, সেইরূপ সংস্কৃত ভাষার নিকট অগ্ন্যাত্ত ভাষার ঋণ স্বীকারে অগৌরবের কিছু নাই। **সংস্কৃত জগতের শ্রেষ্ঠ ভাষা। স্বকঠোর নিয়মবদ্ধ অথচ এরূপ সরস, সুমিষ্ট ও ভাবগর্ভ ভাষা পৃথিবীতে আর বিভাষ্য নাই।** সংস্কৃতে দুই একটা কথাই যাহা ব্যক্ত করা যায়, ইংরাজী বা বাংলায় সেই ভাবটি প্রকাশ করিতে হইলে অনেক কথা বলিবার প্রয়োজন হয়—সংস্কৃত হইতে অল্প ভাষায় অল্পবাদকারী ব্যক্তিগণই বিশেষরূপে অবগত আছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষানোক্ত বিংশ শতাব্দীতে জয়গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া সুপ্রাচীন সংস্কৃত সভ্যতাকে পরিবর্জন করিয়া নূতন সভ্যতার পন্থন করিতে চেষ্টা করা সুবিবেচনার কার্য্য নহে। শিক্ষা হইতে সংস্কৃতকে নির্বাসিত করিতে যাওয়া 'যে ডালে বসা সেই ডাল কাটা'র গায় নির্বোধের কার্য্য মাত্র।

সংস্কৃতবিদেবীদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—সংস্কৃত ভাষা মৃত ও অপ্রচলিত, তাই সংস্কৃত ভাষার অহুশীলনে বুধা সময় ও শক্তি ক্ষয় করিয়া লাভ কি? আবার সংস্কৃত ভাষা অতি দুর্লভ ও অপ্রচলিত বলিয়া ইহা আয়ত্ত করা অধিকতর দুঃসাধ্য। সুকুমারমাত বালক-বালিকাকে এই ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করা কেবল যে নিষ্পয়োজন তাহাই নহে, ক্ষতিজনক ও নিষ্টুরতাও বটে। যে-সময় উহারা স্বকঠিন শব্দরূপ, ধাতুরূপ মুখস্থ করিতে ব্যয় করে, তাহা যদি বাংলাভাষা বা অগ্ন্যাত্ত ভাষা শিক্ষায় ব্যয় করা হয়, তাহা হইলে সকলেরই মঙ্গল।



বাংলা ব্যতীত ইংরাজী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষাতে কিছু কিছু শিক্ষা অর্জন করা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য। কারণ এই সকল ভাষা জগতে প্রচলিত আছে এবং ভাবের আদান প্রদানের জন্য শিক্ষা, ব্যবসায়, চাকুরী প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই ইহাদের সাহায্য অত্যাৱশ্যক। সংস্কৃত ভাষা জগতে প্রচলিত আবশ্যক ভাষাও নহে, তাই এই স্বকঠিন ভাষা শিক্ষার জন্য অকারণ সময় নষ্ট করা সম্পূর্ণ নিরর্থক। প্রাত্যহিক বাস্তব জীবনের দিক হইতে সংস্কৃত সম্পূর্ণ মূল্যহীন। ইংরাজী, গণিত, বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি অত্যাৱশ্যক বলিয়াই দুর্ভাগ্য হইলেও শিক্ষণীয়।”

সংস্কৃত ভাষা স্বকঠিন বলিয়া তাহার অপরিণীম গুরুত্ব অস্বীকারপূর্বক ‘কৃপামণ্ডকতা’ দ্বারা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অল্প ভাষার প্রতি যাহারা অত্যন্ত আদর প্রদর্শন করেন, তাহারা নিরীক্ষা অর্থাৎ সত্যস্বীকারে পরাৱৃত্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার ব্যর্থ, অল্প অনুকরণকারী যে সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল এবং যাহা পাশ্চাত্য শিক্ষার কুকলরূপেই জগতের সম্মুখে হাত্যাম্পদ হইয়াছিল, বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতবিরোধী-সম্প্রদায় তাহারই ধ্বংসাবশেষ বা প্রোতাস্মা মাত্র। তাহাদের অবস্থা হিতোপদেশের ময়ূরপুচ্ছধারী কাক ও নীলবর্ণ শূণ্যের দ্বায়ই শোচনীয়—স্বদেশে ও বিদেশে কোন সমাজে তাহাদের স্থান নাই। খনির ভিতরে প্রবেশ না করিয়াই বাহির হইতেই যাহারা অনুমান করেন,—“খনিতে কোন প্রবেশপথ নাই, অথবা যদিও থাকে তাহা বিপদসঙ্কুল ও অগম্য, আবার খনিতে যদি কোন কিছু থাকে তাহা রাশি রাশি কয়লা মাত্র, হীরক মাত্রই নাই”, তাহারা যেরূপ সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ; তদ্রূপ যাহারা ধারণা করেন,—“সংস্কৃত ভাষা সম্পূর্ণ দুর্কোষা ও শিক্ষাতীত এবং বিংশ শতাব্দীতে তাহা সম্পূর্ণরূপে অচল” তাহারাও অত্যন্ত মূর্খ। সংস্কৃত ভাষা শিখিতে গিয়া কেহ কেহ বার্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়াছেন বলিয়া সকলে যে বার্থমনোরথ হইবে অর্থাৎ সকলের যে দাঁত ভাঙ্গিবে, ইহা কখনও হইতে পারে না। ভারতীয়গণ চিরকালই সংস্কৃতশিক্ষার আদর করিয়া আসিয়াছেন। কই, তাঁহাদের দাঁত ত’ পূর্বে ভাঙ্গে নাই, বরং অত্যন্ত মজবুত হইয়াছিল। মৃত্যুবিক্রয়িনী সংস্কৃত ভাষা হইতে প্রাণশক্তি লাভ করিয়াও যদি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বাংলা তথা অন্যান্য ভাষা সংস্কৃত ভাষার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে উৎসুক হয়, তাহা হইলে ঐসকল ভাষারই অপমৃত্যু স্থনিশ্চিত। বাংলা ভাষা যে সংস্কৃত ভাষার সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাতেই স্বীকার করিবেন। বাংলার অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত শব্দ, বানানও তাই। বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের সমাস,

সন্ধি, লিঙ্গাদি বিষয়ের নিয়ম অনেকস্থলেই অত্যাধিক পালিত হয়। এইসকল কারণে জননী দেবভাষার জ্যোষ্ঠা দৌহিত্রীরূপে বাংলাভাষাকে পরিগণিত করা হয়।

জগতের লোক 'ব্যবহারিক মূল্য' বলিতে কেবল উদরপূর্তি, স্বাস্থ্য, ধন, মান-সম্মান, প্রভৃতি প্রভৃতি জাগতিক সুখের কারণকেই বুঝিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট পার্থিব উন্নতি ও পরিভূষণই সব। যাহা দৈহিক ও পার্থিব প্রয়োজনের সাধক বা পরিপন্থী নহে, তাহা সম্পূর্ণ মূল্যহীন ও বিষবৎ পরিত্যজ্য—এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। জাগতিক সুখই কি মানবের একমাত্র কাম্য বস্তু? বাস্তবিক-পক্ষে দৈহিক ভোগে মানবের সুখ নাই, আত্মার তৃপ্তিতেই প্রকৃত সুখ। আত্মকল্যাণ লাভের জন্য সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ বৈদিক শাস্ত্রাদি একান্তভাবে অধ্যয়ন করা প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্তব্য। পূজা-অর্চনাদি নিত্যকর্মে, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্মকাণ্ডসমূহে সংস্কৃতের একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। মন্ত্র, স্তব প্রভৃতির অর্থ বুঝিবার জন্য প্রত্যেক সনাতন হিন্দুমাত্রেরই সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান অর্জন করা অত্যাৱশ্যক। আমরা সনাতন হিন্দুধর্মকে সাক্ষাৎ বৈদিক ধর্মরূপে প্রচার করিয়া অত্যন্ত গর্বান্বিত হই। সনাতন হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্মরূপে স্বীকার করিয়া একই সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা 'কানা ছেলেকে পণ্ডলোচন বলার' তায়ই বাতুলের প্রলাপ মাত্র।

যাহারা বেদকে নিত্য, অশ্রান্ত ও ধর্মের মূলরূপে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের অন্ততঃ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা প্রথম কর্তব্যরূপেই গ্রহণ করা উচিত। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা কোনক্রমেই অপ্ৰয়োজনীয় নহে। নানাভাবে অনাদৃত ও বিপর্যস্ত হইলেও সংস্কৃত ভাষা কদাপি ভারতে সম্পূর্ণ বিনষ্ট বা মৃত হয় নাই। বস্তুতঃ যে ভাষার গৌরব কোটি কোটি বৎসরেও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, সেই কালবিজয়িনী শাস্ত্রত ভাষার কখনও মৃত্যু হয় না। কত শত ভাষা কালশ্রোতে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার অমলজ্যোতিঃ শত ঝড়-ঝঞ্ঝাতেও বিন্দুমাত্র ঘন হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না। চিরন্তননী সংস্কৃত ভাষাই কালশ্রোত অতিক্রম করিয়া স্বকীয় গৌরবে চির অব্যাহত থাকিবে।

—ত্রিদিবস্বামী শ্রীমন্তজীবেন্দ্রোত্তম বোধায়ন মহারাজ

## সাধ্য-সাধন

যে বস্তু পাইবার জন্ত সাধন করা হয় বা ভজন করা হয়, তাহাকে সাধ্য বলে এবং যে উপায় অবলম্বন করিলে সাধ্যবস্তুকে পাওয়া যায় তাহাকে সাধন বলে ।

শ্রীমদ্‌মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গে শুভবিজয় করিয়াছেন । সেখানে তপন মিশ্র নামক এক ভক্তের বাস । সেই গ্রামেই মহাপ্রভু উপস্থিত । তপন মিশ্র অনেকদিন হইতেই সাধন কি এবং সাধ্যবস্তুই বা কি কিছু বুঝিতে পারিতেছিলেন না । একদিন ভোরে স্বপ্ন দেখিলেন—“এই গ্রামে নিমাই পণ্ডিত শুভাগমন করিয়াছেন । তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর । তুমি তাঁহার নিকট যাও । তিনি তোমাকে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবেন ।” এই স্বপ্ন দেখিয়া তপন মিশ্র মহাপ্রভুর দর্শনের জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং ভাগ্যক্রমে মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন এবং প্রার্থনা জানাইলেন,—“প্রভো ! আমি কি সাধন করিব এবং কাহারই বা সাধন করিব—বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না । আপনি রূপা-পূর্বক আমাকে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব উপদেশ করিয়া ধন্য করুন ।

“প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্য-সাধন কহিল ।

নাম সঙ্কীৰ্ত্তন কর—উপদেশ কৈল ॥”

মহাপ্রভু তপন মিশ্রকে প্রশংসা করিয়া কহিলেন,—তোমার ভাগ্যের সীমা নাই । তোমার হরিভজনে মতি হইয়াছে । কৃষ্ণই জীবের সাধ্য এবং তাঁহার ভজনই সাধন । “নামসঙ্কীৰ্ত্তন কলৌ পরম উপায় ।” হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন কর । প্রভু কহিলেন,—অভেদ ব্রহ্মজ্ঞান বা স্বর্গাদি ভুক্তি জীবের সাধ্যবস্তু নয় । কৃষ্ণ-প্রেমই জীবের একমাত্র সাধ্যবস্তু । কৰ্ম ও জ্ঞান—ইহারা উক্ত সাধ্যবস্তু প্রাপ্তির সাধন বা উপায় নহে । শুদ্ধা কৃষ্ণনামাশ্রয়া ভক্তিই সাধ্যবস্তু পাইবার একমাত্র উপায় । হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তনের দ্বারাই সমস্ত পাওয়া যাইবে ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

সাধ্য সাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল ।

হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তনে মিলিব সকল ॥

এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর নাম কীৰ্ত্তন করিতে করিতে চিন্তা শুদ্ধ হইবে । যেমন কাহারও পিতাধিক্য হইলে মূখের তিক্ততা হয় । মিছরি মিষ্টি । মিছরিই খাইতে খাইতে ক্রমশঃ তিক্ততা চলিয়া গিয়া মিষ্টির আশ্বাদ পাওয়া

যায়, সেইরূপ এই হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন করিতে করিতে চিন্তের মালিন্য দূরীভূত হইবে এবং তখন পূর্ণ অমৃত আনন্দ লাভ হইবে অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইবে। এই প্রেমলাভ করিবার জগ্গই কৃষ্ণনাম কীৰ্ত্তন।

“সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাস্কুর হবে।

সাধ্য-সাধন তত্ত্ব জানিবা সে তবে ॥”

হরিনামই সাধন এবং হরিনামই সাধ্য।

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর সারাজীবন ‘হরে কৃষ্ণ’ নাম সঙ্কীৰ্ত্তন করিয়া-  
ছিলেন। প্রয়াগের নিকটবর্ত্তীর আড়াইল গ্রাম হইতে শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীধাম পুরী  
আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে শ্রীমন্নহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—“হরিদাস প্রত্যহ তিন  
লক্ষ নাম করে। নামের মহিমা কি এবং কিভাবে সাধন করিতে হয় তাহা  
হরিদাসের নিকট শিক্ষার বিষয়।” সেই নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর  
নীলাচলে সিদ্ধবকুলে যখন নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন তখন প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম  
বুকে ধারণ করিয়া নিম্পলক নেত্রে প্রভুর মুখপানে চাহিয়া উচ্চারণ করিলেন  
—“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।” আর এই নাম উচ্চারণ করিয়াই অপ্রকট হইলেন।  
শ্রীল হরিদাস ঠাকুর সারাজীবন অপতিতভাবে হরে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ  
করিয়াছেন, কিন্তু দেহত্যাগকালে “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য” নাম কীৰ্ত্তন করিলেন।  
সুতরাং এখানে আমরা দেখিলাম—হরে কৃষ্ণ নাম সাধন এবং শ্রীগৌরহরির  
অভয়চরণই সাধ্য।

শ্রীমন্নহাপ্রভু জিয়ড় নুসিংহ দর্শন করিয়া গোদাবরী তীরে বিজ্ঞানগরে রায়  
রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রামানন্দের অহুরোধে প্রভু এক বৈষ্ণব  
ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করেন। সন্ধ্যার পর রামানন্দ আসিয়া দণ্ডবৎ করিলেন।  
শ্রীমন্নহাপ্রভু তাঁহাকে সাধ্য-সাধন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“প্রভু কহে,—পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।

রায় কহে, স্বধর্ম্ম আচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয় ॥”

রামানন্দ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অন্তর্গত কৃষ্ণ আরাধনাকে “সাধ্য” বলিয়া বলায় প্রভু  
তাহাকে বাহ বলেন। ক্রমশঃ পর পর কর্ম্মার্পণ, আসক্তিশূন্য কর্ম্ম, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি  
বলিয়া জ্ঞানশ্রুতা শুদ্ধা ভক্তি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের একটা শ্লোক বলিলেন—

“জ্ঞানে প্রয়াসমুদ্যোগ নমস্ত এব

জীবন্তি সনুখরিতাং ভবদীয়বর্ত্তাম্।

স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তদ্ব্যবস্থানোভি-

ধে প্রায়শোহজিতজিতোহপ্যসি তৈশ্চিলোক্যাম্ ॥”

ব্রহ্মা ভগবানকে বলিলেন,—হে ভগবন্! নির্ভেদ ব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞানচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া যে ভক্তগণ সাধুমুখবিগলিত আপনার কথা শ্রবণ করেন ও কায়মনোবাক্যে সাধুপথে স্থিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, ত্রৈলোক্যমধ্যে আপনি দুল্লভ হইয়াও তাঁহাদের নিকট স্থলভ হইয়া পড়েন।

শ্রীম্মহাপ্রভু উহাকে সাধ্যবস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু আরও অগ্রসর হইতে বলিলে—রায় রামানন্দ ক্রমশঃ ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি বলিতে গিয়া দাস্তপ্রেম, সখ্যাপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম বলার পর বলিলেন—“কান্তভাবই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমভক্তি।”

“পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে।

এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥”

এই সমস্ত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—গোপীর কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য-তত্ত্বের অবধি হইলেও আরও যদি কিছু থাকে বল। তখন রামানন্দ বলিলেন—শ্রীমতী রাধারাগীর কৃষ্ণপ্রেমাই—সাধ্যশিরোমণি মহাপ্রভু বলিলেন,—তুমি যে সাধ্য নির্ণয় করিলে ইহার পর আর কিছু আছে কি? তখন রামানন্দ “প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত” নামক একটি ভাব আছে বলিলেন। প্রেমবিলাসতত্ত্বে দুই প্রকার ভাব—সন্তোষ ও বিপ্রলম্ব। এ সম্বন্ধে রামানন্দ নিজকৃত একটি গান করিলেন। ঐ গান শুনিয়া মহাপ্রভু স্বহস্তে তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিলেন। “সাধ্যবস্ত্র সাধন বিনা কেহ নাহি পায়।” সেই সাধ্যবস্ত্র হইতেছে রাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা। সেই সাধ্যবস্ত্র প্রেমসেবা পাইবার উপায় হইতেছে—ব্রজসখীর আত্মগত্যা। গোপী আত্মগত্যা বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অসম্ভব।

দক্ষিণ কানাড়া জেলার ম্যাঙ্গলোর হইতে ৩৬ মাইল উত্তরে “উডুপী”। উডুপীতে শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের গাদী। সেই সম্প্রদায়ের আচার্য্যদিগকে তত্ত্ববাদী বলে। শ্রীম্মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে উডুপীতে আগমন করেন। তত্ত্ববাদিগণ মহাপ্রভুকে মায়াবাদী মনে করিয়া প্রথমে তাঁহার সহিত ব্যাকলাপ করেন নাই। পরে তাঁহার তাত্ত্বিক বিকার ও প্রেমাবেশ দর্শন করিয়া তাঁহাদের বৈষ্ণব জ্ঞান হয়। তখন তত্ত্ববাদীদের আচার্য্য ছিলেন মহাপণ্ডিত রঘুবর্ষ্যতীর্থ। মহাপ্রভু তাঁহাকে অত্যন্ত দৈনন্দনকালে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“সাধ্য-সাধন আমি না জানি ভাল মতে।

সাধ্য-সাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে ॥”

তখন তত্ত্ববাদী আচার্য্য সাধ্য-সাধন সম্বন্ধে বলিলেন,—

“আচার্য্য কহে—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।

এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ “সাধন” ॥

পঞ্চবিধ মুক্তি পাইয়া বৈকুণ্ঠে গমন।

সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র নিরূপণ ॥”

অর্থাৎ—বর্ণাশ্রম ধর্ম ও কৃষ্ণে সমর্পণরূপ কর্মমিশ্রা ভক্তিই সাধন এবং পঞ্চবিধ মুক্তিই—সাধ্য।

“বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম এব আচার লক্ষণঃ।

স এব মঙক্তিযুতো নিঃশ্রেয়স করঃ পরঃ ॥”

অর্থাৎ—বর্ণাশ্রমাবলম্বী পুরুষগণের যে ধর্ম পিতৃলোক প্রাপ্তির সাধনরূপে আচরিত হয় তাহাই মঙক্তিযুক্ত বলে পরম মুক্তিপ্রদ হইয়া থাকে।

তত্ত্ববাদিগণের সাধ্য—মুক্তিলাভ করিবার পর বৈকুণ্ঠে গমন। ইহা শুনিয়া শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না।

“কর্মনিন্দা কর্মত্যাগ সর্বশাস্ত্রে কহে।

কর্ম হইতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥

মুক্তি কর্ম দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।

সেই দুই স্থাপ’ তুমি সাধ্য-সাধন ॥”

কর্ম ও জ্ঞান শুদ্ধ ভক্তির প্রতিকূল, সুতরাং সাধ্যও সাধন নহে। মহাপ্রভু বলিলেন,—ভক্ত যখন ভগবানের পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া নবধা ভক্তির অনুশীলন করেন, তখন এই নবধাভক্তিই সাধন।

“শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।

অর্চনং বন্দনং দাস্ত্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥”

শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্ত্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণসম্পন্ন ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণে অপিত হইয়া সাধিত হইলে সর্বসিদ্ধি হয়।

“প্রভু কহে—শাস্ত্রে কহে শ্রবণ-কীর্তন।

কৃষ্ণ প্রেমসেবা ফলের ‘পরম সাধন’ ॥”

শাস্ত্রমতে শ্রবণ-কীর্তনই শ্রেষ্ঠ সাধন। সেই সাধনবলে কৃষ্ণপ্রেম সেবারূপ সাধ্য-ফলের লাভ হয়। সাধ্য—কৃষ্ণপ্রেম।

“শ্রবণ-কীর্তন হইতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।

সেই পঞ্চম পুরুষার্থ—পুরুষার্থের সীমা ॥”

শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু বলিতে চাহিয়াছেন যে,—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারি পুরুষার্থ। ইহার অতীত হইতেছে পঞ্চম পুরুষার্থ—কৃষ্ণপ্রেম। ইহা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্তন করিলে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বলিয়াছেন,—“কর্ম্মার্পণ ইত্যাদির দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে সংসঙ্গবলে অনন্ত কৃষ্ণভক্তিতে প্রকার উদয় হয়। প্রকার উদয় হইলে শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি সাধন ভক্তি হয়। শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি ভক্তি সাধন করিতে করিতে অনর্থের যত নিবৃত্তি হয় প্রেমের ততই অভ্যুদয় হয়। সুতরাং কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ হইতে অনিবার্যরূপে কৃষ্ণভক্তি উদয় হইবার সর্বত্র সম্ভাবনা নাই। কেননা ( শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি ) সংসঙ্গজনিত—“শ্রবণোৎপত্তি” লক্ষণা প্রকার অপেক্ষা করে।

শ্রীসনাতন শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

“বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।

কৃষ্ণপ্রাপ্য সম্বন্ধ “ভক্তি” প্রাপ্যের সাধন ॥”

শুদ্ধ জীবের প্রাপ্য কৃষ্ণই সম্বন্ধ। প্রাপ্য কৃষ্ণসেবা সাধনই অভিধেয় এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ভোগ ও ভোগরহিত মোক্ষ—এই চারিটি পুরুষার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহাধনরূপ প্রাপ্য কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন।

“কৃষ্ণ ভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।

ভক্তিমুখ নিরীক্ষণ কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান ॥”

“এইসব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।

কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নায়ে বল ॥”

সাধনভক্তি দুই প্রকার—বৈধী ও রাগানুগা।

“রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।

বৈধী ভক্তি বলে তারে সর্বশাস্ত্রে গায় ॥”

“রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসীজনে।

তার অন্তর্গত ভক্তির রাগানুগা নামে ॥”

“সাধা” ভাবভক্তি বা রতি।

“প্রীত্যকুরে রতিভাব হয় দুই নাম।

যাহা হৈতে বশ হন শ্রীভগবান্ ॥”

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—“যিনি বাহিরে সাধকদেহে শ্রুত হরিকথার কীৰ্ত্তন-দ্বারা সেবা এবং মনে কৃষ্ণ সেবোপযোগী নিজ রসোচিত সিদ্ধদেহে সর্বকাল ব্রজে রাধাকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনি শাস্ত্র বা গুরুশাসনবলে বৈধীভক্তির পরিবর্তে নিজের স্বাভাবিক জাতরুচির প্রভাবে রাগানুগ পথে চলিতে চলিতে কৃষ্ণের চরণে প্রগাঢ় প্রীতি লাভ করেন। রাগানুগমার্গেই রতি বা ভাবপ্রভাবে কৃষ্ণ বশীভূত হন এবং কৃষ্ণ-প্রেমসেবা প্রাপ্তি ঘটে।”

এইভাবে সাধন করিতে করিতে ক্রমশঃ ভাব, প্রেম, মহাভাব উদয় হয় ।

“ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে বল ।

সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥”

\* \* \* \*

“অগ্রে নৃত্যগীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ নতি ।

অভ্যুত্থান অম্বুজ্যো তীর্থ গৃহে গতি ॥

পরিক্রমা স্তবপাঠ জপ সঙ্কীর্তন ।

ধূপ মালা গন্ধ—মহাপ্রসাদ ভোজন ।

আরাট্রিক মহোৎসব শ্রীমূর্তিদর্শন ।

নিজ প্রিয় দান ধ্যান তদীয় সেবন ॥

তদীয় তুলসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত ।

এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥”

\* \* \* \*

“সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ ।

মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন ।

সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ ।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অঙ্গসঙ্গ ॥”

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥”

“সাধ্য-সাধন তত্ত্ব যে কিছু সকল ।

হরিনাম সঙ্কীর্তনে মিলিব সকল ॥”

নামই সাধ্য—নামই সাধন ।

—শ্রীহরিনাম রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

## শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তর্দ্বান-প্রসঙ্গ

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮৫ পৃষ্ঠার পর ]

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র নীলাচলবাসী মহাপ্রভুগত-প্রাণ ছিলেন । অথচ মহাপ্রভু কেবল পারমাখিক বিষয় ব্যতীত অন্য কোনরূপ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক কোন বিষয়ে কোনপ্রকারেই ক্ষণকালের জ্ঞানও নিযুক্ত থাকিতেন না । সকলের প্রতি তাঁহার কেবল এইমাত্র



স্নেহ-উপদেশ ছিল,—“আমা প্রতি স্নেহ যদি থাকে সবাকার। কৃষ্ণ বই আর কিছু না গাহিবে আর ॥” এমতাবস্থায় শ্রীমন্নমহাপ্রভুর প্রতি কাহারও কোন প্রকারে হিংসা পোষণের কোন কারণই নাই—বরং “স্বার্থগতি হি বিমুখ” (ভা: ৭।৫।৩১)—ভাগবত-বাক্যানুসারে তাঁহারা শ্রীমন্নমহাপ্রভুকেই তাঁহাদের একমাত্র স্বার্থ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। বিশেষতঃ স্বয়ং রাজা নিজপুত্রসহ যখন মহাপ্রভুর নিকট আত্মবিক্রীত হইতে পারিয়া সর্বদা কৃতার্থ থাকিতেন, তখন কাহারও পক্ষে মহাপ্রভুর সহিত বিরোধিতা রাজদ্রোহিতারই নামান্তর। সেস্থলে প্রতাপরুদ্র তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শ্রীচৈতন্যদেবের এইপ্রকার বিরোধিগণকে কি দোদীপ্তপ্রতাপে বিনাশ করিতেন না ?

বরং শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্দানোন্তর সময়ের বর্ণনায় সমগ্র রাজ্যে বিরহ-কান্দারতার চিত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস মহাপ্রভুকে দর্শনের লালসায় নীলাচল-উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে পথিমধ্যে মহাপ্রভুর লীলাসঙ্গোপন-বার্তা শ্রবণ করিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়েন। স্বপ্নে মহাপ্রভুর দর্শন ও তাঁহা-কর্তৃক সাহসনা লাভ করিলে তিনি পুরী-গমনে সমর্থ হন। সে-স্থানে গিয়া মহাপ্রভুর বিরহে নিমজ্জিত সমগ্র পুরীবাসী—শ্রীগদাধর পণ্ডিত, রায় রামানন্দ, সার্কর্ভোম ভট্টাচার্য্য, বক্তেশ্বর, শিখি মাহিতি, কাশীমিশ্র, কানাই খুটিয়া, বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রভৃতিকে দর্শন করিবার মৌভাগ্য লাভ করেন।—“প্রভুর বিয়োগে দশা যেরূপ সবারে। লক্ষ লক্ষ মুখে কেবা পারে বর্ণিবারে ? শ্রীবিগ্রহ মৌণ-মুদ্রারূপে রহে যৈছে। শ্রীনিবাস সর্বত্র দেখিল সবে তৈছে ॥”—(শ্রীভক্তিরত্নাকর ৩য় তরঙ্গ)। কিন্তু রাজা প্রতাপরুদ্রের দর্শন-লাভ শ্রীনিবাস-প্রভুর পক্ষে সম্ভব হইল না। কারণ, নীলাদ্রি-ভিন্ন যে মহাপ্রভুর অমৃত অবস্থানকে রাজা মানিয়া লইতে পারিতেন না, সেই প্রাণনাথের চির-অন্তর্দানকে তিনি কিরূপে সহ্য করিবেন ? তজ্জন্ম নীলাচলে অবস্থানই তাঁহার পক্ষে দুর্বিষহ হইয়া উঠিল।

“প্রভু কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের বিজ্ঞমানে। পুত্রে রাজা সমর্পিল মঙ্গল-বিধানে । বাহুদেব সার্কর্ভোম, রামানন্দ সনে । নিরন্তর মগ্ন প্রভু-চরিত্র-কীর্তনে । পরম আনন্দে দিবারাত্র গোড়াইতে । অকস্মাৎ উবেগে নারয়ে স্থির হৈতে । হেনকালে প্রভু-অদর্শন কথা শুনি’ । অঙ্গ আছাড়িয়া রাজা লোটায় ধরণী । শিরে করাঘাত করি’ হৈলা অচেতন । রায়-রামানন্দ মাত্র রাখিল জীবন । প্রভুর বিয়োগে রাজা সহিতে না পারে । নীলাচল হইতে রহিল কত দূরে । এঁছে কতজন সঙ্গে না হইল দেখা । মানে নিজ দুর্দৈব—দুঃখের নাহি লেখা ॥”

(ভক্তিরত্নাকর ৩।২১৪-২২০.)

এইস্থলে রাজার শ্রীচৈতন্য-বিরহে মুহূমান অবস্থা বিশেষ লক্ষণীয়। মহাপ্রভুর এরূপ অন্তর্দান না হইয়া যদি ঘটনাটি পাষণ্ড-প্রজন্মের অন্তরূপই হইত—তাহা হইলে প্রতাপরুদ্র বিরহকাতর না হইয়া রোদ্ৰ-মূর্তিই ধারণ করিতেন এবং শ্রীনিবাসাচার্য্য সেন্থলে পুরীধামে রক্তক্ষয়ী বিভীষিকাময় দৃশ্যই দেখিতেন।

মূলতঃ ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ সন্দ্বিহান হইলে সংশয়াক্রান্তের চিত্তের অতীব শোচনীয় অবস্থাই অধিকরূপে প্রমাণিত হইয়া পড়ে। যিনি সর্বকারণ-কারণ, তাঁহার বিয় কোন কিছু হইতেই ঘটিতে পারে না। “অবিজ্ঞা খণ্ডয়ে ধাঁ’র দাসের স্মরণে। সে প্রভুরে বিয় করিবেক কোন্ জনে ॥”—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।৫২৪)। সকল ভগবৎস্বরূপই ‘বিয়-বিনাশন’ ধর্ম্ম স্বাভাবিকরূপেই বর্ত্তমান—কিন্তু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বৈশিষ্ট্য অত্যান্ত ভগবৎস্বরূপ অপেক্ষাও অধিক। তাঁহার সেই বিশেষ পরিচয়টি হইল—“এমন রূপালু নাহি শুনি জিভুবনে। কৃষ্ণপ্রেমা হয় ধাঁ’র দূর দরশনে ॥”—(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।১২১)। যেমন,—“দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার। কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্ম্মী, পাষণ্ডী অপার ॥ সেই সব লোক প্রভুর দর্শন-প্রভাবে। নিজ নিজ মত ছাড়ি’ হইল বৈষ্ণবে ॥”—(চৈঃ চঃ মধ্য ২৩, ১০)। এমনকি ভগ্নংকর মত্তপ যবন-রাজাও মহাপ্রভুর প্রেমচেষ্ঠা গুণচর-মাধ্যমেই শ্রবণ করিয়া তাঁহার নামে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।—“শুনি মহাপাত্র কহে হঞা বিস্ময়। মত্তপ যবনের চিত্ত এঁছে কে করয়। আপনে মহাপ্রভু তাঁর মন ফিরাইল। দর্শন-স্মরণে ধাঁর জগৎ তারিল ॥”—(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।১৭৪, ১৭৫)। আবার ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবন উদ্দেশ্যে গমনকালে—“কৃষ্ণ, কৃষ্ণ’ কহ করি’ প্রভু যবে বলিল। ‘কৃষ্ণ’ কহি’ ব্যাঘ্র-মৃগ নাচিতে লাগিল ॥ নাচে কান্দে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ-সঙ্গে। বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব্ব রঙ্গে ॥”—(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।৪০, ৪১)। এইপ্রকার অতুল মহিমাময় শ্রীমহাপ্রভু যিনি দীর্ঘ অষ্টাদশবৎসর নীলাচলেই অতিবাহিত করিয়াছেন, সেই নীলাচল-বাসিগণই কেবল অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া গেলেন—এরূপ ভাবনা পাষণ্ডকুলের পাষণ্ড হৃদয়েই উদ্ভিত হইতে পারে—কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটি আদৌ সেইপ্রকার নহে।—“জগন্নাথ-সেবক যত রাজপাত্রগণ। যাত্রিক লোক, নীলাচলবাসী যত জন ॥ প্রভুর নৃত্য-প্রেম দেখি হয় চমৎকার। কৃষ্ণপ্রেম উপজিল হৃদয়ে সবার ॥”—(চৈঃ চঃ মধ্য ১৩।১৭৫)। এরূপ কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত ও মহাপ্রভুগত-প্রাণ তৎকালীন নীলাচলবাসী ও জগন্নাথসেবকগণের দ্বারা জোর করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের বিরোধিতা করাইলে ইতিহাসকে যে কিরূপভাবে বিকৃত করা হয়, তাহা স্ববুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিমানই উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

শ্রীপুরুষোত্তম-ধামসহ সমগ্র উৎকল-রাজ্যে শ্রীমন্নহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা বহু প্রাচীনকাল হইতে অত্যাধি চলিয়া আসিতেছে। স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ-মন্দির-চত্বরেই ভক্ত-নয়নাভিরাম বিশাল ষড়্ভুজ-শ্রীগৌরান্ধমূর্তি, মুণ্ডিতমস্তক ও উপবিষ্ট “শুভগৌরান্ধম”-বিগ্রহ, শ্রীমন্নহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম অত্যাধি সেবিত হইতেছেন। ইহা ছাড়াও মন্দিরের দ্বিতীয় প্রাকারের মধ্যে ও মূল-মন্দিরের চতুর্দিকে অবস্থিত বিরাট চত্বর এখনও ‘শ্রীচৈতন্য-মণ্ডপ’ নামে খ্যাত। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন রাজপ্রাসাদের মধ্যে আজও শ্রীপ্রতাপকৃষ্ণ ও তদীয় অধস্তনগণের সেবিত ‘শ্রীগৌর-গদাধর’ মূর্তি বিরাজমান আছেন। কেবল তাহাই নহে, ‘গৌরবাটসাহী’ নামে পরিচিত শ্রীধামের পল্লী ও পথসমূহ অত্যাধি গৌরস্মৃতি সংরক্ষণ করিতেছে। শ্রীরাধাকান্ত মঠে ( শ্রীকামীশ্রের ভবন তথা ‘গন্তোরা’ ) সংরক্ষিত শ্রীমন্নহাপ্রভুর পাছুকাড়ি এবং তথায় শ্রীগোপালগুরু-স্থাপিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহ, গঙ্গামাতা মঠে ( সার্বভৌম-গৃহ ) স্থিত শ্রীদার্বভৌম ভট্টাচার্য-স্থাপিত নৃত্যরত শ্রীগৌরমূর্তি এখনও সম্যকপ্রকারে সেবিত হইতেছেন। ইহা ছাড়াও শ্রীমন্নহাপ্রভুর অন্তর্দ্বানান্তর সময়ে শ্রীধামে ক্রমে ক্রমে স্থাপিত মঠসমূহে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রাচীন বিগ্রহসমূহ আজও সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছেন। শ্রীধাম ব্যতীতও উড়িষ্যার অন্তর্গত গড়জাত-রাজ্যসমূহ যথা—রথপুর, নরগড়, খণ্ডপাড়া, টিগিরিয়া, বড়াধা, আটগড়, নরসিংপুর, ডেংকানল, কালাহাণ্ডি প্রভৃতি রাজ্যে মহাপ্রভুর সময় হইতেই শ্রীজগন্নাথ-মন্দির ও শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহনজীর মন্দিরের সহিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বিশাল মন্দির অত্যাধি উড়িষ্যাবাসিগণের প্রবল গৌর-প্রীতির সাক্ষ্য বহন করিতেছে। উৎকলে খুব কম গ্রামই আছে, যেখানে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত নাই। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বহু সম্পাদিত ‘বিশ্বকোষ’ উল্লিখিত হিসাব অনুযায়ী উৎকলের প্রায় আটশতাধিক মন্দিরে এখনও ‘শ্রীগৌর-বিগ্রহ’ পূজিত হইয়া থাকেন। পুনরায়, Kennedy সাহেবের ‘The Chaitanya Movement’ গ্রন্থে দেখা যায়—“Orissa became such a stonghold of the Chaitanya faith that today the name of Gouranga is more commonly revered and worshipped among the masses in Orissa than in Bengal itself.” ইহা ছাড়াও শ্রীপ্রভাত-মুখোপাধ্যায়-কৃত ‘The History of Medieval Vaishnavism in Orissa’ প্রভৃতি বহু বহু গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-পার্বদগণের অনুরূপই তথ্যসমূহ ধৃত হইয়াছে। এইসকল প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ এবং তথ্যসমূহের প্রতি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যাহারা শ্রীচৈতন্যদেবকে হেয় প্রতিপন্ন করাইতে চাহেন, তাহারা

ইতিহাস বিকৃতির অপরাধে দণ্ডনীয়। যাহারা উক্ত পাষণ্ড-প্রদত্ত বয়ান গলাধঃ-  
করণ করেন, তাহারাও একইভাবে অত্যন্ত ঘৃণ্য।

কৃষ্ণবিরহী-মহাপ্রভুর সমুদ্রে নিমজ্জন-লীলা কে না জানে? অবশেষে যখন  
পরদিবস ধীবরের জালে ধৃত হইয়া সযত্নে উত্তোলিত হইলেন, তখন প্রভুর  
অঙ্গস্পর্শেই ধীবর কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া গেল। অতদ্বজ্জ কিন্তু সরল ধীবর  
মহাপ্রভুকে ‘ভূত’ জ্ঞান করিয়া নিজের কৃষ্ণপ্রেমোদয়কে ভূতের ক্রিয়া বলিয়া মনে  
করিয়াছিলেন। স্বরূপ-দামোদর প্রভুর সঙ্গ লাভ করিয়া অবশেষে সে প্রকৃত  
তত্ত্ব বুঝিতে পারিল।—“স্বরূপ কহে,—যাঁরে তুমি কর ভূত-জ্ঞান। ভূত নহে—  
তঁহো কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্। তাঁর স্পর্শে হইল তোমার কৃষ্ণ-প্রেমোদয়। ভূত-  
প্রেত-জ্ঞানে তোমার হৈল মহাভয়॥”—(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৮।৬৪, ৬৬)।  
অতঃপর উচ্চ-কৃষ্ণসঙ্কীর্ণনের ধ্বনি মহাপ্রভুর কর্ণে প্রবেশ করিলে তিনি হুঙ্কার  
করিয়া উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেই হুঙ্কার-ধ্বনিকে অত্মাপি পাষণ্ডকুল  
তাহাদের কর্ণবিবরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই—পাছে তাহাদের কৃষ্ণবিষয়ে বধিরতা  
দূর হইয়া যায়—পাছে মহাপ্রভুর প্রতি ‘ভূত-জ্ঞান’ পরিত্যাগ করিতে হয়—  
পাছে তাঁহাকে ‘সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ’-রূপে স্বীকার করিয়া বৈষ্ণব হইয়া যাইতে  
হয়। মৃত্যু, যম, কাল প্রভৃতি ষাঁহার আজ্ঞা-পালনকারী দাস, সেই তাঁহাকেই মৃত্যুর  
অধীন করিতে যাওয়া কিরূপ আত্মরিকতা! ষাঁহার বাক্যে মৃত-শ্রীবাসপুত্র মুখর  
হইয়াছিল (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫শ অধ্যায়), ষাঁহার আলিঙ্গন-স্পর্শেও ওকারণ্য-বনের  
ব্রোতাযুগ্মী ‘সপ্ততাল-বৃক্ষ’ সশরীরে বৈকুণ্ঠে আরোহণ করিয়াছিল, সেই অচিন্ত্য-  
শক্তিময় ভগবানের প্রতি মিথ্যা কলঙ্ক আরোপের দুরাগ্রহ কিরূপ আত্মরিকতা!

আত্মরিক স্বভাববশতঃ ভগবানের বিরোধিতা কেহ করিতে পারে—কিন্তু তাই  
বলিয়া উক্ত স্বভাববশতঃ কেহ ভগবান্কে হত্যা করিয়া ফেলিতে পারে না।  
ভগবান্ বরাহদেব-কর্তৃক হিরণ্যাক্ষ নিহত হইলে পর হিরণ্যাক্ষপুত্র ভগবান্ বিষ্ণুর  
রক্তে তর্পণ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেও কার্যতঃ তাহাকেই শ্রীহরির নিকট হস্ত  
হইতে হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ক্ষেত্রেও এইপ্রকার কতিপয় আত্মরিক  
প্রয়াস ঘটিয়াছিল—কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবেই উক্ত প্রয়াসসকল নিফল  
হইয়াছিল। মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণকালে একসময় পাষণ্ডী বৌদ্ধাচার্য্য  
সগর্বে সশিষ্য মহাপ্রভুর সহিত শাস্ত্রবিবাদ উত্থাপন করিলে দর্পহারী মধুসূদন  
তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্রকে তর্কের বিচারেই খণ্ড বিখণ্ড করিলেন। ইহাতে ক্ষিপ্ত  
বৌদ্ধগণ সকলে মিলিয়া ‘কুমন্ত্রণা’ করিয়া বিষ-প্রযুক্ত অপবিত্র-অন্ন মহাপ্রভুকে  
ভোজন করিতে দিলে উক্ত বৌদ্ধ-প্রধানকেই উহার প্রতিকূল পাইতে হইয়াছিল।

—“হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল। ঠোটে করি অন্নসহ খালি লঞা গেল ॥ বৌদ্ধগণের উপরে অন্ন পড়ে অমেধ্য হৈয়া। বৌদ্ধাচার্যের মাথায় খালি পড়িল বাজিয়া ॥ তেরছে পড়িল খালি—মাথা কাটি’ গেল। মুচ্ছিত হঞা আচার্য ভূমিতে পড়িল ॥”—(চৈঃ চঃ মধ্য ২।৫৪-৫৬)। পুনরায়, দক্ষিণের মালাবার-প্রদেশে আসিয়া মহাপ্রভুর ভ্রমণসঙ্গী তরলমতি কৃষ্ণদাস মারণ-উচাটন-বশীকরণে পারদর্শী স্থানীয় ভট্টথারিগণের কবলে পড়িয়াছিলেন। মহাপ্রভু তাহাকে উদ্ধার করিতে ভট্টথারি-গৃহে আসিয়া তাহাদের নিকট কৃষ্ণদাসকে প্রার্থনা করেন। প্রত্যুত্তরে তাহারা মহাপ্রভুকে অস্ত্র লইয়া আক্রমণ করিতে উত্তত হইলে নিজেদের অস্ত্রে তাহারা নিজেরাই আহত হইয়া পলায়ন করে।—

“শুনি সব ভট্টথারি উঠে অস্ত্র লঞা।

মারিবারে আইল সবে চারিদিকে ধাঞা ॥

তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাত হৈতে।

খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টথারি পলায় চারি ভিতে ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২।২৩১-২৩২)

শ্রীমন্তগবদগীতায় দেখিতে পাওয়া যায়,—“বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্। বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥” (গী ৭।১০)। ভগবান্ সর্বভূতের বীজস্বরূপ—তঁাহার বুদ্ধিতেই একজন বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তঁাহার তেজেই এক তেজস্বীর তেজ, তঁাহার বলেই বলবানের বল। সুতরাং সেই বুদ্ধি, সেই তেজ, সেই বল লইয়া পুনরায় সেই ভগবান্কেই আক্রমণ চলিতে পারে না। “যার শিল, যার নোড়া, তার ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া”—প্রবাদবাক্যটি আর যেক্ষেত্রে হউক ভগবানের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। কলে তৎকালে বুদ্ধিমানের বুদ্ধি লুপ্ত হইয়া যায়, তেজস্বী নিস্তেজ হইয়া পড়ে, বলবানের বল অপহৃত হয়। সেস্থলে বৌদ্ধাচার্যের বিবশ্রয়োগ কিংবা ভট্টথারিগণের অস্ত্র কিংবা পাষাণকল্লিত পাণ্ডাগণের শস্ত্র কিরূপে ভগবানের প্রতি আক্রমণীয় হইতে পারে ?

মহাপ্রভু এই ধরাধামে অবস্থানকালেই বেশ কয়েকবারই অশুদ্ধান-লীলার প্রকাশ ঘটাইয়াছেন। যেমন, দক্ষিণদেশ পারভ্রমণকালে তিনি কুম্ভাচলে ‘কুম্ভ’-নামক ব্রাহ্মণের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া তথায় রাত্রিবাস করিয়া প্রাতে পুনরায় যখন যাত্রা করিলেন, তখন ‘বাহুদেব-বিপ্র’ নামে এক কুষ্ঠরোগী মহাপ্রভুর দর্শন-লাভের জগ্জ উক্ত স্থানে আসিলেন। সেই কুম্ভ-বিপ্রের মুখে প্রভুর গমন-বার্তা শুনিয়া কুষ্ঠ-বিপ্র বিলাপ করিতে লাগিলে ভক্তবৎসল ভগবান্ তথায় সেইক্ষণে আবিভূত হইলেন এবং তিনি বাহুদেবকে আলিঙ্গন-সুখ প্রদানদ্বারা তঁাহাকে ব্যাধিমুক্ত করিয়া কুম্ভভজনের উপদেশ করিলেন। “এতক কহিয়া প্রভু কৈলা

অন্তর্দ্বানে। ছই বিপ্র গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে ॥—( চৈঃ চঃ মধ্য ৭।১৪৩ )। পুনরায়, পাষণ্ডী-বৌদ্ধাচার্য্য মহাপ্রভুকে কুমন্ত্রণা করিয়া বিষমিশ্রিত অন্ন-ভোজন করাইতে চাহিলে প্রতিফলস্বরূপে উক্ত বৌদ্ধ মন্তকে ‘খালির’ আঘাতে যখন মূর্ছাপ্রাপ্ত হন, তখন অস্বাস্থ্য বৌদ্ধগণ মহাপ্রভুর নিকট শরণাগত হইলে তিনি তাহাদিগকে কৃষ্ণসকীর্তনের উপদেশ প্রদান করেন। উহাতে বৌদ্ধাচার্য্য ‘চৈতন্য’ লাভ করিয়া মহাপ্রভুকে ‘স্বয়ং কৃষ্ণ’ বলিয়া তাঁহাকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। —“কৃষ্ণ বলি’ আচার্য্য প্রভুরে করেন বিনয়। দেখিয়া সকল লোক হইল বিস্ময় ॥ এইরূপ কোতুক করি’ শচীর নন্দন। অন্তর্দ্বান কৈল, কেহ না পায় দর্শন ॥” —( চৈঃ চঃ মধ্য ৯।৬২, ৬৩ )। এমতাবস্থায় মহাপ্রভুর পক্ষে অন্তর্দ্বানের মাধ্যমেই লীলা-সম্পাদন কি বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা? ( ক্রমশঃ )

## শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১২৫ পৃষ্ঠার পর ]

নিজস্ব ভক্তগণের দ্বারা সম্যকরূপে তিনি বশীভূত, অভক্তের দ্বারা বশীভূত নন। এই কথাটা বুঝতে চাচ্ছেন ‘ভৈজ্ঞজিত্ত্বং’ শব্দে। “টীকাকারগণ ভাগবতের এই বাক্যের অর্থ করছেন—‘তদ্বিদাং’—ভগবদৈশ্বর্য্য-জ্ঞানপর ভক্তগণকে দেখাচ্ছেন। ( অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গৌরব-মিশ্রিত ঐশ্বর্য্যমার্গের সেবকগণ এবং জ্ঞানী বা জ্ঞানমিশ্র ভক্তগণ অপেক্ষা মাধুর্য্য-রসামিশ্র উন্নত উজ্জ্বল রসের সেবকগণের নিকটই সর্ব্বতোভাবে বশীভূত, পরাজিত হয়ে থাকেন। )” একটু **Partiality**—পক্ষপাতিত্ব এসে গেল। এ পক্ষপাতিত্ব থাকবে ভগবানের। উপায় নেই। ‘আমি ত’ পাণ্ডবসখা, কোঁরব কি পর?—এই জিনিষটার বিচার করেছেন মহাভারতে। গীতার মধ্যে বিচারটা দেখানো হয়েছে। অর্জুন, আমাকে সবাই পাণ্ডবসখা বলে, কখনও ত’ শুনলাম না কেউ আমাকে কোঁরবসখা বলছে। তাহলে পাণ্ডবসখা বলছে কেন? কিন্তু আমি জানি অর্জুন, আমাকে পাণ্ডবসখা বললেও কোঁরব আমার পর নয়। তারো আমার নিজের লোক। আমি কি করব বল! আমি সব জেনেও শুনেও আমার নিরপেক্ষতা রক্ষা করি।

অভূত ব্যাপার! তুমি সব বুঝে শুঝে নিরপেক্ষতা রক্ষা কর? ভগবান্ বললেন—হ্যাঁ। আমার নিরপেক্ষতা রক্ষা মানে কি জান? আমি ভালকে ভাল বলি, খারাপকে খারাপ বলে মানি—এটাই হল নিরপেক্ষতা। আমি সাতের নেই, পাঁচের নেই। ‘ন দেবায় ন ধর্ম্মায়’। আমি ‘ন ঘাট্কা ন

পব্কা' এমন নয়। আমি সত্যপ্রিয়ী। সত্যকে আমি মানি। ভগবানের এক নাম ত্রিকালসত্য। দেবকীদেবীর গর্ভস্তুতি করছেন যখন, ব্রহ্ম-শিবাদি দেবতাগণ এসেছেন; অরুণ, বরুণ, বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণ এসেছেন, সেখানে স্তব করছেন,—

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্ত যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যো ।

সত্যস্ত সত্যমুতসত্যানেত্রং সত্যাত্মকং স্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥

সকল স্তবের বিশেষণগুলো সত্য দিয়েই। সত্যাত্মক তুমি তোমাকে আমি স্তব করি। তাহলে ভগবান্ সত্যের পক্ষে, মিথ্যার পক্ষে নন। মিথ্যার পক্ষে তিনি **Verdict** দেবেন না, **Judgement** দেবেন না। এই সত্য-মিথ্যার সুন্দর ব্যাখ্যা মহাভারতের মধ্যে বুঝানো আছে। সত্য, মিথ্যা কাকে বলব আমি? একজন বলছেন,—দেখুন মশায়, আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি না। আমি ভয়ানক বাহাহুর ব্যক্তি! আমি সত্যছাড়া মিথ্যা কখন বলি না। আপনি ওটা রক্ষা করতে পারবেন সবসময়?—বললেন,—হ্যাঁ, চেষ্টা ত' করি। চেষ্টা করলে হবে না, ওটা বিচার নয়। সত্য-মিথ্যার যে বিচার শাস্ত্রে লেখা আছে—এইটা এইটা সত্য, আর এইটা এইটা মিথ্যা, আপনার ত' সব জানা নেই। তাহলে আপনি কি করে সত্য নিয়ে চলবেন? শাস্ত্রীয় সত্য যেটা সেটা আমরা সবাই মেনে চলার জন্ত প্রস্তুত হব, আর শাস্ত্রীয় মিথ্যা যেটা সেটা ত্যাগ করবার জন্ত আমরা সব সময় প্রস্তুত থাকব। এইটাই কথা।

এখন শাস্ত্রীয় সত্য-মিথ্যা ত' আমার জানা নেই। আবার কৃষ্ণ এক জায়গায় ব্যাখ্যা দিচ্ছেন—সত্যটা মিথ্যা হয়ে যায় কোন স্থানে, মিথ্যাটা সত্য হয়ে যায় কোন স্থানে স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে। এত' মুস্তিলের কথা। সত্য-মিথ্যা মোটা-মুটি বুঝে নিয়ে চললাম—এটা একটা বাপার, আবার সত্য কোন জায়গায় মিথ্যা, মিথ্যা কোন জায়গায় সত্য হয়ে যায়—এ বিচারও আছে।

ভগবান্ ষাঁকে উপদেশ করছেন গীতায় সেই সখা অর্জুন ভগবানের আজ্ঞা পালন করে ভগবানে ভক্তিলভ করছেন। যদিও অর্জুন ভগবানে ভক্তিলভ করে আছেন তথাপি দৃষ্টান্ত: তিনি জগন্নের কাছে **Place** করছেন যে, হ্যাঁ আমি ভগবানের আজ্ঞা আদেশ সর্বতোভাবে পালন করবার প্রতিজ্ঞা নিলাম। যার জন্ত গীতার সর্বশেষ শ্লোক—চরম শ্লোক,—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং স্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

ভগবান্ এই যে তাঁকে আশ্রয় দিলেন অর্জুন তা মেনে নিয়েছেন। এতক্ষণ তোমাকে যে ধর্মান্ধের কথা বলেছি তা তোমার মাথায় ঢোকেনি। মাথায়

ওঁর ঠিক চুকেছে, কিন্তু যদি মাথায় চুকেছে আর আমি বুঝে ফেলেছি—একথা বলেন, তাহলে ভগবান্ আর কিছু বলবেন না, চুপ করে যাবেন। যাতে উপদেশ **Continue** চলতে থাকে, আলোচনা বন্ধ যেন না হয়, সেজন্ত তিনি বুঝতে পারছেন না, বুঝতে পারছেন না বলছেন। ভগবানের যিনি সখ্যতা লাভ করেছেন তাঁর কি তত্ত্বজ্ঞানের অভাব আছে? তিনি অত্যাধিক ব্যস্ত নন। “দাচ্য লাগি” পুছে এই সাধুর স্বভাব।” তিনি জানলেও পরে ঐ জিনিষ আবার জিজ্ঞাসা করেন। আরও দশজন গুরুক, বুঝুক। তাঁর জানা আছে। সেইজন্ত সাধুগণ প্রশ্ন করেন। সবাইয়ের প্রশ্ন ত’ এক নয়।

তাহঁদ্বি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই তিনটে হল জানবার, বুঝবার, শিখবার অধিকার, অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীর অধিকার, শিষ্য-শিষ্যার অধিকার, অন্ত্যেবাসীর অধিকার উপাধ্যায়ের কাছে। এই তিনটে মাধ্যম নিয়ে আমরা অগ্রসর হতে পারি জানার, বুঝার, শিখার জন্ত। প্রণিপাত—**Humble obeisance**—আমি কিছু জানি না, বুঝি না, আমাকে দয়া করে বলুন। এ ভাব থাকা দরকার। দ্বিতীয় :—পরিপ্রশ্ন—আমি কিছু শুনাচ্ছি, শুনে আমার সন্দেহ হচ্ছে—এটা কি, ওটা কি, সেজন্ত সে-বিষয়ে আবার প্রশ্ন। গুরুর গুরুগিরির পরীক্ষার জন্ত—গুরু সব জানেন কিনা একবার পরীক্ষা করে দেখি—সেরকম বুদ্ধি নয়। **Honest enquiry after truth**—বাস্তব সত্য আমি জানব, বুঝব, শিখব—সেইজন্ত আমার প্রশ্ন। আমি গুরু-বৈষ্ণবের বুদ্ধি পরীক্ষা করবার জন্ত প্রশ্ন করব না। যদি এ রকম হয় তাহলে সে প্রশ্নের কোন উত্তর বা **Response** আসবে না। এটাই নিয়ম। আর তৃতীয় অধিকার হল ‘সেবয়া’—সেবা—**Serving temperament**। এই তিনটে গুণ যখন আমার থাকবে তখন আমি কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি, জানবার, বুঝবার সুযোগ লাভ করতে পারি। অন্ত্যায় নয়, সেই কথা বুঝানো আছে।

কৃষ্ণ বলছেন,—দেখ অর্জুন, তুমি সব জান না। যদি জান না তবে আমার কথা শোন।

“দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মানুষ্যাস্তি তে।”

এই বিচারে এসে যাবে। তুমি যখন জান না তখন আমার কাছে শোন, আমার কথায় নির্ভর কর, আমার কথা বিশ্বাস কর। শুধু আমার কথা বিশ্বাস করতে হবে না, আমার একান্ত ভক্তের কথায় বিশ্বাস কর। সেখানেও **Submission**



দাও, তাহলে তুমি জানতে পারবে, বুঝতে পারবে। তিনি শুধু নিজেকে বলেন নাই, তাঁর ভক্তকে নিয়ে বিচার করেছেন। আমার একান্ত ভক্তের শরণাগত হও, তাহলে তোমার তত্ত্বদর্শন জানার অসুবিধা হবে না।

কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা জানা নেই আমাদের। শাস্ত্রীয় যে সত্য সেটাই সত্য; শাস্ত্রীয় যে মিথ্যা সেটাই মিথ্যা। সত্যটাকে আমরা সবসময় গ্রহণ করব, মিথ্যাটাকে আমরা সবসময় বর্জন করার চেষ্টা করব। এখন সত্য কখনও মিথ্যা হচ্ছে এবং মিথ্যা কখনও সত্য হচ্ছে। Submission দিয়ে বাস্তবসত্য অল্পভব করলেন, উপলব্ধি করলেন সখা অর্জুন। মেনে নিয়েছেন শেষকালে, হাতজোড় করেছেন। সখ্যভাব কেটে গিয়েছে। সখ্যভাব অর্থাৎ তুমি আমি সম—এমন ভাব। অর্জুন যখন হাতজোড় করেছেন তখন থেকে উপদেশ আরম্ভ হয়েছে, তার আগে হয়নি। অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। পূর্ণ আত্মসমর্পণ, অল্প সল্প নয়। অল্পে ভগবান্ সন্তুষ্ট নন। পূর্ণ শরণাগতি দেখেছেন তাব বলতে আরম্ভ করেছেন। ‘শিষ্যন্তেহহম্’—আমি তোমার শিষ্য স্বীকার করলাম ঠাকুর, আমি কিছু বুঝতে পারছি না ভালমন্দ আমার। সব আত্মীয়স্বজন এসেছেন, আর তুমি এদের মারতে বলছ! কি করে হয় এটা আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। “কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংযুক্তচেতাঃ।” ধর্মাদ্বন্দ্ববিচার আমি সব হারিয়ে ফেলেছি। “যচ্ছ্রেয়ঃ স্যামিচ্ছিতং ব্রহ্মি তন্মে”। ‘শ্রেয়ঃ’-শব্দের ব্যাখ্যা দিয়েছেন কি?—আত্মকল্যাণসূচক উপদেশ, আর ‘প্রেরঃ’-শব্দের অর্থ হল জাগতিক ভাল-মন্দের বিচার। আমার আত্মকল্যাণসূচক যে ব্যাপার সেটা তুমি নিশ্চিত করে বল, আমার আত্মকল্যাণ কিসে হবে। আমি ত’ সব বিচার হারিয়ে ফেলেছি। মনে মনে হাসছেন কৃষ্ণ। মনে মনে বললে হবে শিষ্য স্বীকার করলাম? তুমি অন্তর থেকে বলছ আমি কি করে বুঝব? তুমি অন্তর থেকে বলছ না। তারপরে আবার প্রমাণ দিচ্ছেন—‘শাধি মাম্’। শিষ্যের অধিকার কি?—শাসন স্বীকার করা। ‘গুরোরাজাহবিচারণীয়া’—ইহাই শিষ্যের অধিকার। ‘শাধি মাম্’—আমাকে শাসন কর। মুখে ত’ বলছ শাসন কর, কিন্তু শাসন মানছ কোথায় তুমি? আমি যখন বললাম—তুমি যাদের আত্মীয়স্বজন ভাবছ ওরা আত্মীয়স্বজন নয়, ওরা স্বজনাত্ম দৃষ্ট্য, আততায়ী। আমার কথায় বিশ্বাস কই, প্রত্যয় কই? সেজন্য তুমি আমার কথা পালন করতে পারছ না।

“বিস্বজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥”

কান্নাকাটি শুরু করেছ তুমি এখন। তুমি যে এখন শিষ্য স্বীকার করে

বলছ শাসন কর, তোমার শাসন মেনে নেওয়া আমার ধর্ম, কিন্তু তা ত' তুমি করছ না, মানছ না। শেষকালে অর্জুন বললেন,—‘স্বাং প্রপন্নম্’—তোমার প্রপত্তি স্বীকার করি। আর কোন কথা থাকল না। তখন থেকে কৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিতে শুরু করলেন। সখ্যভাবে ওটা হয়নি সম্ভব, হাতছোড় করতে হয়েছে। সেই উপদেশ পর পর সব চলেছে। কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যার কথা এসেছে। হল না কিছু। বিশ্বরূপ দর্শন করালেন। দেখিয়ে দিলেন, অর্জুন তুমি কি করবে হে। তুমি খুব বাহাদুর, তুমি সব কবুনেবালা। বোকা তুমি, তোমার দ্বারা কিছু সম্ভব হচ্ছে না। “মর্যৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিস্তমাজ্ঞং ভব সবাসাচিন্ ॥” যেটা হবে এই যুদ্ধক্ষেত্রে সেটা দেখে রাখ। আগেতান্নে *film* দেখিয়ে রাখছি কি হবে। ‘নিমিস্তমাজ্ঞং ভব সবাসাচিন্’—হে সবাসাচী অর্জুন! তুমি নিমিস্তমাজ্ঞ হও। মাথায় ঢুকলো না। তারপর গুহবাক্য, গুহতর বাক্য, গুহতম বাক্য বললেন। “সর্বগুহতমং তুর্যঃ শৃণু যে পরমং বচঃ।” তাও মাথায় ঢুকলো না। তখন কৃষ্ণ বললেন,—সব ছাড়। এযাবৎ যা বলেছি পশ্চম হয়ে গেছে আমার। এখন আমার শেষকথা—*Last verdict, Last final word* শোন।

সারা জীবন একটা ছেলে মা-বাবার কথা শোনে না। পিতা যখন অস্তিম শয্যায় শায়িত সে-সময় ছেলেকে ডেকেছে—ওরে হতভাগা! আর। হতভাগা স্নিয়ে বসেছে মুমূর্ষু পিতার কাছে। তখন পিতা বললেন,—দেখ, তুই ত' সারাজীবন আমার কথা শুনলি না, এখন ত' আমি চলে যাব, এ সম্পত্তির অধিকার তোকে সব দিয়ে যাচ্ছি। তুই সব সম্পত্তির মালিক। আর গুণগোল করিস না, ধীর-স্থির, শান্ত-শিষ্টভাবে চল। দেশের দেশের মধ্যে তুই একজন প্রধান হবি ওটা আমি দেখে যেতে পারলাম না। তবে তুই এরকম থাকিস। বলে যাচ্ছেন শেষ কথাগুলো, কিন্তু আমার এই এই ইচ্ছা তুই লিখে রাখ, পালন করবি। তখন ছেলে বলছে,—বাবা, তুমি বেঁচে থাকিতে ত' তোমার কোন আদর-যত্ন, সেবা-সুস্রবা করতে পারিনি, মারা যাওয়ার পর আমি ভেবেছি তোমাদের স্বর্ণপ্রতিমা গড়ে আমি পূজা করব। তখন পিতা বলছেন, মা পাশে বসে আছেন, বেঁচে থাকতে করলি না, মরে গেলে স্বর্ণপ্রতিমা গড়ে পূজা করবি কি করে বিশ্বাস করতে পারি! বিশ্বাসযোগ্য নয়। তথাপি পিতা বলছেন,—ওটা আমাদের দরকার নেই। আমার শেষ ইচ্ছা যেটা, সেটা করবি তাহলে হবে। আগে হয়ত' পুত্রকে আইন করে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন। কিন্তু মরে যাওয়ার সময় তাকে ডেকে উকিল, রেজিস্টার এনে দেখালে

লেখাপড়া করছেন, আবার ক্ষমতা, অধিকার দিচ্ছেন তাকে—তারা পুত্রকে । কথাটা কিরকম ? ওই শেষটাই বহাল হবে । আগে যে দলিল করেছেন সে দলিল cancel, শেষের দিকের দলিল চালু । “পূর্বপর্যায় পরবিশি বলবান”—এই আইনানুসারে Last verdict কার্যকরী হয় । আইনে আছে এটা । ( ক্রমশঃ )

## পাশ্চাত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম-প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহ-সভাপতি ও সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদিগ্ভিষ্মাশ্রী শ্রীমন্তজিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ তৃতীয়বার পাশ্চাত্যদেশে শ্রীগৌরবাণী-প্রচারে আসিয়া এষাবৎকাল স্তূরুপে প্রচারকার্য্য চালাইয়া যাইতেছেন ।

বিগত ২।৫।২৭ তারিখে ভারতের রাজধানী দিল্লীর ইন্দিরাগান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হইতে রওনা হইয়া London এ পৌঁছান । ৩।৫।২৭ ও ৪।৫।২৭ Birmingham-এ দুদিনের ধর্মভাষ্য বেদ, বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রজেনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, জীবের ত্রিতাপ ভোগের কারণ, ত্রিতাপ হইতে উদ্ধারের উপায়-স্বরূপ কৃষ্ণভক্তি প্রসঙ্গে শ্রী মহারাজজী ‘অন্তাভিলাষিতাশুভম্’ শ্লোকের অবতারণা করিয়া বলেন,—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকর ও রুচিকর সেবাই ভক্তি । এই প্রীতিকর ও রুচিকর অক্লূল অহুশীর্ণনের সহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, ইহাই শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বয়ং ভগবান্ কখনও কখনও নিজে আসেন । কখনও অবতারগণকে অবতীর্ণ করান, কখনও বা প্রয়োজনানুসারে নিম্ন পরিকর ও ভক্তবৃন্দকে প্রেরণ করেন ।

দ্বিতীয় দিনের সভাতে শ্রী মহারাজজী বলেন যে,—সম্পূর্ণ বিশ্ব আজ বৈদিক জ্ঞানের দিকে ঝুঁকিতেছে । এর কি কারণ ? জগতের সকলেই সুখী হইতে চাহেন, দুঃখ কেহই চাহেন না । জড়বিজ্ঞান আজ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছিয়াছে সত্য, ইহাতে জড়দেহের ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়াছে, আত্মার ক্ষুধা নষ্ট হইয়া যাইতেছে । উত্তরোত্তর ভোগ করিয়াও ভোগপিপাসা দূর হইতেছে না । “না জাতু কামং কাম্যনামুপভোগেন শাম্যতি ।” জড় বিজ্ঞানে কোথাও আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া হয় নাই । কেবলমাত্র ভারতীয় দর্শনে ইহার অহুসঙ্কান পাওয়া যায় । ভারতীয় দর্শন পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়—“কে আমি, কেন মোরে জারে তাপদ্রয় । ইহা নাহি জানি মোর কৈছে হিত হয় ।” ভারতীয় দর্শন ব্যতীত বিশ্বের কোন দর্শনেই ইহার অহুসঙ্কান নাই । কেবলমাত্র Bat, drink and be merry এই পর্য্যন্তই । এর পরেও যে কিছু হইতে পারে তাহা তাহার। ভাবিতেও পারেন না । বর্তমান বিজ্ঞান computer আবিষ্কার করিয়াছে ।

তাহাতেও আবার E-Mail, Internet বহু কিছু রহিয়াছে। কিন্তু বৈদিক বিজ্ঞান এতদপেক্ষা কোটীগুণ উন্নত ছিল। বর্তমান জড়বিজ্ঞান তাহার ধারে কাছেও যাইতে পারে না। পরীক্ষিত মহারাষ্ট্র শাপগ্ৰস্ত হইলেন, E-Mail ব্যতীতই সমস্ত ঋষিগণ মুহূর্তের মধ্যেই একত্রিত হইলেন। বর্তমান বিজ্ঞান ইহাতে অসমর্থ, সমস্ত জগৎ ভারতীয় দর্শনকে অঙ্গীকার করিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে তবেই চিরস্থায় শান্তি লাভ করিতে পারিবে।

৫।৫।২৭—১৩।৫।২৭ পর্যন্ত লণ্ডনের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতাতে নারদ চরিত্র, ব্যাসের মানসিক অশান্তির কারণ, শ্রীকৃষ্ণভজনে বৈষ্ণব অপরাধ সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। শ্রীব্যাস-নারদ-সংবাদে গুরুদেব শ্রীনারদ ঋষি কেমন ওত্তম ও সর্বমুখ, শিষ্যের সমস্ত সংশয় ছেদনে সমর্থ তাহা বর্ণন করেন। শ্রীনারদ ঋষি ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করেন—শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান—ইহা কোথায় বর্ণন করিয়াছ? তিনি সখাগণের সহিত খেলাধুলার কাঁধে চড়েন ও কাঁধে চড়ান লিখিয়াছ? সখাগণ বলেন—তুমি কেন বড়, তুমি আমি সম। ইহা লিখিয়াছ? ভগবান অজিত হইয়াও মা যশোদার প্রেমে বশীভূত হইয়া বন্ধন স্বীকার করেন—ইহা বর্ণন করিয়াছ? ব্রজাঙ্গনাগণের প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ‘ন পারয়েহং’ বলিয়াছেন, তাহা কি লিখিয়াছ?—না, তাহা হইলে তুমি কি লিখিয়াছ? শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবন্তা, তাহার মধুরলীলা বর্ণন করিলেই তুমি স্থখ-শান্তি লাভ করিবে। নারদ ঋষির নিকট ব্যাস অস্তবৎ বলিলেন,—আমি কিভাবে লিখিব? এখানে শ্রীগুরুদেব এবং শিষ্যের ব্যবহার দেখাইলেন। শ্রীনারদ ঋষি কৃপাপরবশ হইয়া তাহার উপায় বলিয়া দিলেন। ভক্তিবোধগেয় দ্বারা সমাহিতচিত্তে তিনি পূর্ণপুরুষকে দর্শন করিলেন এবং মায়াকে লজ্জিতভাবে পিছনে অবস্থান করিতে দেখিলেন। লজ্জিতভাবে এবং পিছনে কেন মায়াদেবী অবস্থান করিতেছেন? মায়াদেবী ভাবিতেছেন,—অহো! ভগবানের দ্বিগুণ জীবসকলকে আমাকে এইভাবে কষ্ট দিতে হইবে? এই ভাবিয়া তিনি পিছনে লজ্জিতভাবে দাঁড়াইয়া আছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীকৃষ্ণশিক্ষা প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বৈষ্ণব অপরাধ হইতে সাধকগণের দূরে থাকা প্রধান এক প্রথম কর্তব্য তাহা জানান। বৈষ্ণব অপরাধ হইতে দূরে না থাকিলে সাধক কোন জগ্নেই ভক্তিতে অগ্রসর হইতে পারিবে না। জ্ঞাতে অজ্ঞাতে আমরা অনেক অপরাধ করিয়া থাকি, ইহা হইতে আমাদের সাবধান থাকিতে হইবে। ছয় প্রকার বৈষ্ণব অপরাধ বর্ণন করিয়া বারম্বার ইহা হইতে সাবধান থাকিতে নির্দেশ দেন।

১৪।৫।২৭—২৬।৫।২৭ পর্যন্ত California হিত Badgerএ বক্তৃতা করেন।

তথায় এক প্রস্তাব উত্তরে শ্রীল মহারাজজী পূজ্যপাদ স্বামী মহারাজের শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রতি আকর্ষণের কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন,—পরমারাধ্য মদীয় গুরুদেবের গুরুনিষ্ঠা, অনন্তসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, লৌকিক ও শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখিয়া ও শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এইজন্যই শ্রীগোষ্ঠীয় বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারই নিকট সন্মাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের যুগয়া, পিপাসার্ত হইয়া শমীক ঋষির আশ্রমে গমন, সমাধিস্থ ঋষির গলায় মৃতসর্প প্রদান, ঋষিপুত্রের অভিষাপ, গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন, শুকদেব গোস্বামীর আগমন, পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্ন এবং প্রস্তাব উত্তরই সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবতের Continuation-এ ক্রব, প্রহ্লাদ, বলী, অক্ষরীষ, বৃজাঙ্গর, পুরঞ্জন, ভবাটবী-উপাখ্যান বর্ণন করেন। অবশেষে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নন্দনন্দনত্ব স্থাপন করেন।

জনৈক শ্রোতার প্রশ্নের উত্তরে সর্বজনমাগুগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবদগীতা অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনমুখে তুলনামূলক আলোচনা করেন,—

গীতা	ভাগবত
১। গীতার চরম কথা পূর্ণ শরণাগতি।	১। ভাগবতের চরম উপদেশ— শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ।
২। মহাভারতের মধ্যে গীতা বর্তমান, তথাপি বাসদেব মানসিক শান্তি পান নাই।	২। ভাগবত প্রকাশের পর ব্যাসদেবের মনের যাবতীয় অশান্তি দূরীভূত হইয়াছিল।
৩। গীতার উদাহরণ শুনিয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সন্তুষ্ট হন নাই, 'এহো বাহু' বলিয়াছেন।	৩। ভাগবতের প্রমাণ-স্লোক শুনিয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু কখনই 'এহো বাহু' বলেন নাই।
৪। গীতাকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলা হয় নাই।	৪। 'তমাদিদেব' স্লোকের দ্বারা ভাগবতকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলা হইয়াছে।
৫। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়কে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বলা হয় নাই।	৫। ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধকে শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ অঙ্গ বলা হইয়াছে।
৬। গীতায় শ্রীকৃষ্ণকে রসসমুদ্র বলা হয় নাই।	৬। 'মল্লানামশনিবৃণাম্' স্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে দ্বাদশ রসের উপাস্ত বলা হইয়াছে।

ভক্তির উৎকর্ষ প্রদর্শনমুখে জানীভক্ত, শুদ্ধভক্ত, প্রেমীভক্ত, প্রেমপরভক্ত, প্রেমাতুর ভক্তের তুলনামূলক আলোচনা করেন। দশমস্কন্ধ আলোচনামুখে দ্বাদশ রসের উপাত্ত যশোমতীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অবতারের দ্বাদশ কারণ বর্ণন করেন,—

১। যুগধর্ম স্থাপন—

যদা যদা হি ধর্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত।  
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।  
পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।  
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্ত্যমামি যুগে যুগে।

২। ‘অনুগ্রহায় ভক্তানাং মাহুষং দেহমাপ্রিভ’। সমস্ত প্রকার রস আনন্দ-কারণ, যাহা অস্ত্র অবতारे সন্তব নয়। ‘মস্তক-বিনোদায় করোমি বিবিধ ক্রিয়া’।

৩। পৃথিবীদেবীর হুং দেখিয়া ব্রহ্মা ক্ষীরসাগর তটে গমন করিলে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন,—আমার প্রভু পৃথিবীর হুং জানিয়াছেন, তিনি তাঁহার হুং অপনোদনার্থ শীঘ্রই ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন।

৪। কশ্যপ ও অদিতির ইচ্ছাপূরণার্থ ধরাতে আগমন।

৫। দ্রোণ ও ধরার ইচ্ছাপূরণার্থ অবতরণ।

৬। বলী মহারাজের কন্তা রত্নমালার হৃদয়ে বামনদেব দর্শনে তাঁহাকে সন্তপ্তান করাইবার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। পরে ত্রিবিক্রমরূপে তাঁহার দ্বারাই বলী মহারাজকে নাগপাশে বদ্ধ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন,—‘সন্ত নয়, বিষ পান করাইব।’ কৃষ্ণলীলাতে রত্নমালাই পূতনারূপে লীলাপুষ্টি করেন।

৭। জনকপুরীর রাজকন্তাগণ মধ্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের রূপে মুগ্ধ হইয়া মনে মনে শ্রীরামকে বরণ করিবার অভিলাষ গোষণ করেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় তাঁহারা গোপীরূপে আসেন।

৮। দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের ইচ্ছাপূরণ।

৯। শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে লোকরঞ্জনার্থ ত্যাগের পর প্রতি বৎসর যজ্ঞ করিবার জন্য স্বর্ণসীতা বামে রাখিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করেন। স্বর্ণসীতাগণ রামচন্দ্রের সঙ্গী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণলীলায় তাঁহাদের ইচ্ছাপূরণের আশ্বাস প্রদান করেন। পরবর্তিকালে তাহারা গোপীরূপে আসেন।

১০। হর্পনখার ইচ্ছাপূরণার্থ অবতার গ্রহণ। হর্পনখা শ্রীরামকে পতিরূপে পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল। হর্পনখাই কৃষ্ণলীলায় কুজা।

১১। যদুহারাভ ভগবন্তজন্য নিজ পিতা যযাতি মহারাজের আজ্ঞা পালন করেন নাই। ইহা দেখিয়া ভগবান বলিলেন,—‘অহো! আমার জন্ম এতবড় ত্যাগ, এই যত্ববশেই আমাকে আসিতে হইবে।’

১২। শ্রীরামচন্দ্র যত কঠিন কঠিন কাজ লক্ষ্মণের দ্বারা করাইভেন। লক্ষ্মণ প্রতিজ্ঞা করেন এইবার আসিলে বড় ভাই রূপে আসিব, ছোট ভাই রূপে আর আসিব না, নিজের ইচ্ছা মত দেবা করিব। আমিই আদেশ দিব। শ্রীকৃষ্ণ-লীলার লক্ষণ হলেন শ্রীবলদেব।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাতে পুতনাবধ, শকটাসুর-বধ, ভৃগুবর্তাসুর-বধ, অঘাসুর-বধ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া উক্তলীলার রহস্য ও শিক্ষা বর্ণন করেন।

২৭। ১৯২৭—১৯৩৭ পর্যন্ত Sanfrancisco-তে শ্রীনাম-মহিমা, শ্রীকৃষ্ণকথার মাধ্যমেই ভক্তহৃদয় জয় করেন। শ্রীঅজ্ঞানের বিস্ময়কর দর্শন এবং মা যশোদার বিস্ময়কর দর্শনের পার্থক্য, মা যশোদার বৈশিষ্ট্য, শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাণ্ড ঘাটে মাটি খাওয়ার শিক্ষা, কৃষ্ণ সত্যসঙ্কল্প, ত্রিসত্য ইহা প্রমাণিত হয়। মা যশোদার দক্ষিণমুখকালে কৃষ্ণ কেন বিছানা ত্যাগ করিয়া মায়ের নিকট আসিয়াছিলেন?—‘মন্তুজা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠন্তি নারদ’—ইহাই মূখ্য কারণ। সাধক কেন ভগবন্তের চরণ আশ্রয় করিবেন? প্রহ্লাদ চরিত্রের ‘গুরুশ্রবণা...ঈশ্বরারাধনেন চ’—শ্লোকের দ্বারা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। ইহা পুষ্টির জন্য শাস্ত্র হইতে বিভিন্ন প্রমাণ এবং শ্লোকের অবতারণা করেন। দামবন্ধন-লীলাতে দুই অঙ্গুলি দড়ি কম হওয়ার রহস্যে মহাপ্রভুর বিচারদ্বারা প্রমাণ করেন। ২৯। ৩৭ তারিখে Houston-এ শুভবিজয় করেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীনবীনকৃষ্ণ প্রজ্ঞাচারী, বিদ্যালঙ্কার

**শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ**  
**বুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে**  
**সাদর আহ্বান**

ফোন : ৩২৬২১

**শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি**  
(রেজিষ্টার্ড)

**শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ**

পো: তুরা, পিন-৭২৪০০১

জেলা—ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নিয়ামক নিত্যগীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ  
১০৮শ্রী শ্রীমন্তকিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিঃসৃতধারায়  
সমিতির বর্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তকি-  
বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে অত্যন্ত বৎসরের তায় এই  
বৎসরেও উক্ত মঠের সেবকবৃন্দের উত্তোগে আগামী ২২শে শ্রাবণ (ইং ১৪।৮।২৭)  
বৃহস্পতিবার হইতে ২৬শে শ্রাবণ (ইং ১৮।৮।২৭) সোমবার পর্যন্ত পঞ্চম দিবস-  
ব্যাপী শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের বুলনযাত্রা ও ১লা ভাদ্র (ইং ২৫।৮।২৭) শ্রীকৃষ্ণের  
জন্মাষ্টমী উপলক্ষে উক্ত মঠে শ্রীমন্তাগবত পাঠ, কীর্তন, ধর্মসভা, নগর-সকীর্তন,  
ছায়াচিত্র এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীযোগে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাদি প্রদর্শন  
তথা বিশেষভাবে শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক,  
ভোগরাগ এবং শ্রীনন্দোৎসব-দ্বিবসে সর্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা  
হইবে।

অতএব, ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাঙ্কবে যোগদান  
করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই  
মহদানুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির  
সেবাকার্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী স্বকৃতি অজ্জিত হইবে।  
বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—২রা শ্রাবণ, ১৪০০

শুদ্ধভক্ত-রূপালেশপ্রার্থী—

সত্যবৃন্দ,

**শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি**

---

**জ্ঞেয়্যঃ**—কোন বিষয়ে জানিতে হইলে বা আত্মকূল্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা  
করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজের নিকট  
উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।



## শ্রীজন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান-সূচী

৩২শে শ্রাবণ ( ইং ২৪।৮।২৭ ) রবিবার—

ব্রাহ্মমুহুর্তে—যথারীতি মঙ্গলারতি ও কীর্তন ।

পূর্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও শ্রীনাম-সকীর্তন ।

অপরাহ্নে—মহাজন-পদাবলী কীর্তন ।

গোধূলিগ্নয়ে—সঙ্কারতি ও শ্রীতিকীর্তন ।

রাত্রে—শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও অধিবাস-কীর্তন ।

১লা ভাদ্র ( ইং ২৫।৮।২৭ ) সোমবার—

মঙ্গলারতি—ভোর ৪ টায় ।

নগর-সংকীর্তন—মঙ্গলারতি অন্তে প্রাতঃ হইতে পূর্বাহ্ন ৮টা পর্য্যন্ত  
নগর পরিক্রমা ।

পূর্বাহ্নে—৮-৩০ টায় পর সম্পূর্ণ দিবস শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভরদ্বিধী হইতে

শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা-প্রসঙ্গ পারায়ণ ।

সঙ্কার—আরাট্রিক ও শ্রীহরিনাম কীর্তন ।

রাত্রি—৮টা হইতে ধর্মসভা, রামমঙ্গল ও ছায়াচিত্রযোগে

শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন ।

২রা ভাদ্র ( ইং ২৬।৮।২৭ ) মঙ্গলবার—

মঙ্গলারতি—ভোর ৪ টায় ।

পূর্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্তন ।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ ।

সঙ্কার—আরাট্রিক ও কীর্তনান্তে ধর্মসভা, পরে ছায়াচিত্রযোগে

শ্রীশ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন ও রামমঙ্গল ।

---

বিঃ জ্ঞঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যাহুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্তন স্বীকার্য্য ।

---

## বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৮ই ভাদ্র, ২৫ আগষ্ট, সোমবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাসের  
পারণ পরদিবস নক্ষত্রাহুরোধে বৈকাল ৪।৩৮ গতে সূর্য্যাস্ত ৫।৫২ মধ্যে করণীয় ।  
কিন্তু অশক্ত বৈষ্ণবগণপক্ষে উৎসব-শেষে, তিথ্যন্তে, নক্ষত্রমধ্যে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়  
৫।১৯ গতে পূর্ব্বাহ্ন ৯।৩১ মধ্যে পারণ দোষাবহ নহে ।

---

॥ শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গে জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরমর ।  
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিষয়শূন্য

অগ্ন ধর্ম স্মরূপে পালে যেই জন  
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৯শ বর্ষ }

১ পদ্মনাভ, অনিরুদ্ধ, ৫১১ শ্রীগৌরাঙ্গ  
৩১ ভাদ্র, বুধবার, ১৪০৪, ইং ১৭/৯/৯৭

{ ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

## শ্রীকার্তিক-ব্রত-মাহাত্ম্যম্

[শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য ষোড়শবিলাসে]

১। ব্রতন্ত কার্তিকে মাসে যদা ন কুরুতে গৃহী ।  
ইষ্টপূর্ত্তং বৃথা তস্য যাবদাহুতনারকী ॥

১। গৃহস্থ মনুষ্য যদি কার্তিকমাসে ব্রত না করে, তাহা হইলে তাহার ইষ্টপূর্ত্ত-কর্ম বিফল হইবে এবং সে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নরকে বাস করিবে ॥

২। ইষ্টা চ বহুভির্যজ্ঞে কৃত্বা শ্রাদ্ধশতানি চ।

স্বর্গং নাপ্নোতি বিপ্রেন্দ্র অকৃত্বা কার্ত্তিকে ব্রতম্॥

২। হে বিপ্রেন্দ্র! যদি কোন ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে ব্রত না করিয়া বহু বহু যজ্ঞদ্বারা যাগ এবং শত শত শ্রাদ্ধ করে, তথাপি সে স্বর্গ প্রাপ্ত হয় না॥

৩। যদন্তপ্তং পরং জপ্তং কৃতঞ্চ সুমহত্তপঃ।

সর্বং বিফলতামেতি অকৃত্বা কার্ত্তিকে ব্রতম্॥ ৭॥

৩। যাহা দান করিয়াছে, যাহা জপ করিয়াছে এবং যে কিছু সুমহৎ তপস্যা করিয়াছে, কার্ত্তিকমাসে ব্রত না করিলে তৎসমুদায় বিফলতা প্রাপ্ত হয়॥ ৭॥

৪। নিয়মেন বিনা চৈব যো নয়েৎ কার্ত্তিকং মুনে।

চাতুর্ন্যাস্যং তথা চৈব ব্রহ্মহা স কুলাধমঃ॥ ৮॥

ন গৃহে কার্ত্তিকে কুর্য্যাদ্বিশেষণ তু কার্ত্তিকম্।

তীর্থে তু কার্ত্তিকীং কুর্য্যাৎ সর্বযত্নেন ভাবিনি॥ ৯০॥

৪। হে মুনে! যে ব্যক্তি বিনা নিয়মে “কার্ত্তিক মাস” অথবা “চাতুর্ন্যাস্য” যাপন করে, সে কুলাঙ্গার ব্রহ্মহত্যাকারী হয়॥ ৮॥

হে ভাবিনি! কার্ত্তিক মাসে বিশেষ করিয়া “কার্ত্তিকব্রত” গৃহে করিবে না, সর্ব প্রকার যত্নসহকারে তীর্থে কার্ত্তিকব্রত করিবে॥ ৯০॥

৫। বিষেগঃ পূজা কথা বিষেগবৈষেবানাপ্ত দর্শনম্।

ন ভবেৎ কার্ত্তিকে যস্য হস্তি পুণ্যং দশাব্দিকম্॥ ১৪॥

৫। যাহার পক্ষে কার্ত্তিকমাসে বিষুৱ পূজা, বিষুৱ কথা এবং বৈষেবদিগের দর্শন না ঘটে, তাহার দশবৎসরের পুণ্য বিনষ্ট হয়॥ ১৪॥

৬। মেরুতুল্যসুবর্ণানি সর্বদানানি চৈকতঃ।

একতঃ কার্ত্তিকো বৎস সর্বদা কেশবপ্রিয়ঃ॥ ১৭॥

৬। হে বৎস! একদিকে মেরুতুল্য সুবর্ণ ও সর্বপ্রকার দান, আর একদিকে সর্বদা কেশবপ্রিয় কার্ত্তিকমাস॥ ১৭॥

৭। ন কার্ত্তিকসমো মাসো ন কুতেন সমং যুগম্।

ন বেদসদৃশং শাস্ত্রং ন তীর্থং গঙ্গয়া সমম্॥ ২১॥

৭। ( হে ব্রহ্মন! ) কার্ত্তিকের সমান মাস নাই, সত্যযুগের সমান যুগ নাই, বেদের সদৃশ শাস্ত্র নাই, গঙ্গার সমান তীর্থ নাই॥ ২১॥

৮। প্রবৃত্তানাপ্ত ভক্ষ্যাণাং কার্ত্তিকে নিয়মে কৃতে।

অবশ্যং কৃষ্ণরূপত্বং প্রাপ্যতে মুক্তিদং শুভম্॥

৮। যে-সকল দ্রব্য নিত্য ভক্ষণ করে, কার্তিকমাসে যদি তাহার কিছু সঞ্চেচ করা যায়, তাহা হইলে সে অবশ্য মুক্তিপ্রদ পরম মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের সারূপ্য লাভ করিবে।।

৯। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা মুনিসত্তম।

বিযোনিং ন ব্রজত্যেব ব্রতং কৃতা তু কার্তিকে।।

৯। হে মুনিসত্তম! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র, ইহারা যদি কার্তিকমাসে ব্রত করে, তাহা হইলে কখনও বিযোনি প্রাপ্ত হইবে না।।

১০। কার্তিকে মুনিশাদূল সশক্ত্য বৈষ্ণবং ব্রতম্।

যঃ করোতি যথোক্তং মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা ॥ ২৬।।

১০। হে মুনিশাদূল! যে ব্যক্তি কার্তিকমাসে যথোক্ত বৈষ্ণবব্রত ধারণ করে, মুক্তি তাহার করে অবস্থিত হয়।। ২৬।।

১১। প্রদক্ষিণঞ্চ যঃ কুর্যাৎ কার্তিকে বিষ্ণুসদ্বান্।

পদে পদেহশ্বমেধস্য ফলভাগী ভবেন্নরঃ।।

১১। যে নর কার্তিকমাসে বিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণ করে, সে পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলভাগী হয়।।

১২। গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ কার্তিকে পুরতো হরেঃ।

যঃ করোতি নরো ভক্ত্য লভতে চাক্ষয়ং পদম্ ॥ ৩২।।

১২। যে মনুষ্য কার্তিকমাসে হরির অগ্রে ভক্তিপূর্বক গীত, বাদ্য ও নৃত্য করে, সে অক্ষয় পদ প্রাপ্ত হয়।। ৩২।।

১৩। সৰ্ব্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য কার্তিকে কেশবাগ্রতঃ।

শাস্ত্রাবতরণং পুণ্যং শ্রোতব্যঞ্চ মহামুনে ॥ ৩৫।।

সৰ্বান্ ধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইষ্টাপূজাদিকান্নরঃ।

কার্তিকে পরয়া ভক্ত্যা বৈষ্ণবৈঃ সহ সংবসেৎ ॥ ৩৭।।

১৩। হে মহামুনে! সৰ্ব্বধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কার্তিকমাসে কেশবের অগ্রে পুণ্য-স্বরূপ শাস্ত্রাবতরণ শ্রবণ করিবে।। ৩৫।।

মনুষ্য ইষ্টাপূৰ্ত্ত প্রভৃতি সকল ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কার্তিকমাসে পরম ভক্তিসহকারে বৈষ্ণবগণের সহিত বাস করিবে।। ৩৭।।

১৪। যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে।

অষ্টাদশপুরাণানাং কার্তিকে ফলমাপুয়াৎ ॥ ৩৬।।

১৪। হে মুনে! যে ব্যক্তি কার্তিকমাসে যত্নবান্ হইয়া নিত্য ভাগবতের শ্লোক পাঠ করেন, তাহার অষ্টাদশ পুরাণ-পাঠের ফল হয়।। ৩৬।।

১৫। কার্তিকে ভূমিশায়ী যো ব্রহ্মচারী হবিষ্যভুক্ত।

পলাশপত্রং ভুঞ্জানো দামোদরমথার্চয়েৎ ॥

স সৰ্ব্বপাতকং হিত্বা বৈকুণ্ঠে হরিসন্নিধৌ।

মোদতে বিষ্ণুসদৃশো ভজনানন্দনিবৃত্তঃ ॥ ৩৮ ॥

১৫। যে ব্যক্তি কার্তিকমাসে ভূমিশায়ী, ব্রহ্মচারী ও হবিষ্যশী হইয়া পলাশপত্রে ভোজন করত দামোদরের অর্চন করে, সে সকল পাপ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুসদৃশ ও ভজনানন্দে নিবৃত্ত হওত বৈকুণ্ঠে হরি-সন্নিধানে আনন্দ লাভ করে ॥ ৩৮ ॥

১৬। বিষেণঃ শিবস্য বা কুর্যাদালায়ে হরিজাগরম্।

কুর্যাদম্বথমূলে বা তুলসীনাং বনেষু চ ॥

আপদগতো যদাপ্যন্তো ন লভেৎ সবনায় সং।

ব্যাধিতো বা পুনঃ কুর্যাদ্বিষেণনার্মাপমার্জ্জনম্ ॥ ৪৩ ॥

১৬। বিষ্ণু অথবা শিব কিম্বা অম্বথমূল বা তুলসী-কানন—এইসকল স্থানে হরিজাগরণ করিবে। যদি আপদগত হইয়া মানের নিমিত্ত জল প্রাপ্ত না হয় অথবা ব্যাধিগ্রস্ত থাকে, তাহা হইলে বিষ্ণু-নামদ্বারা অপমার্জ্জন অর্থাৎ জলস্পর্শ করিবে ॥ ৪৩ ॥

## প্রশ্নোত্তর

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০৮ পৃষ্ঠার পর ]

১২। চতুর্থ নামাপরাধটি কি?

“সকল বেদ ও সকল উপনিষদে নাম-মাহাত্ম্য দৃষ্ট হয়। এই সকল শ্রুতির নিন্দা করিলে নামাপরাধ হয়। অনেকে দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রুতির অন্যান্য উপদেশকে অধিক সম্মান করত নামার্থ-প্রতিপাদক শ্রুতির প্রতি যে অবহেলা করে, তাহাই তাহাদের নামাপরাধ; সেই অপরাধ-ক্রমে তাহাদের নামে রুচি হয় না।”

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

১৩। নামে ‘অর্থবাদ’ অপরাধটি কিরূপ?

“যাহারা নাম-মাহাত্ম্য-বাচক শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণসমূহে অর্থবাদ আছে—এই কথা বলে, তাহারা অক্ষয় নরকে পতিত।”

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

১৪। নামে অর্থবাদ-কল্পন কাহাকে বলে?

“অর্থবাদ এই যে, শাস্ত্র নাম-সম্বন্ধে যে মাহাত্ম্য বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃত নয়, কেবল নামে মতি প্রদান করিবার জন্য একরূপ ফলশ্রুতি লিখিয়াছেন। এই নামাপরাধে সেই সকল লোকের নামে রুচি হয় না। তোমরা শাস্ত্রোক্ত বাক্যে বিশ্বাসপূর্বক হরিনাম গ্রহণ করিবে; যাহারা অর্থবাদ করেন, তাহাদিগের সঙ্গ করিবে না; এমন কি, হঠাৎ তাহাদিগকে দেখিলে বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে, এইরূপ শিক্ষা শ্রীগৌরান্দ্র দিয়াছেন।”

—জৈঃ ধঃ ২৬শ অঃ

১৫। হরিনামকে কল্পিত মনে করিলে কি হয়?

“ভগবানের নাম-সকলকে কল্পিত মনে করিলে নামাপরাধ হয়। মায়াবাদিগণ এবং কর্মজড়-সকল মনে করেন যে, পদমতত্ত্ব বন্ধ নির্বিকার ও নাম-রূপশূন্য। তাঁহার রামকৃষ্ণাদি নাম কার্য্যসিদ্ধির জন্য ঋষিগণ কল্পনা করিয়াছেন—যাঁতাদের এরূপ সিদ্ধান্ত, তাঁহারা নামাপরাধী।”

—জৈঃ ধঃ ২৭শ অঃ

১৬। নামবলে পাপবুদ্ধি-নামাপরাধের স্বরূপ কি?

“যাঁহাদের নামবলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি হয়, তাহারা নামাপরাধী। নামের ভরসায় যে-সকল পাপ করা যায়, তাহা যম-নিয়মদ্বারা শুদ্ধ হয় না। কেন না, তাহা নামাপরাধের মধ্যে গণিত হওয়ায় নামাপরাধ-ক্ষয়ের যে পদ্ধতি আছে, তাহাতেই তাহাদের ক্ষয় হয়।”

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

১৭। হরিনামে ও পাপে কাটাকাটির চেষ্টাকে কি বলে?

“হরিনামও করি, পাপও করি, জমা খরচ হইয়া অবশেষে কিছুই পাপ থাকিবে না—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া যিনি নামাশ্রয়ের পর ইচ্ছাপূর্বক নূতন পাপ করেন, তাহাকে কপটী ও নামাপরাধী বলা যায়।”

—‘নামবলে পাপপ্রবৃত্তি একটি নামাপরাধ’, সং তোঃ ৮।৯

১৮। কিরূপ আচরণ-ফলে নামবলে পাপ-বুদ্ধির উদয় হয়?

“কিছু কিছু অপরাধ থাকায় উচ্চারিত নাম কেবল ‘নামাভাস’ হয়, (শুদ্ধ) নাম হয় না। নামাভাসেও পূর্বের পাপের ক্ষয় হয় এবং নূতন পাপে রুচি জন্মে না, কিন্তু পূর্ব অভ্যাসক্রমে কিছু কিছু পাপাবশেষ থাকে, তাহা নামাভাসে ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে থাকে; কদাচিৎ কোন পাপ হঠাৎ হইয়া পড়ে, তাহাও নামাভাসে দূর হয়; কিন্তু যদি সেই নামাশ্রয়ী ব্যক্তি এরূপ মনে করেন যে, নামের দ্বারা যখন সকল পাপ ক্ষয় হয়, আমি যদি কোন পাপ করি, তাহাও অবশ্য ক্ষয় পাইবে—এই ভরসায় তিনি যে পাপাচরণ করেন, সেই পাপ অপরাধ হইয়া পড়ে।”

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

১৯। অন্য শুভক্রিয়াসাম্য অপরাধটি কিরূপ?

“হরিনাম সাধনকালে উপায় হইলেও ফলকালে স্বয়ং উপেয়; অতএব হরিনামের সহিত অন্য কোন সৎকর্মের তুলনা নাই। যাঁহাদের মনে অন্য সৎকর্মের সহিত হরিনামের অনন্যবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাঁহারা নামাপরাধী।”

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

২০। নামে রতি না হইবার প্রধান প্রতিবন্ধক কি?

“অন্য সমস্ত নামাপরাধ পরিত্যাগ করিলেও, অনবধান থাকিতে কখনই নামে রতি হয় না।”

—‘উৎসাহ’, সং তোঃ ১১/১

২১। প্রমাদ বা অনবধান কয় প্রকার?

“প্রমাদ অনবধান—এই মূল অর্থ।

ইহা হৈতে ঘটে প্রভু সকল অনর্থ।।

ওদাসীন্য, জাড্য আর বিক্ষেপ—এ তিন।

প্রকার অনবধান বুঝিবে প্রবীণ।।”

—হঃ চিঃ ১২শ পঃ

২২। বিক্ষেপ প্রমাদাসক্তগণের চেষ্টা কিরূপ?

“যাঁহারা বিক্ষেপরূপ প্রমাদাসক্ত, তাঁহারা নির্দোষ নামসংখ্যা যত শীঘ্র শেষ করিতে

পারেন, তাহার চেষ্টা করেন। নাম-সাধনে যাহাতে সেরূপ অযত্ন না হয়—ইহা বার বার সতর্কতার সহিত দেখা আবশ্যিক।” —প্রমাদ, হং চিঃ

২৩। অনবধান-অপরাধ দোষের আকর কিরূপে?

“চিন্ত্ত একদিকে, আর অন্যদিকে নাম।

তাহার মঙ্গল কিসে হয় গুণধাম॥

লক্ষ্যনাম হৈল পূর্ণ সংখ্যামালা গণি’।

হৃদয়ে নহিল রসবিন্দু গুণমণি॥

এই ত’ অনবধান-দোষের প্রকার।

বিষয়ি-হৃদয়ে প্রভু বড় দুর্নিবার॥”

—হং চিঃ ১২শ পঃ

২৪। কি উপায়ে জাড্য দূর হয়?

“অব্যর্থকালত্ব-ধর্ম সাধুর চরিত।

দেখিলে তাহাতে রুচি হইবে নিশ্চিত॥

মনে হ’বে আহা কবে ইঁহার সমান।

স্মরিব, গাইব নাম হয়ে’ ভাগ্যবান্॥

সেই ত’ উৎসাহ আসি’ অলসের মনে।

জাড্য দূর করে কৃষ্ণনামের স্মরণে॥”

—‘প্রমাদ’, হং চিঃ

২৫। হরিনামে ওদাসীন্য আসে কেন?

“কনক, কামিনী আর জয়-পরাজয়।

প্রতিষ্ঠাশা, শাঠ্যবৃত্তি তাহার নিলয়॥

এসব আকৃষ্টি হৃদে হইলে উদয়।

নামেতে অনবধান স্বভাবতঃ হয়॥

—‘প্রমাদ’, হং চিঃ

২৬। অশ্রদ্ধধানে নামোপদেশ কিরূপ?

“যাহাদের শ্রদ্ধা হয় নাই, অপ্রাকৃত-সেবায় বিমুখ এবং হরিনাম শ্রবণে রুচিহীন, তাহাদিগকে হরিনাম উপদেশ করিলে নামাপরাধ হয়।” —জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

২৭। ‘অহং মম’ ভাবাপরাধ কিরূপ?

“যিনি এই জড়ীয় সংসারে ‘আমি একজন এবং এই সমস্ত সম্পত্তি ও জনগণ আমার’—এরূপ বুদ্ধিতে মত্ত হইয়া থাকেন, কদাচিৎ কোন ক্ষণিক বিরাগ বা জ্ঞানের উদয় হইলে পণ্ডিতদিগের নিকট নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, অথচ সেই নামে যে প্রীতি করা উচিত, তাহা করেন না, তিনিও নামাপরাধী।” —জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

২৮। দীক্ষিত ব্যক্তির ভক্তি-পথ হইতে চ্যুতির কারণ কি?

“দীক্ষিত হইয়াও অধিকাংশ বিষয়ী লোক এই জড়দেহে অহংতা ও মমতাবুদ্ধি করিয়া ভক্তিপথ হইতে দ্রষ্ট হন।” —‘অহংমম ভাবাপরাধ’, হং চিঃ

২৯। ‘অহংতা-মমতা’ দূর করিবার উপায় কি?

“নিষ্কিঞ্চনভাবে ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণ।

বিষয় ছাড়িয়া করে নাম সংকীর্ণন॥

সেই সাধুজনে অশ্বেষিয়া তাঁ’র সঙ্গ।

করিবে, সেবিবে ছাড়ি’ বিষয়-তরঙ্গ॥

ক্রমে ক্রমে নামে মতি হইবে সঞ্চার।,

অহংতা-মমতা যা'বে, মায়া হ'বে পার।।” —‘অহংমম-ভাব’, হঃ চিঃ

৩০। নামাপরাধীর লভা কি?

“নামাপরাধী যে ফল বাঞ্ছা করিয়া নাম উচ্চারণ করেন, নাম সেই সকল ফল তাহাকে দিয়া থাকেন; কিন্তু কখনই তাহাকে প্রেমফল দেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নামাপরাধের ফলভোগ হয়। —জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

৩১। কিরূপে নামাপরাধ ক্ষয় হয়?

“কৃষ্ণের শ্রীমূর্তি-প্রতি অপরাধ করি’।

নামাশ্রয়ে সেই অপরাধে যায় তরি’।।

নাম-অপরাধ যত নামে হয় ক্ষয়।

অবিশ্রান্ত নাম লৈলে সর্বসিদ্ধি হয়।।

—ভঃ রঃ ২য় যামসাধন

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

## শ্রীরূপ-শিক্ষা

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১১ পৃষ্ঠার পর ]

“অচ্যে বিষেণ শিলাধীশ্বরকৃষ্ণ নরমতিবৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ

বিষেণকর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেহম্বুবুদ্ধি।

শ্রীবিষেণনাম্নি মস্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-

বিষেণ সর্বেশ্বরেণে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সং:।।”

এ বুদ্ধি করলে নরক গমন অবশ্যজ্ঞাবী। বিগ্রহে কাঠ, মাটি দর্শন করলে নরক। নারায়ণ-সহ ইতর দেবতাগণের সমত্ব করা পাষণ্ডতা। শিবাদির স্বতন্ত্র মনন নামাপরাধের অন্তর্গত। কৃষ্ণনামের বদলে কালী বা গণেশের নাম করলে দ্বিতীয় নামাপরাধ। অবুঝ লোক সারাদিন এই কথাই বলে—অন্য দেবতার নাম করলে মঙ্গল হবে না কেন? ভগবান্ তাঁদের কিছু শক্তি দিয়েছেন, যে কেবল জড়ভূমিকার পরিচালনা করতে মাত্র সমর্থ। সেটিকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা নরকগমনচেষ্টা মাত্র। ভগবানের দাসকে ভগবান্ বললে অপরাধ।

“একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূত্যা।”

অন্য পর্বতের শিলা এনে রাস্তা তৈরী করে। ঐ শিলা ও গিরিধারী Chemical Laboratory তে এক হতে পারে, কিন্তু গিরিধারীকে বিষ্ণুজ্ঞানের পরিবর্তে মায়িক জ্ঞান করলে নরক অবশ্যজ্ঞাবী। শালগ্রামের সেবাগ্রহণ-যোগ্যতা নাই বিচার করলে প্রায়শ্চিত্ত হইতে হ’বে। গুরুকে মনুষ্যবুদ্ধি বা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিও নরকপাতের কারণ।

শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম।

বৈষ্ণবো বর্ণবাহোহপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্।।

বিষ্ণুভক্তদেবীকে অতি নীচ কুকুরখাদক মনে করতে হ’বে। অবৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করতে হবে। ‘হরিজন’ বলতে পাপজীবগণকে মনে করতে হবে না। যাঁরা হরির সেবক তাঁরাই হরিজন।



গৃহীত-বিষুদীক্ষাকো বিষুপূজাপরো নরঃ ।

বৈষ্ণবোহভিহিতোহভিজৈরিতরোহস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥

কস্মিনিষ্ঠ ব্যক্তি এ বিচার বুঝবে না। নিষ্ঠা—নৈরন্তর্য্যে স্থিতি, যেখানে পরিবর্তনশীলতা নাই। কর্ম্ম একতাৎপর্য্যপরতা, কস্মিনিষ্ঠায় স্বর্গাদি লাভ ঘটে, নিজে ফল পায়। সংকস্মীর ফললাভ একমাত্র ধর্ম্ম।

জ্ঞানীর বিচার—জগতের বিভিন্ন বস্তুর একতাৎপর্য্যপর। তার গুণজাত অংশ বাদ দিলে Substratum থাকে, attribute সরে যায়। জিনিষটা Tabularasa হয়ে যায়। তাঁরা জানেন বিশ্বের পরিচিত যে ব্যাপার তার শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করলে সবই এক। কাঠ বা Lantern এর যে শক্তি-পরিচয়ের কথা এর Qualification গুলো বাদ দিলে যে বস্তুকে আশ্রয় করে ও বস্তুটা—দুটো আলাদা থাকে না। অন্তর্য্যামিত্র-সূত্রে উভয়ের অন্তর্য্যামিত্র এক জিনিষ। সাংখ্যায়ন ও একায়ন দুই রকম বিচার। বিভিন্ন বস্তুকে এক বিচার করলে এক হয়। একে বহু দর্শন বিশিষ্টা দ্বৈত-ভেদযুক্ত, বহু বস্তুকে এক দর্শন অভেদ বিচার। একটা জিনিষের Composition analyse করা, Synthetic mood এ এক করা একটা জিনিষ। রামানুজাচার্য্য একত্ব বিচারে বিভিন্ন শক্তি এবং শক্তি-পরিণামবাদ স্বীকার করেছেন। কালসৃষ্টির আগে যা আছে, যা'তে কালক্ষেপ বস্তু প্রযুক্ত হ'বে না, তা গোলোক। সেখানে যেতে হ'বে, সেটা ব্রজ। বিনাশযোগ্য যেটা তাকে Godhead বলা অপরাধজনক। ভেদ-জগতে ঈশ্বরবিমুখতা থেকে সংসার। সকলই অদ্বয়জ্ঞানে বিচার হ'লে—

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।

ব্রহ্মৈতি পরমাত্মৈতি ভগবানিতি শব্দতে ॥

মধ্বমুনি এই শ্লোকের টীকা করতে গিয়ে ভেদের একত্ব দেখিয়েছেন। এই শব্দদ্বয়ে বাস্তব-বস্তুকে লক্ষ্য করেছেন। ভেদবিচার অপরাধজনক। প্রত্যেক শব্দ বিষু ব্যতীত অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করছে, এটা মনোধর্ম্মে নিরূপিত হয়। এসব বস্তুর সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ না জানায় ভেদজ্ঞান। একই জিনিষকে ভেদজ্ঞান করছে। বিশেষ ধর্ম্মকে রহিত করা হ'লে সেই বস্তু ব্রহ্ম। “ধর্ম্মঃ প্রোক্তিতকৈতবঃ” বিচার গ্রহণ করা কর্তব্য। জ্ঞানী বলেন, আমরা নির্বিশেষবাদী। ‘কেন কং বিজনীয়াৎ।’ দ্রষ্টা ও দৃশ্য না থাকলে দর্শন-কার্য্যটা হয় না।

চেতন জগতে নীতাত্ত্ব, অচিৎ জগতে জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ-বিচার। জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ—এই ধর্ম্মত্রয় ত্রিগুণের অন্তর্গত ব্যাপার। যারা জগতের অভিজ্ঞতা ত্যাগ করতে প্রস্তুত তাদৃশ জ্ঞানীর বিচার ব্রহ্মের সহিত একীভূত হওয়া। তাদের বিচার—‘তত্ত্বমসি স্বেতকেতো’, ‘প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম’, ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ ইত্যাদি। যাঁরা কর্ম্ম করেন তাঁরা কস্মী। কর্ম্মের কর্তা, সাধন ও ফল বর্তমান, তাহা লাভে বাসনাযুক্ত ব্যক্তি কস্মী। উত্তরাধিকারীর সার্টিফিকেট পেলে প্রেতের সম্পত্তিতে আমাদের অধিকার। এগুলি যিনি ত্যাগ করেন, তিনি জ্ঞানী।

কস্মিভাঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জেনিন-

স্তেভ্যোজ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ ।

তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোহপি সা রাধিকা

প্রেষ্ঠা তদ্বদীয়ং তদীয় সরসী তাং নাশয়েৎ কঃ কৃতী ॥ (ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ

## প্রগতির পরিণাম

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬০ পৃষ্ঠার পর]

বর্তমান প্রগতিতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শাসনে যে সমস্ত নূতন আইন প্রচলিত হইতেছে, তাহাতে পাশ্চাত্তানুকরণই প্রকাশ পায় এবং ঋষি-ব্যবস্থার উৎসাদনদ্বারা পাশ্চাত্তানুপ্রদত্তি প্রচলনে স্বীজাতির প্রতি বহুবিধ স্বাধীনতার সুযোগ প্রদত্ত হইয়াছে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে—পত্নীর মনস্তৃষ্টি করিতে না পারিলে পতির প্রতিদণ্ড প্রয়োগ করা হইবে।—এইরূপ আইন-প্রচলনের চেষ্টা চলিতেছে। স্বী-প্রধান শাসন-পদ্ধতি কতদূর সুফলদায়ক হইবে তাহা চিন্তা করত অনেকে বিশেষভাবে ভীতিগ্রস্ত হইতেছেন। ঋষি-প্রবর্তিত পতিভক্তির পরিবর্তে পত্নীভক্তিই বর্তমান প্রগতির লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। ঋষিদের ব্যবস্থা পরমার্থ-মূলক ও সংযমপ্রধান ছিল। বর্তমান প্রগতিতে সমাজ যৌনসুখমূলক ও সংযমশূন্য প্রকাশ পাইতেছে। মনুষ্যজীবন ও পশুপক্ষীদের জীবনের পার্থক্য একমাত্র পরমার্থ; নচেৎ পরমার্থশূন্য ইন্দ্রিয়তর্পণপর মনুষ্যজীবন ও পশুজীবনকে ভেদহীন বলা হইয়াছে।—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনস্বঃসামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।

ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

বর্তমান প্রগতিতে বিবাহ-ব্যবস্থায় রেজিষ্টারি-বিবাহ চালু হইয়াছে। অসবর্ণ-বিবাহ, স্বীলোকের বহুবিবাহ এবং বিধবাবিবাহ উচ্চবর্ণেও বর্তমানে প্রচলিত। বিবাহ-বর্ষপূর্তির উৎসবানুষ্ঠান ধনীসম্প্রদায়ে প্রসারলাভ করিয়াছে। বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত, অসমর্থ ও অসুস্থ পিতামাতার সেবার পরিবর্তে তাঁহাদিগকে Oldage Home এ আশ্রয় প্রদান করা হইতেছে। বেকার সহোদরকে একমুষ্টি অন্নদানে পরাঙমুখ অথচ অনুন্নতের প্রতি দরদ ও মানবিকতার মুখভরা বচন বাস্তব কল্যাণজনক কিনা, তাহা বিবেচনীয়। নানাবিধ শাস্ত্রবিহীন কুযুক্তিদ্বারা তথাকথিত সাধুসমাজে অমেধ্য ও তামসিক আহার দোষনীয় নহে বলিয়া প্রচলিত রহিয়াছে। ত্যক্তগৃহ ও চতুর্থাশ্রমী নামধারী কিছু সাধুবেষধারীদের অবৈধ প্রণয় ও স্বীসঙ্গকে নিন্দা করিতে ও শাসন করিতে প্রতিষ্ঠানের কর্তব্যব্যক্তিগণের উদাসীনতা কেন? ধর্মসম্বন্ধে ও ভালমন্দ বিচার না করিয়া সকল ধর্মকেই সমমর্যাদা প্রদান করা কর্তব্য—ইহাই বর্তমান প্রগতি।

কলেদের্দেবনিধে রাজমস্তিহোকো মহান্ গুণঃ।

কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গ পরং ব্রজেৎ ॥

—এই সুসত্য কল্যাণকর শাস্ত্রীয়বচনের গুরুত্ব ও সুফল বিবেচনা করত সমাজ ও রাষ্ট্র কোনরূপ আইন প্রচলন না করায় বর্তমান প্রগতিকে অপরাধজনক বলা অসঙ্গত নহে।

মহারাজ পরীক্ষিত দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি কলিকে দমন করত ঘোষণা করিয়াছিলেন— মুক্তিকামিব্যক্তি কখনই কলিকে প্রদত্ত স্থানপঞ্চকের অর্থাৎ দ্যুতক্রীড়া, মাদকসেবা, অবৈধ স্বীসঙ্গ, জীবহিংসামূলক অমেধ্য-আহার এবং ইহাদের উৎপত্তিস্থান জাতরূপ (সুবর্ণ) ইত্যাদির সেবা করিবেন না। বিশেষতঃ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি, রাজা, লোকনেতা ও গুরুর কার্যকারী ব্যক্তির উক্ত কার্যগুলি অবশ্যই বজ্জনীয়।—

অথৈতানি ন সেবেত বুভুষুঃ পুরুষঃ স্বচিৎ।

বিশেষতো ধর্মশীলো রাজা লোকপতিগুরুঃ ॥

সর্বোপরি জীবের সর্বোত্তম গতি বিবেচনায় শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়—

হরেনার্ম হরেনার্ম হরেনার্মৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

—এই ত্রিসত্যকৃত্বে বচনে হরিনামই মনুষ্যের পরম গতি বলা হইয়াছে। এই হরিনাম ব্যতীত “গতি নাই” বাক্যটিও প্রতিজ্ঞা করত তিনবার উচ্চারিত হইয়াছে। ইহাতে কোনও সন্দেহ থাকা অনুচিত। কিন্তু হায়! বর্তমান প্রগতি এরূপ মঙ্গলজনক বাক্য ও নির্দেশকেও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করত পরম অমঙ্গলজনক দুষ্টচরিত্রোদ্দীপক কাল্পনিক প্রদর্শনী প্রতি গৃহে গৃহে দূরদর্শন ও দূরশ্রবণ প্রভৃতি যন্ত্রদ্বারা নিরন্তর প্রচার করিতেছে। এই যন্ত্রমাধ্যমে পরম মঙ্গলময় কলিমলবিধ্বংসী হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রধানরূপে প্রচার করা কি প্রগতির পরম কর্তব্য নহে? সমাজ ও রাষ্ট্রকে এতদ্বিষয়ে আকৃষ্ট ও রুচিসম্পন্ন করা কি বিশুদ্ধ প্রগতি হয় না।

বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রেই হরিসঙ্কীর্তনকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরম মঙ্গলজনক গতি বলিয়াছেন।—

১। ওঁ আহস্য জানস্তো নাম চিদিবজন্ম মহন্তে বিশেষ সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎ সং।

(ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল)

২। অনাবৃষ্টিঃ শব্দাৎ অনাবৃষ্টিঃ শব্দাৎ অনাবৃষ্টিঃ শব্দাৎ (ব্রহ্মসূত্র)

৩। নাম সঙ্কীর্তনং যস্য সর্বপাপপ্রণাশনম্। প্রণামো দুঃখশমনং তং নমামি হরিং পরম্ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত)

৪। এতাবানেব লোকেহস্মিন পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিয়োগো ভগবতি তন্মামগ্রহণাদিভিঃ ॥ (ঐ, যমরাজের উক্তি)

৫। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।

নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥ (কলিসন্তরণোপনিষৎ)

৬। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ। (অগ্নি পুরাণ)

সর্বোপরি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ—মহামন্ত্র।—

প্রভু বলে, কহিলাম এই মহামন্ত্র

ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ।

ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।

সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥ (চৈঃ ভাঃ মধ্য)

—ত্রিদিগ্ভিম্মী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

## সাধুসঙ্গ

যুধিষ্ঠির মহারাজ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— কি-প্রকারে সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ লাভ করা যায় এবং ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। ভীষ্ম বলিলেন,— ভগবানের মায়ায় এই বিশ্ব চরাচর বিমোহিত। মুঢ়জন মায়াতে বন্দী হইয়া “মম মাতা মম পিতা মমঞ্চ গৃহিণী গৃহম....।” কেবল আমার আমার করিয়া সর্বদাই অস্থির। কিন্তু তাহারা জানে না পুত্র, মিত্র, ভাৰ্য্যা কেহই সঙ্গে যাইবে না। যদি বহু জন্মের সুকৃতি ফলে তাহার সাধুসঙ্গ লাভ হয়, সাধু দর্শন হয়, তাহা হইলে আনায়াসে মায়াজাল বন্ধন ছেদন করিয়া সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

কলিক নামে এক ব্যাধ ছিল। সে দুরাচারী ছিল এবং বহু পাপকার্য্যে লিপ্ত ছিল। চুরি, হিংসা, পরদ্রোহ, বেশ্যাসক্তি প্রভৃতি এমন কোন পাপ কার্য্য ছিল না যে সে করে নাই। একদিন সে সৌভরি নগরে প্রবেশ করিয়া একটা রম্য সরোবর তীরে দেবালয় দেখিতে পাইল। সেই দেবালয় নানা ধাতুদ্বারা বিরচিত এবং উপরে স্বর্ণকলস স্থাপিত। উহা দেখিয়া ব্যাধের মন খুব আনন্দিত হইল। সে মন্দিরের নিকট গিয়া একজন ব্রাহ্মণকে বসিয়া থাকিতে দেখিল। সেই ব্রাহ্মণের নাম উতক। উতক সর্ব গুণাশ্রিত ছিলেন। তিনি বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। সর্বোপরি তিনি অতিশয় সাধু ছিলেন। মন্দিরে পূজার সামগ্রীসমূহ স্বর্ণ নির্মিত। সেই সব স্বর্ণপাত্র দেখিয়া কলিক ব্যাধের খুব আনন্দ হইল এবং সে মনে মনে স্থির করিল—রাত্রিকালে সাধু উতককে মারিয়া দ্রব্যসামগ্রী লইবে। এই প্রকার ভাবিয়া সে মন্দিরের নিকট বনে লুকাইয়া রহিল। রাতে খাড়া লইয়া সে সাধুকে মারিতে গেল। সাধুর বুকে জানু দিয়া খড়্গদ্বারা প্রহার করিতে উদ্যত হইলে সাধু বলিলেন,—আমি ত’ তোমার কোন ক্ষতি করি নাই, তুমি অকারণ কেন আমাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছ। তিনি তাহাকে অনেক শাস্ত্রবাক্য শুনাইলেন। তিনি বলিলেন,—অহিংসা পরম ধর্ম্ম। হিংসা করা মহাপাপ, যদিও কোনদিন কুবুদ্ধির উদয় হয়, তথাপি কাহারও অহিত করা উচিত নয়। ভগবান কালরূপী, সনাতন। কুবুদ্ধি, সুবুদ্ধি তাঁহারই সৃষ্টি। তোমার ঐ প্রকার দুষ্প্রবৃত্তি দেখিয়া মনে হইতেছে—ভগবানই তোমাকে এই প্রকার দুর্ন্যতি প্রদান করিয়াছেন। ভগবানের মায়ায় সকলেই মোহিত ও বদ্ধ। বদ্ধ জীব দেহ, গেহ, কলত্র, পুত্র, মিত্র, বন্ধু-বান্ধব পরিজনবর্গের জন্য সর্বদাই ব্যস্ত। আমার ঘর, আমার দারা, আমার পুত্র-কন্যা ইত্যাদি আমার আমার করিয়া মরিতেছে। কিন্তু হায়! ভাবে না— কেহই তাহার সঙ্গে যাইবে না। তাহারা সাধুসঙ্গ না করিয়া বৃথাই দুর্লভ জন্ম কাটাইতেছে। তোমাকে আর কি দোষ দিব। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শঙ্কর যাঁহার মায়াতত্ত্ব অবগত নহেন, সামান্য মনুষ্য কি করিয়া জানিবে। ভাই, যদি সেই অদোষদরশী পরম কারুণিক ভগবান শ্রীহরির চরণারবিন্দ নিরন্তর চিন্তা করিয়া তাঁহার অভয় পাদপদ্ম আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতেন তাহা হইলে দুঃসহ সঙ্কটে তিনি রক্ষা করিতেন। তাঁহার স্মরণেই বহু জন্মের পাপ হরণ হইয়া যায়। নিষ্কিঞ্চন সেই সাধু ব্যাধকে আরও বলিলেন,— ভাই, লোকে কত কষ্ট করিয়া ধন উপার্জন করে এবং উহার দ্বারা বন্ধু পরিজন পোষণ করে। অধমসঙ্গে অসৎ পাত্রে ধন ব্যয় করে। কিন্তু ঈশ্বরের কর্ম্মে কিছু ব্যয় করিবার প্রবৃত্তি হয়

না। সে যে কে তাহাও জানে না। দেহমদে, ধনমদে মগ্ন হইয়া অহংকারে কাল কাটায়। সাধুজনের নিন্দা করে। গো-ব্রাহ্মণ হিংসা করে। এইভাবে সে নরক গমনের পথ প্রশস্ত করে। সুতরাং ভাই, দুর্লভ জন্ম লাভ করিয়াছ। ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় গ্রহণ কর। তিনি তোমার কল্যাণ করিবেন।

এই সকল শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করিয়া কলিক ব্যাধ খুবই বিস্মিত হইল এবং সাধুর স্পর্শমাত্র তাহার সমূহ পাপ দূরীভূত হইল। তখন সে হাত জোড় করিয়া উতককে কহিল,—  
“হে প্রভো! আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি পূর্ব জন্মে বহু পাপ করিয়াছি, এই জন্মেও অসংখ্য পাপে লিপ্ত। আপনার স্পর্শে ভগবান্ হৃষীকেশে আমার ভক্তির উদয় হইল। আপনি আমার গুরু। অধর্মের অপরাধ ক্ষমা করুন।—এই বলিয়া সে ভগবানের অভয় পাদপদ্মে শরণাগত হইল এবং আর্তস্বরে ভগবানের গুণকীর্তন করিতে লাগিল।

সাধুসঙ্গমাত্রই দুর্বুদ্ধি খণ্ডন হয়। মোহ দূরীভূত হয়। চিত্ত শুদ্ধ হয়। ভক্তিলাভ হয়। কলিক ব্যাধ চিন্তা করিল— এই দেহ আর রাখিব না। কারণ চঞ্চল মনের কোনও স্থিরতা নাই। এইভাবে ব্যাধ নিজকে অনেক ধিক্কার দিতে লাগিল এবং অনুতাপ-অনলে দক্ষীভূত হইতে হইতে দেহত্যাগ করিল। উতক ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিষুপাদোদক প্রদান করিলেন। বিষুপাদোদক স্পর্শে সাধুসমাগমে তাহার দেহ হইতে সমূহ পাপ অন্তর্হিত হইল এবং উতককে স্তুতি করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে দিব্য রথ আসিল। চতুর্ভুজ দিব্যমূর্তি লাভ করিয়া প্রভুর অনুজ্ঞাক্রমে বৈকুণ্ঠে গমন করিল। সাধুসঙ্গের মহিমা এই প্রকার। কারণ—  
“সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গ মুক্তিভিঃ।” সুতরাং আমাদের সাধুসঙ্গ বিশেষ প্রয়োজন। সাধুসঙ্গদ্বারাই আমাদের পরম মঙ্গল লাভ হইবে।

“সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

লবমাত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্ব সিদ্ধি হয়।।”

—শ্রীহরিদাস ভক্তিশাস্ত্রী

## বৈষ্ণবতা কোথায় ?

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৯ পৃষ্ঠার পর ]

একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মই ভক্তিপথের উপদেশদ্বারা মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিয়া ভগবদ্বিমুখ জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্তিত করিয়া শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিতে সমর্থ। শাস্ত্র বলেন,—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।

গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে।। (চৈঃ চঃ মঃ ২২/৪৭)

স্বয়ং কৃষ্ণ উদ্ধব মহারাজকে বলিলেন,—

আচার্য্য মাং বিজনীয়ালাম্ভমন্যোত কহিচিৎ।

ন মৰ্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সৰ্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ (ভাঃ ১১/১৭/২৭)

অন্যত্র পাই—

গুরু মাতা, গুরু পিতা, গুরু হন পতি।

গুরু বিনা এ সংসারে নাহি আর গতি ॥

গুরুপাদপদ্মে রহে যার নিষ্ঠা ভক্তি।

জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি ॥

হেন গুরুপাদপদ্ম করহ বন্দনা।

যাহা হৈতে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রণা ॥

যিনি গুরুদেবের শাসন স্বীকার করেন, তাঁহাকেই যথার্থ শিষ্য বলা হয়। শিষ্যের কর্তব্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও তাঁহার উপদেশ নির্বিচারে নিষ্কপটে যথাযথভাবে পালন করা। শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোভীষ্ট পূরণ করাই শিষ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। যে সেবার দ্বারা হরি-গুরুবৈষ্ণবের প্রীতি উৎপাদন হয় না, তাহাকে সেবা বলা হবে না। সেবা শ্রীকৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্যপূর্ণ। স্বসুখ বাসনাদ্বারা চিন্তবৃত্তি জড়বিষয়ে আসক্তিয়ুক্ত হইয়া পড়ে এবং গুরু-বৈষ্ণবের সেবা হইতে চ্যুত হইয়া মায়ার সংসারে দ্বার উন্মুক্ত হইয়া পড়ে।

শ্রীমদ্রূপপ্রভুর সেবক গোবিন্দ প্রভু গৌর-কৃষ্ণসেবকগণের সর্বোত্তম সেবার আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন।—

গোবিন্দ কহে,—“আমার সেবা সে নিয়ম।

অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন ॥

সেবা লাগি’ কোটি ‘অপরাধ’ নাহি গণি।

স্ব-নিমিত্ত ‘অপরাধাভাসে’ ভয় মানি ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১০/৯৫-৯৬)

মহাপ্রভু স্বভক্তের শুদ্ধভক্তি মাহাত্ম্য এবং ভক্তগণের বিনোদনের জন্য পার্শ্বদগণের মাধ্যমে বিভিন্ন লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্র সূক্ষ্ম মর্ম্ম।

চৈতন্যের কৃপায় জানে এই সব মর্ম্ম ॥

ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী।

এই সব প্রকাশিতে কৈলা এত ভঙ্গী ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১০/১০০-১০১)

সদগুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেই বৈষ্ণব হওয়া যায় না বা বৈষ্ণবতা আসে না। কারণ বৈষ্ণব নিক্ষিঞ্চন। তিনি জগতের কোন বস্তুর জন্য লালায়িত হন না। বৈষ্ণবতা আসে প্রীতিমূলা সেবার মাধ্যমে, শরণাগতির মাধ্যমে। শিষ্যত্বের দাবী করিলেই কি শিষ্য হওয়া যায়? শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালনে উৎসাহ ও তাঁহার মনোভীষ্ট পূরণের জন্য যত্নশীল হইলেই আমাদের নিত্য মঙ্গল লাভ হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের সঙ্গী সর্বদা হরিভজন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। জীবের ইহাই একমাত্র নিত্য মঙ্গল ও কৃত্য।

জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদও বলেন,—“হরিভজন না করিলে জীব জ্ঞানী, কস্মী বা অন্যাভিলাষী হইয়া যায়, সেজন্য সর্বদা ভগবানকে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকিবেন।”

বৈষ্ণব কে? —এ সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—

“কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী, ছাড়িয়াছে যারে, সেই ত’ বৈষ্ণব।

সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধভক্ত, সংসার তথায় পায় পরাভব।।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে এই প্রপঞ্চে আসিয়া কোন ভাগ্যফলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া মঠে বাস করিয়াও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাতার মোহজালে ক্রমে ক্রমে জড়হীয়া পড়িতেছি। ইহার একমাত্র কারণ হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতিমূলা সেবার প্রতি উপেক্ষা। মঠে বা গৃহে বাস করিয়া ও লোক দেখান বৈষ্ণব সাজিয়া বসিয়াছি। শ্রীনাম-সংকীৰ্ত্তনই কলিকালের একমাত্র পরম উপায়—এই শাস্ত্রত বাণী আমরা ভুলিয়া মায়ার নফর হইয়া তথাকথিত সাধুবশে ঘুরিয়া লোককে বঞ্চিত করিতেছি এবং নিজেও বঞ্চিত হইতেছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—“আচার-প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য”। এই শিক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া কিঞ্চিৎ অনিত্যসুখের আশায় অবৈষ্ণবসঙ্গে আসক্তিস্থ হইয়া বিষয়ে মসৃণ হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের মনের গতি জানিয়া সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন,—

“না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গে সঙ্কীৰ্ত্তন,

না করিলে নিৰ্জ্জনে স্মরণ।

না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি;

দুষ্টফল করিলে অৰ্জ্জন।।”

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্যদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত প্রভু গৃহস্থ ও মঠবাসী বৈষ্ণব-বৃন্দের কল্যাণের নিমিত্ত বহু উপদেশ দান করিয়াছেন। এই উপদেশ গৃহস্থ ও বৈষ্ণব সকলেরই পালন করা অবশ্য কর্তব্য যদি সুষ্ঠুভাবে হরিভজন করিতে বাসনা করি। এই সব অমূল্য উপদেশ পূর্ব আচার্য্য ও গুরুবর্গ তাহাদের আচার-প্রচারের ও গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন।—

“যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর।।

কৃষ্ণভক্তির অনুকূল করহ স্বীকার।

কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল সব কর পরিহার।।

জ্ঞান-যোগ-চেষ্টা ছাড়, আর কৰ্ম্মসঙ্গ।

মৰ্কট-বৈরাগ্য ত্যজ যাতে দেহরঙ্গ।।

‘কৃষ্ণ আমায় পালে রাখে জান সর্বকাল।

আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল।।

বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।

পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ।।

জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।

শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ।।  
 বৈরাগী ভাই গ্রাম্য কথা না শুনিবে কানে ।  
 গ্রাম্যবার্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে ।।  
 স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ ।  
 গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন ।।  
 যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরঙ্গের সঙ্গে ।  
 ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে ।।  
 ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ।  
 হৃদয়েতে রাখাকৃষ্ণ সর্বদা সেবিবে ।।

যে সমস্ত উপদেশাবলী কীর্তন করিলাম, তাহা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে, আমরা কোন্ সেবকের মধ্যে পড়িব? ভজন-সাধনের মধ্যে সরলতা ও নিষ্কপটতা না থাকিলে শ্রীগৌরানন্দ মহাপ্রভুর বিচার ও গুরুবর্গের বিচারে প্রবেশ করা সহজসাধ্য হইবে না। গুরুবর্গের আদেশ-নির্দেশকে উপেক্ষা করিয়া আমরা যে পথ্যায়ে পৌঁছিয়াছি, তাহা অধম সেবকেরই লক্ষণ। ছয় প্রকার অধম সেবক সম্বন্ধে শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন।—

অলির্জ্যোতিষিকো বাণঃ স্তব্ধভূতঃ কিমেকাকী ।

প্রেমিত প্রেমকশ্চৈব ষড়্ বিধা সেবকাধমাঃ ।।

**অলি**—অলি অর্থাৎ মৌমাছি যেমন গুণগুণ করে, সেইরূপ সেবকও মনে মনে বিচার করে আমি কেন করব? আরও কত লোক আছে। গুরুদেব না বুঝে সুঝে আমাকে অন্যায় আদেশ করিয়াছেন ইত্যাদি।

**জ্যোতিষী**—সেবক কোন কার্যের জন্য আদিষ্ট হইলে, আগে থেকেই একটা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলে। অর্থাৎ কোন স্থানে যাইবার আদেশ হইয়াছে, সেইখানে না গিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বসে “সেখানে গেলে কোন কাজ হইবে না—যাহার নিকট যাইব তিনি হয়ত’ বাড়ী নাই ইত্যাদি।”

**বাণ**—বাণকে ছাড়িয়া দিলে সে যেমন ফিরিয়া আসে না, তদ্রূপ বাণ-সেবককে কোন কাজের জন্য পাঠাইলে, সে আর ফিরিয়া আসে না।

**স্তব্ধভূত**—সেবক আদেশ শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়, কোন উত্তর দেয় না, কাজও করে না।

**কিমেকাকী**—সেবক বলে আমি কি একা পারব? আর একজনকে সঙ্গে না দিলে হইবে না।

**প্রেমিত-প্রেমক**—অর্থাৎ গুরুদেব একজনকে আদেশ করিলে, সেই ব্যক্তি অন্যকে সেই কার্যে পাঠাইবার জন্য আদেশ করে। সে আবার আর একজনকে সেই কার্যে পাঠায়।

এরা সকলে ঐকান্তিক শরণাগত নয়; সুতরাং অধম। গুরুনিষ্ঠাহীন বা গুরুসেবাবিহীন ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃত। একরূপ অবৈষ্ণবের সঙ্গে করা উচিত নহে। তাহাতে অমঙ্গলই হয়।



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের লেখনীর স্মৃতিচারণ করিতেছি। —যে-সমস্ত সাধক-সাধিকাগণ পারমার্থিক কল্যাণ চান তাঁহাদের ভজন-সাধনের প্রতি সূক্ষ্ম বিচারে আকর্ষণ করিবার জন্যই অমূল্য লেখনীর কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহার দ্বারা মাদৃশ অধর্মের ও ভজনে উৎসাহিত সেবকেরও বহুকল্যাণ সাধিত হইবে।

“ বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে মহাজনগণ এরূপ বলেন,—

যে যেমন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া, আদর করিব যবে।

বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্বসিদ্ধি, অবশ্য পাইব তবে।

যিনি যেমন বৈষ্ণব অর্থাৎ ভক্তিমার্গ যাঁহার অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকার বিচার করিয়া, কনিষ্ঠ, মধ্যম অথবা উত্তম যেরূপ যোগ্যতা যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে সেইরূপ আদর করিতে হইবে। বৈষ্ণবের প্রতি ব্যবহার যথাযথরূপে সম্পন্ন হইলেই জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত বৈষ্ণবাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। তখনই বৈষ্ণবের সর্বসিদ্ধিদাত্রী অমায়্য কৃপার স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হয়। ..... বৈষ্ণব আমাকে কতটা স্নেহ করেন বা আপন জ্ঞান করেন, এই বিচার পর্যা্যপ্ত নহে। কারণ আমি বৈষ্ণবের স্নেহভাজন, এই চিন্তায় যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয় উহা অন্তরের অন্তরালে অবাস্তিত ভোগপিপাসারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আমি বৈষ্ণবের প্রতি কতটা মমত্ববুদ্ধিবিশিষ্ট হইতে পারিয়াছি, এই বিচারই সর্বসিদ্ধি অভ্যুদয়ের সূচনা করে। বৈষ্ণব চিনিয়া তাঁহার প্রতি আত্মীয়বুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত আমার প্রতি বৈষ্ণবের মমতার প্রকৃত স্বরূপ আমার পক্ষে উপলব্ধি করা কখনই সম্ভব হয় না।

বৈষ্ণব চিনিতে হইবে, আদর করিতে হইবে তাঁহার বৈষ্ণবতার দিক্ দিয়া। বৈষ্ণবতা অর্থে বিষ্ণুর ঐকান্তিক সেবাপরতা। উহাই বৈষ্ণবের স্বরূপ। যদি বৈষ্ণব চেনাই আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে বিষ্ণুসেবা তাৎপর্য্যময়তা কি পরিমাণে আছে তাহাই দেখিতে হইবে।

বৈষ্ণবের ছাব্বিশটি গুণের মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণতা বৈষ্ণবের স্বরূপ লক্ষণ, বৈষ্ণবের বৈষ্ণবত্ব। যিনি বৈষ্ণব তাঁহার মধ্যে বৈষ্ণবতার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গুণগুলি থাকিবেই। মনে রাখিতে হইবে বৈষ্ণবের গুণ কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু নহে। বৈষ্ণবোচিত গুণসকল বৈষ্ণবেই থাকিবে, বৈষ্ণবের কৃপা সর্বকালেই ক্রিয়াবতী। বৈষ্ণবের কৃপাতেই তিনি বৈষ্ণব চিনিয়া তাঁহার প্রতি আদরযুক্ত হন। বৈষ্ণবের সহিত আমাদের সম্বন্ধ নিত্য, তাঁহার সহিত নূতন করিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয় না। সত্যি যদি বৈষ্ণবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে আমাদের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে অবৈষ্ণবের প্রতি মমতা সর্বাগ্রে পরিহার করিতে হইবে। অবৈষ্ণবে অনাত্মীয় জ্ঞান নাই অথচ বৈষ্ণবে মমতা বা আত্মীয় বুদ্ধি আছে, ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।” (ব্রহ্মশংঃ)

শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিবূষণ

# জীবের কৃত্য

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯০ পৃষ্ঠার পর]

যে জন শ্রীমদে অন্ধ হয় সর্বক্ষণ।

দরিদ্রতা করি তা'র পরম অঞ্জন।। (শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী)

‘দরিদ্রতাই’ দেবকুমারদ্বয়ের প্রতি ‘পরমাঞ্জন’-স্বরূপ কেন হল, তদুত্তরে বলা হয়েছে,—

“দরিদ্রতা হৈলে টুটে মনে অহঙ্কার।

দরিদ্রজনের হয় সম ব্যবহার।।

উপবাস আদি তার হয় মহাদুঃখ।

সেই তপ হয় তার পরকালে সুখ।।

দরিদ্রের কলেবর ক্ষুধায় শুখায়।

আর কিছু নাহি মাগে অন্ন মাত্র চায়।।

সকল ইন্দ্রিয়গণ টুটে দিনে দিনে।

হিংসা হেন নাম গর্ব নাহি তার মনে।

দরিদ্রজনেরে হয় সাধু সমাগম।

সাধুসঙ্গে অশেষ বাসনা বিমোচন।।

তবে তার সেই হৈতে খণ্ডে ভববন্ধ।

এই দেহে হয় মুক্তিপদ সুখানন্দ।।

ভকত না চাহে ধন গর্বিত আহার।

চাহে মাত্র সাধুসঙ্গে হরিকথা সার।।

জানে ধনগর্ব হিংসা আহার শৃঙ্গার।

কুপণ্ডিত সঙ্গে ব্যর্থ কাল যায় যার।।

ধন পুত্র কলত্রে উপেক্ষা যে করয়।

ধনি করিয়া তার কি অপেক্ষা হয়।।” (শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী)

মুনিবর এইরূপ বিচার করার পর দেবকুমারদ্বয়ের প্রতি কৃপাপরবশে বললেন,—

“কুবের কুমার হৈয়া শিবের কিঙ্কর।

বারুণী মদিরা পান করে নিরন্তর।।

আপনাকে না জানে আপনে বিবসন।

শ্রীমদেতে এত বড় হয় মতিভ্রম।।

এত বড় গর্ব যেন দেখিলুঁ দুহার।

বৃক্ষ হৈয়া ইহারা রহুক চিরকাল।। (শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী)

মুনিবরের এই বাণী শুনে তাদের যেন নেশা দূর হয়ে গেল, তারা অশ্রুপাত করতে করতে মুনিবরের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হয়ে বলল,— “গুরুদেব, আমরা মহা অপরাধী, আপনার বর শিরে ধারণ করলাম; তবে আমাদের সানুয় প্রার্থনা—যেন আমাদের সর্বক্ষণ আপনার

শ্রীচরণ-স্মৃতি থাকে। তখন কৃপালু মহাভাগবত নারদমুনি বললেন,—“স্মৃতিঃ স্যাম্মৎ প্রসাদেন” (ভাঃ ১০/১০/২১) অর্থাৎ— “আমার কৃপায় তোমাদের বৃক্ষ-যোনিতেও সর্বদা স্মৃতি থাকবে।” যাঁরা সর্বদা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের স্মৃতিতে বিভোর থাকেন, তাঁদের সংসারের কোন ক্লেশ অনুভূত হয় না ও তাঁরা ভগবদ্ ভজনে নিরন্তর নিরত থেকে শান্তিময় জীবন যাপন করেন।

মুনিবর আবার বললেন,—“বাসুদেবস্য সন্নিধ্যং লব্ধা”—(ভাঃ ১০/১০/২২) অর্থাৎ—‘তোমরা বাসুদেবের সন্নিধানে নিবাসস্থান পাবে।’ এইবার তাদের বৃক্ষযোনি হতে উদ্ধারের উপায় নির্ধারণ করে বললেন,—

“দেবমানে একশত বৎসর অন্তরে।

কৃষ্ণ-সঙ্গ হৈব এই বৃক্ষ কলেবরে।।

মোরে অনুগ্রহ প্রভু অবশ্য করিব।

বাল্যলীলা করি দুই বৃক্ষ উদ্ধারিব।।

তবে দিব্য কলেবর হৈব দুই জনে।

ভকতি লভিব দেবদেব নারায়ণে।। (শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী)

অতঃপর মুনিবর বদরিকাশ্রম অভিমুখে গমন করলেন। আর তখন শ্রীনলকুবর-মণিগ্রীব দুই ভ্রাতা যমল-অর্জুন্ বৃক্ষ তনু লাভ করে গোকুলে অবস্থান করলেন। বৈষ্ণব-প্রবর শ্রীনারদের ইচ্ছা পূরণার্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দ্বাপরযুগে তাঁর পাদস্পর্শে ঐ যমলার্জুন্ বৃক্ষ-যোনি হতে কুবের-পুত্রদ্বয়কে উদ্ধার করেছিলেন। শ্রীনারদমুনির কৃপায় দেবকুমারদ্বয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দিব্যাদিদিব্য স্বরূপ দর্শন করে কৃতার্থ হয়েছিলেন।

অর্থ আমাদের জড় স্বার্থ চরিতার্থতায় সহায়তা করে ও পঞ্চপ্রকার অনর্থ তথা অনৃত, কাম, মদ, রজ, বৈর—এগুলির দ্বারা আমাদের চিন্তকে কলুষিত করে; কিন্তু অর্থ না হলে ত’ আমাদের সংসারে থাকা যায় না,—এবম্প্রকার অবস্থায় আমাদের কিরূপ অর্থে অধিকার আছে? এই সমস্যার সমাধানকল্পে ভক্তপ্রবর শ্রীনারদমুনি বলেছেন,—

“যাবদপ্রিয়তে জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।

অধিকং যোহভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি।।” (ভাঃ ৭/১৪/৮)

অর্থাৎ—“যে পরিমাণ অর্থাদি দ্বারা উদর পূর্ণ হয়, তদুপযোগী অর্থাদিতেই শরীরগণের অধিকার। ইহা অপেক্ষা অধিক আকাঙ্ক্ষাকারী চোর, অতএব দণ্ডার্থ।”

এতদ্রূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরহরির একটি লীলা এস্থলে বিবৃত করছি। শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরহরি একদিন নিত্যানন্দ প্রভুকে সঙ্গে করে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর গৃহাভিমুখে যাওয়ার পথে ললিতপুরে এক সন্ন্যাসীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেই সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে বালক ভেবে ধন-বংশ হোক্ বলে আশীর্বাদ করেন। তখন মহাপ্রভু ঐরূপ আশীর্বাদের পরিবর্তে “কৃষ্ণে মতিরস্ত” —এই আশীর্বাদই যুক্তিযুক্ত বললেন। তদুত্তরে সেই সন্ন্যাসী বললেন— “পৃথিবীতে জন্মে ধন-সম্পদ, উত্তমা কামিনী এবং বিলাসভোগ যার না হয়, তার জীবন ধারণ বৃথা। কৃষ্ণভক্তি আশীর্বাদের দ্বারা কৃষ্ণভক্তি লাভ হলেও টাকাকড়ি না

থাক্লে কি খাবে?” তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসীকে উপদেশ-ছলে বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দিলেন,—

“ব্যপদেশে মহাপ্রভু সবারে শিখায় ।  
 ভক্তি বিনা কেহ যেন কিছুই না চায় ॥  
 শুন শুন সন্ন্যাসী গোঁসাই যে খাইব ।  
 নিজ কর্ম্মে যে আছে সে আপনে মিলিব ॥  
 ধন-বংশ-নিমিত্ত সংসার কাম্য করে ।  
 বল তার ধন-বংশ তবে কেনে মরে ॥  
 জ্বরের লাগিয়া কেহ কামনা না করে ।  
 তবে কেন জ্বর আসি’ পীড়য়ে শরীরে ॥  
 শুন শুন গোঁসাই ইহার হেতু কর্ম্ম ।  
 কোন্ মহাপুরুষে সে জানে এই মর্্ম ॥  
 বেদেও বলায় “স্বর্গ” বলে জনা জনা ।  
 মূর্খ প্রতি কেবল সে বেদের করুণা ॥  
 বিষয়-সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ ।  
 চিত্ত বুঝি’ কহে বেদ, বেদের কি দোষ ॥  
 ধন-পুত্র পাই গঙ্গান্নানে হরিনামে ।  
 শুনিয়া চলয়ে লোক বেদের কারণে ॥  
 যেতে-মতে গঙ্গান্নান-হরিনাম লৈলে ।  
 দ্রব্যের প্রভাবে ‘ভক্তি’ হইবেক হেলে ॥  
 এই বেদ-অভিপ্রায় মূর্খ নাহি বুঝে ।  
 কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া বিষয়-সুখে মজে ॥  
 ভাল-মন্দ বিচারিয়া বুঝহ গোঁসাইও ।  
 কৃষ্ণভক্তি ব্যতিরিক্ত আর বর নাই ॥” (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট এই তত্ত্ব শ্রবণ করে সন্ন্যাসী আশ্চর্য্যান্বিত হলেন। সদ্যোজাত শিশু যেমন নিজ চেষ্টা ব্যতীত মাতৃস্তু্য পেয়রূপে লাভ করে, তেমনই জীব নিজ কর্ম্মফলে তার অপার্থিত খাদ্য লাভ করবার সুযোগ পাবে। কর্ম্মফলদ্বারাই ধনাদি প্রাপ্তি ঘটে। দুঃখের জন্য চেষ্টা না করলেও যেমন দুঃখ কালক্রমে ভোগ করতে হয়, সেইরূপ কালক্রমে সুখের উদয় হয় এবং ধনাদিও পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

## শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তর্দ্বান-প্রসঙ্গ

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২৯ পৃষ্ঠার পর]

“গৌর-আনা-ঠাকুর”—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুকে লীলা-সঙ্গোপনার্থে পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ মারফত এক তর্জা প্রহেলী প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাউলকে কহিহ, —লোক হইল বাউল। বাউলকে কহিহ—হাটে না বিকায় চাউল। বাউলকে কহিহ, —কায়ে নাহিক আউল। বাউলকে কহিহ, —ইহা কহিয়াছে বাউল। (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৯/২০, ২১)

—“মহাপ্রভুকে কহিও যে লোক প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে, আর প্রেমের হাটে প্রেমরূপ চাউল-বিক্রয়ের স্থল নাই। মহাপ্রভুকে কহিও যে আউল অর্থাৎ প্রেমোন্মত্ত বাউল আর সাংসারিক কার্য্যে নাই। মহাপ্রভুকে কহিও যে, প্রেমোন্মত্ত হইয়াই অদ্বৈত একথা কহিয়াছে। “তাৎপর্য্য এই যে, প্রভুর আবির্ভাব হইবার যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইল, এখন প্রভুর যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক।” শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত তর্জা শ্রবণে উহার তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—“তাঁর যেই আজ্ঞা”—(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৯/২৩)। অর্থাৎ অদ্বৈত প্রভুর কথা রক্ষা করিতে তিনি লীলা-সঙ্গোপনেই মনস্থ করিলেন। অপরদিকে শ্রীস্বরূপ-দামোদর উহা বুঝিতে পারিয়াও দৃঢ়তার জন্য মহাপ্রভুকে তর্জার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, মহাপ্রভু তদুত্তরে বলিলেন,—“আচার্য্য হয় পূজক প্রবল। আগমশাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল।। উপাসনা লাগি’ দেবের করেন আবাহন। পূজা লাগি’ কত কাল করেন নিরোধন।। পূজা নিব্বাহণ হৈলে পাছে করেন বিসর্জন।”—(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৯/২৫-২৭)। অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য গঙ্গাজল ও তুলসীদ্বারা আবাহন করিয়া মহাপ্রভুকে এই জগতে প্রকটিত করিয়াছেন। তাঁহাকর্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহারই ইচ্ছা প্রপূরণে মহাপ্রভু জগতে ব্রহ্মা-শিবাদিবও দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করিয়াছেন। অতঃপর আগম-শাস্ত্রের বিধিবেত্তা শ্রীআচার্য্য মহাপ্রভুর প্রতি তর্জার মাধ্যমে বিসর্জন-মন্ত্র ব্যক্ত করিয়া জানাইলেন,—হে প্রভো! যে উদ্দেশ্যে আমি আপনাকে এই ভূলোকে আবির্ভূত করাইয়াছিলাম, সে উদ্দেশ্য আমার সম্পূর্ণ হইয়াছে, —জগৎ কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছে, অতএব আপনার অবতরণের জন্য আমার দায়বদ্ধতা এক্ষণে শেষ হইল,—অর্থাৎ আপনার নিত্য শ্রীগোলোকধামে আপনার গমন সূত্রাং এক্ষণে হইতে পারে। ইহাই মহাপ্রভুর লীলা-সঙ্গোপনের পটভূমিকা। কিন্তু ইহার সহিত পূর্বোক্ত পাষণ্ড-প্রলাপসমূহের কোনপ্রকার সম্বন্ধ কিংবা সামঞ্জস্য দেখা যায় না।

শ্রীমুরারী গুপ্ত, শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর কিংবা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—তাঁহারা তাঁহাদের রচনায় স্পষ্ট করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্বান-লীলা ব্যাখ্যা করেন নাই। বরং বলা যায়—ভগবদ্বিরহ অসহনীয় বলিয়াই তাঁহারা উক্ত বিশেষ প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অপ্রাকৃত-লীলার নিত্যত্বই তাঁহাদের হৃদয়ে বিশেষ অনুভূত বলিয়া তাঁহাদের নিকট মহাপ্রভুর অন্তর্দ্বান-প্রসঙ্গের আদর নাই। সাধারণ মানুষ, অভক্তগণ ও ভক্তদ্বৈষিণ প্রেমী-ভক্তগণের

হৃদয়ের এই বিশেষ অনুভূতিটিকে সামান্যতমও উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়াই যত বিপত্তির উদয় হইয়াছে। হিংসা-কলহময় জীবন-যাপনে অভাস্ত বলিয়াই ইহার অতিরিক্ত ভাবনাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। নাপিত দুই-একটি ‘ফোঁড়া’ কাটিয়া সফল হওয়ায় যদি নিজকে বৈদ্যরাজ ভাবিয়া ডিগ্রীধারী চিকিৎসকগণের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে চাহে এবং তৎফলে গুরু-বিষয়ে লঘু-মন্তব্য করে—তবে ডিগ্রীধারিগণ উহাকে কেন মানিয়া লইবেন?

উপরিউক্ত শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণের রচিত গ্রন্থাদিতে আলোচ্য অন্তর্দ্বান-প্রসঙ্গের আলোচনা নাই বলিয়া কাহারও এই বিষয়ে কল্পনার কসরৎ করিবার কোন অবকাশও নাই। কারণ এই প্রসঙ্গে শ্রীনরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর-কৃত ‘শ্রীশ্রীভক্তিরত্নকর’-গ্রন্থে পরিষ্কার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তর্দ্বানের কিছু পরে শ্রীমন্নরোত্তম ঠাকুর শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে তাঁহার বিভিন্ন লীলাস্থল এবং পার্ষদগণের দর্শন-অভিলাষে গমন করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি টোটা-গোপীনাথের মন্দিরে আসিলে শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভুর শিষ্য শ্রীমামু গোস্বামী তাঁহার নিকট শ্রীগুরু ও গৌরাদেবের মহিমা-কীর্তনে পঞ্চমুখ হইলেন এবং অবশেষে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্বান-প্রসঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন-অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিলেন।—

“অহে নরোত্তম ! এইখানে গৌরহরি।  
না জানি— কি পন্ডিতে কহিল ধীরি ধীরি।।  
দোঁহার নয়নে ধারা বহে অতিশয়।  
তাহা নিরখিতে দ্রবে পাষণ-হৃদয়।।  
ন্যাসি-শিরোমণি-চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার?  
অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার।।  
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।  
হেলা অদর্শন—পুনঃ না আইলা বাহিরে।।

(ভঃ রং ৮ম তরঙ্গ ৩৫৪-৩৫৭)

শ্রীমন্নহাপ্রভুর অন্তর্দ্বান-প্রসঙ্গে আরও দুইটি বিচার কোন প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লিখিত না থাকায় কিংবদন্তিরূপেই উহারা বিরাজ করিতেছে। তন্মধ্যে একটি হইল যে, শ্রীমন্নহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহে লীন হইয়াছেন এবং অপরটি হইল—তিনি সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন। সর্বমোট এই তিনটি বিচারের যুগপৎ অস্তিত্বে ক্ষুদ্র-মস্তিষ্কসম্পন্ন যুক্তিবাদিগণের মস্তক ঘূর্ণিত হইলেও আমরা কিন্তু ইহাদের কোনটির প্রতিই অশ্রদ্ধা পোষণ করিতে পারি না।—কারণ, অচিন্ত্য-ক্ষমতাময় ভগবানের পক্ষে ইহা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। সর্বশক্তিমত্তা—ভগবানের একটি লক্ষণ। ‘সর্বশক্তিমত্তা’ বলিতে মানব-বুদ্ধিতে যাহা ধারণাযোগ্য, কিংবা মানবে যাহা সম্ভব, যদি কেবল তাহাই হয়, তাহা হইলে উহাকে ‘সর্বশক্তিমত্তা’ বলা যায় না। মানব-মেধায় যাহা অঘটনীয়, তাহাও ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির অধীন বলিয়া ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা। যেমন, রথযাত্রাকালে—“আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ। এককালে সাত ঠাণ্ডি করিল বিলাস।। সবে কহে—প্রভু আছেন মোর সম্প্রদায়। অন্য

ঠাঞি নাহি যান, আমারে দয়ায়।। পূর্বের যৈছে রাসাদি-লীলা কৈল বৃন্দাবনে। অলৌকিক লীলা গৌর কৈল ক্ষণে ক্ষণে।।” —(চৈঃ চঃ মধ্য ১৩/৫২, ৫৩, ৬৬)। পুনরায়, “এইমত মহাপ্রভুর অচিন্ত্য প্রভাব। এবে শুন প্রভুর যৈছে হয় আবির্ভাব।। শরীর মন্দিরে, আর নিত্যানন্দ-নর্তনে। শ্রীবাস-কীর্তনে, আর রাঘব-ভবনে।। এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা ‘আবির্ভাব’। প্রেমাকৃষ্ট হয়,—প্রভুর সহজ স্বভাব।।” —( চৈঃ চঃ অন্ত্য ২/৩৩-৩৫)। নীলাচলে অবস্থান করিয়াও সর্বশক্তিমান শ্রীমদ্ব্যহাশ্রয় প্রেমাকৃষ্ট হইয়া যুগপৎ উক্ত চারি স্থানে সদা অবস্থিত হইয়া তাঁহাদের প্রেম-সেবা গ্রহণ করিতেন। সুতরাং অন্তর্দর্শন-কালে তিনি নীলাচলে বিভিন্নস্থানে অবস্থিত অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট তাঁহার অন্তর্দর্শন অবহিত করাইতে যুগপৎ তিনি উক্ত তিন-প্রকারেই অন্তর্দর্শন-লীলার প্রকাশ ঘটাইয়াছেন—ইহা অচিন্ত্যশক্তিমান ভগবানের পক্ষে কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে।

এ-প্রসঙ্গে একটা বিশেষ বিচার লক্ষিতব্য যে, মহাপ্রভুর এই অন্তিম অন্তর্দর্শন-লীলা ভগবদ্বিগ্রহে লীন এবং সমুদ্রে প্রবেশ-সম্পর্কিত—পূর্ব-উল্লিখিত দক্ষিণদেশ-ভ্রমণকালীন কেবল অদর্শনরূপ অন্তর্দর্শন-লীলার ন্যায় নহে। ইহার কারণ এই যে, উক্ত অদর্শনরূপ অন্তর্দর্শন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু-কর্তৃক প্রেরিত মহাপ্রভুর লীলা-সঙ্গোপনের ইঙ্গিত লাভের পূর্বে ঘটিয়াছিল। কিন্তু উক্ত ইঙ্গিত লাভের পর ইহাতেই মহাপ্রভু অন্য প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হন—শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদজনিত বিপ্রলম্বভাব তখন দ্বিগুণিত হইয়া পুনরায়, প্রতিক্ষণ তাহা বর্ধিত হইতে লাগিল। —“ সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হইল। কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দশা দ্বিগুণ বাড়িল।। উন্মাদ প্রলাপ-চেষ্টা করে রাত্রি দিনে। রাধা-ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে।।” —( চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৯/৩০, ৩১)। শ্রীস্বরূপ-দামোদর, রামানন্দের সহিত তিনি নিরন্তর শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি হইতে শ্লোক পাঠ করিয়া ‘দিব্যোন্মাদ’, ‘চিত্রজন্মাদিতে’ অনুক্ষণ অনুলিপ্ত থাকিতেন। এই প্রকার রাধা-ভাবাবেশে প্রিয়তমের সহিত মিলনের সুতীর আকাঙ্ক্ষায় শ্রীগৌর-ভগবদ্বিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণ-ভগবদ্বিগ্রহে লীন হইয়াছিলেন। অপরদিকে একই কারণে যমুনা-স্বফুর্তিতে তাঁহার সমুদ্রে প্রবেশ হইয়াছিল—এবং ইহা মহাপ্রভুর জন্য কোন নূতন ঘটনা নহে। পাঠকগণের পুনঃ অবগতির জন্য বলি—মহাপ্রভুর পূর্বোক্ত সমুদ্রে নিমজ্জন-লীলা তাঁহার কেবল কোন যোগ-বিভূতি নহে, পরন্তু সেই যোগীশ্বরের মৃত্যু-যম-কালাদীশ্বরই নিত্য ঘোষণা করে।

পাষাণগণের শ্রীচৈতন্য-বিরোধী লেখনীতে যে তাহাদের পূর্বসূরীদের রচনার উল্লেখদ্বারা নিজ পাষাণধর্মের বৈধতা স্থাপনের প্রয়াস দেখা যায়, তাহাতে অনেকেই চিন্তের দুর্বলতাবশতঃ বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। অনেকসময় সেই তাহাদের পথ-প্রদর্শক পাষাণগণকে মহাপ্রভুর সমসাময়িক বলিয়াও উল্লেখিত হইতে দেখা যায়। আমরা ইহার সত্যাসত্য নিরূপণের অযথা তর্কে না গিয়া বরং বলিব যে, ভগবদ্বিরোধিতা বহু প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে—তবে বর্তমানে যুগপ্রভাবে তাহা নানা ভঙ্গিমায়া উদ্বেগজনকভাবে উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সময়কালেও উহাদের অস্তিত্ব যে ছিল না—তাহা নহে। যেমন, “যে হুসেন সাহ সর্ব উড়িয়ার দেশে। দেবমূর্তি ভাসিলেক দেউল বিশেষে।। হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র। তথাপিহ এবে না মানয়ে যত অন্ধ।।”—

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪/৬৭, ৬৮)। আরও যেমন, রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে প্রশ্ন করিতেছেন,—“শাস্ত্র-প্রমাণে চৈতন্য হন কৃষ্ণ? তবে কেনে পণ্ডিত সব তাঁহাতে বিতৃষ্ণ?” —(চৈঃ চঃ মধ্য ১১/১০১)। এস্থলে ‘পণ্ডিত সব’ বলিতে তৎকালীন সকল পণ্ডিতকেই বুঝিতে হইবে না। কারণ শ্রীচৈতন্যদেবের পার্শ্বদগণ সকলেই ধুরন্ধর পণ্ডিত ছিলেন—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীগদাধর, জগদানন্দ, শ্রীবাস, স্বরূপ-দামোদর, মুরারীগুপ্ত, হরিদাস ঠাকুর, রায় রামানন্দ, সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, গোপীনাথ আচার্য্য, কাশী মিশ্র, শিখি মাহিতি, শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্গোস্বামী, শ্রীগোপালগুরু ইত্যাদি কে নহেন! এক্ষেত্রে রাজা তথাকথিত পণ্ডিতগণের শাস্ত্রজ্ঞান সত্ত্বেও ভগবদ্বিমুখতার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—  
 যাঁহারা “শাস্ত্রের না জানে মন্ম অধ্যাপনা করে। গর্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে।।” —  
 (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১/১৫৮)। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংই বলিয়াছেন,—“সন্ধিকার্য্য-জ্ঞান নাহি যার। কলিযুগে ‘ভট্টাচার্য্য’ পদবী তাহার।।” —(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১/২৮৮)। ইহাঁরই বর্তমানে ভগবদ্বিরোধি-গোষ্ঠীর কর্ণধার।

শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্য রাজার উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন,—“তাঁর কৃপা-লেশ হয় যারে। সেই সে তাঁহারে কৃষ্ণ করি’ লইতে পারে।।” —ইহা যে ভট্টাচার্য্য প্রধানতঃ নিজ অভিজ্ঞতা হইতেই বলিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ,  
 “ত্রিভিগুণময়ৈভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ। মোহিতং নাভিজানাতি মামেভাঃ পরমব্যয়ম্।।  
 নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। মুঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।।”  
 —(গীঃ ৭/১৩, ২৫)। একদিকে সমগ্র জীব মহামায়ার ত্রিবিধ মোহ-রজ্জুর বন্ধনে আবদ্ধ, অপরদিকে ভগবান্ যোগমায়ায় নিজকে সমাবৃত করিয়া স্থায় অন্তরঙ্গগণসহ নিত্যলীলারত—  
 এমতাবস্থায় মায়ামুগ্ধ ও মুঢ় জীবের পক্ষে প্রথমতঃ মহামায়া ও দ্বিতীয়তঃ যোগমায়া  
 ব্যুৎ অতিক্রম করিয়া ভগবানকে বুঝিয়া লওয়া অসম্ভব। অতএব ভগবৎকৃপা ব্যতীত আর  
 উপায় কি? তজ্জন্য “মামেব যে প্রপদ্যন্তে” (গীঃ ৭/১৪)—ভগবদ্-বাক্যানুসারে ভগবান্  
 এবং ভগবন্তুগ্গণের প্রপণ্ডি স্বীকার করিলেই এই দুস্তর মায়া পার হইয়া তাঁহার সামিধ্য  
 সম্ভব। কিন্তু তাহা না করিয়া বিদ্যা-ধন-কুলের মদে সেই ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তগণের  
 সহিত বিরোধিতা করিলে শাস্ত্র-জ্ঞানেরও কোন কার্য্যকারিতা থাকে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং  
 করুণাসিদ্ধু হইয়াও এই প্রকার ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে কোনপ্রকার আপোষ করেন নাই।

“সংকীর্ণ-আরম্ভে মোহার অবতার। উদ্ধার করি মু সর্ব পতিত সংসার।।

যে দেয়, যবনে মোরে কড় নাহি মানে। এ যুগে তাহারা কান্দিবেক মোর নামে।।

যতেক অস্পৃষ্ট-দুষ্ট-যবন-চণ্ডাল। স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত অধম রাখাল।।

হেন ভক্তিযোগ দিমু এ-যুগে সবারে। সুর-মুনি-সিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে।।

বিদ্যা-ধন-কুল-জ্ঞান-তপস্যার মদে। যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে।।

সেই সব জন হবে এ-যুগে বঞ্চিত। সবে তারা না মানিবে আমার চরিত।।”

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪/১২০-১২৫)

সুতরাং এইপ্রকার ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক হইলেও তাঁহার প্রতি ‘বিতৃষ্ণ’  
 হইয়া, তাঁহার ‘চরিত্র’ না মানিয়া যদি কিছু বিধু-বৈষ্ণব-নিন্দার বমন রাখিয়াই যায়, তবে



তাহা নিশ্চয়ই শ্রুতি-স্মৃতিকে অতিক্রম করিয়া প্রমাণ বলিয়া নিদিষ্ট হইতে পারে না। বর্তমানে সেই তাহাদের উত্তরসূরিগণ শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণকে চিঠি করিবার মানসে উক্ত বমন ভোজন করিয়া যদি ঘন ঘন ঢেকুরও তোলে, তথাপিও কাহারও বিভ্রান্ত হইবার কারণ নাই। পেচককুল উহাদের বংশপরম্পরায় প্রচলিত জ্ঞান এবং নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারে সূর্য্যকে অস্বীকার করিলেও সূর্য্যের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য্য। সুতরাং বলি, —শ্রুতি-স্মৃতি-বেদ এবং তদনুগত ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য যদি প্রমাণরূপেই স্বীকৃত না হইল, তাহা হইলে তোমাদের প্রলাপোক্তিরই বা প্রামাণিকতা কোন্ যুক্তিতে গ্রাহ্য?

বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্ত-বচনং প্রমাণম্।

এতৎ প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কন্তস্য কুর্য্যাৎ বচনং প্রমাণম্??

যে কোন বিষয়ে অশ্রদ্ধ হইয়া আলোচনা করিতে গেলে তাহা কেবলমাত্র নিন্দ্যাই পর্য্যবসিত হয়। ইহাকে আমরা অনধিকার-চর্চা ভিন্ন কিছু বলি না। আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে আগ্রহী হইয়া পড়িলে তাহা হাস্যকর হয় বটে, কিন্তু ক্ষতিকর নহে। কিন্তু অনধিকার চর্চায়, বিশেষতঃ তাহা ধর্ম্মবিষয়ে ঘটিয়া থাকিলে যে ক্ষতিসাধন হইয়া থাকে, তাহা অপূরণীয়। অসৎ-বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সদ্বস্তুর প্রতি রুচি কদাপি সম্ভব হয় না। তজ্জন্যই “চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী”, কিংবা “স্বভাব না যায় ম’লে” — প্রভৃতি প্রবাদবাক্যের উদয় হইয়াছে। “দশচক্রে ভগবান্ ভূত” — এই সকল দুষ্ট মতবাদী ও উক্ত মত-প্রচারকগণের চক্রে একদিকে যেরূপ ভগবান্ ভূত হইতেছেন, অপরদিকে ভূত ভগবান্ বনিয়া যাইতেছে — ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। বিশেষ করিয়া বর্তমানের এই আত্মবিশ্মৃত বাঙ্গালীগণ যেরূপ ঈশ্বর-বিরোধিতার পরিচয় দিতেছেন — তাহা ভারতে, এমনকি বহিঃভারতেও কোন জাতির মধ্যে সেরূপ দেখা যায় না। এই বিষয়ে কোন এক প্রাকৃত কবির খেদোক্তি স্মরণ না করিয়া পারিতেছি না, — “সাত কোটা সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননি! রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করনি।।”

তাহাদের ঈশ্বর-বিদ্বেষমূলক গবেষণায় এবং সেই গবেষণার ফল-প্রচারে তাহারা প্রাণনাশের আশঙ্কা যে প্রকাশ করিয়াছে, তাহাও অত্যন্ত কু-ইঙ্গিতপূর্ণ। আমরা বলি, এরূপ ঘটনা নিজ নিজ কর্ম্মফলেরই উপযুক্ত ফল বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অনুসারিগণ তথা ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বতোভাবে হিংসা বর্জন করিয়াই চলেন — ইহাই শ্রীম্মহাপ্রভুর শিক্ষা। তাঁহারা ভগবদ্-দ্রোষি এবং ভক্তদ্রোষিগণকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিবার শিক্ষাই লাভ করিয়াছেন। এইসকল দ্রোষিগণের জন্য বিশেষ দায়িত্ব দণ্ডদাতা শ্রীযমদেবের উপরই ভগবান্-কর্তৃক অপিত। ভগবদ্ভক্তগণ যমদণ্ড্য সেই পাষণ্ডদের অত্যন্ত দুঃখজনক পরিণতি সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ায় তাহাদের জন্য বরং দুঃখিতই হন। পাষণ্ডদের বিভীষিকাময় পরিণতি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মসমূহের মধ্যে একটা। রাজদ্রোহিতা করিয়া কাহারও পক্ষে রাজদণ্ড এড়াইয়া যাওয়া সম্ভব হইতে পারিলেও ভগবদ্বিদ্রোষি এবং ভক্তদ্রোষির পক্ষে যমদণ্ড অতিক্রম করা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। “কণ্টকেনৈব কণ্টকম্” — কাঁটা দ্বারা কাঁটা উত্তোলনও প্রকৃতির সেই স্বাভাবিক নিয়মেই হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত পাষণ্ডদের ক্ষেত্রে অহরহঃই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ইহাই শেষ কথা নহে — তাহাদের জন্য কোটিগুণ

বিভীষিকাময় পর্যায় অর্থাৎ অত্যন্ত ভয়ংকর নরকবাস যে অপেক্ষা করিতেছে, ইহা কেবল তাহার সূচনা মাত্র। মূল কথা এই যে, ভগবানের সহিত হিংসা প্রকাশ করিলে কোন লোকের নিস্তার নাই।

—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

## শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৪ পৃষ্ঠার পর ]

অর্জুনকেও বললেন কৃষ্ণ—এতক্ষণ তোমাকে যে উপদেশ করেছি সেগুলো সব বাদ দাও, দরকার নেই, তুমি বুঝলে না কিছু। আমার শেষ কথা শোন। “মামেকং শরণং ব্রজ”—একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও, আমার শরণ গ্রহণ কর। তার ভিতরে আবার সন্দেহ আসছে, সেজন্য ওটা চেপে দিচ্ছেন কৃষ্ণ। আমার এই আজ্ঞা পালন করতে গিয়ে তোমার ভিতরে যদি এমন চিন্তা হয় যে, কি জানি আমি আবার পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হব কিনা, সেই ভয় যদি আসে তোমার তাহলে “অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি”—আমি তোমাকে সমস্ত রকম দোষ-ক্রুটি থেকে মুক্তি দেব, রক্ষা করব। “মা শুচ”—তুমি চিন্তা-ভাবনা কর না, তুমি শোকগ্রস্ত হয়ো না, তুমি ত’ ক্ষত্রিয়। ক্ষাত্রধর্ম ত’ ছেড়ে দিয়েছ, এখন এসে গিয়েছ শূদ্র ধর্মে। শূদ্রধর্ম কাকে বলে? ‘শোচনাং ইতি শূদ্র’। প্রাকৃত শোক-মোহের বশীভূত যারা তারা হলেন শূদ্র—এই হল শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা। ব্রাহ্মণ কে?—যাঁরা ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁরা হলেন ব্রাহ্মণ। ভগবানের উপাসনা যারা করেন না, প্রাকৃত শোক-মোহের বশীভূত যারা, তারা হলেন শূদ্র। তুমি যদি তাই নও তাহলে তুমি শোকগ্রস্ত হচ্ছ কেন? আমার আজ্ঞা পালন করতে গিয়ে তোমার এত দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা কেন? শেষকালে আবার হাতজোড় করেছেন অর্জুন,—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।।

প্রতিজ্ঞা করলেন—তুমি যা বলছ তা আমি পালন করব। আমি এটা বুঝতে পেরেছি। আমি আগে তোমার সঙ্গে যে তর্কাতর্কি করছিলাম তা না বুঝে করছিলাম। আমার সব মোহ বিগত হয়েছে, আমি স্মৃতিশক্তি ফিরে পেয়েছি। “অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ”—কথাটা আছে। ভগবানকে সবসময় স্মৃতিপথে রাখব—এটাই আমাদের প্রতিজ্ঞা থাকবে, আর সেই স্মৃতি যদি আমার চলে যায় তাহলে সব গেল। “ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্যায়োহস্মৃতিঃ” ভগবানকে ভুলে যাওয়া হল আমাদের সব থেকে বিপদ। এর থেকে বিপদ আর কিছু নাই এ সংসারে। ভগবান্নাম, ভগবৎস্মৃতি বিস্মরণ আমাদের সব শেষ করে দেয়। এই দোষেই আমরা বদ্ধজীব হয়ে সংসারে কষ্ট পাচ্ছি। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—ত্রিতাপজ্বালায় জজ্জরিত হচ্ছি। পাপ-পুণ্য, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, স্বর্গ-নরক করে যাচ্ছি। কিন্তু ভগবানের সাক্ষাৎ সেবালাভের সুযোগ হচ্ছে না। এটাই হল আমাদের পক্ষে চরম দুর্ভাগ্য।

কৃষ্ণ বললেন,—দেখ, সত্য ও মিথ্যা হয়। আবার মিথ্যাও সত্য হয়। ভগবদাজ্ঞা

পালন করে অর্জুন ঠিক সখ্যভাব রক্ষা করলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে তিনি একটা কথা বললেন, দরকার ছিল সে-সময়। কেননা ভগবানের ইচ্ছা। তিনি বললেন,— তুমি বল ‘অশ্বখামা হতঃ’। যুধিষ্ঠির ভাবলেন, আমি ত’ ধর্মরাজ, এই মিথ্যা কথা বলি কি করে? তিনি ওটা বলতে চাচ্ছেন না। তারপর অশ্বখামা নামে একটা হাতী মারা গেছে। তখন তিনি বললেন— ‘অশ্বখামা হতঃ’। শেষকালে একটু লেজুড় জুড়ে দিলেন ‘ইতি গজঃ’। ভগবান্ বললেন,— ও যুধিষ্ঠির! খানিকটা খুব জোরে হল, আর খানিকটা খুব আস্তে আস্তে হল কেন? সবটা একই সুরে বললে না কেন? ভগবান্ বিশ্বাস্ত্যামি, ধরে ফেলেছেন তিনি। চালাকি করলেন যুধিষ্ঠির। আগে বলেন নি, যখন অশ্বখামা নামে হাতীটা মারা গেছে সেই সময় চিৎকার করে উঠেছে ‘অশ্বখামা হতঃ ইতি গজঃ’। খারাপ হল। আমার কথা রাখলে না তুমি, নিজের বাহাদুরি রাখলে। এর Punishment হল নরকদর্শন। নরকে যাও। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আবার নরক দর্শন! আইনের একটু এদিক ওদিক হলে রেহাই নেই। ভগবানের আজ্ঞা লঙ্ঘন করবার জন্য তাঁর নরক দর্শন হল।

এক জায়গায় আবার যেটা সত্য সেটা বলতে গিয়ে নরকদর্শন হচ্ছে। আর ভগবান্ যেখানে বললেন এটা বল, আমার মনে হচ্ছে ওটা মিথ্যা কথা, সেটা আমি বলতে চাচ্ছি না, সেটোতে ভগবদাজ্ঞা লঙ্ঘন হল। শাস্ত্রে এ সব বিচার আছে—সত্য কখনও মিথ্যা হচ্ছে, আবার মিথ্যা কখনও সত্য হচ্ছে। ভগবানের Verdict—অভিमत শুনুন। তিনি বলছেন ধর্মার্ধর্ম সম্বন্ধে যা বিচার সেগুলো শাস্ত্রে আমারই দেওয়া। তোমরা নিজেরা কিছু তৈরী করো না, আমার দেওয়া Verdict মেনে নেবে, তাহলে তোমাদের কল্যাণ। মহাভারতের মধ্যে শ্লোকটা আছে। ‘অধর্মং ধর্মোচ্যতে’। সেকি! ‘সুপ্রসঙ্গে হৃষীকেশে বিপরীতে বিপর্যয়ঃ’—হৃষীকেশ ভগবান্ যদি সম্মুখ হন তাহলে অন্যায়টা ন্যায় হয়ে যাচ্ছে, আর ন্যায়টাও অন্যায় হয়ে যাচ্ছে। সেই উদাহরণ দিয়েছেন এখানে। “মামনাদৃত্য ধর্মোহপি পাপং স্যাৎ মৎ প্রভাবতঃ।” ধর্মও পাপ হয়ে যাবে একথাও বলা আছে। তাহলে আমি সত্য-মিথ্যা কোনটাকে বলব? ভগবান্ যে বিধান দিয়েছেন সেইটা সত্য। ভগবান্ যেখানে বলছেন এইটা এইটা কর, তোমাদের কল্যাণ হবে, সেইটা হল সত্য। আর যেখানে বলছেন— এইটা এইটা করবে না, সেটাই মিথ্যা, সেটা বাদ দিতে হবে। আমার ইচ্ছানুসারে হবে না। ঠিক এই কথাটা শিক্ষা দিয়েছেন।

“স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গৌরব-মিশ্রিত ঐশ্বর্য্যমার্গের সেবকগণ এবং জ্ঞানী বা জ্ঞানমিশ্র ভক্তগণ অপেক্ষা মাধুর্য্য-রসাস্রিত উন্নত উজ্জ্বল রসের সেবকগণের নিকটই সর্ব্বতোভাবে বশীভূত হয়ে থাকেন। অন্য প্রকার অর্থ, যথা—ভগবানের প্রিয় শ্রেষ্ঠ ভক্তগণের প্রভাব যাঁরা জানেন তাঁদের নিকটেই মাত্র নিজের ভক্তবশ্যতাটি জ্ঞাপন করেন।”

যাদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি নেই, যারা কখনও ভগবানকে ভুল বুঝবেন না, এই জাতীয় যে উন্নতোজ্জ্বল রসাস্রিত ভক্ত—যাঁরা কখনও ভগবানকে ভুল বুঝতে পারেন না, এমন ধরণের লোকের কাছে ভগবান্ ভক্তবশ্যতা প্রকাশ করেন, সকলের কাছে নয়। তাহলে গোপনীয়তা আছে। তত্ত্বদর্শন শিক্ষাগ্রহণ-ব্যাপারে এবং প্রদান সম্বন্ধেও এ গোপনীয়তা আছে। সকলকে সবটা দেওয়া হবে না। নিজের ভক্তবশ্যতা জ্ঞাপন করেন নিজের প্রিয়

শ্রেষ্ঠ ভক্তের কাছে। “অন্য কারও নিকটে প্রকাশ করেন না। কারণ যারা বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য সবিশেষ অবগত নহেন, কেবল জ্ঞানেরই চর্চা করেন, তাদের নিকট ‘ভক্তির এবং বিশেষতঃ ভক্তি-মাহাত্ম্যের পরম গোপনীয়ত্ব-নিবন্ধন’ তাহা প্রকাশনের অযোগ্য।” সুতরাং কৰ্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বিগণ ভক্তি থেকে বঞ্চিত। ওদের উপদেশ করা যাবে না। ভয়ানক কথা! এ আবার কি? এ বিচার গীতার মধ্যে অর্জুনকে বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ,—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্ম্মসঙ্গিনাম্।

যোষয়েৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।।

কৰ্ম্মী-জ্ঞানিগণের বুদ্ধিভেদ কর না। কেন? —সামান্য যেটুকু করছিল ওরা ওটুকুও ছেড়ে দেবে। সেজন্য নিষেধ করছেন। তাহলে উভয় সঙ্কট ওদের। ওদের বুদ্ধিভেদ কর না—বেশী কিছু বলতে যেও না। আচ্ছা, ওটা না হয় না বললাম, কিন্তু ভক্তি সম্বন্ধে কিছু বলা যাবে না? এতে নিষেধ নেই, ওটা বলতে পার। কৰ্ম্ম, জ্ঞান, যোগের কথা কিছু বলবে না, বললে উষ্টো বুঝবে। উষ্টো বুঝলে সব শেষ। নিষেধ করছেন। তাহলে উপদেশ কাকে কতটুকু করতে হবে, কাকে কতটুকু বলতে হবে তাও বিচার করতে হবে। যিনি বলবেন তাঁর বিচারের মধ্যে থাকবে। কিন্তু ভক্তিদৰ্শনের কথা সকলকে বলা যাবে, প্রচার করা চলবে। কৰ্ম্ম, জ্ঞান, যোগের কথা বললে তাতে উৎসাহ পাবে, কিন্তু তারা বুঝবে না। কৰ্ম্মই ভক্তি, জ্ঞানই ভক্তি, যোগই ভক্তি, তপস্যাই ভক্তি শাস্ত্রে বলা আছে। বোঝে কয়জন? অনেক সময় ভক্ত প্রার্থনা করছেন,—

কৰ্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, কৃষ্ণভক্তি নাই।

তবে বল কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই।।

কোন কৰ্ম্ম সেটা যেটা ভক্ত চাইছেন? সে কৰ্ম্ম ভগবৎসম্পর্কীয় কৰ্ম্ম, ভগবানের প্রীতিমূলা কৰ্ম্ম, ভগবানের সেবামূলা কৰ্ম্ম। সেই কৰ্ম্ম চাইছেন ভক্ত। ভগবানকে কি করে পেতে হবে? তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধজ্ঞান কি? সম্পর্ক কি? —এটা বুঝতে পারা যায় যে জ্ঞানের দ্বারা সেটা হল ভক্তি।

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।

হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা।।

সূর্যে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।

সেব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেদ্।।

‘হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া’—ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে, ভগবানের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে কৰ্ম্ম সেইটাই ভক্তি। গীতা-মাহাত্ম্যের শেষ শ্লোক—আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যেগুলো Quote করেছেন, তার শেষ শ্লোক—

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্র গীতমেকো দেবো দেবকীপুত্র এব।

একো মন্ত্ৰস্তস্য নামানি যানি কৰ্ম্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা।।

সেই পরদেবতার সেবা। তাহলে কৰ্ম্মই ভক্তি এখানে। কেবল শব্দ বললে হবে না, শুধু শব্দগুলো নিয়ে ঝগড়া করলে হবে না। কৰ্ম্ম কাকে বলব?—‘তৎ কৰ্ম্ম হরিতোষণং যৎ সং’ বিদ্যা কাকে বলব?—‘সা বিদ্যা তন্মতির্য্যা’—যে বিদ্যায় ভগবানে ভক্তি হয়,

সেটাই হল বিদ্যা। আর যদি সে উদ্দেশ্য না হয় তাহলে সে বিদ্যা বিদ্যা নয়, সে বিদ্যা অবিদ্যা ভেল। সে বিদ্যা অবিদ্যা হয়ে গেল। ‘দ্বৈ বিদ্যো বেদিতব্যে সা পরা চ অপরা’ তাহলে কেন শাস্ত্রের সমালোচনা আসছে।

মন রে, কেন কর বিদ্যার গৌরব।

স্মৃতিশাস্ত্র, ব্যাকরণ, নানা ভাষা-আলোচন,

বৃদ্ধি করে যশের সৌরভ।।

কিন্তু দেখ চিন্তা করি’, যদি না ভজিলে হরি,

বিদ্যা তব কেবল রৌবব।

কৃষ্ণ-প্রতি অনুরক্তি, সেই বীজে জন্মে ভক্তি,

বিদ্যা হ’তে তাহা অসম্ভব।।

বিদ্যায় মার্জ্জন তা’র, কভু কভু অপকার,

জগতেতে করি অনুভব।

যে বিদ্যার আলোচনে, কৃষ্ণরতি স্মুরে মনে,

তাহারি আদর জান’ সব।।

ভক্তি-বাধা যাহা হ’তে, সে বিদ্যার মস্তকেতে,

পদাঘাত কর’ অকৈতব।

সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তা’র হিয়া,

বিনোদের সেই সে বৈভব।।

তাহলে কোন বিদ্যাকে বিদ্যা বলছে সেটা বুঝতে হবে। যে বিদ্যায় কোন অহঙ্কার নেই, যে বিদ্যায় নিরভিমান ভাব এনে দেবে, যে বিদ্যায় অমানী মানদ ভাব এনে দেবে, যে বিদ্যায় তৃণাদপি সুনীচ ভাব এনে দেবে, তার নাম বিদ্যা। মহাপ্রভু দিগ্বিজয়ী-জয়ের সময় দিগ্বিজয়ীকে বলছেন,—

[পরের দিন (দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত) যখন ভুল বুঝতে পেরেছেন, সরস্বতী দেবীর আজ্ঞা পেয়েছেন—আরে, তুমি কার কাছে পরাক্রান্ত হয়েছ? আমি তোমার মুখে বসে সব বলি, আর আমার স্বামীর কাছে গেছ তুমি বিচার করতে। এটা তোমার বোকামি হয়েছে। সেখানে তোমার বাকরোধ হওয়া মানে আমি সেখানে চুপ করে গেছি। আমি কিছু বলতে পারি না সেখানে। স্বামীর কাছে কি স্ত্রীর কোন বাহাদুরি চলে? —বাহাদুরি চলে না। এজন্য আমি চুপ করে গেছি, আর তুমি হেরে গেছ। মন খারাপ কর না। যাও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তাঁর কাছে তত্ত্বসিদ্ধান্ত জান, তাঁর কাছে উপদেশ প্রার্থনা কর। পরের দিন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গেছেন মহাপ্রভুর কাছে। গিয়ে বলছেন,— ঠাকুর! আমি বুঝতে পারিনি, তুমি যে আমার মালিকানী সরস্বতী দেবীর উপরওয়ালা। তা আমার জানা ছিল না। ক্ষমা কর, উপদেশ চাই।]

দিগ্বিজয় কবির বিদ্যার কার্য্য নহে।

ঈশ্বর ভজিতে সেই বিদ্যা সত্য কহে।।

মন দিয়া বুঝ দেহ ছাড়িয়া চলিলে।

ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে।।  
 এতেকে মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি।  
 করেন ঈশ্বর সেবা দৃঢ় চিত্ত করি'।।  
 এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র সকল জঞ্জাল।  
 শ্রীকৃষ্ণচরণ গিয়া ভজহ সকাল।।  
 সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।  
 কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি রয়।।  
 মহা উপদেশ এই কহিনু তোমারে।  
 সবে বিষুণ্ডভক্তি সত্য অনন্ত সংসারে।।

এছাড়া আর ভাল কথা কিছু নেই জেনে রাখ, বুঝে রাখ। অহঙ্কারের কথা কিছু নেই। ভগবান্ তিনি যে ভক্তবৎসল তা তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্তের কাছে প্রকাশ করেন, সকলের কাছে করেন না। কৰ্মী, জ্ঞানী, যোগী যারা, তাদের কাছে প্রকাশ করেন না।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোজ্জিতা।।

কর্ম, জ্ঞান, যোগের দ্বারা ভগবান্ খুশী হন না, প্রীত হন না। ভক্তিপ্রিয় মাধব ভক্তির বশ।

ভক্ত্যতুয্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয় মাধব।

ভক্ত্যহমেকয়া গ্রাহ্য শ্রদ্ধয়াস্মা প্রিয়ঃ সতাম্।

ভক্তিঃ পুনাতি মমিষ্ঠা স্বপাকানপি সম্ভবাৎ।।

সব জায়গায় ভক্তির কথা। ভক্তিসূত্রেতেও তাই আছে—“ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।” ভক্তিছাড়া কিছু হবে না যিনি যত বাহাদুরি করুন না। “ভক্তির এবং বিশেষতঃ ভক্তি-মাহাত্ম্যের পরম গোপনীয়ত্ব-নিবন্ধন তা প্রকাশনের অযোগ্য। এই তাৎপর্যেই ‘তদ্বিদাং’—এই পদের ‘ভূত-বশ্যতাবিদাং’ অর্থাৎ ভক্তবশ্যতারূপ শ্রীকৃষ্ণের গুণটি যাঁরা জানেন,—এই অর্থ প্রদর্শন করা হয়েছে। অতএব ‘প্রেমতঃ’—ভক্তি বিশেষের সহিত, ‘শতাবৃত্তি’—শত শত বার পুনরায় ‘তং বন্দে’ সেই ঈশ্বরকে আমি বন্দনা করি।

সূতরাং ভক্তির প্রকার-বিশেষরূপ ভক্তগণের অবশ্য আচরণীয় বন্দনাই আমার প্রার্থনীয়, কিন্তু ঐশ্বর্য-জ্ঞানাদি নহে—ইহাই প্রার্থনাকারীর তাৎপর্য।”

সাধারণভাবে আমি কর্ম, জ্ঞান, যোগাদির প্রার্থনা করি না। কিসের প্রার্থনা করি? — ভক্তিলাভ যাতে আমার হয়, সেই প্রার্থনাই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। এছাড়া আর কিছু চলবে না। রান্না করার সময় মায়েরা একটা জিনিষ ব্যবহার করেন এবং সেটা ব্যবহার করতে হয় সজ্জি রান্নার ক্ষেত্রে। নামটা তার লবণ। লবণ না হলে সবজি রান্না হবে কি?—হবে না। যদি লবণ দিতে ভুল হয়ে যায় তাহলে সেটা বিশ্বাদ হয়ে যাবে। সে সবজি খাওয়া যায় না। তবে Diabetic patient এর ক্ষেত্রে এই লবণহীন সবজির ব্যবস্থা আছে। তাকে খেতে হয়, গিলতে হয় বাধ্য হয়ে। লবণহীন সবজির কোন আশ্বাদ নেই, স্বাদিষ্ট নয়। অতএব যা

কিছু রান্না হবে তার ভিতরে লবণ দিতে হবে। এই লবণ শব্দ হতে ‘লাবণ্য’-শব্দের সৃষ্টি হল। চিন্তা করবেন কোথায় লবণ, আর কোথায় লাবণ্য! লাবণ্য কাকে বলে?— Beauty, Glory, Lusture কে বলে লাবণ্য। সেই লাবণ্য বৃদ্ধি করে সবজির লবণ। ভক্তিবৃত্তি হল লাবণ্য সাধক-সাধিকার। এটা ছাড়া সাধনা চলবে না। ঠিক ঠিক সাধক-সাধিকা সংজ্ঞা পাওয়া যাবে না ভক্তিবৃত্তি ছাড়া। সেইকথা শাস্ত্রের সর্বত্র বুঝানো আছে।

‘ভক্তিবৃত্তি’ মানে কি? — সেবক-সেবিকার ভাব। সেবা আর ভক্তি একই কথা। আরাধনা, উপাসনা, ভক্তি, সেবা—সব এক কথা, একটুও তফাৎ নেই। শাস্ত্রীয় প্রমাণ-শ্লোক আপনাদের অনেকের জানা আছে,— “ভজ ইত্যেব বৈ ধাতু সেবায়াং পরিকীর্তিতঃ।” সুতরাং সেবা ভক্তি আরাধনা, উপাসনা সব এক কথা—এটা বুঝতে হবে। আমরা ঐ চিন্তা বাদ দিয়ে চলতে পারব না। ভক্তি প্রার্থনা করতে হবে আমাদের।

ইতি শ্রীশ্রীদামোদরাস্টকের তৃতীয় শ্লোকের শ্রীশ্রীল সনাতন-গোস্বামিকৃত দিগদর্শিনী-নামক টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

## শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি নিত্যলীলাপ্রবিন্দ ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-শতবার্ষিকী

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২০০ পৃষ্ঠার পর]

আসাম-প্রদেশস্থ ধুবড়ী জেলার সদর ধুবড়ী নগরীতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নবনির্ম্মীয়মান শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাদ্ধ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অক্ষয়-তৃতীয়া-তিথিতে সাড়স্বরের সহিত অনুষ্ঠান-পূর্ব ও সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্যপ্রবরের শুভাবির্ভাব-শতবার্ষিকীর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা-সঙ্কীর্তন, সভা-সমিতি, পাঠ-কীর্তন প্রভৃতি মহোৎসব সমাপ্ত হইলে বিগত ২৮শে বৈশাখ (ইং ১১/৫/৯৭), রবিবার প্রাতে রিজার্ভ বাসযোগে বিলাসীপাড়া মহকুমা শহর অভিমুখে যাত্রা করা হয়।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদিগ্গুস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ এই শতবার্ষিকী-পরিক্রমাপটীর অগ্রণীর ভূমিকা পালনে ব্রতী হন। বিলাসীপাড়া নিবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীবলরাম সাহা মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে প্রায় অর্দ্ধশতাধিক মঠবাসী বৈষ্ণববৃন্দ তাঁহার বাসভবনে শুভবিজয় করেন। তথায় মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় নগর-সঙ্কীর্তন শোভাযাত্রা সহযোগে সহরের মুখ্য মুখ্য পথগুলি পরিক্রমাণ্ডে স্থানীয় সার্ব্বজনীন দুর্গামণ্ডপ-প্রাঙ্গনে উপনীত হন। এই সঙ্কীর্তন শোভাযাত্রায় স্থানীয় বহু আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যোগদান করেন।

উল্লিখিত দুর্গামণ্ডপে সুসজ্জিত মধ্যে ব্রহ্মচারীবৃন্দ মহাজন-পদাবলী কীর্তন করেন এবং

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজের পৌরহিত্যে এক মহতী ধর্মসভা আরম্ভ হয়। শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের অতিমর্ত্য চরিত্র ও অবদান-বৈশিষ্ট্য তথা মানব জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এক দার্শনিক তথ্যপূর্ণ হৃদয়াকর্ষক ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য মহারাজ। শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে জানান যে —আত্মধর্ম-যাজনই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা ও মুখ্য কর্তব্য। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ বর্তমান সমাজে নৈতিক চরিত্রের অধঃপতনের মূলে ধর্মহীনতা বা নাস্তিক্যবাদের পরিণতি বলিয়া উল্লেখ করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ ধর্মহীনতা হইলে আসুরিক সমাজ হয়; সুতরাং তাহা পর্যালোচনা করিয়া সমাজের কর্ণধারগণ তথা ধর্মনায়কগণ সঠিক পথ প্রদর্শন করাইলে দেশ তথা ব্যক্তি সকলেরই কল্যাণ হইবে। এই সভায় বিপুল লোকের সমাগম হইয়াছিল—যাহা অবশ্যই উৎসাহব্যাঞ্জক।

রাত্রে শ্রীহরিপদ সাহা মহাশয়ের বাসভবনে বৈষ্ণবগণ প্রসাদ গ্রহণান্তর রাত্রিযাপন করেন এবং পরদিবস প্রাতে শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সঙ্ঘ কোকড়াঝাড় জেলার বাসুগাঁও অভিমুখে রিজার্ভ বাসযোগে যাত্রা করেন।

## শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, বাসুগাঁও (আসাম)

২৯শে বৈশাখ (ইং ১২/৫/৯৭), সোমবার পূর্বাঙ্কে পরিক্রমা-পার্টি উপনীত হইলে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ সদলবলে বৈষ্ণবগণকে পরম শ্রীতির সহিত স্বাগত অভিনন্দন জানান। পরে মধ্যাহ্নে স্থানীয় ভক্তপ্রবর শ্রীসাধনচন্দ্র বস্মণ মহাশয়ের একান্ত প্রার্থনায় বৈষ্ণবগণ তাঁহার গৃহে প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় তাঁহার বাটী-সংলগ্ন বিদ্যালয়-প্রাঙ্গনে আয়োজিত ধর্মসভায় ব্রহ্মচারিগণ মহাজন-পদাবলী কীর্তন করেন এবং ৬টা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের পৌরহিত্যে ধর্মসভা আরম্ভ হয়। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য মহারাজ প্রভৃতি বক্তাগণ ‘সনাতন ধর্মের স্বরূপ ও তাৎপর্য’ সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতায় গভীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী-সমন্বিত ধর্মের গূঢ়তত্ত্বসমূহ বিশ্লেষণ করেন। পরে মহাজন-পদাবলী কীর্তনান্তে সভার কার্য সমাপ্তি হয়।

৩০শে বৈশাখ (ইং ১৩/৫/৯৭), মঙ্গলবার শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠের মঙ্গলারতি সমাপ্তান্তে শালাকাঠির উদ্দেশ্যে কীর্তনমুখে এক শোভাযাত্রা বহির্গত হন। পুরোভাগে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্যপ্রবরের ও জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের এবং কলিযুগপাবনাবতীরী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আলোকচিত্র সুসজ্জিত শিবিকা সহযোগে ধীর গতিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। বর্ণাঢ্য এই শোভাযাত্রায়



বহু জনসমাবেশ হইয়াছিল। শালাকাঠি রেলওয়ে গেটের কালী মন্দির প্রাঙ্গনে উপনীত হইয়া স্থানীয় ভক্তবৃন্দের সৌজন্যে জলযোগান্তে সভার কার্য আরম্ভ হয়।

এখানে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ বক্তৃতাকালে ‘ধর্মের স্বরূপ ও সার্থকতা’ সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন এবং শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন চিন্তাধারার অন্তরালে জীবের চরম লক্ষ্যস্থল নির্ণয়ে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর উৎকর্ষতা বিচার্য্য বিষয়ে সুগভীর তত্ত্ব বিশ্লেষণে শ্রোতৃবৃন্দকে চমৎকৃত করান। আধিকারিক দেব-দেবীগণ অবশ্যই প্রণম্য ও শ্রদ্ধা হইতে নাই, কিন্তু তাঁহারা যে পরতত্ত্ব নহেন ইহা অনস্বীকার্য্য বলিয়া বর্ণনা করেন। শালকোচা নিবাসী শ্রীরাজীবলোচন নাথ (মাধ্যমিক স্কুল পরিদর্শক) মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় বৈষ্ণব-ধর্ম বা ভাগবতী-ধর্ম বা আত্মধর্ম সম্পর্কে বলিতে গিয়া উল্লেখ করেন যে, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দয়ার চমৎকারিতা অত্যন্ত সুগভীর ও নিত্য-আনন্দলহরী প্রযুক্ত, ইহা অবশ্যই অনুধাবনীয়।

অতঃপর মধ্যাহ্নে সন্নিকটস্থ বর্ষণ-আলয়ে বৈষ্ণবগণের প্রসাদের ব্যবস্থা তথা শত শত পরিক্রমাকারী ভক্তগণকে এবং আহূত, রবাহূত প্রভৃতি সহস্রাধিক জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন।

অপরাত্নে থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্ট-এর দুর্গামণ্ডপে এক মহতী সভার আয়োজন হয়। শ্রীঅরুণচন্দ্র গোপ (শিক্ষক, কোকড়াঝাড় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়) মহাশয় বৈষ্ণবধর্মের উৎকর্ষতা সম্পর্কে সুযুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ আত্মধর্মের সূক্ষ্ম বিচারদ্বারা প্রতিপন্ন করান যে ভোগপর দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া মানবগণ নিত্যসুখ লাভ করিতে পারেন না। সভা সমাপ্ত হইলে বাসযোগে তথা হইতে বাসুগাওস্থ শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন করা হয়।

৩১শে বৈশাখ (ইং ১৪/৫/৯৭), বুধবার শ্রীমন্দিরে মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে বাসুগাও সহরে নগর সংকীর্ণন উদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়া পরিক্রমাকালে স্থানীয় শ্রীগোবিন্দজী মন্দিরের নাট্যমন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গনে এক মহতী সভার আয়োজন হয়। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ শ্রীগোবিন্দজীউর লীলা-বৈশিষ্ট্য ও শ্রীহরিনাম-মহিমা কীর্তন করেন। পরে মধ্যাহ্নে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করা হয়।

ঐ দিন সন্ধ্যায় উক্ত মঠের নাট্যমন্দির প্রাঙ্গনে সভার আয়োজন হইলে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ, শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ সনাতন ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন। পরিশেষে এই মঠের ইতিবৃত্ত ও সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্যের এখানে মঠস্থাপনে স্বধামগত পার্বতীচরণ রায় মহাশয় ও তদীয় ধর্মপত্নী স্বধামগতা প্রতিভা রাণী রায়ের ঐকান্তিক সেবা-প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবগত করান। এতদ্ব্যতীত এই মঠের অন্যতম প্রধান সেবক ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ বিষ্ণু মহারাজকে উক্ত মঠের অন্যতম রূপকাররূপে অভিহিত করেন এবং শ্রীশ্রী গুরুপাদপদ্মের শুভাবির্ভাব-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে বহু বৈষ্ণববৃন্দ উপস্থিত হওয়ায় প্রচুর কল্যাণপ্রদ বলিয়া উল্লেখ করত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

এখান হইতে আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল বঙ্গাইগাঁও জেলার সদর বঙ্গাইগাঁও শহর।

শ্রীপ্রিয়নাথ চৌধুরী মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে ১লা জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৫/৫/৯৭) বাসযোগে বড়পাড়াস্থ তাঁহার বাসভবনে উপনীত হইলে বিশেষ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। পূর্বাহ্নেই শ্রীব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয় মঠ পরিক্রমণ ও তথায় হরিকথার আয়োজন হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীচৌধুরী বাবুর বাসভবনে সকলের প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা হয়। অপরাহ্নে কীর্তনমুখে বঙ্গাইগাঁও শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমণ করিয়া সার্বজনীন শ্রীহরিসভা মন্দির-প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলে স্থানীয় ভক্তবৃন্দের অতিশয্যে মহতী ধর্মসভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায় ভক্তবৃন্দের এতই উপস্থিতি হইয়াছিল যে, স্থান সঙ্কুলান হওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। তজ্জন্য বৈষ্ণবগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া এক দল বড়পাড়া প্রত্যাবর্তন করিয়া কতিপয় ভক্তগৃহে তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া শ্রীপ্রিয়নাথ চৌধুরী মহাশয়ের বাসভবনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানেও সভার আয়োজন হয়। পরিশেষে দুই দলই তথায় সম্মিলিত হন এবং সভার কার্য আরম্ভ হয়। বক্তাগণ সনাতন ধর্মের বিভিন্ন দিগ্‌দর্শন করিতে গিয়া সমিতির নিয়ামক-আচার্যের অতিমর্ত্য চরিতাবলীও বর্ণনা করেন। এখানেই রাত্রিবাস করা হয়।

পরের দিন সকালে কীর্তনসহযোগে আমরা নিউ বঙ্গাইগাঁও স্টেশনে উপনীত হইয়া ট্রেনযোগে আসামের রাজধানী গৌহাটী অভিমুখে রওনা হই। তখন পূর্বাহ্ন প্রায় ৯টা, কামাখ্যা স্টেশনে পৌঁছিলে পাণ্ডু শ্রীগোবিন্দজী গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ও স্থানীয় বহু ভক্ত সমন্বিত হইয়া আমাদের পরিক্রমা-সঙ্ঘকে স্বাগত জানান।

## শ্রীগোবিন্দজী গৌড়ীয় মঠ, পাণ্ডু, গৌহাটী (আসাম)

২রা জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৬/৫/৯৭), শুক্রবার শ্রীমঠে অবস্থানপূর্বক বৈকাল ৪ ঘটিকা হইতে ব্রহ্মচারিগণ মহাজন-পদাবলী কীর্তন করেন। কীর্তনান্তে শ্রীমদ্ভগবত পাঠ করেন শ্রীমদ্ভক্তিবদান্ত আচার্য মহারাজ।

৩রা জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৭/৫/৯৭), শনিবার মঙ্গলারাত্রিকান্তে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন হয়। পাণ্ডু, মালিগাঁও, আদাবাড়ী প্রভৃতি স্থানে কীর্তনসহযোগে পরিক্রমা করা হয়। বৈকাল ৫ঘটিকায় আয়োজিত ধর্মসভায় স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, অধ্যাপক, শিক্ষক প্রভৃতি জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণও সম্মিলিত হন। শ্রীমদ্ভক্তিবদান্ত পর্যটক মহারাজ, শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমৎ বিষ্ণু মহারাজের বক্তৃতান্তে সভাপতির ভাষণে শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজ সামাজিক জীবনে ধর্মের দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়া অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বলিয়া বর্ণনা করেন।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৮/৫/৯৭), রবিবার বাসযোগে শ্রীবিশিষ্টাশ্রম দর্শন করা হয় এবং যাত্রিগণের মধ্যে অনেকে কামাখ্যা মন্দির দর্শনেও যান। পরে উমানন্দ, দৌলগোবিন্দ প্রভৃতিও দর্শন করা হয়। এই দিনই বৈকালে শ্রীমদ্ আচার্য মহারাজ বাতীত অন্যান্য মহারাজগণ এবং কিছু ব্রহ্মচারী কেহবা শিলং, শিলচর, কোচবিহার, গোলোকগঞ্জ, ধুবড়ী, বাসুগাঁও প্রভৃতি স্থানে যাত্রা করেন। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় শ্রীনিবুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভাষণকালে বলেন যে, ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক কৃষ্টি সবই ধর্মভিত্তিক অথচ উহা সবই উন্নত

বিজ্ঞান ভিত্তিক। তাই ভারতের যাহা কিছু চিন্তাধারা সমস্তই ধর্মকেন্দ্রিক—যেন ধর্মই ধ্যান-জ্ঞান। ধর্মকে বাদ দিয়া কোন চিন্তা-ভাবনা হইতে পারে না। সভাপতির ভাষণে ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীমৎ আচার্য মহারাজ জানান যে, শক্তিসাধনার পীঠস্থান এই কামরূপ বা আসাম প্রদেশ জ্যোতিষচর্চার প্রাগ্ভূমি, সে-কারণে এই গৌহাটী বা গুয়াহাটী প্রাচীনকালে প্রাগ্জ্যোতিষপুর নামেই সুবিদিত ছিল। এখানেই অবস্থিত কামাখ্যা দেবী যেমন তন্ত্রসাধকের মাতৃভূমি, তেমন এই কামাখ্যা দেবীই শ্রীগোপালমন্ত্র প্রদান করে ভক্তকে ভক্তি-পথবর্তিকা প্রদান করেন। কিন্তু অতত্ত্বজ্ঞগণ জড়কামনা-প্রসূত তমোগুণায়িত অবস্থার পূজারীরূপে পরিগণিত হইয়া ভগবদ্ভক্তি হইতে বিচ্যুত হন। মহারাজজী ঈশ্বর-তত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে গিয়া চিৎশক্তি, ময়াশক্তি, জীবশক্তি বা তটস্থা-শক্তির অবস্থা ও ঈশ্বরের সহিত কাহার কিরূপ সম্পর্ক এবং শক্তিত্রয়ের সেবানৈপুণ্যের বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত দার্শনিক বিচারসম্বিত তত্ত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করায় শ্রোতৃমণ্ডলী চমৎকৃত হন। সভার সমাপ্তিকালে মঠরক্ষক শ্রীপরেশানন্দ ব্রহ্মচারীজী যাঁহারা এই অনুষ্ঠানে কায়িক, বাচিক, মানসিক, আর্থিক প্রভৃতি যে কোনপ্রকারে সেবায় সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের করুণা সর্বদাই যেন বর্ষিত হয়, তজ্জন্য হার্দিক প্রার্থনা করেন।

বলাবাহুল্য তিন দিবসই প্রত্যহ সহস্রাধিক জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরিত করা হইয়াছিল।

৫ই জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৯/৫/৯৭), সোমবার প্রাতে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য মহারাজের পরিচালনায় বৈষ্ণববৃন্দ ও ভক্তগণ-সম্বিত প্রায় অর্দ্ধশত জনের অবশিষ্ট দলটি গৌহাটী স্টেশন হইতে কামরূপ এক্সপ্রেসযোগে শ্রীধাম নবদ্বীপ উদ্দেশে রওনা হন। পথিমধ্যে শিলিগুড়ি শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠের কিছু সেবক নিউজলপাইগুড়ি জংশনে সকল বৈষ্ণবগণের মধ্যাহ্ন-সেবার জন্য প্রসাদ প্রদান করেন।

—বিশেষ সংবাদদাতা

## পাশ্চাত্ত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম-প্রচার

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ২৩৮ পৃষ্ঠার পর ]

২/৬/৯৭ আমেরিকাস্থিত Texas State এর Houston city তে শ্রীল মহারাজ পদার্পণ করেন। বিমানবন্দরে শ্রীবিষ্ণুদাসের আনুগত্যে স্বাগত সমারোহ। ২/৬/৯৭—৭/৬/৯৭ সায়ংকাল পর্য্যন্ত Houston এ থাকাকালীন শ্রীল মহারাজ বর্তমান জগতের সমস্যা এবং সমাধানের একমাত্র উপায় ভক্তি—ইহা লৌকিক, বৈজ্ঞানিক এবং পারমার্থিক যুক্তিদ্বারা স্থাপন করেন এবং মন্তব্য করেন শ্রীমদ্ভাগবতেই সার্বকালিক, সার্বদেশিক সার্বজনীন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের জগতে প্রকটের কারণ ব্যাখ্যা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো . . . . . সুপ্রসীদিত' শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভক্তির পারিভাষিক আলোচনা করেন। আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা, স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির

আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন,—শাস্ত্রবর্ণিত প্রহলদ মহারাজ—কথিত ‘শ্রবণং কীর্তনং বিষেগ..... উত্তমম্’ হল স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। ‘ইতি পুংসাপিতা বিষেগ’—সর্বপ্রথম সাধককে শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবচরণে সমর্পিত হইতে হইবে। সমর্পিত না হইয়া ভক্তি অনুশীলন করিলে স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি হইবে না। ৬৪ প্রকার ভক্তির অঙ্গই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। ইহা নবধা, পঞ্চধা, ত্রিধা এবং ‘পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্তনম্’ একধা রূপে আমাদের নিকট প্রকটিত আছেন। অন্যভিলাষিতায়ুক্ত হইয়া অথবা জ্ঞান-কর্মদ্বারা আবৃত হইয়া যাজিত হইলে ইহা স্বরূপসিদ্ধা না হইয়া আরোপসিদ্ধা অথবা সঙ্গসিদ্ধা হইবে।

জনৈক শ্রোতা প্রশ্ন করেন,—মহারাজ! মুসলমান এবং খ্রীষ্টান্ ধর্মের কেবলমাত্র এক আল্লা এবং God, কিন্তু হিন্দুধর্মে শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যমহাপ্রভু, রাম, নৃসিংহ, বামন, বরাহ, মংস্য ইত্যাদি এত ভগবান কেন?

উত্তর :— ভগবান এক। India তে সমস্ত বিষয়ে gradation রহিয়াছে। সাধকের যোগ্যতা অনুসারে ভগবানের বিবিধ প্রকাশ। যেমন— Class one, two হইতে M. A. Ph.d. সকলেই ছাত্র, কিন্তু সব ছাত্র এক নহে, বিভিন্ন grade রহিয়াছে। এইজন্যই পাশ্চাত্ত্য মনীষী বলিয়াছেন,—‘India guided by God can lead the world back to sanity.’

প্রশ্ন :— মহারাজ! আমরা কি ভজন করিতে করিতে অবশেষে ভগবানের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যাইব?

উত্তর :— না, না, কখনই নয়। জগতের কোন বস্তু কখনই মিলিয়া এক হইতে পারে না। ‘এক’ শব্দের মধ্যেই দুইটি অক্ষর রহিয়াছে, ‘ONE’ এ তিনটি alphabet রহিয়াছে, ‘I’ এ সহস্র সহস্র ..... রহিয়াছে। আচ্ছা, দুই গ্লাস জল আন, দ্বিতীয় গ্লাসের জল প্রথম গ্লাসে ঢালিতে থাক। জল কি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেল? হ্যাঁ, যদি এক হইয়া গেল নীচে পড়িল কেন? না কখনও মিশিয়া এক হয় নাই। অন্য আর একটা উদাহরণ— আজকের class এ 350 জনের বেশী ভক্ত আছেন, সকলে আমার সহিত মিলিয়া এক মাংসপিণ্ড হইয়া গিয়াছে? না, প্রত্যেকের সত্ত্বা পৃথক্ রহিয়াছে। আমরাও তদ্রূপ দাস্য, সখ্যাদি বিভিন্ন ভাবাশ্রয়ে ভগবানের সহিত মিলিব, কখনই এক হইব না।

গুরুপদাশ্রয়ের তাৎপর্য বৈষ্ণব আনুগত্য। বহুদেবদেবীর উপাসনা ভজনপথের অন্তরায়, একনিষ্ঠতার পথে অন্তরায় এবং ভাগবতের বিভিন্ন উপাখ্যান আলোচনামুখে তাহার শিক্ষা ও সাধক জীবনে তাহার প্রভাব ব্যাখ্যা করেন। আমেরিকাস্থ Vietnam Buddhist Monastery তে গীতা প্রকটের কারণ ও গীতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

৭/৬/৯৭ তারিখে Central Americaস্থ Costa Rica র রাজধানী Sanjose এ রাত্রিতে অবতরণ করিলে পর স্থানীয় দ্বিশতাধিক ভক্তগণ বিমানবন্দরে মহারাজকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ১½ ঘণ্টা যাবৎ কীর্তনে সম্পূর্ণ বিমানবন্দরকে কীর্তনমুখর করিয়া তোলেন। Custom officers আমাদের জানান আপনাদের জন্য বহু ভক্ত বাহিরে কীর্তন করিতেছেন, আপনাদের check up এর কোন প্রয়োজন নাই। আমরা Costa Rica গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিলে ওখানেও বিরাট কীর্তনপার্টি স্বাগত সন্তোষের জন্য পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। কিছুক্ষণ পর পূর্বোক্ত কীর্তন দল পৌঁছিলে কীর্তনের রোলে, শঙ্খের ধ্বনিতে, মৃদঙ্গের

ধিক্ তাং এবং গীটারের সম্মিলিত সুরে কিছুই শুনিতে ও বুঝিতে পারা যাইতেছিল না। বিশেষতঃ Spanish ভাষায় কীর্তন হওয়ার জন্য আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না, অবশেষে চারজন গীটার বাদকের আনুগত্যে তাহারা পরম করুণ শ্রীমদ্বিত্যানন্দ প্রভু ও দয়ালদাতা শিরোমণি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মহিমা কীর্তন করেন। ৮/৬/৯৭ তারিখে স্থানীয় সাংবাদিক দ্বারা Interview, ৯/৬/৯৭ তারিখ Iskcon এর শ্রীগুরুপ্রসাদ স্বামী কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীল মহারাজ তাঁহাকে cross interview এর মাধ্যমে নিরুত্তর করেন। ১০/৬/৯৭ স্থানীয় Iskcon farm এ শ্রীঅভয়চরণ স্বামীর দ্বারা ভব্য স্বাগত। ১০/৬/৯৭ পুনরায় অপর সাংবাদিক দ্বারা Interview । Interview দুইটি পরে প্রকাশিত হইবে। ৭/৬/৯৭ হইতে ১৪/৬/৯৭ পর্য্যন্ত Costarica তে থাকাকালীন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লইয়া আলোচনামুখে বলেন— প্রথমে আমাদের সাধ্য স্থির করিতে হইবে, তবে সাধন শুরু হইবে। এইজন্য সমস্ত গৌড়ীয় গ্রন্থে প্রথমে সাধ্য স্থির করিয়া পরে সাধন বর্ণন হইয়াছে। সম্ব্যাকালীন পাঠে মূলতঃ মায়াবাদ খণ্ডনই ছিল মূল বক্তব্য বিষয়। Costarica তে সুষ্ঠু অনুষ্ঠানের যাবতীয় দায়িত্বে ছিলেন শ্রীরামানন্দ (রমেশ) দাসাধিকারী মহাশয়।

১৫/৬/৯৭ পুনরায় Houston এ আগমন। Houston এ ১৮/৬/৯৭ পর্য্যন্ত থাকাকালে একাদশীর লৌকিক, বৈজ্ঞানিক ও পারমার্থিক ব্যাখ্যা এবং একাদশী-মাহাত্ম্য আলোচনামুখে শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ ও দুর্ব্বাসার উপাখ্যান ও শ্রীধর্ম্মাস্তদ ও রুক্মাস্তদ উপাখ্যান ব্যাখ্যা করেন। দেবদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবক-সেবিকা। সর্ব্বজনমান্য শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও প্রমাণ শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ শ্লোক উদ্ধার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবন্ত স্থাপন করেন।

১৯/৬/৯৭ তারিখে আমেরিকার রাজধানী Washing D. C. তে আগমন, ২০/৬/৯৭ Virginia, ২১/৬/৯৭—২২/৬/৯৭ পুনঃ Washington এ ধর্ম্মসভা। উক্ত সভায় মূলতঃ শ্রীনাম-মহিমা বর্ণন করেন। Washington এ পূজ্যপাদ নারসিংহ মহারাজ, বিষ্ণু মহারাজ ও অগ্রাহ প্রভু ধর্ম্মসভা ইত্যাদির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া শ্রীল মহারাজের কৃপাশীর্বাদ লাভ করেন।

২২/৬/৯৭ হইতে ৩০/৬/৯৭ পর্য্যন্ত France এর Paris city এবং Iskcon এর New Mayapur Farm এ অবস্থানকালে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বৃহত্তাগবতামৃত আলোচনা করেন। গৌড়ীয় গুরুবর্গের ইহাই প্রথম গ্রন্থ, ইহার উপর ভিত্তি করিয়া সমস্ত গৌড়ীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরাদেবী মহারাজ পরীক্ষিতকৈ বলিলেন,—পুত্র! আমি স্ত্রীজাতি, অজ্ঞ। শুকদেব গোস্বামীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিলাম না। তুমি শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য সহজ, সরল ভাষায় বুঝাইয়া বল। শ্রবণাস্ত ভক্তির দ্বারা যিনি ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার জননী কি সাধারণ নারী ছিলেন? না, কখনই না, তিনি জগজ্জীবের কল্যাণের জন্য ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যেমন অজ্ঞান অজ্ঞ ছিলেন না, শ্রীমদ্ভাগবদগীতা প্রকাশের জন্য অজ্ঞবৎ অভিনয় করিয়া জগৎ কল্যাণ করিয়াছিলেন। তেমনই মাতা উত্তরাদেবী শ্রীবৃহত্তাগবতামৃত প্রকাশে সহায়তা করিয়াছিলেন।

মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীমদ্ভাগবতের দেবছতি উপাখ্যা নে সাংখ্যযোগমিশ্র বর্ণন করিয়াও

গ্রহণ করিলেন কেন? ‘সতাং প্রসঙ্গান্মবীর্যাসংবিদো’ এই শ্লোকই তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ, যাহা ভক্তিরাজ্যের প্রবেশের জন্য বিশেষ উপযোগী।

কুজাও স্ত্রীজাতি, স্বস্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ। তথাপি শ্রীমত্তাগবতে স্থান কেন? কুজা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া কাহাকেও ভালবাসেন না। স্বসুখবাসনারূপ অন্যাভিলাষ ছিল, সাধারণী রতি বিশিষ্ট হইলেও আমাদের গ্রহণীয় নহে।

যজ্ঞপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের গুরুজন, তাঁহাদের ভক্তি ঐশ্বর্য্যমিশ্রা, তাঁহাদের ভাব গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের উপাস্য নহে। মথুরার যাদবপত্নীগণ, গোপীগণের ভাবের প্রতি আকৃষ্ট ‘এতা পরাং তনুভূতা.....’ শ্লোকে ইহার আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিবার জন্য ইহাই যথেষ্ট নহে।

মহিষীগণের ভাবও ঐশ্বর্য্যমিশ্রা, ভয়যুক্ত, তাঁহাদের ভাবে শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট ত’ বটেই কিন্তু পূর্ণবশীভূত নহেন। তাঁহাদের রতিকে ‘সমঞ্জসা’ বলা হইয়াছে। এনারাও একনিষ্ঠ নহেন। কৃষ্ণ বাৎসল্যভাবে বশীভূত হইয়া মা-যশোদার বন্ধন স্বীকার করিলেও পরিপূর্ণ বশীভূত নহেন।

ব্রজঙ্গনাগণ একনিষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান ব্যতীত তাঁহারা কিছুই জানেন না, স্বসুখ-বাসনার গন্ধমাত্র নাই। তাঁহাদের শৃঙ্গারাদি কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতির জন্যই। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,— ‘ন পরায়েহহং নিরবদ্য সংযুজাং.....’। ইহা অন্য কাহারও জন্য বলেন নাই। ইহাদের ভাবই গোড়ীয়গণের উপাস্য। এই ব্রজভাব দান করিবার জন্যই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আসিয়াছিলেন। এই ব্রজভাবে ভজন করার জন্যই পরীক্ষিৎ মহারাজ মা উত্তরাকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে উপদেশ দিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যালঙ্কার

## দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট-এর সদস্যগণ গরীব ও দুঃস্থ জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ২৮, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৪ এ শ্রীবিনোদবিহারী দাতব্য চিকিৎসালয়-নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। বিগত ১৫ই আগস্ট ১৯৯৭, শুক্রবার স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী-বর্ষে উক্ত চিকিৎসালয় উদ্বোধন করেন মাননীয় সাংসদ শ্রীঅজিত কুমার পাঁজা মহাশয়। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমুক্তিবেদান্ত আচার্য মহারাজ, শ্রীপূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত (চেয়ারম্যান, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন) পৌরপিতা শ্রীস্বরজিৎ ভট্টাচার্য ও শ্রীসাধন সাহা, ডাঃ পরিমল কুমার দেওয়ান, ডাঃ নিমাই বসু, ডাঃ সি. আর. ভট্টাচার্য, ডাঃ শ্রীশঙ্করনাথ লাহা, শ্রীগৌর পাল ( ডেপুটি সেক্রেটারী, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন) ও অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

অনুষ্ঠানটি ১৫ই আগস্ট, ১৯৯৭ বহুল প্রচারিত দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, বর্তমান ও প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এবং আকাশবাণীতে ইহা প্রচারিত হয়। ১৯শে আগস্ট, মঙ্গলবার রাত্রি ১০-২০ মিনিটে দূরদর্শনের সংবাদেও ইহা সম্প্রচারিত হয়।

এই চিকিৎসালয় নিস্মার্মকল্পে যাঁহারা অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করিয়াছেন এবং যে-সকল ডাক্তারবাবুগণ নিরলসভাবে সেবা করিতেছেন, ট্রাস্টের সদস্যগণ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাসৌ জয়তঃ  
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা  
আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী  
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের  
২৯শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব



নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব ইতি নামিনে।।

---

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।



শ্রীশ্রীগুরুগৌরান্দৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিস্টার্ড)

ফোন—৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

৮ হাথীকেশ, ৫১১ শ্রীগৌরান্দ

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্দিতপূর্ব্বিকেষম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিকেষম্—

আগামী ৩০শে পদ্মনাভ, ২৯শে আশ্বিন, ১৪০৪ (১৬/১০/৯৭) বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অম্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্ত্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ২৯শ বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবাক্ষবে যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ক্রটি মাজ্জনীয়। ইতি— ৩০শে ভাদ্র, ১৪০৪

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশ প্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী :—

২৯শে আশ্বিন (ইং ১৬/১০/৯৭), বৃহস্পতিবার—

প্রাতে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের

অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্নে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

---

বিঃ দ্রঃ— পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে “সাধারণ-সম্পাদক”—এঁর নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।  
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিয়ন্ত্রণ

অন্ত ধর্ম স্তূষ্টরূপে পালে যেই জন  
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৯শ বর্ষ}

১ দামোদর, গর্ভোদশায়ী, ৫১১ শ্রীমৌরাক  
৩০ আশ্বিন, ১৪০৪, ইং ১৭/১০/৯৭

{ ৮ ম সংখ্যা

সানুবাদং

## শ্রীকার্ত্তিক-ব্রতে বিধিনিষেধাঃ

[শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য পঞ্চদশবিলাসে]

বিধয়ঃ—১। কার্ত্তিকস্য ব্রতানীহ তস্যাং কুর্যাদতস্ত্রিতঃ।

নিত্যং জাগরণায়ান্তে যামে রাত্রৌ সমুখিতঃ।

শুচিভূত্বা প্রবোধাথ স্তোত্রৈর্নীরাজয়েৎ প্রভুম্ ॥ ৮১ ॥

১। নিত্য কার্ত্তিকমাসের রাত্রির শেষপ্রহরে জাগরণের নিমিত্ত গাত্রোথান করিয়া শুচিপূর্বক স্তোত্র-পাঠ সহকারে প্রভুকে জাগরিত করত নীরাজন অর্থাৎ আরাত্রিক করিবে ॥ ৮১ ॥

২। নিশম্য বৈষবান্ ধম্মান্ বৈষবৈঃ সহ হর্ষিতঃ।

কৃত্বা গীতাদিকং প্রাতর্দেবং নীরাজয়েৎ প্রভুম্ ॥ ৮২ ॥

২। বৈষ্ণবধর্ম-সকল শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবগণসহ সহর্ষে গীতাাদি করিয়া প্রাতঃকালে প্রভুকে নীরাজন করিবে।। ৮২।।

৩। নিত্যং বৈষ্ণবসঙ্গত্যা সেবেত ভগবৎকথাম্।

সর্পিষাহর্নিশং দীপং তিলতৈলেন চার্চয়েৎ।

বিশেষতশ্চ নৈবেদ্যান্যর্পয়েদাচরেত্তথা।

প্রণামাংশ্চ যথাশক্ত্যা একভক্ত্যাদিকং ব্রতম্।। ৮৭।।

৩। কার্তিকমাসে নিত্য বৈষ্ণবদিগের সহিত ভগবৎকথা সেবন এবং দিবাত্রা ঘৃত বা তিল তৈলদ্বারা প্রদীপ দিয়া অর্চনা করিবে। অন্যান্য মাস অপেক্ষা কার্তিকমাসে বিশেষ করিয়া নৈবেদ্যাদি অর্পণ ও বিশেষরূপে প্রণামাদি করিয়া যথাশক্তি একভক্তাদি অর্থাৎ একবার মাত্র ভোজনরূপ ব্রত ধারণ করিবে।। ৮৭।।

৪। দামোদরাস্তিকম্ নাম স্তোত্রং দামোদরার্চনম্।

নিত্যং দামোদরাকর্ষি পঠেৎ সত্যব্রতোদিতম্।। ৯৬।

৪। কার্তিকমাসে দামোদরের অর্চনপূর্বক সত্যব্রত-নামক মুনিকথিত 'দামোদরাস্তিক' নামক স্তোত্র নিত্য পাঠ করিবে, তাহাতেই দামোদর বশীভূত হইয়া থাকেন।। ৯৬।।

নিষেধঃ— ৫। কার্তিকে তু বিশেষেণ রাজমাষাংশ্চ ভক্ষয়ন্।

নিষ্পাবান্ মুনিশাদ্দূল যাবদাহূতনারকী।।

৫। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি বিশেষতঃ কার্তিকমাসে রাজমাস (বরবটী কলাই) এবং নিষ্পাব (শিম্বী) ভোজন করে, সে মহাপ্রলয় পর্যন্ত নারকী হইবে।।

৬। কলিঙ্গানি পটোলানি বৃন্তাকং সন্ধিতানি চ।

ন ত্যজেৎ কার্তিকে মাসি যাবদাহূতনারকী।। ৯০।।

৬। যে মনুষ্য কার্তিকমাসে কলিঙ্গ (কলমীর শাক), পটোল, বৃন্তাক (বাত্তাকী) এবং সন্ধিত (আসবাদি) পরিভ্যাগ না করে, সে মহাপ্রলয় পর্যন্ত নারকী হয়।। ৯০।।

৭। তৈলাভ্যঙ্গং তথা শয্যাং পরান্নং কাংস্যভোজনম্।

কার্তিকে বর্জয়েদ্যস্ত পরিপূর্ণব্রতী ভবেৎ।।

৭। যে ব্যক্তি কার্তিকমাসে তৈলমর্দন, শয্যা, পরান্ন এবং কাংস্যপাত্রে ভোজন বর্জন করেন, তাহার ব্রত পরিপূর্ণ হয়।।

৮। কার্তিকে বর্জয়েত্তৈলং কার্তিকে বর্জয়েন্মধু।

কার্তিকে বর্জয়েৎ কাংস্যং কার্তিকে শুক্ল-সন্ধিতম্।।

ন মাংস্যং ভক্ষয়েন্মাংসং ন কৌর্ম্মং নান্যদেব হি।

চাণালং স ভবেৎ সুব্রু কার্তিকে মাংসভক্ষণাৎ।। ৯৩।।

৮। হে সুন্দরি! কার্তিকমাসে তৈল, মধু, কাংস্য, শুক্ল (কাঞ্জিকাদি পর্যুষিত অল্পদ্রব্য), সন্ধিত (আসবাদি মদ্যবিশেষ), মংস্য, কূর্ম্ম, মাংস এবং অন্য (আমিষতুল্য) দ্রব্য ভোজন করিবে না। যে ব্যক্তি কার্তিকমাসে মাংস ভোজন করে, সে চণাল হয়।। ৯৩।।

## প্রশ্নোত্তর

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২৪৭ পৃষ্ঠার পর]

### জীবে দয়া

১। সর্বশ্রেষ্ঠ পরোপকার কি?

“সর্বভূতে দয়া তিন প্রকার। জীবের স্থূল দেহ-সম্বন্ধে যে দয়া, তাহা সংকর্ম-মধ্যে গণিত। ক্ষুধিত জীবকে ভোজন-দান, পীড়িত জীবকে ঔষধ-দান, তৃষিত জীবকে জল-দান, শীত-পীড়িত জীবকে আচ্ছাদন-দান—এই সকলই দেহ-সম্বন্ধিনী দয়া হইতে নিঃসৃত। বিদ্যা-দানই জীবের মনঃসম্বন্ধিনী দয়া হইতে নিঃসৃত। কিন্তু জীবের আত্মসম্বন্ধিনী দয়াই সর্বোপরি। সেই দয়া-প্রবৃত্তি হইতেই জীবগণকে কৃষ্ণভক্তি দিয়া সংসার-ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবার যত্ন হয়।”

—পরহিংসা ও দয়া, সং তোঃ ৯।৯

২। ‘জীবে দয়া’ বলিতে কোন্ প্রকার জীবের প্রতি দয়া বুঝায়?

“জীবে দয়া’ এই কথাটি কেবল বদ্ধজীব সম্বন্ধে—ইহা বুঝিতে হইবে। আবার বদ্ধ জীবের মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণ-সামুখ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি দয়া নয়, মৈত্রী ব্যবহার করার উপদেশ আছে। অতএব বদ্ধজীবগণের মধ্যে যাঁহারা বালিশ অর্থাৎ মুঢ়, তাঁহাদের প্রতিই দয়া করিতে হয়।”

—জীবে দয়া, সং তোঃ ৪।৮

৩। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও শুদ্ধভক্তগণের পরোপকার-বৃত্তির মধ্যে তারতম্য কি?

“কর্ম্মকাণ্ডী ব্যক্তিগণ জীবের নিত্যমঙ্গল ততদূর অন্বেষণ করেন না, কেবল দেহ-সম্বন্ধিনী ও মনঃসম্বন্ধিনী দয়াকেই অতিশয় শুভ বলিয়া মনে করেন। জ্ঞানকাণ্ডী ব্যক্তিগণ মনঃসম্বন্ধিনী দয়াকেই অধিক আদর করেন। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ ভক্তিপ্রচারদ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল সাধনের যত্ন করেন।”

—পরহিংসা ও দয়া, সং তোঃ ৯।৯

৪। বৈষ্ণবের পক্ষে জীবে দয়ার একমাত্র পরিচয় কি?

“জীবের ভাগ্যোদয় না হইলে কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির উদয় হয় না। তৎকার্য্যে জীবকে সাহায্য করাই বৈষ্ণবের হৃদয়গত জীবে দয়ার একমাত্র পরিচয়।”

—জীবে দয়া, সং তোঃ ৪।৮

৫। বৈষ্ণব জীবের প্রতি কিরূপ দয়া করেন?

“জীবকে কৃষ্ণেগ্নুখ করাই বৈষ্ণবের প্রধান কার্য্য। যে-স্থলে স্থূল শরীরের রোগ নিবৃত্তি বা ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, সে-স্থলে বৈষ্ণবতা নাই; যেহেতু তদ্বারা কেবল ক্ষণিক উপকার হয়, কিন্তু নিত্য উপকার হয় না। তবে যেখানে ঐ সকল কার্য্যের দ্বারা কৃষ্ণেগ্নুখী প্রবৃত্তির সহায়তা করা যাইতে পারে, সেখানে তত্তৎকার্য্যেও বৈষ্ণবের স্বত্ত প্রবৃত্তি হয়।”

—জীবে দয়া, সং তোঃ ৪।৮

৬। আদর্শ আচার ও প্রচার কিরূপ হওয়া উচিত ?

“তোমাদের সাধু-চরিত্র অপরকে শিক্ষা দাও। তুমি ভাল কার্য্য করিতেছ, উত্তম। কিন্তু জগজ্জীব তোমার ভ্রাতৃগণ, তাহারা অসং কার্য্যের দ্বারা পতিত হইতেছে; তোমার কর্তব্য এই যে, তোমার সাধু চরিত্র দেখাইয়া তাহাদিগকে তোমার চরিত্র অনুকরণ করাও।”

—সাধুশিক্ষা, সং তোঃ ৫।১০

৭। কিরূপ বিষয়িগণ বৈষ্ণব-কৃপা-পাত্র?

“নিষ্কপট বিষয়িজনের প্রতি কৃপা করা উচিত।”

—ভক্ত্যানুকূল্যবিচার, ভাঃ মঃ ১৫।১২৬

৮। বৈষ্ণব কিরূপ প্রচার-ফলে সুখী হন?

“দ্বারে দ্বারে এইরূপ শিক্ষা দিতে দিতে যদি একটি জীবও এক বৎসরে উদ্ধার পাইয়া কৃষ্ণভজন করে, তবে বৈষ্ণব নিজ-কার্য্যে বিশেষ সুখ লাভ করেন।”

—জীবে দয়া, সং ত্রেঃ ৪।৮

৯। জীব-দয়া ও কৃষ্ণভক্তির সত্তার কোন ভেদ আছে কি?

“দয়া কখনই রাগ হইতে ভিন্ন বৃত্তি হইতে পারে না—জীবে-দয়া ও কৃষ্ণভক্তির সত্তার ভিন্নতা নাই।”

—কৃঃ সং ৮।১৮

১০। বৈষ্ণবের দয়া কিরূপ? উহা সর্বোত্তম কেন?

“বৈকুণ্ঠাবস্থায় কেবল মৈত্রী এবং বন্ধাবস্থায় পাত্র-বিশেষে মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষারূপ ভাবসকল নিত্যস্বধর্ম্মগত দয়ার ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় মাত্র। সাংসারিক জীব-সম্বন্ধে দয়াই অত্যন্ত কুণ্ঠিত অবস্থায় জীবের স্বদেহনিষ্ঠ, একটু প্রস্ফুটিত হইলে স্বগৃহবাসি- জীবনিষ্ঠ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে সর্বগণনিষ্ঠ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে স্বদেশবাসি-স্বজাতিনিষ্ঠ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে স্বদেশবাসি-সর্বজননিষ্ঠ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে সর্বমানবনিষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে সর্বজীবনিষ্ঠ আর্দ্রভাব বিশেষরূপে



## শ্রীরূপ-শিক্ষা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪৮ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীরাধাকুণ্ড রাধাভাবময় কুণ্ড। রাধার পূর্ণবিকাশ এই কুণ্ডে। সেই ভাবে বিভাবিত ব্যক্তি মধুর রতি লাভ করতে পারেন। সুতরাং কুণ্ডকে একটি জলাশয়মাত্র জ্ঞান করা ভূতপূজকের বিচারের মত। তারা খামকে চিঠি মনে করে। লেফাফা ও তদন্তভুক্ত ব্যাপারকে এক মনে করা ভুল। শিশির মধ্যে ওষুধ থাকলে শিশিটা ওষুধ নয়। কর্মের আচরণ, জ্ঞানের আবরণ-সকল কোন সুবিধা দেয় না ব'লে শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন—  
“জ্ঞানকর্মান্যদ্যন্যবৃত্তম্”। যা আজ পর্য্যন্ত কোন প্রচারক-সম্প্রদায় দিতে পারে নাই। জীবের ভাগবত শ্রবণীয় ও ভক্তিপথ একমাত্র আশ্রয়ণীয়।

“রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহুঁদিনী শক্তিরস্মা-  
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতে। তে।  
চৈতন্যাত্ম্যং প্রকটমধুনা তদ্ব্যবধৈক্যমাণ্ডং  
রাধাভাবদ্যুতি-স্বলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥”

সর্বোত্তম আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহ—শ্রীমতী বার্ষভানবী। যখন সেই রাধার ভাব পূর্ণভাবে গৌরসুন্দরে প্রদীপ্ত হ'য়েছিল, তখন তাঁ'কে শ্যামসুন্দরসহ মিলিত বার্ষভানবী ছাড়া আর কিছু বলা যেতে পারে না। রায় রামানন্দ গৌরসুন্দরকে কাঞ্চন-পঞ্চালিকায় ঢাকা শ্যামসুন্দর দেখেছিলেন। এখানে যে বিগ্রহ দেখছেন—রাধার শুভ্রমূর্তি আর শ্যামসুন্দরের কৃষ্ণবর্ণ দেখছেন, এরূপ দেখবেন না, এঁদের ভোগ্য পদার্থ না দেখে সেব্য পদার্থ দেখলে হৃদয়ের মলিনতা দূর হ'লে ভগবান্ দেখা দেন।

নায়মায়া প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণতে তেন লভ্যন্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণতে তন্মুং স্বাম্॥

চৈতন্যময় অবস্থা লাভ হ'লে তাঁ'র দর্শন ঘটে। বিশ্বভোগময়-দর্শনে এ জিনিষটাও ঐরূপ বাহ্য পদার্থ মনে হ'বে। আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ মনে করলে নারকী।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।

যন্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন হি কহিচিচ্ছেনেহভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

বহির্জগতের কথায় ব্যস্ত থেকে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারলে অমঙ্গল ঘটবে। তাৎকালিক প্রতীতি অনভিজ্ঞের ছবিটা সেখানে পড়বে। শব্দীর সঙ্গে শব্দের ভেদ ক'রে অন্য বিচারে ধাবিত করবে। রাধাকুণ্ডকে জলাশয় মাত্র জ্ঞান হ'বে। মাটির বিচার আমাদিগকে বিপথগামী করবে। ভগবানকে বাহ্য পদার্থবিশেষ মনে করলে যমদণ্ড হ'তে হ'বে। কর্মকাণ্ডের আবাহন-ফলে ভাগবতের শ্লোক বুঝতে পারবে না।

প্রায়েন বেদ তদিদং ন মহাজনোহয়ং

দেব্যা বিমোহিতমতিবর্ত মায়য়ালম্।

ত্রয়াং জড়ীকৃতমতিমধুপুস্পিতায়াং

বৈতানিকে মহতি কস্মিণি যুজ্যমানঃ॥

মথুরা জ্ঞানভূমিকা—যেখানে ভগবদ্বিশয়ে মূৰ্ত্তা অপসারিত হ'য়েছে, সেখানে অজের জন্ম।

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাৎ

বন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাৎ তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।

রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতপ্লাবনাৎ

কুর্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥

এমন কেন্ মৃত আছে যে নিজের অস্মিতাকে রাধাকুণ্ডে স্থাপন করে না। রাধিকার ভাব যেখানে পূর্ণমাত্রায়, তা'তে যাঁরা স্নাত, কারুণ্যমৃত তারুণ্যমৃত, লাবণ্যমৃত ভাবে যাঁরা বিভাবিত তাঁরা কৰ্ম্মী জ্ঞানীর দৃষ্ট হ'তে পারেন না। কৃতী পুরুষ এমন বোকা কে আছে যে এগুলির পর পর শ্রেষ্ঠতা বুঝবে না?

আমাদের কম বুদ্ধি থাকলে বাস্তব-বস্তুর সংবাদ আমাদের নিকট আসবে না। কৰ্ম্ম-জ্ঞানাদিদ্বারা ঐগুলি খুঁজলে কৃষ্ণ পাই না। কৃষ্ণভক্তিকে ঢাকা দিয়ে দেয়। সকল কৰ্ম্মাদির আবরণ উন্মুক্ত করলে কৃষ্ণকে দেখা যায়।

ভগবানকে ক্লীব মনে করা পাষণ্ডতা। চৈতন্যদেব মনুষ্যের এই মূঢ়তাকে অপসারিত করার উপদেশ দিয়াছেন—“ভক্তিদ্বারা কৃষ্ণসেবা কর।” আবরণদ্বারা হয় না। এজন্য “অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্” শ্লোকের অবতারণা।

কোটি জ্ঞানীমধ্যে হয় একজন মুক্ত।

কোটি মুক্তমধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।

ভক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥

যাঁরা কৰ্ম্ম ভোগ করেন, তাঁরা ভোগী। ঐহিক ও আমুখিক ভোগদ্বারা ভগবানকে বঞ্চনা ক'রে নরকগমন করতে হয়। নিজেদ্রিয়-তর্পণকারীর—কৰ্ম্মফলবাদীর ইহ ও পরলোকে স্বর্গসুখ ও নরকাদি দুঃখ। ‘ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাৎ কৰ্ম্মসঙ্গিণাম্।’ ফলকামী ব্যক্তি মরণের পরেও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিতোষণে ব্যস্ত। ভক্তিবিরোধী ব্যক্তি ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের প্রতি আক্রমণ করে। তাদের দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে শ্রীচৈতন্যদেব এসকল কথা শ্রীরূপকে বলেছেন।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরহিষে নমঃ॥

নিজ নাম-রূপ-গুণ-লীলা-প্রদর্শনকারী কৃষ্ণকে নমস্কার। তুমি কৃষ্ণ ব'লে নিজের হৃদয়কে রাধার ভাবে ঢেকেছ। ভোগীর ভাব ছেড়ে উৎকৃষ্ট সেবকের ভাবে ঢেকেছ।



আট প্রকার নায়িকার চিন্তাস্রোতে এক নায়কে তুষ্টিসাধন কুণ্ডের ভাব। ভাবের পূর্ণ সমষ্টি বার্ষভানবী। খণ্ড প্রতীতিতে যুথেশ্বরীগণ, ভাবের দ্বারা মধুর রতিতে সেই বস্তুর পূজা করতে বসেছেন। এমন বোকা কে আছে যে, কুণ্ডতীরে সর্বসময়ই কথ্য না জেনে পাল্য দাসী বিচার না করে কর্মী-জ্ঞানী হয়ে মহাপণ্ডিত হয়ে বসে থাকে।

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসনলব্ধীক্ষাঃ।

হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন।।

ব্রজবাসীর স্বরূপদর্শনের অভাবযুক্ত ব্রজবাসী (?) দক্ষিণমার্গে লুপ্ত। কৃষ্ণভক্ত পাপ-পুণ্য হ'তে পৃথক্।

যদা পশ্যাঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মায়োনিম্।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।।

তঁারা কামনা-রহিত সুতরাং পুণ্যপাপ প্রবৃত্তি তাঁদের নাই। দিব্যজ্ঞান লাভ হ'লে তাহা দূর হয়। মকাদিম ও কমিনার বিচার এক নয়। অল্পবুঝ সমাজ কামনাচালিত হয়ে কর্মী বা জ্ঞানী হয়। ভক্তের প্রকারভেদ আছে। বার্ষভানবী শ্রেষ্ঠ ভক্ত। যাঁর চরণরেণু উদ্ধবেরও প্রার্থনীয়।

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং

বৃন্দাবনে কিমপি গুপ্তলতৌষধীনাম্।

যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা

ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।।

শ্রুতি বলতে কেবল সংহিতাংশ বা উপনিষৎ পাঠ করে Pantheistic বিচার আনলে অমঙ্গল প্রসব করে বিশুদ্ধ বিচার চিন্তাত্রবাদে নাই। আবরণ-রহিত হয়ে কৃষ্ণনুশীলন করার নাম ভক্তি। চার প্রকার ভজনপ্রণালীতে যাঁরা ভ্রমণকারী, যাঁরা তারতম্য বিচার করেন, তাঁরা মধুর রতির সর্বোত্তমতা বুঝতে পারেন।

“অনয়া মীয়তে”—মেপে নেওয়া বিচার ত্যাগ করে “অনয়া রাধিতো নুনং” বিচার করে বার্ষভানবীর আশ্রয়-গ্রহণ করলে সকলের মঙ্গল হ'বে। কতক লোক তাঁকে চন্দ্রা বিচার করে পরাসৌলিতে রাখেন। কিন্তু গোবিন্দলীলামৃত যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা জানেন যে, কৃষ্ণবস্ত্র চন্দ্রা শৈব্যাকে বঞ্চনা করে রাধাসহ লীলা করেছেন। (ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ

## ভূত-প্রেতাদির অস্তিত্ব কি কাল্পনিক?

সর্বযুগে ও সর্বকালে ভৌতিক কাহিনী তথা ভূত-প্রেত-দৈত-দানব প্রভৃতি মানুষের নিকট চিরন্তন আকর্ষণের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিভিন্ন ধরণের রহস্যময় ভৌতিক কাহিনী মানুষকে নানাভাবে উত্তেজিত করিয়াছেন এবং বর্তমানেও করিতেছে। ভূতের অস্তিত্ব, আকার, কার্যাবলী, অভিপ্রায় সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ মনে করেন,—“ভূতের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য এবং ভূত-তত্ত্ব গভীরভাবে আলোচ্য।” অপরপক্ষে অনেকের মতে ভূতপ্রেতের কাহিনী শিশুসাহিত্যের উপজীব্য। আজকের এই বিংশ শতাব্দীর কৰ্ম্মব্যস্ত নাগরিক জীবনে মানুষই ভৌতিক গল্পের সবচেয়ে বড় খরিদদার। আজকের বিজ্ঞানমনস্কতার যুগেও জোরালো কোন রিপূর তাড়নীয় মানুষ ভূতের গল্প গোগ্রাসে গিলিয়া থাকে। বিশ্ববাসী ও সন্দেহবাদী সকলে ভূত-প্রেত, অপছায়া, পিশাচ, দানো প্রভৃতি supernatural বস্তুতে আকৃষ্ট হইয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ ভূতশিকারী (ghost hunter) John Radclif তাঁহার “Friends, Ghosts and Spirits” গ্রন্থে (১৮৫৪) লিখিয়াছেন,—“সব দেশ সব যুগে মানুষ supernatural ভূত-প্রেতাদির প্রতি সম্পূর্ণরূপে আস্থা রাখিয়াছেন।” এমন গ্রাম খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না যেখানে ভূতের গল্প লইয়া কাহিনী চালু নাই। এমন পরিবার নাই যেখানে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের মুখের শোনা ভৌতিক কাহিনী শিশুদের (পিতামাতাদেরও) আনন্দ ও ভয় দেয় নাই বা দিচ্ছে না। একটা কথা ঠিক যুগে যুগে ভগবান্ ও ভূত এই ‘ভ’কারান্ত দুইটা মানুষের জীবনে জড়াইয়া পড়িয়াছে। ইংল্যান্ডের সব থেকে সেরা বৈঠকী আসরের নায়ক Jonshonএর ভাষায় বলিতে হয়,—“ভগবান্ বিশ্বাস করেন অনেকেই, কিন্তু ভূতে বিশ্বাস করে প্রায় সকলেই। All arguments are against it but all belief is for it.”। গত ষাট বৎসর ধরিয়া প্রেততত্ত্ব বেশ অগ্রগতির পথে। তাই মানুষের জীবনে আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে ভয়, ভগবান্ ও ভূত এই শব্দগুলি যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে। আমরা বিশ্বাস করিবা না করি ভূত-প্রেতাদির অস্তিত্ব কিন্তু চিরকালই বিদ্যমান।

ভূত ও প্রেতের ইংরেজী শব্দ ‘Ghost’। ভূত, প্রেত বা Ghost কথাটির আভিধানিক অর্থ মৃত ব্যক্তির দেহহীন spirit বা আত্মার অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির লোকসমক্ষে প্রকাশকে বুঝায়। Ghost শব্দটি প্রাচীন ইংরেজী saxon gaste অথবা guest হইতে আসিয়াছে। উত্তর ইংল্যান্ডে guest কথাটির অপর এক অর্থ apparition, অপছায়া অর্থাৎ ভূত। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট Peter Underwood তাঁহার ‘A Gazetteer of British Ghosts’ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—There are most ghosts seen, reported and accepted in the British isles than anywhere else on earth অর্থাৎ

ব্রিটেন হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ ভূতপ্রেতের রাজ্য।” কৌতূহলী স্বভাব আর নতুন কিছু ঘটনার অলৌকিক ব্যাখ্যা গ্রহণে ব্রিটেনবাসীদের তীব্র আগ্রহ, সবকিছু মিলাইয়া ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস এখানে স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। লণ্ডনের Kensinton Society এখনও ভূততত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া চলিতেছেন। ভৌতিক তত্ত্ব লইয়া তাহারা হাজার দশেক ফাইল রাখিয়াছেন। অনেক ঘটনা আলোর খেলা বা পরিষ্কার জুয়োচুরি বলিয়া তাহারা প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু শুধু ব্রিটেনেই প্রায় সাত শত ঘটনা কেন হইয়াছে তাহার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখনও পর্য্যন্ত তাহারা দিতে সক্ষম হন নাই।

বাস্তব সত্যের প্রকাশক পুরাণাদি ধর্মশাস্ত্রসমূহ ভূত-প্রেতাদির অস্তিত্ব সর্বতোভাবে স্বীকার করিয়াছেন এবং প্রেতাদি জন্ম যে চৌরাশী লক্ষ জন্মের অন্যতম এক জন্ম তাহা জানাইয়া আমাদের কাল্পনিক চিন্তাস্রোতকে স্তব্ধ করিয়াছেন। ধর্মশাস্ত্রসমূহ গয়ায় পিণ্ডদান বা শ্রাদ্ধ তথা ভাগবত-শ্রবণের মাধ্যমে প্রেতমুক্তির কথা আমাদের বিশেষভাবে জানাইয়াছেন। ভূতের অস্তিত্ব আছে বলিয়াই জগতে ‘ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ’, ‘ভূতের বেগার খাটা’, ‘দশচক্রে ভগবান্ ভূত’, ‘ভূত দিয়ে ভূত ছাড়ানো’, ‘ভূতের আবার গঙ্গাস্নান’, ‘ভূতের বোঝা বহা’ কথাগুলি বহুল পরিমাণে প্রচলিত রহিয়াছে। যুগ যুগ ধরে সংখ্যাতিত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সাক্ষ্য ও অভিমত এতই প্রবল যে ভৌতিক সম্ভাকে জাল বা অলীক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। ‘Law of Sykik Phenomeno’ গ্রন্থের লেখক Dr. Tomas J. Hadson বলিয়াছেন,—“আজকের দিনেও যে প্রেততত্ত্বকে স্পীকার করেন না, সে ‘নাস্তিক’ বলে অভিহিত হইবারও যোগ্য নয়, তাহাকে শুধু অজ্ঞ বলাই চলে।” বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক Alfred R. Welsh বলিয়াছেন,—“প্রেততত্ত্বকে প্রমাণ করিবার জন্য অধিক আর কোনই প্রমাণের প্রয়োজন নাই। কেন না বিজ্ঞান-সমর্থিত অপর আর কোনও সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে ইহার চেয়ে সুদৃঢ় প্রমাণ নাই। ‘পাশ্চাত্ত্যের প্রখ্যাত ভূততত্ত্ববিদ Tirel এর উক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয়, “ভূতের আকর্ষণ এত দুর্নিবার কেন? কারণ মৃত্যুর পর যে অজানা জীবন তাহার জন্য মানুষের মনে যে স্বাভাবিক কৌতূহল আছে ভূতেরা তাহার অবগুষ্ঠন উন্মোচন করিয়া দেয়।” Kemili Flemeryon, W. T. Stid, Prof. Hysolp ও এমন আরও অনেকে ঠিক একইভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, অশরীরী আত্মা আমাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করিতে পারে। বিশ্ব সাহিত্যের Bram Stoker-এর ‘The burial of rats’, এর ‘Dracula’, ‘The secret of growing gold’, Algernon Blackwood এর ‘The empty house’, Ronald Seth-এর ‘The Ghost in two halves’, Jan Neruda-এর ‘The Vampire’, Pedro Antonio De Alarcon-এর ‘The Tall Woman’, R. Chelwynd Hayes-এর ‘She walks on dry land’, Helen Piddock-এর ‘The Uglyman’, Arthur Conan Doyle-এর ‘The brown hand’, Tom Kristenson-এর

'The vanished faces', Algernon Blackwood-এর 'The Woman's Ghost Stories', Alphonse Daudel-এর 'South Window', H. R. Wakefield-এর 'Ghost Hunt' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে পাঠক মাত্রেরই গা হুম্‌হুম করিবে।

ভারতবর্ষের বেতালপঞ্চবিংশতির নানা কাহিনীতে ও পটভূমিকায় অসামান্য ভীতি-বিহ্বলতা আভাসিত হইয়াছে। চৈনিক, কোরীয় ও তিব্বতীয় সাহিত্যের বিশেষ করে পালি ভাষায় ভৌতিক কাহিনীর জমজমাট আসর। উত্তরে হিমেল হাওয়ায় ভাসিয়া থাকা নরওয়ে, সুইডেন ও আইসল্যান্ডের সাহিত্যেও ভৌতিক গল্পের অফুরন্ত ভাণ্ডার। জার্মান সাহিত্যিক সিলাররের লেখাতেও ভৌতিক গল্পের সার্থক বিন্যাস দেখা যায়। ফরাসী সাহিত্য বালজাক ও মৌপাসার সার্থক ভৌতিক দৃশ্যপট দেখা যায়। ইলিয়ড ও ওডিসিতে ভৌতিক ঘটনার প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। Tibetology-এর সাথে পালি সাহিত্যের যে ওতঃপ্রোত সম্পর্ক তাহাতে ভৌতিক ঘটনা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করিয়াছে। সেক্সপীয়রের নাটকে, বিশেষ করে হ্যামলেটের ভৌতিক দৃশ্যপট ও ম্যাকবেথে ডাইনীদের আবির্ভাব ও সিজারের কালফোর্নিয়ার দুঃস্বপ্ন এই ভৌতিক মনস্কতার সার্থক প্রয়াস ইঙ্গিত করে।

সিজারের অপমৃত্যুর কথা একটি ভূত আসিয়া তাঁহার “স্ট্রী কালফোর্নিয়াকে বলিয়া যায় এই তথ্য ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। হত্যাকারী ব্রুটাস্-এর সামনে সিজারের-ভূত উপস্থিত হইয়াছিল—এই কাহিনীও সকলের জানা। হতভাগ্য ব্রুটাসের সামনে ভূত আবার উপস্থিত হইয়াছিল গ্রীসের রণক্ষেত্রে তাঁহার মৃত্যু অদূরে এই কথা জানাইবার জন্য। অপচ্যায়ার বিরাট দেহ, রক্তহীন মুখমণ্ডল। স্তম্ভিত, ভীত ব্রুটাস্ জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কে তুমি? মানুষ না দেবতা? কি চাও?” প্রেত উত্তর দিল,—“আমি সিজারের দুষ্ট প্রেত। রণভূমিতে আবার দেখা হইবে।” ব্রুটাস্-এর পরাজয় ও মৃত্যুর পূর্ববর্তে সেই দুষ্ট প্রেত সত্যি সত্যি রণাঙ্গনে আসিয়াছিল, ইতিহাসের এই কাহিনী সেক্সপীয়র তাঁহার নাটকে কাজে লাগাইয়াছিলেন।

ভূত-প্রেতকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম শ্রেণীর ভূত অত্যন্ত নিরীহ, তাহারা পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখনও কখনও মানুষের নিকট বিশেষ বার্তা বা সাবধান-বাণী পৌঁছাইয়া দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূতেরা ক্ষতিকারক, দুষ্টপ্রকৃতি এবং গোলযোগ সৃষ্টিকারী (Poltergeist)। ইহারা জিনিসপত্র আসবাব ইত্যাদি ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া মানুষকে অতিষ্ঠ করে। তৃতীয় দলের ভূতদের বলা হয় ‘fetch’ অর্থাৎ জীবিত বা মুমূর্ষু ব্যক্তির দ্বিতীয় মূর্তি। ইহারা জীবজন্তুর ছায়ামূর্তি, কখনও বা প্রাণহীন বস্তুর ছায়ামূর্তি। ইহারা ঘুরিয়া বেড়ায় নিজ্জর্ন, আবজ্জর্নাময়, অব্যবহার্য স্থানে। অনেকে হয়ত ভূত দেখেন নাই। কিন্তু যাহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহাদের ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছেন। প্রাচীন ব্যাবিলনবাসীরা মার্জি ফলকে, রোমানরা চামড়ার কাগজে ছবি আঁকিয়া, গ্রীসের লোকেরা কাঠের উপর খোদাই করিয়া, সপ্তদশ অষ্টাদশ

শতাব্দীতে অপূর্ব চিত্রাঙ্কনে, ভিক্টোরিয়ান সময়ে বক্স-ক্যামেরার সাহায্যে এবং বর্তমানে দ্রুতগতিসম্পন্ন পোলারয়েড ছবির সহায়তায় ভূতদের যুগ যুগ ধরিয়া ইতিহাসে বিধৃত করিয়া রাখা হইয়াছে।

মিশর, আরব, আমেরিকা, গ্রীস, ইটালি, আসিরিয়ান, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের লোকেরা ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। আসিরিয়ানবাসীরা তিন জাতির প্রেতাচার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত। ‘উতুকু’ ভূত শ্মশানে, কবরখানায়, জনশূন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং তাহাদের দর্শনেই মানুষ রোগাক্রান্ত হইত। ‘আলু’ (Alu) ভূতেরা কবন্ধ, কখনও বা মস্তক, কণ, হস্তপদহীন হইয়া ভয়ঙ্কর মূর্তিতে দেখা দিয়া মানুষকে জড়াইয়া ধরিত। ঘরে ঢুকিয়া পর্যন্ত ইহারা মানুষকে ভয় দেখাইত। ‘একিম্মু’ (ekimmu) অত্যন্ত ঘরোয়া ভূত। যে মৃতদেহ কবরস্থ করা হয় নাই তাহারই প্রেত হইতেছে ‘একিম্মু’। ঘরে প্রবেশপূর্বক এই ভূতেরা পরিবারের কাহারও আসন্ন মৃত্যুর কথা ঘোষণা করিত, কখনও বা চীৎকার চৈচামেচি গোলমাল করিত। মৃত ব্যক্তির দেহ যথোচিত নিয়মে কবরস্থ না করিলে মানুষ ভূত হইয়া দেখা দিবেই, অ্যাসিরিয়ানদের এই বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বের আসিরিয়ানদের এক পুস্তকে লিখিত আছে,—

He, the hair of whose body an evil

Fiend hath set on end.

আসিরিয়ানবাসীরা পূজার্চা প্রার্থনার দ্বারা ভূত তাড়াইত। ব্যাবিলনবাসীরা বাতি জ্বলাইয়া ধূপ-ধূনো পুড়াইয়া ভূত তাড়াইত।

উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা বহুকাল পূর্ব হইতে প্রেতের পূজা করিয়া আসিতেছে। মৃত মানুষের সামনে ইহারা যে ভূত-নৃত্য (ghost dance) করে তাহা অতি বর্ণময় ও উদ্দীপক। আমেরিকার দুষ্ট ভূত-প্রেতরা খুব চৈচামেচি করে। আমেরিকানরা বিশ্বাস করে যে মৃত ব্যক্তির অপছায়ারা ঝিঝি পোকের মত গান করে। আমেরিকার প্রাক্তন President Harry Trooman ১৯৪৫ সালে তাহার ডায়েরীতে লিখিয়াছিলেন,—“I think it must have been Lincon's ghost walking in the wall.” ভূত ছাড়াইবার জন্য বেশ কয়েকশত ওঝাকে ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, ইহা ১৯৭৮ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

আরবীয়রাও নানান জাতীয় ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করিতেন এবং বর্তমানেও করেন। কোন মানুষকে হত্যা করিলে তাহার রক্ত যেখানে পড়িত সেখানকার ভূমি হইতে আফ্রিত বা ভূত আবির্ভূত হইত। তবে যদি একটা নতুন পেরেক সেখানে পুতিয়া দেওয়া হইত তবে ভূত উঠিতে পারিত না। ‘Nailing down the ghost’ কথাটি এই বিশ্বাস হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা ছাড়া ভ্যামপায়ার (Vampire)-এর কাহিনীর উৎপত্তি এই একই উৎস হইতে। Vampire এক জাতীয় রক্তপিপাসু প্রেত—যাহারা নিদ্রিত মানুষের রক্ত পান করে।

ভূতপ্রেতের প্রচুর কাহিনী ও বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় গ্রীক ও রোমানদের পুরানো কাহিনীতে। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন মৃত ব্যক্তির manes পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়ায়, দুষ্ট লোককে ভয় দেখায়। দেবতাজ্ঞানে তাহারা ভূত-পূজা করিতেন। রোমানদের কবরের উপর রক্ষিত প্রস্তরে লেখা থাকিত D. M. অথবা D. M. S. (Dis Manibus অথবা Dis Manibus Sacrum) অর্থাৎ পবিত্র ভূত-দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। প্রাচীন মিশরীয়দের ভূতপ্রেত লইয়া অনেক কারবার ছিল। ভূতদের সন্তুষ্ট না করিলে তাহারা সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইত মানুষের ক্ষতি করিবার মতলবে। নানাবিধ পূজা-অর্চাদ্বারা মিশরীয়েরা ভূতপ্রেতকে তুষ্ট রাখিত।

চীনদেশে ভূতের উৎপাত ছিল ও আছে। বিশেষ করে যাহাদের হত্যা করা হইত তাহাদের প্রেতাছারা ভয়ঙ্কর মূর্তিতে দেখা দিত। চীনে ভূত প্রথমে নিরবয়ব, ক্রমে মাথা, পা, পরে সম্পূর্ণ দেহ লইয়া প্রকাশ পাইত। ইহাদের মুখে থুতনি নাই। জীবিত অবস্থায় ব্যবহৃত পোশাকাদি পরিয়া ভূতের আবির্ভাব হইত। তাহাদের দেহ ঘিরিয়া নীল রঙের আলো জ্বলজ্বল করিত। ষাট রকমের 'শিন' অর্থাৎ দুষ্ট ভূতের অস্তিত্বে চীনারা বিশ্বাস করেন। ভূত তাড়াইবার জন্য ঘরের দেওয়ালে মাদুলী টাঙ্গাইয়া রাখা হয়। ভূত-প্রেতকে খুশী করিবার জন্য চীনারা এক অদ্ভুত উৎসব পালন করেন। পিঠে তৈয়ারী করিয়া তাহার উপর লিখিয়া রাখেন ভূতের জন্য নিমন্ত্রণ-লিপি (For honourable homeless ghosts)।

জাপান-এর ইতিহাসে নানা জাতীয় ভূত-পেত্লীর উল্লেখ বর্তমান। এই দেশে আবার ভূতের চেয়ে পেত্লীর সংখ্যা বেশী। শুভ্র আবরণে আবৃত, আলুলায়িত কুন্তলে মুখমণ্ডল ঢাকা, পেত্লীরা যত্রতত্র স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করে। আর দুষ্ট হয় সামুরাই যোদ্ধাদের প্রেতাছা, তরবারি হস্তে বীরদর্পে ভ্রাম্যমান। ইহাদের পা নাই, দেহে ক্ষতচিহ্ন। জাপানী ভূত-পেত্লীরা কিন্তু হিংসুটে বা ক্ষতিকারক নয়। কিন্তু প্রয়োজন হইলে ইহারা দুষ্টুমি করিতে ছাড়ে না। ইহারা আবার শের্যালের মূর্তিতে বেড়ায়। ইচ্ছামত সুন্দরী নারীমূর্তি ধরিয়া পথিককে বিভ্রান্ত করে।

### ভারতবর্ষের ভূত-প্রেতাদির বিবরণ

ভারতবর্ষে ভীতিকর প্রেত, ভূত, পিশাচ, পেত্লী, শাকচূনী প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রেত দেখিতে ভয়ঙ্কর, দেহ রক্তবর্ণ, দাঁত সিংহের মত। অন্ধকারে গভীর রাত্রে ঘুরিয়া বেড়ায়, নাকী সুরে কথা বলে। ইহাদের শান্ত করিবার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট পাথরের বা মাটির ঘর গড়িয়া মূর্তি রাখা হয় এবং সময় সময় খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি নৈবেদ্য হিসেবে দেওয়া হয়। দুষ্ট প্রেতদের তাড়াইবার জন্য ওঝা নামক একজাতীয় মন্ত্রদক্ষ লোকও আছে (পূর্বেও ছিল)। তাহারা মন্ত্র পড়ে, নানা জাতীয় মশলা (সরষে, শুকনা লঙ্কা) পুড়াইয়া শাকচূনী

তড়ায়। মানুষকে ভূত বা প্রেতে ধরিলে ওঝা বা রোজা আসিয়া ভূত-পেত্নী দূর করিয়া দিয়া মানুষকে সুস্থ করে। ভূতদের বাসস্থান পোড়ো বাড়ী, শ্মশান, বট, অশ্বখ, তেঁতুল বৃক্ষ প্রভৃতিতে। পরিত্যক্ত ভূতপ্রেত বাড়ীকে ‘হানাবাড়ি’ বলে।

### খ্রীষ্টধর্মে ভূতের অস্তিত্ব কাল্পনিক নহে

খ্রীষ্টধর্মের বিবর্তনের পথে মৃতের আত্মা ও ভূতের আবির্ভাব প্রভূত পরিমাণ ঘটিয়াছে। বাইবেলে যত্রতত্র ইহাদের উল্লেখ আছে। ম্যাথু (Mathu) বলিয়াছেন,— “শিষ্যেরা যখন যীশুকে জলের উপর হাঁটিয়া যাইতে দেখিলেন, তাহারা মনে করিল এ নিশ্চয় ভূত।” লুক লিখিয়াছেন,— “খ্রীষ্ট আবার তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলে, তাহারা ভাবিল এ যীশুর অপচ্ছায়া হইবে।” আফ্রিকার উপমাল-এর বিশপ লিখিয়াছেন,— “তঁাহার তিনজন সহকর্মী মৃত্যুর পর তঁাহার সহিত দেখা করিয়া যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সব ভবিষ্যতে ঘটিয়াছে।” বিশপের বিশ্বাস যে মৃত্যুর পর স্পিরিটের মৃতপূর্ব চেহারার মতই আকৃতি থাকে। বিখ্যাত খ্রীষ্টান যোগী Saint Antony অনেক ভূত-প্রেত-পিশাচের সঙ্গে মোলাকাৎ করিয়াছেন। আজও খ্রীষ্টান ধর্মে ভূতপ্রেত স্পিরিট-এর অস্তিত্ব স্বীকৃত। হিংসুটে ও ক্ষতিকারক স্পিরিট বিতাড়নের জন্য ব্যবস্থা এখনও খ্রীষ্টান সমাজে চলতি আছে।

### প্রেতাদি জন্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও দুঃখপ্রদ এবং সাধুमुखে হরিনাম শ্রবণেই প্রেতত্ব হইতে মুক্তিলাভ

সংশাস্ত্র শ্রবণ, বিষ্ণুপূজা, সজ্জনসঙ্গ, এই সকল প্রেতত্বনাশের কারণ—ইহা গরুড়পুরাণ হইতে পাওয়া যায়। গরুড়পুরাণের ৮ম অধ্যায়ের উত্তরখণ্ডে পঞ্চপ্রেতোখ্যানে পর্যুষিত, সূচীমুখ, শীঘ্রগ, রোধক, লেখক—এই পঞ্চপ্রেতের নামের উল্লেখ দেখা যায়। পূর্বজন্মের কর্মফলবশতঃ তাহারা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এক ব্রাহ্মণের সঙ্গপ্রভাবে প্রেতযোনি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভগবান্ বিষ্ণু গরুড়কে বলিয়াছেন,—

ইথাং বিমানেন মদীয়লোকে গতো দ্বিজন্তেহপ্যথ পঞ্চভি ।

প্রেতা যযু স্বর্গমগণ্যপুণ্যং সংসঙ্গসংসর্গবশাৎ সুপবর্ণ।। (গরুড়পুরাণ)

—“হে গরুড়! দেখ সাধুসঙ্গের মহিমা! যাহার ফলে সেই পঞ্চপ্রেত মুক্তিলাভ করিয়া বিমানে আরোহণপূর্বক মদীয় লোকে যাইয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।” পদ্মপুরাণে বর্ণিত ভাগবত-মাহাত্ম্যে গোকর্ণের মুখে সপ্তদিন ভাগবত শ্রবণ করিয়া ধুক্কারী দুঃসহ প্রেতযোনি হইতে মুক্তিলাভপূর্বক বিষ্ণুপ্রেরিত পুষ্পক রথে চড়িয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন জানা যায়। গীতাতে ‘ভূতানি যান্তি ভূতেজ্য’ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ‘ভূতপূজকগণ যে ভূতলোক প্রাপ্ত হন’ তাহা জানাইয়াছেন।

শ্রীভাগবতে (ভাঃ ১০।৬।২৭-২৯) শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন,—“ডাকিনী, যাতুধানী ও কুস্মাণ্ড-নামক শিশুবিয়জনক গ্রহগণ, ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ, রক্ষ, বিনায়ক, কোটরা, রেবতী, জৈষ্ঠা, পূতনা প্রভৃতি প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের হিংসকগণ বিষুণের নাম শ্রবণে মুক্তিলাভ করিতে পারে।” ভীষ্ম যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলিয়াছেন,—

সততং শ্রবণাদ্যস্য পুণ্যশ্রবণকীর্তন।

মানবা বিপ্রমুচ্যন্তে আপন্নাঃ প্রেতযোনিষু॥ (গরুড়পুরাণ)

—“সর্বক্ষণ বিষুণের নাম শ্রবণ-কীর্তন ও স্মরণ করিলে তবেই প্রেতভাব হইতে মুক্তিলাভ করা সম্ভবপর।”

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

## আত্মারাম

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করিয়া নিবৃত্তিমার্গ নিরত তাঁহার পুত্র শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। শৌনক ঋষি সূত গোস্বামীর নিকট শ্রীশুকদেব সম্বন্ধে “আত্মারাম” শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন।—

“স বৈ নিবৃত্তিনিরতঃ সর্বত্রোপেক্ষকো মুনিঃ।

কস্য বা বৃহতীমেতামাত্মারামঃ সমভ্যসৎ॥ (ভাঃ ১।৭।৯)

শৌনক বলিয়াছেন,—সূত! মুনিবর শুকদেব নিবৃত্তিনিষ্ঠ ও আত্মাতেই রমণশীল (আত্মারাম) ছিলেন। সর্ব বিষয়েই তাঁহার উপেক্ষা পরিলক্ষিত হইত। অতএব তিনি কি কারণেই বা এই বিস্তীর্ণ সংহিতা সম্যক অভ্যাস করিয়াছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—

“নিবৃত্তিনিরতঃ অর্থাৎ ব্রহ্মানুভবিনমপি।”

শৌনকাদি ঋষির প্রশ্ন হইতেছে যে— শ্রীশুকদেব পরমহংস, ব্রহ্মানন্দমগ্ন হইয়া সমস্ত বিষয়কেই উপেক্ষা করিতেন। তিনি কেন কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাকথাপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত অভ্যাস করিয়াছিলেন।

গীতাতে বলিয়াছেন,—

“যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতীরিষ্যতি ॥

তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥” (গীতা ২।৫২)

ভগবান্ অর্জুনকে বলিলেন,—যে-সময়ে তোমার অস্তঃকরণ মোহরূপ গহণকে বিশেষরূপে অতিক্রম করিতে পারিবে, সেই সময়ে তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুতফলে নির্বেদ



প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ যখন মোহরূপ অন্ধকার অর্থাৎ আমি-আমার রূপ অজ্ঞানযুক্ত অবিবেকাত্মক কলুষরাশি তিরোহিত হইবে তখন যে শাস্ত্রে অধ্যাত্ম তত্ত্ব নাই, যাহা কর্ম ও তজ্জনিত ফলাফলের কীর্তন করে তাহা নিতান্ত নিম্নল ও সর্বদা অনাবশ্যক বলিয়া প্রতীতি জন্মিবে। স্বর্গাদি পরলোককে কর্মের ফলস্বরূপ জানিয়া ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ বৈরাগ্যকে আশ্রয় করেন। এইরূপ নির্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই তাহার ফলস্বরূপ অন্তঃকরণশুদ্ধি অবশ্যই জন্মিবে।

সূত গোস্বামী বলিলেন,—

“আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রহা অপ্যরুক্রমে।

কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিচ্ছন্ততগুণো হরিঃ॥ (ভাঃ ১/৭/১০)

সূত কহিলেন,—ঋষিগণ! যাঁহাদিগের অহংকার গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, বিধি-নিষেধ অতীত সেই আত্মারাম মুনীগণও বিপুল বিক্রম ভগবানে অহৈতুকী ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কেন না শ্রীহরির গুণই এইরূপ।

আত্মারামাঃ (আত্মনি ভগবতি রমন্তে যে তে কৃষ্ণ ক্রীড়নশীলাঃ) মুনয়ঃ (ভোগপর জড়বিষয় রহিতাঃ), নির্গ্রহাঃ (হৃদয় জয় কামগ্রন্থিহীনাঃ ব্রহ্মভূতাঃ) অপি উরুক্রমে (অজিতে কৃষ্ণে), অহৈতুকীং (অনাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মানাদ্যনাবৃত্তম্ শুদ্ধাং কৃষ্ণানুশীলনময়ীং) ভক্তিং (সেবাং) কুর্বন্তি।

এ সম্বন্ধে গীতায় বলিয়াছেন,—

“ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্বক্তিং লভতে পরাম্॥ (গীতা ১৮/৫৪)

ব্রহ্মে অবস্থিত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ সংপ্রাপ্ত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কোন বস্তুর জন্য শোক বা আকাঙ্ক্ষ করেন না। তিনি সর্বভূতে সমদর্শী হইয়া পরা অর্থাৎ প্রেমলক্ষণযুক্ত মদ্বক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

“ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ (গীতা ১৮/৫৫)

তিনি সেই পরাভক্তির দ্বারা যেরূপ বিভূতি ও স্বভাবযুক্ত আমি এবং যাহা আমার স্বরূপ সেইরূপ আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন। এবং সেই প্রেমভক্তিবলে তত্ত্বতঃ জানিয়া তদনন্তর আমাতে অর্থাৎ আমার নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও দেখা যায়,—

“আত্মারাম পর্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন।

ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ৬/১৮৫)

ভক্তসংসর্গে প্রীতিলাভ করাই ভগবানের স্বভাব। ব্রজগোপীগণের কোনও স্ব-সুখ বাঞ্ছা ছিল না। তাঁহাদের কৃষ্ণার্থেই অখিলচেষ্টা ছিল। ভক্তের ভক্তিতে ভগবান্ বশীভূত হন। আপাতদর্শনে গোপীগণকে বিবেকহীন নারী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাঁহাদের

শ্রীকৃষ্ণচরণে এতই শরণাগতি ছিল যে কৰ্ম্মী, জ্ঞানী, যোগিগণ অনাদিকাল ধরিয়৷ চেষ্টা করিয়াও কোনওদিন সেই গুণের অধিকারী হওয়া ত' দূরের কথা, তাহার ধারে কাছেও যাইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আত্মারাম হইয়াও ব্রজগোপীগণের শরণাগতির গুণে আবদ্ধ হইয়া আত্মসুখ লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি ভক্তির মর্য্যাদাই রক্ষা করিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেমমাধুর্য্যময়ী বিগ্রহস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধারাগী। শ্রীমতীর জীবনের মূলমন্ত্র—

“তাজন্ত বান্ধবাঃ সৰ্ব্বৈ নিন্দন্ত গুরবো জনাঃ।

তথাপি পরমানন্দো গোবিন্দো মম জীবনম্॥”

ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র মন্থথ-মন্থথ। অর্থাৎ মন্থথেরও মন্থ মথে। তিনি কামদেবেরও চিত্তহরণকারী আত্মারাম। আত্মারাম হইয়াও তিনি রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র প্রকৃত ব্রহ্মচারী। ইন্দ্রিয় সংযম বলিয়া যদি কোন কথা থাকে তাহা কেবলমাত্র কৃষ্ণচন্দ্রেই প্রযোজ্য। ভগবান্ স্বতন্ত্র। রাসক्रीড়া করিয়াও তিনি কামজয়ী—তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—রাসক्रीড়ায় নিবৃত্তিরই উপদেশ দিয়াছেন। তিনি শতকোটি গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা করিয়াও সৰ্ব্বপূজ্য। তিনি আত্মারাম হইয়াও এইরূপ লীলা করিয়াছিলেন। কারণ তিনি অতীন্দ্রিয়। এই আত্মারাম শব্দটী কৃষ্ণেরই উপযুক্ত। তাহার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের কোনও ক্রিয়া নাই। ভগবান্ নিজ মুখেই বলিয়াছেন,—“জন্ম কৰ্ম্ম চ মে দিব্যম্॥”

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে আত্মারাম সে সম্বন্ধে গর্গসংহিতায় একটি উপাখ্যান রহিয়াছে।—রাসলীলার সময় গোপীগণ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। অধিক রাত্রে কৃষ্ণ আসিলেন। গোপীগণ এত বিলম্ব হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাহার গুরুদেব শ্রীমৎ দুৰ্ব্বাসা ঋষি ভণ্ডীর বনে আসিয়াছেন বলিয়া সেখানে গুরুদর্শনে গিয়াছিলেন। এবং গুরুদেবের সেবা-পূজায় নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তজ্জন্য তাহার আসিতে দেরী হইল বলিলেন। ইহা শুনিয়া গোপীগণ অতিশয় বিস্মিতা হইলেন এবং চিন্তা করিলেন—যিনি অনাদির আদি সেই গোবিন্দেরও গুরু—তাঁহাকে অবশ্যই দর্শন করিতে হইবে। তাঁহারা কৃষ্ণকে বলিলেন,—“তোমার গুরুদেবকে দর্শন করিবার জন্য আমাদের মন ব্যাকুল হইয়াছে। কিন্তু এখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। যমুনা উত্তাল। এত রাত্রে নৌকাও নাই। কি করিয়া পারে যাইব।” শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—তোমরা যখন দুৰ্ব্বাসা ঋষিকে দর্শন করিবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছ তাহা হইলে যাও। যমুনাকে বলিবে—সৰ্ব্বদোষ-বিনিমুক্ত ব্রহ্মচারী কৃষ্ণ ওপারে ভাগুরী বনে যাওয়ার জন্য পথ করিয়া দিতে আপনাকে বলিলেন। যমুনা তোমাদিগকে পথ করিয়া দিবেন। তাহা শুনিয়া গোপীগণ চৰ্ব্বা, চুষা, লেহা, পেয় ছাঙ্গান প্রকার প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য লইয়া যমুনাतीরে গেলেন এবং কৃষ্ণ যেরূপ বলিয়াছিলেন সেইরূপ বলায় যমুনা তাঁহাদিগকে পথ করিয়া দিলেন। তাঁহারা অনায়াসে

ভাণ্ডীর বনে পৌঁছিয়া দুর্বাসা ঋষিকে দর্শন করিলেন। এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। গোপীগণ যে বিপুল পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য লইয়া গিয়াছিলেন সেগুলি সেবা করিবার জন্য আবেদন জানাইলে দুর্বাসা ঋষি বলিলেন,—“আমি পরমহংস, নিষ্ক্রিয়, তোমরা নিজ হাতে খাওয়াইয়া দাও। গোপীগণ সকলেই সেই সমস্ত প্রচুর খাদ্যদ্রব্য খাওয়াইলেন। দুর্বাসা সমস্তই খাইলেন। গোপীগণ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। এখন ফিরিবার সময় কি করিয়া যমুনা পার হইবেন চিন্তা করিয়া তাঁহারা দুর্বাসা ঋষিকে আসিবার সময়ের ঘটনা বলিলেন এবং ফিরিয়া যাওয়ার জন্য উপায় করিয়া দিবার প্রার্থনা জানাইলে দুর্বাসা বলিলেন,—“চিন্তা করিও না। যমুনাকে বলিও দুর্বারসপানকারী অন্নজলত্যাগী দুর্বাসা ঋষি আপনাকে পথ করিয়া দিতে বলিলেন,—এইরূপ বলিলে যমুনা তোমাঙ্গিকে পথ দিবেন।” গোপীগণ যমুনাতীরে গিয়া এইরূপ বলয়া যমুনা পথ দেন এবং অনায়াসে তাঁহারা কৃষ্ণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—“আমরা দুর্বাসার দর্শন পাইয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দেখিলাম—তোমরা উভয়েই মিথ্যাবাদী। কেননা তুমি আমাদের উপপতি। ‘শতকোটি গোপীতেও নহে তব কাম-নির্বাপণ।’ তুমি রাসবিহারী রসিক চূড়ামণি। তুমি কি-প্রকার ব্রহ্মচারী। আর আমরা নিজহাতে দুর্বাসাকে অসংখ্য লোকের ভক্ষ্য চর্ক্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় এতসব ভোজ্যদ্রব্য খাওয়াইলাম; তিনি কি করিয়া কেবলমাত্র দুর্বারসপানকারী অন্নজলত্যাগী হইলেন—আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

তখন কৃষ্ণ বলিলেন,—“কর্মসমূহ আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না। কর্মফলের আমার স্পৃহা নাই। আমি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্। আমার পক্ষে অতিতুচ্ছ কর্মফল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। আমি সর্বদা নির্মল, নিরহঙ্কার, সমদর্শী, সর্বগ, সর্বশ্রেষ্ঠ, বৈষম্যরহিত ও নিগুণ। যিনি নিজ শরীর ও চিন্তকে বুদ্ধির অধীন রাখিয়া ফলাশা ও সমস্ত পরিগ্রহশূন্য হইয়া অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তুতে মমতা ত্যাগ করত কেবল শরীর-যাত্রা নির্বাহের জন্য কর্ম করিয়া থাকেন, তাহাতে কর্মজনিত পাপ বা পুণ্য তাঁহার কিছুই যায় না।

ব্রহ্মে কর্মার্পণপূর্ব্বক ফলাসক্তি ত্যাগ করত যিনি কর্ম করেন, পদ্মপত্র যেমত জলে থাকিয়া জলে লিপ্ত হয় না তিনিও তদ্রূপ কর্মপাশে লিপ্ত হন না।” এ সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—“তেল ও জল এক পাত্রস্থ হইলেও উভয়ে যেমন স্বতন্ত্র থাকে, ভগবান্ও কর্মের সহিত তদ্রূপ সংযুক্ত থাকিলেও তিনি কর্ম হইতে স্বতন্ত্র। পদ্মপত্র জলে ভাসমান থাকিলেও তাহা যেমন জলে প্রলেপযুক্ত হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ সর্বদা কর্মপরায়ণ হইলেও তদ্বিষয়ে উদাসীন।”

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে বলিয়াছেন,—

“রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারমোহপ্য খণ্ডিতঃ ॥

কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাং চৈব দুরাত্মতাম্ ॥ (ভাঃ ১০/৩০/৩৪)

‘আত্মারামঃ অর্থাৎ নিজানন্দে এব রমমানঃ।’ অর্থাৎ—শ্রীকৃষ্ণ নিজের আনন্দেই পরিপূর্ণ। নারীর বিভ্রমাদিতে তাঁহার কোনই প্রয়োজন নাই বা তজ্জন্য তাঁহার চিন্তা আকৃষ্ট হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। তিনি পূর্ণকাম। তথাপি বিষয়াকৃষ্ট মানবের বিষয়-পরতন্ত্রতা-নিবন্ধন দৈন্য ও নারীগণের দুরাচারের পরিচয় প্রদানের জন্যই সেই সকল নারীগণের সহিত বিহার করিয়াছিলেন।

সর্ববৃত্তভুজ শ্রীশুকদেব কৃষ্ণরমণীর সৌভাগ্য অতিশয় বর্ণনপূর্বক নিজ উক্তির দ্বারা তাহার প্রতিপোষণ করিয়াছেন। ভগবান্ আত্মারাম হইয়াও তাঁহার সহিত রমণ করিয়াছিলেন। আত্মরত ও আত্মারাম এই উভয় শব্দের প্রয়োগ প্রায় একই অর্থের হইয়া থাকে। অতএব এই শ্লোকে পুনরুক্তি দোষ হইল বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। ভগবান্ বেদব্যাস এইরূপ বৃথা শব্দ প্রয়োগ করিতে পারেন না। অতএব “আত্মরতঃ অর্থাৎ সেই প্রণয়িনীর সহিত ‘আত্মনা’ অর্থাৎ যত্নসহকারে রত। অর্থাৎ রমণক্রিয়া যিনি করিয়াছিলেন তিনিই আত্মরত। কারণ আত্মা শব্দে যত্ন, ধৃতি, বুদ্ধি, স্বভাব প্রভৃতি বুঝায়। ভগবানের সহিত সেই নিত্যানন্দময়ী ঈশ্বরের এরূপ সম্বন্ধ যে তিনি আত্মারাম হইলেও কেবল আত্মস্বরূপে তাদৃশ সুখ লাভের অভাবেই যেন তিনি রমণার্থ এত প্রযত্ন করিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে পাছে সেই প্রকৃতি স্বরূপেরই পূর্ণত্ব প্রতিপাদিত হয়—এই নিমিত্ত “অখণ্ডিত” বলিয়া ভগবানের একটা বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে। ভগবান্ পূর্ণ। প্রকৃতিস্বরূপা এই রমণী তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি এবং তদভিন্নভাবেই চির বিদ্যমান। অচল প্রতিষ্ঠ পূর্ণ সলিলসমুদ্র স্বীয় অন্তরে সলিলের স্রোত বিশেষ উপলব্ধি না করিলেও তদুপজীব্য স্রোতস্বতীতে তাহার বিশেষ উপপত্তি যেমন প্রতীত হয়, সেইরূপ হ্লাদ-রসসাগর শ্রীকৃষ্ণের মহাভাব সেই হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপা রাধিকাতেই বিশেষ উপলব্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ সমুদ্রের সহিত তাহার স্রোতের যেমন সম্বন্ধ, ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত হ্লাদিনী শক্তি রাধিকারও সেইরূপ সম্বন্ধ। সেই হ্লাদিনী শক্তিসমূহের সারভূতাই রাধিকা। এবং ভগবান্ পূর্ণস্বরূপে নিত্য বিরাজ করিলেও, আত্মস্বরূপে প্রেমের উদ্ভাসনই রাধিকার সহিত রমণ জানিতে হইবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় এই লীলার অনুষ্ঠান করিয়া ভগবৎ-তত্ত্ব অনভিজ্ঞ অবিবেকী মানবগণের বিশেষ উপকারই করিয়াছেন। কারণ তিনি তাহাদের নিকট পরতত্ত্ব গোপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু কামাতুর হইয়া কখনও নারীর বশীভূত হওয়া উচিত নহে—ইহাই তাহার এ স্থলে বিশেষ উপদেশের বিষয়। যেহেতু জড়কামই পুরুষের স্বাতন্ত্র্য বিনিময়ে কাম্যবস্তুর মিলন করায়। কামপরতন্ত্র ব্যক্তি কাম্য বিষয়ের অধীন হইয়া পড়ে। সুতরাং নিজের স্বাতন্ত্র্য না থাকায় নানা প্রকার দুঃখে অভিভূত হয়। এই লীলায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে কোন ব্যক্তি কামের বশীভূত হইবে সে নানাপ্রকার দুঃখের অধীন হইবে। অতএব আকাজক্ষাই দুঃখের মূল কারণ এবং নিরাকাজক্ষাভাবে অবস্থিতিই প্রকৃত সুখ।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীঅম্বরীষ উপাখ্যানে আমরা দেখিতে পাই—দুর্ব্বাসাকে ভগবান বলিতেছেন,—

“নাহমাত্মানমাশাসে মন্তুজ্জৈঃ সাধুভির্বিনা।

শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা।।” (ভাঃ ৯/৪/৬৪)

হে ব্রাহ্মণবর! যাঁহাদের আমিই একমাত্র আশ্রয়, সেই সাধুগণ ব্যতীত আমি নিজ স্বরূপগত আনন্দ ও নিত্য ষড়ৈশ্বর্য সম্পত্তির অভিলাষ করি না।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন,— “যত্র আরমনাদহম্ আত্মারাম ইতি প্রসিদ্ধ স্তমাত্মানম্ অপি ভজৈর্বিনা না শাসে ন কাণ্ডেক্ষ ইতি মৎস্বরূপ ভূতানন্দাৎ অপি মন্তুজ্জৈ স্বরূপানন্দোহতি স্পৃহীয়.....।”

ভগবান্ আনন্দময় হইলেও হ্রাদিনীর সার ভক্ত ভগবানকেও আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং ভক্তভাব ভগবদ্ভাব অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। অতএব ভক্তই ভগবানের একমাত্র অভিলষিত।

এই প্রকার বহু শ্লোকে কৃষ্ণের ভক্তপ্রেমবশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণকাম, আত্মারাম ও অখণ্ডিত। অর্থাৎ সর্ববিধ স্ত্রী-বিলাসে অনাকৃষ্ট চিন্ত হইয়াও ভক্তপ্রেমবশ্যতা গুণ পরম প্রেমবতী শ্রীরাধার আনন্দবর্দ্ধনের জন্যই রাসলীলা করিয়াছিলেন বা রমণ করিয়াছিলেন। তিনি রাসাদিলীলা করিয়াও পরমমুক্ত ও আত্মারাম।

—শ্রীহরিদাস ভক্তিশাস্ত্রী

## জীবের কৃত্য

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৯ পৃষ্ঠার পর ]

আবার শুদ্ধ অনন্যভক্তগণের অর্থ উপার্জনের কোন প্রচেষ্টাই থাকে না। শ্রীচৈতন্যহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করলে শ্রীবাসপণ্ডিত মহাপ্রভুর বিরহ সহ্য করতে না পেরে নবদ্বীপ-বাস পরিত্যাগ করে আত্মীয়বর্গসহ কুমারহট্টে (হালিসহরে) এসে বসবাস করেন। সেই সময় একদিন মহাপ্রভু সপার্ষদে শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে শুভ পদার্পণ করলে শ্রীবাসপণ্ডিত পরিজনগণসহ মহানন্দে মহাপ্রভু ও তাঁর সঙ্গীদের সেবা করেন। তাই দেখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বললেন,—“তুমি গৃহস্থ, তোমার অর্থ উপার্জনে চেষ্টা করা উচিত, নতুবা কুটুম্ব ভরণ-পোষণ কি-প্রকারে হবে?” শ্রীবাস তখন তাঁর অর্থ উপার্জনের ইচ্ছা নেই বলে নিজ হাতে তিনবার তালি দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐরূপ তালি দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে শ্রীবাসঠাকুর বললেন,—“আপনিও আমাকে অর্থ উপার্জনের জন্য যখন বলছেন, তখন আমার উপায় কি? এক উপবাস, দুই উপবাস, তিন উপবাস,—তারপরে গলায় ঘাট বেঁধে

গঙ্গায় প্রবেশ করব।” শ্রীবাসের এই বাক্য শুনে শ্রীমন্মহাপ্রভু হৃদ্ধার করে বললেন,—“যদি কখনও লক্ষ্মীকে ভিক্ষা করতে হয়, তথাপি তোমার গৃহে কখনও অভাব হবে না। যিনি অনন্যচিণ্ডে কৃষ্ণের ভজন করেন, তাঁর যোগ-ক্ষেম কৃষ্ণ নিজেই স্বেচ্ছায় বহন করেন।”

শ্রীবাসঠাকুর অনন্যভক্ত, তাঁর অর্থ উপার্জনে স্পৃহা নেই, কিন্তু আমাদের ত’ অর্থ উপার্জনে স্পৃহা আছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজনে কি অর্থাদি লাভ হয়? শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রার্থানুরূপ অর্থ ত’ লাভ হয়ই, উপরন্তু প্রার্থনাতিরিক্ত ফলও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

“সতাং দিশ্যার্থিতমর্থিতো নৃণাং নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যন্ত।

স্বয়ং বিধন্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥” (ভাঃ ৫।১৯।২৬)

অর্থাৎ—“সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনন্যভাবে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত ভক্তগণ যদি সকাম হয়ে আরোগ্য, রাজৈশ্বর্য, স্ত্রী-পুত্রাদি লাভেচ্ছাযুক্ত মনেও ভজন করেন, তথাপি ভগবান্ তাঁর সেই প্রার্থিত বস্তু অপরিপূর্ণরূপে নিশ্চয়ই দান করে থাকেন, যেহেতু তিনি সর্বার্থপ্রদ। প্রার্থিত বস্তুর ভোগদ্বারা ক্ষয়ে পুনরায় যাতে আর প্রার্থনার অবকাশ না থাকে, সেইরূপ প্রচুর পরিমাণেই তাহা দান করেন। ভগবানের সর্বোপরি বৈশিষ্ট্য এই যে, নিজ ভক্তের প্রার্থিত ধনাদি দান করেই তিনি ক্ষান্ত হন না, বস্তু বৈশিষ্ট্য-জ্ঞানহীন ভক্তের অপ্রার্থিত সমস্ত বস্তুর আচ্ছাদক বা সর্বকাম নিবর্তক স্বচরণপদ্মও তাকে দান করে থাকেন।” সকাম ভক্তও পরিশেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁর পাদপদ্ম লাভ করেন। তবে ভক্ত ও ভগবানের সেবায় অর্থাদি ব্যয় না হলে তাহা পরমার্থপ্রদ না হয়ে অনর্থের হেতু হয়ে থাকে। অর্থের কিরূপ ব্যবহার করলে অর্থকে অনর্থ বলা যাবে না? এই প্রসঙ্গে ধনীর পুত্র রঘুনাথ দাসের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ স্মরণীয়;—

“মৰ্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।

যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।২৩৮)

কার অর্থ, কে ভোক্তা, কে ব্যবহার করে?— এই প্রশ্নগুলির সদুত্তরে অর্থের সদব্যবহার সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি। ঈশোপনিষদে উক্ত হয়েছে, (প্রথম মন্ত্র)—

“ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিন্দনম্॥”

অর্থাৎ—“এই পরিদৃশ্যমান চরাচর বিশ্বের সমস্তই পরমেশ্বর-কর্তৃক আবাস্য তথা আবৃত বা ভোগ্য। সেজন্য নিজ অদৃষ্ট-অনুসারে ভগবৎকর্তৃক প্রদত্ত বিষয়সমূহ তাগ ধন্মসহকারে অর্থাৎ যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক অনাসক্তভাবে ভগবৎ-প্রসাদবুদ্ধিতে ভোগ করবে বা সেবা করবে। ‘মা গৃধঃ’— অর্থাৎ অধিক ভোগে আকাঙ্ক্ষা করো না। ‘কস্য স্বিন্দনম্?’— অর্থাৎ ধন বা ভোগ্য পদার্থ কার হতে পারে? সমস্ত ধনের অধিকারী একমাত্র ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র। তুমি বা অপর কেহ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী নহ বা নহে। সুতরাং দৃশ্যাদৃশ্য চরাচরের সকল বস্তুকেই ভগবৎ-সেবোপকরণ বিচারে

ভগবৎ-সেবায় সমর্পণ করে তার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করবে।” আমাদের বাড়ীতে দাস-দাসীরা আমাদের অর্থ ব্যবহার করেই আমাদের সেবা করে। তারা আমাদের সেবার জন্য অর্থ ব্যয়ে কার্পণ্য করে না। আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দাস। সমগ্র জগৎ ও জগতের যা কিছু ধন-সম্পদ ও পদার্থ আছে সব কিছুই ভগবানের সেবার উপকরণ। তাঁর অর্থই তাঁর সেবায় আমরা ব্যয় করব—এতে আমাদের সঙ্কোচ, দুশ্চিন্তা, কার্পণ্য থাকবে কেন? মাটি টাকা ও টাকা মাটি—এ চিন্তা আমাদের যেন না আসে। এ বিশ্বে যা কিছু আছে, সমস্ত বস্তুরই ভোজ্য একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র; সমস্ত ধন-সম্পদ তাঁরই, কাজেই তাঁর স্বার্থেই বা তাঁর সুখ রচনায় সব কিছুই ব্যবহৃত হবে—ইহাই বিধান। আমাদের বাড়ীর দাস-দাসীরা যেমন মালিকের সেবার পর ভোজন করে, তেমনই আমাদেরও ভগবৎ সেবা-পূজার পর তাঁর উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ ভোজন করা কর্তব্য। মণিবের গৃহে অধিক ধন থাকলেও দাস-দাসীরা সেই ধনের অংশীদার বা দাবীদার হয় না, মণি বা দেন, তাই গ্রহণ করে। মণিবের ধন-সম্পদে দাস-দাসীদের লোভ করা ও আকাঙ্ক্ষা করা অন্যায় ও অপরাধ। ভগবানের বহু ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাদের যেটুকু দেন, তাতেই খুশী হয়ে আমাদের জীবিকা নির্বাহ করা আবশ্যিক। স্বর্গে প্রচুর ধন থাকলেও পরমেশ্বর ব্যতীত তাতে কারও অধিকার নেই। ভগবানের অদন্ত বস্ত্র পাবার আকাঙ্ক্ষা করা অনুচিত।

এ ভোগময় জগতে ভোগের বস্তু উৎপাদনে জড় বৈজ্ঞানিকগণ ও সাধারণ মানুষেরা ব্যস্ত থাকেন। এই প্রকৃতিকে ও প্রকৃতিজাত কোন বস্তুকে ভোগ করার অধিকার আমাদের নেই। আমরা প্রকৃতির দ্বারা লালিত-পালিত হচ্ছি। সেইহেতু প্রকৃতি আমাদের কাছে পূজ্য; তাঁকে ভোগ্যরূপে দর্শন করা বা তাঁর থেকে উৎপাদিত বস্তুগুলিকে আমাদের নিজেদের ভোগের উপাদানরূপে গ্রহণ করার প্রবৃত্তি অপরাধ। আমরা স্বরূপজ্ঞ কৃষ্ণদাস;—আমরা ভোগী নই। প্রকৃতির বিষয়সকল যদি আমাদের ভোগ্যরূপে গ্রহণ করা অনুচিত হয়, তাহলে আমরা পৃথিবীতে বেঁচে থাকব কি করে? প্রকৃতির ভাণ্ডারে যা কিছু আছে তদ্বারা আমরা জীবন ধারণ বা শরীর রক্ষণ করতে পারি। আমাদের শরীর রক্ষণের প্রয়োজন কি জন্য? তাহাও সুষ্ঠুভাবে হরিভজনের জন্য প্রয়োজন জানতে হবে। প্রকৃতিজাত বস্তুগুলির মধ্যে যেগুলি হরিসেবার অনুকূল, সেইগুলি শ্রীহরির ভোগে লাগিয়ে তদুচ্ছিষ্ট সুপরিব্র মহাপ্রসাদ-সেবায় জীবাত্মা ও দেহ-মনের তৃপ্তি সাধন হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হয়েছে,—

“কামস্য নেদ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।

জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কস্মভিঃ।।” (ভাঃ ১।২।১০)

অর্থঃ—“বিষয়ভোগের ফল ইন্দ্রিয়তর্পণ নয়। যতদিন জীবন থাকে, ততদিন কাজের ফল অর্থাৎ যে পরিমাণ বিষয়গ্রহণে জীবন থাকে, সেই পরিমাণ বিষয়ভোগে কামের সেবা করা যায়। অতএব ভগবন্তত্ত্ব জিজ্ঞাসাই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন। নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্মানুষ্ঠানদ্বারা এ জগতে যে স্বর্গাদিলাভ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা প্রয়োজন নয়।”

বিষয়সকল যে জীবের বিরোধী তা' নয়। বিষয়ে যে রাগ-দ্বेष আছে তাহাই জীবের পরম শত্রু। যে-পর্য্যন্ত প্রাকৃত শরীর আছে, সে-পর্য্যন্ত বিষয় স্বীকার অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু দেহাত্মাভিমানবশতঃ যে রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন হয়, তাহা খর্ব্ব করবার জন্য যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করা আবশ্যিক। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় অর্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ,—

“ইন্দ্রিয়স্যেन्द्रিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।

তয়োঁ বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপস্থিনৌ।।” (গীতা ৩।৩৪)

“প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব-স্ব বিষয়ের প্রতি রাগ ও দ্বেষ বিশেষভাবে অবস্থিত আছে। অতএব তাহাদিগের অধীন হবে না; যেহেতু পুরুষার্থ সাধকের পক্ষে তারা পরম শত্রু।”

প্রত্যেক ইন্দ্রিয় নিজ নিজ বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। ইন্দ্রিয়গণ দুই প্রকার যথা,— জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কৰ্ম্মেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা,—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শে অনুরাগবিশিষ্ট হয়; আর কৰ্ম্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ যথাক্রমে ভাষণ, গ্রহণ, গমন, উৎসর্গ ও আনন্দ—এইগুলিতে নিবদ্ধ হয়। এক্ষণে কারও কারও শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কার্য্যে অনুরাগের উদয় হয়, আবার শাস্ত্রবিহিত কার্য্যেও অনেক সময় দ্বেষ হয়— এগুলির বশ্যতা স্বীকার করা উচিত নয়। আত্মার সঙ্গে বিষয়ের কোনই সম্বন্ধ নেই। শুদ্ধ আত্মা কোন বিষয়ের অধীন না হ'য়ে নিত্যবস্তু ভগবানকে লাভ করে আনন্দময় জীবন-যাপন করতে প্রয়াসী হন।

জড় বিজ্ঞানীদের ধারণা কৃষকভক্তগণ অকৰ্ম্মণ্য, কাপুরুষ এবং অনুৎপাদনক্ষম, জীবনযাপন করেন। আত্মবিদ ভক্তগণের কার্য্য তথাকথিত ভোগী কৰ্ম্মিগণের কার্য্য অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। জড় বৈজ্ঞানিকগণ ও দেশ-কৰ্ম্মিগণ জড় বস্তু উৎপাদন ও ভোগ-বিলাসের উপকরণদ্বারা দেহ-মনের সুখ প্রদান করার জন্য সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ জীবাত্মার পুষ্টি ও আনন্দের জন্য নিত্য নূতন চিৎ উৎপাদনে নিরত থাকেন। সুতরাং শুদ্ধভক্তগণ ( non-productive ) হ'তে পারেন না। ভক্তগণই জীবের দুঃখ দূরীকরণে সমর্থ। দেহ-মনের মালিক আত্মা। দেহে আত্মার বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতার উপর দেহের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। দেহে আত্মার অবিদ্যমানতায় দেহের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। দেহ ও মন আত্মার সম্পত্তি। সম্পত্তির পুষ্টি ও তুষ্টি সাধনে মালিকের পুষ্টি ও তুষ্টি হয় না। দেহ-মনের পুষ্টি ও তুষ্টির দ্বারা জীবাত্মার পুষ্টি ও তুষ্টিসাধন কি সম্ভব হয়? পক্ষান্তরে জীবাত্মার পুষ্টি ও তুষ্টিসাধনে দেহ-মনের পুষ্টি ও তুষ্টিসাধন হয়ে থাকে। মালিক যদি বেঁচে থাকে, তবে তো তা'র সম্পত্তি থাকবে? সম্পত্তিকে বাঁচালে মালিককে বাঁচানো যায় না। ভক্তগণ ভক্তি-ক্রিয়ার দ্বারা আত্মার ক্ষুদ্রিত্ব দূর করেন, যুক্তবৈরাগ্যে আত্মার তুষ্টি এবং ভক্তিজনিত সম্বন্ধজ্ঞানে আত্মার পুষ্টিসাধন করে থাকেন। অতএব ভক্তগণ অকৰ্ম্মণ্য নহেন। ভক্তগণ অসং বৃত্তিগুলির সাথে সংগ্রাম করে সংবৃত্তি প্রকাশের জন্য সচেষ্ট হয়। প্রলোভনসমূহকে প্রতিহত করেন, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও নানা মতবাদপূর্ণ জগতে সহ্য-



শীল হয়ে সহ-অবস্থান করেন। জীবের সচ্চরিত্র গঠনে উদ্যোগী হন, পাপকে প্রশ্রয় দেন না, জীবে হিংসা করেন না, সকলকে সুখ ও আনন্দ দিতে সর্বদা চেষ্টাশীল থাকেন, সর্বদা মানবধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, ইত্যাদি গুণসম্পন্ন ভক্তগণ কি কাপুরস্ব হ'তে পারেন? পূর্ণচেতন ভগবানের সাথে অণুচেতন আত্মার যে স্বজাতীয় সম্বন্ধ আছে, তাহা ভক্তগণের শিক্ষায় ও কৃপায় আমরা উপলব্ধি করতে পারি। দেহ-মনের আনন্দের উপাদান এ জগতে আছে, কিন্তু আত্মার আনন্দের উপাদান এ জগতে নেই। দেহ-মনের আনন্দের উপাদানগুলি অনিত্য ও তাহা অর্থব্যয়ে পাওয়া যায় না। কিন্তু আত্মার আনন্দের উপাদানগুলি নিত্য, তাহা বহু অর্থ ব্যয় করলেও পাওয়া যায় না। প্রেমিক ভক্তগণের কৃপা ব্যতীত নিজ চেষ্টায় বা বহু অর্থব্যয়েও তাহা মিলবে না। প্রেমিক ভক্তগণ সর্বদা অপ্রাকৃত ভূমিকায় স্থিত থেকে জীবাত্মার নিত্য আনন্দের উপাদান তথা ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিতে আবিষ্ট হয়ে এই জড়জগতে শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁকে অনুগ্রহপূর্বক সেই নিত্য আনন্দের উপাদান বিতরণ করেন, সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তাহা লাভ করে থাকেন। এজন্য অর্থাদি কোন মূল্যই দিতে হয় না,—শুধুমাত্র লালসাই চিন্ময় আনন্দ প্রাপ্তির একমাত্র মূল্য। যথা শ্রীল রায় রামানন্দের উক্তি,—

“কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোহপি লভ্যতে।

তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটীসুকৃতৈর্ন লভ্যতে।।” (পদ্যাবলী)

অর্থৎ—“ হে মানবগণ! কৃষ্ণভক্তিরসদ্বারা ভাবিতা অর্থৎ সুবাসিতা মতি যদি কোনস্থানে প্রাপ্ত হও তবে ক্রয় কর, উহার মূল্য কেবল লালসামাত্র, তদ্ভিন্ন কোটি কোটি জন্মের সুকৃতদ্বারাও এই মতি লভ্য হয় না।” অতএব অর্থাদি দ্বারা ভগবদ্ভক্তি লাভ বা নিত্য আনন্দ লাভ হয় না।

কর্ম্মিগণ সমস্ত বস্তুকে “অহং ভোক্তা” রূপে দর্শন করে ইন্দ্রিয়তর্পণের মাধ্যমে তাৎকালিক আপাত সুখ লাভ করে, কিন্তু পরিণামে দুঃখ পায়। অনেকে শুদ্ধ জ্ঞান-সাধনদ্বারা মুক্তি লাভের জন্য যত্নবান হয়। এই প্রকার বুড়ুক্ষু ও মুমুক্ষু—উভয়বিধ মানবই নিম্নলোক হ'তে উচ্চলোক পর্য্যন্ত কর্ম্মফলানুসারে গতি লাভ করে। “ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশাস্ত” — এইগুলি অনর্থ ও কৈতব এবং জীবের প্রকৃত প্রয়োজন নয়। ভোগও ত্যাগের ভূমিকায় মদ, কাম, রজঃ প্রভৃতি অপুণ্ডগুণগুলি প্রকাশিত থাকে। ভোগ ও ত্যাগের ভূমিকা অতিক্রম করে যুক্ত-বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক ভগবদ্দাস্যে নিযুক্ত থেকে আনন্দময় ভগবানের অনুশীলন করাই জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম এবং তা'র ফলে আনন্দময় ভগবান্ আনন্দিত হন আর সঙ্গে সঙ্গে অনুশীলনকারীর মধ্যেও আনন্দ সঞ্চারিত হয়। ভগবানের সেবা করেই বিমল আনন্দ ও পরম শান্তি লাভ হয়। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

## কলিযুগের শ্রেষ্ঠতা

মহারাজ পরীক্ষিৎ সরস্বতী-তীরস্থ কুরুক্ষেত্রে আসিয়া দেখিলেন একজন রাজবেশধারী শূদ্র একটা ত্রিপাদহীন বৃষকে ও একটা গাভীকে নিদ্রায়ভাবে প্রহার করিতেছে। বৃষটি ভয়ে মূত্র ত্যাগ এবং গাভীটি অশ্রু বিসর্জন করিতেছিল। মহারাজ তাঁহার রাজত্বে নিৰ্জ্জন স্থানে এইভাবে দুইটি অসহায় দুর্বল প্রাণীর উপর অত্যাচার করিতে দেখিয়া সেই ব্যক্তিটিকে তৎক্ষণাৎ বধ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি মহারাজের পদতলে নিপতিত হইয়া শরণাগত হওয়ায় মহারাজ তাহাকে বধ করিতে পারিলেন না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার রাজত্ব পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। মহারাজ জানিলেন সেই ব্যক্তিটি স্বয়ং কলি। সর্বত্রই মহারাজের রাজত্ব হওয়ায় কলি তাহার বসবাসের নিমিত্ত কিছু স্থান প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে দ্যুত, মদ্যাদি পান, স্ত্রী-সংসর্গ-ও জীবহিংসা—এই চারিটি স্থান প্রদান করিলেন। কলি পুনরায় স্থান প্রার্থন করিলে মহারাজ কলিকে একখণ্ড সুবর্ণ প্রদান করিলেন। সুবর্ণতেই আছে গৰ্ব, স্ত্রীসঙ্গ-লিপ্সা, মিথ্যা, হিংসা, শত্রুতা—এই পাঁচটি দোষ।

পরীক্ষিৎ মহারাজের রাজত্বকালে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরে পৃথিবীতে কলির প্রবেশ। গাভীরূপা ধরিত্রী রোদন করিতেছেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন, সুতরাং শূদ্রের উপভোগ্যা হইবেন এই ভয়। এই কলিযুগে ধর্মের অবস্থা অতীব শোচনীয়। বৃষরূপী ধর্মের তিনটি পাদ ভঙ্গ। সত্যযুগে তপঃ, শৌচ, দয়া, সত্য এই চারিটি পাদে ধর্মের অবস্থিতি ছিল। কলিতে সত্যরূপ একটা পাদে কোনপ্রকারে অবস্থান করিলেও দুর্দান্ত কলি তাহাও ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ফলে গাভীরূপা ধরিত্রীর কষ্টের সীমা নাই। কলিকালে ধর্মের অবস্থা এই প্রকার শোচনীয় হওয়া সত্ত্বেও, সর্বশাস্ত্রপ্রণেতা শ্রীব্যাসদেব কিন্তু বলিয়াছেন,—‘কলি সাধু’। তিনি কেবল কলিকেই সাধু বলেন নাই, কলিযুগের ‘শূদ্রকেও সাধু’ বলিয়াছেন। আর ইহাও বলিয়াছেন কলিযুগে ‘যোষিৎও সাধু’।

যে কলিতে ধর্মের অবস্থা সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর অপেক্ষা অতীব শোচনীয়, সেই কলি কি-প্রকারে সাধু হইল? আর যে শূদ্র ও যোষিৎগণের অন্যান্য যুগে শাস্ত্র পাঠের অধিকারী বা সাধু হইবার সুযোগই ছিল তাহারাই বা কলিযুগে কি-প্রকারে সাধু হইলেন, এ রহস্য অতীব মধুর।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর কলিযুগের এত দোষ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার ওদার্য্যদানে কলিযুগকে মহান হইতে সুমহান করিয়াছেন। কলির জীবকে অকাতরে অযাচিতভাবে দান করিয়াছেন এমনই দুর্লভ সম্পদ যাহা সত্য, ত্রেতা বা দ্বাপরের পক্ষে কোন প্রকারেই পাওয়া সম্ভব নহে।

কলিযুগে জীবের পরমায়ু স্বল্প, ক্ষুধা পিপাসায় কাতর, মন চঞ্চল, শরীরিক পীড়ায় অসুস্থ, লোভী, ভোগী, পাপী সে-কারণে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের জীব যেভাবে ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চনের দ্বারা কষ্ট করিয়া ঈশ্বর লাভ করিয়াছেন, কলির জীবের পক্ষে

তাহা আদৌ সম্ভব নহে। তাহা হইলে এই কলির হতভাগ্য জীবের গতি কি হইবে? সেই কারণে পরম করুণাময়ের অপার করুণা এই কলিহত জীবের প্রতি। এই করুণাধারায় কলিযুগ হইয়াছে সকল যুগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের গণনায় কলিযুগের পরমায়ু চার লক্ষ বত্রিশ হাজার সৌরবর্ষ। কলিযুগের দ্বিগুণ দ্বাপর, তিনগুণ ত্রেতা ও চারগুণ সত্যযুগের পরমায়ু। চারিযুগের সমষ্টি এক। মহাযুগ বা দিব্যযুগ। এক হাজার দিব্যযুগ ব্রহ্মার একদিন। এই এক হাজার দিব্যযুগের মধ্যে প্রতিটি যুগ থাকে এক হাজারটি করিয়া। তাহার মধ্যে একটি ব্রহ্মাণ্ডে এক হাজার হইতে মাত্র একটি দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্ (অবতারী ভগবান্) শ্রীকৃষ্ণের একবার মাত্র আবির্ভাব হয়। যে ব্রহ্মাণ্ডে যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়, তাহার পরবর্ত্তী কলিযুগে সেই ব্রহ্মাণ্ডে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব ঘটে। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য-বিগ্রহ, আর শ্রীগৌরসুন্দর উদার্য্য-বিগ্রহ। মাধুর্য্যের পরিপূর্ণতা ওদার্য্যে। একারণেই পরবর্ত্তী কলিতেই গৌরাস্তের আবির্ভাব।

বর্ত্তমানে বৈবস্বত মন্বন্তর চলিতেছে। এই মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ দিব্যযুগে দ্বাপরের শেষে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রজমণ্ডলে মথুরায় ও গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী বর্ত্তমান কলিযুগের প্রথম কলার প্রথম পাদে শ্রীগৌরাস্তের আবির্ভাব হইয়াছে। সুতরাং এই কলিতে মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা মহাভাগ্যের অধিকারী হইয়াছি।

এখন প্রশ্ন হইল কেন এই কলিতে জন্মিয়া আমরা মহাভাগ্যের অধিকারী হইয়াছি? কলিযুগের শ্রেষ্ঠতা কোথায়? আর এই কলিযুগ বা যে কলিতে শ্রীগৌরাস্তসুন্দরের আবির্ভাব হয়, সেই কলিযুগ কেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?

যুগধর্ম্মরূপে নির্দেশিত হইয়াছে,—সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চন ও কলিতে শ্রীনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন। প্রতিযুগের নিজস্ব যুগধর্ম্মের দ্বারাই ঈশ্বর লাভ সম্ভব—ইহাই শাস্ত্রের বাণী। কিন্তু বলা হইয়াছে দশ বৎসর ধ্যানের দ্বারা যে ফল লাভ হইবে, এক বৎসর যজ্ঞে ত্রেতায় সে ফলই হইবে। আবার এক বৎসর ত্রেতার যজ্ঞের সমান দ্বাপরের একমাস অর্চনের ফল। আবার দ্বাপরের এক মাসের অর্চনের যে ফল, কলিযুগের জীব-২৪ ঘণ্টা শ্রীনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনে তদপেক্ষা চরম ফললাভের অধিকারী। সুতরাং কলির যত দোষই থাকুক কলিযুগের শ্রেষ্ঠতা এইখানেই।

কিন্তু গৌরসুন্দরের আবির্ভাব যে কলিতে সে কলি কেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ? এক হাজারের মধ্যে মাত্র একটি দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র এবং পরবর্ত্তী একটি মাত্র কলিতে শ্রীগৌরচন্দ্র স্বয়ং যুগধর্ম্ম শ্রীনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন প্রচার করেন। অন্যান্য কলিতে যুগধর্ম্ম প্রচার করান অংশাবতারদ্বারা। যে কলিতে তিনি নিজে যুগধর্ম্ম প্রচার করেন সে কলিতেই তিনি উদার্য্য-বিগ্রহরূপে কৃষ্ণের মাধুর্য্যপ্রেম নিজে আস্বাদন করিয়া জগৎকে বিতরণ করেন। এখানেই মাধুর্য্যের পরিপূর্ণতা ওদার্য্যে। “আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে।” অন্যান্য কলিতে অংশাবতারদ্বারা নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন প্রচার হইলেও সেই নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনে মুক্তিচতুষ্টয় লাভ হইলেও ব্রজপ্রেম লাভ হয় না। শ্রীগৌরহরি নিজে আসিয়াই

কেবল সেই কলির জীবকে ব্রজপ্রেম দান করেন। এ কারণে যে কলিতে তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হন সেই কলিই ধন্যাতিধন্য।

শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য-বিগ্রহ ও শ্রীগৌরঙ্গ ঔদার্য্য-বিগ্রহ। মাধুর্য্যের পূর্ণপ্রকাশ ঔদার্য্যে।

“প্রেমরস নির্যাস করিতে আনন্দান।

রাগমার্গভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।।”

রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।

এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদগম।।”

সন্তোগময় কৃষ্ণচন্দ্র পরম করুণাময় ঔদার্য্য-বিগ্রহরূপে সর্বজীবকে স্বভক্তিশ্রী, যাহা কোন যুগে কোন প্রকারে বিতরিত হয় নাই, সেই উন্নত উজ্জ্বল রসের ভাণ্ডার, বিলাইতে এক দিব্যযুগে একটীমাত্র কলিতে অবতীর্ণ হয়। আর সেই ব্রহ্মাণ্ডের সেই কলির জীব সেই অনর্পিত ব্রজপ্রেম লাভে হয় ধন্যাতিধন্য। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ণনের প্রেমের বন্যায় তিনি সর্বজীবকে ভাসাইয়া লইয়া চলে। এমনই করুণা তাঁহার কলিজীবের প্রতি।

জীবের সহিত ভগবানের নিত্য সম্বন্ধ বর্তমান। সে সম্বন্ধ অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধে আবদ্ধ। সেই সম্বন্ধের চরম অবস্থায় আসিয়া যায় ব্রজপ্রেম। সেই প্রেমকে মহাবদান্যরূপে—ঔদার্য্যবিগ্রহরূপে সর্বজীবের মধ্যে বিলাইতেই নবদ্বীপ-সুধাকরের উদয়।

বর্তমান এই কলিতে মাত্র ৫১১ বছর আগে সেই গৌরচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছে। সুতরাং এই কলিতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরাও মহাভাগ্যের অধিকারী হইয়াছি। কিন্তু যদি আমরা সেই ভাগ্যের সদ্যবহার না করি তাহা হইলে আবার চরম ভাগ্যহীন বলিয়াই পরিগণিত হইব। এই কারণে শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন ‘কলি সাধু’।

আবার ঔদার্য্যবিগ্রহ কেবল কলিকেই সাধু করেন নাই। আচণ্ডলে প্রেম বিতরণ করিয়া এবং শ্রীনাম-সঙ্কীর্ণনে নারীপুরুষ ভেদ রহিত করিয়া, শূদ্র ও যোষিৎকে সাধু করিয়াছেন। যে শূদ্র ও নারীর অন্য কোন যুগে শাস্ত্র পাঠের বা শাস্ত্র-মন্ত্র উচ্চারণের অধিকার ছিল না, শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় তাহারা সকলেই একযোগে নামপ্রেমের বন্যায় ভাসিয়া চলিবার সুযোগ লাভ করিল এই কলিযুগে। সে-কারণে এই কলিযুগে—‘কলি সাধু’, ‘শূদ্র সাধু’ ও ‘যোষিৎ সাধু’। এখানেই কলিযুগের সর্বশ্রেষ্ঠতা, কলিযুগের মহত্ত্ব।

চেতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।

বিচার করিলে চিন্তে পাবে চমৎকার।।

—শ্রীমতী মায়া সরকার

# শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭০ পৃষ্ঠার পর]

আজ শ্রীকৃষ্ণষ্টমী। এর নাম বহলাষ্টমী। এই বহলাষ্টমী সম্বন্ধে বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থে যে বর্ণনা আছে সংক্ষিপ্ত সেইটা আমরা আলোচনা করে আমাদের শুভ প্রারম্ভ করছি। পদ্মপুরাণে নারদ-শৌনকাদি-সংবাদে বলছেন,—

গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে রাধাকুণ্ডে প্রিয়ং হরেঃ।

কার্তিকে বহলাষ্টম্যাং তত্র স্নাত্বা হরেঃ প্রিয়ং।

নরো ভক্তো ভবেদ্বিপ্রাস্তদ্ধি তস্য প্রতোষণম্॥

হে বিপ্রগণ! রমণীয় গোবর্দ্ধন পর্বতে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম রাধাকুণ্ড আছে। কার্তিকমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে মনুষ্য ঐ কুণ্ডে স্নান করলে হরির প্রিয় ভক্তশ্রেষ্ঠ হন। যেহেতু তাহাতে স্নান করলে হরি-পরিতোষণ হয়ে থাকে।

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণেস্তস্যাঃ কুণ্ডে প্রিয়স্তথা।

সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণেরত্যন্তবল্লভা॥

হে মনিগণ! যেমন শ্রীরাধা বিষ্ণুর প্রিয়তমা, তদ্রূপ তাঁহার কুণ্ডও প্রিয়তম। কারণ যত যত গোপী আছেন সেই সকলের মধ্যে একমাত্র রাধাই শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় বল্লভা, প্রিয়া, শ্রেষ্ঠা।

বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্যাঃ প্রতুষ্যতা।

কৃষ্ণেনান্যত্র দেবী তু রাধা বৃন্দাবনে বনে॥

ঐ পদ্মপুরাণেই শ্রীরাধিকার উপাখ্যানের অন্তে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রতি পরিতুষ্ট হয়ে তাঁকে বৃন্দাবনের আধিপত্য প্রদান করেছেন। এইজন্য শ্রীরাধা অন্যস্থানে লক্ষ্মীরূপে অবস্থান করলেও বৃন্দারণ্যে স্বয়ং শ্রীরাধিকারূপে অবস্থান করেন।

তৎকুণ্ডে কার্তিকাস্টম্যাং স্নাত্বা পূজ্যো জনার্দনঃ।

সুবোধন্যাং যথা প্রীতস্তথা প্রীতস্ততো ভবেৎ॥

কার্তিকমাসের কৃষ্ণষ্টমীতে স্নান করে জনার্দনকে পূজা করলে উত্থানেকাদশীতে পূজিত হয়ে তিনি যেমন প্রীত হন এতেও তদ্রূপ প্রীত হয়ে থাকেন।

আজ চতুর্থ শ্লোক এখানে আলোচনা করা যাচ্ছে।—

বরং দেব! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিৎ বা ন চান্যং বৃণেহং বরেশাদপীহ।

ইদম্ভে বপূর্নার্থ! গোপাল-বালং সদা মে মনসাবিরাস্তাং কিমন্যেঃ॥

মূলানুবাদ : হে (পরমদ্যোতমান) দেব! আপনি সর্বপ্রকার বরপ্রদানে সমর্থ হলেও আমি কিন্তু (আপনার নিকট চতুর্থ পুরুষার্থ) মোক্ষ বা মোক্ষাবধি (অর্থাৎ ঘনসুখ-বিশেষায়ক শ্রীবৈকুণ্ঠলোক, এমনকি, শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তির প্রকার-রূপ) অন্য কোনও বর প্রার্থনা করি না। হে নাথ! তোমার এই বালগোপাল রূপই যেন আমার হৃদয়ে নিত্যকাল প্রকটিত থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্য কিছুতে আমার প্রয়োজন নেই।

টীকানুবাদ : “এই প্রকার উৎকর্ষবিশেষ-বর্ণনামুখে স্তুতি করে নিজের অভীষ্ট-বিষয় প্রার্থনা করছেন,—‘বরং’ ইত্যাদি দুটি শ্লোকের দ্বারা। ‘দেব’!—হে পরমদীপ্তিশীল! অথবা হে মধুরক্ৰীড়া-বিশেষপর! আপনি সকল প্রকার বর প্রদানে সমর্থ হলেও, আপনার নিকট থেকে আমি চতুর্থপুরুষার্থরূপ মোক্ষ (১); অথবা ‘মোক্ষের চরম অবস্থা হতেও পরম উৎকর্ষরূপ নিরবচ্ছিন্ন ঘনীভূত সুখবিশেষ স্বরূপ সেই শ্রীবৈকুণ্ঠলোকও প্রাপ্ত হতে ইচ্ছা করি না (২); ‘অন্যঞ্চ’—এবং ‘অন্য যা কিছু শ্রবণাদি নবধা ভক্তিদ্বারা লভ্যরূপ কোনও বর’ (৩) আপনি দিতে ইচ্ছা করলেও এবং সেই সকল বর অন্যের পক্ষে বরণীয় হলেও, এই বৃন্দাবনে আমি কিন্তু তা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নহি। (‘ইহ’—এই শব্দের, শ্লোকের পরবর্ত্তী অংশের সঙ্গেও সম্বন্ধ রয়েছে)।

কেন এটা বলছেন তিনি?—তাঁর প্রার্থনায় এটা বোঝা যাচ্ছে। অধিকার অনুসারে তাঁর প্রার্থনা। শেষের দিকে একটা শ্লোকে বলেছেন তিনি—“তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ ন মোক্ষং গ্রহো মেহস্তি দামোদরেহ।” ওটা তাঁর আকাঙ্ক্ষণীয় বিষয় হলেও এখানে তিনি বালগোপালমূর্ত্তি দেখতে চাচ্ছেন। বালগোপালের উপাসক তিনি, তা বুঝা যাচ্ছে এখানে। বিশুদ্ধ বাৎসল্যভাবে তিনি বালগোপালের উপাসনায় ইচ্ছুক। সেই মূর্ত্তি দেখতে চাচ্ছেন তিনি, অন্য মূর্ত্তি দেখতে চাচ্ছেন না।

“এখানে মোক্ষাদি তিনটি বরের পর শ্রেষ্ঠত্ব স্বতঃই প্রতীতি হচ্ছে। অথচ মোক্ষ হতে বৈকুণ্ঠলোকের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীভাগবতামৃতের উত্তরখণ্ডে (১।১৪-১৫) শ্লোকে স্পষ্টরূপেই কথিত হয়েছে। এবং বৈকুণ্ঠলোক হতে শ্রবণাদি নবধা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বও ‘কামং ভব’—ইত্যাদি ভাগবতের (৩।১৫।৪৯) শ্লোকের দ্বারা সেখানেই বর্ণিত হয়েছে। যথা—

(সনৎকুমারাদি চতুঃসন প্রার্থনা করছেন,—হে ভগবন! আমরা আপনার ভক্ত জয়-বিজয়কে অভিসম্পাত করা-হেতু যে অপরাধ করেছি তাতে) আমাদের যদি অত্যন্ত নিকৃষ্ট যোনিতে, এমন কি, নরকেও জন্মগ্রহণ করতে হয়, তাতে ক্ষতি নেই,—যদি আপনার অপ্রাকৃত গুণগ্রামদ্বারা কর্ণরন্ধ্র নিত্যকাল পরিপূরিত থাকে। অর্থাৎ আমরা যদি নিত্যকাল আপনার গুণ শ্রবণ-কীর্তনের সৌভাগ্যলাভ করতে পারি।” একটা শর্ত এখানে। আমরা যে দোষ-ত্রুটি করে ফেলেছি আপনার জয়-বিজয়কে অভিসম্পাত দিয়ে তাতে আমাদের যে সাজা আপনি দেন সে সাজা আমরা মনে নিতে রাজী আছি, তাতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু যেখানে আপনার গুণগ্রাম আমরা কীর্তন করতে পারব, আপনার লীলাকথা যেখানে আমরা শ্রবণ-কীর্তন করতে পারব, সেই অবস্থাটা লাভ হলে আমাদের যথেষ্ট।

যদি গমনমধুস্তাদ্ কৰ্মপাশানুবদ্ধো

যদি চ কুলবিহীনে জায়তে পক্ষিকীটে।

ক্রিমিশতমপি গত্বা জায়তে চাতুরাষ্ট্রা

ভবতু মম হৃদিস্থে কেশবে ভক্তিরেকা।।

ঐ নিষ্ঠা দেখাচ্ছেন। আমার কর্মফলানুসারে আমার যে সাজা হউক না কেন, আমি মন্যকুলে জন্মগ্রহণ না করে পশু-পক্ষীকুলে জন্মগ্রহণ করি, কৃমি-কীট কুলে জন্মগ্রহণ করি, বৃক্ষ-তৃণ-গুল্ম-লতারূপে জন্মগ্রহণ করি, তোমার স্মৃতি যেন আমরা বহন করতে পারি—এটা হল বড় কথা। তাহলে আমার কোনটাতে আপত্তি নেই। সব সাজা মেনে নিচ্ছি। শ্রীভাগবতামৃতের উত্তরখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের ১৪-১৫ যে শ্লোকটা সে সম্বন্ধে বলছেন,—

বৈকুণ্ঠং দুর্লভং মুক্তৈঃ সান্দ্রানন্দ-চিদাত্মকম্।

নিষ্কামা যে তু তত্তত্তা লভন্তে সদা এব তৎ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণপাদাজ-সাক্ষাৎসেবা-সুখং সদা

বহুধানুভবন্তস্তে রমন্তে ধিকৃতামৃতম্॥

অর্থাৎ “যাঁরা কামনাশূন্য হয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, সে-সকল নিষ্কাম ভক্তগণ সদাই বৈকুণ্ঠ-পদ লাভ করে থাকেন। এই বৈকুণ্ঠ-ধাম ঘনীভূত আনন্দ ও চিৎ-স্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মাধন-মূর্তি। সেই বৈকুণ্ঠ মুক্তগণেরও দুর্লভ। (তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মৈক্যবাদী মুক্তাভিমানিগণ কখনই সেই বৈকুণ্ঠ-ধাম প্রাপ্ত হন না)।” চাইলে কি হবে, সে অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কাদের?—যারা ব্রহ্মৈক্যবাদী। জীবব্রহ্মৈক্যবাদী যারা—ভগবানের সঙ্গে মিশে যাব, ভগবান্ হয়ে যাব, ভগবানের সিংহাসন দখল করব—এমন চিন্তাভাবনা যাদের সেই সকল Anarchist রা।

“নিষ্কাম-ভক্তগণ সেই বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের সাক্ষাৎ সেবা-সুখ সর্ব্বদা নানাপ্রকারে অনুভব করেন। তাঁদের অধিকার অনুসারে, যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন রসেতে সেখানে সেবা প্রাপ্ত হন। তাঁর সঙ্গে বিবিধ ক্রীড়া করে আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হন। পরমানন্দধন-হেতু এই সেবা-সুখের নিকট অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ-সুখ অতীব তুচ্ছ বলে মনে হয়।” যে মোক্ষ সুখকে এখানে খুব বড় বলে মনে করছে, সেটাও সেখানে তুচ্ছীকৃত। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম দিকে এক শ্লোকে বলছেন—সব থেকে বড় কপটতা হল মুক্তিকামনা, মোক্ষবাঞ্ছা।

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।

যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্বান॥

অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কথা! মুক্তি চাইতে গিয়ে যদি আমি ভগবানকে হারিয়ে ফেলি, তাহলে সে মুক্তি না চাওয়া ভাল। সেইজন্য ভক্তকে ভগবান্ মুক্তি দিতে চাইও নিচ্ছেন না।

“দীয়মানং ন গৃহুস্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।”

সেটা বলছেন এখানে। আমরা তোমার একান্ত ভক্ত জয়-বিজয়কে অভিসম্পাত করে ফেলেছি, এর জন্য তুমি আমাদের যে সাজা দাও না কেন, যে কোন কুলে আমাদের জন্ম হোক না কেন, তোমার স্মৃতি যদি আমরা বহন করতে পারি তাহলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমরা এইটাই মেনে নিচ্ছি “অর্থাৎ আমরা যদি নিত্যকাল আপনার গুণ শ্রবণ-কীর্তনের সৌভাগ্যলাভ করতে পারি।” ‘নিত্যকাল’

শব্দটা আছে, আর শ্রবণ-কীৰ্ত্তনের সৌভাগ্যটা সবসময় দরকার। মাঝখানে বাদ গেলে হবে না। অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় তার স্রোতটা থাকতে হবে। যখনই বাদ হয়ে যাবে তখনই সব ভুল হয়ে গেল। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাকথা থেকে যখনই আমরা দূরে সরে থাকব, তখনই আমাদের সবথেকে বড় বিপদ। চরম দুর্ভাগ্য সেইটাই। সেই কথাই ভাগবতে পরিস্কারভাবে বলেছেন,—‘ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশস্ত স্যাদীশাদপেতস্য।’ দ্বিতীয়াভিনিবেশ কাকে বলছে?—ভগবান্ এবং ভগবৎ-সম্পর্কিত বস্তু ছাড়া অন্য বস্তুতে অভিনিবেশ, আসক্তি। ‘ইশাদপেতস্য’—ভগবান্ থেকে দূরে সরে যাওয়া, ভগবদ্বিরোধী হয়ে যাওয়া, ভগবানকে ভুলে যাওয়াকে বলছে ভগবদ্বিরোধী ভাব। ভগবানকে ভুলে থাকা সবথেকে বড় বধুন্নার বিষয় আমাদের।

“শ্রবণাদি নবধা ভক্তির যথাযথ আচরণ করে সিদ্ধি (কৃতার্থতা বা প্রেমভক্তি) লাভ করলে পর (নিজ-কর্মফলে) নরকাদি যে-কোনও স্থানই অবস্থান হউক না কেন, সকল স্থানই তাঁর পক্ষে বৈকুণ্ঠ-বাস বলে মনে হয়।” ভক্তের একবার উদ্ধগতি লাভ হলে আবার নিম্নগতি হয় নাকি? বৈকুণ্ঠ গতি লাভ করবার পর আবার নিম্নগতি?—সম্ভাবনা নেই। বৈকুণ্ঠগতি যার হয়ে গেছে, তার আর ওখান থেকে পতন নেই, ওখান থেকে Diversion নেই। তাহলে একথা আসবে কেন? এটা উপমা দিয়ে বলছেন। যদি আমাদের এইরকম হয়, ভগবান্ যদি আমাদের এইরকম সাজা দেন, তাহলেও আমরা এটা মেনে নেব। শুধু তাঁর কাছে একটা প্রার্থনা করব—ঠাকুর, তোমার নাম যেন না ভুলি, তোমাকে যেন না ভুলি। তোমাকে যেন বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে না দেই—এই প্রার্থনাটুকু ভক্ত রাখেন। এটা উদাহরণস্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। যাঁর বৈকুণ্ঠগতি হয়েছে তাঁর আর কখনও অধোগতি হয় না।

“তাহলে কি বর চাচ্ছে?—তদুত্তরে বলছে—হে নাথ! এই বৃন্দাবনে আপনার কথিত এই গোপাল-বালক-রূপটি যেন সর্বদাই আমার মনে জাগরুক থাকে, ব্যাবির্ভূত থাকে, এইটাই তাঁর বিশেষ প্রার্থনা। আপনি অন্তর্যামী, সর্ববৃহৎপ্রভৃতি রূপে (আমার) অন্তরে সর্বদা অবস্থিত, বাইরে সাক্ষাৎ দর্শনের মত অন্তরেও যেন সর্বদা সর্বাস্থের সৌন্দর্য্যাদি প্রকাশের দ্বারা আপনি প্রকটিত থাকেন।” ভিতরে বাইরে সবসময় আপনার দর্শন পাই যেন। আমি শুধু অন্তরে দর্শন পাব, বাইরে দর্শন পাব না, তা হবে না, আমাকে সবসময় দর্শন দিতে হবে। অন্তর্যামী তুমি ত’ অন্তরে আছ, বাইরে তাহলে দেখা দিবে না কেন? আমি কি অন্যায় করেছি? সবসময় তোমার দর্শন চাই। এক মুহূর্তও ছাড়া চলবে না। গোপীগণের উক্তির মত খানিকটা।

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবুযায়িতম্।

শূন্যায়িতং জগৎ সর্বত্র গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥

নিমেষ হইল যুগের সমান। গোপীগণ বলছেন বুঝতে পারছি না বিধাতা কেন এই পলক সৃষ্টি করেছেন? নির্নিমেষ-নেত্রে ভগবানকে দর্শন করব, দর্শন করব তাঁর রূপমাধুরী। সেখানে আবার বিধি পলক সৃষ্টি করেছেন! বিধিকে নিন্দা করছেন। কোন অবস্থা হলে এ ধরনের উক্তি আসে—এটাও বুঝবার বিষয়। অর্থাৎ ভগবানকে ছেড়ে



কখনও চলবে না আমাদের, থাকা উচিত নয়—সেই কথাটা বিশেষ করে বলছেন আমাদের। বিশেষ অধিকারী ব্যক্তির কাছে ভগবান্ সবসময় আছেন। তিনি কখনও ভগবান্ ছাড়া নন। তিনি কখনই ভক্তিছাড়া নন, তিনি কখনই ভক্ত ছাড়া নন।

“কৃষ্ণ স্বয়ং যেন তাঁর ভক্তকে সম্বোধন করে বলছেন,—ওহে! উক্ত মোক্ষাদি (তিনটি বরও সামান্য নহে) পরম উপাদেয়রূপেই সকলে গ্রহণ করে থাকে; অতএব তুমিও তাই গ্রহণ কর। যখন সবাই এটা গ্রহণ করছে তখন তোমার এটা গ্রহণ করতে আপত্তি কি? ভগবান্‌ই পূর্বপক্ষ করে বলছেন। তদুত্তরে বলছেন,—‘কিমন্যে?’—অন্য মোক্ষাদি বর-ত্রয়ে আমার প্রয়োজন কি?” আমি মোক্ষ চাই না। এই মোক্ষ দিয়ে কি হবে? যে মোক্ষ পেলে তোমাকে ভুলে যাব, অহঙ্কার এসে যাবে আমার, দাস্তিকতা এসে যাবে আমার, ও মোক্ষ আমি চাই না। যে মোক্ষের দ্বারা তোমাকে আমি ভুলে যাব, সে মোক্ষের আমার কোন দরকার নেই; যে ঐশ্বর্য্যদ্বারা তোমাকে ভুলে যাব, আমার অহঙ্কার, অভিমান এসে যাবে, সে ঐশ্বর্য্য চাই না আমি।

প্রভু তব পদযুগে মোর নিবেদন।

নাহি মাগি দেহসুখ, বিদ্যা, ধন, জন।।

নাহি মাগি স্বর্গ আর মোক্ষ নাহি মাগি।

না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি।।

তাহলে ভক্ত কোনটাই চাচ্ছেন না। তাঁর কাছে একনিষ্ঠা ভক্তিই প্রার্থিত বিষয়, অন্য কিছু নহে। আর সব তিনি বাদ দিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু এটা প্রার্থনা করতে গিয়ে ভগবান্‌ কাকেও প্রেমভক্তি দান করছেন, তার কি আর অন্য কোন ব্যবস্থা—থাকা, খাওয়া, পরার ব্যবস্থা রাখছেন না? ওটা ত’ এমনিতেই আসে, আসবে।

“সব বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।”

পরধর্ম্ম কাকে বলে?—যত রকম ধর্ম্মের কথা শাস্ত্রে বলা আছে—দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, নৈমিত্তিক ধর্ম্ম সব। তার ভিতরে সবথেকে বড় ধর্ম্ম কি?—‘পরো

ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।’ ভগবানে ভক্তিই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আর পরধর্ম্মের একটা মানে করা হয়েছে—অপরের ধর্ম্ম। সেটা কি রকম? সেটাও কৃষ্ণ অর্জুনকে বলতে ছাড়েন নি। ‘স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ’ তার মানে কি? অনেকে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন,—তুমি ক্ষত্রিয়, ক্ষাত্রনীতি ক্ষাত্রধর্ম্ম সংরক্ষণ কর। এটা ঠিক অর্থ নয়। ‘স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ’ মানে কি?—আত্মধর্ম্মে অবস্থিত হয়ে নিধনও ভাল আত্মধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য। আর পরোধর্ম্ম মানে অন্যায় ধর্ম্ম। ভয়াবহ অন্যায়ধর্ম্মে তোমার কোন কল্যাণ নেই। সে অবস্থায় যদি তুমি মারা যাও তাহলে তোমার কোন সদগতি হবে না। কিন্তু আত্মধর্ম্মে স্থিত হয়ে যদি তুমি মৃত্যুবরণ কর, তাহলে তোমার সদগতি। আমার একান্ত শ্রদ্ধার, নমস্য Guardian হয়ত’ দেহরক্ষা করলেন। শ্রদ্ধার সময় (শ্রদ্ধা মানে যাকে বলব আসুর শ্রদ্ধা বা রাক্ষস শ্রদ্ধা) মন্ত্রপাঠ করাচ্ছেন বামনঠাকুর—

‘এতে প্রেততর্পণকালে ভবন্তিঃ।’ কিন্তু আমার অভিভাবক-অভিভাবিকা তাঁরা সব প্রসাদভোজী ছিলেন। তাঁরা নিত্য নামকীর্্তন করতেন, গ্রন্থপাঠ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতেন। তাঁদের দেহান্তের পর তাঁরা ভূতপ্রেত হয়ে গেছেন, তাঁদের সেই প্রেতাঙ্গা থেকে রক্ষা করবার জন্য আমি শ্রাদ্ধ করতে বসেছি। এ আবার কি? এ বিচার চলে না। সেইজন্য বৈষ্ণবস্মৃতি, সাত্ততস্মৃতিতে ব্যবস্থা আছে—ভগবানের প্রসাদ-নৈবেদ্য দিয়ে তাঁদের পরিতুষ্ট কর। এতে সবদিকেই সুবিধা, কোনদিকে অসুবিধা নেই। আর তাঁরা দেহান্তের পর সব ভূত-প্রেত হয়েছেন—এটা চিন্তা করা ত’ মহা অনর্থের ব্যাপার। আমার Guardianরা সদাচারী, সদুপাসক, তাঁরা মৃত্যুর পর ভূত-প্রেত হতে যাবেন কেন? আর এটাই বা কি জাতীয় শ্রদ্ধাঙ্গাপন—যার নাম শ্রাদ্ধ। এ মতবাদ খণ্ডন করেছেন।

‘বিশ্বেশ্বর্নিবেদিতাম্নৈন যষ্টব্যং দেবতান্তুরম্।’

ভগবানের প্রসাদ দিয়ে তাঁদের সন্তুষ্ট করতে হবে। তাঁরা ত’ উদ্ধর্দৈহিক গতি লাভ করেছেন নিশ্চয়ই। সব মাতাপিতা ত’ আর সদাচারী নন। সেক্ষেত্রে যদি ধরে নেওয়া যায় তাঁদের অধোগতি হয়েছে, তাহলেও মহাপ্রসাদ দিলে তাঁরা উদ্ধর্দৈহিক গতি লাভ করবেন। কোনদিকে লোকসান নেই। সেই কথা বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থ হরিভক্তি-বিলাসে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বলছেন আমি সদগতি চাই। সদগতি কি?—ভগবানের স্মৃতি, ভগবানের ধ্যান-ধারণা, ভগবানের সাধন-ভজন—এটাই আমার কাম্য। ভগবানে ভক্তিবিশদানই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

“এতাবান্বে লোকেহস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃজ্জ।”

এও ভাগবতের শ্লোক। একই কথা এই শ্লোকে। মনুষ্যগোষ্ঠীব, মনুষ্যসমাজের পরধর্ম কি?—‘ভক্তিযোগে ভগবতি তন্মাম-গ্রহণাদিস্তি।।’—ভগবানে ভক্তিযোগ-বিশদান এবং তাঁর শ্রীনাম-কীর্্তন নিরন্তর। সব জায়গায় একই কথা, কথার একটুও এদিক ওদিকে নেই। যেখানে বর্ণনার মধ্যে এসেছে সেখানে একই কথা এসেছে। একই ব্যক্তি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাাস ত’ বেদ বিভাগ করেছেন। গীতার মধ্যে বলেছেন,—

পত্রং পুষ্পং ফল তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃত্যশ্রামি প্রযতাত্ননঃ।।

ঠিক সেই একই শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৮০শ অধ্যায়ে কৃষ্ণ-সুদামা-উপাখ্যানে এসেছে। এদিক-ওদিক হবে না। তত্ত্বসিদ্ধান্ত এমন জিনিস ওটা গুলিয়ে যায় না। ওটা উপর উপর জল খেতে হয় না। নীচের জলে তলানি পড়ে, কিন্তু তত্ত্বসিদ্ধান্তে তলানি পড়ে না। ওটা সবসময় স্বচ্ছ, পরিষ্কার, ওর ভিতরে কোন কষ্টকল্পনার স্থান নেই। অনেকে উপদেশ দিয়েছেন—জল খাবে ত’ উপর উপর খাও, নীচে ডুবে যেওনা, তাহলে সব জল গুলিয়ে যাবে। ভক্তিতত্ত্বসিদ্ধান্ত এরকম গুলিয়ে যাওয়ার বস্তু নয়। ওটা Everlasting, unchanging। সবসময়ই একই অবস্থাপ্রাপ্ত, বিকারগ্রস্ত হয় না। এর মধ্যে কষ্টকল্পনার স্থান কোথায়? এদিকে ভক্তি ভক্তি মুখে বলছি, কাজের বেলায় তাতে বিশ্বাস নেই। তার কি শক্তি, ক্ষমতা—সেটা নিয়ে

শাস্ত্র বিচার করেছেন। ওটা বুঝি না। ক্রেশরী, শুভদা, লঘুতা, মোক্ষদা, সুদুর্লভা, সান্দ্রানন্দ, বিশেষাত্মা, কৃষ্ণকর্ষিণী—এই যে ভক্তির বৈশিষ্ট্য বলছেন, কে বুঝি আমরা, মাথায় ঢোকে না আমাদের। ‘শ্রীকৃষ্ণকর্ষিণী চ সা’—ভক্তি মহাদেবী শ্রীভগবানকে আকর্ষণ করে। আর কেউ পারে না। তাঁর আনুগত্য দরকার আছে। যে কোন বিষয়ে আমাদের পরিপূর্ণতা লাভের জন্য—সাধনাস্থের পরিপূর্ণতা লাভের জন্য ভক্তির আশ্রয় অবশ্যস্বাভাবী অপরিহার্য। এ কথা শাস্ত্র বলছেন। (ক্রমশঃ)

### স্বধামে শ্রীযুক্তা আরতি দেবী

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের পরম পূজনীয়া শ্রীযুক্তা আরতি দেবী (ভট্টাচার্য্য) গত ১৮ই আষাঢ় ১৪০৪ বঙ্গাব্দ, ইং ৩রা জুলাই ১৯৯৭, বৃহস্পতিবার কৃষ্ণ-চতুর্দশী-তিথিতে বেলা ১১-১৫ মিনিটে স্বধামে গমন করিয়াছেন।



তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের উপস্থিতিতে শিলিগুড়ি মিলনপল্লীস্থ শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে বিশেষ সমারোহের সহিত তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য অনুষ্ঠানাদি সুসম্পন্ন হয়।

অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার এক অজ্ঞাত গ্রামে জমিদার বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতার কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন তিনি। শৈশবে মাতৃবিয়োগ হওয়ায় এবং জমিদার-বাড়ীর রক্ষণশীলতার জন্য উচ্চশিক্ষা লাভ না করিতে পারিলেও অসাধারণ মেধা ও জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন তিনি। দেশভাগের পর তিনি তাঁর স্বামী শ্রীসত্যকিন্ধর ভট্টাচার্য্যের সহিত পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা বর্তমান রহিয়াছেন।

পতিবিয়োগের পর নিজচেষ্ঠায় রায়গঞ্জ পৌরসভায় একটা চাকুরী গ্রহণ করেন সংসারের অস্বচ্ছলতার হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য। একরকম ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় দুই পুত্রকে শিক্ষিত করাইয়া সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত করেন এবং কন্যাদ্বয়কে উপযুক্ত পাত্রস্থ করেন।

বাল্যকাল হইতে তিনি ধর্মপ্রাণা ছিলেন। ভগবদ্ভিষ্মায় তিনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমন্ত্বেদান্ত বার্মন গোস্বামী মহারাজকে গুরুরূপে বরণ করেন এবং তাঁহার কৃপা লাভ করত শ্রীহরিভজনে মনোনিবেশ করেন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবা ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। তিনি সর্বদা নিয়মপূর্বক শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও শাস্ত্রালোচনা করিতেন। শ্রীসমিতির প্রকাশিত ‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা’ পাঠ করিবার জন্য তিনি শ্রীপত্রিকার আজীবন সদস্যপদও গ্রহণ করিয়াছিলেন। “বৈষ্ণব দেখিয়া, চরণে পড়িব, হৃদয়ের বন্ধু জানি।”—এই মহাজন-বাক্য ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। সতীর্থ গুরুভ্রাতাগণকে তিনি নিজ সন্তানাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন।

শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার দিনেও তিনি যথানিয়মে তাঁহার সেবিত শ্রীগোপালের জন্য ভোগ রন্ধন করেন। কিন্তু ভোগ নিবেদন আর তিনি করিতে পারেন নাই। মৃত্যুর পূর্বে হাতজোড় করিয়া শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বার বার প্রণাম জানান এবং শ্রীহরিনাম করিতে করিতে স্বধামে গমন করেন।

তাঁহার ইচ্ছানুসারে পুত্রগণ তাঁহাকে লইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ স্বহস্তে তাঁহার সৎকারাদি ক্রিয়া করেন। আমরা তাঁহার সেবাময় জীবনের আদর্শ ক্রিয়াকলাপ আর প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না। তাঁহার শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার জ্বলন্ত আদর্শ আমাদের পথ প্রদর্শক হউক এবং আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করুক। তাঁহার পুত্রকন্যাগণ তাঁহাদের মায়ের সেবাপ্রাণ জীবনের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলুক—ইহাই শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা।

—জনৈক বিরহী

## প্রাচীন নদীয়া

নিত্যকালই নিত্যস্বরূপে রাজিতেছ মায়াপুর গো

রাজিতেছ মায়াপুর!

তব বক্ষসি বাক্ষারে সদা শ্রীমন্মহাপ্রভুর গো

কীর্তন সুমধুর।

করি কীর্তন বিধি দুর্লভ পরমামৃত ধন গো

হরিনাম মহাধনে

রাধিকার ভাব অঙ্গিকারিয়া ব্রজের নবমদন গো

বিলাইয়া জগজনে!

তোমার বক্ষে পতিতের ধন কাঙ্গালের ধন কালা গো

কাঙ্গালের ধন কালা

সন্ন্যাসিরূপে অবতার হ'ল জুড়া'তে জগৎ জ্বালা গো

বিলা'তে ভক্তি ডালা।

ঝাঁজ, মৃদঙ্গ সুরমুখরিত মায়াপুর সদা তুমি গো,

মায়াপুর সদা তুমি!

বৃন্দাবনের অভেদতত্ত্ব “বিনোদের” হৃদিভূমি গো,

সম্বন্ধে আমি নমি।

কালের কুটিল চক্রাবর্তে কত না কাণ্ড ঘটে গো,

কত না কাণ্ড ঘটে।

‘ঠিক’ যাহা তাহা চিরকাল ‘ঠিক’ ইহা সে সত্য বটে গো,

সর্ব্ব শাস্ত্র রটে।

আদিম নদীয়া তুমি মায়াপুর তুমি সে প্রাচীন নদে গো,

তুমিই সত্য ন'দে!

তবাস্তিত্ব বিপ্রলিপ্সু অন্ধবিদ্যা-বিদে গো

জানে না—মরি সে খেদে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি বহু প্রামাণিক পটে গো

বহু প্রামাণিক “২ পটে।

তোমার প্রমাণ বহু আঁকা আছে দেখে না কেন তা শঠে গো,

বোঝে না কেন তা হঠে?

শাস্ত্রে বলিছে ওপারে কুলিয়া নদে তার পরপারে গো,

কুলিয়ার পরপারে!

সংখ্যা অতীত প্রমাণ রাজিছে মায়াপুর চারিধারে গো

মুঢ় জীবে বোঝাবারে।

বল্লালদিঘী কাজীর ভবন রাজপ্রাসাদের স্তূপ গো,

রাজপ্রাসাদের স্তূপ,

মায়াপুরেই ত' বিদ্যমান্ তা দেখে কে সৃষ্টরূপ গো

ডোবা সবে মায়াকূপ!

কৈতববাদ শুদ্ধভকতে বিশ্বাস নাহি করে গো,

বিশ্বাস নাহি করে!

কৈতবাচারী নরের সকাশে ভক্তে মৌন ধরে গো,

দর্শনও পরিহরে।

অনেকরূপেই অনেকে করিছে অনেক মিথ্যাজাল গো,

সৃজিছে মিথ্যাজাল,

সত্য বস্তু আচ্ছাদিতে কি খাটিবেক চতুরাল গো,

হোকনা এ কলিকাল!

নিত্যবস্তু নিত্যকালই নিত্যভাবেই রাজে গো,

নিত্যভাবেই রাজে!

তার মাঝে এনে ভেজাল মিশালে সে কি কখনও সাজে গো,

টিকিতে পারে না তা যে!

তোমার ধূলার কত গুণ ওগো মায়াপুর, মায়াপুর গো,

মায়াপুর, মায়াপুর!

প্রার্থি সতত বিধি শঙ্কর তব কণা রেণুর গো,

সুধাদপি সুমধুর!

তোমার বিন্দু রেণুর লাগিয়া কত মুনিগণ বনে গো,

কত মুনিগণ বনে।

যুগ যুগ ধরি করে তপস্যা না লভে এ ধূলি ধনে গো,  
 রহয়ে ক্ষুধা মনে!  
 তোমারি ওপারে ঐ কুলিয়ার নানামতবাদী দল গো  
 হরির বিমুখ দল!  
 অহেতু করুণাসিন্ধু “গোরার” কৃপা লভে সুরসাল গো,  
 হিংসাদির বদল!  
 নানা জনে গাহে নানারূপে তোমা নানান্ স্থানেতে লয় গো,  
 নানাস্থানে তোমা লয়!  
 একস্থানে আছে চিরকাল আর স্থানে তাকি রয় গো,  
 কভু তা নাহিক হয়!  
 গৌরভক্ত নামধেয় বটে গৌরাভক্ত তারা গো,  
 গৌরাভক্ত তারা!  
 যে-সকল জন মায়াপুর-ধামে সদা বিশ্বাসহারা গো  
 নূতনে প্রয়াসী যারা!  
 গলে দিয়া বাস কহে তব দাস আশাপাশ সব ছিড়ে গো  
 অন্যাভিলাষ ছেড়ে!  
 তব পাদমূলে থাকিবারে দাও ক্ষুদ্র পত্রনীড়ে গো,  
 গাহি তোমা বিশ্ব বেঁড়ে!  
 সেও মোর ভাল যদি কাছে রাখ অতিহীন কীট কোরে গো,  
 অতিহীন কীট করে!  
 স্বসৌভাগ্য সতত ভাবিব পরমানন্দ ভরে গো,  
 রব ধূলি লীন পড়ে।।

—শ্রীনারায়ণ দাস চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে

## শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব

শ্রীগোলোকবিহারী হরি অনন্তলীল, পূর্ণ-মাধুর্য্যমণ্ডিত। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অজ অর্থাৎ জন্মরহিত হইয়াও স্বীয় যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া গোলোক হইতে এই ভুলোকে প্রতিযুগেই অবতীর্ণ হন। তাঁহার জন্ম এবং কৰ্ম্ম সবই দিব্য, অলৌকিক ও অধোক্ষজ অর্থাৎ সাধারণ বদ্ধজীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহে।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপ্রাবৃত।

সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজ মে মনসা বিধীয়তে॥

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জড় জগতের প্রকৃতিজাত কোন বস্তুর অন্তর্গত তত্ত্ব বা কালক্ষোভ্য পরিণামশীল বস্তু নহেন। সেই নিখিল ভুবনমঙ্গলময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্ম-জয়ন্তী উৎসব সমগ্র বিশ্বের মানব আত্মমঙ্গল লাভের জন্য নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র মেঘালয় প্রদেশান্তর্গত তুরা সহরস্থিত শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও বার্ষিকী জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ শুভাগমন করেন।

গত ৩২শে শ্রাবণ ১৪০৪ বঙ্গাব্দ (ইং ২৪।৮।৯৭) রবিবার অধিবাস-দিবসে সেবকগণ শ্রীমঠের প্রবেশদ্বার ও শ্রীমন্দির পূর্ণকুন্তসহ কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লব, পুষ্প ও রঙিন পতাকার দ্বারা সুসজ্জিত করেন। সন্ধ্যায় আরতি ও পরিক্রমাস্তে শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ অধিবাস কীর্ত্তনপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যামুখে শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাসের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করেন।

১লা ভাদ্র, সোমবার প্রাতে তুরা সহরের বিভিন্ন রাজপথে হৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতি যোগে সুসজ্জিতভাবে নগর-সঙ্কীর্তন করা হয়। পরিক্রমাস্তে সারাদিন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী পারায়ণ করা হয়। মৃন্ময়ী মূর্ত্তির সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা,



ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বিবিধ লীলাবলীর প্রদর্শনীও বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছিল।

সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় আয়োজিত ধর্মসভায় ব্রহ্মচারিগণ সুললিতকণ্ঠে মহাজন পদাবলী কীর্তন করেন। কীর্তনান্তে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য মহারাজের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি Mr. T.K. Das (Ex. Principal of Tura Govt. College), শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমৎ বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমৎ যতি মহারাজ, শ্রীমৎ বোধায়ন মহারাজ, শ্রীরামানন্দ ভট্টাচার্য (Ex. Principal Tura Govt. College), Prof. K. P. Chowdhury (Tura Govt. College) প্রভৃতি বক্তাগণ 'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অবতারবাদ' বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন। অস্ত্র পর সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য মহারাজ তত্ত্বসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

২রা ভাদ্র, মঙ্গলবার অর্থাৎ শ্রীনন্দোৎসবের দিন বেলা ১২টা হইতে বৈকাল ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত আহুত, অনাহুত ও রবাহুত প্রায় ত্রি-সহস্রাধিক ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ দান করিয়া তাঁহাদের পারমার্থিক ভজনানুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়।

সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় মহাজন-পদাবলী কীর্তনদ্বারা সভার কার্য শুরু হয়। প্রধান অতিথি শ্রীরামনরেশ পাণ্ডে (প্রধান শিক্ষক, তুরা হিন্দী হাইস্কুল), শ্রীমদ্ আচার্য মহারাজ, শ্রীমৎ যতি মহারাজ, শ্রীমৎ বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমৎ বোধায়ন মহারাজ প্রভৃতি বক্তাগণ 'শ্রীচৈতন্যদেব এবং সনাতন ধর্ম' সম্পর্কে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর সভাপতির ভাষণে শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তপূর্ণ সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন।

৩রা ভাদ্র, বুধবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে শ্রীসমিতি-কর্তৃক পরিচালিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বিদ্যাপীঠের (English Medium School) ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীবৃন্দ আবৃত্তি, নৃত্য-গীতাদি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। পরে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীগণকে পুরস্কৃত করা হয়।

প্রত্যহ শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ দাসাধিকারী রামায়ণ গান পরিবেশন করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠের দিব্যসত্রয়ব্যাপী এই বার্ষিকী অনুষ্ঠানে সমিতির সেবকবৃন্দের সেবাপ্রচেষ্টা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা বিশেষ প্রশংসনীয়।

বলাবাহুল্য, শ্রীসমিতির প্রধানকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও অন্যান্য সকল শাখামঠসমূহে ও এই শ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

—নিজস্ব সংবাদ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগোরাধো জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।  
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিরশৃগ

অন্য ধর্ম স্তূরুপে পালে যেই জন  
হরি-কথায় রতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

৪৯শ বর্ষ }

২ কেশব, বাসুদেব, ৫১১ শ্রীমৌর্য  
৩০ কার্তিক, ১৪০৪, ইং ১৬/১১/৯৭

{ ৯ ম সংখ্যা

সানুবাদং

## শ্রীশ্রীদয়িতদাসদশকম্

[ ত্রিদিগ্ভিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক-শ্রীধর-মহারাজ-কৃতম্ ]

নীতে যস্মিন্ নিশান্তে নয়নজলভরেঃ স্নাতগাত্রাববুদানাং  
উচ্চৈরুৎক্রেণশতাং শ্রীবৃষকপিসুতয়াধীরয়া স্বীয়গোষ্ঠীম্ ।  
পৃথ্বী গাঢ়ান্ধকারৈর্হতনয়নমণীবাবৃতা যেন হীনা

যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিস্করোহয়ম্ ॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীবৃষভানুনন্দিনী নিশান্তকালে লক্ষ লক্ষ বিলাপকারী, নয়নধারাসিঞ্চিত-গাত্র  
জনগণের মধ্য হইতে যাহাকে অধীরভাবে নিজ গোষ্ঠীমধ্যে আকর্ষণ করিলে যাহাকে

হারাইয়া এই পৃথিবী হতনয়নমণিজনের ন্যায় (সরস্বতী ঠাকুরের গুঢ় নাম “নয়নমণি”) গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল,—হে (প্রভুদর্শনবিরহিত) আমার দীন নয়ন! (পক্ষান্তরে হে দীনোদ্ধারণ! অথবা সঙ্গে না লইবার জন্য করুণাতে কৃপণতাপ্রকাশকারী হে নয়ন নামক প্রভুজন) ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিস্করকে সেইখানে লইয়া চল।।১।।

যস্য শ্রীপাদপদ্মাং প্রবহতি জগতি প্রেমপীযুষধারা  
যস্য শ্রীপাদপদ্মচ্যুতমধু সততং ভৃত্যভৃঙ্গান্ বিভক্তি।  
যস্য শ্রীপাদপদ্মাং ব্রজরসিকজনো মোদতে সম্প্রশস্য  
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিস্করোহয়ম্।।২।।

যাঁহার পাদপদ্ম হইতে জগতে প্রেমসুধানদী প্রবাহিত হইতেছে, যাঁহার পাদপদ্ম-চ্যুত মধু নিরন্তর পান করিতে করিতে অনুচর-মধুকরগণ নিজ নিজ জীবন ধারণ করিতেছে, ব্রজের বিশ্রুত-রসান্ত্রিত জন যাঁহার পাদপদ্মের প্রশংসা করিতে সুখবোধ করিয়া থাকেন— হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিস্করকে সেইখানে লইয়া চল।।২।।

বাৎসল্যাং যচ্চ পিত্রো জগতি বহুমতং কৈতবং কেবলং তৎ  
দাম্পত্যং দস্যুতৈব স্বজনগণ-কৃতা বন্ধুতা বঞ্চনেতি।  
বৈকুণ্ঠস্নেহমূর্ত্তেঃ পদনখকিরণৈর্যস্য সন্দর্শিতোহস্মি  
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিস্করোহয়ম্।।৩।।

মাতাপিতার বাৎসল্য বলিয়া জগতে যাহা বহুমানিত, (হরিভক্তির বাধারূপে) তাহা ছলনা মাত্র, সমাজপ্রচলিত তথাকথিত পবিত্র দাম্পত্য-প্রেম (উভয়ের সম্ভাব্য নিরুপাধিক প্রেমসম্পদ অর্জনের উদ্যমলুপ্তনকারী আসুরিক প্রচেষ্টারূপে) দস্যুতা ভিন্ন কিছুই নয় এবং বন্ধুতা বঞ্চনামাত্র—এই সমুদায় বিচার যে অপ্রাকৃত স্নেহময় বিগ্রহ মহাপুরুষের পদনখকিরণের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে—হে দীন নয়ন, ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিস্করকে সেইখানে লইয়া চল।।৩।।

যা বাণী কণ্ঠলগ্না বিলসতি সততং কৃষ্ণচেতন্যচন্দ্রে  
কর্ণক্ৰোডাজ্জনানাং কিমু নয়নগতাং বৈ মূর্ত্তিং প্রকাশ্য।  
নীলাদ্রীশস্য নেত্রার্পণভবনগতা নেত্রতারাভিধেয়া  
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিস্করোহয়ম্।।৪।।

শ্রীকৃষ্ণচেতন্যচন্দ্রের কণ্ঠস্বররূপে যে বাণী সর্বদা জনগণের কর্ণক্ৰোড়ে বিলাস করিতে, তিনিই কি কর্ণ হইতে নয়নগোচর মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া শ্রীনীলাচলচন্দ্রের

(রথযাত্রাকালে) নয়নার্পণরূপ প্রসাদপ্রাপ্ত প্রাসাদে প্রকটিত হইয়া “নয়নমণি” নামের সার্থকতা প্রদর্শন করিতেন? হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই ভৃত্যকে সেইখানে লইয়া চল।।৪।।

গৌরেন্দোরস্তশৈলে কিমু কনকঘনো হেমহাজ্জম্বুনদ্যা  
আবির্ভূক্ত প্রবৰ্ণৈর্নিখিলজনপদং প্লাবয়ন্ দাবদধ্বম্।  
গৌরাবির্ভাবভূমৌ রজসি চ সহসা সংজুগোপ স্বয়ং স্বং  
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিস্করোহয়ম্।।৫।।

শ্রীভাগবতোক্ত জম্বুনদের নির্মল স্বর্ণময় জল আকর্ষণ করিয়া কি এই কাঞ্চনবর্ণ মেঘ শ্রীগৌরচন্দ্রের অন্তগমনশৈলে উদিত হইয়া (ত্রিতাপ)-দাবাগ্নিদধ্ব সমুদয় দেশকে প্রচুর বর্ষণদ্বারা প্লাবিত করিতে করিতে শ্রীগৌরাজের উদয়ভূমিরজে অকস্মাৎ আত্মগোপন করিলেন! হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিস্করকে সেইখানে লইয়া চল।।৫।।

গৌরো গৌরস্য শিষ্যো গুরুরপি জগতাং গায়তাং গৌরগাথা  
গৌড়ে গৌড়ীয়-গোষ্ঠ্যশ্রিতগণ-গরিমা দ্রাবিড়ে গৌরগব্বী।  
গান্ধব্বী গৌরবাচ্যো গিরিধরপরমপ্রেয়সাং যো গরিষ্ঠো  
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিস্করোহয়ম্।।৬।।

যিনি গৌরবর্ণ এবং শ্রীগৌরগাথাগানকারী নিখিল জগতের (স্বাভাবিক) গুরু হইয়াও যিনি শ্রীগৌরকিশোর-নামক কোন মহাত্মার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, যিনি সমগ্র গৌড়মণ্ডলে শুদ্ধ গৌড়ীয় গোষ্ঠীর আশ্রয়দাতৃগণের গরিমামূল, যিনি দ্রাবিড়-বৈষ্ণবগণের (লক্ষ্মী-নারায়ণোপাসকগণের) নিকট শ্রীগৌরপ্রদত্ত (শ্রীরাধাগোবিন্দের ব্রজ-ভজনের কথা) কীর্তন করিতে গব্ব অনুভব করেন, শ্রীগান্ধব্বীর গণেও যাঁহার গরিমাসম্পদ দৃষ্ট হয় এবং গিরিধারীর পরম প্রিয়মণ্ডলে যিনি শ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ—হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিস্করকে সেইখানে লইয়া চল।।৬।।

যো রাধাক্ষণ্যনামামৃতজলনিধিনাপ্লাবয়দ্বিশ্বমেত-  
দাল্লেক্ষাশেষলোকং দ্বিজনুপবণিজং শূদ্রশূদ্রাপকৃষ্টম্।  
মুক্তৈঃ সিদ্ধৈরগম্যঃ পতিতজনসখো গৌরকারুণ্যাক্তি-  
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিস্করোহয়ম্।।৭।।

যিনি শ্রীরাধাক্ষণ্যনামামৃত-সমুদ্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অপশূদ্র এমন কি ল্লেচ্ছ পর্য্যন্ত অশেষ লোকাত্মক সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করিয়াছেন, মুক্ত ও সিদ্ধগণের

অগম্য হইয়াও যিনি পতিতজনবন্ধু এবং শ্রীগৌরাদেবের করুণাশক্তি বলিয়া পরিচিত—  
হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিস্করকে সেইখানে লইয়া চল।।৭।।

অপ্যাশা বর্ততে তৎ পুরটবরবপুলোকিতুং লোকশন্দং  
দীর্ঘং নীলাজনেত্রং তিলকুসুমনসং নিন্দিতাঙ্কেন্দুভালম্।  
সৌম্যং শুভ্রাংশুদন্তং শতদলবদনং দীর্ঘবাহুং বরেণ্যং  
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিস্করোহয়ম্।।৮।।

সেই লোকমঙ্গলকর পুরটসুন্দর মূর্তি-দর্শনের কি আশা আছে? সেই সুদীর্ঘ,  
নীলকমলনয়ন ও তিলফুলজয়ী নাসিকা, সেই অর্দ্ধচন্দ্রধিকারী ললাট, সেই  
সৌম্যবদনকমল, সেই শুভ্রজ্যোতিঃ দন্তপংক্তি ও সেই আজানুলম্বিত বাহুসম্বিত  
রমণীয় বিগ্রহের পুনর্দর্শনের কি আশা আছে? হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে,  
শীঘ্র এই কিস্করকে সেইখানে লইয়া চল।।৮।।

গৌরাদে শূন্যবাণাঘিতনিগমমিতে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্থ্যাং  
পৌষে মাসে মঘায়ামমরগণ্ডরোর্বাসরে বৈ নিশান্তে।  
দাসৌ যো রাধিকায়্যা অতিশয়দয়িতো নিত্যলীলাপ্রবিষ্টো  
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিস্করোহয়ম্।।৯।।

চারি শত পঞ্চাশৎ সংখ্যক (৪৫০) গৌরাদে পৌষ মাসে, কৃষ্ণপক্ষে, চতুর্থী-  
তিথিতে মঘা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে নিশান্ত সময়ে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর অতীব  
দয়িত অনুচর যিনি নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন— হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ  
যেখানে, শীঘ্র আমাকে সেইখানে লইয়া চল।।৯।।

হাহাকারৈর্জ্ঞানানাং গুরুচরণজুষাং পুরিতাভূর্নভশচ  
যাতোহসৌ কুত্র বিশ্বং প্রভুপদবিরহাক্তস্ত শূন্যায়িতং মে।  
পাদাজে নিত্যভূত্যাঃ ক্ষণমপি বিরহং নোৎসহে সোঢুমত্র  
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিস্করোহয়ম্।।১০।।

জনসাধারণের ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবারত শিষ্যগণের হাহাকারে সমস্ত পৃথিবী  
ও আকাশ পূর্ণ হইয়া গেল। ঐ মহাপুরুষ কোথায় গেলেন? হায়! সমস্ত বিশ্ব আজ  
প্রভুপাদ-বিরহে শূন্যবোধ হইতেছে। পাদপদ্মের নিত্য ভূতা ক্ষণমাত্র বিরহও সহ্য করিতে  
অসমর্থ। হে দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিস্করকে সেইখানে লইয়া  
চল।।১০।।

# প্রশ্নোত্তর

## বৈষ্ণবসেবা

১। কৃপাপ্রার্থী কি বৈষ্ণবের তারতম্য বিচার করিবেন না?

“যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া,  
আদর করিব যবে।  
বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্বসিদ্ধি,  
অবশ্য পাইব তবে।”

—প্রার্থনা (লালসাময়ী) ৭, কঃ কঃ

২। অসাধুকে সাধুভ্রমে সেবা করিলে কি সাধুসেবা-ফল লভ্য হয়?

“এমত মনে করিবেন না—‘আমরা সাধু বলিয়া অসাধুকে সেবা করিলেও সাধুসেবা ফল পাইব।”

—বৈষ্ণবনিন্দা, সং তোঃ ৫।৫

৩। জীব-সেবা ও বৈষ্ণব-সেবা কি এক?

“জীবমাত্রকে যদি বৈষ্ণব বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সেবা করিলে ‘জীবসেবা’ হইতে পারে। উহাকে মহাপ্রভুর নির্দিষ্ট ‘নামপরায়ণ-বৈষ্ণবসেবা’ বলা যায় না।”

—বৈষ্ণবসেবা, সং তোঃ ৬।১

৪। উদরপরায়ণ ও ধন-শিষ্যাদি-লোভী বৈষ্ণব-চিহ্নধারিণকে ভোজন করাইলে কি বৈষ্ণব-সেবা হয়?

“তীর্থস্থানে বর্তমান প্রথা নিতান্ত অনিষ্টকর। তথায় একজন ছড়িদার গিয়া একশত বৈষ্ণব (?) নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। নিমন্ত্রণ পাইয়া বৈষ্ণবগুলি (?) অপরাপর কার্য রহিত করিয়া তিলকাদি-দ্বারা সজ্জীভূত হইলেন। ‘অদ্য ভরপেট লুচি-মালপোয়া পাইব এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু দক্ষিণাও মিলিবে’—এই ধনাশয়ে ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে—‘ধন-শিষ্যাদিভির্দ্বারৈযা ভক্তিরূপপদ্যতে’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা এই সকল কার্যকে ভক্তি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এই সকল কার্য যদি ভক্তি না হইল, তবে অনুষ্ঠাতাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না।”

—বৈষ্ণবসেবা, সং তোঃ ৬।১

৫। বহিস্মুখ প্রভু সন্তানকে ভোজন করাইলে কি বৈষ্ণবসেবা হয়? বৈষ্ণবসেবায় আশ্রম-সম্মানের প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

“তীর্থস্থানে আজকাল প্রথা এই যে, যখন যাঁহার বৈষ্ণবসেবা করাইতে ইচ্ছা হয়, তিনি কোন একটি প্রভু-সন্তানকে আনাইয়া তাঁহার পূজারী টহলিয়াদ্বারা অন্ন-ব্যঞ্জন-পীঠাপানা প্রস্তুত করাইয়া ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া কতকগুলি লোককে আমন্ত্রণ করত ভোজন করাইয়া থাকেন। এরূপ কার্য্যকে আমরা বৈষ্ণবসেবা বলিতে পারি না। \*  
\* \* বৈষ্ণবসেবায় আশ্রম-সম্মানের প্রয়োজন নাই। ভক্তির তারতম্যই বৈষ্ণবের তারতম্য।”

—বৈষ্ণবসেবা, সং: তোঃ ৬।১

৬। কিরূপ বিচার ও সতর্কতার সহিত বৈষ্ণব-সেবা করা কর্তব্য?

“বৈষ্ণবসেবাকে নিত্যধর্ম মধ্যে গণ্য করিবেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠার আশায় নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবকে সেবা করাইয়া দক্ষিণাদি প্রদান করত ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন না।”

—বৈষ্ণবসেবা, সং: তোঃ ৬।১

৭। বৈষ্ণব (?) ভোজনে দক্ষিণা-প্রদান-কার্য্যটি কি কস্মিকাণ্ড নয়?

“বৈষ্ণবকে ভোজন করাইয়া তাঁহার দক্ষিণা দেওয়া নিতান্ত কস্মিকাণ্ডের মধ্যে পরিগণিত। বৈষ্ণবের দক্ষিণা নাই। বৈষ্ণবের দক্ষিণা-প্রথাটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের দক্ষিণা-প্রথা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। এই প্রথা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যিক।”

—বৈষ্ণবসেবা, সং: তোঃ ৬।১

৮। কিরূপ বৈষ্ণবকে তৃপ্ত করা কর্তব্য?

“হে ভক্তবৃন্দ! শুদ্ধনাম-পরায়ণ বৈষ্ণবকে সর্ব্বপ্রকারে তর্পণ করুন। কিন্তু বৈষ্ণবের ভোজন-দক্ষিণা দিয়া বৈষ্ণবসেবাকে কস্মিকাণ্ডের অধম করিবেন না। নিমন্ত্রণ করিয়া অনেকগুলি বৈরাগী-বৈষ্ণবকে (?) ভোজন করান প্রভুর মত নহে।”

—বৈষ্ণবসেবা, সং: তোঃ ৬।১

৯। শুদ্ধ বৈষ্ণব ও সাধারণ অতিথিকে কিরূপভাবে ভোজন করান উচিত?

“ক্ষুধিত আতুর বিদ্যাব্যবসায়ীদিগকে আবশ্যিক ভোজন করাইতে হইলে, অতিথি-ব্যবহারে তাহা সম্পন্ন করিবে, প্রীতিবিশেষ করিবার প্রয়োজন নাই; যত্ন কর, কিন্তু প্রীতি করিও না। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণকে প্রীতিসহকারে ভোজন করাইবে এবং আবশ্যিক হইলে প্রীতিসহকারে তাঁহাদের প্রদত্ত প্রসাদ-ভোজন গ্রহণ করিবে।”

—সঙ্গত্যাগ, সং: তোঃ ১১।১২

১০। সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দেওয়া ও অভ্যাগত-বৈষ্ণবসেবা কি এক?

“অনিমন্ত্রিত বৈরাগী-বৈষ্ণবের নাম—‘অভ্যাগত’। ঘটনাক্রমে সেরূপ বৈষ্ণব দুই একটি গৃহে আসিলে, তাঁহাদের সেবা করা উচিত; ইহাতেই গৃহস্থের বৈষ্ণবসেবা

হয়। অধিক বৈরাগীকে একত্র করিলে তাঁহাদের উপযুক্ত সম্মান হয় না; তাহাতে অপরাধ হয়। নিমন্ত্রণ করিবা-মাত্রই নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবের অভ্যাগততত্ত্ব ধর্ম থাকে না; তাহাতে সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দেওয়া হয় বটে, বৈষ্ণবসেবা হয় না।”

—বৈষ্ণবসেবা, সং তোঃ ৬।১

১১। অতিথিসেবা ও বৈষ্ণবসেবায় পার্থক্য কি? বৈষ্ণব-গৃহস্থের কোন্টি করা কর্তব্য?

“অতিথিসেবায় ও বৈষ্ণব-সেবায় এই ভেদ যে, অতিথিসেবাটি—গৃহস্থধর্ম এবং বৈষ্ণবসেবাটি—বৈষ্ণবধর্ম। যিনি বৈষ্ণব হইয়াও গৃহস্থ, তিনি অবশ্যই অতিথিসেবা করিবেন; কেন না, তিনি গৃহস্থ বলিয়া অতিথিসেবা করিবেন এবং ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া বৈষ্ণব-সেবা করিবেন।”

—বৈষ্ণব-গৃহস্থের আতিথ্য, সং তোঃ ৮।২

১২। যথার্থ বৈষ্ণবসেবা কিরূপে হয়?

“আজকাল ‘মহোৎসব’ বলিয়া একটা প্রথা চলিতেছে; তাহাকেই অনেকে বৈষ্ণবসেবা বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ শুদ্ধ বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত বৈষ্ণবসেবা হয় না। শুদ্ধ বৈষ্ণব যদি অল্প সংখ্যকও হন, তথাপি তাঁহাদের সেবাতেই বৈষ্ণবসেবা হইতে পারে।”

—বৈষ্ণবসেবা ও প্রচলিত মহোৎসব-প্রথা, সং তোঃ ৪।৫

১৩। বৈষ্ণবের আগমনে ও গমনে কিরূপ ভক্ত্যঙ্গ পালনীয়?

“বৈষ্ণব আসিতেছেন’ শুনিলে কিছু দূর গিয়া অভ্যর্থনা করিবে; আর বৈষ্ণব যখন চলিয়া যান, তাঁহার সহিত কিছু দূর পর্য্যন্ত অনুগমন করিবে।”

—শ্রীরামানুজ-স্বামীর উপদেশ ১৯, সং তোঃ ৭।৩

### ইষ্টগোষ্ঠী

১। ইষ্টগোষ্ঠী সভা কাহাকে বলে?

“শুদ্ধভক্তসঙ্গ ব্যতীত ইষ্টগোষ্ঠী হয় না। ‘ইষ্ট’-শব্দে—অভিলষিত বিষয় এবং ‘গোষ্ঠী’-শব্দে—সভা। এই দুই শব্দ মিলিত হইয়া শুদ্ধভক্তিপরায়ণ সাধুদিগের সভাকে ইষ্টগোষ্ঠী বলিয়া নামকরণ করা হয়।”

—শ্রীমদগৌরাঙ্গ সমাজ, সং তোঃ ১০।১২

২। ভাগবতগণের ইষ্টগোষ্ঠী কয় প্রকার?

“ইষ্টগোষ্ঠী দুই প্রকার—আচার ও প্রচার। আচার-পালনে তাঁহারা (ভজন-পরায়ণ বৈষ্ণবগণ) শ্রীভাগবতাদি পাঠ ও শ্রবণ এবং হরিনাম-কীর্তনে রত। প্রচারে-সময়ে ভগবত্তত্ত্ব, জীব, রসতত্ত্ব ও নাম-মহিমা অধিকারি-ভেদে প্রদান করেন।”

—শ্রীমদগৌরাঙ্গ সমাজ, সং তোঃ ১০।১২



৩। কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী কাহাকে বলে?

“দুইজনে মিলিত হইয়া যে গোষ্ঠী হয়, তাহাকে কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী বলে।”

—শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-সমাজ, সং তোঃ ১০।১২

৪। সাধারণের সহিত আলাপ ও ইষ্টগোষ্ঠীতে পার্থক্য কি?

“সাধারণের সঙ্গে রসালোপে সুখ হওয়া দূরে থাকুক, অত্যন্ত রসভঙ্গ হয়; ইষ্টগোষ্ঠীতে সেরূপ রসভঙ্গ হয় না।”

— শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-সমাজ, সং তোঃ ১০।১১

৫। শুদ্ধভক্ত-সম্মেলন অতি দুর্লভ কেন?

“শুদ্ধভক্ত জগতে বিরল। অতএব তাঁহাদের মিলনরূপ ইষ্টগোষ্ঠীতে দুই চারিজন ব্যতীত একস্থানে অধিক পাওয়া যায় না।”

— শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-সমাজ, সং তোঃ ১০।১১

৬। শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-সমাজের বিভিন্ন স্তর কি কি?

“যে-স্থলে সর্বপ্রকার লোকের সমাগম, সে-স্থলে বৈষ্ণব-সমাজ বা বৈষ্ণবদিগের ইষ্টগোষ্ঠী। যে-স্থলে দুই শুদ্ধভক্তের মিলন, সে-স্থলে কৃষ্ণকথাগোষ্ঠী। যে-স্থলে এক শুদ্ধভক্তের অবস্থান, সে-স্থলে কেবল নামাদির নির্জর্জন-ভজন।”

— শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-সমাজ, সং তোঃ ১০।১১

— জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

## শ্রীরূপ-শিক্ষা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮৮ পৃষ্ঠার পর]

“নমো মহাবদান্য কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচেতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥”

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শাস্ত।

ভুক্তিমুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশাস্ত॥

যিনি কৃষ্ণের ভজন করেন, তিনি নিষ্কাম। অ-কৃষ্ণের সেবা হয় না, তাহা ভোগ। কৃষ্ণভক্তের মুখ্য লক্ষণ—কৃষ্ণের সেবানৈরন্তর্য্য যাঁতে বিদ্যমান। অন্যের প্রভু সাজলে কৃষ্ণ তার প্রভু হন না। ভক্তগণ ব্রহ্মসায়ুজ্য ও ঈশ্বরসায়ুজ্য ঘৃণা করেন। বাউলের মত নারায়ণ হ'য়ে যাওয়া। মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধি যতদিন না হয় ততদিন অশাস্ত। অশাস্ত ব্যক্তি বিবেকহীন হ'য়ে চঞ্চলতা প্রকাশ করেন। আহার-নিদ্রাদিতে পশুর সমান ধম্মবিশিষ্ট যারা, তারা অশাস্ত। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর সেবা করলে অশাস্তি আসবেই।

কৰ্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্ জ্ঞানাবলম্বকাঃ।

বয়স্তু হরিদাসানাং পাদত্ৰাণাবলম্বকাঃ॥

হরিদাসের জুতো মাথায় নিয়ে বেড়াব, এটী আমাদের বড় অভিলাষ। কৰ্মজ্ঞানাদিতে যারা অত্যন্ত সমৃদ্ধ, তা'দের সঙ্গে ত্যাগ করব। ঐহিক আনুশ্রিক ফললাভ দুর্বুদ্ধি। জ্ঞানীর বিচার বস্তুসহ একীভূত হয়ে যাওয়া। নিজের অস্তিত্ব লোপ ক'রে নির্বিশেষ হ'য়ে যাব। তারা আত্মঘাতী।

পশুরা অনেক সময় শোনে না, বাড়ি মারলে দোরস্থ, তা'দের সেবাবুদ্ধি নাই। কৃষ্ণভজন ব্যতীত অন্য চেষ্টানিরত ব্যক্তিসকল পশুতুল্য। আমরা অন্যবিচারযুক্ত হ'য়ে স্বতন্ত্রতা চালাব—এটা অনভিজ্ঞতা।

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মানভিশুমক্ষম্।

কৃপামুধিৰ্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥

আমি চঞ্চল ছিলাম, শাস্তি ইচ্ছা করি নাই। শ্রীসনাতন প্রভু আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করিয়েছেন।

ভক্তি আশ্রয় না করলে অশান্ত হ'য়ে সমাবর্তন ক'রে সংসার ভোগ করে।

জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি উতি যায়।

শিক্ষোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

এটা ভুক্তি। আর মুক্তি ঐ গুলো না করা। দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন থাকলে অসুবিধা—  
এটা মুক্তি।

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোৰ্ভবসাগুরস্য।

সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোহপ্যসাধু॥

বরং বিষ খেয়ে মরে যাওয়া ভাল তথাপি যোষিতের সঙ্গে অকর্তব্য। ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হবার ইচ্ছুক ব্যক্তি নিষ্কিঞ্চন জনের সঙ্গে করবে। সাধনের দ্বারা অষ্টাদশ সিদ্ধি লাভ করবে যা'দের বাসনা, তারাও অশান্ত। এদের দোরস্ত ক'রে ভক্ত করতে হ'বে।

সনাতন-পাদপদ্ম আশ্রয় না করলে সিদ্ধান্তজ্ঞান হয় না। ভক্তি ব্যতীত অন্য চিন্তাস্রোত অনাদ্যার ধর্ম।

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ।

সদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিত্বপি মহামুনে॥

কোটি কোটি ব্যক্তির মধ্যে ভক্ত সুদুর্লভ। সিদ্ধ ও মুক্তগণের মধ্যে (কোটি কোটির) একজন নারায়ণপরায়ণ হন।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।  
 গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পার ভক্তিলাভ-বীজ॥  
 মালী হএগ সেই বীজ করে আরোপণ।  
 শ্রবণ-কীর্তনজলে করয়ে সেচন॥  
 উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।  
 বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥  
 তদুপরি যায় লতা গোলোক-বৃন্দাবন।  
 কৃষ্ণচরণ-কল্লবৃক্ষে করে আরোহণ॥

কৃষ্ণচরণ-কল্ল—দাসরস চরণ-সেবিগণের, সখ্যরস উরু-সেবিগণের, বাৎস্যরস  
 —ভূজসেবিগণের আর মধুর রস—শীর্ষস্থানীয়গণের আশ্রয়। রসবিচারে কৃষ্ণের চরণ,  
 উরু, ভূজ ও মস্তক পর পর রসের উন্নত বিচার।

ব্রহ্মাণ্ডে নানাপ্রকার ভজন-প্রণালী আছে। প্রভু হ'বার প্রণালী, বিদ্বান্ হ'বার প্রণালী  
 প্রভৃতিও আছে। তজ্জন্যও লোকে যত্ন করছে।

“জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।

নৈবাহত্যভিধাতুং বৈ হ্রামকিঞ্চনগোচরম্॥”

জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী-মদমন্ত জনগণ হরিকথা শ্রবণ করে না, কীর্তন করে না।  
 ব্রহ্মাণ্ড—ব্রহ্মার অণু, ডিম, ভিতর, তাঁর অন্তরে সবজিনিষ। তাতে ১৪ ভুবন। তার  
 বাইরে বৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিরজা। ব্রহ্মাণ্ড ১৪ ভুবন। ভূঃ, ভুবঃ,  
 স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—এই সপ্ত ব্যাহতি আর সপ্ত অবর লোক। দ্বিজ সকলও  
 অণুভ্যন্তরে থাকে। দ্বিজত্বসংস্কার—

“মাতুরগ্রেহিজননং দ্বিতীয়ং মৌজিবন্ধনে।

তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি-চোদনাৎ॥”

শূদ্র না থাকা—দ্বিজ হওয়া। দ্বিজ অর্থে পাখী ও ব্রাহ্মণ। দ্বিজগণ পাখীদের  
 পড়ালে পড়তে পারে। যে ব্রাহ্মণ উৎকৃষ্টতা লাভ করবে, সে ভক্তের সেবা করবে।  
 ক্ষত্রিয়, বৈশ্য উৎকৃষ্ট হ'লে ভক্তসেবা করবে। ভক্তের ভূত্যগিরি করলে সুবিধা।  
 কপাল-পোড়া জীব জন্মৈশ্বর্য্য নিয়ে ব্যস্ত, হরিসেবা করবে না। প্রকৃতিজনের স্বভাব  
 হরিজনদ্বেষ করা। কপাল ভাল হ'লে “স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং” বিচার গ্রহণ করতে  
 পারা যায়। সেবা করার সৌভাগ্য হওয়া দরকার। মিছাভক্তদল অঘবক-পুতনাদ্বারা  
 সংহার হ'বে। তারা কৃষ্ণবিদ্বেষীর শিষ্য হ'য়ে ভক্ত পরিচয় দেয়। বিষ্ণুভক্তবিরোধি-  
 দল অসুর। প্রলম্ব—কপটতা। বলদেব তাকে বিনাশ করেন। ভাগ্য হ'লে ভক্তের সেবা  
 করতে পায়। ‘ভাগ্য’ মানে হরিভক্তি-লাভ—কোন বৈষ্ণব সহ দেখা হওয়া। আর  
 অবৈষ্ণবসঙ্গ হ'লে দুর্ভাগ্য।

গুরুদেবের নিকট কৃষ্ণের অনুগ্রহ পাওয়া যায়। কৃষ্ণকে কেউ দেখতে পায় না। আধ্যাত্মিক ব্যক্তি কৃষ্ণদর্শন করতে পারে না। গুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রবণ করাই কৃষ্ণপাদপদ্ম-দর্শনের প্রথম সোপান।

কিছুদিন পূর্বে বৃন্দাবনে কয়েকজন মহৎ লোক ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে জাতগোসাঁই দল ও ব্রজবাসীদের লড়াই হত। তাঁরা ভোগা দিতেন, এদের সঙ্গ করতেন না। গৌর-শিরোমণি নামক এক ব্যক্তি ভাগবত পাঠ করতে বৃন্দাবন এসেছিলেন। তিনি ভাগবতব্যবসায় করতেন বলে কেউ তাঁর কথা শুনতে আসতেন না। পরে বুঝতে পেরে উহা ছেড়ে দিলেন। মিছাভক্ত-সম্প্রদায় শুনে রেখেছে পাঠ শুনতে নাই। মূর্খতা বজায় রেখে বোকামি করবে। এটা ভাড়াটিয়া পাঠকের ভাগবত পাঠ নয়। অন্য লোক শুনলে মঙ্গল হবে।

গুরুদেবের প্রসাদই কৃষ্ণের প্রসাদ। যেখানে কৃষ্ণের প্রসাদ পাওয়া যায় না সেখানে গুরুই গোলমাল। ভক্তব্রত এমন কথা বুঝতে পারে না। তারা মনে করে ইন্দ্রিয়তর্পণকারী পাঠকের পাঠ শুনবে। মঞ্জুরীর আনুগত্য যারা স্বীকার করে নাই, তাদের পাঠ শুনলে নরক। ভক্তিলতার বীজ লাভ করতে হ'বে। নিজে কৃষক হ'য়ে রোপণ-কাজ করতে হবে।

শ্রীরূপকে গৌরসুন্দর যে-সকল কথা বলেছেন, তা' যারা শুনে তা'রা ব্রজবাসের যোগ্য। নচেৎ ব্রজে বাস করলেও বাস হবে না, সংসার প্রবল হ'য়ে যাবে। গুরুর অকুপা হ'লে বঞ্চিত হ'য়ে নিজের সর্বনাশ।

কৃষক হ'য়ে ভূমিতে বৃক্ষ উৎপন্ন করা দরকার। কস্মিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের ঠাকুরপূজা নয়, ভক্তিলতাবীজ আরোপণের জন্য চাষা হওয়া দরকার। নিজে আচরণ করে অন্য লোকের মঙ্গল করা দরকার। কা'কে কৃষ্ণ বলে, কা'কে ভজন বলে না জানলে অন্যাভিলাষ-কর্ম-জ্ঞান-যোগের বীজ পাবে। পুরুত ঠাকুরেরা পূজা করুক, আমরা করব না, আমরা ভজনানন্দী—বোষ্টমরা বলে। জাত-গোসাঁইরা বলে, আমরা বোষ্টমদের শিষ্য করব। নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবীর পাদপদ্ম আশ্রয় করে বীরভদ্র প্রভু গুরুর কার্য করতে পেরেছিলেন। গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় না করলে গুরুর কার্য হ'বে না। বোষ্টম সাজা ভাগবতে নিষিদ্ধ। কলির বিষয়—

শুদ্ধা প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেষোপজীবিনঃ।

ধর্ম্মং বক্ষ্যত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরূহ্যোত্তমাসনম্।।

শুদ্ধসকল ত্রিবিধ জাতির সেবা করবে। সংস্কারগ্রহণের পর বেদসমীপে গমন করতে হয়। 'অহং ত্বাং বেদসমীপং নেষ্যে।' মূঢ়তা ছাড়িয়ে বৈষ্ণব করব—এ বিচার হ'চ্ছে ব্রহ্মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে। আর মূর্খতা করবে আউল, বাউল, প্রাকৃত সহজিয়ার দল। তারা বোষ্টম অভিমান ক'রে মূর্খতাদ্বারা ভক্তবিদ্বেষ করবে—পশুর

ন্যায় ব্যবহার করবে। তাদের শাস্ত করা দরকার।

ভগবানের সেবা করব বিচার হ'লে চৈতন্যের বাক্য শুনতে হ'বে—

নিক্ষিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ব-সাগরস্য।

সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোহপ্যসাধু।।

যিনি শ্রবণ করবেন তিনিই কীর্তন করবেন। প্রহ্লাদ (যিনি প্রকৃষ্ট আহ্লাদ পেয়েছেন) বলেছেন,—

শ্রবণং কীর্তনং বিষেণঃ স্মরণং পাদসেবনম্।

অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যামান্নবিবেদনঃ।।

ইতি পুংসাপিতা বিষেণী ভক্তিশেচন্মবলক্ষণা।

ক্রিয়েত ভগবত্যাঙ্কা তন্মন্যোহধীতমুত্তমম্।।

যাঁরা আত্মসমর্পণ করে নাই তাদের নিকট হ'তে পয়সা আদায় করবার জন্য তাড়াতাড়ি দীক্ষা দিয়ে দেওয়া অন্যায়। তারা জড়জ্ঞান দেবে, দিব্যজ্ঞান দিতে পারে না। জড়জগতের কথা শিক্ষা দেবে তার জন্য মাশুল চাই। এটা হরিভক্তনের উদ্গত জিনিষ। হরিদাসের ভৃত্য হব, এটা ভক্তের বিচার। পয়সা রোজগারের জন্য মন্ত্র দেওয়া, ভাগবত পাঠ করা, ঠাকুরপূজা প্রভৃতি করা ভাল নয়, তাতে পাপ হবে। যারা করবে তারা পাপজীব মধ্যে গণ্য হবে। এই অসুবিধা হ'তে ত্রাণ করবার জন্য প্রহ্লাদ বলেছেন—আগে যারা শরণাগত হয়েছে তারা নববিধা ভক্তির অনুশীলন করতে পারবে। (ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ

## বিশ্বাসঘাতক

মানুষের মনে বিশ্বাস আছে বলিয়াই পৃথিবীটাকে সুন্দররূপে প্রতিভাত হয়। পৃথিবী হইতে সমূলে বিশ্বাসের বিলুপ্তি হইলে পৃথিবীটা হিংসার রাজ্যে পরিণত হইত, পৃথিবীর বুকে মেহ-মমতা-দয়া-শ্রদ্ধা-ভক্তি বলিয়া কোন কিছুই অস্তিত্ব থাকিত না। উপনিষদের মতে, বিশ্বাস অন্ধকারে আলোকবর্তিকা-সদৃশ। “Faith is a flash of light in darkness.” বিশ্বাস ব্যতীত যে কোন কার্যে সাফল্যলাভ অসম্ভব। বিশ্বাসহীন কন্ম গন্ধশূন্য কৃত্রিম ফুলের ন্যায় অসার। “Work without faith is like an artificial flower that has no fragrance.” নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিশ্বাসের মূলে কুঠারঘাত করিয়া যাহারা অপরের ক্ষতিসাধন করেন, তাহারা জগতের লোকের নিকট ‘বিশ্বাসঘাতক’রূপে পরিচিত। বিশ্বাসের সুযোগ লইয়া বিশ্বাসঘাতকগণকে প্রায়শঃ পরদ্বীহরণ, পরস্বহরণ প্রভৃতি গর্হিত কন্ম করিতে দেখা যায়। প্রত্যাশাশক, অবিশ্বাসী,

প্রতারক, বেইমান প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতকেরই অপর নামসমূহ। বেইমানেরা মুখে একরূপ, মনে অন্যরূপ। তাহারা একই সাথে অধরে অমৃত এবং অন্তরে হিংসারূপ গরল পোষণ করিয়া থাকেন। ‘নুন খাই যার গুণ গাই তার’ বাক্যের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। বাঘের গোবধে যেরূপ কোন দুঃখ হয় না; তদ্রূপ যাহারা দুষ্কর্মে অভ্যস্ত, তাহাদের পাপকার্য্যে কোন ভয় থাকে না। কোন কোন ক্ষেত্রে বাঘেরও চক্ষুলজ্জা থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের হৃদয়ে পরলোক চিন্তা স্থান লাভ করিতে পারে না।

সব চুলে যেরূপ চামর হয় না, তদ্রূপ সকল মানুষকে বিশ্বাসের যোগ্য বলা যাইবে না। অপাত্রে বিশ্বাস ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কাক সকলের মাংস খায়, কিন্তু কাকের মাংস যেরূপ কেহই খায় না; তদ্রূপ প্রতারক সকলকেই ঠকাইতে চায়, তাই সকলে প্রতারককে এড়াইয়া চলিতে চায়। যাহার এক মুখে দুই কথা অর্থাৎ যে অসাম্প্রদায়িক কার্য্যহানি করে এবং সম্মুখে থাকিলে প্রিয়বাক্য বলে, তাহাকে কেহই বিশ্বাস করে না। গল্পের গুরু গাছে উঠিলেও, বাস্তবে যেরূপ গুরু গাছে উঠিতে পারে না, তদ্রূপ বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিশ্বাসঘাতককে সুখী মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসঘাতকতার ফলস্বরূপে তাহাকে অশান্তির অনলে পুড়িয়া পুড়িয়া খাচ্ হইতে হয়। ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ। কোন প্রতারককে দেখিলেই লোকে তাহাকে মীরজাফরেরই সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন। বিশ্বাসঘাতকের উপাধি মাথায় লইয়া বাঁচিয়া থাকার কোন অর্থ আছে কি? সামান্য জড়সুখের নিমিত্ত লোকের সহিত প্রবঞ্চনা করিলে লোকে যে গায়ে থুথু ছিটাইবে, তাহা কি অতি সম্মানের বিষয়? বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম ভয়াবহ। কোরাণে রসূলুল্লাহ বলিয়াছেন,—‘যে লোক বিশ্বাসী ব্যক্তির অনিষ্ট করে, তাহার সহিত প্রতারণা কবে, সে অভিশপ্ত।’ নীতিশাস্ত্রেও পাওয়া যায়,—

মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ।

তিষ্ঠন্তি নরকে ঘোরে যাবচ্ছন্দ্রদিবাকরৌ।।

“মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন ব্যক্তি এবং যাহারা বিশ্বাসঘাতক তাহারা চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ভীষণ নরকে অবস্থান করে।” উপকারীর সঙ্গে যাহারা বেইমানি করে, বিপদে পড়িলেই কেহই তাহাদের সাহায্য করিতে এগিয়ে আসিবে না। বিশ্বাসঘাতকেরা যাহাদের নিমক খাইয়া দুষ্কর্ম করেন শুধু তাহাদের কাছে ঘৃণ্য নয়, যাহাদের জন্য তাহারা দুষ্কর্ম করেন তাহাদের নিকটও ঘৃণার পাত্র। দুষ্প্রবৃত্তি যাহার মজ্জাগত, তাহাকে চেষ্টা করিলেও সহজে সংলোকে পরিণত করা সম্ভবপর নয়।

এই পৃথিবীর সববিছুই ভগবানের সম্পত্তি; পরস্বহরণ গর্হিত কর্ম্ম। ইহ জগতে

সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রেশপ্রভাবে মানবের মৃত্যু হয়। যাহারা পাপ-প্রবৃত্তির চরম সীমায় উপনীত হইয়া ভগবানের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করেন, তাহারা বিশ্বাসঘাতক ও জীবন্মৃত। প্রপঞ্চের কোন কিছুই আমাদের ভোগ্যবস্তু নহে, ভগবানের সেবার বস্তুতে ভোগবুদ্ধি করিতে নাই। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবাযোগ্য ধন তাহাদের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া যাহারা ভাবী উত্তরাধিকারিগণের জন্য সঞ্চয় করিয়া যান, তাহাদের বংশের কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ থাকে না। কারণ ভবিষ্যতে তাহাদের বংশে অনেক কুলান্ধার জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্বপুরুষের সঞ্চিত অর্থ ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য নানাবিধ পাপকার্য্যে নিয়োগ করিবে। ফলস্বরূপে তাহারা নিজেরাও নরকে গমন করিবেন এবং দুর্ভাগ্য কৃষ্ণবিমুখ পিতৃপুরুষগণকেও নরকে পাঠাইবার পথ পরিষ্কার করিবেন। যাহার সহিত আমাদের নিত্য সম্পর্ক সেই জগতের পিতা শ্রীকৃষ্ণের সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির নিমিত্ত জীবের কৃষ্ণসেবাবিমুখতা তাহার পিতৃদ্রোহিতা বা বিশ্বাসঘাতকের পরিচয়কেই বহন করিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বলা হইয়াছে,—

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।

পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ।।

বিশ্বাসঘাতক মনের কাম-ক্রোধাদির দাসত্ব করিবার খুবই রুচি। সুযোগ পাইলেই কৃষ্ণবহির্মুখ মন উপদেষ্টার আসন গ্রহণপূর্বক জীবকে কাম-ক্রোধাদির দাস্যে নিযুক্ত করিয়া তাহার চরম সর্বনাশ করিয়া থাকেন। মনের দ্বারা প্রতারণিত হইয়া জীব বিশ্বাসঘাতকের উপাধি লাভ করিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি বিদ্বেষ করিবার জন্য সতত ব্যস্ত থাকেন। তজ্জন্য বিশ্বাসঘাতক মনের কথা না শুনিয়া সাধু-গুরু-শাস্ত্রের কথা শুনিলে জীবের মঙ্গল অবশ্যসম্ভাবী।

সত্যের গতি স্তব্ধ করিবার ক্ষমতা ইহ জগতের কাহারও নাই। যাহারা সত্যের প্রতিরোধে কৃতসঙ্কল্প হন, তাহারা মিথ্যার আশ্রয়ে থাকিয়া লোককে ধোকা দিতে গিয়া অতি শীঘ্র কালগ্রাসে পতিত হন। মিথ্যার আশ্রয়-নিতান্ত শঠের কর্ম্ম। এই প্রপঞ্চে যতদূর সত্যস্বরূপ ভগবন্তের জয় হয়, ততদূরই মায়াজনিত মিথ্যা বিদূরিত হয়। কতকগুলি হতভাগ্য লোক শাস্ত্রের সহিত কোন সম্পর্ক না রাখিয়া অথবা শাস্ত্রের কোন তাৎপর্য্য না বুঝিয়া কৃষ্ণকে রূপক বা ঐতিহাসিক নায়করূপে কল্পনাপূর্বক তাঁহার সম্বন্ধে অশ্লীল মন্তব্য করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের কাল্পনিক চিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া প্রতারকেরা নিজেদের ত' ক্ষতিসাধন করিতেছেনই; অধিকন্তু অপরের কপাল খারাপ করিয়া দিতেছেন। বিবর্তবাদী তথা প্রতারকের আপাত আনন্দের কথা শ্রবণই জগতের লোক প্রয়োজন বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছে। তাই “শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ়

নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকৰ্ম কৃত হয়।”—শাস্ত্রের এই চরম প্রয়োজনীয় কথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণভক্তির কথা শুনিবার লোক অত্যন্ত বিরল। ভক্তির সহিত বিরোধকারী অভক্ত, মহাজ্ঞানী ও মায়াবাদী প্রভৃতি লোকের নিকট ভোগপর বা ত্যাগপর বাক্যসমূহ বলিয়া তাহাদিগকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলাইয়া তাহাদিগের অমঙ্গল সাধন করিতে পিছপা হন না। যে কপটতা করিয়া বাহ্যে কৃষ্ণভজনের অভিনয় মাত্র করেন, আর অন্তরে কৃষ্ণের নিকট ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বাঞ্ছা করেন, কৃষ্ণ তাহার অভিলষিত এই সমস্ত তুচ্ছ বস্তু দিয়াই তাহাকে বঞ্চনা করেন, সেই বিশ্বাসঘাতককে কখনও প্রেমভক্তি দান করেন না।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য অস্বীকার করা বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য। একমাত্র গুরু-বৈষ্ণবের সেবার দ্বারাই জীবের মঙ্গললাভ হয়। যেখানে গুরু-বৈষ্ণব সেবায় উদাসীনতা, সেখানে কৃষ্ণগনুশীলন বা কৃষ্ণসুখানুসন্ধান থাকিতে পারে না। তথায় কেবল স্বসুখবাঞ্ছার তাণ্ডব নৃত্যই বর্তমান। ভক্তিবিরোধী চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিয়া থাকেন। আত্মসুখানুসন্ধিৎসা জিনিষটী অপস্বার্থপরতা বা বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য। “Selfishness is the greatest curse of the human race.” বিশ্বাসঘাতকগণ স্বতন্ত্র ও দান্তিক। তাহারা সত্য সত্যই গুরুর নিকট পৌঁছাইতে পারে না। দীক্ষাগ্রহণের পরেও গুরুর মনোভীষ্ট পূরণে সচেষ্ট না হইয়া মুখে নিজেকে ‘গুরুর সেবক’ বলিয়া কপট অভিমান করিতেছি বলিয়াই যাবতীয় অনর্থ উপস্থিত হইতেছে। দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার পরে জড়বিষয়ে অভিনিবেশ কি করিয়া থাকিতে পারে? জড়প্রতিষ্ঠা, অর্থসংগ্রহের স্পৃহা ও স্বজনগণের সেবার প্রচেষ্টাই বা কি করিয়া জাগিতে পারে? আমরা গুরুদেবকে ‘গুরু’ সম্বোধন করিয়াও কার্য্যক্ষেত্রে তাহাকে আমাদের শিষ্য ব শাসনযোগ্য বস্তুতে পরিণত করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিতেছি।

অবৈষ্ণবদিগের এই নশ্বর জীবনই সর্বস্ব। তাহারা যে অতি উৎকট কষ্ট ভোগ করেন, তাহা নিবারণের জন্য তাহারা বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও কষ্টশূন্য হইতে পারেন না। জীবকে কৃষ্ণগম্মুখ করাই বৈষ্ণবের প্রধান কার্য্য। যে-স্থলে স্থূল শরীরের রোগ-নিবৃত্তি বা ক্ষুন্নিবৃত্তি করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, সে-স্থলে বৈষ্ণবতা নাই; যেহেতু তদ্বারা কেবল ক্ষণিক উপকার হয়, কিন্তু নিত্য উপকার হয় না। বৈষ্ণবগণ জীবগণকে কৃষ্ণনামামৃত সমুদ্রে অবগাহন করাইয়া তাহাদিগকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ উপাধি হইতে মুক্তিদানপূর্ব্বক নিত্যশান্তি প্রদান করেন।

—ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ



## স্বধর্ম

“স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমহসি।

ধর্ম্যাঙ্গি যুদ্ধাচ্ছেয়োহন্যাং ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।।”

বর্ণ চারিটি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। আশ্রম চারিটি—ব্রহ্মচার্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। চারিবর্ণ ও চারি আশ্রমের নিজ নিজ ধর্ম রহিয়াছে। কিন্তু—

“চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।

স্বধর্ম করিয়াও রৌরবে পড়ি’ মজে।।”

গীতার প্রথমোক্ত শ্লোকে বলিলেন,—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ করা। কিন্তু গীতার মুখ্য তাৎপর্য্য ইহাতেছে ভক্তি। প্রেমই জীবের প্রয়োজন। জীবের স্বধর্ম ইহাতেছে—আত্মধর্ম। যাহার দ্বারা জীব কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ ইহতে পারে।

জীব দুই প্রকার—মুক্তজীব ও বদ্ধজীব। সুতরাং জীবের স্বধর্ম দুই প্রকার। মুক্ত অবস্থায় জীবের স্বধর্মে উপাধি নাই। কিন্তু জীব যখন জড়বদ্ধ অবস্থায় থাকেন তখন তাঁহাকে বহুবিধ অবস্থার মধ্যে পড়িতে হয়। সেই সকল অবস্থায় তাঁহার স্বধর্মেরও আকার ভেদ আসিয়া পড়ে। আমরা মনুষ্য দেহ লাভ করিয়াছি। এই প্রকার বদ্ধ অবস্থার মধ্যে অবস্থান করিয়াও যদি তাহার ধর্মটি বর্ণাশ্রমরূপী হয় তাহা স্বধর্ম-রূপে প্রতিভাত হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রায়রামানন্দ-সংবাদে আমরা দেখিতে পাই,—

“প্রভু কহে—পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।

রায় কহে—স্বধর্ম আচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।।”

শ্রীমদ্মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে সাধ্যতত্ত্ব নির্ণয়কারী শাস্ত্রশ্লোক পাঠ করিতে বলিলে রায়রামানন্দ মানবদিগের স্বধর্ম আচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় বলিলেন।

ভগবানকে সন্তুষ্ট করাই ইহাতেছে সাধ্যতত্ত্ব। মনুষ্যের নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে বর্ণের এবং নিজ নিজ অবস্থা অনুসারে আশ্রমের ধর্ম পালন করা প্রয়োজন। অতএব বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্য নাম স্বধর্ম।

কিন্তু শ্রীমদ্মহাপ্রভু ইহাকে “এহো বাহ্য” বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে স্বধর্ম স্থাপন করিতে গিয়া পর পর ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন।

১। বর্ণাশ্রম ধর্মের কথা বলিলেন,

২। কর্ম্মার্পণরূপ কন্মমিশ্রা ভক্তি,

৩। বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া হরিভজন,

৪। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি পরিত্যাগ,

৫। জ্ঞানশূন্যা ভক্তিই শুদ্ধাভক্তি।

জ্ঞানশূন্য ভক্তি শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—“এহো হয়, আগে कह আর।”

৬। তখন রায়রামানন্দ বলিলেন,—“প্রেমভক্তি সর্বসাধ্য সার।”

“প্রেমভক্তি বলিতে বুঝিতে হইবে—

(ক) দাস্য প্রেম— উত্তম নহে। কারণ দাস্যপ্রেমে মমতা থাকিলেও তাহাতে ভয় এবং সন্ত্রম রহিয়াছে।

(খ) সখ্য প্রেম—উত্তম। কারণ সেখানে ভয় এবং সন্ত্রম নাই। সেখানে একান্ত বিশ্বাস।

(গ) বাৎসল্য প্রেম— তদপেক্ষা উত্তম। সখ্যারসের প্রেমে আরও অধিক স্নেহের আবির্ভাবে বাৎসল্য রস হয়।

(ঘ) কান্ত্যবাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমভক্তি।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন,—

“স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।।”

অর্থাৎ যে ধর্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণে অপ্ৰতিহতা (অর্থাৎ বিঘ্নাদির দ্বারা অনভিভূতা), অহৈতুকী (অর্থাৎ ফলাভিসন্ধানরহিতা) আত্মপ্রসাদ জননী ভক্তি জন্মে, সেই ধর্মই জীবের পরম ধর্ম। উহাই একমাত্র স্বধর্ম।

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

“স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধিঃ হরিতোষণমিতি বক্ষ্যমানরীত্যা তৎ সন্তোষনার্থমেব কুতো ধর্মঃ পরঃ সর্বতঃ শ্রেষ্ঠ ন নিবৃত্তিমাশ্রলক্ষণোহপি বৈমুখ্য বিশেষঃ। \* \* \* ফলান্তরানুসন্ধানরহিতা অপ্ৰতিহতা তদুপরি সুখদ পদার্থান্তরাভাবাৎ কেনাপি অবরোধয়িতুং অশক্যা।।”

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

“ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নাৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।।”

যে ধর্ম সম্যক্রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণকথায় জীবগণের রতি অর্থাৎ দৃঢ় অনুরাগ উৎপাদন না করে তাহার অনুষ্ঠান কেবল বৃথা পরিশ্রম মাত্র।

লোকে স্ব-স্ব বর্ণ ও আশ্রম বিভাগ-অনুসারে যে-সকল বিশুদ্ধ ধর্মকর্মের সম্যক অনুষ্ঠান করেন ভগবৎপ্রীতিই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ও ফল।

এইজন্য সর্বদাই একাগ্রমনে ভক্তপালক ভগবানের নাম-গুণাদির শ্রবণ, কীর্তন, ধ্যান ও পূজা করাই জীবের কর্তব্য এবং উহাই জীবের স্বধর্ম।

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

## জীবের কৃত্য

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০৪ পৃষ্ঠার পর]

অনেকের ধারণা-অর্থ না থাকলে ভগবান্ ও তদভক্তের সেবা সম্ভব হ'বে না। কিন্তু যদি ভগবান্ তাঁদের প্রচুর অর্থ প্রদান করেন, তবে তদ্বারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা সুষ্ঠুভাবে করতে সমর্থ হবেন। তাঁদের ঐরূপ বুদ্ধিকে সেবা-বুদ্ধি বলা যায় না, উহা কপট ভোগবুদ্ধিরই পরিচায়ক। শাস্ত্র বলেছেন,—

“তৃণানি ভূমিরুদ্ধকং বাক্ চতুর্থী চ সুনুতা।

এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যান্তে কদাচন।।”

অর্থাৎ—“অতিথি সেবার জন্য সদগৃহস্থের গৃহে অন্ততঃ পক্ষে তৃণ, ভূমি, উদক ও সুমিষ্ট বাক্যের অভাব হয় না। অথচ এই চারিটি বস্তুর দ্বারাই সদগৃহস্থ যথাযোগ্য অতিথি-সেবায় সমর্থ হন।” সুতরাং অর্থহীনতা অতিথি-সেবা, হরি-সেবা বা হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার ব্যাঘাত উৎপাদনে সমর্থ হয় না।

অর্থ থাকুক বা না থাকুক তজ্জন্য চিন্তা করার আবশ্যক নাই। প্রকৃত গৃহস্থভক্ত নিজ স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করে ভগবানে আত্মসমর্পণপূর্বক ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে গৃহ-পরিচালনায় নিম্নরূপ বুদ্ধি নিয়োজিত করেন;—

“আমার বলিতে প্রভু, আমার কিছু নাই।

তুমিই আমার মাত্র পিতা-বন্ধু-ভাই।।

বন্ধু, দারা, সুত-সুতা—তব দাসী-দাস।

সেই ত' সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস।।

ধন, জন, গৃহ, দার ‘তোমার’ বলিয়া।

রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া।।

তোমার কার্যের তরে উপার্জিত ধন।

তোমার সংসার-ব্যয় করিব বহন।।

ভাল-মন্দ নাহি জানি সেবা মাত্র করি।

তোমার সংসারে আমি বিষয়-প্রহরী।।

তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়-বাসনা।।

নিজসুখ লাগি কিছু নাহি করি আর।

ভকতিবিনোদ বলে, তব সুখ সার।।”

সূতরাং জাগতিক বিদ্যা, ধন, দ্রব্য-সামগ্রী প্রভৃতি ভগবান্ অচ্যুতের সেবায় নিযুক্ত হ'লেই সার্থক হয়, নতুবা তাহা অনর্থবর্ধক ও জড় সংসার-বন্ধনের হেতু হয়ে থাকে। নিষ্কাম ভক্ত দরিদ্র হ'লেও যথালোভে সন্তুষ্ট থাকেন, বিষয়াদি লোভে অর্থ সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করেন না ও তা'তেই পরম সুখ পেয়ে থাকেন। কারণ তাঁর যাবতীয় ভার ভগবান্ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে থাকেন।

**কুলধর্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্ম—উপাধিভূত ধর্ম,—জীবের স্বরূপের ধর্ম নহে**

জীব বা আত্মা যে পৃথিবীতে জড় দেহ ধারণ করে জন্মগ্রহণ করেছে, তা'র কারণ স্ব-সুখ-ভোগবাঞ্ছা ও প্রাকৃত গুণে আসক্তি। তটস্থ-স্বভাবসম্পন্ন জীব কৃষ্ণ বহিস্মুখতাক্রমে জড়া প্রকৃতি বা মায়াতে অধ্যাস হওয়ায় প্রকৃতির গুণজাত কার্যো কর্তৃত্ব অভিমান করে থাকে। প্রকৃতির সংসর্গকৃত কর্মদোষে মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি উত্তমোত্তম নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করে সুখ-দুঃখ ভোগ করে থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতে জানা যায়,—

“পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।

কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্যোনিজন্মসু।।” (গীতা ১৩।২২)

অর্থাৎ—জীব প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়েই প্রকৃতিজাত দেহে আত্মবুদ্ধি করে শোক-মোহ-সুখ-দুঃখাদি গুণসমূহকে নিজের বলে অভিমান করে ভোগ করে থাকে। প্রকৃতির গুণে আসক্তিবশতঃ জীবের শুভাশুভ কর্মাকৃত যে-যে জন্ম হয়, সেই সেই জন্ম অর্থাৎ দেবতা, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি নানা যোনিতে জন্মলাভ করে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়ে জড়দেহে আত্মবুদ্ধি হ'তে বিষাদযোগের উৎপত্তি। যখন মায়াবদ্ধজীব দেহকেই ‘আমি’ ও দৈহিক বিষয়গুলিকে ‘আমার’ বলে মনে করে, তখনই দেহধর্ম, কুলধর্ম, জাতিধর্ম, বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রভৃতি নৈমিত্তিক ধর্মগুলিকে নিত্য সনাতন ধর্ম বলে বিচার করে। দ্বিতীয় বস্তু মায়াতে অভিনিবেশবশতঃ মানুষ শোক-মোহ-ভয় প্রভৃতির দ্বারা অভিভূত হয়। কৃষ্ণ ও কার্ষ্য ব্যতীত অন্য প্রতীতিই দ্বিতীয় অভিনিবেশ। দেহাত্মবুদ্ধিমূলে যে ধর্মার্থধর্মের বিচার তা'কে মনোধর্ম বলে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের সংসারের প্রতি আসক্তি ছিল হয় না। যথা শাস্ত্র-বাণী,—

“তাবদ্ব্যয়ং দ্রবিশ-দেহ-সুহৃন্নিমিগুং শোক-স্পৃহা-পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।

তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্তিমূলং যাবন্ তেহজ্জিহ্বভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ।।”

(ভাঃ ৩।৯।৬)

“(শ্রীব্রহ্মা বললেন)— যে-কাল পর্য্যন্ত লোক ভবদীয় (ভগবৎ) অভয় পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, সে-কাল পর্য্যন্ত তার অর্থ, দেহ ও আত্মীয়স্বজন সুহৃদ্বর্গ

পাছে বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য ভয়, উহাদের বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগকে পাবার জন্য স্পৃহা, তাতে পরাভব (বিফল) হলেও তথাপি উহাদের জন্য বিপুল পিপাসা, পুনরায় কোন প্রকারে আকাজক্ষিত বস্তু লাভ হলে অনাত্মবস্তুতে ‘আমি’ ও ‘আমার’—এরূপ জড়শক্তি বর্তমান থাকে। দুঃখময় সংসারের উহাই মূল কারণ।”

অজ্জুন কুরু-পাণ্ডব উভয় সেনার মধ্যে দেহ-সম্বন্ধী ব্যক্তিগণকে দেখে তাঁদের প্রতি আত্মীয়বুদ্ধি (দেহ সম্বন্ধে আত্মীয়বুদ্ধি) করে শোক ও মোহগ্রস্ত হবার অভিনয় করেন। দেহাত্মবুদ্ধিযুক্ত ধর্মকে নিত্য শুদ্ধ সনাতন ধর্ম বলা যায় না। দেহ ও মন অনিত্য বলে তার ধর্মও অনিত্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ১।৩৬ শ্লোকে অজ্জুন বলছেন,—

“পাপমেবাত্ময়েদস্মান্ হৈত্বৈতানাততায়িনঃ।

তস্মান্নার্বা বয়ং হস্তং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।

স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব।।”

অর্থঃ—‘হে মাধব, এই সকল শত্রুদিগকে বধ করে আমাদের পাপই আশ্রয় করবে। সুতরাং সবান্ধব দুর্যোধনাদিকে বধ করা আমাদের উচিত নয়। যেহেতু আত্মীয়কে বিনাশ করে আমরা কি-প্রকারে সুখী হব?’ এস্থলে অজ্জুন বলতে চাইছেন—দুর্যোধনাদি আমার স্বজনবর্গ,—এঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বা এঁদের বধ করে আমার পাপ হবে; তাতে আমার পারলৌকিক সুখ ত’ দূরের কথা, ঐহিক সুখও হবে না। অজ্জুন কুল ধর্মকে শ্রেয়ঃ মনে করে নিজ বংশীয় জ্ঞাতি দুর্যোধনাদিকে বধ করতে অসম্মতি জানালেন ও যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হলেন। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত অজ্জুনের বিষাদ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বললেন,—

“অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।

গতাসূনগতাসুংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।। (গীতা ২।১১)

(শ্রীভগবান্ বললেন)—তুমি অশোচ্য বা শোকের অযোগ্য জনগণের নিমিত্ত অনুশোচনা করছ, আবার পণ্ডিতগণের ন্যায় কথাও বলছ। কিন্তু পণ্ডিতগণ প্রাণহীন বা প্রাণবান্ কারও জন্য শোক করেন না।

আত্মজ্ঞানরহিত অজ্জ মূর্খগণ তাদের পিতামাতা প্রভৃতির দেহ হতে আত্মা নির্গত হলে পিতামাতা প্রভৃতির দেহের নিমিত্তই শোক করে, সূক্ষ্মদেহের নিমিত্ত ও আত্মার নিমিত্ত শোক করে না। কারণ মূর্খগণ সূক্ষ্মদেহ ও আত্মার পরিচয় জানে না। তারা সচেতন পিতামাতার দেহকে তথা আত্মার সহিত দেহকে পিতামাতার দেহ বলে জানে। অজ্জুনের জ্ঞাতি-ভ্রাতা দুর্যোধন স্থূল-সূক্ষ্ম দেহযুক্ত আত্মা। প্রতি জীবের মৃত্যুতে প্রাপ্ত দেহের নাশ হয়, আর সূক্ষ্মদেহ মুক্তি বা জীবের স্ব-স্বরূপ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত অনশ্বর

থাকে। পণ্ডিতগণ আত্মার স্বভাব জানেন বলে আত্মার অবস্থিতিরহিত নশ্বর স্থূলদেহের এবং আত্মার অবস্থিতির সহিত নশ্বর সূক্ষ্মদেহের জন্য শোক করেন না। এইভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত অর্জুনকে দুর্যোধনাদির মৃত্যুর জন্য শোক করা অনুচিত জানিয়ে তাঁর বিষাদ দূরীকরণের চেষ্টা করলেন।

ভগবান্ আবার অর্জুনের নিকট জানতে চাইলেন,—প্রীতি-পাত্রের মৃত্যু দর্শনে জীবের শোক হয়, এক্ষণে অর্জুনের প্রীতির আষ্পদ আত্মা, না দেহ? আত্মাই যদি প্রীতির আষ্পদ হয়, তাহলে জীবাত্মা ও পরমাত্মা—উভয়েই নিত্য ও মরণরহিত হওয়ায় জীবাত্মা শোকের বিষয় হতে পারে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ২।১২ শ্লোকে ভগবান্ বললেন,—

“ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বৈ বয়মতঃ পরম্॥”

অর্থাৎ—আমি (পরমাত্মা) ইতঃপূর্ব্বে কখনও ছিলাম না, ইহা কিন্তু নয়; তুমি অর্জুন কখনও ছিলে না—ইহাও নয়। এই রাজাগণ যে কখনও ছিলেন না—এমনও নয়। ইহার পর আমি, তুমি ও এই রাজাগণ আমরা সকলে থাকব না—তাও নয়। এই সৃষ্টির অন্ত সময়ে (প্রলয়ে) আমি পরমাত্মা, তুমি জীবাত্মা ও রাজাগণ জীবাত্মা প্রত্যুত সকলেই থাকব। পরমাত্মা ও জীবাত্মা—উভয়েই নিত্য অর্থাৎ বাস্তব ভেদযুক্ত। ভগবানের সত্তা যেমন ত্রিকালসত্য, জীবের সত্তা ও তেমনই ত্রিকালসত্য। ভগবান্ আরও বলেছেন,—

“বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।

কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তিকম্॥” (গীতা ২।১১)

“হে পার্থ! যিনি জীবকে নিত্য, অজ, অব্যয় এবং অবিনাশী বলে জানেন, তিনি কি-প্রকারে কাহাকেও হত্যা করান বা হত্যা করেন?” ভগবান্ এস্থলে অর্জুনকে শিক্ষা দিলেন—‘হে অর্জুন! তোমার এরূপ জ্ঞান হলে তুমি নিজেকে বধ-ক্রিয়ার কর্ত্তা ও আমাকে প্রেরণাদাতা মনে করবে না। কারণ আমরা উভয়ে কেহই দোষভাগী হব না।’

দেহ চেতন থাকাকালীনই কুলধর্ম্ম থাকে, কিন্তু মৃত্যুর পর কুলধর্ম্ম থাকে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ২।২২ শ্লোক এস্থলে উল্লেখ্য;—

“বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্যান্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥”

অর্থাৎ—‘মানুষ যে-প্রকার জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে অপর নববস্ত্র পরিধান করে, সেই প্রকার জীবাত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে অপর নূতন দেহ ধারণ করে থাকে।’

যুদ্ধে মৃত্যু হ'লে আত্মা শরীরকে ছেড়ে চলে যায় ও তখন জীব কর্মফলানুসারে অন্য নব্য শরীর লাভ করে। জরাগ্রস্ত শরীর পরিত্যাগের পর নূতন শরীর প্রাপ্ত হলে তখন কি আর পূর্বতন দেহ সম্বন্ধীয় কুলধর্ম থাকে? দেহকে নিমিত্ত করেই কুলধর্মের উৎপত্তি ও নাশ হয়ে থাকে। তাই কুলধর্ম নৈমিত্তিক,—আদৌ নিত্যধর্ম নয়।

কুলধর্মের ন্যায় বর্ণাশ্রম-ধর্মও অনিত্য। আমরা অনেকে বর্ণাশ্রম-ধর্মের প্রতি আস্থাশীল। বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম—এই দুইটি ধর্ম একত্রে বর্ণাশ্রম-ধর্ম নামে পরিচিত। বর্ণধর্ম অর্থে আমরা বুঝি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটি বর্ণ; আর এই চারিটি বর্ণের প্রত্যেকটিতে অবিবাহিত অবস্থায় ব্রহ্মচার্য্য, স্ব-বর্ণের মধ্যে বিবাহিত অবস্থায় গৃহস্থ, দ্বী-সঙ্গ ত্যাগের পর বাণপ্রস্থ এবং তৎপরে সন্ন্যাস—এই চারিটি আশ্রম অধিকার-অনুসারে নির্ণীত আছে। যে সমস্ত মানবগণ চারি বর্ণের বহির্ভূত, তাদের অন্ত্যজ বলা হয়। স্বভাব, জন্ম, ক্রিয়া ও লক্ষণের দ্বারা বর্ণ নিরূপণ করাই শাস্ত্র-সম্মত। বৈধ জীবনযাপনের জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্মের প্রয়োজন হয়ে থাকে। কিন্তু আজকাল জন্ম-অনুসারে বর্ণ নিরূপণ হয়;—যেমন—ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ হয়, ক্ষত্রিয়ের সন্তান ক্ষত্রিয় হয়,—এইরূপ ভাবে জাতি-নিমিত্তে বর্ণপ্রথা চালু হয়েছে। শাস্ত্রানুসারে বর্ণবিভাগ কিভাবে করা উচিত এবং পুরাকালে কিভাবে বর্ণবিভাগ করা হত, তৎসম্পর্কে কিছু শাস্ত্রীয় বাণীর অবতারণা করছি।—

শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধে সর্ববর্ণের লক্ষণ বর্ণনা করে শেষে নারদমুনি বলেছেন,—

“যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম।

যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ।।” (ভাঃ ৭।১১।৩৫)

“মনুষ্যাগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে-সকল লক্ষণ কথিত হল, সেই সেই লক্ষণ যেখানে দেখা যাবে, সেই বর্ণে তাকে নির্দেশ করতে হবে। (কেবল জন্মদ্বারা বর্ণ নির্দিষ্ট হবে না)।”

উক্ত শ্লোকে প্রতিপাদিত হয়েছে যে, যাঁর ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা নাই অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্যতীত নিম্নজাতিতে জন্ম হয়েছে, এরূপ ব্যক্তির যদি শম, দমাদি গুণ দেখা যায়, তবে তাকেও শৌক্ৰ-জন্মনিমিত্ত বর্ণ নিরূপণ না করে তার লক্ষণদ্বারা বর্ণ নিরূপণ করাই বিধি হবে। অন্যথায় প্রত্যবায়গ্রস্ত হতে হবে।

পুরাকালে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে গুণ-কর্ম্যানুসারে বিভিন্ন বর্ণ বিভাগ হয়েছে;—

“ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।

ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কর্মভিবর্ণতাং গতম্।।”

(মহাভারত শাল্যপর্ব ১৮৮।১০)

“ভৃগু বলেছেন,—ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহের কোনপ্রকার পার্থক্য নাই। পূর্বের ব্রাহ্মণ-কর্তৃক সৃষ্ট সমগ্র জগৎ ব্রাহ্মণময় ছিল, পরে কৰ্ম্মদ্বারা বিভিন্ন বর্ণসংজ্ঞা লাভ করে।”

মহাভারতে স্পষ্টভাবে কীর্তিত হয়েছে,—

“শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষণং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।

ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ।।”

(মহাভারত শাল্যপর্ব ১৮৯।৮)

অর্থাৎ—“শূদ্রে যদি বিপ্র-লক্ষণ দেখা যায় এবং ব্রাহ্মণে যদি শূদ্র-লক্ষণ উপলব্ধ হয়, তাহলে শূদ্র শূদ্রবাচ্য হয় না এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হতে পারে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন,—

“চাতুৰ্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকৰ্ম্মবিভাগশঃ।

তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্যাকর্তারমব্যয়ম্।।” (গীতা ৪।১৩)।

অর্থাৎ— “গুণ ও কৰ্ম্মের বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র— এই চারিবর্ণের বিশেষত্ব সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টাদি-কার্য্যে আমি কর্তা হলেও আমাকে অকর্তা ও অব্যয় বলে জানবে অর্থাৎ বর্ণ ও আশ্রমধৰ্ম্মের সৃষ্টি আমার বহিরঙ্গ মায়াশক্তির দ্বারাই হয়ে থাকে; আমি স্ব-স্বরূপে ঐ সকল কার্য্য হতে উদাসীন থাকি।” উক্ত শ্লোকে ভগবান্ অজ্জুনকে বলেছেন,—আমি ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের স্রষ্টা, কিন্তু পরক্ষণেই আবার বলেছেন—“মাং বিদ্বি অকর্তারম্ অব্যয়ম্”—অর্থাৎ অব্যয় আমাকে উক্ত বর্ণ চতুষ্টয়ের স্রষ্টাই বলে জানবে। ভগবান্ শুধুমাত্র বর্ণচতুষ্টয়ের স্রষ্টা নন, তিনি সকল বিষয়েরই স্রষ্টা—একথা সত্য; তথাপি তিনি যে স্ব-স্বরূপে বর্ণধৰ্ম্ম সৃজন করেন নি, তাতে অজ্জুনের বিশ্বাস স্থাপনের জন্য “মাং অকর্তারং বিদ্বি”—এইরূপ বলেছেন। ভগবান্ স্ব-স্বরূপে বর্ণবিভাগ করলে কেহ কেহ তাঁর বৈষম্যদোষ দিতে পারে, কিন্তু তিনি বর্ণ-বিভাগকর্তা নন এবং তিনি অব্যয় অর্থাৎ তিনি নির্লিপ্ত ও সাম্যভাবাপন্ন— এই কথা বলায় তাঁর কোনই বৈষম্যদোষ থাকে না। এ পৃথিবীতে চাতুৰ্ব্বর্ণ-বিধান মনুষ্যের পক্ষেই প্রযোজ্য। উক্ত ভগবদ্বাক্যে জানা যায়—বর্ণবিভাগ গুণ ও কৰ্ম্মের বিভাগ অনুসারেই সংঘটিত হয়। গুণ-কৰ্ম্মকে স্বীকার না করলে ভগবদ্বাক্যকেই অমান্য করা হয় ও তাতে বর্ণবিভাগের কোনই মর্যাদা থাকে না।

গুণ-কৰ্ম্ম বিভাগের পদ্ধতি (Process) কিরূপ হবে, তারও নির্দেশ ভগবান্ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ব্যক্ত করেছেন,—

“ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।

কৰ্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভৈবগুণৈঃ।।” (গীতা ১৮।৪১)

হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কৰ্ম্মসমূহ স্বভাবজাত সত্ত্বাদি



গুণ অনুসারে বিভক্ত হয়েছে। স্বভাব-বিরুদ্ধ কর্ম করতে গেলে সেই কর্ম সুষ্ঠু ও ফলপ্রদ হয় না। চিত্তস্বরূপ জীব কৃষ্ণ-বর্হিস্মুখতাদোষে মায়ার ত্রিগুণের দ্বারা অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি গুণের দ্বারা নশ্বর দেহে আবদ্ধ হয়। যথা,—  
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-প্রমাণ,—

“সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।

নিবল্লন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥” (গীতা ১৪।৫)

“(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন,—) হে মহাবাহো! জড় প্রকৃতি বা ময়াশক্তি হতে জাত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই গুণত্রয় দেহমধ্যে অবস্থিত নির্বিকার দেহী জীবকে সুখ-দুঃখাদি ভোগে আবদ্ধ করে।” দেহের কারণভূত গুণত্রয় মায়িক হওয়ায় তদ্বারা জীবের সংসার বন্ধন হয় ও কর্মফল অনুসারে সংসারেই উচ্চ-নীচ যোনিতে যাতায়াত করতে হয়। জীব নির্গুণ হলেও বদ্ধদশায় প্রবেশ করে প্রাচীন সংস্কারবশতঃ কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিস্মৃতি প্রযুক্ত সগুণ স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছে। তাই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই গুণত্রয় ময়াবদ্ধ জীবের স্বভাব-সিদ্ধ হয়েছে।

এক্ষণে চারিবর্ণের কর্মসমূহ কিভাবে নিরূপিত হবে? “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ”—(গীতা ৩।২৭) অর্থাৎ— প্রকৃতির গুণের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়মান কর্মসমূহ—এইরূপ কথিত হওয়ায় সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণের বৈষম্য থেকে জীবের যে স্বভাব গঠিত হয়েছে, সেই স্বভাবজনিত গুণ অনুসারে কর্মসকল নিরূপিত হবে—ইহাই শাস্ত্র-নির্দেশ। (ব্রহ্মশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

## গৌড়ীয় মঠের সকলেই প্রভু!

আমাদের মহাপরাক্রম পূর্ব্বপুরুষগণ তোমাদের বিষদন্ত উৎপাটন করিয়া বেদন্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মনে হইতেছে, উহার যন্ত্রণা এতদিনে কিছুটা উপশম হইয়াছে। তাই পুনরায় স্বভাব-সুলভ মাৎস্য লইয়া আবার মাথাচাড়া দিতেছ। তাই সহজিয়া মাৎস্যময় বিগ্রহটিকে তোমরা সাধুর মোড়কে আবৃত করিয়াছ—‘কাঠালের আমসত্ত্ব’—কে আর প্রবাদমাত্র না রাখিয়া প্রমাণস্বরূপে খাড়া করিয়াছ। তোমাদেরই বা কি দোষ— তোমাদের আসলে মাৎস্যময়্যের ধাতু। বেশের সহিত মাৎস্যময়্যের কোন দ্বৈষ নাই। মাৎস্য্য কুপিত হইলে নিরপেক্ষতা নিস্তেজ হইয়া পড়ে, শাস্ত্র-দর্শনের চক্ষু ছানিগ্রস্ত হয়, ঔদ্ধত্যের চাপ বাড়িয়া যায়, অবশেষে বৈষম্যবিন্দা উদ্গীর্ণ হইতে থাকে। কোমল শ্রদ্ধালুগণ তোমাদের সেই হলহলে ক্লিষ্ট হইয়া তত্ত্বদ্রষ্টাকেই বরণ করিয়া লয়। জ্ঞান-

চক্ষু উন্মীলনের আর অবকাশ হয় না।

শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত বৈষ্ণবগণ দীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পরস্পরকে ‘প্রভু’ বলিয়া সম্বোধন করেন। কিন্তু ভায়া হে! গৌড়ীয় মঠ যে-স্থলে মৎসরতার ‘বিষয়’ এবং তোমরা উহার আদর্শ ‘আশ্রয়’, সে-স্থলে ‘প্রভু’ সম্বোধন তোমাদের জন্য মাৎসর্যের উদ্দীপন। সুতরাং উহাতে যথাযথরূপেই বিভাবিত হইয়া তোমরা বিদ্রূপের ‘অনুভাব’ ব্যক্ত কর,—“গৌড়ীয় মঠের সকলেই প্রভু!” তজ্জন্য আবার উহার সমর্থনে কেমন একটি তত্ত্বও খাড়া করিয়াছ,—“এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন। দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ।।” ( চৈঃ চঃ আঃ ৭।১৪)। বলিতেছ,—‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রই একমাত্র ‘মহাপ্রভু’ এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র এই দুইজনই ‘প্রভু’-পদবাচ্য। এবং এই প্রভুদ্বয়ের শৌক্য (!) অধস্তনগণও ‘প্রভুবংশের’ অন্তর্গত হওয়ায় পরবর্তীতে তাঁহারা কেবল প্রভু-পদের সর্বসত্ত্বসংরক্ষক—আর কেহই নহে।’ আমরা তোমাদের এরূপ অববর্চনিতাকে সকলের নিকট প্রকাশ করিয়া দিব।

ভাবিতেছি—শাস্ত্র-কথিত “আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ” অথবা “কৃষ্ণং বন্দে জগদগুরুম্” ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ তোমরা কিরূপ করিবে অথবা করিতেছ! উপরি উল্লিখিত ব্যাখ্যানুসারে হইলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁহার শৌক্যবংশে (!) জাত ব্যক্তিগণই কেবল ‘আচার্য্য’ বা গুরু হইতে পারিবেন—আর কেহই নহে। তাহা হইলে ত’ যাদবকুল ধ্বংস হইলে পর জগৎ আচার্য্য-শূন্য কিংবা গুরুশূন্য হইয়া গেল! কিংবা “ত্বমেব মাত চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব”—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর এই বাক্য অনুকরণ করিয়া তোমরা হয়ত শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন এই জগতের আর কাহাকেও ‘মাতা’ ‘পিতা’ কিংবা ‘বন্ধু’ বলিয়া সম্বোধন বন্ধ করিয়া দিয়াছ। এইজন্যই কথিত আছে—শাস্ত্র পড়িয়া কেহ তরে আর কেহ মরে।

সর্বকারণকারণ শ্রীভগবান্ চিন্ত্য-অচিন্ত্য সর্বপ্রকার গুণের পূর্ণতম আধার। অপরদিকে সকলপ্রকার প্রাকৃত গুণশূন্য বলিয়া তিনি নির্গুণ। তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছায় ও অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে তাঁহার অপরিমিত বৈশিষ্ট্যের যে অংশ যত পরিমাণে যে-স্থলে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাঁহারা সেই সেইরূপেই মহিমাম্বিত হইয়াছেন। এইরূপেই ব্রহ্মত্ব, শিবত্ব, দেবত্ব, গুরুত্ব, পিতৃত্ব, মাতৃত্ব প্রভৃতির উদয় হইয়াছে এবং সেই প্রকারেই নামকরণের রীতি প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ভাই সহজিয়া! তোমাদের যুক্তি অনুসারে ব্রহ্মার অধস্তনগণ তাই বলিয়া সকলেই ব্রহ্মা এবং এইরূপে শিবের, ইন্দ্রের, দেবতাগণের শৌক্য বংশধরগণ পৈতৃক-সূত্রে সেই সেই পদবীর দাবীদার হইতে পারেন কি? পুনরায়, তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, গুরু, পিতা, মাতা প্রভৃতিরূপে সম্বোধন কলি উহাতে তাঁহার প্রীতিবিধান হইবে ত’? তোমরা নিশ্চয়ই ‘মর্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারো সহিতে’ (চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৬৬)—মহাপ্রভুর বাণী বিস্মৃত হইয়াছ। অথবা মহাপ্রভুর ভক্তের এই প্রার্থনা সম্বন্ধে অবগত নহ—

“সকলে সম্মান, করিতে শক্তি, দেহ নাথ যথাযথ। তবে ত’ গাইব, হরিনাম সুখে, অপরাধ হ’বে হতা।”

তথাকথিত “প্রভু-বংশ” বা “আচার্য্য-বংশের” একচ্ছত্র প্রভুত্ব কিংবা আচার্য্যত্ব ইহা তোমাদের নিছকই কল্পনা। শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কিংবা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কেহই কোনস্থানেই এইপ্রকার উক্তি প্রমাণস্বরূপে আমাদের জন্য রাখিয়া যান নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীরায়রামানন্দ-প্রভুর সহজাত গুরুত্ব বুঝাইতে তাঁহাকে বলিলেন,— “কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।” শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে অবস্থান-সময়ে তিনি যবন-কুলোদ্ভূত (কিন্তু অযবন) শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যত্ব-ঘোষণা করিয়াছিলেন,— “আচার-প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য। তুমি সর্বগুরু, তুমি জগতের আর্ঘ্য।” এখন বলত’, একচ্ছত্র আধিপত্যের এমত অধিকার তোমাদিগকে কাঁহারা দিয়াছেন? শ্রীমদ্ভাগবতের “যস্য যল্লক্ষণং” শ্লোকের প্রতি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়াই তোমরা উদাসীন থাক—শুনিয়াও শুন না, বুঝিয়াও বুঝ না।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার পরম ইষ্টদেব শ্রীগৌরসুন্দরের বন্দনা করিয়াছেন,— “নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ। স-ভৃত্যায় স-পুত্রায় স-কলত্রায় তে নমঃ।” ভায়া হে! বলত’ এইস্থলে ‘সপুত্র’-শব্দে মহাপ্রভুর কোন শৌক্রেপুত্রকে বুঝান হইয়াছে? ‘শ্রী’-শক্তিস্বরূপা লক্ষ্মীপ্রিয়া কিংবা ‘ভু’-শক্তিস্বরূপা’ বিষ্ণুপ্রিয়া কাহারও দ্বারাই’ তিনি কোন শৌক্রেবংশের (!) সূত্র রাখিয়া যান নাই। তবে কি ইহাকে তোমরা নিতামুক্ত ভগবৎপার্যদ শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের প্রলাপোক্তি বলিয়া চলাইয়া দিবে? সেই ধৃষ্টতাকে ধিক্কার দিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়া শ্রবণ কর। ‘সঙ্কীর্ণনৈক-পিতরৌ’—বাক্যানুসারে ‘সঙ্কীর্ণন-যজ্ঞ’ যেরূপ তাঁহার পুত্ররূপে ব্যাখ্যাত হয়, আবার তাঁহার উদাসীন ‘গোস্বামী’ শিষ্যগণও ‘পুত্র’-পর্য্যায়ে গৃহীত হইয়াছেন। উহারই দ্যোতনা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের কীর্তনে পাওয়া যায়— “হা হা প্রভু সনাতন ‘গৌর-পরিবার’।” পুনরায় ইহারই প্রতিধ্বনি শ্রীব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়-সারস্বত গুরু-পরম্পরায় শ্রুত হইয়া থাকে— “সর্বের তে গৌরবংশাশ্চ পরমহংস বিগ্রহাঃ। বয়ঞ্চ প্রণতাদাসান্তদুচ্ছিষ্ট-গ্রহগ্রহাঃ।” —এই সব পরমহংস, গৌরঙ্গের নিজ বংশ, তাঁদের উচ্ছিষ্টে মোর কাম।।’

সুতরাং ‘বংশ’ বলিলেই যে তোমরা শৌক্রে অধস্তনগণকে বুঝিয়া থাক, তাহা ঠিক নহে। কেন বলিতেছি, তাহা শুন—প্রভুর শৌক্রেপুত্রে যে প্রভুত্বের অবিমিশ্র অধিষ্ঠান বলবৎ থাকিবে—তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর ছয় পুত্র ছিলেন—তন্মধ্যে ‘অচ্যুতানন্দ’, ‘কৃষ্ণমিশ্র’ ও ‘গোপাল’ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত ছিলেন বলিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহাদিগকে ‘সার’-রূপে ঘোষণা করিয়াছেন। অপর পুত্রত্রয় ‘বললাম’, ‘স্বরূপ’ ও ‘জগদীশ’ শ্রীগৌরচন্দ্রের

বিরোধিতা করায় তিনি তাঁহাদিগকে ‘অসার’-রূপে উল্লেখ করিয়া ধান্যরাশির পাতনার ন্যায় উড়াইয়া দিয়াছেন। সুতরাং দেখিতেছ—অবিমিশ্র পিতৃসত্তা পুত্রে কিংবা শৌক্ৰবংশে আরোপণ কখনই সূক্ষ্মবিচার সম্মত নহে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলেও তোমাদিগকে হতাশাই হইতে হইবে।। অতএব ‘প্রভুবংশ’কে শৌক্ৰবংশের ন্যায় তোমাদের ভাবিয়া লওয়ার কোন ভিত্তিই নাই—এইবার বুঝিয়াছ?

ভাই সহজিয়া! “এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন”—ইহার ব্যাখ্যা তোমরা কিরূপে করিলে! শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তোমাদের এরূপ প্রলাপে নিশ্চয়ই ব্যাখিত হইতেছেন। তিনি মূলতঃ সেইস্থলে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র—তাঁহারা সকলেই বিষুত্তত্ত্ব। তথাপি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই তাঁহাদের মধ্যে পরাৎপরতত্ত্ব—তজ্জন্য তিনি ‘মহাপ্রভু’। শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুদ্বয় বিষুত্তত্ত্ব হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের সেবামৃত-পানে প্রলুদ্ধ হইয়া শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের সেবায় সতত নিযুক্ত। ‘ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে। সেইভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে।।’—(চৈঃ চঃ অঃ ৬।৮৬)। সুতরাং এইস্থলে ‘মহাপ্রভু’ এবং ‘প্রভু’-শব্দের উল্লেখ দ্বারা তাঁহাদের তিনজনকেই যেমন বিষয়বিগ্রহ এবং আরাধ্য-তত্ত্বরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, অপরদিকে তাঁহাদের মধ্যেও তারতম্যও উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ‘প্রভুত্বের’ একচ্ছত্র আধিপত্য কল্পনা করিবার অবকাশ তোমাদের কিরূপে হইল?

ভায়া! পঞ্চতত্ত্বের প্রথম তিনতত্ত্ব যখন ‘মহাপ্রভু’ ও ‘প্রভুদ্বয়’-রূপ চিহ্নিত হইলেন, তখন অপর দুই তত্ত্বকে কি তোমরা প্রভুত্বহীন-রূপে বিবেচনা করিয়াছ? তাঁহাদিগকে ‘প্রভু’ বলিয়া সম্বোধন করিতে তোমাদের আপত্তি কিসের? তাহা হইলে বলি শ্রবণ কর—‘বিষয়’ ও ‘আশ্রয়’ভেদে ‘প্রভু’ দুই প্রকার। কেবল বিষয়বিগ্রহের মধ্যেই যাঁহারা প্রভুত্ব বুঝিয়া থাকেন, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতীয়-বিচারে ‘প্রাকৃত ভক্ত’। আশ্রয়বিগ্রহের মধ্যে প্রভুত্বের উপলব্ধি হইলেই বিষয়জাতীয় প্রভুর আশ্রিত হইবার সৌভাগ্য উদয় হয়। তজ্জন্যেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ব্যক্ত করিয়াছেন,—“সেই রূপ-রঘুনাথ প্রভু যে আমার।” ( চৈঃ চঃ অঃ ১০।১০৩)। কিন্তু কবিরাজ ঠাকুরের এই উক্তি তোমাদের মাৎসর্যময় দৃষ্টি, কর্ণ বা হৃদয় কোথাও প্রবেশ করে নাই। আরও দেখ—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গুরু-বৈষ্ণবগণকে ‘প্রভু’-রূপে সম্বোধন করিবার শিক্ষা তাঁহার কীর্ত্তনের ছত্রে ছত্রে কিরূপে সম্পূর্ণ করিয়াছেন!—

“হা হা প্রভু লোকনাথ রাখ পদদ্বন্দ্বে। কৃপাদৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে।।”

“হা হা প্রভু সনাতন, গৌর পরিবার। সবে মিলি বাঞ্ছাপূর্ণ করহ আমার।।”

“দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস। রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস।।”

‘বৈষ্ণব-বিজ্ঞপ্তি’তে—

“অদোষদরশি প্রভো! পতিত উদ্ধার। এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার।।”

সহজিয়া ভায়া! তোমার চিত্ত দেখিতেছি এখনও সংশয়াপন্ন। ‘সংশয়াত্মা বিনশ্যতি’—গীতার এই বাক্যে তোমার অবশ্যস্তাবী বিনাশের পূর্বাভাস ঘোষিত হইয়াছে—সুতরাং সাবধান! ‘জীবের স্বরূপ হয় নিত্য-কৃষ্ণদাস’—ইহাকে তোমরা কি-প্রকারে বুঝিয়া থাক? কেবল ‘কৃষ্ণদাস’-রূপে নিজকে অভিমান করিয়া কৃষ্ণকে ‘প্রভু’ বলিয়া অনন্ত-জীবন তারস্বরে চীৎকার করিলেও ‘দন্ত’-দৈত্যের করাল গ্রাস হইতে নিস্তার পাইবে না। বৈষ্ণবদাসানুদাসত্বের বিচার নিম্নপটে গ্রহণ করিয়া তৃণাদপি-সুনীচতার আদর্শে অভিযুক্ত হইতে পারিলেই ‘সঙ্কীর্ণ-মহাযজ্ঞে আহুত হইবার অধিকার লাভ হয়। ইহা যত শীঘ্র বুঝিবে, ততই মঙ্গল। বৈষ্ণবদাসানুদাস’—কথাটি তোমরা কেবল মুখেই বলিয়া থাক। কিন্তু বৈষ্ণবকে ‘প্রভু’ বলিতেই যত তোমাদের আপত্তি—সুতরাং তোমাদের বৈষ্ণবদাসানুদাসত্ব এক নির্ভেজাল কপটতা। সম্রাট কুলশেখরের প্রার্থনা তোমাদের পিচ্ছিল হৃদয়ে কখনই প্রবেশ করিতে পারে না—

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে

মৎপ্রার্থনীয় মদনুগ্রহ এষ এব।

তদভূতভূত-পরিচারক-ভূতভূত

ভূতাস্য ভূতা ইতি মাং স্মর লোকনাথ।।

হে মধুকৈটভাশাতন! হে লোকনাথ! আমার জন্মের ইহাই ফল, ইহাই আমার প্রার্থনা এবং ইহাই আমার প্রতি অনুগ্রহ, যে তুমি আমাকে তোমার ভূতের ভূত, তাঁহার ভূতের ভূত, তাঁহার ভূতের ভূত ও সেই ভূতের ভূতারূপে মনে কর। ‘শ্রীদেবকীনন্দন-দাস প্রভু সেই সহজ-দৈত্যেরই শিক্ষা তাঁহার ‘বৈষ্ণব-বন্দনা’য় সংরক্ষণ করিয়াছেন,—“ইয়াছেন হইবেন প্রভুর যত দাস। সভার চরণ বন্দৌ দস্তে করি’ ঘাস।।” ভাই সহজিয়া! তোমরা কিন্তু এইরূপ বিচার হইতে শতযোজন দূরে অবস্থান করিতেছ। তোমাদের অশ্রুপাত কুণ্ডীরাশ্রু-তুল্য, তোমাদের দস্তে তৃণ-ধারণ পশ্চাৎ হইতে মস্তকে জাঠি মারিবার ন্যায়, তোমাদের বৈষ্ণবতা—কপটতা। ‘গৌড়ীয় মঠের সকলেই প্রভু’—ইহা তোমাদের মাৎসর্য্যগর্ভ উক্তি। প্রকৃতপক্ষে গৌড়ীয় মঠের সকলেই তৃণাদপি সুনীচতার মস্ত্রে দীক্ষিত। তাঁহারা স্বয়ং প্রভু হইতে চাহেন না—অমানীমানদত্ত্বের বিচারে অপরকে ‘প্রভু’ গুণে সম্মান প্রদান করেন। এইসকল সুসূক্ষ্ম বিচার তোমাদের মাৎসর্য্য-মলিন হৃদয়ে দাগ কাটিবে না। আমরা তোমাঙ্গিকে দুঃসঙ্গ বজ্জনীয় বিচারে দূর হইতেই দণ্ডবৎ-প্রণাম করি।

—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

## সাধ্য-বস্তু

‘সাধ্যবস্তু’ সাধন বিনা কেহ নাহি পায়।

কৃপা করি’ কহ রায় পা’বার উপায়।।

শ্রীম্মহাপ্রভু সংসার-চক্রে আবর্তিত ত্রিতাপজ্বালায় জজ্জরিত জীবের চরম কল্যাণ লাভের উপায় যে সাধ্যবস্তু তাহা নির্ণয়ের জন্য শ্রীরামানন্দ রায়কে নির্দেশ করিলেন শ্রীরায় স্বধৰ্ম্মাচরণ হইতে শুরু করিয়া, শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবাকে চরম সাধ্য বলিয়া জানাইলেন। আর সেই সাধ্যবস্তু প্রেমসেবা পাইবার উপায় জানাইলেন, ব্রজসখীর আনুগত্য। ব্রজগোপীর আনুগত্যরূপ সাধন ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবারূপ সাধ্যবস্তু লাভ সম্ভব নহে।

কিন্তু সেই সাধ্যও সাধন উভয়ই কিভাবে লাভ হইবে?—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

সাধ্য ও সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।

হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তনে মিলিবে সকল।।

ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরযুক্ত এই হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন হইতেই সকলপ্রকার অনর্থমুক্ত হইয়া সাধ্য সাধন সমস্তই মিলিবে। শ্রীম্মহাপ্রভু শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে নামাচার্য্য করিয়াছেন। সারাজীবন ধরিয়া তিনি তিন লক্ষ ‘হরে কৃষ্ণ’—এই নাম সাধন করিয়াছেন সাধ্যবস্তু প্রাপ্তির আশায়। কিন্তু তাঁহার নির্যাতনের সময় তিনি মহাপ্রভুর শ্রীচরণে ব্রজপ্রেমরূপ সাধ্যবস্তু কামনা না করিয়া, প্রার্থনা করিলেন,—

হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল চরণ।

নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদবদন।।

জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম।

এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িমু পরাণ।।

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর তাঁহার নির্যাতন হইতে শিক্ষা দিলেন,—‘হরে কৃষ্ণ’ নামই সাধন ও শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণ প্রাপ্তিই সাধ্য।

কিন্তু আমার ন্যায় বদ্ধ জীবের ইহাই প্রশ্ন, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যিনি সারাজীবন তিনলক্ষ ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত শ্রীহরিনাম অভ্যাস করিয়াছেন, তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে কেন ‘হরে কৃষ্ণ’ নাম ছাড়িয়া ‘কৃষ্ণচৈতন্য’ নাম উচ্চারণ করিলেন? আর কেনই বা সাধ্যবস্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা অভিলাষ না করিয়া, শ্রীচৈতন্যচরণ বঞ্চে ধারণ করিয়া শ্রীচৈতন্যমুখচন্দ্রিমা দর্শন করিলেন?

কলিযুগের যুগধৰ্ম্ম শ্রীহরিনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন। মহাপ্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন,—

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধৰ্ম্ম।

সর্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্রমৰ্ম্ম।।

আবার বলিয়াছেন,—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।

নাম হৈতে হয় সর্বজগৎ নিস্তার।।

কেবল হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তনই করিতে বলিয়াছেন মহাপ্রভু এবং শ্রীহরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তনই শাখাপ্রশাখা সমন্বয়ে নিজে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীনামানামী অভিন্ন জানিয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও তিনলক্ষ হরিনাম অভ্যাস করিয়াছেন সাধ্যবস্ত ব্রজপ্রেম পাওয়ার আশায়। তথাপি কেন শ্রীচৈতন্য চরণ প্রাপ্তিই সাধ্য হইল? শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যবিগ্রহ, আর শ্রীগৌরসুন্দর ঔদার্য্য-বিগ্রহ। ঔদার্য্য-বিগ্রহের সেবার মাধ্যমে মাধুর্য্য-বিগ্রহের সেবা কিভাবে সম্ভব?

শ্রীকৃষ্ণ—সন্তোগ-বিগ্রহ, শ্রীগৌরসুন্দর—বিপ্রলভ-বিগ্রহ। সন্তোগময় রসিকশেখর কৃষ্ণচন্দ্র নিজের প্রেমরস নির্য্যাস আশ্বাদনের জন্য এবং রাগমার্গে ব্রজগোপীরা তাঁহাকে যেভাবে সেবা করেন, সেই রাগমাগীর্ষ্য ভক্তি সর্বজীবের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য স্বয়ং গৌরসুন্দররূপে প্রকাশিত হন।

প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আশ্বাদন।

রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।।

রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।

এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদগম।।

গৌরসুন্দর সে-কারণে পরম করুণাময় ঔদার্য্য-বিগ্রহরূপে ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক, রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপে প্রকাশিত।

কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।

আপনা আশ্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব।

ভক্তভাবে কেবল নিজে একাকী আশ্বাদন করিলেন না; সেই মধুর প্রেমরস নির্য্যাস রাগমাগীর্ষ্য ভক্তির দ্বারা ঔদার্য্য-বিগ্রহরূপে পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সকলকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিয়াছেন,—‘নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম ও ব্রজপ্রেম—এই দুইটি প্রচার করিবার জন্য আমি প্রকট হইতে ইচ্ছা করিতেছি। যদিও যুগধর্ম্ম প্রচারকার্য্য অংশাবতারদ্বারা হইতে পারে, তথাপি পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমি ব্যতীত ব্রজপ্রেম প্রচার আর কেহই করিতে পারেন না।

যুগধর্ম্ম প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে।

আমা বিনা অন্যে নাহে ব্রজপ্রেম দিতে।।

সে-কারণে মাধুর্য্য-বিগ্রহ ঔদার্য্যরূপ ধারণ করিলেন। কেবল ঔদার্য্যরূপ ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, পঞ্চতত্ত্বরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়া, প্রেমরসের নিত্য আশ্বাদন ও বিতরণ করিতে লাগিলেন।

সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি’ পৃথিবী আসিয়া।

পূর্ব্বপ্রেম ভাণ্ডের মুদ্রা উঘাড়িয়া।।

পাঁচে মিলি’ লুটে প্রেম করে আশ্বাদন।

\* \* \* \*

পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।  
 যেই যাহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান॥  
 লুটিয়া, খাইয়া, দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।  
 আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শতগুণ বাড়ে॥  
 উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।  
 স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা সকলই ডুবায়॥  
 সজ্জন, দুর্জ্জন, পদ্ম, জড়, অন্ধগণ।  
 প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥  
 জগৎ ডুবিল, জীবের হইল বীজনাশ।  
 তাহা দেখি' পাঁচ জনের পরম উল্লাস॥

আবার শিক্ষাষ্টকের অষ্টকালীয় ভজনের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম-মাধুর্য্যের সেই চরম উৎকর্ষ জীবকে অবগত করাইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অমন্দোদয়ার সিদ্ধনে “জীব কেবলমাত্র কৃষ্ণভজন কর, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। “কৃষ্ণভজন ত্যাগ করিয়া চৈতন্যভজনে শ্রীচৈতন্যের দয়া নাই—সেই ভজন কলিজাত কাল্পনিক।” যাহারা কেবলমাত্র চৈতন্যভজনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা গৌরনাগরী বা গোরাভজা অপসম্প্রদায়ভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়ার লেশমাত্র সেখানে স্পর্শ করে না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার।

বিচার করিলে চিন্তে পাবে চমৎকার॥

তাহা হইলে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যণ-সময়ে মহাপ্রভু তাঁহার দ্বারা যে লীলা প্রকাশ করিলেন, তাহাকে কি ‘কৃষ্ণভজন’ ত্যাগ করিয়া চৈতন্যভজন বলা যায়?—না, কখনই নয়। তাহা হইলে মহাপ্রভুর অমন্দোদয়ার যে প্রকাশ কি তাহা তাঁহার নির্য্যণ-মূহুর্ত্তে প্রকাশ পাইত? এখানে যে শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণ-প্রাপ্তিই ‘সাধ্য’ বলিয়া এবং ‘কৃষ্ণচৈতন্য’ নাম জিহ্বায় উচ্চারিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য অতীব মধুর ও প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

ব্রজগোপীভাব,

হইবে স্বভাব,

আনভাব না রহিবে।

‘সাধন’ এই যে ব্রজগোপীভাব ইহা একমাত্র কলিযুগধর্ম্ম শ্রীনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের ফলে লাভ হয়। কিন্তু সেই যুগধর্ম্ম যদি অংশবতারদ্বারা প্রচারিত হয়, তাহা হইলে সেই শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা কৃষ্ণানুশীলন হইলেও ব্রজগোপীভাব লাভ হইবে না।

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।

তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।

কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥



আর সেই যুগধর্ম যখন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দররূপে নিজে আসিয়া এক হাজার কলির মধ্যে যখন নির্দিষ্ট একটী কলিতে প্রচার করেন, তখন সেই গোপীভাব ও ব্রজপ্রেম যথা তথা দান করেন, পাত্রাপাত্র বিচার করেন না। ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের অমন্দোদয়া।

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলা যথা তথা।

জগাই-মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা।।

স্বতন্ত্র দৈশ্বর প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার।

বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার।।

অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য নাম যেই লয়।

কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাস্ত্র বিহুল সে হয়।।

‘কৃষ্ণ’নাম করে অপরাধের বিচার।

কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার।।

চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।

নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার।।

সে-কারণে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, নামাচার্য্য হইয়া জীবশিক্ষার জন্য, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে জিহ্বায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম উচ্চারণ করিলেন।

আর শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণ-প্রাপ্তিই ‘সাধ্যবস্তু’ কেন? শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ প্রাপ্তিতে, ঔদার্য্যদ্বারে, মাধুর্য্য প্রকোষ্ঠে প্রবেশ। শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় “শ্রীচৈতন্য-ভজন বলিতে কৃষ্ণত্যাগ করিয়া রাধাকৃষ্ণের গৌরভজন বুঝায় না। তাদৃশ কল্পিত ভজনরূপ মায়ার দাস্যে কৃষ্ণ প্রেমমাধুর্য্যের অবস্থিতি নাই। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ উদার এবং ঔদার্য্যের অভ্যন্তরে মধুর। কৃষ্ণের উদারতা—কেবল মুক্তসিদ্ধ ও আশ্রিত জনগণের উপর; গৌর-নিত্যানন্দের ঔদার্য্য-স্রোতে অনর্থযুক্ত অপরাধী জীব ভোগময় অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৌর-কৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করেন। কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করেন, গৌর-নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই। অপরাধী কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলে কখনই নামফল (কৃষ্ণপ্রেমা) লাভ করেন না। গৌর-নিত্যানন্দের নাম গ্রহণকারী অপরাধী থাকাকালে নাম করিতে করিতে অপরাধ-মোচনান্তে নামফল লাভ করেন। ইহার বিচার সিদ্ধান্ত এই যে, গৌর-নিত্যানন্দের নিকট কৃষ্ণবিমুখ সাধক কৃষ্ণগমুখ হইবার জন্য গমন করেন।” সেইজন্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর জিহ্বায় ‘কৃষ্ণচৈতন্য’ নাম উচ্চারণ করিয়া শিক্ষা দিলেন।

ঔদার্য্যেই মাধুর্য্যের পরিপূর্ণতা। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের কৃপায় ঔদার্য্যের দ্বারেই মাধুর্য্য সেবালাভ। অপরাধী জীব গৌর-নিত্যানন্দের নামের দ্বারা গৌরপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করেন। “অনর্থযুক্ত অবস্থায় ও জগদগুরু শিক্ষকদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারা তাহাদিক্কে স্বয়ংরূপ ও স্বয়ং প্রকাশের স্বরূপ উপলব্ধি করান, তাহাতেই জীবের স্বরূপ জ্ঞানের উদয় হয়।” তখন জীব বিপ্রলম্ব-ভাবময় বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণপ্রেমের বিপ্রলম্বভাব লাভ করে। ফলে জীবের ব্রজগোপীভাব স্বভাব হইয়া পড়ে এবং

কৃষ্ণাধুর্য্য প্রকোষ্ঠের সেবা লাভ করিবার যোগ্যতা অর্জন করে। ইহাই জীবের নিত্য-সিদ্ধি ভাব।

অনর্পিতচরীং চিরাং করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ  
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জল-রসাং স্বভক্তিপ্রিয়ম্।  
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ  
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

—শ্রীমতী মায়া সরকার

## শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১৪ পৃষ্ঠার পর]

‘কিমন্যেঃ’—এই বাক্যের অন্যার্থ দেখাচ্ছেন,—মোক্ষাদিবর প্রার্থনা না করলেও, পরম প্রাথমিক আমার চতুর্ভুজাদি (ঐশ্বর্য্যময় শ্রীনারায়ণাদি) মূর্তির দর্শন ও তাঁর সহিত সম্ভাষণরূপ বর গ্রহণ কর? আবার যুক্তি দিয়ে বলছেন কৃষ্ণ। “তদুত্তরে বলছেন,—অন্য বরে আমার প্রয়োজন নেই। তাৎপর্য্য এই যে, আমার চিন্তে আপনার এইসকল শোভার শিরোমণি শ্রীমূর্তিটি সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকলেই আমার অত্যন্ত আনন্দ অনুভব হয়। অন্য কিছুতেই তা হয় না।” আমি অন্য কিছু চাই নাই। এই জিনিসটা গুরুদেব ব্যাখ্যা করেছেন এটা suggestive question । তিনি এটা হরিকথার মধ্যে বলতেন—suggestion and auto-suggestion—দার্শনিক বিচার দুটো। এটা suggestive questions কেন? পদকর্ত্তা ঋষি—যিনি দামোদরাস্তিক লিখেছেন তিনি জানেন কোন্টার থেকে কোন্টা শ্রেষ্ঠ। এটা তাঁর জানা আছে। জেনে-শুনেই তিনি প্রার্থনা রাখছেন। অনেকে আমরা না জেনে অনেক প্রার্থনা করি; কিন্তু ইনি জেনে-শুনে প্রার্থনা রাখছেন এবং definite—নির্দিষ্ট তিনি এটা খুঁজে পেতে চাচ্ছেন। ওই point থেকে তিনি নড়বেন না, সরবেন না। একেই বলে Auto-suggestion । গুরু-বৈষ্ণবের কাছে কিছু জানতে চাইছেন—আমি এই জিনিসটা জানতে চাই definite—নির্দিষ্ট এই জিনিসটুকু। একে বলে Auto-suggestion । এর মধ্যে দুটো ভাব আছে। একটা ভাব—প্রাকৃত অহমিকা আছে, আর একটা অহমিকা নেই। আমি আত্মসমর্পণ করেছি, আপনি যা বলে দেবেন তা আমি মেনে নেব, তথাপি আমি এইটুকু জানতে চাই। দুটো জিনিস—একটা সমর্পিতাত্মা; আর একটা কিছু না জেনে শুনে প্রশ্ন করা—দুটো আছে।

নিমি-নবযোগেন্দ্র-সংবাদে এমন একটা অংশ আছে—যেটা গুরুপাদপদ্ম ব্যাখ্যা করতেন। প্রশ্ন করেছেন কবি ঋষির কাছে নিমিরাজ, সে প্রশ্নের উত্তরে বলছেন,—

যথৈতামৈশ্বরীং মায়াং দুষ্টরামকৃতাশ্রুতিঃ ।

তরন্ত্যঞ্জঃ স্থলধিয়ো মহর্ষ ইদম্মুচ্যাতাম্ ॥

প্রশ্ন করার পর তাঁর সন্দেহ, সংশয়—আমি প্রশ্নটা করে ফেললাম, কিন্তু এ প্রশ্ন করার অধিকার আমার আছে কিনা তা ত' আমি আগে চিন্তা করিনি। এটা চিন্তা না করেই আমি প্রশ্ন করলাম। হয়ত' এ প্রশ্ন করার আমি অনধিকারী। এইটা মনে করে তাঁর ঐ ভুল, দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে নিচ্ছেন নিমিরাজ। প্রশ্ন করে ফেলেছি এখন ত' আর উপায় নেই।

ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রুত যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমম্।

যেঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যতাত্মানমপ্যজঃ॥

প্রশ্ন করার অধিকার, যোগ্যতা আছে কি না আমি জানিনা, বুঝি না, বিচার করিনি, কিন্তু প্রশ্ন আমি করে ফেলেছি, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। আমার এই ঔদ্ধত্য ক্ষমা করুন। কিন্তু আমি তথাপি “ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রুত”—ভাগবত-ধর্ম্ম জানতে চাই, সনাতন ধর্ম্ম জানতে চাই, আত্মধর্ম্ম জানতে চাই। অন্য কোন ধর্ম্ম জানতে চাই না। “যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমম্”—আবার সঙ্গে সঙ্গে বলছেন,—যদি আমি শুনবার যোগ্য হই, অধিকারী যদি আমাকে বিবেচনা করেন, তবে বলুন তা না হলে নয়। আমাকে যদি অনধিকারী বিবেচনা করেন, তাহলে আমি শুনতে চাই না। ওরকম দুরাগ্রহ আমার নেই। তবে যদি আমাকে সমর্থ, অধিকারী বিবেচনা করেন, তবে আমাকে দয়া করে বলুন। যে সনাতন ধর্ম্ম, যে ভাগবত-ধর্ম্ম, যে আত্মধর্ম্ম শুনলে “যেঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যতাত্মানমপ্যজঃ”—অজ ভগবান্ সন্তুষ্ট হন প্রশ্নকারীর প্রতি। প্রপন্ন ভক্ত, প্রপত্তি স্বীকার করেছেন যিনি সর্ব্বতোভাবে, তাঁর যত কিছু অহঙ্কার, যত কিছু বাহাদুরি সব কিছু ভগবানের চরণে দিয়েছেন যিনি, উপদেশকের কাছে দিয়েছেন যিনি, সেই রকম সমর্পিতাত্মা প্রপন্ন ব্যক্তির কাছে, ভক্তের কাছে ভগবান্ খুশী হয়ে নিজেকে নিজে দান করে দেন।

‘কৃষ্ণ! তোমার হণ্ড’ যদি বলে একবার।

মায়াবদ্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার।।

অজ ভগবান্, অজ্ঞেয় ভগবান্। অজ—প্রাকৃত জন্ম-মৃত্যু তাঁর নেই। আজকালকার তথাকথিত প্রাকৃত জড় কবি, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক বলছেন প্রাকৃত জন্ম-মৃত্যু আছে ভগবানের। কিন্তু কৃষ্ণ ত' গীতা-ভাগবতে সব খণ্ডন করেছেন আগেভাগে। অজ্ঞান শোন আমার দুঃখের কথা, আমি মানুষের মত একটা চেহারা নিয়ে এসেছি, এইজন্য সব বোকা, অতাত্ত্বিক লোকগুলো আমাকে সাধারণ মানুষ বলতে চায়। কি মুন্সিলে পড়েছি আমি বলত'! আমি যে নররূপটা নিয়ে এলাম এটা কি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু অতাত্ত্বিক বোকা লোকগুলো সব ভাবছে যে এটা বোধ হয় তাদের মত একটা শরীর। অশ্চর্য্য! এরা আমার প্রতি অন্যায় আচরণ করছে। ‘মানুষীং তনুমাশ্রিতম্’—মানুষের মত চেহারাটা আমার, কিন্তু মানুষ এ চেহারাটা পেল কোথায়? এই চেহারাটার উপরওয়ালা মালিক ত' আমি। আমি নিত্য নরাকার পরব্রহ্ম। আমারই আকার original আকার। ‘পরব্রহ্ম নরাকৃতিঃ’, ‘গুঢ়ং তৎ মনুষ্যালিঙ্গম্’—আমার আকারই হল নরাকার। এই রকম একটা আকার দিয়ে আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি। তার একটা imitation।

ওরা মনে করছে কি যেহেতু ভগবান্ মানুষের মত আকার নিয়ে এসেছেন, সেহেতু উনি ত' মানুষ। এর থেকে আর বোকামি কিছু হতে পারে না। জান অর্জুন, আমার মনে মনে খুব দুঃখ—আমার তত্ত্ব কেউ জানল না, বুঝল না, আমাকে চিনল না কেউ। ‘জন্ম-কর্ম চ মে দিব্যম্’—আমার যে জন্ম-কর্ম তা অলৌকিক, দিব্য, অপ্রাকৃত। ‘পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্’—আমার ভগবন্তাব যারা জানে না, বোঝে না, তারা আমাকে চিনবে কি করে, আমার স্বরূপ বুঝবে কি করে?

যদি প্রশ্ন করা হয় ভগবানকে—তোমার আকারটা কি? তদুত্তরে ভগবান্ বলছেন ‘পরংব্রহ্ম নরাকৃতিঃ’, ‘জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপম্ অতুলং শ্যামসুন্দরম্’, দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরম্’—এই হল আমার আকার। আমি এই আকার নিয়ে আমার একান্ত ভক্তকে দর্শন দান করি। সেই নিত্য আকারেরই উপাসনা করেন ভগবদ্ভক্তগণ। নিত্য আকার, অনিত্য আকার নয়, যার অপর নাম—শ্রীমূর্তি, শ্রীবিগ্রহ। স্বয়ংরূপ ভগবান্ তিনি দুই মূর্তিতে আবির্ভূত হচ্ছেন—নামমূর্তি ও বিগ্রহমূর্তি। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বলছেন,—

আর দুই জন্ম মোর সঙ্কীর্ণনারত্তে।

হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ॥

মোর অর্চামূর্তি মাতা তুমি সে ধরণী।

জিহ্বারূপী তুমি মাতা নামের জননী ॥

এক অর্চামূর্তি ও আর এক নামমূর্তি—এই দুই মূর্তি। মহাপ্রভু তাঁর মা শচীদেবীকে বলছেন কথাটা। গোপনীয়, তুমি জেনে রাখ। সকলে যদি আমাকে শচীপিসির ছেলে বলে তা বলুক, কিন্তু আমার তত্ত্বদর্শনটা এই এবং তোমার তত্ত্বদর্শনটা এই—শুনে রাখ, জেনে রাখ। সুতরাং দুঃখ করছ কেন, আমি সন্ম্যাস নিয়েছি বলে তুমি মন খারাপ করছ কেন? আমি জগতে শিক্ষা বিস্তার করবার জন্য এসেছি। আমি যদি না শিখাই তাহলে জগৎ উচ্ছন্ন যাবে। ‘উৎসীদেয়ুরীমে লোকাঃ’—সেইজন্য আমাকে অখিল লোকশিক্ষকরূপে জগতে এসে শিক্ষা দিতে হচ্ছে এবং ভগবানের জন্য কিরকম কান্নাকাটি করতে হবে, কিরকমভাবে তাঁকে পেতে হবে, আমি সেটা শিখাতে এসেছি।

“আমার অত্যন্ত আনন্দ অনুভব হয় তোমার এই শ্রীবালগোপাল মূর্তিদর্শন করে, অন্য কিছুতেই তা হয় না। অন্তর্দর্শনের মাহাত্ম্য শ্রীভাগবতামৃতের উত্তর-খণ্ডে তপোলোকে শ্রীপিপ্পলায়নের বাক্যদ্বারা (২।৮৬-৯৬) শ্লোকে বিস্তৃতভাবে বিবৃত রয়েছে।” সেখানে কি বর্ণিত হয়েছে তা এখানে ব্যাখ্যা দিয়েছেন,—

“ঋষভদেবের পুত্র শ্রীপিপ্পলায়ন ঋষি গোপকুমারকে বললেন,—“উর্দ্ধরেতা যোগীন্দ্রগণের স্থান এই তপোলোক পরিত্যাগ করে কিহেতু তুমি অন্যত্র যেতে ইচ্ছা করছ?” গোপকুমারকে জিজ্ঞাসা করছেন পিপ্পলায়ন। “আর কিজন্য বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে চক্ষুদ্বারা দেখবার জন্য তুমি নানা স্থানে ভ্রমণ করছ?” যে তত্ত্ববস্ত্ত অবজ্ঞামনসগোচর, যাকে এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন করা যায় না, অনুভব করা যায় না, তাঁকে তুমি চোখ দিয়ে দর্শন করবে—এ

আকাঙ্ক্ষা কেন তোমার? “তুমি তোমার মন অন্তর্নিহিত করেই সমাধিস্থ কর।” তাহলে কথার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে সাধারণ চোখের দ্বারা হচ্ছে না, Double চোখ অর্থাৎ উপচক্ষু লাগিয়েও হচ্ছে না। দূরবীন্ যন্ত্র ও অন্যান্য সূক্ষ্ম যন্ত্র লাগিয়েও হচ্ছে না। তাহলে সেটা কি চক্ষু?—শাস্ত্র বলছেন সেটা হল ভক্তিচক্ষু, প্রেমনেত্র। সেই নেত্রে ধরা দেন ভগবান। সেই নেত্রে ভগবানের শ্রীরূপমাধুরী ধরা পড়ে, অন্যভাবে পড়ে না। ঠাকুর দেখে খুব হৈ হৈ করলাম—আঃ! কি সুন্দর, কি সুন্দর! সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা ত’ আমার জানা নেই। যে সৌন্দর্য বিশ্বে যত সৌন্দর্য আছে সে-সকল সৌন্দর্যকে পরাভূত করে, সব সৌন্দর্যকে চাপা দিয়ে দেয় যে সৌন্দর্য, সেই সৌন্দর্য সম্পর্কে আমার বাস্তব কোন ধারণা নেই। তাহলে কি দেখে আমি আহা! আহা! করছি। আমার কল্পনার মধ্যে যে সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্য দেখে আমি ওরকম করছি?

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ভগবানেরই মূর্তি। ‘ব্যাসো নারায়ণ স্বয়ম্’। তিনি যখন ভগবানের লীলাকথা বর্ণনা করছেন তাঁর বর্ণনার মধ্যে কোন ভুল হয়ে যাচ্ছে কিনা, এইজন্য বেদব্যাস ক্ষমা চেয়েছেন শাস্ত্রে। কি ব্যাপার! তাহলে আমরা শিখব কি? তিনি স্বয়ং ভগবান হয়ে যদি এই কথা বলেন—আমি তোমার লীলা বর্ণনা করছি এটা প্রাকৃত কিছু হয়ে না যায়, সেজন্য তিনি ক্ষমা চেয়েছেন, তাহলে আমরা কোথায় আছি। কীর্তন করি আমরা “শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ব, বন্দোঁ মুখিঃ সাবধান-মতে।” এই ‘সাবধান-মতে’র মানে কি? কিসের সাবধানতা?—অপরাধ হয় না যেন—এই সাবধানতা। তত্ত্বদর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে আমাদের যেন অপরাধ না হয়ে পড়ে। আমাদের ভিতরে যেন ধৃষ্টতা না আসে, অহঙ্কার না আসে। সেইজন্য ‘বন্দোঁ মুখিঃ সাবধান-মতে’, অপরাধ হয় না যেন—আকর দিতে হচ্ছে।

“যেহেতু তিনি পরমাত্মা বাসুদেব অর্থাৎ চিত্তাধিষ্ঠাতা। তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বের দ্বারা নিতান্ত শোধিত চিত্তেই স্ফুর্তিপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন।” সেই ভগবান বাসুদেব তিনি হলেন নিখিল জীবের চিত্তাধিষ্ঠাতা। “অন্যত্র চক্ষুরাদিতে প্রকাশিত হন না; কারণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অর্থাৎ স্বপ্রকাশত্ব ও অপরিচ্ছিন্নত্বহেতু বাহ্যেদ্রিয়দ্বারা তার গ্রহণ সম্ভবপর নহে।” তাহলে আমরা কি করে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই তত্ত্ববস্তুকে বুঝব? অনুধাবন করব? True conception টা আসবে কি করে, বাস্তব ধারণাটা আসবে কি করে?—তাঁর কৃপাসাপেক্ষ ব্যাপার। তিনি আমায় অধিকার দেবেন, সেই অধিকার নিয়ে আমি দেখব। এছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই। এখানে আমাদের সকল প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বৃত্তি ব্যর্থ।

শিবঠাকুর গেলেন একসভায়। সেই সভায় ভগবান বসে আছেন, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ সব দেবতাগণ বসে আছেন। শিবঠাকুর যেতে একটু দেরী করেছেন। শিবঠাকুর ঢুকলেন, ঢুকে ভগবানকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। একটা কিছু বললেন দণ্ডবৎ-প্রণাম করার সময়। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কাকে বলে তা অনেকে জানেন না। সাষ্টাঙ্গ প্রণামের মধ্যে একটা অঙ্গ হল মুখ, অর্থাৎ তাকে কিছু বলতে হবে স্তব-স্ততি মুখে ঐ প্রণামের মধ্যে। সেটা বলেছেন শিবঠাকুর। কি বলেছেন,—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশক্তিং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।

সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥

ব্যাপারটা কি? বিশুদ্ধসত্ত্বের অবস্থান হল বাসুদেব। ‘বাসুদেব’-শব্দের অর্থ হল বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত যিনি। বিশুদ্ধসত্ত্ব মানে প্রকৃতির সৃষ্টি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিনটে গুণের অতীত তত্ত্ব। ভগবান্ প্রকৃতির উপরে, তিনি প্রকৃতির নিয়ন্তা। সেইজন্য ভগবানকে বলা হচ্ছে অপ্রাকৃত, অসমোদ্ধ। এই বিশেষণগুলো ভগবানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেই ভগবান্ কেমন? শুকদেব গোস্বামী ব্যাখ্যা দিচ্ছেন,—

‘হরির্হিঃ নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।’

প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত তিনি। তিনি নিগুণ। নিগুণ বলতে কি তাঁর কোন গুণ নেই না কি?—তা নয়, সর্বগুণে গুণাধিত তত্ত্ব তিনি। জগতে যে গুণ আছে সে গুণ ত’ তাঁর আছে, তাছাড়া অপ্রাকৃত অনন্ত গুণসমন্বিত তত্ত্ব তিনি। প্রাকৃত গুণরহিত পরন্তু অপ্রাকৃত গুণসমন্বিত—সেই কথা বলছেন নিগুণ-শব্দে। ‘পুরুষঃ’—শুধু পুরুষ বললে হবে কি? জগতে ত’ স্ত্রী-পুরুষ আছে। সে পুরুষ নন তিনি।

‘নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈষ্যেব নরোত্তমম্।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসো ততে জয়মুদীরয়েৎ॥’

এখানে কে নর আর কে নরোত্তম? ভগবান্ এক মূর্তি ধারণ করেছিলেন—নরনারায়ণ ঋষি। ভাগবতে আলোচনা করেছেন আপনারা। এই শ্লোকে ‘নরোত্তম’—শব্দে ভগবান্ এবং ‘নর’—শব্দে অর্জুনকে, ভক্ত উদ্ধবকে লক্ষ্য করা হয়েছে। এসব ব্যাখ্যা দেওয়া আছে শাস্ত্রে। আবার স্বয়ং নারায়ণ তিনি, দুই মূর্তি একাধারে অবস্থিত। যাঁর নাম নরনারায়ণ ঋষি। তিনি ভগবান্।

“চিচ্ছে ভগবদর্শন হলে তাকে ধ্যানই বলা হয়, তাহাতে চাক্ষুষ দর্শন হল না। সুতরাং চাক্ষুষ-দর্শনের জন্য এই তপোলোক থেকে অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন। এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে বলছেন,—চক্ষুদ্বারা শ্রীহরির যে সাক্ষাৎ-দর্শন তাও মনের দ্বারাই নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হয়ে থাকে।” আমি চোখ দিয়ে যেটা দর্শন করব সেটা মনেতে আগে নেবে, তবে হবে দর্শন। আমার উক্তি, স্তব-স্তুতি সবকিছু, তার পরে দর্শন। স্তব-স্তুতির আগে দর্শন হয় না। সকলের আগে আমাকে স্তব-স্তুতি করতে হবে। আমি যাঁর পরিচয় জানি না, আমি যাঁর মহিমা-মাহাত্ম্য জানি না, তাঁকে কি করে দেখব? সকলের দর্শন সমান হবে? বহু যাত্রীদের সঙ্গে একজন বৃদ্ধা যাত্রী গেছেন পুরীতে। সবাই দর্শন করছেন জগন্নাথদেবকে। জগন্নাথ তুমি কৃপা কর বলে প্রার্থনা করছেন, কিন্তু বুড়ীমা কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। কই, কই, জগন্নাথ কই! আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি, তুমি দেখতে পাচ্ছ না। বুড়ীমা বললেন,—না। কি দেখছ তুমি? আমি আমার উঠানেতে পুঁইশাকের একটা যে বাড় উঠেছে সেটা দেখতে পাচ্ছি। আর কি দেখছে? আমার ঘরের ছাগলটা সেটা টেনে টেনে খাচ্ছে। তাহলে এদের জগন্নাথ-দর্শন হচ্ছে, বুড়ীমার ত’ জগন্নাথ দর্শন হচ্ছে না। তার ত’ উঠানের সেই পুঁইশাকের মাচা আর ছাগলে তা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে তাই দর্শন হচ্ছে। এটা কি

দর্শন হবে? হবে না। চিত্তবৃত্তি নিয়ে, সেবানুকূল পরিবেশ নিয়ে দর্শনের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হয়ে যে দর্শন সেটাই দর্শন। জড়দর্শন দর্শন নয়। “কারণ যখন ভগবান স্ফুর্তিলাভ করেন, তখন মনে আর অন্য কোন বৃত্তি প্রকাশ পায় না। অর্থাৎ শ্রীভগবন্মূর্তিতে মনোনিবেশকালে মনের দ্বারা যে দর্শন তাহাই চাক্ষুষ-দর্শন বলে অনুভূত হয়ে থাকে।”

“ইহা স্বীকার করলেও চক্ষুদ্বারা দর্শনে অধিক সুখ হয়; এরূপ যদি কেহ বলেন, তার উত্তরে বলছেন,—মনে সুখের উদয় হলে কেবল চক্ষু কেন, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণই সুখী হয়।” কথাটা ঠিক। সুতরাং এখানে মানস দর্শন ব্যাখ্যা করছেন। “মনোমূলকত্বহেতু সকল ইন্দ্রিয়-সুখই মনঃসুখের অন্তর্ভুক্ত। একমাত্র মনের বৃত্তি বা ক্রিয়াতেই বাক্-চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকলের বৃত্তি বা ক্রিয়া সাধিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ, ‘মন’ রূপ-রসাদি বিষয় গ্রহণ না করলে ইন্দ্রিয়গণ স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে কিছুই গ্রহণ করতে পারে না।” সুতরাং মনকে নিতে হচ্ছে সেখানে। যা বিষয় গ্রহণ করছে সব মনই করছে। আর এই মনকে নিয়ে যত ঠেলাঠেলি। শাস্ত্রে এই মনকে কি বলেছেন,—‘মনঃ ষষ্ঠানি-দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি’ এই মন ভাল, আবার এই মন ভয়ানক খারাপ। “মনঃ এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।”—মনই মুক্তির কারণ, আবার মনই অনর্থের কারণ। আত্মার বশীভূত মন ভালটা করবে, সে উশ্টোটা করবে না; আর অবশীভূত মন সব সময় এদিক-ওদিক দৌড়াতে পাগলা ঘোড়ার মত। বশীভূত মন ঠিক ভগবচ্চিন্তা-ভাবনা নিয়ে, ধ্যান-ধারণা নিয়ে থাকবে, এদিক-ওদিক করবে না।

“মনোবৃত্তি ব্যতীত সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিই নিষ্ফল জানবে। যদিও ইন্দ্রিয়গণ স্ব-স্ব বিষয় গ্রহণ করে (—এরূপ বলা হয়), তথাপি তাহা গ্রহণ না করার মতই হয়ে থাকে। কারণ মনোবৃত্তির অভাবহেতু (অর্থাৎ মনের ক্রিয়া না হওয়ায়) জীবাত্মাতে তত্ত্ব বিষয়ের অনুভব হয় না। অতএব বিশুদ্ধ-চিত্তবৃত্তি বিশেষে যে ভগবানের আবির্ভাব, তাহাই প্রকৃত দর্শন। চক্ষুদ্বারা যে প্রত্যক্ষ দর্শন, তাহা দর্শন নহে—যেহেতু তিনি ইন্দ্রিয়বৃত্তির অগোচর।”

দামোদরাস্তকের চতুর্থ শ্লোকের শেষাংশে সত্যব্রতমুনি প্রার্থনা করছেন—আমি নিত্য তোমার এই বালগোপাল-মূর্তি দর্শন করতে আকাঙ্ক্ষী। আমি অন্য মূর্তি দর্শন করতে চাই না। কিন্তু ইনিই আবার পরবর্তী এক শ্লোকে বলেছেন,—

‘তথা প্রেম-ভক্তিং সকাং মে প্রযচ্ছ’

প্রেমভক্তি প্রার্থনা করেছেন। এই প্রেমভক্তি কোন্ প্রেমভক্তি? দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, না বাৎসল্য-প্রেম? এখানকার বর্ণনা অনুসারে বুঝতে পারা যায় যে তিনি বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমের আকাঙ্ক্ষা করছেন। যে জন্য উনি বালগোপাল-মূর্তির দর্শন চাচ্ছেন। আবার প্রসঙ্গক্রমে তিনি গোপকুমারের প্রসঙ্গও নিয়ে এসেছেন। সেক্ষেত্রে গোপকুমারের সাক্ষাৎ-দর্শন আর মানস-দর্শন দুটো নিয়ে বিচার এসেছে। কোন্ দর্শন শ্রেষ্ঠ? সেই বিচারের ব্যাখ্যা শ্রীল গুরুপাদপদ্ম যা দিয়েছেন তা এখানে আলোচনা করছি।—

“শ্রীধ্রুব-প্রহ্লাদাদি ভক্তগণের যে চাক্ষুষ ভগবদ্ দর্শন হয়েছিল শুনা যায়—

তাহা কিরূপ? এর উত্তরে বলছেন,—শ্রীভগবান্ ভক্তবাৎসল্য-গুণে যদি কারও নয়নগোচর বা দর্শনেদ্রিয়-গ্রাহ্য হন, তাহা কদাচিৎ বলে জানবে।” ভগবানের সাক্ষাৎ-দর্শন খুবই কঠিন। যদি কখনও ভক্তবাৎসল্যপ্রযুক্ত কোন ভক্তকে সাক্ষাৎ-দর্শন দিয়ে থাকেন তা কদাচিৎ। এটা সাধারণ ব্যাপার নয়। অর্থাৎ তাহা নিয়ম বা রীতি নহে। বিশেষতঃ এই কলিযুগে ভগবানের সাক্ষাৎ-দর্শন পাওয়া। সেটা বলা আছে এখানে। পরন্তু সেই দর্শনও চিত্ত-বৃত্তি-রূপ জ্ঞান-দৃষ্টিদ্বারাই সংঘটিত হয়ে থাকে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নহে। চোখ দিয়ে আমরা যেটা দেখছি সেটা প্রাকৃত দর্শন, জড় দর্শন। যতদিন পর্য্যন্ত আমার জড়দর্শন না ঘুচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত আমি অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ, শ্রীমূর্তি দর্শন করব কিভাবে?

সেইজন্য এখানে এই পূর্বপক্ষ তুলেছেন। তাহলে যে দর্শন করছেন ওটা কিভাবে? সেটা এখানে ব্যাখ্যা করছেন।—চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন ঠিক হয় না। তাহলে দর্শন কিভাবে হবে?—কর্ণেন্দ্রিয়দ্বারা। কর্ণেন্দ্রিয়দ্বারা দর্শন মানে তত্ত্ববস্তু, তত্ত্ববিষয় আমি আগে শ্রবণ করব—শ্রীবিগ্রহ কি, শ্রীমূর্তি কে, বৈষ্ণব কে, ভগবান্ কে, তাঁদের স্বরূপ-বিচার আমি আগে শুনব। কিভাবে দর্শন করতে হবে তার Process, Procedure আমি জানব, তারপর আমি দর্শন করব এবং সে দর্শনের রীতিও—ভগবান্ তুমি তোমার রূপমাধুরী কৃপা করে আমাকে দর্শন করাও, আমাকে সেই চোখ দাও—যে চোখ দিলে আমি তোমার দর্শন পাব ঠিক ঠিক। গীতার মধ্যে ভগবান্ অর্জুনকে একটা চোখ দিয়েছেন (একাদশ অধ্যায়ে)—যে চোখটা হল বিশ্বরূপ-দর্শন, বিশ্বরূপোপাসনা। এখানে গোস্বামিগণ বিশ্বরূপোপাসনার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেখানে বলছেন এটা জড়ও নয়, স্থূলও নয়, সূক্ষ্মও নয়, এমন একটা জিনিস। সাধারণ মানুষ যারা—কর্মজড়ম্মার্তবাদিগণ বা ব্রহ্মবাদিগণ তারা এই বিশ্বরূপ-দর্শনকে খুব বড় বলে মনে করছেন। কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টিতে বলছেন এটা মনঃসম্পর্কীয়। অধ্যাত্মবাদ-শব্দের ব্যাখ্যা দিয়েছেন শাস্ত্রে। অধ্যাত্মবাদ মানে মনঃসম্পর্কীয়। কোন্ মনঃসম্পর্কীয়? সূক্ষ্ম মনঃসম্পর্কীয়। সূক্ষ্ম হলোই যে সেটা ভাব হয়ই গেল, তা নয়। জড় স্থূল ও সূক্ষ্মও দুইই জড়। সেখানে চেতনের কথা বলা হয়েছে। অপ্রাকৃত-শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে বাস্তব দর্শনের যেখানে অর্থ করা হয়েছে। জাগতিক স্থূল-সূক্ষ্ম চলবে না। ভগবদর্শনের ক্ষেত্রে।

তত্ত্ববস্তুকে দর্শন করতে গেলে কর্ণের দ্বারা দর্শন করতে হবে। তাঁর তত্ত্ব সম্পর্কে আগে জানতে হবে, বুঝতে হবে, কি করলে আমি তাঁর দর্শন পাব—এগুলো সব জেনে নিতে হবে। সে ধাম দর্শনই হোক, বৈষ্ণব দর্শনই হোক, গুরুদর্শনই হোক আর স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎ স্বরূপ দর্শনই হোক, সবটার বেলায় একই চিন্তা আছে। “যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ পরিচ্ছিন্নতা-ধর্মবশত্ পরম অপরিচ্ছিন্নতা ধর্মযুক্ত বস্তু কখনই গ্রহণ করতে পারে না। জড় ইন্দ্রিয় কি করে পারবে? ক্ষমতা নেই তার।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়েঃ।

আমরা যে হরিনাম করছি, হরিনাম করব, তা কিভাবে করব। সে সম্পর্কে



আমার অভিজ্ঞান কোথায়? আমার অবশীভূত মন ঠিক নাম গ্রহণ করতে পারছে না। “নামাঙ্কর বাহিরায় বটে নাম কভু নয়।” তাহলে যদি আমাকে দর্শন করতে হয় তাহলে সে process টা কিরূপ হবে?

“সেবোন্মুখে হি জিহাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

সেবোন্মুখ-জিহ্বায় এই নাম স্বয়ং স্ফুর্তিপ্রাপ্ত হন। তাহলে আমার বাহাদুরি কি? সেই নামের কৃপার জন্য আমাকে বসে থাকতে হবে। কৃপাপ্রার্থনা সব সময় আমাদের প্রয়োজন আছে। “তবে উক্ত চাক্ষুষ-দর্শনের প্রসিদ্ধির কারণ এই যে—বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-চিত্তে ভগবদর্শন হলে জীবের তা চাক্ষুষ-দর্শন বলে অভিমান হয় মাত্র।” যাঁর বিশুদ্ধ সত্ত্বে দর্শন হচ্ছে তিনি মনে করছেন আমি সাক্ষাৎ দেখলাম, কিন্তু সেটা জড়ীয় কিছু নয়, সেটা practical—বাস্তব, অপ্রাকৃত। প্রকৃত প্রস্তাবে তা চাক্ষুষ দর্শন নয়। ভগবদর্শন যদি সত্যই বিশুদ্ধচিত্তে হচ্ছে বিশুদ্ধসত্ত্ব অবস্থায়, তাহলে সেটাকে যদি কেউ মনে করেন এটাই আমার চাক্ষুষ দর্শন, তা নয়। চাক্ষুষ দর্শনের যে দোষ-ত্রুটি আছে সেটা একরকম; আর সাক্ষাৎ-দর্শন, বাস্তব দর্শন সেটা আর এক রকম। চক্ষুটা যদি আমার অপ্রাকৃত দর্শনে আসে তাহলে সেটা ঠিকই হল। আর যদি জড় চোখ, জড় ইন্দ্রিয় নিয়ে আমি কিছু করতে যাই তা হবে না। সব জড়দর্শন হবে।

ধাম দর্শনের ক্ষেত্রে যেমন বলা হয়েছে,—

মায়া জড়াবৃত চক্ষু দেখে ক্ষুদ্রাগার।

জড়ময় ভূমি জল দ্রব্য যত আর॥

মায়া কৃপা করি, জাল উঠায় যখন।

আঁখি দেখে সুবিশাল চিন্ময় ভবন॥

তাহলে বিচারটা বুঝতে হবে। আমাদের বাহ্য যে দর্শন সেটা জড়দর্শন। আর সেটা যদি সরে যায়, আমি যদি দিব্যদৃষ্টি পাই তাহলে ঠিক চিন্ময় দর্শন হবে, অপ্রাকৃত দর্শন হবে। সেটা ভগবৎ-কৃপাসাপেক্ষ। একটুও বাহাদুরি নেই আমার নিজের এ ব্যাপারে। চেষ্টা আমি করতে পারি, তবে কৃপা করা বা না করা সেটা সম্পূর্ণ ভগবানের ইচ্ছাধীন ব্যাপার। করুণা প্রার্থনা করা ভক্তের স্বভাব, সাধক-সাধিকার স্বভাব। (ক্রমশঃ)

## বিজ্ঞপ্তি

বিশেষ ব্যাপসপূজা-সংখ্যা (শতবার্ষিকী) পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লেখকগণকে অগম্যী ২২শে পৌষ, ৭ই জানুয়ারীর মধ্যে প্রবন্ধ পাঠাইতে অনুরোধ জানানো হইতেছে।

—কার্য্যধ্যক্ষ

✠	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।	✠
ধর্মঃ স্মৃতিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেন-কথাসু যঃ।		নোংপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
✠	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥	✠

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।

অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্বশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।

হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৯শ বর্ষ }

২ নারায়ণ, প্রদ্যুম্ন, ৫১১ শ্রীগৌরান্দ  
৩০ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৪০৪, ইং ১৬/১২/৯৭

{ ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

## শ্রীশ্রীবলদেব-স্তোত্রম্

[ শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বলভদ্রখণ্ডে একাদশোহধ্যায়ে ]

দেবাদিদেব ভগবন্ কামপাল নমোহস্ততে।

নমোহনন্তায় শেষায় সাক্ষাদ্রামায় তে নমঃ ॥ ১ ॥

হে দেবাদিদেব! হে ভগবন্ কামপাল! আপনাকে নমস্কার। হে বলরাম! আপনি সাক্ষাৎ শেষ অনন্ত, আপনাকে নমস্কার ॥ ১ ॥

ধরাধরায় পূর্ণায় স্বধাম্নে সীরপাণয়ে।

সহস্রশিরসে নিত্যং নমঃ সঙ্কর্ষণায় তে ॥ ২ ॥

হে ধরাধর হলধর! আপনি স্বীয় তেজে পূর্ণ; হে সহস্রশীর্ষ সঙ্কর্ষণ! আপনাকে নিত্য নমস্কার ॥ ২ ॥

রেবতীরমণ ত্বং বৈ বলদেবাচ্যুতাগ্রজ।

হলায়ুধ প্রলম্বয়ু পাহি মাং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥

হে বলদেব! আপনি অচ্যুতের অগ্রজ, রেবতীর পতি, হলায়ুধ ও প্রলম্বয়; হে পুরুষোত্তম! আপনাকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

বলায় বলভদ্রায় তালাঙ্কায় নমো নমঃ।

নীলাম্বরায় গৌরায় রোহিণেয়ায় তে নমঃ ॥ ৪ ॥

হে বল, বলভদ্র ও তালধ্বজ! আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। হে নীলাম্বর, গৌরবর্ণ, রোহিণী-তনয়! আপনাকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

ধেনুকারিমুষ্টিকারিঃ কুটারির্ব্বল্লাস্তব্ধ ॥

রুক্ষ্যরিঃ কূপকর্ণারিঃ কুস্তাণ্ডারিস্ত্বমেব হি ॥ ৫ ॥

আপনি ধেনুকারি, মুষ্টিকারি, কুটারি ও বল্লাস্তব্ধ। রুক্ষী, কূপকর্ণ ও কুস্তাণ্ডেরও বিনাশক আপনিই ॥ ৫ ॥

কালিন্দী ভেদনোহসি ত্বং হস্তিনাপুর-কর্ষকঃ।

দ্বিবিদারির্যাদবেন্দো ব্রজমণ্ডল-মণ্ডনঃ ॥ ৬ ॥

আপনি কালিন্দীকে ভেদ ও হস্তিনাপুরকে আকর্ষণ ও দ্বিবিদ-বানরকে বধ করিয়াছিলেন; আপনি যাদবগণের শ্রেষ্ঠ, ব্রজমণ্ডলের শোভা ॥ ৬ ॥

কংসভাতৃ-প্রহস্তাসি তীর্থযাত্রাকর প্রভুঃ।

দুর্য্যোধনগুরুঃ সাক্ষাৎ পাহি পাহি প্রভো ত্বতঃ ॥ ৭ ॥

আপনি কংস-ভ্রাতৃদিগের নিহন্তা, তীর্থযাত্রাকর, প্রভু ও সাক্ষাৎ দুর্য্যোধন-গুরু; অতএব হে প্রভো! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন ॥ ৭ ॥

জয় জয়াচ্যুত দেব পরাংপর

স্বয়মনস্ত দিগন্তগতশ্রুত।

সুরমুনীন্দ্র-ফণীন্দ্রবরায় তে

মুখলিনে বলিনে হলিনে নমঃ ॥ ৮ ॥

হে অচ্যুত! আপনার জয় হউক, জয় হউক; হে পরাংপর দেব! আপনি স্বয়ং অনন্ত ও দিগন্তবিশ্রুত এবং আপনি সুরেন্দ্র, মুনীন্দ্র, ফণীন্দ্র, হলী, বলী ও মুখলী; আপনাকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

যঃ পঠেৎ সততং স্তবনং নরঃ

স তু হরেঃ পরমং পদমাব্রজেৎ।

জগতি সর্ব্ববলং ত্বরিমর্দনং

ভবতি তস্য ধনং স্বজনো ঘনম্ ॥ ৯ ॥

যে-মানব সতত এই স্তব পাঠ করে, সে হরির পরমপদ প্রাপ্ত হয়, জগতে তাহার সর্ব্ববল-সম্পন্ন শত্রু-সংহারে সামর্থ্য, ধন ও স্বজন লাভ ইহা থাকে ॥ ৯ ॥

# প্রশ্নোত্তর

## প্রচার

১। আচারপ্রিয়, প্রচারপ্রিয় ও আচার-প্রচারপ্রিয় ভক্ত কাঁহার?

“বিবিক্তানন্দিগণ আচারপ্রিয় এবং গোষ্ঠ্যানন্দিগণ সর্বদা প্রচারপ্রিয় ; তন্মধ্যে কেহ কেহ উভয়প্রিয়ভাবেই আনন্দ ভোগ করেন। ভগবৎস্মরণই প্রেমভক্তের আচার এবং ভগবান্নাম-কীর্তনই প্রেমভক্তের প্রচার-কার্য।”

—চৈঃ শিঃ ৬। ৩

২। মহাপ্রভুর ধর্ম কি প্রচার্য্য নহে?

“মহাপ্রভু সকলকেই বৈষ্ণবধর্মের প্রচার-ভার দিয়াছেন।”

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

৩। প্রচারে করুণ নীতি অবলম্বনীয়?

“অপাত্রকে সুপাত্র করিয়া নাম উপদেশ দিবে। যে-স্থলে উপেক্ষার প্রয়োজন সে-স্থলে এমত বাক্য বলিবে না—যাহাতে প্রচারকার্যের ব্যাঘাত হয়।”

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

৪। শ্রীমদ্ভক্তিবিদ্যাদ ঠাকুর বিপুলভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা প্রচারের জন্য কি প্রণালী নির্দেশ করিয়াছেন?

“নগরে নগরে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন ও শ্রীগৌরাস্ত্রের শিক্ষা প্রচার করুন। \* \* আপনারা হস্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লইয়া দ্বারে দ্বারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম ও শিক্ষা প্রচার করুন। মহাপ্রভু যেরূপ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে আজ্ঞা-টহল প্রচার করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, আপনারাও সর্বদেশে শ্রীগৌরাস্ত্রের দাস হইয়া শ্রীআজ্ঞা টহল প্রচারে সৎপাত্রকে নিযুক্ত করুন। প্রচার-কার্য্য অসৎপাত্রের দ্বারা হয় না। আমাদের বিবেচনায় আপনারা অবিলম্বে একটি বৈষ্ণব-চতুষ্পাঠী করুন। কতকগুলি নিঃস্বার্থ সচ্চরিত্র লোকদিগকে সেই চতুষ্পাঠীতে শিক্ষিত করিয়া নগরে নগরে ও পল্লীতে পল্লীতে শ্রীআজ্ঞা টহল প্রচারের ভার অর্পণ করুন।”

—‘শ্রীমদগৌরঙ্গ-সমাজ’, সঃ তোঃ ১১। ৩

৫। পূর্বতন বৈষ্ণববর্গ ও গোস্বামিপাদগণ কিভাবে বৈষ্ণবধর্ম সংরক্ষণ ও প্রচারণ করিয়াছিলেন? বর্তমান যুগেও কোন্ শক্তিতে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হইতেছে?

“পূর্বতন বৈষ্ণব ও গোস্বামিপাদেরা কেহ কেহ ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ, কেহ কেহ নানা পদ-পদাবলী, কেহ কেহ বা ধর্মপ্রচার ও হরি-সংকীর্তন এবং কেহ কেহ আপনাদের পবিত্র চরিত্র ও অনুপম বৈষ্ণবতাদ্বারা বিশুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণবধর্মালোকে জগৎ আলোকিত করিয়া রাখিতেন। কালপ্রভাবে নানা উপধর্ম-অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন হওয়ায়

মহাপ্রভু আবার নিজ-শিক্ষা ও প্রেমবিস্তার এবং প্রকৃত বৈষ্ণব-আচার-ব্যবহার প্রচার করিবার কারণ অধুনা অনেকের মন আকর্ষণ এবং কোন কোন ভক্ত-হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন।”

—‘বৈষ্ণবসভা তথা বৈষ্ণবধর্ম-প্রচার’, সং তোঃ ২। ১

৬। শ্রীচৈতন্যের বিশুদ্ধ-ধর্ম-সংরক্ষণের জন্য কলঙ্কারোপণকারীদিগের প্রতি কি কর্তব্য?

“শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদিষ্ট ও আচরিত পবিত্র ধর্মপুষ্পে যে-সকল কীট প্রবেশ করিয়াছে, সেই সকল অনিষ্টকারী কীটদিগকে ঐ ধর্মপুষ্প হইতে দূরীভূত করিবার যত্ন করাও আমাদের উদ্দেশ্য। ঐ সকল কীট ধর্মপুষ্পের কেবল যে সৌগন্ধই হরণ করিতেছে, এমত নয়; উহারা উক্ত পুষ্পকে ক্রমশঃ কাটিয়া কাটিয়া নিঃশেষিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, প্রভু নিত্যানন্দ এবং তৎপুত্র প্রভু বীরচন্দ্র বৈষ্ণব-সংসার পত্তন করিবার জন্য যে-সকল পবিত্র উপদেশ-বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা কোথাও বা উষর-ক্ষেত্রে পতিত হইয়া নিম্মল হইয়াছে, কোথায়ও বা অযথা ভূমিতে প্রোথিত হইয়া অযথা ভূতবৃক্ষ হইয়া উঠিতেছে।”

—‘সজ্জনতোষণী পত্রিকার উদ্দেশ্য’, সং তোঃ ২। ৪

৭। বৈষ্ণবধর্মের পুনরুদ্ধারের জন্য কি করা কর্তব্য?

“বৈষ্ণবধর্মকে পক্ষ হইতে উদ্ধার করিতে হইলে সমস্ত দৌরাণ্য দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।”

—‘ভেকধারণ’, সং তোঃ ২। ৭

৮। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দুষ্ট-মত নিরসনের জন্য কিরূপ সহিষ্ণু হইতে বলিয়াছেন?

“যদি আপনার দেশে ঐ সকল দুষ্ট-মত থাকে তাহা হইলে আপনি সেই সকল মতকে শোধন করিবার যত্ন করিবেন। ইহাতে ধূর্ত ও তৎক্ষণ লোকের সহিত যদি মনোবাদও হয়, তাহা হইলে তাহাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর খাতিরে স্বীকার করিবেন।”

—‘সহজিয়ামতের হেয়ত্ব’, সং তোঃ ৪। ৬

৯। শুদ্ধভক্তি প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে ভক্তিবিরোধিগণের চরিত্র-বিশ্লেষণ আবশ্যিক কি?

“ভক্তির নাম করিয়া অনেক স্থলে অবৈধ ও ভক্তিবিরোধি ক্রিয়া-সমূহ আচরিত হয়। সেই সকল বিষয় স্পষ্টরূপে না দেখাইয়া দিলে শুদ্ধভক্তির জয় লাভ হয় না।”

—‘সজ্জনতোষণী পত্রিকার উদ্দেশ্য’, সং তোঃ ২। ৪

১০। পৃথিবীর সকল ভাষায় শ্রীচৈতন্যের লীলা লিখিত হওয়া প্রয়োজনীয় কেন?

“শ্রীচৈতন্য-লীলা সকল ভাষায় লিখিত হওয়া প্রয়োজনীয়। অতি স্বল্পদিনের মধ্যেই মহাপ্রভু সর্বদেশব্যাপী হইয়া একমাত্র উপাস্য-তত্ত্ব হইতেছেন।”

—‘সমালোচনা’, সং তোঃ ৪। ৩

১১। শ্রীচৈতন্য-কথা বিস্তার ও তদীয় পদাঙ্কপূত তীর্থোদ্ধারের জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কিরূপ আর্তি ছিল?

“শ্রীপ্রয়াগক্ষেত্রে দশাশ্বমেধ-ঘাটে ( যেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই খানে ) ভক্তগণ একটী সেবা প্রকাশ করিবার যত্ন করিতেছেন ; এই কার্যটি যদি হইতে পারে, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভালরূপ প্রচার করা হয়। আবার শুনিলাম যে, শ্রীপ্রয়াগক্ষেত্রে যে-স্থলে মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ফল্গুতীর্থের উপকণ্ঠে একটী সেবা প্রকাশ করিবার জন্য অত্রস্থ কোন প্রভু-সন্তান বিশেষ যত্ন করিতেছেন। \* \* এখন কাশীধামে চন্দ্রশেখর-ভবন ( যেখানে মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন ) কোথায় আছে, তাহা স্থির করিয়া কোন মহাত্মা তথায় একটী সেবা প্রকাশ করিবার যত্ন করুন।”

—‘নববর্ষে বিগত বর্ষের আলোচনা’, সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮। ১

১২। প্রচারকগণ কোন সূত্রে মহাপ্রভুর ধর্ম প্রচার করিবেন?

“প্রেমসূত্রে মহাপ্রভুর প্রচারকগণ কার্য্য করিতেন ; তাঁহারা কোন বেতন বা পুরস্কার আশা করেন নাই। বিশুদ্ধ-চরিত্র প্রচারক ব্যতীত বিশুদ্ধ ধর্মের প্রচার সম্ভব হয় না। এইজন্যই আজকাল অন্যান্য ধর্মে বেতনগ্রাহী লোকেরা প্রচার করিতে থাকেন, অথচ তাঁহাতে যথেষ্ট ফল হয় না।”

—চেঃ শিঃ ১। ২

১৩। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও পার্শ্বদবর্গ কে কিরূপভাবে সর্বত্র হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন?

“কলিযুগপাবনাবতার অপার-কৃপা-পারাবার শ্রীমদগোদ্রুমচন্দ্র সন্ন্যাস করিয়া জগতে সর্বত্র হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। প্রভু স্বয়ং শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বসিয়া উৎকলবাসী ও দাক্ষিণাত্যবাসীদিগকে পরমার্থ বিতরণ করেন। বঙ্গদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভুকে শ্রীনাম ও ভগবন্ত প্রকাশ করিবার অধিকার প্রদান করেন। পাশ্চাত্য-ভূমিতে শুদ্ধভক্তি ও নাম-মহিমা প্রচার করিবার জন্য শ্রীমদ্ রূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবৃন্দকে প্রেরণ করেন। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা লাভ করিয়া শ্রীধাম-বৃন্দাবনে অবস্থিত হইয়া শুদ্ধনাম, শুদ্ধভক্তি ও শ্রীনাম-মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। সেই নামরসাচার্য্য গোস্বামীপ্রবর যে নাম-মহিমাষ্টক রচনা করেন, তাহা অদ্য আপনাদের নিকট গান করিতেছি; কৃপাপূর্বক শ্রবণ করত শ্রীহরিনামের মহিমা অনুভব করুন।”

—‘নাম-মহিমা’, বৈঃ সিঃ মাঃ ৫ম গুটী

১৪। নামহট্টের পত্তনকারী কে এবং তাঁহার আজ্ঞা-টহলটি কি?

“নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।

পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ।।

শ্রদ্ধাবান্ জন হে !

প্রভুর কৃপায়, ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।।

অপরাধশূন্য হৈয়া লহ কৃষ্ণ-নাম।  
 কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥  
 কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।  
 জীবে দয়া, কৃষ্ণ-নাম—সর্বধর্ম-সার॥

—‘নাম-প্রচার’ ( আজ্ঞা-টহল ), বৈঃ সিঃ মাঃ ৬ষ্ঠ গুটী

১৫। নামহট্টের মূল-মহাজন, কর্মচারী ও টহলদার পদবীর কার্য কি কি? শুদ্ধ টহল কিরূপে হয়?

“শ্রীমন্মহাপ্রভু কলি-জীবের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে ঘরে ঘরে নাম প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন ; অতএব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই গোদ্রুমস্থ নামহট্টের মূল মহাজন। নামহট্টের সমস্ত কর্মচারীই আজ্ঞা-টহলের অধিকারী হইলেও টহলদার পদাতিক-মহাশয়-গণই এই কার্য বিশেষরূপে নিঃস্বার্থভাবে করিয়া থাকেন। প্রভু নিত্যানন্দ ও পদাতিক হরিদাস-ঠাকুর সর্ব্বাগ্রে নিজে নিজে ঐ কার্য করিয়া উক্ত পদের মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন। পরস্যা ও চাউল ইত্যাদির আশায় যে টহল দেওয়া যায়, তাহা শুদ্ধ আজ্ঞা-টহল নয়।

টহলদার মহাশয় করতাল বাজাইয়া বলিবেন,—হে শ্রদ্ধাবান্ জন! আমি তোমার নিকট কোন পার্থিব বস্তু বা উপকার চাহি না। আমার এই মাত্র ভিক্ষা যে, তুমি প্রভুর আজ্ঞা পালন করত কৃষ্ণনাম কর, কৃষ্ণভজন কর ও কৃষ্ণ শিক্ষা কর। \* \* হে শ্রদ্ধাবান্ জন! নামাভাস ত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধনাম গান করাই জীবের নিতান্ত শ্রেয়ঃ। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণভজন কর। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনদ্বারা অধিকারভেদে বিধিমার্গে বা রাগমার্গে ভজন কর। \* \* হে শ্রদ্ধাবান্ জন! দশ অপরাধ-শূন্য হইয়া কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণই জীবের মাতা, পিতা, সন্তান, দ্রবিনিগদি ধন ও পতি বা প্রাণেশ্বর। জীব—চিৎকণ, কৃষ্ণ—চিৎসূর্য্য, জড়জগৎ—জীবের কারাগার। জড়াতীত-কৃষ্ণলীলাই আমাদের প্রাপ্য ধন। \* \*

হে শ্রদ্ধাবান্ জীব! তুমি কৃষ্ণ-বহিন্মুখ হইয়া মায়িক সংসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছ। এ অবস্থা তোমার যোগ্য নয়। \* \* চৌর্য্য, মিথ্যা-ভাষণ, কাপট্য, বিরোধ, লাম্পট্য, জীব-হিংসা, কুটীনাটী প্রভৃতি নিজের ও সমাজের অহিতকর কার্য—সমস্তই অনাচার। সে-সমস্ত ছাড়িয়া সদুপায়ের দ্বারা কৃষ্ণের সংসার কর। সারকথা এই যে, সর্ব্বজীবে দয়াপূর্ব্বক শুদ্ধ চরিত্রের সহিত তুমি কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণরূপাদি তোমার সিদ্ধ-স্বরূপগত নয়নগোচর হইবেন। অল্পদিনের মধ্যেই তোমার চিৎস্বরূপ উদিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম সমুদ্রে তুমি ভাসিতে থাকিবে।”

—‘নাম-প্রচার’ ( আজ্ঞা-টহল ), বৈঃ সিঃ মাঃ, ৬ষ্ঠ গুটী

১৬। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীমন্তুক্তিবিনোদ ঠাকুর নামহট্ট প্রচারে কিরূপ উদ্যম ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন?

“আমরা বিগত ২৮শে ফাল্গুন তারিখে উক্ত গ্রামে ( আমলাজোড়ায় ) উপস্থিত ছিলাম। পূর্ব্ব রাত্রে একাদশী জাগরণের পর প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় গ্রামস্থ ভক্তবৃন্দ মহাসমারোহের সহিত কীর্ত্তনে বাহির হইলেন। পরম পূজ্যপাদ সিদ্ধ শ্রীল জগন্নাথদাস

বাবাজী মহাশয়কে অগ্রবর্তী করিয়া সকলে প্রপন্নাশ্রমে পৌঁছিলেন। তথায় কীর্তন-সময়ে বাবাজী মহাশয়ের যে-সকল ভাব উদিত হইতে লাগিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। শতবর্ষের উর্দ্ধ বয়সেও যে প্রেমানন্দে সিংহের ন্যায় তাঁহার নৃত্যে এবং মধ্যে মধ্যে ‘নিতাই কি নাম এনেছে রে। নাম এনেছে নামের হাটে শ্রদ্ধামূল্যে নাম দিতেছে রে। দয়াল নিতাই আমার জগা’র মার খেয়ে প্রেম দেয় রে।’—ইত্যাদি ধূয়া অবলম্বন করিয়া তাঁহার অজস্র ক্রন্দন ও ভূমি-লুণ্ঠন-সময়ে তথায় একটা আশ্চর্য্য দৃশ্যের উদয় হইয়াছিল, তাহা অন্যত্র দেখা যায় না। বাবাজী মহাশয়ের ভাব দর্শন করিয়া এবং কীর্তনানন্দে নিমগ্ন হইয়া সকলেই প্রায় অশ্রু-পুলকে পরিপূর্ণ ও ভাবে গদগদ হইয়া বহুক্ষণ নৃত্য করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে কীর্তন স্থগিত হইলে সংক্ষেপে নামহট্ট-বিষয়ক একটা বক্তৃতা হইল। বাবাজী মহাশয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া প্রপন্নাশ্রমের কার্য্য সেইদিন হইতে আরম্ভ হইবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। বিপণিপতি মহাশয় বাবাজী মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে তদ্বিবসেই প্রপন্নাশ্রম-প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সমাপ্ত করিলেন।

স্কুল, ডাক্তারখানা ভূত্বিত প্রতিষ্ঠার সময় সর্ব্বদেশে স্থানীয় প্রধান লোককে সভাপতি করা হয়। ভক্ত-সমাজে তৎকালে উপস্থিত পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়কে প্রপন্নাশ্রম-প্রতিষ্ঠার সভাপতির আসন দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠু। যে যে গ্রামে প্রপন্নাশ্রম স্থাপিত হয়, তাহার প্রতিষ্ঠা এইরূপেই করা কর্তব্য।”

—‘আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম-প্রতিষ্ঠা’, সং তোঃ ৪।২

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

## শ্রীরূপ-শিক্ষা

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩২ পৃষ্ঠার পর ]

নচেৎ যাত্রার দলের অভিনয় করা হয়ে যাবে। কৃষ্ণকথা যারা শুন্বে না, তারা অভক্তের কাছে যাবে, তা’রা “উপদেশামুতে মানে যম”। তাদের ভক্তভক্ত জ্ঞান নাই। অভক্তের দ্বারা ভক্তনির্গয় হবে না। অসুর-মন্তক গুরুর বিচার করতে পারে না। যারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মে আবদ্ধ, তার সেবক যারা তারা বৈষ্ণব হ’তে পারে না। অকিঞ্চনের বেশ নিয়ে জাতগৌসাইকে প্রণাম করবে অথচ আশ্ব গোখর চণ্ডালকে প্রণাম করবে না, সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথাকে বৈষ্ণবতা মনে করবে। সাদা কৌপীন ক’রে নিয়ে পরমহংস সাজবে। প্রকৃতপ্রস্তাবে হরিভক্তি থাকলে সনাতন প্রভুর ন্যায় ভক্তের প্রসাদী বস্ত্র নিবে। কালনেমির কৌপীন নিতে দেবী হয় নাই। ভক্তি থাকলে বাইরে বিষয়ীর চেষ্টা দেখালেও ভক্তিই বিচার্য্য। মিছাভক্ত-সম্প্রদায় অন্য কার্য্যে ব্যস্ত।

ভাগবতকে পণ্যদ্রব্য করলে সাংসারিক বারুজীবী। গৌসাই, ব্রজবাসী বংশ-পরম্পরায় হ’তে পারে না। কতক লোক মৌন থাকবে; কিন্তু যে শ্রবণ করবে সে তৎক্ষণাৎ তা’ কীর্তন করবে। মঞ্জুরী পুতলে গাছ হয়, উহা নষ্ট ক’রে দিলে গাছ হয়



না। গুরুপা মঞ্জুরীর আনুগত্য ত্যাগ করলে অমঙ্গল অনিবার্য।

“শৃংখলিতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গুণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।

নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি।।”

বিচার ধ্বংস ক’রে কপটতাদ্বারা ভজনানন্দী হ’লে অসুবিধায় পড়বে। কীর্তন না হ’লে স্মরণটা বাদ পড়ে গেল। মৌনীর শ্রবণ করে না। নিত্য শ্রবণ না হ’লে কীর্তন বন্ধ হয়ে গেল। গুরুপাদপদ্ম অনুক্ষণ কীর্তন করেন। যারা তাঁর নিকট শ্রবণ করবে তারাও অনুক্ষণ কীর্তন করবে। অনুক্ষণ গুরুপাদপদ্মে থাকতে হবে, এক সেকেণ্ডের জন্য তফাৎ হ’লে অসুবিধায় পড়লাম। যে-সকল লোক বড় বিষয়াসক্ত, তাদের কীর্তন শ্রবণ করতে হবে না, লঘুর নিকট শ্রবণ করতে হবে না, গুরুর নিকট শুনতে হবে। গুরুর কার্য্য করতে হবে জগতের জন্য অগৌড়ীয়ের মৌনব্রত ভেঙ্গে দেওয়া গৌড়ীয়ের কার্য্য। Continually শ্রবণ না করলে continually কীর্তন হবে না। এই সকল কথা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অনেক দিন ধরে বলেছিলেন। শ্রবণটা নিজ চেষ্টায় করতে হবে। জগদগুরু যে শিক্ষা দিচ্ছেন “কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ” সেটা শ্রবণ করলাম না, বৈষ্ণব হয়ে পড়লাম—এরকম অবস্থা লোকের সংখ্যা প্রবল। কারণ, এরা সদাচাররহিত কথকের নিকট ভাগবত শোনে। নিজ্ঞন ভজনের অভিনয় অন্যায়া।

সেবা প্রচুর পরিমাণে হলে লাভ। মুখে কীর্তন করব। নিজে না পারলে ভগবানের সকল কায়ব্যুহকে ডাকব। অখাদ্যভোজীর জিহ্বায় হরিকীর্তন হয় না। অমেধ্যগ্রহণ শাস্ত্রবিগর্হিত। প্রসাদ ব্যতীত অন্য দ্রব্য মলমূত্র, তা হ’তে ত্রাণ লাভ করলে ভক্ত হওয়া যায়। মৌনী হওয়া নিষিদ্ধ।

গুরুপাদপদ্ম ত্যাগ করে নিজ্ঞন ভজন ভাল নয়। তাঁর সঙ্গ সর্বক্ষণ দরকার। শ্রবণ না হ’লে কীর্তন হয় না। দীক্ষা অনুক্ষণ হয়। ঠাকুর হরিদাসের কথায় সেটা জানতে পারা যায়।

জাত বোষ্টম্ বা মিছাভক্তের সঙ্গ করলে সর্বনাশ। বাস্তবিক বৈরাগ্যযুক্ত হ’লে বিষয়স্পৃহা দূর হবে। মাধুকরীগ্রহণ গৌড়ীয় মঠ করছেন। তাঁরা বিষ সংগ্রহ করেন না। তাঁদের কীর্তন ব্যতীত আর কোন কৃত্য নাই। তাঁরা ভক্তসান্নিধ্য ব্যতীত দুঃসঙ্গে প্রমত্ত হন না।

শ্রবণাদি-সেবা না করলে প্রাপ্তন সুকৃতিটুকুও নষ্ট হয়। বৈষ্ণবচরণরেণু-জল পেলে মঙ্গল। জল না দিলে বীজ নষ্ট হয়ে যায়। শ্রবণ-কীর্তন না করে মনগড়া বা কপট বৈষ্ণবের সঙ্গ করলে সর্বনাশ।

মর্ত্যজীবকে গুরু বলবেন না। যিনি ২৪ ঘণ্টা কৃষ্ণভজন না করেন, তার সঙ্গ করবেন না। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত পদার্থকে বৈষ্ণব বলবেন না। মাটিয়া বিচার ত্যাগ ক’রে অপ্রাকৃত বিচার গ্রহণ করতে হবে। জাগতিক কার্য্য—Social serviceএর জন্য যারা বাস্তব, তাদের সঙ্গ বঞ্জনীয়।

বিরজা—যেখানে জন্মস্থিতি-ভঙ্গ—রজঃ-সত্ত্ব-তমের ক্রিয়া বিগত। তা ছেড়ে যেতে হবে, Transcend করতে হবে। জগৎ-সৃষ্টির পূর্বের জায়গা বিরজা। তথায়

কারণার্ণবশায়ী ভগবানের অবস্থান। তাঁর ঈক্ষণে প্রকৃতি হতে ব্রহ্মাণ্ড রচনা হচ্ছে। তিনি সর্বদা কার্য্যে ব্যস্ত।

আদ্যন্ত মহতঃ শ্রুত্ব দ্বিতীয়ং তত্ত্বসংস্থিতম্।

তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং যানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে।

এখানে গুণত্রয়ধর্ম নাই বলতে বসেছেন শাকাসিংহ কপিলাদি। খানিক এগিয়ে বিশিষ্ট দত্তাত্রেয় শঙ্করের বিচার। এঁদের থেকে তফাৎ হতে হবে। শ্বেতাশ্বর ও দিগম্বর অহংবাদীর বিচার ত্যাগ করতে হবে। লছমীচাঁদ শেঠ বৃন্দাবনে মন্দির ক'রে দিয়েছেন। তাঁর অপর ভাই জৈন। তাঁদের বিচার ঈশ্বর নাই, খাটমলকে খিলান দরকার। বিরজা পার হ'য়ে পুনরায় স্থল পাওয়া গেল। বিষু-উপাসক সকল “উভে কুলে সঞ্চরন্তি”। ভগবান্ ভৌম বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হন। এখানে নামভজনকারী ব্যক্তি ব্রজবাসের সময় এটা উপলব্ধি করতে পারবে। নচেৎ ভোগ প্রবল হ'লে অসুবিধা হবে। ব্রজে এসে ভোগ করা ভাল নয়। আমরা এটা বরাবর প্রদর্শনীতে দেখাচ্ছি। ব্রজদর্শনে ভ্রান্তি হয়েছে। কৃষ্ণের সেবা-উপকরণ দেখছে না। মাধুকরীকে চিন্ময় জ্ঞান করে না। ভোগীদের দানের মত মনে করছে।

বিরজার পর ব্রহ্মলোক—যেখানে সকল জড়পদার্থ সরে গেছে চিন্মাত্র—ভূমিকা। অচিন্মাত্র ভূমিকার চিন্তাস্রোত তরলীকৃত হয়েছে, সেটী বিরজা। চিন্মাত্র অপেক্ষা চিদ্বিলাসবিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। নির্বিশিষ্ট স্থানে ভজন, ভজনীয় ও ভক্ত—তিনটী বস্তুর অবস্থান নাই। সর্বক্ষণ হরিভজন না হ'লে ধাতুপাত্র স্পর্শ করুক বা না করুক তাতে কিছু আসে যায় না। চিন্মাত্র-ভূমিকার যেখানে কাশীবাসী মায়াবাদীরা যেতে চান, সেখানে হরিভজনের কোন কথা নাই। অবুঝ লোকের জায়গা ব্রহ্মধাম, জড় বিশেষরহিত ধাম, কিন্তু চিদ্বিশেষরহিত হ'লে অত্যন্ত দরিদ্র জায়গা। ব্রহ্মানন্দের কোটী গুণ আনন্দ প্রেমানন্দে। বেদান্ত অধ্যয়ন ক'রে ব্রহ্মে বিলীন হ'বার বুদ্ধি ত্যাগ করতে হবে। ব্যোম ভূতাকাশ। ব্যোমে একটী বাস্তব থাকতে পারে, সমতল থাকতে পারে, স্থূল বলিয়া বিশিষ্ট বস্তু থাকতে পারে। তুরীর অবস্থার বিচার নির্বিশেষধামে ও পরব্যোমে। পঞ্চম মানের রাজ্য যমুনার তীর, বংশীধ্বনিতে “প্রিয়ঃ সোহয়ং” “যঃ কৌমারহরঃ”—যা গৌরসুন্দর শিক্ষা দিয়েছেন।

শেষোক্ত শ্লোকটী সাহিত্যদর্পণকার উদ্ধৃত ক'রেছেন। পরব্যোম গোলোকের নিম্ন ভাগ। ঐশ্বর্য্যবিচারে খানিকটা উঠলে দেখা যায়। এখানে ২২ প্রকার রস মাত্র। উপর দেখা যায় না, নিম্নার্দ্ধ মাত্র। এগুলি আমরা ৫টী প্রদর্শনীতে দেখিয়েছি। কিন্তু অভক্ত উষ্ট্র না দেখলে কি করব। পরব্যোমের উপরিভাগে কৃষ্ণপাদপদ্ম আছেন। মর্যাদাপথে নারায়ণ-সেবার উপর কৃষ্ণসেবা। সেজন্য ‘অন্যাভিলাষিতাশূন্যং’ শ্লোকে উত্তমা ভক্তির বিচারে কৃষ্ণগনুশীলনের কথা “বিষ্ণোরনুশীলন” নয়। এটী হৌরসুন্দরের বিশেষ কৃপার কথা। রাগানুগার দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি ও রাগাঙ্ঘিকার অনুগায় মধুর রতি সর্বশ্রেষ্ঠ।

সংসারের কথা নিয়ে যারা মানুষকে ভোগ করাচ্ছেন, তাদের বিচারপ্রণালী ও ভক্তের বিচারপ্রণালী এক নয়। কৃষ্ণপদসেবা করলে লীলাবৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায়। অঘবকাদি বধই কৃষ্ণলীলা নয়, এটী বিরোধী বিনাশ, তৎপরে কৃষ্ণে আসক্তি। তর্কপথে থাকতে হবে, তা' নয়।

“তাঁহা”—কৃষ্ণচরণকল্প-বৃক্ষে; তথায় পৌঁছাবার পরে। এখানে সাধনভক্তিকে অবজ্ঞা করতে হবে না। ভজন করতে হবে মানে সাধনের মধ্যে থাকা, সাধনকে ছেড়ে ভাবরাজ্যে অগ্রসর হওয়া নয়। সাধন নিত্য। ভক্তি নিত্য হ'লে সাধন অনিত্য নয়। যিনি সাধনভক্তি শেখান, তিনি মরে যান না।

প্রাকৃত সহজিয়ার সঙ্গে করলে এসব কথা বুঝা যায় না। মালী নিত্য শ্রবণ-কীর্তনাদি জল সেচন করছেন। “যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাতা।” বৈষ্ণব অপরাধ হ'লে অধঃপতন। তা'হ'লে ভোগী বা ত্যাগী—মর্কটবৈরাগী হতে হবে। হাতী গুঁড় পাঠিয়ে বেড়ার উপর থেকে গাছ উপড়ে ফেলবে। “ধরি মাছ না ছুই পানি” বিচার ক'রে গুরুর আসন নিলে সর্বনাশ। মহাভাগবত-এর অবস্থা হ'লে কৌপীন নিবে। চারি আচার্য্যই লাল-কাপড়-পরা সন্ন্যাসী। চৈতন্যদেবেরও লাল কাপড়, মাধবেন্দ্রের ৯টি শিষ্যই লাল-কাপড়-পরা। সনাতন-রূপাদির পারমহংস্য বিচারে সাদা কাপড়। তাঁদের সত্য সত্য বিরক্ত বৈষ্ণ, কপটতায়ুক্ত বৈরাগী নয়। \* চরণ যেরূপ ঠাকুর সেবা করেন, সে কথা নয়। দীনবন্ধুর শ্রেণী আধ্যাত্মিক বিচারে ওসব করতে গেছে। কোন ধর্মীর অর্থ আমার গুরুদেব নেন নাই।

“তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ”। যিনি ভজন করবেন তাঁকে যত্ন করতে হবে, যাতে দূর হতে গাছ নষ্ট না ক'রে দেয় তার জন্য। যেমন কপির চারা ঢেকে দেয় সেইরূপ যত্ন করতে হবে।

কিন্তু ‘যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা’—লতার গায় একটা পরগাছা উঠলে সর্বনাশ। “ভুক্তি” মাইনে নেওয়া, “মুক্তি” মাইনে না নেওয়া। রামানন্দ রায় রাজার pension নিয়েছিলেন। যদি বলা হয় তিনি অন্যায় করেছেন আমরা ধাতুপাত্র ছোব না, তাতে লোকসংগ্রহ হ'তে পারে কিন্তু অপরাধের কথা। সোণার পাত্র থেকেও বড় পাত্র রাধাকুণ্ডের পাত্র সকল। স্বর্ণের ব্যবহার দেখে কেউ ব্যস্ত হ'লে সর্বনাশ। প্রতিষ্ঠার আশা আমরা করি না। মাইনে পেয়ে সমস্ত টাকা হরিসেবায় দিলেই হয়। রাজকবিপণি করি নাই। মিছাভক্ত হ'য়ে কপটতা করছি। সোণার গ্লাস, মোটরে কিছু অসুবিধা হ'বে না। আমাদের গুরুপাদপদ্ম কাঠখড়ি সংগ্রহ ক'রে বেচে পয়সা এনে পাক করতেন। তাঁর নিকট গেলে আমাকে ভাগবতব্যাখ্যা করতে বলতেন; শুনে এমন একটা কথা বলতেন যা হাজার বছর আলোচনা করলেও জানতে পারতাম না। তিনি বলতেন মাইনে নিও না, লোকের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ ক'রে বৈষ্ণবসেবা কর।

নিষিদ্ধাচার—কৃষ্ণভক্তি ছেড়ে বৈরাগ্য দেখাতে যাওয়া।

কুটীনটী—ছিদ্রানুসন্ধান ক'রে তর্কবিতর্ক করতে যাওয়া।

জীবহিংসা—পরমাংসভক্ষণ, ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা।

কন্মিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, অন্যাভিলাষ, সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভক্তিসকল 'উপশাখা'। নিড়িয়ে না দিলে মুখোর গাছ বেশী হয়। প্রথমেই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা ছেদন করতে হবে। উপশাখা ছেদন না করলে সর্বনাশ।

ন ধর্ম্যং নাধর্ম্যং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্যামিহ তনু।

শচীসুনাং নন্দীশ্বরপতিসুতহে গুরুবরং

মুকুন্দপ্রেষ্ঠহে স্মর পরমজয়ং ননু মন।।

দাস গোস্বামী প্রভুর চরণাশ্রয় না করলে সর্বনাশ, তাঁর চরণাশ্রয় করলে পরম মঙ্গল।

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ

## শুনিলেই শ্রীহরিনাম পশু-পক্ষী-কীটাদি তরে কি?

স্বার্থপর ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজকে পোষণ করে। আর নিঃস্বার্থপর ব্যক্তি নিজকে ত' পোষণ করেনই; অধিকিস্ত্রু অপর লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকেও পোষণ করেন। পোষণের তারতম্যানুসারে স্বার্থপর ব্যক্তি অপেক্ষা নিঃস্বার্থপর ব্যক্তির শ্রেষ্ঠতা পরিলক্ষিত হয়। পারমার্থিক বিচারে হরিনাম-জপকারী অপেক্ষা উচ্চ নামকীর্তনকারী সর্বশ্রেষ্ঠ। হরিনাম-জপকারী কেবলমাত্র নিজের মঙ্গলবিধান করেন, কিন্তু হরিনাম-কীর্তনকারী নিজের মঙ্গলবিধানের সঙ্গে সঙ্গে জগতেরও মঙ্গল বিধান করেন। তাই হরিনাম-কীর্তনকারী কেবলমাত্র স্বার্থপর নহেন, পরন্তু নিঃস্বার্থ ও পরার্থপর। উচ্চ হরিনামকীর্তন কখনও দোষের বা তর্কদ্বারা সমালোচনার বিষয় হইতে পারে না। কৃষ্ণনাম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-নাম কীর্তিত হইলে তাহা শ্রবণের অধিকার লাভ করিয়া কেবলমাত্র মনুষ্য নহে সন্ধুচিত চেতন, আচ্ছাদিত চেতনাদিসমূহও জীবন্মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠগতি লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এক ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন,—

শুন বিপ্র, সকল শুনিলে কৃষ্ণনাম।

পশু, পক্ষী, কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।। (চৈঃ ভাঃ আদি ১৬।২৭৮)

পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।

শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে।। (চৈঃ ভাঃ আদি ১৬।২৮০)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদেও পাওয়া যায়, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শিবানন্দ সেনের ভগবদ্ভক্ত কুকুরকে প্রথমে কৃষ্ণনাম শুনাইয়া এবং পরে তাঁহার মুখে কৃষ্ণনামোচ্চারণের ক্ষমতা প্রদান করিয়া তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

প্রসাদ নারিকেল-শস্য দেন ফেলাএগ।

'রাম' 'কৃষ্ণ' 'হরি' কহ—বলেন হাসিয়া।।

শস্য খায় কুকুর, 'কৃষ্ণ' কহে বার বার।  
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার।।

\* \* \*

আর দিন কেহ তার দেখা না পাইলা।  
সিদ্ধদেহ পাঞ কুকুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা।।  
এছে দিব্যলীলা করে শচীর নন্দন।  
কুকুরকে কৃষ্ণ কহাঞ করিলা মোচন।।

শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপরিউক্ত বাক্যসমূহের অবৈধ অনুকরণ করিয়া প্রাকৃত সহজিয়াগণের অনেকে কুকুর-বিড়ালাদির কর্ণে কৃষ্ণমন্ত্র বা কৃষ্ণনাম প্রদানের ছলনা করিয়া আত্মেन्द्रিয়-তৃপ্তির চেষ্টা করেন। অনেকে আবার আত্মেन्द्रিয়-তর্পণের উদ্দেশ্যে পক্ষী পুষিয়া তাহাকে কৃষ্ণনাম বলিতে শিখাইয়া তাহার মুখ হইতে কৃষ্ণনাম শ্রবণের ছলনা করেন। কেহ কেহ স্থাবর-জঙ্গমাদিকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিবার মানসে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্তন করেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ অপ্রাকৃত মহাভাগবতগণের আচরণের অবৈধ অনুকরণ করিতে গিয়া যে আত্মেन्द्रিয়-প্রীতিবাঞ্ছা করেন, তাহা তাহাদের দুরারোগ্য একপ্রকার গুপ্ত ব্যাধি। স্বয়ং রোগী যেরূপ নিজের রোগ কিছুতেই ধরিতে পারেন না, সুচিকিৎসক তাহার রোগ নির্ণয় করেন, তদ্রূপ প্রাকৃত সহজিয়াগণ নিজেদের রোগ ধরিতে না পারিলেও শুদ্ধনামের অনুশীলনকারী নামাচার্য্য মহাভাগবতগণ তাহাদের রোগ অনায়াসে ধরিতে পারেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ—নামাপরাধী, তাহাদের মুখে নামাপরাধ ব্যতীত কখনও শুদ্ধনাম উচ্চারিত হয় না। নামাপরাধী পশু-পক্ষীকে নামাপরাধ শ্রবণ করাইয়া তাহাদিগকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিবার যে আদর্শ স্থাপন করেন, তাহা ছলনামাত্র। তাহা ফলপ্রসূ না হইয়া বিপরীত ফল প্রদান করে। যিনি হরিনামের সেবা ও অপরকে হরিনাম শ্রবণ করাইবার চেষ্টা দেখাইতে গিয়াও পাপ-পুণ্যের প্রাকৃত বিচারে মগ্ন, তিনি কখনও নামের স্বরূপ অবগত হইতে সক্ষম হন নাই। সুতরাং ঐরূপ ব্যক্তির মুখে পশু-পক্ষী-কীটাদি 'ত' দূরের কথা, অপর মনুষ্যও নাম শ্রবণ করিলে সংসারগতি লাভ করিবে।' বৈকুণ্ঠগতি 'ত' দূর অস্ত। নামাপরাধী ব্যক্তির কুকুর-বিড়ালাদির কর্ণে নাম প্রদানের প্রচেষ্টা অথবা পক্ষীর মুখ হইতে হরিনাম শ্রবণ করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার বহুদূরীকৃত সখের অন্যতম একটি 'সখ' বিশেষমাত্র। কোথায় মহাভাগবতগণের অলৌকিক কৃপাশক্তি ও তন্মুখোচ্চারিত অপ্রাকৃত শ্রীনাম, আর কোথায় ইन्द्रিয়তর্পণপরায়ণ সহজিয়াগণের মহাভাগবতগণের প্রতি মর্কট প্রবৃত্তিমূলক মুখভঙ্গি ও তন্মুখোচ্চারিত নামাপরাধ। নামাপরাধী ব্যক্তি যেক্ষেত্রে নিজেই মায়াবদ্ধ, সেক্ষেত্রে তিনি কি করিয়া কুকুর-বিড়ালাদির কর্ণে নামপ্রদান করিয়া তাহাদিগকে মায়াবদ্ধ বৈকুণ্ঠলোকে প্রেরণ করিতে পারেন? ইহা একজন অন্ধের অপর একজন অন্ধকে পথ দেখাইবার ন্যায় হাস্যাস্পদ ব্যাপার। বসন্তী হিন্দুর পরবের কোন খবর রাখেন না বলিয়া তাহার নিকট পরব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যেরূপ কোন উত্তর দিতে পারিবেন না, তদ্রূপ নামের মাহাত্ম্য

সম্বন্ধে যাহার কোন ধারণাই নাই, সেই নামাপরাধী কি করিয়া অপরকে নাম প্রদান করিয়া তাহার মঙ্গল সাধন করিবেন?

নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, চৈতন্যরসবিগ্রহ সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীহরিনাম উচ্চারণ বা শ্রবণ করিতে শুদ্ধ আত্মা বা নিৰ্মল চেতনই একমাত্র সক্ষম। পশু-পক্ষী বা মানবের দেহ কিম্বা কোন অচেতন যন্ত্রের মধ্যে অপ্রাকৃত নামের কোন ক্রিয়া হয় না। শুদ্ধনাম স্পর্শ করিলে তবেই পশু-পক্ষী-কীটাদির আত্মা নিৰ্মল হইবার যোগ্যতা লাভ করে। নাম-কীর্তনকারী, নাম-শ্রবণকারী এবং নামের মধ্যে কোনপ্রকার ব্যবধান থাকিলে কেবল বাহ্যপ্রক্রিয়ায় নাম উচ্চারণ বা শ্রবণের দ্বারা বাস্তব ফলোদয়ের কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাই দেখা যায়, গ্রামোফোনের মুখে নাম বা সবাক চিত্রের ‘মীরাবাদি’, ‘বিষ্ণুপ্রিয়া’, ‘প্রহ্লাদ’ ‘নারদ’ প্রভৃতির মুখে নাম শ্রবণ করিয়াও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের আকাঙ্ক্ষা নিবারিত না হওয়ায় সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়া তাহাদের বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিও হয় না। অনেক সময় দেখা যায়, বারাদনার আলয়ে বারাদনার মুখে রাইকানুর নাম তথা প্রেমসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া পোষা শুকপাখী, কাকাতুয়া, ময়না প্রভৃতি ঐ সকল উচ্চারণ করিতে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু এইক্ষেত্রে নামোচ্চারণকারী যেরূপ দৈহিক কসরতের দ্বারা দৈহিক যন্ত্রের মধ্যেই নামকে সীমাবদ্ধতা করিবার অভ্যাস করিয়াছে, তদ্রূপ নামশ্রবণকারী পশু-পক্ষীও ‘হরে কৃষ্ণ’ নাম প্রভৃতির উচ্চারণ দেহযন্ত্র কসরতের মধ্যে অভ্যাসমাত্র করিয়াছেন। তাহাদের আত্মায় নাম স্পর্শ করে নাই বলিয়া উভয়ের কাহারও মঙ্গললাভ হয় না। জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—“মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীরও জিহ্বা আছে এবং তাহারা নানাপ্রকার ধ্বনি উচ্চারণ করিতে পারে বটে, কিন্তু মানব ব্যতীত আর কোন প্রাণীই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারে না। তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন, পক্ষিগণও ত’ কৃষ্ণ-নামোচ্চারণের ন্যায় শব্দের অনুকরণ করে, তাহাতে তাহাদেরও উত্তমগতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ হইতে পারে? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ‘অনুকরণ’ ও ‘অনুসরণ’—সম্পূর্ণ পৃথক্ কার্য। অনুকরণকারী কৃষ্ণনামের ন্যায় জড়াকাশের ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দগুলি উচ্চারণ করিলেও তাহার সেবোন্মুখ-জিহ্বায় চিদিন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিদাকাশ বিরাজিত কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় না। কৃষ্ণের বিষয়ভোগের উদ্দেশ্যে সকামভাবে যে উচ্চারিত নাম-প্রতিম শব্দ, তাহা ‘বৈকুণ্ঠ-নাম’ নহে। উহা তুচ্ছফল প্রদান করিতে সমর্থ বলিয়া নামাপরাধ-শব্দেই কথিত, পরন্তু উহা শুদ্ধনামের ফল কৃষ্ণপ্রেমা উদয় করাইতে পারে না।”

এক নিৰ্মল ও শুদ্ধ আত্মা শুদ্ধনাম উচ্চারণ করিলে তাহা অপর এক নিৰ্মল অনাবৃত আত্মায় বিদ্যুৎকণার ন্যায় সঞ্চারিত হইলে শ্রবণকারী বা কীর্তনকারী বাহ্যদর্শনে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, যাহাই হউক না কেন, তদ্বারাই উভয়ের পরম মঙ্গললাভ অনিবার্য। প্রাণিমাট্রেই বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ করিতে না পারিলেও ভগবদ্ভক্তের নিকট হইতে তাহারা কর্ণদ্বারা তাহা শ্রবণ করিতে পারে। বৈকুণ্ঠ-নাম শ্রবণে যাহার যোগ্যতা হইল না, তাহার জীবন সত্যসত্যই বৃথা। পক্ষী তথা মুকজীবগণের নামপ্রদানকারী যদি

মহাভাগবত বা শুদ্ধবৈষ্ণব হন, তাহা হইলে পক্ষী তথা মূকজীবগণের আত্মা হরিনামে অভিষিক্ত হইয়া আনুষঙ্গিকভাবে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভগবৎসেবাময় বৈকুণ্ঠে নীত হয়। এই প্রসঙ্গে জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যভাগবতের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—“সাধু, ভক্ত বা বৈষ্ণবের শ্রীমুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিলে শুশ্রূষাজীবমাত্রেরই কর্ণরঞ্জে সেই উচ্চারিত বৈকুণ্ঠশব্দ প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে মায়াবন্ধন হইতে মোচন করে। কারণ বৈকুণ্ঠ-নাম জীবকে ভোগ-বুদ্ধি হইতে বিমুক্ত করিয়া বৈকুণ্ঠবস্তুর সেবাবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করায়। ভক্তজিহ্বরূপ বৈকুণ্ঠধামে জড়াকাকারের ন্যায় বদ্ধজীবের কোন ভোগ্য অজ্ঞান না থাকায় এবং বৈকুণ্ঠনাম পূর্ণ অদ্বয়—জ্ঞান-বাচক হওয়ায় জীবকে ভোগময়ী বদ্ধদশায় আবদ্ধ করে না। সুতরাং বৈকুণ্ঠ ভগবান্নাম গ্রহণ করিলে জীব জীবমুক্ত হয়।” অতএব বাহ্যদর্শনে নামাক্ষরের ন্যায় দেখিতে নামাপরাধ শ্রবণে জীবমাত্রেরই সংসার গতি অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ক্রিয়া অধর্ম, অনর্থ, কামের অতৃপ্তি অবশ্যসম্ভাবী; আর মহাভাগবতের মুখে হরিকথা-শ্রবণে জীবমাত্রেরই নিত্যকল্যাণ অবশ্যসম্ভাবী।

—ত্রিদিগ্ভিম্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

## গুরুসেবা

“সাক্ষাদ্ভবিতেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সঙ্ঘিঃ।

কিন্তু প্রভো যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥”

নিখিল শাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন বিগ্রহরূপে কীর্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, কিন্তু যিনি প্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ সেই ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

শ্রীগুরুসেবাই আমাদের একমাত্র ধর্ম। গুরুসেবা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীগুরুদেব ভগবানের অভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহ। তিনি আশ্রয় জাতীয় ভগবান্। ভগবানের সেবা করিলে ভগবান্ যত না সন্তুষ্ট হন গুরুসেবাদ্বারা তিনি তদপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হন। গুরুসেবাদ্বারা আমাদের যাবতীয় অমঙ্গলরাশি দূরীভূত হইবে এবং পরম মঙ্গল লাভ হইবে।

শ্রীমন্ত্তাগবত বলিয়াছেন,—

“তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।

শাস্ত্রে পরে চ নিষগতং ব্রহ্মণ্যপশমাশ্রয়ম্॥”

জীবের পরম মঙ্গল অর্থাৎ যাহা ঐহিক বা পারলৌকিক কর্ম্মার্জিত ভোগের ন্যায় অনিত্য নহে। তাদৃশ শাস্ত্রত কল্যাণ জানিবার ইচ্ছুক হইয়া শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম-বিষয়ে অভিজ্ঞ রাগাদিশূন্য গুরুর শরণাগত হইবে।

শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন এবং শিষ্যের সমস্ত সন্তাপ হরণ

করিয়া ভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। ভগবানের সেবা আমরা কি-প্রকারে করিব, তজ্জন্য ভগবান্ নিজেই গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমাদেরকে সেবা শিক্ষা প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই,—

“গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।

গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥”

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে বলিয়াছেন,—

“আচার্য্য মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেৎ কর্হিচিৎ।

ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেব ময়ো গুরুঃ॥”

ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন,—হে উদ্ধব! গুরুদেবকে আমার অভিন্ন আশ্রয়-বিগ্রহ জানিবে। কখনও তাঁহার অবজ্ঞা বা মনুষ্যজ্ঞানে দোষ দর্শন করিবে না, যেহেতু গুরু সর্বদা দেবস্বরূপ।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দম্ব, গ্রাম্যবান্ধব, হিংসা, ত্রিতাপ ও ত্রিগুণাদি জয় করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণও সর্বভাবে শ্রীগুরু-সেবা। গুরুসেবাদ্বারাই সর্ব সিদ্ধি হইবে এবং ভগবৎ প্রাপ্তি হইবে।

“যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।

মর্ত্যাসন্ধিঃ শ্রুত্ব তস্য সর্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥”

অর্থাৎ—প্রত্যক্ষ ভগবান্ জ্ঞানদীপপ্রদ গুরুতে যে ব্যক্তির মর্ত্যজ্ঞানরূপ দুর্বুদ্ধি থাকে, তাহার সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন হস্তিমানের ন্যায় ব্যর্থ হয়।

তাই বলি,—

(মনরে) গুরু-পদ সদা কর সার।

শ্রীগুরু-করুণা হ'লে, তরে যাবে অবহেলে,

ভবসিদ্ধি অনন্ত অপার॥

শোকতাপ দূরে যাবে, গুরুনাম লবে যবে,

কাতর হয়ে ডাক একবার।

কপটতা পরিহরি', অন্তর সরল করি',

আশ্রয় লইলে হবে পার॥

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরু হন, পরমহংস মহাজন,

নাম প্রেমে সদা গরগর।

হেন গুরু নিষ্ঠা কর, আজীবন সঙ্গ ধর,

ছেড়ে না ছেড়ে না পদ তাঁ'র॥

হরিদাস মন্দমতি, বিষয় মদাম্ব অতি,

বুথায় গেল দুর্লভ জনম।

ওহে গুরু দয়াময়! হইয়া মোরে দসয়,

কৃপা করি দাও শ্রীচরণ॥

—শ্রীহরিদাস দাস, ভক্তিশাস্ত্রী



## বৈষ্ণবতা কোথায় ?

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৬ পৃষ্ঠার পর ]

শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপাপূর্বক সেবকগণকে সেবাভার দিয়া সেবকের চিত্তবৃত্তিকে সংশোধন করিবার সুযোগ দেন। গুরুবর্গের আদেশ ও শাসন নির্বিচারে পালন করাই শিষ্যের একমাত্র কর্তব্য। মঠে বাস করিয়া মঠবাসীর আচার-বিচার ছাড়িয়া দিলে অচিরেই সংসারী হইয়া পড়িতে হইবে। কেহ কেহ ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করেন সেবার পরিবর্তে। মঠের স্বার্থ, মঠের সেবার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়িলেই সংসার ভাল লাগে। গুরু-বৈষ্ণবের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে, মঠকে ভোগ করার প্রবৃত্তি দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফলে চিত্তচঞ্চল হইয়া পড়ে এবং সংসারে যাইবার জন্য বাসনা প্রবল হয়। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা বা সেবা হইতে বঞ্চিত হইলেই জীবের পতন ও তৎফলে সংসারে প্রবেশ। মহাজনগণ সংসারকে নরকের দ্বারস্বরূপ ও অন্ধকূপসদৃশ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, যদি হরিসেবাবিহীন গৃহ হয়।

মঠ সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ—এই বিচারে আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। ভক্তের মঠ-মন্দির হচ্ছে প্রাণ। কারণ এখানে সদা সর্বদা হরি-গুণগান কীর্তন হইয়া থাকে। ভগবান্ ও গুরু-বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত অন্য কোন সেবা নাই। এখানে আনন্দের প্রবেশ নাই; শুধু বৃন্দাবন-রসকেলি বার্তা।

মহাজনগণ সংসার-উত্তীর্ণ হইবার পথনির্দেশ করিয়াছেন,—

“সংসারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে।

যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চান্দরে।।”

“আর কবে নিতাই-চাঁদের করুণা হইবে।

সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।।

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।

কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।।”

“নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবৈ,

ধর নিতাইয়ের চরণ দু’খানি।।”

অতএব, গুরু নিত্যানন্দের চরণে নিম্পটে আশ্রয় বা শরণাগত না হইলে সংসার-সাগর পার হওয়া বড়ই কঠিন।

দুর্দশাগ্রস্থ জীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলিলেন,—

“যারা সর্বক্ষণ কৃষ্ণসেবা করেন, সেই সব সাধুর সঙ্গে থাকলে আমাদের সেবাপ্রবৃত্তি জাগবে। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ ব্যতীত সেবা করার ইচ্ছা জাগাতে পারে না। হরিসেবা তামাসার জিনিষ নয়। ইহা কেবল সাধুসঙ্গ ও কৃপাসাপেক্ষ। সাধুগুরুর পূর্ণ আনুগত্য করলেই সেবার সৌভাগ্য লাভ হয়। সেবক অভিমান না হইলে সেবা হয় না। সেবা ও সেবকের সহিত যোগসূত্রই হ’ল ভক্তি বা সেবা। আমরা সেবক না হইয়ে

সেবা হতে চাচ্ছি। সুতরাং সেবা কি করে হ'বে? সেবকই ত' সেবা করবে। সম্বন্ধ না হইলে সেবা হয় না। সেবা করতে করতে সম্বন্ধ পরিস্ফুট হয়।”

“আমরা গুরু-কৃষ্ণের eternal slaves, আমরা গুরু-কৃষ্ণের নিত্য গোলাম— এই কথাটা ভুলে যাবার জন্যই আমাদের এত দুর্গতি হয়েছে। সংসঙ্গ ব্যতীত দুর্বল আমি বাঁচতে পারব না। সব সময় সাধুসঙ্গে বাস না করলে প্রভু হবার দুর্বুদ্ধি প্রবল হ'বে এবং নানা দুশ্চিন্তা এসে আমাদেরকে বিব্রত করে ফেলবে।”

ভজ্ঞ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দ রে।

দুর্লভ মানব-জনম সংসঙ্গে তরহ এ ভবসিঙ্ধু রে॥

আচার্য্যবর্গের অবাধ্য হইয়া পড়ার জন্যই আমাদের অন্য কামনাবাসনা প্রবল হইয়া পড়ে। একবারও ভাবি না—

“কে তুমি, কোথায় ছিলে, কি করিতে হেথা এলে।

কিবা কাজ করে গেলে, যাবে কোথা শরীর পতনে।”

অতএব, আমাদের Final goal-এ পৌঁছাইতে হইলে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।

মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নহে।

কৃষ্ণভক্তি দূরে রহ, সংসার নহে ক্ষয়॥ ( চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৫১)

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

নৈবাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্গিষ্ণুং স্পৃশ্যত্যানর্থাপগমো যদর্থঃ।

মহীয়সাং পাদরজোহভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

(ভাঃ ৭।৫।৩২)

অতএব, বৈষ্ণবতা লাভ করিতে হইলে নিরন্তর সেবা বৃত্তির উপরই নির্ভরশীল থাকিতে হইবে। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে তাঁহাদের প্রীতিমূলা সেবাই বৈষ্ণবতা।

গৃহস্থ ভক্তগণেরও পারমার্থিক যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে সর্বাগ্রে ভগবৎ-সুখার্থ সাধু-গুরুর সঙ্গ ও সেবা প্রীতিপূর্বক করিতে হইবে। মহাজনগণ বলেন,— গৃহত্যাগী যে-সমস্ত মঠবাসী ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী মঠে বসবাস করিয়া নিরুপায়ে নিরন্তর গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে হরিভজন করেন, তাঁহাদের সেবা করাই গৃহস্থের একমাত্র কর্তব্য। কেবলমাত্র, সদগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে বৈষ্ণবী-দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া সংসারে-ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সদা সর্বদা ব্যস্ত থাকিলে এবং সুযোগ সুবিধামত মঠ ও গুরু-বৈষ্ণবকে ভোগের বস্তু জ্ঞান করিয়া আখেরে গুছাইয়া লইবার প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত না হইলে নরকে যাওয়ার পথ সুগম হইয়া পড়িবে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভু গৃহস্থ-ভক্তগণের কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার পার্শ্বদগণের মাধ্যমে বহু মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন। শুধু খাওয়া, পরা, থাকাই জীবের মূল উদ্দেশ্য নহে। সর্বতোভাবে কৃষ্ণসেবার জন্য নিযুক্ত হইলেই মনুষ্য জীবন সার্থক হইবে।

“এতাবজ্জন্মসাক্ষ্যং দেহিনামিহ দেহিবু।

প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা।।” (ভাঃ ১০।২২।৩৫)

“ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।

জন্ম সার্থক করি’ কর পর উপকার।।” (চৈঃ চঃ আঃ ৯।৪১)

বিশ্ণুশাঠ্য দোষ হইতে নিস্তার পাইতে হইলে হরি-গুরু বৈষ্ণব সেবা করাই জীবের একমাত্র শ্রেয়ঃ পথ। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রেয়ঃ পথ সম্বন্ধে অন্যত্র বলিলেন,—

“শ্রেয়ো মধ্যে কোন শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার।।

কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর।।”

গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্তব্য ও সাধ্য সম্বন্ধে কুলীন গ্রামবাসী ভক্তগণের জিজ্ঞাসা—

গৃহস্থ বিষয়ী আমি, কি মোর সাধনে।

শ্রীমুখে করেন আজ্ঞা, নিবেদি চরণে।।

প্রভু কহেন,—‘কৃষ্ণসেবা’, ‘বৈষ্ণব-সেবন’।

নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন।।” (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৩-১০৪)

প্রভু কহে,—‘বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সংকীর্তন।

দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ।।’ (চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭০)

বৈষ্ণব চিনিবার উপায় প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীতে পাই,—“বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর এবং বৈষ্ণবতম—এই তিন প্রকার লক্ষণ পাওয়া যায়। এই তিন প্রকার বৈষ্ণবের সেবাই গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্তব্য। প্রভুর বিচারের তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা কেবল বৈষ্ণবী-দীক্ষামাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ একবারও নিরপরাধে কৃষ্ণনাম করেন নাই, তাঁহার প্রতি বৈষ্ণবসেবা প্রযোজ্য নয়; কেবল ‘সুহৃৎ’, ‘অতিথি’ বলিয়া তাঁহাকে সম্মান করা আবশ্যক।’ “মন্ত্র-দীক্ষিত বৈষ্ণবকে এস্থলে বিচারে আনা হয় নাই; ইহার কারণ এই যে, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত অনেকে তত্ত্বজ্ঞানশূন্যতাবশতঃ মায়াবাদাদি-দোষে দূষিত থাকিতে পারেন, কিন্তু নামাপরাধশূন্য কৃষ্ণনামোচ্চারণকারী-বৈষ্ণবের সে-সব দোষ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। মন্ত্র-দীক্ষিত ব্যক্তি বৈষ্ণবপ্রায়, কিন্তু যিনি নিরাপরাধে একবার কৃষ্ণনাম করিয়াছেন, তিনি সর্বকনিষ্ঠ হইলেও ‘শুদ্ধ বৈষ্ণব’। গৃহস্থ বৈষ্ণব সেইরূপ বৈষ্ণবকেই সেবা করিবেন।” (অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য)।

বিশ্ণুশাঠ্য দোষ গৃহস্থ ও মঠবাসী উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য। কারণ, মঠে বাস করিয়া ভিক্ষালব্ধ অর্থ ও অন্যান্য উপায়ে উপার্জিত অর্থ যদি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় বা শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধীয় কোন পারমার্থিক কার্য্যে ব্যয়িত না হয়, তবে বিশ্ণুশাঠ্যদোষ হেতু অপরাধ আসিয়া পড়ে। এই অপরাধের ফলও ভয়ানক আকার ধারণ করে। অতএব, ধন উপার্জন করিয়া উক্ত ধনের দ্বারা শ্রীভগবান্ ও হৃদীয় বস্তুর সেবাই একমাত্র পরমার্থ।

“তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।।”

নাম-সংকীর্তনের মাধ্যমেই বৈষ্ণবতা প্রকাশ পায় সেইহেতু শ্রীমন্মহাপ্রভু নামের

মহিমা প্রচুর কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীনামভজনেই সর্বসিদ্ধি হয়। শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—“সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর। “কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।”

৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গ-মধ্যে শ্রীনাম-সংকীৰ্তনেরই সর্বশ্রেষ্ঠতা। নাম-সংকীৰ্তনদ্বারাই জীবের মঙ্গল সম্ভব।

“নাম সংকীৰ্তনে হয় সর্বানর্থ-নাশ।

সর্বশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস।।” ( চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।১১)

“ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।

‘কৃষ্ণপ্রেম’ ‘কৃষ্ণ’ দিতে ধরে মহাশক্তি।।

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীৰ্তন।

নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।।” ( চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৭০-৭১)

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলিলেন,—

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে-কিছু সকল।

হরিনাম-সংকীৰ্তনে মিলিষে সকল।। ( চৈঃ ভাঃ ১।১৪।১৪৩ )

অতএব, কৃষ্ণদাস হইতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল। চিত্ত নিৰ্মল হওয়ার একমাত্র পথ নিরন্তর কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্তন। কৃষ্ণ সর্বাকর্ষক হইলেও নিৰ্মল চিত্তবৃত্ত ভক্তের প্রতি সুলভেই আকৃষ্ট হন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকারীর প্রতি শ্রীভাগবানের ইহাই অহৈতুকী কৰুণা।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি,—

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-

বিরমিতনিজধর্ম্মাধ্যানপূজাদিযত্নম্।

কথমপি সকৃদাস্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ

পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে।। (বৃঃ ভাঃ ১।১।৯)

“নাম-সঙ্কীৰ্তন কলৌ পরম উপায়”—এই নাম কীর্তনের মধ্যেই বৈষ্ণবতা অনুসূত আছে।”

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

## বিজ্ঞপ্তি

বিশেষ অসুবিধার কারণে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৯ম সংখ্যা পত্রিকার মধ্যে ৭ম ও ৮ম সংখ্যা এবং ১০ম সংখ্যা পত্রিকার মধ্যে ৯ম ও ১০ম সংখ্যা পত্রিকা পাঠানো হইতেছে। গ্রাহকগণকে তাহা দেখিয়া গৃহীতার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

—কার্য্যাব্যাহার

## জীবের কৃত্য

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪৪ পৃষ্ঠার পর ]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার “চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ”—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয় লিখেছেন,—“চত্বারো বর্ণা এব চাতুর্বর্ণ্যং—স্বার্থে স্যৎ। অত্র সত্ত্বপ্রধানাঃ ব্রাহ্মণাস্তেষাং শমদমাদীনি কর্ম্মণি; রজঃ সত্ত্বপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি কর্ম্মণি, তমঃ রজঃ-প্রধানা বৈশ্যাস্তেষাং কৃষি-গোরক্ষাদীনি কর্ম্মণি; তমঃ প্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাং পরিচর্য্যাশ্রকং কর্ম্ম ইত্যেবং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ বিভাগৈশ্চত্বারো বর্ণাঃ ময়া কর্ম্মমার্গাশ্রিতহেন সৃষ্টাঃ।” অর্থাৎ চারিটা বর্ণই চাতুর্বর্ণ্য, এখানে স্যৎ প্রত্যয় স্বার্থে, ভাবার্থে নহে। ইহাতে সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণগণের শম-দমাদি কর্ম্ম, রজঃসত্ত্বপ্রধান ক্ষত্রিয়গণের শৌর্য্য-যুদ্ধাদি কর্ম্ম, তমঃ রজঃপ্রধান বৈশ্যগণের কৃষি-গো-রক্ষাদি কর্ম্ম, তমঃপ্রধান শূদ্রগণের পরিচর্য্যাশ্রক কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। এই প্রকার গুণকর্ম্মবিভাগশঃ—গুণ ও কর্ম্মসমূহের বিভাগের দ্বারা চারিটা বর্ণ কর্ম্মমার্গাশ্রিত বলে আমা-কর্তৃক সৃষ্ট।

কোন বর্ণের কোন কোন স্বাভাবিক কর্ম্মে অধিকার তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন,—

“শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরাৰ্জ্জবমেব চ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্।।

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দান্দ্র্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্।।

কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজম্।

পরিচর্য্যাশ্রকং কর্ম্ম শূদ্রস্যপি স্বভাবজম্।।” (গীতা ১৮।৪২-৪৪)

অর্থাৎ—“শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, আৰ্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—এই সকল ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম। শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, কার্য্যকুশলতা, ও যুদ্ধে অপলায়ন, দান এবং লোকনিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম্ম। কৃষি, গো-রক্ষা ও বাণিজ্য প্রভৃতি বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম। আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যাশ্রক কর্ম্মই শূদ্রগণের স্বভাবজ।”

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত ভগবদ্বাক্যে জানা যায় যে, কেবল শৌক্রেজন্মদ্বারা বর্ণ নিরূপণ না করে উক্ত চারি প্রকার স্বভাব অনুসারে মনুষ্যগণের বর্ণ-বিভাগ করাই শাস্ত্র-সম্মত পন্থা। যদি জন্মানুসারে বর্ণ নিরূপণ করা ভগবদভিপ্রায় হত, তাহলে ভগবান্ প্রতি বর্ণের জন্য পৃথক পৃথক কর্ম্ম নির্দিষ্ট করে দিতেন না। জন্মানুসারে ব্রাহ্মণ নির্ণয় করতে গেলে দেহকে ব্রাহ্মণ বলতে হয়। সর্পের যেমন বিভিন্ন বর্ণ দেখে কোন্টা ‘গোখরা’, কোন্টা ‘কেউটে’ প্রভৃতি নানারকম সর্পকে চিহ্নিত করা হয় বা চেনা যায়; তদ্রূপ কিন্তু মানুষের চারি বর্ণের ক্ষেত্রে এবং অস্ত্যজগণের ক্ষেত্রেও দৈহিক গঠন, দেহের

বর্ণ বা রঙ প্রভৃতি দেখে সর্পের চিহ্নিত-করণের ন্যায় কোনও ভাবে কে কোন বর্ণের মানুষ বা কে অন্ত্যজ মানুষ তাহা চেনবার উপায় নেই। ব্রাহ্মণ—শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়—রক্তবর্ণ, বৈশ্য—পীতবর্ণ, শূদ্র—কৃষ্ণবর্ণ,—এইরূপ নিয়ম বা ব্যবস্থামত দৈহিক গঠন না হওয়ায় ব্রাহ্মণের ঔরসজাত পুত্রকে জন্মের পরই ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায় না। মানুষের দেহটাই যদি ব্রাহ্মণ হয়, তাহলে মৃত্যুর পর দেহটাকে দাহ করলে ব্রহ্ম-হত্যার পাপ হয়ে যায়। কিন্তু দেহটা ব্রাহ্মণ নয় বলেই দেহটাকে মৃত্যুর পর দাহ করলে সেরূপ পাপ হয় না। তাই ব্রাহ্মণের শব-দেহও দাহ করা হয়ে থাকে। সুতরাং দেহকে ব্রাহ্মণ বলা যুক্তিযুক্ত হয় না ও হতে পারে না।

বর্ণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্বোচ্চ বর্ণ এবং শূদ্র সর্বনিম্ন বর্ণ। কোনও ব্রাহ্মণ কুলোদ্ধৃত ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্ম না করে ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম করে, তাহলে সেই ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ধৃত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলা কি শাস্ত্রসম্মত হবে? যে ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রাহ্মণের গুণ ও আচার পরিদৃষ্ট হয় না, তাকে ব্রাহ্মণ বলে সম্মান দিলে শ্রীমদ্ভগবদগীতার বাণী ও সর্বশাস্ত্রনির্দেশই উল্লঙ্ঘন করা হবে।

দৈবাধীনে মানুষের বিভিন্ন যোনিতে জন্ম হয়ে থাকে। অনেকে ভাবতে পারেন—ব্রাহ্মণ-কুলে যার জন্ম হয়েছে, তাকে ভগবান্ বিচার করেই ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম দিয়েছেন, সুতরাং সেই ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ধৃত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করাই সঙ্গত; আর যদি কাকে ব্রাহ্মণ না বলে তার লক্ষণদৃষ্টে তাকে অন্য বর্ণে নিরূপণ করা হয়, তাহলে ত' ভগবানের বিচারের প্রতি অবমাননা করা হয়। এইরূপ চিন্তারত ব্যক্তিগণের জন্য আবশ্যক যে, পুণ্য ও পাপের তারতম্য-অনুসারে মানুষের বিভিন্ন উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্ম হয়ে থাকে। পুণ্যফলে ব্রাহ্মণ-বংশেও জন্ম হয়ে থাকে। যেমন গো-সেবা করলে পুণ্য হয়। গো-সেবা করার পুণ্যফলে যে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম হয়ে থাকে, তাহা শ্রীমন্-মহাপ্রভুর বাক্যে জানা যায়। একদা জনৈক সর্বজ্ঞ জ্যোতিষ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্বজন্ম গণনা করতে এসে ধ্যানমগ্ন হয়ে জানলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্বজন্মে সর্বৈশ্বর্যময় পরিপূর্ণ ভগবান্ ছিলেন এবং এ জন্মেও তিনি তাহাই আছেন। এ কথা শুনে শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন,—

“প্রভু হাসি’ কৈলা—তুমি কিছু না জানিলা।

পূর্বে আমি ছিলাম জাতিতে গোয়াল।।

গোপ-গৃহে জন্ম ছিল গাভীর রাখাল।

সেই পুণ্যে হৈলাম আমি ব্রাহ্মণ ছাওয়াল।।’ (চৈঃ চঃ আঃ ১৭।১১০-১১১)

জীব যখন এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহ ধারণ করে, তখন তার পূর্বজন্মের কামনা-বাসনা ও সংস্কারগুলি সূক্ষ্ম দেহকে আশ্রয় করে তার সঙ্গে আসে। গোপ-জন্মে গো-সেবা-করার পুণ্যফলে কাহারও ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম তথা উচ্চ বর্ণ প্রাপ্ত হলেও পূর্বজন্মের দেহ-গেহাদি-চেষ্টায় অসদাচার, অমেধ্যাদি ভোজন প্রভৃতি কুস্বভাবগুলি সে ত্যাগ করতে পারে না। তাই ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম হলেও অনেকে পূর্ব-সংস্কারবশে কুকার্যপারায়ণ হয়ে

থাকে। অবশ্য পিতা-মাতা উভয়েই ব্রহ্মস্বভাব-সম্পন্ন সদাচারী হলে তাঁদের গর্ভধানাদি সংস্কারযুক্ত সন্তান সাধারণতঃ ভগবদিচ্ছায় ব্রহ্ম-স্বভাবযুক্ত ও ব্রাহ্মণের গুণসম্পন্ন হতে পারে। তবে বর্তমানকালে সেরূপ ব্রাহ্মণ বিরল বা নাই বললেও অতুষ্টি হয় না।

আজকাল যে-সকল ব্রাহ্মণ-বংশের সন্তানগণ সদাচারবিহীন, হিংসাপ্রবণ, লোভী, ক্রোধী, কলহপ্রিয়, কামুক, স্বার্থান্ধ, অমেধ্যভোজী, মাদকাসক্ত প্রভৃতি নানাবিধ অসদগুণ-সম্পন্ন ও অসৎপথাবলম্বী হয়ে অমানবিক কার্য্য করে থাকে, তাদেরও কি 'ব্রাহ্মণ'-সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে? কেহ কোনও পুণ্যবলে ব্রাহ্মণবংশে জন্ম লাভ করলেও ব্রাহ্মণের স্বভাবজনিত গুণগুলি তার মধ্যে দৃষ্ট হবেই— এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই।

অধর্ম্ম-আচরণকারী, অমেধ্য-ভোজনকারী, তামসিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিও গো-সেবা করে পুণ্য অর্জন করতে পারে। গো-পালন বা গো-সেবা করলেই যদি অসৎ স্বভাব পরিবর্তিত হয়ে বা অসৎ স্বভাব বিনষ্ট হয়ে শুদ্ধ সংস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হত, তাহলে দেশের গোয়ালী বা গো-পালকগণ সকলেই সংস্বভাব সম্পন্ন হত। পূর্ব্ব জন্মে কেহ যদি সুনীতিপরায়ণ, নিষ্ঠাবান, সদাচারী, বিশুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন হয়ে জীবন যাপন করেন, তাহলে পরবর্ত্তী জন্মে সেই গুণগুলি প্রাচীন সংস্কাররূপে তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

বর্ত্তমানকালে অনেক ব্রাহ্মণ-বংশীয় সন্তানের মধ্যে কেহ ক্ষত্রিয়-স্বভাবযুক্ত, কেহ বৈশ্য-স্বভাবযুক্ত, কেহ শূদ্র-স্বভাবযুক্ত, কেহ বা অস্ত্রাজ-স্বভাবযুক্ত এবং কেহ কেহ অসুর-স্বভাবযুক্ত হয়ে থাকে। পুণ্যফলে অনেকের ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হলেও তাদের ভগবদ্বহিস্মুখতা ও ক্রুরস্বভাব-জনিত ক্রিয়াদ্বারা আসুবভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হতে দেখা যায়। সেই আসুর-স্বভাবসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-বংশীয় সন্তানগণকে শাস্ত্রে ধিক্কার জানানো হয়েছে,—

“ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবিদ্যাং ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞাতম্।

ধিক্কুলং ধিক্ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে।।” (ভাঃ ১০।২৩।৩৯)

“ভগবদ্বহিস্মুখ জনগণের শৌক্ৰ, সাবিত্র্য ও যাজ্ঞিকরূপ ত্রিবিধ জন্মে ধিক্, তাদের বিদ্যা, ব্রত ও বহুজ্ঞাত্য ধিক্, তাদের উচ্চকুল ও ক্রিয়াদক্ষতায় ধিক্, (এই কথা বলে বহিস্মুখ-যজ্ঞে দীক্ষিত মাথুর ব্রাহ্মণগণ আপনাদিককে ধিক্কার করেছিলেন)।”

কলিকালে বর্ণধর্ম্মের অধঃপতন সম্বন্ধে শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে,—

“ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ পাপপরায়ণাঃ।

নিজাচারবিহীনাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।।

বিপ্রা বেদবিহীনাশ্চ প্রতিগ্রহ-পরায়ণাঃ।

অত্যন্ত কামিনঃ ক্রুরা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।।

বেদনিন্দাকরাশ্চৈব দ্যুত চৌর্য্যকরাস্তথা।

বিধবাসঙ্গলুকাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ দ্বিজাঃ।।

বৃন্তার্থং ব্রাহ্মণাঃ কেচিৎ মহাকপট ধর্ম্মিণাঃ।

রক্তাশ্রয়া ভবিষ্যন্তি জটিলঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।

কলৌ যুগে ভবিষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রধর্মিণঃ।।”

(পদ্মপুরাণে ক্রিয়াযোগসারে ১৭শ অধ্যায়)

“কলিযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণই স্ব-স্ব আচারবিহীন পাপপরায়ণ হবে। বিপ্রগণ—বেদবিহীন, যজ্ঞাদি অপর পাঁচটা ব্রাহ্মণোচিত কর্ম পরিত্যাগপূর্বক কেবল প্রতিগ্রহপরায়ণ, অত্যন্ত কামুক ও ক্রুর-প্রকৃতিবিশিষ্ট হবে। কলিকালে দ্বিজগণ বেদনিন্দক, দ্যুতক্ৰীড়াপরায়ণ, চৌর্যবৃত্তিবিশিষ্ট এবং বিধবা-সঙ্গ-লোলুপ হবে। জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন কোন মহাকপটধর্মী ব্রাহ্মণ রক্তবস্ত্র পরিধান এবং জটিল কেশশ্মশ্রু ধারণ করবে। কলিতে ব্রাহ্মণগণ এইরূপ শূদ্রধর্মে অবস্থান করবে।”

কলিকালে শৌক্যবিচারের শুদ্ধতা নাই;—

“অশুদ্ধাঃ শূদ্রকম্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।

তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রোত বর্জনা।।”

(হং ভঃ বিঃ ৫ম বিলাস, ৩ সংখ্যাপ্রদত্ত বিষুণ্যামল-বাক্য)

অর্থাৎ—“কলিতে তথা বিবাদতর্কে শৌক্যব্রাহ্মণগণের শুদ্ধতা নাই, তাঁরা—শূদ্রসদৃশ মাত্র। তাঁদের বৈদিক কর্মানুষ্ঠানমার্গে নির্মলতা নাই। পাঞ্চরাত্রিক বিধানই তাঁদের শুদ্ধি।”

আমরা মানব। মনু + ষ (অনুগতার্থে) ‘মানব’-শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে অর্থাৎ মনুর অনুগত জনকেই মানব বলা হয়েছে। অতএব যারা মনুর অনুগত নয়, তাদের মানব বলা যায় না, পরন্তু তাদের ‘মানব’ না বলে তদ্বিপরীত ‘দানব’ বলা যেতে পারে। মনু বেদপাঠ বর্জনকারী দ্বিজের জীবিতাবস্থাতেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করেছেন। এমন কি তাঁর মতে বেদপাঠহীনের পুত্র-পৌত্রাদির উপনয়ন নিষিদ্ধ। যথা,—

“যোহনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।

স জীবন্তেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সাহস্রঃ।।” (মনু ২।১৬৮)

“যে দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ হবার চেষ্টা না করে অন্য বিষয়ে (লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি ভগবদিতর-বিষয়ে) শ্রম স্বীকার করেন, তিনি তাঁর জীবিতাবস্থাতেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।”

মনু জানিয়েছেন,—ক্রিয়াদ্বারা শূদ্র ও ব্রাহ্মণ হয়ে যায়, আবার ব্রাহ্মণও শূদ্র হয়ে যায় ; যথা— “শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্।।”

মনু আরও বলেছেন,—

“অলিঙ্গী লিঙ্গিবেষণ যো বৃত্তিমুপজীবতি।

স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তির্য্যগ্যোনৌ প্রজায়তে।।” (মনু ৪।২০০)

অর্থাৎ—“চিহ্নধারণের অনুপযোগী হয়ে তত্ত্বচিহ্ন গ্রহণপূর্বক তত্ত্বভূক্তিদ্বারা জীবিকা অর্জন করলে বর্ণাশ্রমের পাপসমূহ তাকে আশ্রয় করে এবং সে তৎপালে তির্য্যগ্যোনি লাভ করে।”



শাস্ত্রে বর্ণবিধান সম্পর্কে মনুর অসংখ্য উপদেশ-নির্দেশ আছে; মনুর অনুগত-জনই তাহা পালন করে থাকেন। শাস্ত্রে অব্রাহ্মণতার কারণ ও দেবল ব্রাহ্মণের নিন্দা করা হয়েছে;—

“অপি চাচারতন্তেষামব্রাহ্মণ্যং প্রতীয়তে।  
বৃত্তিতো দেবতাপূজা-দীক্ষা-নৈবেদ্যভক্ষণম্॥  
গর্ভাধানাদি-দাহান্ত-সংস্কারান্তর-সেবনম্।  
শ্রীতক্রিয়াহনুষ্ঠানং দ্বিজৈঃ সম্বন্ধবর্জনম্॥  
ইত্যাদিভিরনাচারৈরব্রাহ্মণ্যং সুনির্ণয়ম্॥”

(শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত আগমপ্রামাণ্য-ধৃত সাহিত্য শাস্ত্রবাক্য)

অর্থার্থ—“বৃত্তি নিয়ে দেবপূজা, দীক্ষা, নৈবেদ্য ভোজন—এই সকল আচরণ হতেই সেই সকল ব্যক্তির অব্রাহ্মণতা প্রতীয়মান হয়। গর্ভধান হতে দাহ পর্য্যন্ত অন্য সংস্কার-গ্রহণ, শ্রীত ক্রিয়ার অননুষ্ঠান, দ্বিজগণের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ প্রভৃতি আচরণের দ্বারাই সুষ্ঠুরূপে অব্রাহ্মণতা নির্ণীত হয়।”

“দেবকোশোপজীবী যঃ স দেবলক উচ্যতে।  
বৃত্তার্থং পূজয়েদ্দেবং ত্রীণি বর্ষাণি যো দ্বিজঃ।  
স বৈ দেবলকো নাম সর্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ॥”

(শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত আগমপ্রামাণ্য)

অর্থার্থ—“যে ব্যক্তি দেব-সেবায় প্রদত্ত সম্পত্তি দ্বারা নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে ‘দেবল’-নামে কথিত হয়। যে দ্বিজ বৃত্তির নিমিত্ত তিন বৎসর যাবৎ দেব-পূজা করেন, সেই দেবলক সর্বকর্ম্মে অত্যন্ত নিন্দিত।” (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

## অনর্থ

“কৃষ্ণ, কৃষ্ণমায়া, জীব,—এই তিন তত্ত্ব।

মায়ামোহে মায়াবদ্ধ জীবের অনর্থ॥

বিভূচেতন শ্রীভগবানের চেতন সত্ত্বা হইতেই অণুচেতন জীবের প্রকাশ। কিন্তু অণুত্বহেতু জীবের মায়া-বশীভূত হইবার যোগ্যতা বর্ত্তমান। জীব অণুচেতন হওয়ায় মায়ার মোহে মোহিত হইয়া মায়ার বন্ধন স্বীকার করে ও অনর্থের শিকার হইয়া মায়িক জগতে আসিয়া ত্রিতাপ-জ্বালায় জজ্জরিত হইতে থাকে।

যতদিন এই অনর্থ জীবকে না ছাড়ে ততদিন জীবের স্ব-স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। অনর্থগুলি জীবকে স্বরূপের ধর্ম্ম হইতে চ্যুত করিয়া ভোগময় জীবনে পরিভ্রমণ করায়। এবং জীব দ্বিতীয় অভিনিবেশে মত্ত হইয়া ‘আমি’ ও ‘আমার’ চিন্তায় মগ্ন হইয়া থাকে। তাহার চিন্তে জাগে ভয়, শোক, আশা, নৈরাশ্য। অনর্থহেতু সদসৎ বিচার হারাইয়া কাম-ক্লেষের দাস্য স্বীকার করে। মায়াকৃষ্ট জীব আমরা স্বরূপের ধর্ম্মে যদি ফিরিয়া যাইতে চাই তাহা হইলে আমাদের জানা প্রয়োজন অনর্থগুলি কি? শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর “ভজন-রহস্যে” এই অনর্থগুলি জানাইয়াছেন।

আম্নায়-সূত্র ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে দুর্দৈব বা আরোপিত অনর্থ চারিপ্রকার।—

মায়ামুগ্ধ জীবের অনর্থ চতুষ্টয়।

অসতৃষ্ণা, হৃদয়-দৌর্বল্য বিষময়।

অপরাধ, স্বরূপবিভ্রম এই-চারি।

যাহাতে সংসার বন্ধ বিপত্তি বিস্তারি।।

তত্ত্ববিভ্রম, অসতৃষ্ণা, অপরাধ, হৃদয়দৌর্বল্য—এই চারিপ্রকার অনর্থ আবার বিস্তার লাভ করিয়াছে প্রতিটি চারিপ্রকারে। অতএব মোট যোলটি অনর্থ জীবের স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এই যোলটি অনর্থ সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইলে আমরা স্বরূপে প্রকাশিত হইতে পারিব এবং আমি' প্রকৃত কে তাহা জানিতে পারিব।

প্রথমতঃ অজ্ঞানতা হইতে 'তত্ত্ববিভ্রম' হয়। ইহা জীবের ভগ্যাকাশে কুজ্জটিকার ন্যায় আসিয়া, 'কৃষ্ণ'সূর্য্যকে আবৃত করিয়া রাখে।

তত্ত্ববিভ্রমের প্রথম ভ্রম 'স্ব-তত্ত্বে ভ্রম'। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে জীবের স্বরূপ জানাইয়া বলিয়াছেন,—

“জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।

কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'।।

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদিবহিস্মুখ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।।”

মায়িক জগতে প্রবেশের পূর্বে তটভূমি হইতে তটস্থ জীবের স্ব-তত্ত্বে—তাহার স্বরূপ যে 'কৃষ্ণের নিত্যদাস' তাহাতে ভ্রম উপস্থিত হইল। এই ভ্রমের ফলে তাহার স্বরূপের ধর্ম 'কৃষ্ণের নিত্যসেবা'—তাহা ভুলিয়া গেল। তত্ত্বভ্রমের এই প্রথম ভ্রম স্বতত্ত্বে ভ্রম হওয়ায়, দ্বিতীয় তত্ত্বভ্রম 'পরতত্ত্বে' ভ্রম আসিয়া উপস্থিত হইল অর্থাৎ কৃষ্ণকে ভুলিয়া গেল। ফলে তাহার ভোগাকাঙ্ক্ষা জাগিল এবং মায়া বশীভূত হইয়া পড়িল। তত্ত্বভ্রম শুরু হইয়াছে মায়িক জগতে প্রবেশের পূর্বেই। প্রথমেই আমরা ভুলিয়াছি আমরা 'কৃষ্ণের নিত্যদাস' তাহা। ইহাই আমাদের স্ব-তত্ত্বে ভ্রমের অনর্থ। স্ব-তত্ত্বে ভ্রম হওয়ার ফলে পরতত্ত্বে ভ্রম জন্মিল। পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিলাম। স্বতত্ত্বে ভ্রমের কুজ্জটিকা কৃষ্ণ সূর্য্যকে আবৃত করিয়া পরতত্ত্বে ভ্রম আনিয়া দিল। ইহার ফলে অনুচিৎ জীব আমাদের চিৎশক্তি হ্রাস হইয়া মায়াবশীভূত হইবার যোগ্যতা আসিল। এই অজ্ঞানতার ফলে দ্বিতীয় অভিনিবেশ, 'আমি' ও 'আমার' ভোগাকাঙ্ক্ষা আসিয়া হাজির হইল। এইবার দ্বিতীয় অভিনিবেশে জন্মাইল দেহাত্মবুদ্ধি।

কোন কারণে ব্রেনের অস্বাভাবিকতার ফলে পাগল বলিয়া পরিগণিত হয়। পাগলের স্বাভাবিক জ্ঞান থাকে না। নিজের ও জগদ্বিষয়ে সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। পাগল 'নিজে' কে তাহা ভুলিয়া নিজকে অন্য ভূমিকায় চিন্তা করিয়া থাকে। ফলে তাহার হাবভাব কথাবার্তায় সব কিছুতে অস্বাভাবিকতা পরিদৃষ্ট হয়। স্ব-তত্ত্বে ভ্রম হওয়ায় জীবের স্বাভাবিক ধর্ম হইতে বিচ্যুতি ঘটে। ফলে কৃষ্ণের দাসত্ব ভুলিয়া যায়। জলের ধর্ম 'তরলতা'। জীবের ধর্ম 'কৃষ্ণসেবা'। কিন্তু স্ব-তত্ত্বে, পরতত্ত্বে ভ্রম হওয়ায়—মায়ার

সংস্পর্শে আসিয়া হাজির হওয়ায়—জল যেমন শীতলতার সংস্পর্শে আসিয়া তখন স্বরূপের ধর্ম তরলতা ছাড়িয়া কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ জীব স্বরূপের ধর্ম সেবা ছাড়িয়া মায়ায় সংস্পর্শে ভোগে মত্ত হয়। স্বরূপের ধর্ম হারাইবার ফলে তাহার কর্তব্যাকর্মে ভুল হয়। মায়ামোহে দেহাত্মবুদ্ধিকে সুদূর করিবার অভিলাষে তৃতীয়-ভ্রম—সাধ্য-সাধন-তত্ত্বে ভ্রম জন্মে। একমাত্র সাধ্যবস্তু কৃষ্ণচন্দ্রের সাধন ছাড়িয়া ভোগবাঞ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য বহু সাধ্যবস্তু—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, যোগ, বিভূতি, বহু দেবদেবীর আরাধনা—ঐহিক ও পারত্রিক সুখলালসায় এই সকল বহু প্রকার সাধ্য-সাধন-তত্ত্বে ভ্রম জীবের ভাগ্যে ঘটিতে লাগিল।

চতুর্থ ভ্রম ভজনের বিরোধি-বিষয়ে ভ্রম। একমাত্র ভজন কৃষ্ণসেবা লাভের আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া, ঐহিক-পারত্রিক সুখ কামনায় বহু সাধ্যবস্তুর ভজন-বিরোধী সাধনা আমাদের কর্মচক্রে জন্মজন্মান্তরে পরিভ্রমণ করাইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ অসতৃষ্ণ। অসতৃষ্ণ হইল দ্বিতীয় অনর্থ। মূল তৃষ্ণা কৃষ্ণসেবা ছাড়িয়া অসদ্বিষয়ে ধাবিত হইলে অনর্থের ডালপালা ত' বাড়িয়াই চলিবে। ফলে অসতৃষ্ণা অনর্থের প্রথম শাখাপ্রশাখা ভোগাকাঙ্ক্ষার সহিত ঐহিক বিষয়-পিপাসা এবং তাহার অশেষণে আমরা অন্ধ জীব ছুটিয়া চলিলাম—কামিনী, কাঞ্চন, বিষয়-সম্পত্তি, যশ, মান, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে। দ্বিতীয় অসতৃষ্ণা জন্মিল 'পারত্রিক বিষয়ে অশুভ এষণা' বা নানা দেবদেবীর উপাসনার দ্বারা এই সকল ঐহিক এষণা লাভ করিবার জন্য। এই সকল ভোগের ফল স্বর্গে ও মর্ত্যে সুখভোগ লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার প্রচেষ্টা। অসতৃষ্ণার তৃতীয় শাখা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় যোগ-বিভূতি বাঞ্ছা। যোগ-বিভূতির দ্বারা নিজকে জগতের লোকের চক্ষে বড় বলিয়া প্রমাণ করা। অসতৃষ্ণার চতুর্থ শাখা সর্বশেষে ভোগে বিরক্ত হইয়া ত্যাগের ছলনায় মোক্ষবাঞ্ছা।

এই চারিপ্রকার অসতৃষ্ণার অনর্থ আমাদের ন্যায় কৃষ্ণবিমুখ জীবকে ভোগের ও ত্যাগের ছলনায় নাচাইতে লাগিল। “কখনও ভোগের, কখনও ত্যাগের, ছলনায় মন নাচে।”

তৃতীয়তঃ অপরাধ। অসৎপথে অসৎসঙ্গে চলিলে অপরাধ ত' জন্মিবেই। এই অপরাধও আবার চারিপ্রকার।

প্রথম অপরাধ হইল নামাপরাধ। “এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব, না পায় দুঃখের শেষ। সাধুসঙ্গ করি, হরি ভজে যদি, তবে অন্ত হয় ক্লেশ।।” ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ-প্রভাবে যদি সদগুরু চরণশ্রয় ঘটিয়া থাকে এবং শ্রীগুরুদেব যদি শ্রীনামভজনের অধিকারও দিয়া থাকেন, তথাপি নামাপরাধ-রূপ অনর্থ হেতু নাম শুদ্ধ না হওয়ায় হরিভজনে ফল হয় না। শ্রীনাম-নামী অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের শ্রীনামগ্রহণে মঙ্গল হয় না, দশবিধ নামাপরাধ হেতু। সে-कारणे শ্রীনামপ্রভুর কৃপালাভ আমাদের ভাগ্যে ঘটে না।

দ্বিতীয় অপরাধ কৃষ্ণস্বরূপে অপরাধ বা সেবাপরাধ। শাস্ত্রে ৬৪ প্রকারের সেবাপরাধের উল্লেখ করিয়াছেন।

তৃতীয় অপরাধ ভক্তের চরণে অপরাধ। সর্বাপেক্ষা বড় ও কঠিন অপরাধ ইহাই।

চতুর্থতঃ ভক্তব্যতীত চিৎকণ জীবে অপরাধ। এবম্প্রকার অপরাধ আমরা সর্বক্ষণ করিয়া চলিয়াছি।

চতুর্থ অনর্থ হইল হৃদয়দৌর্বল্য। হৃদয়দৌর্বল্যও চারি প্রকার। কৃষ্ণ ছাডিয়া অন্যান্য ইতর বিষয়ে চিত্ত ধাবিত হইলে, প্রথম হৃদয়দৌর্বল্য জন্মিল। দ্বিতীয়তঃ ইহা হইতে আসিল কুটীনাটী, কপটতা। তৃতীয় হৃদয়দৌর্বল্য জন্মিল পরশ্রীকাতরতায়। অপরের ভাল দেখিলে দুঃখ বা ঈর্ষায় সুখ বিনষ্ট হয়। অপরের দুঃখ দেখিলে হৃদয়ে সুখ বা আনন্দ জন্মায়। চতুর্থ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। এই প্রতিষ্ঠাকে শূকরী-বিষ্ঠার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সর্বত্যাগ করিলেও এই প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা বড়ই কঠিন। ইহা হৃদয়কে দরুণভাবে দর্বল করিয়া ফেলে।

এই ষোলটি অনর্থ জীবকে স্বরূপের ধর্ম্য ভুলাইয়া মায়িক জগতে পরিভ্রমণ করাইয়া থাকে। আত্মকল্যাণপিপাসু জীব যদি অনর্থের স্বরূপ জানিয়া এগুলিকে তাগের যত্নে সচেতন হয় তাহা হইলে পুনরায় সে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণের সেবার রাজত্বে প্রবেশ করিতে পারিবে। কি-প্রকারে অনর্থ বিনষ্ট হইবে?

“চিৎকণ জীবের কৃষ্ণ-ভক্তযোগ বলে।

অনর্থ বিনষ্ট হয় কৃষ্ণ-প্রেম-ফলে।।

এই তত্ত্ব নাম-সমাধিতে পাইল ব্যাস।

ভাগবতে ভক্তযোগ করিল প্রকাশ।।”

—শ্রীমতী মায়া সরকার

## শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৬০ পৃষ্ঠার পর ]

“(যদি বল), ভগবান্ তাঁর করুণাশক্তিদ্বারা কখনও কখনও জীবের বাহ্য চক্ষুর গোচরীভূত হয়ে থাকেন; কারণ তাঁর এই প্রকার দর্শনে যে আনন্দ, তা হৃদয়েই প্রকাশিত হয়। যেহেতু হৃদয় বা মনই আনন্দের উৎপত্তি স্থান।” হৃদয় যদি না সেটা গ্রহণ করে, তাহলে আনন্দের কোন সম্ভাবনা নেই। দর্শন করলে একটা আনন্দ হবে, যদি সে আনন্দ না হয় তাহলে বুঝতে হবে আমার হৃদয় তৈরী হয়নি। বৈষ্ণব দেখিয়া পড়িব চরণে হৃদয়ের বন্ধু জানি।—কথাটা আছে। কেন বৈষ্ণবচরণে পড়ব?—হৃদয়ের বন্ধু জানিয়া। তিনি ত’ আমার সব। তাঁকে ছাড়া আমার এক পা চলবার উপায় নেই—এটা জেনেছি বুঝেছি বলেই তাঁর দর্শনে আনন্দ হচ্ছে। যিনি বা যাঁরা আমার কাছে Unwanted—অবাঞ্ছিত তাদের দর্শনের জন্য ত’ আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে না, কিন্তু এমন ক্ষেত্র আছে যেখানে প্রিয়জনকে দর্শন করবার জন্য ছুটফুট করে চিত্ত। কাতর হয়ে পড়ি আমি। সে অবস্থাটা থাকা চাই। ইষ্টবস্তুর প্রতি নিষ্ঠা এবং তাঁর প্রতি স্নেহ-মমতা যত প্রগাঢ়

হবে ততই তাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়, এই কথা বুঝানো আছে। তার জন্য টান থাকা চাই, সেটা স্বাভাবিকভাবে আসে না, অনেক কিছু করলে পরে ঐ ভাবটা আসে। যতদিন পর্যন্ত আমার হৃদয়ে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা আছে; দম্ভ, দর্প, অভিমান প্রবল আছে চিন্তে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার ঐ অবস্থা আসবে না। এগুলোকে যখন ছেড়ে দিতে পারব, সরল হৃদয় নিয়ে যখন আমি অগ্রসর হতে পারব, তখন আমার পক্ষে ওটা সম্ভব। তার আগে প্রার্থনাই আসবে না, দিল্ খোলসা করে আমি বলতে পারব না। কৃপা করুন—মুখে বলা হবে কিন্তু ভিতরে হবে না।

“অন্তর-বাহিরে সমব্যবহার নির্দোষ আনন্দময়।”

যদি এই সদৃশের কথা লেখা আছে তাহলে অন্তর বাহির ত’ সমান করতে হবে। আমার ভিতরে একরকম আর বাহিরে আর একরকম, তাহলে ত’ সমদর্শী আমি বলে প্রমাণিত হবে না। আর সমদর্শন না হলে ভগবান্ তাঁকে দর্শন দেবেন না।

সমদর্শী সাধুর ব্যাখ্যা রয়েছে। সমদর্শনের অর্থ বলছেন—জীবাত্মা, পরমাত্মা দর্শন। শুধু জীবাত্মার দর্শনের কথা বলা হয়নি সমদর্শনে। তিনি একাধারে জীবাত্মা পরমাত্মাকে দর্শন করছেন। তিনি ভালটাকে খারাপ দেখছেন না, আবার খারাপটাকে ভাল দেখছেন না। ভালটাকে তিনি ভাল বলছেন, খারাপটাকে তিনি খারাপ বলছেন—এর নামই সমদর্শন, এর নাম হল নিরপেক্ষ দর্শন। শাস্ত্র এটাই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সমদর্শন, বলতে ভালটা খারাপ হয়ে যাবে, আর খারাপটা ভাল হয়ে যাবে, তা নয়। ভালকেই যিনি ভাল বলবেন, সৎকে যিনি সৎ বলবেন, অন্যায়কে যিনি অন্যায় বলবেন, সেটাই হল সমদর্শন এবং একেই বলে নিরপেক্ষ দর্শন।

“ভগবানের দর্শন লাভ করার পর যখন তিনি অন্তর্হিত হন, তখন তাঁর দর্শন-জনিত আনন্দ হৃদয়েই বিলসিত হয়ে বহু প্রকারে উত্তরোত্তর স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়।” ভগবানকে দর্শন পেলে ভক্ত শান্তি স্বস্তি লাভ করলেন, কিন্তু দর্শনের পর যখন তিনি অন্তর্হিত হচ্ছেন ভক্তের সামনে, তখন কি অবস্থা হয়? তাকে কি বলব?—সেই অবস্থাকে ‘বিরহ’ বলব। যখন দর্শন দিয়েছেন তখন তাকে ‘মিলন’ এবং যখন অন্তর্হিত হয়েছেন তখন তাকে ‘বিরহ’ বলব। সেই বিরহের মধ্যেও আনন্দ আছে কি না? জড়জগতে আনন্দ নেই, কেবল দুঃখ, কিন্তু অপ্রাকৃত জগতে ওর মধ্যেও আনন্দ—এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন শাস্ত্রে। জড়ীয় যে অভাববোধ সেখানে দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা, কিন্তু ভগবানের দর্শন, ভগবদ্ভক্তের দর্শন, গুরু-বৈষ্ণবের দর্শন সেখানে যে অভাববোধ তার ভিতরে একটা আনন্দ আছে। চিন্তা করলেও আনন্দ। যাঁরা ধামে আসতে পারছেন না, যাঁরা সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীমুখ থেকে সাক্ষাদ্ভাবে হরিকথা শ্রবণ করতে পারছেন না, তাঁরা যদি গৃহে বসে এই চিন্তাভাবনা করেন যে কখনও ত’ আমি গিয়েছিলাম, দর্শন করেছিলাম, এইরকম এইরকম দর্শন করেছিলাম, এইরকম আলোচনা সব শ্রবণ করেছিলাম, তাহলেও আনন্দ। তাহলে গৃহে বসেও ওই জিনিসটা চিন্তা করলে তাঁর অনুশীলন হবে—সেকথা বলা হয়েছে।

“অতএব ভগবদদর্শন মনেই পর্যাবসিত হয়।” মন যদি না নেয় তাহলে দর্শন

কে করবে? রাস্তার ধারে বসে আছি আমি, আমার সঙ্গে আরও দু'চার জন বন্ধু বসে আছেন, আমাদের সামনে দিয়ে পাঁচটা হাতী চলে গেল, আমরা গল্প করছি। এক বন্ধু বললেন, কিরে আমাদের সামনে দিয়ে পাঁচটা হাতী চলে গেল দেখলি? কই না ত'! সেকি! পাঁচপাঁচটা হাতী গেল দেখলি না!—না, কি করে দেখব, আমরা ত' গল্প করছিলাম। মনটা ছিল গল্লেতে। চোখ তাকিয়ে রয়েছে হয়ত'। কিন্তু হাতী দেখতে পেল না কেউ। তাহলে মন বস্তু গ্রহণ করবে তবে না আনন্দ উপলব্ধি। মন যদি সেখানে দূরে সরে থাকে তাহলে উপলব্ধির কোন ক্ষেত্র নেই। আমার সামনে দিয়ে অনেক কিছু ঘটে গেলেও আমি দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি না। “এবং মনই দর্শন-সুখ-গ্রহণের একমাত্র যোগ্যতম পাত্র বা অধিকারী। অতএব চক্ষুদ্বারা দর্শনের চেষ্টা নিষ্পয়োজন। এইখানে খণ্ডন করছেন সাক্ষাৎ দর্শনের অপকারিতা। সাক্ষাৎ দর্শন করতে গেলে ত' আমরা ভুল দেখে ফেলি, ভুল বুঝে ফেলি। আমি যদি নিজচেষ্টিয় চক্ষু দিয়ে দর্শন করতে যাই, শুধু চোখ দিয়ে কেন, কান দিয়েও যদি চেষ্টা করি তথাপি প্রাকৃত জড় অবস্থা থাকলে সবটা খারাপ হয়ে যাবে, ভাল কিছু হবে না। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের মুখ থেকে যদি শক্তিশালী অপ্রাকৃত তত্ত্বসিদ্ধান্ত-পূর্ণ বাক্যসকল শ্রবণ করি তাতে লাভ বেশী। অতএব চক্ষুদ্বারা দর্শনের চেষ্টা নিষ্পয়োজন।

“যদি বল—চক্ষু প্রভৃতি বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহের ন্যায় মনও পরিচ্ছিন্ন; সুতরাং তার পক্ষেও পরম অপরিচ্ছিন্ন ভগবন্মূর্তি দর্শন অসম্ভব।” ঠিক কথা, মনটা যদি আমার Control না হয়, মনটা যদি আমার আত্মার বশীভূত না হয়, অবশীভূত মন হয় তাহলে ‘সে মন জানে রে’ সে ত' উন্টোপাণ্টা করবে। কিরকম?—সে মন যা নিচ্ছে সব ভুল নিচ্ছে, উন্টোপাণ্টা নিচ্ছে। সকালের মনটা দুপুরের মন নয়, দুপুরের মনটা বিকালের মন নয়, মন সদাসর্বদা পরিবর্তনশীল। মন সবসময় তার নিজের অবস্থা থেকে সরে সরে যাচ্ছে। “দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান,—সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ,—এই সব ভ্রম।। “এই ত' জড় মনের সংজ্ঞা দিয়েছে।” সে সবসময় তার অবস্থা পরিবর্তন করছে, কখনও এক অবস্থা নেই। অবশীভূত মনের যদি এইরকম অবস্থা হয় তাহলে কি করব? তখন কি করা হবে? আবার ঠিক একই ধরণের কথা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বললেন,—

অন্যের হৃদয়—মন,

মোর মন—বৃন্দাবন,

‘মনে’ ‘বনে’ এক করি’ জানি।

তাহাঁ তোমার পদদ্বয়,

করাহ যদি উদয়,

তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।।

কি ব্যাপার! এখানে কি চৈতন্যমহাপ্রভু অখিললোক শিক্ষক হয়ে জগদগুরু রূপে তিনি আমাদের সব তত্ত্বদর্শন শিখাতে এলেন, সাধন-ভজন শিখাতে এলেন, তিনি কি কিছু অহঙ্কার প্রকাশ করলেন এই বাক্যের দ্বারা?—না, মোটেই না, তিনি তাঁর তত্ত্বসিদ্ধান্ত ঠিকই রেখেছেন, তাঁর যে মনের অবস্থা সেটা তিনি ব্যক্ত করেছেন।

কিভাবে?—সাধারণ লোকের যে মন, অবশীভূত যে মন, সেই মন একটা পৃথক জিনিস। ‘আনের হৃদয় মন’—অন্য লোকের মন যেটা সেটা অবশীভূত মন, ‘মোর মন বৃন্দাবন’—আমার যে মন, আমি যে মন নিয়ে চলছি সেটাকে আমি বৃন্দাবন বলে জানছি, বুঝছি। সেই মন (বশীভূত মন) আর বৃন্দাবন দুটো এক। ‘মনে বনে এক করি জানি। তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।।’ সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে যদি তোমার পাদপদ্ম দর্শন করাও তাহলে জানব আমার প্রতি তোমার পূর্ণ কৃপা আছে। কথাটা এই রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাহলে সকলের সবটা এক হচ্ছে না।

“স্বাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি।

সর্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্মৃতি।।

বন দেখি’ ভ্রম হয়—এই ‘বৃন্দাবন’।

শৈল দেখি’ মনে হয়—এই ‘গোবর্দ্ধন’।

যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে—‘কালিন্দী’।

মহাপ্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি’।।”

তিনি কি জড়কে চেতন দেখছেন, না চেতনকে জড় দেখছেন? তাঁর দর্শনটাই চেতন দর্শন। দর্শনে কোন গুণগোল নেই। জড়দর্শনে সবটাই গুণগোল। তাঁর দর্শন ঠিক আছে, সুতরাং সব ব্যাপারেই একই হবে। জড়দর্শন তাঁর নাই। এই যে অধিকার এ অধিকার ত’ সকলের হচ্ছে না। মহাপ্রভু নিজস্ব কথা নিজের কাছে থেকে যাচ্ছে। শিক্ষার জগতে কিছু শিক্ষা আমাদের জন্য দিচ্ছেন। সকলের জন্য সবটা নয়। এ নিয়ে শাস্ত্রে আলোচনা রয়েছে। চেতন্যমহাপ্রভুর উক্তির মধ্যে আছে, তিনি জীবশিক্ষার জন্য কতকগুলি তত্ত্বসিদ্ধান্ত জানিয়েছেন, আবার নিজস্ব আচরণও আছে। ভগবানের নিজস্ব আচরণটা যদি আমরা আচরণযোগ্য মনে করি, তাহলে ভুল হয়ে যাবে, অপরাধ হয়ে যাবে। চলবে না ওটা।

প্রভু কহে,—‘আমা’ পূজ, আমি দিব বর।

গঙ্গা-দুর্গা—দাসী মোর, মহেশ—কিঙ্কর।।”

এ কথা যদি আমরা বলতে যাই তাহলে সব শেষ। সব সোহহংবাদী হয়ে পড়ব। সব ভগবানের দল, ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ব দলে পড়ে যাব আমরা। তা না, ওটা তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। আবার যখন শিক্ষা দিচ্ছেন তখন বলছেন,—ছি! ছি! জীবকে কখনও ভগবান বলে, জীবকে কখনও বিষ্ণু বলে। এটা বলা অপরাধ, কখনও বলবে না। খুব গালাগালি দিয়ে দিলেন।

কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।

সেই বেটা করে মোর ওপ খণ্ড খণ্ড।।

বাখানয় বেদ, মোর বিগ্রহ না মানো।

সর্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ, তবু নাই জানে।।

শিক্ষা এসব। বিগ্রহ জড় নহে, বিগ্রহ চেতন, শ্রীমূর্তি চেতন, কথা বলেন।

সাক্ষাৎ ভাবে ভক্তের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করেন। সেই প্রেমময় ভগবান্ ভক্তের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য হাজার হাজার মাইল হেঁটে গিয়ে সাক্ষী দেন। ভক্তের উপাসিত ভক্তিমাখা দ্রব্য তিনি অতি আদর যত্নে গ্রহণ করেন। ভক্তের সব কথা শোনেন, ভক্তের জন্য অনেক পরিশ্রম স্বীকার করেন। ভক্তের কিছু নেই, তিনি তাকে অনেক কিছু দেন। সেটা রক্ষা করার ক্ষমতা নেই, ভগবান্ আবার নিজে গিয়ে রক্ষা করেন। এসব কথাগুলো ত' বলা আছে। সবটা সকলের জন্য নয়।

বহু লীলাকথা শ্রবণ করেছেন পরীক্ষিৎ মহারাজ। যখন কিছু প্রসঙ্গ এসেছে একটু উন্টোপাণ্টা লাগছে তাঁর কাছে, তখন শুকদেব গোস্বামী বলেই ফেললেন— “তেজীয়াসং ন দোষায় বহু সর্বভুজো যথা।” এই তেজীয়ান্ লোকটা কে? মুন্সিল্ ত' ওইখানে হয়ে গেছে। আমি যদি ভাবি আমি তেজীয়ান্ ব্যক্তি, আমি অধিকারী ব্যক্তি, তাহলে আমার অধিকার চলে গেল। আমি অধিকারী নই—যদি এটা ভাবতে শিখি, তাহলে আমার কোনদিন অধিকার লাভের সম্ভাবনা আছে।

আপনাকে বড় বলে, বড় সেই নয়।

লোকে যারে বড় বলে, বড় সেই হয়।।

বড় যদি হতে চাও, ছোট হও তবে।

তাহলে সেখানে হৃদয়ের স্বাভাবিক দৈন্যভাব এসে যাচ্ছে। অমানী মানদ-ধর্মে দীক্ষিত হওয়া চাই, তা না হলে কিছু হতে পারে না। মহাপ্রভুর কথায় ইহাই আসছে।

আগি কীর্তন করব, আমি হরিকথা বলব, আমি একটু শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করব, তার গোড়া হচ্ছে—“আমানী মানদ হৈলে কীর্তনে অধিকার দিবে তুমি।” আমি যদি অমানী মানদ হতে না পারি তাহলে আমার শ্রবণ-কীর্তনের কোনটারই অধিকার নেই। এবং সেই কথাই ব্যাখ্যা করেছেন ‘শ্রদ্ধাস্থিতোহনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্য’। ভাগবতের দশম স্কন্ধের শ্লোকে ঐ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদধঃ বিষ্ণেঃ

শ্রদ্ধাস্থিতোহনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং

হৃদরোগমাশ্বপহিনোতাচিরেণ ধীরঃ।।

‘অনুশ্রবণ’ মানে কি?—গুরুমুখে শ্রবণ। যেখানে সেখানে নয়। অধিকারী গুরু-বৈষ্ণবের মুখে শ্রবণ। ‘শ্রদ্ধাস্থিত’-শব্দ এসেছে। শ্রদ্ধাস্থিত-শব্দে সব শেষ। আমার আর কোন অধিকার থাকল না শ্রদ্ধাস্থিত-শব্দে। আমার সব অধিকার কেড়ে নিয়েছে শ্রদ্ধাস্থিত-শব্দ বলে। কেন?—

‘শ্রদ্ধা’-শব্দে—বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।

কৃষ্ণের ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়।।

তাহলে কি করে করব? আমার ত' সে শ্রদ্ধা-ভক্তি নেই। ভগবানে ভক্তি করলে সব হয়ে যাবে—যদি এই দৃঢ়বিশ্বাস থাকে তাহলে আবার এদিক ওদিক ছুটাছুটি করি কেন? যদি কৃষ্ণের উপাসনা করলে, কৃষ্ণের সাধন-ভজন করলে আমার সব



মিটে যায়, তাহলে আমি আবার এদিক ওদিক করে বেড়াচ্ছি কেন? গাছের গোড়ায় জল দিলে যদি গাছটাকে বাঁচানো যায়, তাহলে আবার আমি গাছের পাতায় পাতায় জল দিয়ে সময় নষ্ট করছি কেন? এ ত' যুক্তির কথা। আমার ত' সময় নেই। কারোর সময় নেই এ সংসারে। সকলের সময় খুব সংক্ষেপ। সময় যখন সংক্ষেপ তখন সংক্ষেপে ব্যবস্থা নিতে হবে। সেটা ভুলে যাচ্ছি কেন আমরা। গাছের গোড়ায় জল ঢাললে গাছ বাঁচে, কিন্তু আমি যদি গাছের পাতায় পাতায় জল ঢালি তাহলে কি গাছ বাঁচবে? কখনই না। আমাদের policy টা উল্টো হয়ে যাচ্ছে, সময় নষ্ট করছি। আধিকারিক দেবদেবীর উপাসনা করতে গিয়ে বহু সময় নষ্ট হচ্ছে। কি দরকার? আমি এক জায়গায় জল ঢালব।

— যথা তরোমূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্বক্কভুজোপশাখাঃ।

প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বাহ্ণমচ্যুতেজ্য।।

সেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এখানে। 'অচ্যুতেজ্য'—ভগবানের পূজা। একজনকে পূজা করলে যদি আমার সব হয়ে যায় তাহলে আবার পৃথক পৃথক পূজা করার দরকার কি? প্রত্যেক দেবদেবীর চরণে আলাদা আলাদা করে ফুল দেওয়ার কি প্রয়োজন? এক জায়গায় দিলে ত' সব হয়ে যায়। আর যদি এই কথা হয় তাহলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা কি বোকা, তিনি কি অতাত্ত্বিক ব্যক্তি বা শিবঠাকুর কি অতাত্ত্বিক ব্যক্তি। তাঁরা কি বলছেন?—

“যৎ পূজনেন বিধুবাঃ পিতরোহর্চিঃশাস্তিঃ।”

যাঁর পূজা করলে পিতৃপুরুষগণের পূজা হয়ে যায়, 'বিবুধা'—সকল দেবতা-গণের পূজা হয়ে যায়, সমস্ত দেবতাগণ পূজা পেয়ে যান, 'তুষ্টা ভবন্তি ঋষিভূত-সলোকপালাঃ।'—সমস্ত ঋষিগণ সন্তুষ্ট হয়ে যান যাঁর পূজা করলে, লোকপালগণ তুষ্ট হয়ে যান যাঁর পূজা করলে, যাঁর আরাধনা করলে, 'সর্বো গ্রহাঃ'—সমস্ত গ্রহ শান্তি হয়ে যায় যাঁর আরাধনা করলে, পৃথক পৃথক ভাবে আর নবগ্রহ শান্তির প্রয়োজন হয় না, 'তরণিসোমকুজাদি মুখ্যা'—মঙ্গলগ্রহ, শুক্রগ্রহ ইত্যাদির আর পৃথকভাবে পূজার দরকার হয় না। 'গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি'—আমি আদিদেব গোবিন্দের পূজা করছি। তাহলে ব্রহ্মা কি Theory টা ভুল বললেন? শিবঠাকুরও ঐরকম কথা বলেছেন ভাগবতে,—

তথাপি যৎপাদনখাবস্তুং জগদ্বিরিঞ্চোপহাতার্হগান্তঃ।

সেশং পুণাতন্যতমো মুকুন্দাৎ কো নাম লোকে ভগবৎ-পদার্থঃ।।

বামনদেবের শ্রীপাদপদ্ম থেকে গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছেন। তাঁর বেগ ধারণ করলেন কে?—শিবঠাকুর। 'শিব শিবোহভূত'—শিব শিবত্ব লাভ করলেন বিষ্ণুর পাদদ্বীপে বারি গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করে। পবিত্রতা লাভ করলে গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করে। 'সেশং'—সে + ঈশং) সেই সর্বোচ্চেশ্বর যে ভগবান তাঁর সেবাপূজা, তাঁর আরাধনা করলে আর কার আরাধনা বাকী থাকে? সব হয়ে যায়। তাহলে আমি সময় নষ্ট করতে যাব কেন? কি দরকার? এটা কারও মাথায় আসছে না।

উপাস্য নির্ণয় একটা বড় জিনিস। আমি যে সাধন-ভজন করব কে হবেন আমার উপাস্য? কিছু টাকা-পয়সা, কিছু সম্পত্তির দরকার—বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করলাম, কিন্তু যদি আমি মুক্তি চাই, তাহলে দেবতাগণ তা দিতে পারবেন না। আমি যদি ভক্তি চাই তা দিতে পারবেন না। আমি যদি প্রেমভক্তি চাই তা দিতে পারবেন না তাঁরা, ক্ষমতা নেই তাঁদের। যাঁদের ক্ষমতা নেই তাঁদের কাছে গিয়ে আমি কি করব? আমার Demand টা যদি বড় তাহলে যাঁর কাছে পাব তাঁর কাছে যাব। বৃথা সময় নষ্ট করব কেন? কোন দেবতা মুক্তি দিয়েছেন কাকে, লেখা আছে কোথায়? কোন দেবদেবী মুক্তি দিতে পারেন না, ও Port folio নেই তাঁদের। ওই দপ্তর—Port folio টা ভগবান্ নিজের হাতে রেখেছেন। মুক্তিদাতৃত্বের দপ্তরটা তিনি বিলি করেন নি দেবতাগণকে। এটা তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। যদি আমার মুক্তি দরকার, ভক্তি—ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি দরকার, এসব যদি আমি প্রার্থনা করি তাহলে ভগবানের কাছে যেতে হবে। অন্য কোন দেবদেবীর ক্ষমতা নেই দেওয়ার। বহুতর উদাহরণ রয়েছে শাস্ত্রে।

শিবঠাকুরের একজন ভক্ত ছিলেন ঘন্টাকর্ণ। ঘন্টাকর্ণ যখন মুক্তি চেয়েছিলেন তখন শিবঠাকুর কি দিতে পেরেছিলেন?—না, দিতে পারেন নি। বললেন—ও দপ্তর আমার হাতে নেই, ওটা চাইতে গেলে তোমরা ভগবানের কাছে চাও। মুক্তিদাতৃত্ব কোন দেবদেবীর হাতে নেই। ভগবানের হাতে—শ্রীকৃষ্ণের হাতে মুক্তিদাতৃত্ব আছে।

‘মুক্তিপ্রদাতা সর্বেষাং কৃষ্ণরেব ন সংশয়ঃ, বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।’—একথা বুঝানো আছে। সুতরাং আমি সময় নষ্ট করব কেন? উপাস্য নির্ণয় করতে হবে। আমি কি চাই, কতটুকু চাই? যদি অধিকারিক দেবদেবীর পূজা করি তাহলে আমাকে এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থাকতে হয়, যদি এখানেও না থাকি তাহলে চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ঘুরতে হয়। ‘মা আমায় ঘুরাবি কত, চোখ বাঁধা কল্লুর বলদের মত।’ এই চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পাক দিতে হচ্ছে আমাকে, কর্ম-কর্মফল, সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরক এই করছি পড়ে পড়ে। যদি এখান থেকে ছুটি পাওয়ার ইচ্ছা থাকে কারও তাহলে ভগবানের ভজন-সাধন করতে হবে—শ্রীহরির ভজন-সাধন করতে হবে। সেখানে দেবদেবীরা কিছু করতে পারবে না। তাঁদের যে ক্ষমতা দেওয়া আছে সেটা সীমিত ক্ষমতা, সেটুকু তাঁরা দিতে পারেন। ‘ধনং দেহি, জনং দেহি, দ্বিষো জহি’—এই করলে কিছু পেতে পারি আমি। কিন্তু ভক্তি পেতে গেলে ভগবানের সেবাপূজা করতে হবে। ভক্তি ত’ দুরের কথা, মুক্তি দিতে পারেন না দেবতারা, তাঁদের হাতে মুক্তি নেই। তাঁরা কি করবেন? সময় নষ্ট করতে যাব কেন আমরা। অতএব সবগুলো বিচার জানতে হবে আমাদের। ( ক্রমশঃ )

## বিয়োগিনী বিষুগপ্রিয়া

গোরা-বিয়োগিনী বালা, নয়নে বহিছে জল,—  
ক্ষণে করে হায় হায়,                      ক্ষণে পথ পানে চায়,  
আলুয়িত কেশ দাম, চুমিছে চরণতল॥ ১॥  
গদ গদ ভাসে বালা, বলে “কোথা প্রাণাধার”—  
কি এত করেছি দোষ,                      কেন বঁধু এত রোষ,  
এ জীবনে দিবে নাকি, মোরে দরশন আর?? ২॥  
চিরতরে কেন বল, তেয়োগিলে অবলায়?  
নিতি করি ডাকাডাকি,                      পাওনা শুনিতে তাকি,—  
কেন দিলে বুক ভাঙি, নিদারুণ উপেখায়?? ৩॥  
হেন নিষ্ঠুরতা শরে, কেন নাথ মোরে আর,—  
বিধিতেছ অবিরত,                      আমি যে মরমে হত,—  
বল বল আরো সাধে, কিবা আছে গো তোমার?? ৪॥  
কি বলিল বিষুগপ্রিয়া! নাথ মোর নিরদয়?  
যদি প্রলয়ের ঝড়ে,                      দিনকর খসি পড়ে,  
মক্ষিকা সুমেরু তুলি, মহাশূন্য মাঝে লয়,—॥ ৫॥  
অনন্তে মিশিয়া যায়, যদি এ ব্রহ্মাণ্ডখান,—  
সতী ছাড়ে নিজপতি,                      ত্যজে তপ ঋষি যদি—  
তবু দয়া মাখা রবে, নাথের কোমল প্রাণ॥ ৬॥  
কে বলে সে গেছে ভুলে, হয়ে মোরে নিরদয়,—  
আমার মরম ঘরে,                      সে যে নিতি খেলা করে,  
এক দণ্ড এক তিল মোর কাছ ছাড়া নয়॥ ৭॥  
তোমার গৃহিণী হয়ে, কেন জনমিনু হায়!  
পথের পথিক যারা,                      তোমাধনে পায় তারা,  
যতনে লুটিয়া পড়ে, ওই দুটী রাঙাপায়॥ ৮॥  
নারী না হইয়া যদি, হইতাম অন্যজন,—  
তবে এ নয়ন ধারা,                      মোরে না করিত সারা,—  
সেবিতাম রাঙ্গাপদ, ভাবিয়া পরাণ মন॥ ৯॥

এ জগতমাঝে শুধু, আমিই অভাগি একা,  
 প্রেমেতে ডুবালে ধরা, আমিই জীবনে মরা,—  
 মোরেই নিদয় শুধু দিলে না বারেক দেখা॥ ১০॥  
 না না কেবলে অভাগী আমি, সৌভাগ্যের নাহি ওর,—  
 চন্দ্রচক্ষে আর বটে, দরশন নাহি ঘটে,  
 আত্মায় আত্মায় সেবে, নিতি জড়াজড়ি মোর!! ১১॥  
 যদি গৃহমাঝে তুমি রহিতে পরাণ ধন,—  
 শুধুরতে পতি মম, আজি যেতে প্রিয়তম,  
 হইয়া জগতপতি, তুষিছ জগতজন॥ ১২॥  
 যদি গৃহে রতে শুধু, আমিই পেতেম সুখ,—  
 আজ সারা বিশ্বজন, হেরি' নাথ ও বরণ,—  
 পাইছে কতই শান্তি, ভরিয়া দগধ বুক॥ ১৩॥  
 সবে সুখে ভাসে হেরি', বিষুগপ্রিয়া-পতি মুখ,—  
 এ হতে সৌভাগ্য আর, কিবা আছে অবলার,—  
 উছসি উঠিছে হিয়া, ভাবে এ অতুল সুখ॥ ১৪॥  
 যেখানে সেখানে রও, রবে মোর (ই) প্রাণাধার,—  
 বিষুগপ্রিয়া-পতি নামে, রবে চির ধরা ধামে,—  
 তবে আর কেন কাঁদি, কেন এত হাহাকার॥ ১৫॥  
 বিলাও বিলাও প্রেম, যত সাধ এ ধরায়,—  
 এ দাসী যেন গো তায়, নাহি হয় অন্তরায়,  
 আর মোর কোন দুখ, নাহি নাথ এ হিয়ায়॥ ১৬॥  
 হইয়া জগতপতি, বিষুগপ্রিয়া-প্রাণাধার,—  
 এ সারাজগত পরে, সুধা বরিষণ করে,—  
 সুখ শান্তি প্রীতি থল, আজি গো সে এ ধরায়॥ ১৭॥  
 এর চেয়ে কিবা সুখ, আছে বা আমার হায়!  
 (আর) নাহি শোক দুখ, নবসুখে পূর্ণ বুক,  
 বালা কবে প্রেম ঢালি' দিবে গোরাচাঁদ-পায়॥ ১৮॥

—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী

## ভক্তির লক্ষণ

শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া শ্রীপাদ রূপগোস্বামী যে অপরূপ ভক্তিরসামৃত উদ্ধার করিয়াছেন, তাহারই কণা মাত্র আশ্বাদন করিবার প্রয়াসী হইয়া আজ এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি। বিভিন্ন ভক্তিসিদ্ধান্তে ভক্তির বিভিন্ন লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় পূজাপাদ ভক্ত্যাচার্য্যগণ আমাদের বোধসৌকর্য্যার্থে কত বিভিন্ন ভাবে ভক্তি-রহস্যের ব্যাখ্যা ও প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু ভক্তিরসামৃতসিদ্ধিতে সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূত অশেষ মাধুর্য্যসমন্বিত যে অপূর্ব্ব ভক্তিলক্ষণ দেখিতে পাই তাহার আর তুলনা নাই।

শ্রীগোপালতাপনীয় শ্রুতিতে ভক্তির এইরূপ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে,—“ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুদ্রোপাধি নৈরাস্যেনামুখিন্ মনঃকল্পনম্। এতদেব নৈকস্ম্যমিতি।”

অর্থাৎ ইহার ভজনাই ভক্তি। ঐহিক ও পারত্রিক উপাধি নিরসনপূর্ব্বক ইহাতে মনঃকল্পনকে ভজনা বলে। তাহাই নৈকস্ম্য।

এই শ্রুতিবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া এবং ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য ও মাধুর্য্য বিশেষ-ভাবে প্রকটিত করিয়া শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণগনুশীলনং ভক্তিরূপম্॥

শ্রুতিতে ইহামুত্র উপাধির নৈরাস্যের দ্বারা শ্রীভগবানে মনঃকল্পনরূপ ভজনাকেই ভক্তি বলা হইয়াছে। ইহামুদ্রোপাধিশূন্যতা লক্ষ্যই সংক্ষিপ্ত অথচ পরিষ্ফুট করিয়া শ্রীগোস্বামিপাদ ‘অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্’ লিখিয়াছেন। মনঃকল্পনরূপ ভজনা বলাতে অনুকূলভাবে ভজনাই অবশ্য শ্রুতির তাৎপর্য্য, কারণ প্রতিকূলভাবে মনঃকল্পনকে ভজনা বা ভক্তি নামে উদাহৃত করা যাইতে পারে না। শ্রুতির এই উহ্য তাৎপর্য্য ভক্তিরসামৃতসিদ্ধিতে পূর্ণ করা হইয়াছে। মনঃকল্পন ও ভজনা-পদ অপেক্ষা অনুশীলন-পদে যে নিগূঢ় তাৎপর্য্য নিহিত আছে, তাহা অনুশীলন-পদের ব্যাখ্যার অগ্রে পরিব্যক্ত হইবে। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, উক্তরূপ ভজনাই নৈকস্ম্য। যাঁহার ইহামুত্র কোনরূপ ফললাভের বাসনা নাই তাঁহার পক্ষে শ্রৌতস্মার্ত্ত প্রভৃতি কন্মের আর আবশ্যকতা কি? ভজনের আনুষঙ্গিক অবশ্য নিষ্পাদ্য কন্মব্যতিরেকে যাবতীয় কন্মরাশি পরিতাগ করিয়া তিনি কন্মশূন্য হইয়া থাকেন। কিন্তু শুধু নৈকস্ম্য বলিলে ভক্তির পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। ভক্তির সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ লক্ষণে ভক্তিবিরোধী অন্যান্য সাধনমতের নিরাস আবশ্যক। নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞানকেই মুক্তির একমাত্র দ্বাররূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। সেইরূপ বৈরাগ্যবাদিগণ বৈরাগ্যের প্রাধান্য তারস্বরে ঘোষণা করিয়া থাকেন। সাংখ্যযোগাদি বিভিন্ন দর্শনপন্থিগণ স্ব-স্ব-দর্শনানুযায়ী বিভিন্ন সাধনা অবলম্বনের উপদেশ দিয়া থাকেন। এই সকল প্রতিদ্বন্দ্বী সাধনা ব্যতীত শিথিলতা প্রভৃতি অপর নানাপ্রকার বিঘ্ন ভগবন্তুক্তজনের অন্তরায়রূপে উপস্থিত হইয়া ভক্তিপথে বাধা প্রদান করিতে পারে। ভক্তিলক্ষণে এই সকল বিঘ্নেরও নিরাস আবশ্যক।

জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রভৃতি সামান্যতঃ ভক্তিমার্গে পরিবৰ্জ্যনীয়। ভক্তির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তির অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে বটে, কিন্তু জ্ঞানবৈরাগ্যাদির অত্যাধিক প্রাধান্যে চিন্তের কাঠিন্য জন্মিয়া থাকে বলিয়াই উহার আতিশয্য ভক্তিমার্গের পরিপন্থী। ভক্তি অতি সুকুমার প্রকৃতি। কোন কারণে চিন্তের কাঠিন্য জন্মিলে ভক্তিস্ফূর্তির ব্যাঘাত ঘটে। এই নিমিত্ত ভক্তিতত্ত্ববিদগণ চিন্তের কঠিনতাসাধক জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি পরিবৰ্জ্জনের উপদেশ করিয়াছেন। তজ্জন্য উক্ত হইয়াছে,—

কৰ্ম্মবিক্ষেপকং তস্যা বৈরাগ্যং রসশোষকম্।

জ্ঞানং হানিকরং তত্ত্বচ্ছেদিতং ত্বনুযাতিতাম্॥

অর্থাৎ কৰ্ম্ম ভক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে, বৈরাগ্যে ভক্তির স্তম্ভ করে জ্ঞান ভক্তির হানি করে ; কিন্তু কৰ্ম্ম, বৈরাগ্য ও জ্ঞান শোধিত হইলে ভক্তির অনুগামী হয়। শ্রুতিতে কেবলমাত্র কৰ্ম্মহীনতার উল্লেখ হইয়াছে, পরন্তু জ্ঞান বৈরাগ্য শিথিলতা প্রভৃতি অন্তরায়সমূহের স্পষ্ট নিষেধ করা হয় নাই। শ্রুতির উক্ত উহ্য অংশ পূর্ণ করিয়া শ্রীগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন “জ্ঞানকৰ্ম্মাদ্যনাবৃতম্”।

‘অন্যাভিলাষিতশূন্যম্’ এবং ‘জ্ঞানকৰ্ম্মাদ্যনাবৃতম্’ এই দুইটি বিশেষণ পদের দ্বারা ভক্তির তটস্থ লক্ষণ নির্দেশ করিয়া পরবর্তী চরণে ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। ‘আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনই’ উত্তমভক্তি। ‘আনুকূল্যে’-পদের তৃতীয়া বিভক্তি উপলক্ষণে ব্যবহৃত হয় নাই, ইহা বিশেষণবিবক্ষায় ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা বা স্পৃহণীয়া প্রবৃত্তিই আনুকূল্যভাব, তাহাই ভক্তি। প্রশ্ন হইতে পারে ‘আনুকূল্য’ বলিলেই যদি ভক্তি বুঝায় তবে পুনরায় অনুশীলন-পদ ব্যবহারের তাৎপর্য কি? ইহার বিশেষ তাৎপর্য আছে। ‘অনু’ ও ‘শীলন’ এই দুইটি শব্দ লইয়া অনুশীলন পদ গঠিত। আনুকূল্যভাব জাত হইলে মুহূর্মুহুঃ শীলন কর্তব্য, ইহাই ‘অনু’-শব্দের অভিপ্রায়। ‘শীলন’-শব্দের ধাত্বর্থ দ্বিবিধ—(১) প্রবৃত্ত্যাত্মক ও নিবৃত্ত্যাত্মক শারীরিক, মানসিক ও বাচনিক চেষ্টা এবং (২) শ্রীতিবিষয়াত্মক মানসিক ভাব। তন্মধ্যে ভাবরূপটি চেষ্টারূপের কারণ হইলেও তাহা স্বপ্রকাশরহিত; চেষ্টারূপ কার্য স্বপ্রকাশধর্মী বলিয়া ভাবরূপকে নিয়ত আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। তাই ধাতু হইতে অনুশীলন-শব্দের ব্যুৎপত্তিভ্য অর্থ উক্ত প্রকারে দ্বিবিধ হইলেও চেষ্টাই একমাত্র অনুশীলনের পর্যায়রূপে পর্য্যবসিত হইতেছে। এই ধাত্বর্থঘটিত মৰ্ম্ম বিশেষরূপে পরিস্ফুট করিবার নিমিত্তই অনুশীলন-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ‘কৃষ্ণানুশীলন’-এর অর্থ কৃষ্ণসম্বন্ধীয় অনুশীলন অথবা কৃষ্ণার্থ অনুশীলন। এই অনুশীলনরূপ চেষ্টায় কারণীভূতভাব একমাত্র গুরুপাদাশ্রয়াদির দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। ধাত্বর্থঘটিত এই ভাবরূপ ক্রোড়ীকৃত আছে বলিয়াই স্থায়ী ও ব্যভিচারী ভাবও এই ভক্তিলক্ষণের অন্তর্গত হইতে পারিয়াছে, তত্ত্বভাবে ভক্তিলক্ষণের অব্যাপ্তিদোষ অব্যাপ্তদোষ ঘটে নাই। অনুশীলন-শব্দের এই সর্বব্যবগাহিতা ও মাধুর্য্য ভজনা মনঃকল্লন প্রভৃতি শব্দে তেমন পরিস্ফুট নহে। ‘কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্’, তাই অন্য কোন দেবতার উল্লেখ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণানুশীলনকেই উত্তম

ভক্তিরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। শ্রীগোপালতাপনীয় শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে,—  
 “একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য” ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণই ভক্তির অদ্বিতীয় বিষয় এবং চরম  
 বিশ্রাম-স্থান। ভক্তিলক্ষণের কৃষ্ণ-শব্দ তদীয় অবতারাতিরও উপলক্ষক, কারণ পূর্ণ  
 বলিলে স্বতঃসিদ্ধভাবে অংশেরও গ্রহণ হইয়া থাকে; তবে তাঁহার অন্যান্য অবতারাতিতে  
 ভক্তির ক্রিয়া হইলেও সে ক্রিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং তত্তৎস্থলীয় ভক্তির  
 ন্যূনতা অনিবার্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে শ্রীভগবান্ এই কথাই বলিয়াছেন,—

যেহপ্যন্যদেবতা ভক্ত্যা যজন্তে শ্রদ্ধয়াস্থিতাঃ।

তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥

যাস্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যাস্তি পিতৃব্রতাঃ।

ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা যাস্তি মদযাজিনোহপি মাম্॥

তাই শ্রীগোষ্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণনুশীলনেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন। পূর্বেই উক্ত  
 হইয়াছে যে অনুশীলন অনুকূলভাবে হওয়া চাই, কারণ প্রতিকূলভাবে অনুশীলনকে  
 কেহ ভক্তি বলে না। এস্থলে আপাতদৃষ্টিতে শ্রীমদ্ভগবতের সপ্তম স্কন্ধে শ্রীনারদোক্ত  
 নিম্নলিখিত বচনের সহিত ভক্তিরসামৃতসিঙ্ধুর বিরোধ মনে হইতে পারে,—

তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন বা।

স্নেহাৎ কামেন বা যুজ্যাৎ কথঞ্চিস্নেহক্ৰতে পৃথক্॥

যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।

ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ (ভাঃ ১।৭।২৬-২৭)

কামাদ্বেষাভ্যুত্যাৎ স্নেহাদ্যথা ভক্ত্যেবৈব মনঃ।

আবেশ্য তদযৎ হিত্বা বহবস্তদ্যতিং গতঃ॥

গোপ্যঃ কামাভ্যুত্যাৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।

সম্বন্ধাদ্বেষঃ স্নেহাদ্যুৎ ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥

তমাং কোণ্যুনায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ ॥ (ভাঃ ১।৭।৩০-৩২)

কিন্তু একটু পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে সেরূপ বিরোধের আশঙ্কা অমূলক  
 বলিয়া মনে হয়। ভক্তিসাধনের সর্বনিম্ন সোপান বৈধীভক্তির অপেক্ষা ভাবভূমির  
 স্থান যে উচ্চে তাহা ভক্তিরসামৃতসিঙ্ধুতে প্রদর্শিত হইয়াছে। কাম, স্নেহ ও সম্বন্ধ  
 অনুকূলভাবে ভাবিত বলিয়া রাগানুগ ভাব ভক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। প্রতিকূল-  
 ভাবিত দ্বেষ ও ভয়রূপ বৈরানুবন্ধ ভক্তি নহে। শ্রীগোষ্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

আনুকূল্য বিপর্যাস্যাষ্টীতি-দ্বৈষৌ পরাহতৌ।

ভক্তি-শব্দার্থে বৈরভাবও অন্তর্গত করিলে ভক্তি-শব্দের ব্যাপ্তি সহজসীমা  
 অতিক্রম করিয়া সর্বব্যবহারবিরোধী হইয়া পড়িবে। ভাগবতোক্ত পদ্যে শ্রীনারদও  
 সর্বদা বৈরানুবন্ধকে ভক্তিশোষণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বেষ, ভয়  
 প্রভৃতি বৈরানুবন্ধ ভাবপর্যায়ভুক্ত বলিয়া নিম্নাধিকারীর অনুষ্ঠেয় বৈধীভক্তি অপেক্ষা  
 শ্রেয় এই কথাই উক্ত বচনের তাৎপর্য। বৈধীভক্তি অপেক্ষা ভাবরূপ অবিহিত  
 বৈরানুবন্ধ শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়তা করিতে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী। কিন্তু ভাবভূম্যাকড়

হইলেও বৈয়ানুবন্ধ ভক্তি নহে। শ্রীকৃষ্ণে অবিহিত ভাবও প্রযুক্ত হইলে তুল্যফলদায়ী হয়, ইহাই উদ্ধৃত প্রকরণের বিবক্ষিত বিষয়। দশম স্কন্ধের ২৯শ অধ্যায়েও ঠিক এই বিষয়ের প্রসঙ্গ হইয়াছে, তাহার টীকায় শ্রীমৎ স্বামিপাদ লিখিয়াছেন যে,—বস্ত্তশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না, বিষবোধে অমৃত পান করিলেও বিষপানের ফল না হইয়া অমৃতপানেরই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জুগুপ্সিত ভাবও প্রযুক্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ লাভ ঘটয়া থাকে। কিন্তু ফলসাম্য হইলেও জুগুপ্সিত প্রতিকূল ভাবকে ভক্তিনামে কদাচ অভিহিত করা যাইতে পারে না।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামি-নির্দ্ধারিত এই ভক্তিলক্ষণের সহিত এক্ষণে অন্যান্য ভক্তিতত্ত্ববিদের লক্ষণ তুলনায় আলোচনা করা যাউক। প্রথমেই শ্রীসম্প্রদায় প্রবর্তক শ্রীমদ্রামানুজাচার্যের ভক্তিবিবরণ আলোচনা করিব। তিনি শ্রীভাষ্যে নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপনপূর্বক ভক্তিমার্গ সুপ্রতিষ্ঠার কার্য আরম্ভ করেন। উপনিষদে যে যে-স্থলে বিদ-ধাতুর (বেদন) প্রয়োগ হইয়াছে তত্তৎস্থলে বেদন-শব্দের অর্থ যে উপাসনা ইহা প্রতিপাদন করিবার প্রসঙ্গে তিনি শ্রীভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

“ধ্যানং চ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্ন স্মৃতিসন্তানরূপা ধ্রুবা স্মৃতিঃ। \* \* উপাসনং স্যাৎ ধ্রুবানুস্মৃতিদর্শনাৎ নিব্বচনাচ্ছেতি তস্যৈব বেদনস্যোপাসন রূপস্যাকৃদাবৃত্তস্য ধ্রুবানুস্মৃতি-ত্বমুপবর্ণিতম্। \* \* এবং রূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেন অভিধীয়তে, উপাসনপর্য্যায়-ত্বাভুক্তিশব্দস্য।” শ্রীভাষ্য ১অঃ ১পাঃ ১ সূঃ।

অর্থাৎ তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবর্তমান স্মৃতিপ্রবাহময় ধ্রুবানুস্মৃতির নাম ধ্যান। \* \* লোকপ্রসিদ্ধি এবং শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায় যে, উপাসনা ও ধ্রুবানুস্মৃতি এক। এইরূপে বারম্বার অনুষ্ঠিত সেই উপাসনাত্মক বেদনকেই ধ্রুবানুস্মৃতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ভক্তিশব্দেও এবম্বিধ ধ্রুবানুস্মৃতিই অভিহিত হইয়া থাকে; কারণ ভক্তি-শব্দটি উপাসনারই পর্য্যায় বা একার্থবোধক।

অতএব শ্রীরামানুজের মতে ধ্যান, বেদন ও উপাসনা ভক্তিরই পর্য্যায়ভুক্ত এবং ভক্তির অর্থ তৈলধারাবৎ নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতিসন্তানরূপা ইষ্টদেবের ধ্রুবানুস্মৃতি। আমরা ‘ধ্যান’-শব্দে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, এই ব্যাখ্যানসারে ভক্তি কেবলমাত্র সেই মানসিক ব্যাপারেই পর্য্যবসিত হইতেছে। যে অতুলনীয় ভাবসম্পদ ভক্তির হৃদয় ও কেন্দ্রস্বরূপ রামানুজাচার্যের ভক্তিলক্ষণে তাহা আবরণ ভেদ করিয়া প্রকাশমান হইতে পারে নাই। স্মৃতি ও ধ্যান সাধনভক্তির চতুঃষষ্টি প্রকার মুখ্যঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। যথা—

স্মৃতির্ধ্যানং তথা দাস্যং সখ্যামান্নবিবেদনম্। (ভঃ রঃ সিঃ ২য় লহরী)

ভক্তিমাগের সর্ব্বপ্রথম সোপান বৈধীভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গের মধ্যে কেবলমাত্র দুইটি অঙ্গের সহিত ভক্তির সমীকরণ করিলে ভক্তির মাধুর্য্য ও মহনীয় ব্যাপকতার হানি করিয়া উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নিরতিশয় সঙ্কুচিত করা হয়। বিশেষতঃ মূলীভূত ভাবের প্রাধান্য যথারূপ প্রকটিত না করায় শ্রীরামানুজ-প্রদত্ত লক্ষণ নিতান্তই অসম্পূর্ণ।



বিষ্ণুপুরাণে শ্রীভগবানের নিকট ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ যে ভক্তিবর প্রার্থনা করিয়াছিলেন অনেকের মতে তাহাই ভক্তির সর্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞা।

যা শ্রীতিরবিবেকীনাং বিষয়েষ্মনপায়িনী।

ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥ ( বিঃ পুঃ ১।২০।১৯ )

অর্থাৎ, অবিবেকী ব্যক্তিগণের নানাবিধ বিষয়ভোগে যেরূপ শ্রীতি জন্মিয়া থাকে, তোমার অনুস্মরণাসক্ত আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ শ্রীতি যেন অপসৃত না হয়।

অবিবেকী সংসারী ব্যক্তিগণের বিষয়াসক্তি যেরূপ প্রগাঢ় তদনুরূপ দৃঢ় আসক্তি ভগবদভিমুখিনী করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ভক্তিসাধনের প্রথমাদিকারীর পক্ষে ইহার সত্যতা ও দিগ্‌দর্শনকারিতা অস্বীকার করা চলে না। তবে ভক্তির পূর্ণাবয়ব লক্ষণ হিসাবে এই সংজ্ঞা যে অসম্পূর্ণতা-দোষে দুষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। অবিবেকী ব্যক্তিগণ স্বার্থানুবন্ধেই বিষয়ভোগে আসক্ত ; নিজ স্বার্থসিদ্ধি হেতুই বিষয়ভোগে তাঁহাদের শ্রীতি জন্মিয়া থাকে। উত্তমাভক্তি কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে অহৈতুকী অন্যাভিলাষিতাশূন্য। স্বার্থগন্ধযুক্ত বিষয়াসক্তি এবং অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তির পার্থক্য অনেক বেশী ; অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তির সহিত প্রাকৃত বিষয়াসক্তির তুলনা সেইজন্য হইতেই পারে না। ‘তোমার কথা ভাবিতে ভাবিতে সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে যেন অনপায়ী শ্রীতির উদ্ভব হয়’—ইহাও ভক্তির আদর্শ হইতে পারে না। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে,—

আত্মেন্দ্রিয়শ্রীতি-বাঞ্ছা—তারে বলি ‘কাম’।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়শ্রীতি-ইচ্ছা ধরে ‘প্রেম’ নাম ॥ ( ১৬৫ )

\* \* \* \*

সর্ব্বত্যাগ করি’ করে কৃষ্ণের ভজন।

কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন ॥ ( ১৬৯ )

ইহাকে कहিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।

স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ ॥ ( ১৭০ )

বিশেষতঃ ভক্তির অন্তরায়সমূহের নিরাস না থাকায় বিষ্ণুপুরাণোক্ত এই লক্ষণকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন বলা যাইতে পারে না।

নারদ ও শাণ্ডিল্য সুপ্রসিদ্ধ ভক্তিসূত্র প্রণয়ন করিয়া জগতে অমর কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। অতি পূর্ব্বকালে ভক্তিমার্গানুযায়ী বৈষ্ণবগণ ভক্ত, ভাগবত, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস ও কন্মহীন প্রভৃতি নানাবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। সেই সকল প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র মতই প্রধান ছিল। ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রেও ভক্তিতত্ত্ব বিশদভাবে উপদিষ্ট ও আলোচিত হইয়াছে। নারদভক্তিসূত্র, শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্র, শ্রীমদ্ভাগবত ও নারদ পঞ্চরাত্র গ্রন্থে ভক্তিতত্ত্বের যে যে লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে সেই সকল লক্ষণের সহিত শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর নির্দিষ্ট লক্ষণের তুলনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ( ক্রমশঃ )

—শ্রীঅম্বুজান্মক সরকার

✠	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।	✠
ধর্মঃ স্মৃতিতঃ পুংসাং বিশ্বকসেন-কথাসু যঃ।		লোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।
✠	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥	✠

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম।  
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিশ্বশূন্য ॥

অন্য ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।  
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৯শ বর্ষ } ২ মাঘ, অনির্কন্দ, ৫১১ শ্রীগৌরাব্দ { ১১শ সংখ্যা  
২৯ পৌষ, বুধবার, ১৪০৪, ইং ১৪/১/৯৮

সানুবাদং

## শ্রীশ্রীউৎকর্থা-দশকম্

[ শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্ ]

ছিন্ন-স্বর্ণ-বিনিন্দি-চিক্ৰণ-রুচিং স্মেরাং বয়ঃসন্ধিতো  
রম্যাং রক্ত-সুচীন-পট্টবসনাং বেশেন বিভ্রাজিতাম্গ।  
উদঘূর্ণচ্ছিতিকণ্ঠ-পিচ্ছ-বিলসদবেণীং মুকুন্দং মনাক্  
পশ্যন্তীং নয়নাঞ্চলেন মুদিতাং রাধাং কদাহং ভজে ॥ ১ ॥

যাঁহার সমুজ্জ্বল অঙ্গ-কাস্তি ছিন্ন অর্থাৎ কর্তিত স্বর্ণের মনোহর শোভাকেও তিরস্কার  
করিতেছে, যিনি পরম মধুর মন্দ মন্দ হাস্য করিতেছেন, যিনি বয়ঃসন্ধিতে অতিশয় রমণীয়া,  
যিনি অরুণ-বর্ণ অতি সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, যিনি মনোহর বেশে সুশোভিত  
হইয়াছেন, যাঁহার মস্তকস্থ বেণী মণ্ডলী-বন্ধনে নৃত্যশীল ময়ূরগণের প্রসারিত পুচ্ছশ্রেণীর  
ন্যায় শোভা পাইতেছে, যিনি নয়ন-কোণে মুকুন্দের প্রতি ঈষৎ বন্ধিম দৃষ্টিপাত করিতেছেন  
এবং যিনি সাতিশয় হস্তান্তঃকরণা, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব? ॥ ১ ॥

যস্যাঃ কান্ত-তনুসং-পরিমলেনাকৃষ্ট উচ্চৈঃ স্ফুরদ্-

গোপীবন্দ-মুখারবিন্দ-মধু তৎ প্রীত্যা ধয়ন্যপাদঃ ।

মুঞ্চন্ বর্ত্তনি বংত্রমীতি মদতো গোবিন্দ-ভৃঙ্গঃ সতাং

বৃন্দারণ্য-বরেণ্য-কল্পলতিকাং রাধাং কদাহং ভজে ॥ ২ ॥

গোবিন্দ-রূপ মধুকর পরমা সুন্দরী ব্রজগোপীগণের মুখারবিন্দের সুপ্রথিত মধু অতিশয় প্রীতিসহকারে পান করিয়াও, তাহা সদ্য পরিত্যাগ করত, যাঁহার কমনীয় অঙ্গের প্রফুল্ল পরিমলে অত্যধিক আকৃষ্ট হইয়া, মত্ততাবশতঃ পথে পথে হেলিয়া দুলিয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন, বৃন্দাবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্পলতিকা, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব? ॥ ২ ॥

শ্রীমৎ-কুণ্ড-তটী-কুড়ুঙ্গ-ভবনে ক্রীড়াকলানাং গুরুং

তল্লৈ মঞ্জুল-মল্লি-কোমল-দলৈঃ কণ্ঠে মুহুর্মাধবম্ ।

জিত্বা মানিনমক্ষ-সঙ্গর-বিধৌ স্মিত্বা দৃগন্তোৎসবৈ-

র্যুঞ্জানাং হসিতুং সখীঃ পরমহো রাধাং কদাহং ভজে ॥ ৩ ॥

পরম-শোভাযিত শ্রীরাধাকুণ্ডের তটস্থ নিকুঞ্জ-ভবনে, মনোহর মল্লিকা কুসুমের সুকোমল-দল-নির্মিত শয্যায়, কেলি-পরায়ণ-ব্যক্তি সকলের শিরোমণি দর্শায়িত মাধবকে পাশক-ক্রীড়া-সমরে বারম্বার পরাজিত করিয়া, তাঁহাকে উপহাস করিবার জন্য, যিনি হাস্য-বদনে অপাঙ্গ-ভঙ্গীসহকারে, স্বীয় সখীগণকে নিযুক্ত করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব? ॥ ৩ ॥

রাসে প্রেমরসেন কৃষ্ণ-বিধুনা সাদ্ধ্বং সখীভিবৃতাং

ভাবৈরষ্টভিরের সাত্ত্বিকতরৈল্যস্যং রসৈস্তম্বতীম্ ।

বীণা-বেণু-মৃদঙ্গ-কিঙ্কিণি-চলন্মঞ্জীর-চূড়োচ্ছলদ-

দ্বানৈঃ স্ফীত-সুগীত-মঞ্জু নিতরাং রাধাং কদাহং ভজে ॥ ৪ ॥

রাসলীলায় সখীগণ-পরিবৃতা হইয়া প্রেমরসিক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত অষ্ট মহাসাত্ত্বিক-ভাবে বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, কিঙ্কিণী (ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা), চঞ্চল নুপুর, চূড়ী প্রভৃতির উচ্ছলিত-শব্দ-পরিপুষ্ট সুমধুর গীতসহকারে, যিনি রসময় নৃত্য বিস্তার করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব? ॥ ৪ ॥

উদাম-স্মরকেলি-সঙ্গর-ভরে কামং বনান্তঃখলে

কৃষ্ণেনাক্ষিত-পীন-পর্বত-কুচদ্বন্দ্বাং নথৈরদ্রকৈঃ ।

তদদর্পেণ তথা মদোদ্ধুরমহো তং বিক্রমাকুর্ষতীং

দূরে স্থালিকুলৈঃ কৃতশিষ্যমহো রাধাং কদাহং ভজে ॥ ৫ ॥

বন মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল কন্দপ-শৃঙ্গে নথাস্ত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সুবিশাল শৈলতুল্য কুচ-দ্বয়কে চিহ্নিত করিলে, যিনি তাঁহারই ন্যায় দর্প করিয়া মদোদ্রম তঁাহাকে ক্ষতবিক্ষত

করিতেছেন, এবং সখীগণ দূর হইতে তাহা দর্শন করিয়া যাঁহাকে আশীর্বাদ করিতেছেন,  
সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব? ॥ ৫ ॥

মিত্রাণং নিকরৈর্বৃতেন হরিণাং স্বৈরং গিরীন্দ্রান্তিকে

শুষ্কাদানমিষণে বহুনি হঠাদন্তেন রুদ্ধাঞ্চল্যাম্।

সার্দং স্মের-সখীভিরুদ্ধুর-গিরাং ভঙ্গ্যা ক্ষিপন্তীং রুযা

ভ্রুদৈর্বিলাসচ্চকোর-নয়নাং রাধাং কদাহং ভজে ॥ ৬ ॥

গোবর্দ্ধনের নিকট পথিমধ্যে শুষ্ক অর্থাৎ কর-গ্রহণচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ সুবলাদি-  
সখাগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া, দর্প-ভরে স্বচ্ছন্দে হঠাৎ যাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করায়, যিনি  
হাস্যমুখী সখীগণের সহিত ভঙ্গীসহকারে তাঁহার প্রতি উদ্ধত বাক্যসমূহ প্রয়োগ করিতেছেন  
এবং তৎকালে ভ্রূদৈর্বিলাসচ্চকোর-নয়ন-যুগল চঞ্চল হইতেছে, সেই  
শ্রীরাধাকে আমি ভজনা করিব? ॥ ৬ ॥

পারাবার-বিহার-কৌতুক-মনঃপূরেণ কংসারিণা

স্ফারে মানস-জাহ্নবী-জলভরে তর্য্যাং সমুত্থাপিতাম্।

জীর্ণা নৌর্মম চেৎ স্বলেদিতি মিষাচ্ছায়াদ্বিতীয়াং মুদা

পারে খণ্ডিত-কঞ্চুলিং ধৃত-কুচাং রাধাং কদাহং ভজে ॥ ৭ ॥

বিস্তীর্ণ মানস-গঙ্গার জলে পারাপার-বিহারাভিলাষে কৌতুহলাক্রান্ত-চিন্তিত হইয়া,  
কংস-রিপু শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে পার করিবার নিমিত্ত, একাকিনী নৌকায় উত্তোলন করিয়া  
ছলপূর্বক “আমার নৌকা জীর্ণ হইয়াছে, যদি জলমগ্ন হয়” এই কথা বলায়, যিনি ভীতা  
হইয়া কঞ্চুলিকা অর্থাৎ কাঁচুলি উন্মোচন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার স্তন-দ্বয় ধারণ করিয়াছিলেন,  
সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব? ॥ ৭ ॥

উল্লাসৈর্জলকেলি-লোলুপ-মনঃপূরে নিদাঘোদগমে

ক্ষেবলী-লম্পট-মানসাভিরভিতঃ সায়াং সখীভিবৃত্তাম্।

গোবিন্দং সরসি প্রিয়েহত্র সলিল-ক্ৰীড়া-বিদগ্ধং কণৈঃ

সিঞ্চন্তীং জল-যন্তুকেণ পয়সাং রাধাং কদাহং ভজে ॥ ৮ ॥

যিনি স্বীয় জলকেলি-লোলুপ চিন্তের বাসনা পূরণার্থ, গ্রীষ্মারম্ভে সায়াংকালে ক্ৰীড়া-  
কৌতুকাভিলাষিণী সখীগণ-পরিবৃত্তা হইয়া, শ্রীরাধাকুণ্ডের জলে জলযন্তুদ্বারা  
জলকেলিবিহারে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জলকণা-সমূহ সেচন করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি  
কবে ভজনা করিব? ॥ ৮ ॥

বাসন্তী-কুসুমোৎকরেণ পরিতঃ সৌরভ্য-বিস্তারিণা

স্বেনালঙ্কৃতি-সঞ্চয়েন বহুধাবির্ভাবিতেন স্ফুটম্।

সোৎকম্পং পুলকোদগমৈর্মুরভিদা দ্রাগ্ভূষিতাঙ্গীং ক্রমৈ-

র্মোদেনাশ্রুভরৈঃ প্লুতাং পুলকিতাং রাধাং কদাহং ভজে ॥ ৯ ॥

যিনি পুলকান্বিত-কলেবর শ্রীকৃষ্ণকর্ডুক কম্পান্বিত-হস্তে, সর্বত্র সৌরভ-বিস্তারকারী বসন্তকালীন কুসুমাবলী ও স্বনির্মিত বিবিধ অলঙ্কার-সমূহে সত্ত্বর সুসজ্জিত হইয়া, আনন্দাশ্রু-প্লাবিতা ও পরম পুলকিতা হইয়াছিলেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব? ॥ ৯ ॥

প্রাণেভ্যোহপ্যধিক-প্রিয়া মুররিপোর্যা হন্ত! যস্যা অপি

স্বীয়-প্রাণ-পরাক্রতোহপি দয়িতান্তংপাদরেণোঃ কণাঃ।

ধন্যাং তাং জগতীত্রেয়ে পরিলসজ্জঙ্ঘাল-কীর্তিং হরেঃ

প্রেষ্ঠাবর্গ-শিরোহগ্রভূষণ-মণিং রাধাং কদাহং ভজে ॥ ১০ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসমূহ হইতেও সমধিক প্রিয়া, অথচ কি আশ্চর্য্য! সেই শ্রীকৃষ্ণের পদরজঃকণা যাঁহার স্বীয় কোটা কোটা প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম, যাঁহার কীর্তিরাশি অতীব উজ্জ্বল ও ত্রিজগতে সুবিস্তীর্ণ এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীবর্গের মস্তকস্থিত অত্যাৎকৃষ্ট ভূষণমণি-স্বরূপ অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণপ্রিয়াগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা, সেই ধন্যতমা শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব? ॥ ১০ ॥

উৎকণ্ঠাদশক-স্তবেন নিতরাং নবোন্ম দিব্যোঃ স্বরৈ-

বৃন্দারণ্য-মহেন্দ্র-পটুমহিষীং যঃ স্তোতি সম্যক সুধীঃ।

তন্মৈ প্রাণসমা-গুণানুরসনাং সঞ্জাত-হর্ষোৎসবৈঃ

কৃষ্ণোহনর্ঘমভীষ্টরত্নমচিরাদেতং স্ফুটং যচ্ছতি ॥ ১১ ॥

যে ব্যক্তি সম্যক সদ্ভক্তি-সম্পন্ন হইয়া দিব্য-স্বরে এই অভিনব ‘উৎকণ্ঠাদশক’ স্তোত্রদ্বারা বৃন্দাবনাধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পটুমহিষী বা পাটরাণী শ্রীরাধিকার অতিশয় স্তব করেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই স্তবদ্বারা প্রাণসমা শ্রীরাধার গুণান্বাদন করত, অতিশয় হস্ত হইয়া তাঁহাকে শীঘ্র শ্রীরাধিকার সেবারূপ অমূল্য অভীষ্টরত্ন প্রকৃষ্টরূপে প্রদান করেন ॥ ১১ ॥

## প্রশ্নোত্তর

### রসকীর্তন

১। কৃষ্ণলীলা-গানের প্রণালী কি?

“গৌরচন্দ্রের লীলা-গীতই সর্ব্বাঙ্গে গান করা উচিত: বিশেষতঃ সাধুদিগের প্রথা এই যে, গৌরচন্দ্রের লীলা-গান না করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-লীলা গান করেন না।”

—সমালোচনা, সং: তোঃ ২। ৬

২। সাধকের পক্ষে কিরূপ সঙ্গীত শ্রবণ করা উচিত?

“যে সঙ্গীত কেবল ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্য করে না, কিন্তু ভগবানের লীলা বর্ণনের দ্বারা ভক্তি-বৃত্তির অনুশীলন করে, কেবল সেই সকল সঙ্গীত-বাদ্যাদিই শ্রবণ করিবে। যে সঙ্গীত সামান্য কর্ণেন্দ্রিয় ও বিষয়াভিভূত চিত্তের বিষয়রাগ-মাত্র সমৃদ্ধিকরে, তাহা দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে।”

—চৈঃ শিঃ ৩। ২

৩। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মধ্যে সঙ্গীতের পারিপাট্য কখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে?

“শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর সময়েই গানের পারিপাট্য হয়। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম দাস ও শ্রীশ্যামানন্দ—এই তিন মহাত্মা কিছুদিন শ্রীজীব গোস্বামীর শিক্ষা-শিষ্যরূপে অবস্থিতি করেন। শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমোদনে ইঁহারা কীর্ত্তন-পদ্ধতির ব্যবস্থা করিলেন। তিন জনেই সঙ্গীত-শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। দিল্লীর কালোয়াতি বিদ্যায় তিনজনেই পারদর্শী। তিন জনেই পরস্পর এক-প্রাণ, একাশয় ও হৃদয়-বন্ধু।”

—ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসভাস, সং: তোঃ ৬। ২

৪। ‘মনোহরসাহী’, ‘গরাণহাটি’ ও ‘রেণেটি’ গানের প্রচলন কখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে?

“শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য কাটোয়া-প্রদেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রদেশটী মনোহরসাহী পরগণার অন্তর্গত। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবর্তিত গান পদ্ধতির নাম—‘মনোহরসাহী’ গান। শ্রীনরোত্তমদাস রাজসাহী জেলার গরাণহাটি বা গড়ের হাট পরগণার অন্তর্গত খেতুরী গ্রামের অধিবাসী। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবর্তিত গান-পদ্ধতির নাম ‘গরাণহাটি’ গান। শ্রীশ্যামানন্দ মেদিনীপুর জেলার লোক। তাঁহার প্রবর্তিত গীত পদ্ধতিকে ‘রেণেটি’ গান বলা যায়। শ্রীজীব গোস্বামী গান্যচার্য্যদিককে উৎসাহ দিবার জন্য শ্রীনিবাস আচার্য্যকে ‘প্রভু’-পদ, শ্রীনরোত্তম দাসকে—‘ঠাকুর’-পদ ও শ্রীশ্যামানন্দকে—‘প্রভু’ পদ দিয়াছিলেন।”

—ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসভাস, সং: তোঃ ৬। ২

৫। মহাজন-পদে অরসজ্ঞ ব্যক্তির অক্ষর সংযোগ করা অনুচিত কেন?

“মহাজনের বাক্যে রসভাস ও বৈষ্ণব-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নাই। অরসজ্ঞ ব্যক্তি বা গায়ক অক্ষর সংযুক্ত করিলে কাজে-কাজেই রসভাস ও সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথা হইয়া পড়ে।”

—ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসভাস, সং: তোঃ ৬। ২

৬। রসকীর্ত্তন-ব্যবসায়ীর মূল্য কতদূর ও তাহার কীর্ত্তন কি বৈষ্ণবের শ্রোতব্য?

“ইঁহারা (ব্যবসায়ীর লীলারস-গায়কগণ) সকলেই নামে-রসিকমাত্র; তাহারা রসবোধশূন্য এবং বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ-ভাষী। তাহাদের গানে রাগ-রাগিনী, রং-ঢং যথেষ্ট আছে, কিন্তু বৈষ্ণবের শ্রোতব্য অধিক দেখা যায় না। তাহারা সমাগত স্ত্রীলোক ও মুখ লোকদিগকে রঞ্জন করিবার মানসে গানে এতদূর অক্ষর দেয় যে, মহাজনের পদটী কোথায় থাকে, তাহা জানা যায় না। মুখ লোক বাহবা দেয়, অর্থ দেয়, তাহাতেই তাহারা অহঙ্কারে পরিপূর্ণ।”

—ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসভাস, সং: তোঃ ৬। ২

৭। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অধিকারীর পক্ষে যে রসকীর্ত্তন নিষিদ্ধ, তৎসম্বন্ধে কিরূপ তীব্র উক্তি করিয়াছিলেন?

“জগতে অধিকাংশ মনুষ্যই বিকৃত; তাহারা রং ভালবাসে, প্রকৃত ভজনের নাম লইয়া যথেষ্টাচার করিয়া থাকে। যে-পর্য্যন্ত এই কুপন্থা স্থগিত না হইবে, সে-পর্য্যন্ত শৃঙ্গার-রসের গান্ধীর্ঘ্য থাকিবে না। হে ভক্তবৃন্দ! স্বার্থপর গায়ক ও জড়ানন্দপর শ্রোতাগণের সভায় আপনারা রস-গান শ্রবণ করিবেন না। শ্রাদ্ধ-সভা ত’ দূরে যাউক, বৈষ্ণবদিগের

আখড়ায়ও এ পদ্ধতি যাহাতে না থাকে, তাহার যত্ন করুন। সর্বপ্রকার অধিকারী যেখানে উপস্থিত, সেখানে নাম ও প্রার্থনা এবং দাস্য-রসের গান হওয়াই উচিত। যেখানে অমিশ্র শুদ্ধ রসিক বৈষ্ণব-মাত্র উপস্থিত থাকেন, সেখানে রস-গান শ্রবণ করুন এবং রস-গান শ্রবণ-সময়ে নিজ-সিদ্ধ-স্বরূপোচিত-ভজনভাব অনুভব করুন। ইহাতে গান পদ্ধতি যদি উঠিয়া যায়, যাউক, তাহাতেও বৈষ্ণবদিগের মঙ্গল হইবে। অর্থ-লোভে ও ইন্দ্রিয়-সুখের প্রত্যাশায় যেখানে-সেখানে রসগানের প্রথা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত কলির কার্য্য।”

—ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাবাস, সং: তোঃ ৬। ২

৮। দেহারামী ব্যক্তি অপ্রাকৃত লীলার কথা শ্রবণে কি গতি লাভ করে?

“যে-সকল ব্যক্তি স্থূল দেহগত সুখকে বহুমানন করত চিন্ময় দেহগত এই সকল আনন্দ-বৈচিত্র্য অবগত হন নাই, তাঁহারা এই সকল কথার প্রতি দৃষ্টিপাত, মনন ও আলোচনা করিবেন না, কেন না, তাহা করিলে ঐ সকল বর্ণনাকে মাংস-চন্দ্রমুগত ক্রিয়া মনে করিয়া হয় অলীল বলিয়া নিন্দা করিবেন, নয় আদর করিয়া সহজিয়া-ভাবে অধঃপতন লাভ করিবেন।”

—চৈঃ শিঃ ৭। ৭

### ভক্তি-প্রাতিকূল্য

১। ভক্তির অনুকূল বিষয় স্বীকার ও প্রতিকূল বিষয় বর্জনে দৃঢ়তার আবশ্যকতা কি?

“ভক্তির অনুকূল স্বীকার ও প্রতিকূল পরিহার-বিষয়ে সাধকের দৃঢ়তা ও যত্ন আবশ্যক। সংসারী জীবের অনেক সময়ে অনেক ভজন-প্রতিকূল ব্যাপার ঘটে; বিশেষ যত্ন ও দৃঢ়তাপূর্ব্বক সেগুলি পরিত্যাগ না করিলে সাধনের বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া অভীষ্ট-লাভে বিলম্ব ঘটায়।”

—সাধন, সং: তোঃ ১১। ৫

২। ‘প্রাতিকূল্য-বর্জন’ কাহাকে বলে?

“ভগবদ-ভাগবত-প্রসাদ ব্যতীত কিছুই ভোজন করিব না, ভাবদ-ভাগবতরূপ মন্দির ও স্থানাদি ব্যতীত আর কিছুই দেখিব না, প্রসাদ-গন্ধ ব্যতীত আর কিছুই ঘ্রাণ লইব না, ভগবদ-ভাগবত কথা ব্যতীত আর কোন কথা শুনিব না, হস্ত-পদাদি বিশিষ্ট শরীরকে ভগবদ-ভাগবত সম্বন্ধশূন্য ব্যাপারে নিযুক্ত করিব না, তদ্ব্যতীত কিছুই ধ্যান, বিচার ও আশ্বাদন করিব না, তদ্বিষয় ব্যতীত অন্য কাব্য-গীতাদি বলিব না”—এইরূপ সঙ্কল্পই প্রাতিকূল্য-বর্জন।”

—শ্রদ্ধা ও শরণাগতি, সং: তোঃ ৪। ৯

৩। প্রাতিকূল্যবর্জনকারীর প্রতিভা কি?

“তুয়া ভক্তি-বহিস্মুখ-সঙ্গ না করিব।

গৌরঙ্গ-বিরোধি-জন মুখ না হেরিব।”

—শঃ

৪। কিরূপ লোকের সঙ্গত্যাগ বিধেয়?

“যেখানে ভক্তিবিরুদ্ধ আচার, সেখানে ভক্তি নাই; সেরূপ লোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই বিধান হইয়াছে।”

—কুটীনটি, সং: তোঃ ৬। ৭

৫। দুঃসঙ্গ ও সুসঙ্গ নির্ধারণের বিচার কি?

“ভগবদ্বিমুখ পুণ্যবান্ ও পাপী—উভয়ই ‘দুঃসঙ্গ’, ভগবৎসান্মুখ্য-প্রাপ্ত পাপী ব্যক্তিও ‘সুসঙ্গ’ বলিয়া জানিতে হইবে।”

—জনসঙ্গ, সং: তোঃ ১০। ১১

৬। কাহাদের সঙ্গকে ‘সৎসঙ্গ’ বলা যায়?

“ধন, পাণ্ডিত্য, জাতি বা বর্ণ ইত্যাদি যতই থাকুক, তৎসম্পন্ন বহিঃস্বার্থ-লোকের সঙ্গে সর্বদা যত্নপূর্বক পরিচয় করিবে এবং কৃষ্ণেণ্মুখ ব্যক্তিরই সঙ্গে করিবে। চারি প্রকারে পরিদৃশ্য হইয়া অনেকে কৃষ্ণেণ্মুখ বলিয়া পরিচয় দেন, তন্মধ্যে যাঁহার সরল ও নিরুপদ্রব, তাঁহারই সংসঙ্গ। চারি প্রকার এইরূপ—(১) কর্ম-ধর্ম-সাপেক্ষ ভক্ত, (২) কর্ম-ধর্ম-নিরপেক্ষ পরায়োগী, (৩) অপরায়োগী, (৪) তত্ত্ববেশধারী।”

—আঃ বিঃ ভাঃ টাঃ

৭। অসৎসঙ্গ ও সাধুসঙ্গের ফল কি?

“অসৎজনের সঙ্গে করিলে ঘোর সংসাররূপ-ফলপ্রাপ্তি হয়। কে অসৎ, কেই বা সৎ—এ বিষয় বিচার না করিয়াও সঙ্গ-ফল অবশ্য লাভ হয়। সাধুলোকের সঙ্গে করিলে নিঃসঙ্গত্বরূপ ফলোদয় হয়।”

—সাধুসঙ্গের প্রণালী বিচার, সমস্বিনী ( ক্ষেত্রবাসিনী ) সং তোঃ ১৫। ২

৮। বিষয়ী ও মায়াবাদী—ইহারা কি কৃষ্ণভক্ত?

“বিষয়-বিমুঢ় আর মায়াবাদী জন।

ভক্তিশূন্য দুহে প্রাণ ধরে অকারণ।।”

—শঃ

৯। মায়াবাদী ও বিষয়ীর মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত শ্লাঘ্য?

“সে দুয়ের মধ্যে বিষয়ী তবু ভাল।

মায়াবাদি-সঙ্গ নাহি মাগি কোন কাল।।”

—শঃ

১০। ব্যবহারিক কার্যে বহিঃস্বার্থগণের সঙ্গে কতটুকু করা যায়?

“ভগবদ্বিঃস্বার্থ ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্গে করিবেন না ; ব্যবহারিক কার্যে তাঁহাদের সহিত সম্মিলন অবশ্য হইবে, সেই সেই কার্য পর্যন্ত তাহাদের সহিত ব্যবহার করিবেন। কার্য সমাপ্ত হইলে আর তাঁহাদের সহিত ব্যবহার রাখিবেন না।”

—তত্ত্বকর্মপ্রবর্তন, সং তোঃ ১১। ৬

১১। কি চিত্তবৃত্তিতে সঙ্গে হয়?

“অসতের প্রতিদান ও অসতের নিকট হইতে গ্রহণ যদি প্রীতিসহকারে হয়, তবেই ‘অসৎসঙ্গ’ হইয়া পড়ে। অসৎ ব্যক্তি নিকটে আসিয়াছে, তাহার সহিত যে কর্তব্য-কর্ম আবশ্যিক হয়, তাহা কেবল কর্তব্য-বোধে করিবে। পরস্পরের গুঢ় কথার জল্পনা করিবে না; গুঢ় জল্পনায় প্রায়ই প্রীতি থাকে, তাহাতে সঙ্গে হয়। নিতান্ত সংসারী বান্ধবাদের মিলনে আবশ্যিক-বার্ত্তা-মাত্র করিবে; হৃদয়ের সহিত প্রীতি তখন না করাই ভাল।”

—সঙ্গত্যাগ, সং তোঃ ১১। ১১

১২। বহিঃস্বার্থগণের সহিত আন্তরিক ভ্রাতৃত্ব কি নিন্দনীয় নয়?

“কোন সভায় একত্র উপবিষ্ট হওয়া বা নৌকারোহণে একত্র নদী পার হওয়া, এক-ঘাটে স্নান করা বা এক-বিপণিতে দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করাকে ‘সঙ্গ’ বলা যায় না। কোন ব্যক্তির সহিত আন্তরিক ভ্রাতৃত্ব-সহকারে ব্যবহার করার নামই ‘সঙ্গ’। বহিঃস্বার্থ-জনের সহিত তদ্রূপ সঙ্গে করিবে না।”

—চৈঃ শিঃ ৩। ৩

( ক্রমশঃ )

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর



# প্রতিকূল মতবাদ

## পত্রলেখকের প্রতিকূল বিচার

এক মাননীয় পত্র লেখক লিখিয়াছেন,—“আমার মতে ভক্তির অনুশীলন কেবল নীরবে এবং নিজ্জনে সম্পাদিত হইতে পারে। তদুদ্দেশ্যে কোনরূপ সভা সমিতি বা আন্দোলন ভক্তির বিরোধী বলিয়া আমার মনে হয়, কারণ উহা দ্বারা প্রচার বা প্রতিষ্ঠা আসিতে পারে।”

## মহাভাগবত ও ভাগবতের অধিকার

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জীবকে অমানী হইতে উপদেশ দিয়াছেন এবং জগতের সকলকে মাননীয় জানিয়া সম্মান দিতে বলিয়াছেন। জীবমাত্রকে সম্মান দিবার একমাত্র মহাভাগবতগণেরই অধিকার। তদনুগত অধিকারে আমরা দেখিতে পাই কৃষ্ণ প্রেম, হরিজনে মিত্রতা, অনভিজ্ঞ জনে অনুগ্রহ ও বিদ্বেশীর উপেক্ষাই ভাগবত জীবনের আদর্শ। জীব যে অধিকারে থাকিয়া কৃষ্ণানুশীলন করেন সেই অধিকারে নিষ্ঠাই তাঁহার অনুকূল বিষয়। অধিকার বিপর্যয় ঘটিলে তাহাই দোষ বলিয়া পরিণত হয়।

## অজ্ঞান-অপসারণ মধ্যম ভাগবতের কৃত্য

যাঁহারা নিরপেক্ষভাবে ভক্তির স্বরূপ আলোচনা করিবার অবকাশ পান নাই তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা মহাবদান্যবর শ্রীগৌরসুন্দর নিজ মুখে সেই সকল কথা প্রচার করিয়াছেন এবং বশিক্ষিত অপ্রাকৃত শক্তিসম্পন্ন শ্রীরূপাদি আচার্য্যবর্গদ্বারা জুগতে প্রচার করিয়াছেন। সেই সকল অবিতর্কিত সিদ্ধান্ত-জ্ঞানের অভাবে আমরা অনেক সময় নিজ আত্মগুরিতার বশবর্তী হইয়া নিজ কল্পিত সাপেক্ষ বিচারসমূহ ব্যক্ত করিয়া অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিই। আবার তাদৃশ বিচারের অনৈপুণ্য সন্দর্শন করিবার সৌভাগ্য উদয় হইলে নিরপেক্ষ হইতে পারি। ভক্তির প্রতিকূল সিদ্ধান্তগুলির অসম্পূর্ণতা ও অনুপযোগিতা প্রদর্শন করিলে কেহ যেন নির্দয় হইয়া মনে না করেন যে কোন মাননীয় ব্যক্তির বিচার-দোষ দেখাইতে গেলে তাঁহার মান্যের খর্ব্ব করা হইবে এবং নিজ প্রতিষ্ঠা-দ্বারা মধ্যম ভাগবতাদিকারকে বিপন্ন করা হইবে। মধ্যম ভাগবতাদিকারে অনভিজ্ঞ জনে উপেক্ষার বিধান নাই; পরন্তু জীবের ভক্তিবাদক অজ্ঞানসমূহের অপসারণ-কৃত্য নিশ্চয়ভাবে আছে।

## অহৈতুকী উত্তমভক্তিই অভিধেয় ও পঞ্চম পুরুষার্থ

শ্রীগৌরসুন্দরের মহামূল্য শ্রীমুখবাণী হইতে আমরা জানি যে, কৃষ্ণ ব্যতীত অপর মায়িক অভিলাষ বর্জিত হইয়া নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানাদির আবরণ, নিত্য-নৈমিত্তিকাদি জীবের কর্মফলপ্রসূ ভোগাবরণ ও শৈথিল্যাদির আবরণ উন্মুক্ত হইয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলনকে শুদ্ধ অহৈতুকী উত্তম ভক্তি বলে। কৃষ্ণপ্রেম লাভরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির অভিধেয় নিরপেক্ষ জীবের একমাত্র পরম পুরুষার্থ ভক্তিই চতুর্বর্গাঙ্গীত পঞ্চম পুরুষার্থ। সেই ভক্তির অবস্থা ত্রিবিধ। সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা।

## অন্যাভিলাষ, কৰ্ম, জ্ঞান, শৈথিল্যাদি অনর্থসমূহ ভক্তির

### বাধক এবং সাধুসঙ্গপ্রভাবে তাহার দূরীকরণ

সাধনাবস্থার প্রথম মুখে কৃষ্ণ-বৈমুখ্যরূপ অনর্থসমূহ জীবকে ভক্তিনিষ্ঠ হইতে বাধা দেয়। অনর্থগুলি অন্যাভিলাষ, ফলভোগময় কৰ্ম্মাবরণ, ফলত্যাগময় জ্ঞানাবরণ, কৃষ্ণ-সেবায় উদাসীন্যরূপ শৈথিল্যাবরণ বলিয়া শ্রেণীত হইয়াছে। জীব অনর্থের হস্তে পড়িয়া প্রলাপগ্রস্ত রোগীর ন্যায় কত প্রকার রোগমুক্তির কল্পনাসমূহ নিজ চিকিৎসার জন্য উদ্ভাবনা করে; কিন্তু তাহাতে রোগোপশম হওয়া দূরে যাক্ উত্তরোত্তর রোগোপাধি বৃদ্ধি হইতে থাকে। সেজন্য আত্মস্তরিতা ছাড়িয়া নিষ্কিঞ্চন সাধুর আনুগত্য হইতেই কৃষ্ণানুশীলনের ফলভোগ বা শৈথিল্য জীবের অনর্থ। ঐ অনর্থগুলি সাধুসঙ্গপ্রভাবে অপসারিত হয়।

### অনর্থযুক্ত অবস্থায় নিৰ্জ্জন-ভজন ভক্তিপথ নহে

তাদৃশ অনর্থের মূলসমূহ উদরে পূর্ণ রাখিয়া নির্গমন পন্থারোধ করত জীবের নীরব ও নিৰ্জ্জন হইবার সামর্থ্য নাই। নীরব বা নিৰ্জ্জনের অভিনয় দেখাইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ভক্তির অবাস্তুর ফল রবরাহিত্য বা জনরাহিত্য সম্ভবপর নহে। কৃত্রিম সাধনসমূহের অকৰ্ম্মণ্যতা জগতে সভ্যতা বিস্তারের আদিম কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইতিহাসে জাজ্জ্বল্য প্রতিপন্ন আছে, সুতরাং তাদৃশ বঞ্চনশীল মার্গ ভক্তিপথে স্বীকৃত হয় নাই।

### প্রাকৃত নিৰ্জ্জনতা ও প্রাকৃত নিরবতা ভক্তিবিরোধী

অজ্ঞানের গরিমা, ভীমভট্টাদি কৰ্ম্মিগণের আড়ম্বরফলে বৈরাগ্যের প্রতিভা, হৃদয়ে পোষণ করিয়া কিরূপে ভক্তি-বিরোধী জীব রবরাহিত মুকধৰ্ম্ম এবং জনরহিত নিৰ্জ্জন কারাবাস স্বীকার করিয়া কৃষ্ণভক্তি হইল মনে করিবে? নীরব ও নিৰ্জ্জন অবস্থা কৰ্ম্মফলাধীন জীবের আকাশকুসুম বা শশবিষাণের ন্যায় অসম্ভব। জীব কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ হইলেই ভাগবতাদিকারে প্রাকৃত জনসঙ্গ ও প্রাকৃত উপদেশক বা বিচারকগণের বাদ সঙ্গ আপনা হইতে পরিত্যক্ত হইয়া দুঃসঙ্গমুক্ত ভক্ত হরিজন-গোষ্ঠীতে কৃষ্ণলাপপর হইতে পারিবেন। ভক্তগণ প্রাকৃত নিঃসঙ্গ বা প্রাকৃত মুকধৰ্ম্মকে ভক্তির বিরোধী জানেন। তাদৃশ নীরব ও নিৰ্জ্জন ধৰ্ম্মদ্বয় কখনই ভক্তির অনুকূল হইতে পারে না, কেননা উভয়ধৰ্ম্মই অসৎ অর্থাৎ নিত্যকাল স্থায়ী নহে। যাহা কালক্ষুর তাহা আবার বৈকুণ্ঠ কিরূপে হইবে? সাধুসঙ্গ, নিঃসঙ্গ অপেক্ষা ভক্তের উপাদেয়। সাধুসঙ্গ হইতেই দুঃসঙ্গের হেয়ত্ব ও বাদের মুচতা বিদূরিত হয়। নির্বিশেষবাদী হঠকারিতার আশ্রয়ে যে-সকল মতবাদ প্রচার করেন, তাহা ভক্তগণের সম্বন্ধে আদৌ প্রযুক্ত হইতে পারে না। “ন নির্বিশ্লেষো নাতিসঙ্গ ভক্তিযোগোহস্য সিদ্ধিঃ” শ্লোক এবং “আধিক্যে ন্যূনতয়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ” এতৎ প্রসঙ্গে ধীরভাবে অনুশীলনীয়।

### ভক্তির প্রচার ও প্রতিষ্ঠাই সভা-সমিতির সার্থকতা

জগতে সভা-সমিতির যদি কোন ফল থাকে তাহা হইলে হরিভক্তি প্রচার ও প্রতিষ্ঠা-উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত। সভা সমিতি, যদি হরিভক্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে তাদৃশ সভা-সমিতির কোন আবশ্যকতা নাই। কতিপয় সেকেলে ফলকামী কৰ্ম্মিগণ মনে করেন যে সভা-সমিতি পূর্বকালে ছিল না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠক

ইষ্টগোষ্ঠীর কথা সকলেই অবগত আছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠক ভাগবত-শ্রবণ-সভার কথা আপনাদের অবদিত নাই। শ্রবণ ও কীর্তনই সাধনের পরম পরাকাষ্ঠা বলিয়া শ্রীগৌরহরি ও শ্রীমদ্ভাগবতগণ নিরন্তর জগৎকে উপদেশ দিতেছেন ; কিন্তু এত কথা শুনিবার পরও মাননীয় লেখক মহাশয় নিজের বিচারফলে নির্বিশেষবাদী বিষয়মদাক্ষ তार्কিকগণের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা দুঃখিত। পঞ্চরাত্র বলেন,—

সুর্যে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদিশ্য যা ত্রিণ্যা।

সেব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥

মুক ও জড় হইলেই যে কেবল ভক্তি হয় একথা কোন বিজ্ঞ লোকে বলেন না। নীরব ও নির্জন উভয়ই প্রাকৃত ধর্ম। ভক্তি অপ্রাকৃত বস্তু, সুতরাং প্রাকৃত রবত্যাগ বা প্রাকৃত রবযুক্ত হওয়া উভয়ই ভক্তির প্রতিকূল; প্রাকৃত জনসঙ্গ বা প্রাকৃত জনরাহিত্য উভয়ই ভক্তির প্রতিকূল। তজ্জন্য পরমোচ্চস্বরে অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কীর্তন কর। “আমি জ্ঞানী বিচারক” এতাদৃশ নিজভোগপর অব্যক্ত বাঞ্ছেরূপ বিষয়কথা ছাড়িয়া মৌন হও—ইহাই সকল বিচারের শেষ কথা—গৌরহরি গান করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ ১২৮-১৩০ সংখ্যায় ভগবদুক্তি,—

“যারে দেখে তারে কহ ‘কৃষ্ণ’-উপদেশ।

আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার’ এই দেশ॥

কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।

পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥

এই মত যাঁর ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা।

সেই ঐছে কহে, তাঁরে করায় এই শিক্ষা॥”

### নীরব-ভজনের প্রতিপক্ষে শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ নীরব অনুশীলনের প্রতিপক্ষে কীর্তন বিষয়ে লিখিয়াছেন,—  
“নামকীর্তনধ্বংস উচ্চৈরেব প্রশস্তম্। নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠমিত্যাদৌ। অত্র যথোপদিষ্টং কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা—‘তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিসুণা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি’রিতি। যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কণ্ঠব্য তদা কীর্তনাত্মা-ভক্তিসংযোগেনৈবেত্যান্তম্।”

হরিকথা কীর্তন যেখানে নাই, হরিকথার প্রচার যেখানে নাই, সেইখানেই ধ্যানাদি কৃত্রিম বিষয়-কথা প্রবল। হরিজনের সঙ্গ যেখানে নাই সেখানেই মায়াগ্রস্ত আবদ্ধ-জীবের সঙ্গময় সভা-সমিতি। যেখানে কীর্তন নাই, শ্রবণ নাই, পক্ষান্তরে ফল্গু-বৈরাগ্যের কথা বঞ্চিত সমাজকে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছে সেখানে অপ্রাকৃত যুক্ত-বৈরাগ্য নাই। ফল্গুবৈরাগ্য প্রাকৃত বিষয়, সুতরাং উহা জীবের কোন মঙ্গল আনয়ন করিতে সমর্থ নহে। ফল্গুবৈরাগ্যের বশবর্তী হইয়া কৃষ্ণানুশীলনকে প্রাকৃত বিষয়ান্তর্গত মনে করিলে যে অপরাধ হয়, বিষয়কে এবং কৃষ্ণকে সমজ্ঞান করিলে যে বিধিপূর্ণ মায়াবাদ আশ্রয় করা হয়, তাহা সাধুসঙ্গ ব্যতীত কিরূপে জীবের উপলব্ধি হইবে। ভক্ত, সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কল্লিত বিচাররূপ অসাধু ভাবসমূহ হৃদয়ে পোষণ করিয়া নিঃসঙ্গ ও নীরব মনে করিলে কি মায়িক প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের

সেবা হইতে রক্ষা পাইবেন? মায়ার প্রচার বা মায়াবাদ প্রচারের ফলে ভক্তিপ্রচার ও ভক্তিপ্রতিষ্ঠা উন্মূলিত করিবার অসদ্বাসনা কি প্রচার বা প্রতিষ্ঠার হেয়ত্বের চরম সীমা নহে?

### ভক্তাভক্তির প্রচারকে প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা থাকিতে পারে না

ভক্ত ভগবানে ভক্তিযোগে অচিন্ত্য দ্বৈতদ্বৈত নিত্য ভাবময়। নিত্য ভক্তিবিশুখ হইয়া অভক্তির আদর্শ নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান, নিত্য নৈমিত্তিক ভোগ্য কর্মবাদ ও সেবা-শৈথিল্যবাদকে বহুমানন করিয়া ভগবদ্বিরোধী আত্মভ্রুরিতা বৃত্তিরূপ অবৈধসাধন করিলে জীবের ক্রুরূপে শ্রেয়ঃ লাভ হইবে? জীব যদি অনাত্মবিরেকবলে বিরূপ বুদ্ধিতে আপনাকে মুমুক্শু, বুভুক্শু বা উদাসীন মনে করিয়া নিজ মায়িক প্রতিষ্ঠা বা প্রচারের উৎকট তাড়নার বশবর্তী হইয়া অপ্রাকৃত শ্রবণ-কীর্তনাখ্যা ভক্তির প্রতিকূল ভাব-হৃদয়ে ভ্রমক্রমে পোষণ করেন এবং ভক্তগণে প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠা থাকিতে পারে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আত্মঘাতী জানিয়া ভক্ত নীরব হইবেন। এস্থলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

“বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি’।

ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি।।”

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ

## মহাপ্রভুর প্রেমময় ধর্ম ও প্রেমহীন প্রচার-চাতুর্য্য

“নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।”

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কৃষ্ণকে মহাবদান্য ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতারূপে তত্ত্ববিদ্ বৈষ্ণবগণ বর্ণন করিয়াছেন। তিনি গোলোক হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে ভক্ত বা মনুষ্যজ্ঞান করিলে অপরাধ, অন্যায় ও অজ্ঞতা প্রকাশ পায়। তিনি বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র-বর্ণিত ভগবান্। তাঁহার কার্য্যাবলীকে লীলা বলা হয়। তাহা জীবের ন্যায় কর্ম নহে। তাঁহার যাবতীয় পরিচয় অপ্রাকৃত; তাহাতে প্রাকৃত বিলাস ও চাতুর্য্য নাই। তাহা চিন্ময়, প্রেমময় ও মায়াগন্ধহীন। তাহা মায়িক সত্ত্বগুণাত্মক তত্ত্ব বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। শ্রীকৃষ্ণ নিজে ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন,—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

তাক্ষা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহজ্জুন। (গীতা ৪।৯)

যিনি আমার এই প্রকার অলৌকিক অপ্রাকৃত জন্ম ও কার্য্যাদি তত্ত্বতঃ মায়াভীত ও চিন্ময় বলিয়া ধারণা করিতে সক্ষম হন তিনি প্রাকৃত দেহ পরিত্যাগ করত পুনরায় প্রাকৃত জন্ম গ্রহণ করেন না এবং চিন্ময় ধামে আমাকে প্রাপ্ত হন।

শ্রীভগবানের সমস্ত কিছুই প্রাকৃত নহে বলিয়া তাহার ভিন্নতা বুঝাইতে তাহাকে লীলা বলা হয়। লীলা ও কর্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাহাকে প্রাকৃত জ্ঞান করিলে মূঢ়তা প্রকাশ পায়।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ (গীতা ৯।১১)

অর্থাৎ সর্বপ্রাণীর মহেশ্বর (মহান্ স্রষ্টা, নিয়ন্তা ও পালক) আমার পরম পরিচয় জানিতে না পারিয়া মুখ ব্যক্তিগণ আমার নরাকৃতি চিন্ময় বিগ্রহকেও মায়িক পঞ্চভূতাত্মক মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত “কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং” শ্লোক হইতে জানা যায় যে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ ব্যতীত কোন অংশ নহেন। বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টবিংশতি চতুর্য়ুগেই মাত্র কৃষ্ণ মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েন। অন্য চতুর্য়ুগের কলিতে অংশরূপে শ্যামবর্ণ ধারণ করিয়া থাকেন। অষ্টবিংশতি চতুর্য়ুগের কলিতে আবির্ভূত-তত্ত্বকে অন্যান্য কলিযুগে উপাস্যতত্ত্বের সহিত এক তত্ত্বরূপে বর্ণন করা হয় নাই। বর্ণ-বিচারে অষ্টবিংশ চতুর্য়ুগের মহাপ্রভুকে কৃষ্ণবর্ণ বলায় তিনি যে কৃষ্ণতত্ত্ব তাহা প্রকাশ পায়। “অস্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং” শ্লোকে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ কাষাটী শ্রীমহাপ্রভুরূপে সম্পাদন করেন, কৃষ্ণলীলায় তাহা প্রকাশ করেন নাই। এই হেতু মহাপ্রভুরূপেই তিনি মহাবদান্য আখ্যা লাভ করিয়াছেন। “অনর্পিতচরীং চিরাৎ” শ্লোকেও ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই মহাপ্রভুর লীলার বিশেষ মাহাত্ম্য এবং বৈশিষ্ট্য।

মহাপ্রভুর নামপ্রচার প্রেমাত্মক। সর্বত্রই এই প্রেমসংযোগ তাঁহার লীলার মহত্ত্ব। তাঁহার নামপ্রচার প্রেমহীন নহে। তাঁহার লীলার সর্বত্রই এই প্রেমযুক্ততা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহার গমনাগমন, কথোপকথন, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন, তীর্থাদি পযাটন সর্বত্রই ইহা প্রকাশিত। তিনি সমগ্র ভারতে যে নাম বিতরণ করিয়াছেন তাহা দেশবাসী তাঁহার প্রেমোন্মত্ততা দর্শন করত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার গমনাগমন কিরূপ প্রেমময় তাহার দুই একটি শাস্ত্র বর্ণনা,—

মণ্ডসিংহ-প্রায় প্রভু করিলা গমন।

প্রমাবেশে যায় করি' নাম-সঙ্কীর্ণন॥

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে!

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে!!

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রক্ষ মাম্!

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাহি মাম্॥

রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রক্ষ মাম্।

কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! পাহি মাম্॥

এই শ্লোক পড়ি' পথে চলিলা গৌরহরি।

লোক দেখি' পথে কহে,—বল 'হরি' 'হরি' ॥

সেই লোক প্রেমমত্ত হএগ বলে 'হরি' কৃষ্ণ'।

প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শন-সতৃষ্ণ॥

কতক্ষণ রহি' প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।

বিদায় করিলা তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥

সেইজন নিজ-গ্রামে করিয়া গমন।

কৃষ্ণ বলি' হাসে, কান্দে, নাচে অনুক্ষণ॥

যারে দেখে, তারে কহে,— কহ কৃষ্ণনাম।  
 এইমত 'বৈষ্ণব' কৈল সব নিজ-গ্রাম।।  
 গ্রামান্তর হৈতে দেখিতে আইল যত জন।  
 তাঁর দর্শন-কৃপায় হয় তাঁর সম।।  
 সেই যাই' গ্রামের লোক বৈষ্ণব করয়।  
 অন্যগ্রামী আসি' তাঁরে দেখি' বৈষ্ণব হয়।।  
 সেই যাই' অন্যগ্রামে করে উপদেশ।  
 এইমত বৈষ্ণব হইল সব দক্ষিণ-দেশ।।  
 এইমত পথে যাইতে শত শত জন।  
 'বৈষ্ণব' করেন তাঁরে করি' আলিঙ্গন।।

মনুষ্যকে প্রেমময় ও বৈষ্ণব করা দূরে থাক, বারিখণ্ডের পথে মহাপ্রভু স্থাবর জঙ্গমকেও প্রেমোন্মত্ত করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীহীন মহাবদান্য হইয়াছেন,—

লক্ষ্যের বিষয় এই যে—মহাপ্রভু লোককে “বল হরি হরি” বলিলে সে ব্যক্তি প্রেমোন্মত্ত হইতেন, কিন্তু সাধারণ অনধিকারীর মুখ হইতে “বল হরি হরি” বাক্য শুনিলেও প্রেমোন্মত্ত তা দূরে থাক, প্রেমাভাস ও হয় না। ইহাই ‘সম্মুখরিতাং ভবদীয়-বার্তাম্’ শ্লোকে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহার প্রেমোদয় হয় নাই, পরন্তু যিনি অন্যাভিলাষী, তাহার মুখনিঃসৃত নাম প্রেম প্রদান করিতে পারে না। এইজন্য অনধিকারীর মুখে নিঃসৃত হরিকথাও বজ্জনীয়।—

অবৈষ্ণব-মুখোদগীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।

শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ।।

ইহাই শাস্ত্রের উক্তি। যে-প্রকার লোকের সঙ্গ করা যাইবে, সেই প্রকার গুণই তাহাতে সংক্রামিত হইবে। অন্যাভিলাষীর নানা চাতুর্য্যপূর্ণ প্রচারদ্বারা হতভাগ্য মনুষ্যগণ আকৃষ্ট হইলেও তাহা প্রেমধর্ম প্রচার হইতে পারে না। ভোগবিলাসদ্বারা আকৃষ্ট মনুষ্যকে ভক্ত বলা সঙ্গত নহে। সুস্বাদু মহাপ্রসাদ ভোজন করিবার লোভ বদ্ধজীবমাত্রেরই আছে। নানারূপ বিলাসবহুল অট্টালিকা ও নন্দনকালনতুল্য উদ্যান এবং চিড়িয়াখানা যাহাদের আকৃষ্ট করে, তাহারা ভক্ত নহেন। বিশেষতঃ ধনী ব্যক্তি ভোগাসক্ত, তাহাদের দুঃসঙ্গ বলিয়া ভক্তগণ দূরে অবস্থান করেন। তাহাদের সেবা কখনই ভক্তসেবা নহে। ঐ ভোগীকুল ও সিনেমার নায়ক-নায়িকাগণও দুঃসঙ্গ জানিতে হইবে। তাহাদিগকে লক্ষ্মহীরা মনে করিলে অন্যায় হইবে। কারণ গণিকাকে হরিদাস ঠাকুর উদ্ধার করিয়াছিলেন। সে কার্য্য সাধারণ ভক্তের দ্বারা সম্ভবপর হয় না। ঐ প্রকার নায়ক-নায়িকা ও শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ ব্যক্তির গৌরবলিপ্ত প্রচারকে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম বলা অসঙ্গত। ‘প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী যায় পলাইয়া’—বিশুদ্ধ বৈষ্ণবতা এইপ্রকার। আর প্রতিষ্ঠার জন্য অতিরঞ্জিত সংবাদ ও আলেখ্যাদি এবং বহিস্মুখজনের প্রশংসার মাধ্যমে প্রচার কতদূর প্রেমধর্ম তাহা বিবেচ্য। ধনীলোকের অনুকম্পায় ধনী হওয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহাতে প্রেমিক হওয়া সম্ভব হয় না।

ভারতআধ্যাত্মিকতার দেশ। কালপ্রভাবে তাহার আধ্যাত্মিকতা বিপর্য্যস্ত হইয়া বৌদ্ধ,

জৈন, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু সেই ধর্ম আধ্যাত্মিকতা বিচারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থান পায় নাই। কোথাও তরবারিদ্বারা, কোথাও ভোগের প্রলোভনদ্বারা অনুন্নত ও অবহেলিত সম্প্রদায়মধ্যেই উক্ত ধর্মগুলি প্রসার লাভ করিয়াছে। ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিয়া ধর্মাস্তরিত ব্যক্তিগণ আকৃষ্ট হয় নাই। দারিদ্রপীড়িত ব্যক্তিকে উচ্চবেতন, সুন্দরী যুবতী, কৃষিজন্ম পাঁচবিঘা ভূমি, স্বচ্ছন্দে বাসোপযোগী বাসগৃহ, পারিবারিক চিকিৎসা ও সন্তানাদি পালন ও তাহাদের বিবাহের দায়িত্বের বিনিময়ে ধর্মত্যাগ ও ধর্মাস্তর গ্রহণ করা প্রেমাকৃষ্টতার পরিচায়ক নহে। মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম এইভাবে প্রচারিত হয় নাই। দারিদ্রের কাঁথা, ধনীব্যক্তি এমনকি রাজাকেও বিষয়ী বলিয়া বহু অনুনয় ও প্রার্থনা সত্ত্বেও মহাপ্রভু দর্শন দান করেন নাই। তাহাদের সেবা ও মনস্তৃষ্টি করত ভোগাগার নির্মাণ করেন নাই। মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণই বৈরাগ্যপ্রধান। “কাঁথা-করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ। যাহা দেখি’ তুষ্ট হন গৌর-ভগবান।।” তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত ধর্মে খ্রীসঙ্গ কঠোরভাবে বর্জিত। ভক্তের নামে ভোগীর বিবাহকার্যেরও তিনি প্রশ্রয়দাতা ছিলেন না। “অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথাহমুপযুক্ততঃ” বাক্যকে তিনি অসম্মান ও অবজ্ঞা করেন নাই। তজ্জন্যই অদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীবাসাদি গৃহস্থভক্তগণ তাঁহার পার্শ্বদ ছিলেন। কিন্তু খ্রীসঙ্গী গৃহীর প্রশ্রয়দাতা ছিলেন না। তাঁহার প্রচারকগণ “বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস” প্রচার করিয়াছেন। স্পর্শমণিও তাহাদের আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। “ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।”—ইহাই তাঁহাদের ভিত্তিপ্রস্তর ছিল। “বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ” উক্তি হইতে বৈরাগীর কৃত্য জানা যায়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আদর্শরূপে গান করিয়াছেন,— “লয়ে সাধুবেশ, আনে উপদেশ, এ বড় মায়ার রঙ্গ।” শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলিয়াছেন,— “কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাধিনী, ছাড়িয়াছে যারে সেই ত’ বৈষ্ণব।”

—ত্রিদিগ্বামী শ্রীমজ্জিমবোদন্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

## ষড়্বেগ—ভক্তির প্রতিকূল

কালস্রোতের প্রচণ্ড বেগে মায়াবদ্ধ জীবগণ চৌরাশী লক্ষ যোনি ধরিয়া অহর্নিশ ভবচক্রে ঘুরপাক খাইতেছে। বন্যার সময় জলের প্রবল বেগে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে গ্রামের পর গ্রামে জল প্রবেশ করিয়া অসংখ্য মানুষ ও গবাদি পশুর প্রাণহানি, ফসলাদির অশেষ ক্ষতিসাধন এবং অনেক মানুষকে গৃহহীন করিয়া থাকে—তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। আবার ঝড়ের সময় বায়ুর প্রবলবেগ যে জনজীবনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলে, তাহাও আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। আলোর গতিবেগ, শব্দের গতিবেগ এবং আরও কতই না বেগের সহিত কমবেশী আমরা সবাই পরিচিত। কিন্তু এই বেগগুলি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ ‘উপদেশামৃত’ের প্রথম শ্লোকে “বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগম্” এ যে ষড়্বেগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই আলোচনা করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। মূল শ্লোকটি নিম্নরূপ,—

“বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থ-বেগম্।

এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ।।”

“যেই ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছারহিত পণ্ডিত বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর ও উপস্থ ইত্যাদি ষড়্বেগ ধারণ করিতে সমর্থ তিনি সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করিতে পারেন।” শাস্ত্র তাঁহাকে ‘গোস্বামী’ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন। ষড়্বেগের কবলে পতিত হইলে জীব ‘গোদাস’ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। অদান্ত গো কখনও হরিসেবা করিতে পারে না। গোস্বামিগণই হরির সেবক, গোদাসগণ মায়ার দাস, তাহাদিগকে কৃষ্ণভক্ত হইতে হইলে অবশ্যই গোস্বামিগণের চরণাণুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ‘শ্রীউপদেশামৃত-ভাষা’য় লিখিয়াছেন,—

“গুরুকৃপা-বলে লভি সম্বন্ধ বিজ্ঞান। কৃতিজীব হয়েন ভজনে যত্ববান॥

সেই জীবে শ্রীরূপ-গোস্বামী মহোদয়। উপদেশামৃতে ধন্য করেন নিশ্চয়॥

গৃহী গৃহত্যাগী ভেদে দ্বিপ্রকার জনে। উপদেশ-ভেদ বিচারিবে বিজ্ঞজনে।

গৃহী প্রতি এই সব উপদেশ হয়। গৃহত্যাগী প্রতি ইহা পরাকাষ্ঠাময়॥

বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ আর। জিহ্বাবেগ, উদর-উপস্থবেগ ছার॥

এই ছয় বেগ সহি কৃষ্ণনামাশ্রয়ে। জগৎ শাসিতে পারে পরাজিয়া ভয়ে॥

কেবল শরণাগতি কৃষ্ণভক্তিময়। ভক্তিপ্রতিকূল ত্যাগ তার অঙ্গ হয়॥

ছয় বেগ সহি যুক্তবৈরাগ্য আশ্রয়ে। নামে অপরাধশূন্য হইবে নির্ভয়ে॥”

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ‘উপদেশামৃত-ভাষা’র মধ্যে বলিয়াছেন,—

“কৃষ্ণের কথা বাগ্ বেগ তার নাম। কামের অতৃপ্তে ক্রোধবেগ মনোদাম॥

সুস্বাদু-ভোজনশীল জিহ্বাবেগদাস। অতিরিক্ত ভোজ্য যেই উদরেতে আশ॥

যোষিতের ভৃত্য স্ত্রৈণ কামের কিঙ্কর। উপস্থবেগের বশে কন্দর্পতৎপর॥

এই ছয় বেগ যার বশে সদা রয়। সে জন গোস্বামী করে পৃথিবী বিজয়॥”

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত ‘আনুকূল্যস্য সঙ্কল্প প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্’-শ্লোকে যে ষড়্বেগ শরণাগতির কথা পাওয়া যায়, তাহার অন্যতম ‘আনুকূল্যের সঙ্কল্প’ ও ‘প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন’। তাই আনুকূল্যের সঙ্কল্প ও প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন শ্রদ্ধা-ভক্তির সাক্ষাৎ অঙ্গ না হইলেও ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অধিকারদাতা শরণাপত্তি-লক্ষণ শ্রদ্ধার বিশেষ অঙ্গ। ভজনপরায়ণ ব্যক্তিগণ আনুকূল্যস্য সঙ্কল্প ও প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনসহকারে ভক্তির অনুশীলন করিয়া থাকেন। শ্রীল রূপগোস্বামি-কৃত শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধুর “অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্মান্যাদ্যাবৃতম্”-শ্লোকে এই বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। চিন্তা ষড়্বেগের দ্বারা আক্রান্ত হইলে ভক্তির শুদ্ধ অনুশীলন সম্ভবপর হয় না। ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তির চিন্তকে প্রাতিকূল্য বর্জ্জন অর্থাৎ ষড়্বেগ সহনের দ্বারা ভক্তিপ্রবণ করিবার জন্য শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ “বাচো বেগং মনসং ক্রোধবেগম্”-শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। ষড়্বেগের নিবৃত্তি করিবার চেষ্টাই যে ভক্তিসাধন তাহা নহে, কিন্তু ভক্তিমন্দিরে প্রবেশের যোগ্যতাসাধন মাত্র। কর্মমার্গে ও জ্ঞানমার্গে ষড়্বেগ নিবৃত্তির যে উপদেশ ও সাধন-প্রণালী রহিয়াছে, তাহা কখনও ভক্তের পালনযোগ্য নহে। কৃষ্ণনাম-রূপ-চরিতাদির অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্তন ও অনুস্মরণই সাক্ষাৎ ভক্তি—ইহা শাস্ত্র আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছেন।



মায়িক সবিশেষ যত্নে বা অভিনিবেশে ত্রিবিধ বেগ পরিদৃষ্ট হয়—যথা বাক্বেগ, মানসবেগ ও শরীর বেগ। এই বেগত্রয়ের কবলে পতিত হইলে কেহই মঙ্গললাভ করিতে পারে না, তজ্জন্য বেগসহনশীল ব্যক্তি পার্থিব বস্তুর বশীভূত হইবার পরিবর্তে পৃথিবীকে জয় করিতে সমর্থ হন। যাঁহার বুদ্ধিতে বাক্য, মন ও কায়ের দণ্ড অর্থাৎ বহির্বিশয়ে অনবস্থান এবং সংস্কল্পের প্রতিকূল ব্যাপার হইতে বিরতি রহিয়াছে, তিনিই ‘ত্রিদণ্ডী’ বলিয়া কথিত হন। কেহ কেহ ক্রোধবেগকে মানসবেগের অন্তর্গত বলিয়া থাকেন। শরীরবেগ ত্রিবিধ—জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ। ষড়্বেগ সম্বন্ধে বিশদভাবে ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা হইতেছে।

ষড়্বেগ কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপুর সহিত সরাসরিভাবে যুক্ত। যে বাক্য প্রয়োগের দ্বারা ভূতগণের উদ্বেগ সৃষ্টি করা হয়, তাহাই সাধারণতঃ বাগ্বেগ নামে কথিত। জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ‘অনুবৃত্তিতে’ নির্বিশেষবাদীর শাস্ত্রীয় জ্ঞানাসমূহ, কৰ্ম্মকাণ্ড-নিরতের কৰ্ম্মফলের শাস্ত্রযুক্তি ও কৃষ্ণতর অভিলাষীর যথেষ্টা ভোগপর অনুভবজন্য বাক্যাবলী প্রভৃতিকে বাক্যের বেগ বলিয়া নিদ্রারণ করিয়াছেন এবং ভগবানের সেবনোপযোগী বাক্যসমূহের প্রবৃত্তিই কেবল বেগসহনের ফল, উহাই বাগ্বেগ নহে—ইহাও কৃষ্ণতর বিষয়ক অনুভব জন্য বাক্বেগে বিশেষ (শ্রীল প্রভুপাদ)।

মোট কথা ভগবদগুণসমূহ কীর্তনের দ্বারাই বাগ্বেগকে সুনিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর। এই প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতে পরীক্ষিত মহারাজ বলিয়াছেন,—“সা বাগযয়া তস্য গুণান গৃণীতে” অর্থাৎ “মনুষ্যের যে বাগিদ্রিয়ে ভগবদ গুণসমূহ কীর্তিত হয়, উহাই বস্তুতঃ বাগিদ্রিয়।” অম্বরীয় মহারাজ “বচাংসি বৈকুণ্ঠগাণানুবর্ণনে” অর্থাৎ বাক্যসমূহকে বৈকুণ্ঠবস্তুর গুণানুকীর্ণনে নিয়োগ করিয়াছিলেন। বৃত্রাসুরও “গুণাংস্তে গৃণীত বাক্” স্তবের মাধ্যমে বাক্যের দ্বারা ভগবানের গুণকীর্তন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ধনকুবেরের পুত্রদ্বয় নলকুবের ও মণিগ্রীব ভগবানের স্তব করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—“বাণী গুণানুকথনে” অর্থাৎ আমাদের বাক্য আপনার গুণানুকীর্ণনে নিযুক্ত থাকুক।

একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত—এই ষোড়শকলার মধ্যে প্রধান। যাবৎ জীবের মন সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের অধীন থাকে, তাবৎ তাহার মন পাপ, পুণ্য বা মিশ্রকৰ্ম্মের বিস্তার করে। মায়ারচিত মন দেহী জীবকে আলিঙ্গন করিয়া সংসারচক্রে নিষ্পেষিত করে এবং সুখ, দুঃখ, মোহ ও পাপ-পুণ্যাদি কৰ্ম্মের কালোচিত দুর্নিবার ফলসমূহকে সর্বতোভাবে সৃষ্টি করিয়া থাকে। মন বলবান হইতেও বলশালী এবং যোগিগণেরও ভয়ঙ্কর। মুষ্টির দ্বারা যেরূপ বায়ুকে আবদ্ধ করা যায় না, তদ্রূপ যোগাদি পন্থার দ্বারা দুর্জয় মনের বেগ দমন করা সম্ভবপর হয় না। মনের বেগ সম্বন্ধে জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ‘অনুবৃত্তিতে’ লিখিয়াছেন,—“মনের বেগ দ্বিবিধ—অবিরোধ প্রীতি ও বিরোধযুক্ত ক্রোধ। মায়াবাদীর বিশ্বাসে প্রীতি, কৰ্ম্মবাদীর বিশ্বাসে আদর ও অন্যাভিলাষীর মতে বিশ্বাস—এই তিন প্রকার অবিরোধ প্রীতি। জ্ঞানী, কৰ্ম্মী ও অন্যাভিলাষীর চেষ্টা দেখিয়া নিরপেক্ষ অবস্থানই মনের অব্যক্ত অবিরোধ প্রীতিবেগ। অন্যাভিলাষের অতৃপ্তি জন্য, কৰ্ম্মফল লাভের অতৃপ্তিতে ও মুক্তির অপ্রাপ্ত হেতু ক্রোধ। কৃষ্ণলীলা চিন্তাই মানসবেগ

সহনের ফল, উহা মানসবেগ নহে।” অতএব দেখা যাইতেছে, হরি- গুরু-চরণোপাসনারূপ অস্ত্রদ্বারা মনের বেগকে দমন করা সম্ভবপর। “মনশ্চ স্মরেদসমুদ্ভব” অর্থাৎ যদ্বারা নিখিলভূতাস্তব্যমী শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ হয়, উহাই বস্তুতঃ মন। ধনকুবেরের পুত্রদ্বয় “মনস্তব পাদয়োঃ স্মৃত্যাম্” অর্থাৎ মনের দ্বারা ভগবানের পাদপদ্ম স্মরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। ব্রহ্মসূরও “মনঃ স্মরেতাসুপতে” বাক্যদ্বারা প্রাণপতি কৃষ্ণের গুণাবলী স্মরণে মনকে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। অম্বরীষ মহারাজ “স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো” অর্থাৎ মনকে কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধ্যানে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ভক্তগণের মন ভগবানের রূপ-গুণ-লীলারস নিমগ্ন থাকায় ঐ মন বিষয়সমূহের রঙ্গভূমি নহে, উহা ভগবল্লীলাক্ষেত্র—

অন্যের হৃদয়-মন,

মোর মন-বৃন্দাবন,

‘মনে’ ‘বনে’ এক করি’ জানি। (চৈঃ চঃ মঃ ১৩।১৩৭)

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে।

মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময়েব প্রবিলীয়তে ॥ (ভাঃ ১১।১৪।২৭)

“বিষয়ে ধ্যানশীল-চিত্ত বিষয়েই আসক্ত হয়, আর আমাকে অনুক্ষণ স্মরণকারী-চিত্ত কিন্তু আমাতেই নিমগ্ন হন।” ক্রোধের বেগ অর্থাৎ রূঢ়বাক্যাদি প্রয়োগদ্বারা মন যে অসদ্বিশেষে আবিষ্ট হয়, তাহারও নিবৃত্তি কৃষ্ণসেবার দ্বারা সম্ভব হইয়া থাকে।

জিহ্বাবেগের সহিত উদরবেগ ও উপস্থবেগের সম্পর্ক অঙ্গাদিভাবে জড়িত। কেহ কেহ জিহ্বাবেগকেই উদরবেগ ও উপস্থবেগ সৃষ্টির কারণ বলিয়া উল্লেখ করেন।

জিহ্বার লালসে যে ইতি উতি ধায়।

শিম্বোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২২৭)

বৈরাগী হঞ করে জিহ্বার লালস।

পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২২৫)

‘জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ’ না হইয়া জিহ্বাবেগের ও উপস্থবেগের দাস হইলে কৃষ্ণভজন হয় না। জড় রসাস্বাদনে জিহ্বা বিপথগামিনী হয়। প্রাপঞ্চিক বুদ্ধির বশে যাহারা কৃষ্ণানুশীলন-রসে বঞ্চিত, তাহারাই অজিতেন্দ্রিয়, কেন না, ইতর ভোগময় জগতে উদ্দাম ইন্দ্রিয়গণ প্রবল হইয়া রুচিবশে রূপরসাদি গ্রহণ করে এবং ভালমন্দ ভোজনচেষ্টায় শিম্বোদরপরায়ণ হইয়া পড়ে। শ্রীভাগবত (৭।১৫।১৮) “ওপস্থজৈহ্ম কাপর্ণ্যাদগৃহপালায়তে জনঃ” শ্লোকে যাহারা উপস্থ ও জিহ্বাসুখের জন্য লালায়িত, তাহারা দীনভাবাপন্ন হইয়া কুকুরের ন্যায় দশা প্রাপ্ত হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মৎস্য আমিষের লোভে আমিষলিপ্ত বড়িশের সন্ধান না পাইয়া যেক্রপ ঐ আমিষ ভোজনে মৃত্যুলাভ করে, তদ্রূপ কৃষ্ণবহির্মুখগণ জড় পরিণামদর্শনে অসমর্থ হইয়া প্রাকৃত রসাসক্তিতে সংসার লাভ করিতে বাধ্য হয়। জিহ্বাবেগ সর্বাপেক্ষা প্রবল ও ভক্তিপ্রতিবন্ধক।

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।

ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্বং জিতে রসে। (ভাঃ ১১।৮।২১)

“যে-কাল পর্য্যন্ত রসেন্দ্রিয়কে জয় না করিতে পারা যায়, সে-কাল পর্য্যন্ত সবেন্দ্রিয় জয় করিয়াও পুরুষ জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না, রসনা জয় হইলে সকল জয় হয়।”

প্রেয়োপন্থী জীব জিহ্বাদ্বারা স্বীয় প্রিয়ানুভূতি সাধন করে। যদি জিহ্বার প্রিয়বস্তু হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, তাহা হইলে জিহ্বোপভোগ্য প্রিয়দ্রব্য না পাইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। ষড়্রসসেবন স্থূলভাবে জিহ্বার কার্য্য। মধুর-অম্ল-কটু-লবণ-কষায়-তিক্তভেদে ষড়্বিধ রসের ভোগলালসাকে জিহ্বাবেগ বলা হয়। শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ জিহ্বাবেগের একটী সুন্দর তালিকা প্রকাশ করিতে গিয়া ‘অনুবৃন্তি’তে লিখিয়াছেন,—“ষড়্রসের কোন রস লালসায় উত্তেজিত হইয়া সকলপ্রকার পশু মাংস, মৎস্য, কর্কট, ডিম্ব, শুক্রশোণিত-জাত শবশ্রেণীস্থ অমেধ্যদ্রব্য, বর্দ্ধনশীল উদ্ভিদ, লতা ও শাক, গব্যপ্রকার ভেদ প্রভৃতি গ্রহণ করিবার লালসাই জিহ্বার চেষ্টা। অতিরিক্ত লক্ষা ও অল্প সাধুগণ পরিত্যাগ করেন। হরিতকী, সুপারী প্রভৃতি তাম্বুলোপকরণ, তাম্বুল, ধূমপান, গঞ্জিকাদি উৎকট ধূমপান, অহিফেন, মদ্য প্রভৃতি মাদকদ্রব্য-সেবন জিহ্বাবেগের অন্তর্ভুক্ত। ভগবানের উচ্ছিষ্টাদি গ্রহণপূর্ব্বক শুদ্ধজীব জিহ্বাবেগের হস্ত হইতে পরিব্রাজ্য লাভ করেন। ভগবন্মৈবেদ্য পরমাস্বাদকর হইলেও উহা প্রসাদভোজীর নিকট জিহ্বাবেগ নহে, পরন্তু ভগবানের বিলাস-সহচর উত্তম সুস্বাদু দ্রব্যসমূহ নিজজড়ভোগ-বাসনার উদ্দেশ্যে প্রসাদের ছলনায় গ্রহণ করিবার চাতুরী উপস্থিত হইলে উহাও জিহ্বাবেগের অন্তর্গত। জিহ্বাবেগ বর্দ্ধন করিতে হইলে নানাপ্রকার অসচেষ্টা ও অসৎসঙ্গ ঘটিবার সম্ভাবনা।”

জিহ্বার দুইটা কার্য্য—বাক্য উচ্চারণ ও রসাস্বাদন। ইতর কথা উচ্চারণ ও ইতর রসাস্বাদনে জিহ্বার বেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণেরও বেগ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু জিহ্বাদ্বারা শ্রীভগবানের নাম-সর্কীর্ভনে এবং ভগবৎপ্রসাদ-সেবনে জিহ্বাসহ সকল ইন্দ্রিয় বিজিত হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—“তদর্পিতে মহাপ্রসাদান্নে রসনাং জিহ্বাম্।” এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

শরীর অবিদ্যা-জাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল, জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।

তার মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুম্মতি, তা’কে জেতা কঠিন সংসারে।।

কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়, স্বপ্রসাদ-অন্ন দিলা ভাই।

সেই অন্নামৃত খাও, রাধাকৃষ্ণগুণ গাও, প্রেমে ডাক চৈতন্য-নিতাই।।

উদরের বেগ বলিতে আমরা সাধারণতঃ অত্যন্ত ভোজনপ্রয়াসকেই বুঝিয়া থাকি। বেশীরভাগ সময়ই উদরবেগ জিহ্বাবেগেরই সহচর হিসাবে কার্য্য করিয়া থাকে। উদরবেগগ্রস্ত ব্যক্তি অধিকাংশ সময়ে রোগবিশিষ্ট হইয়া থাকে। অতিভোজী উপস্থবেগের দাস। অধিক ভোজনচেষ্টা করিতে গেলে নানাপ্রকার সাংসারিক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। কৃষ্ণপ্রসাদসেবা ও কৃষ্ণব্রত একাদশ্যাদি-পালনে ও কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তিতে উদরবেগ নিবৃত্ত হয়।

ভগবৎপ্রতীতির অভাবে জীবের ভোগবাসনার উদয় হয়। তখন পুরুষগণ স্ত্রীগণের ভোক্তা, রমণ, রতিপ্রদ, বিস্তপদ প্রভৃতি অভিমান করে এবং স্ত্রীগণও আপনাদিগকে পুরুষগণের ভোগ্যা, রমণী, বিস্তভোগিনী প্রভৃতি অভিমানে মত্ত হয়। ভগবৎসেবাবিমুখ

কামলম্পট বদ্ধজীবগণের ইন্দ্রিয়াশক্তি এরূপ প্রবল যে, তাহারা বিহারার্থ স্ত্রীগণের ক্রীড়ামৃগতুল্য হইয়া পড়ে এবং তাহাদের সেবায় চিরকাল নিযুক্ত থাকে। সর্বদাই আপনাদিককে স্ত্রী-বাধ্য জ্ঞান করে। অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ দৈবমায়ারচিত্তা কামিনীকে দর্শন করিয়া তদীয় হাব-ভাবাদি বিলাসচেষ্টায় প্রলুব্ধ হইয়া অগ্নিমুখে প্রধাবিত পতঙ্গের ন্যায় ঘোর নরকে পতিত হইয়া দুঃখভোগ করে। উপস্থবেগের জন্যই পুরুষের এতই বিপত্তি। উপস্থবেগ ভক্তিসাধনে সাধকের প্রধান অন্তরায়। উপস্থবেগ বলিতে স্ত্রী-পুরুষ সংযোগ-লালসাকে বুঝায়, যাহার দ্বারা নিয়ত মন অসদ্বিশয়ে প্রতিষ্ঠ হয়। উপস্থবেগ সম্বন্ধে জগদগুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ ‘অনুবৃতি’তে লিখিয়াছেন,—“উপস্থবেগ দ্বিবিধ—বৈধ ও অবৈধ। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শাস্ত্রীয় বিধানমতে নিশিচর্য্যাপালনপর হইয়া গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম রক্ষা করিয়া বৈধচেষ্টায় উপস্থবেগ সংযত করেন। অবৈধ উপস্থবেগ নানাবিধ। শাস্ত্রীয় সমাজবিধি ত্যাগ করিয়া পরস্ত্রীগ্রহণ, অষ্টপ্রকার ইন্দ্রিয়সুখ-পিপাসা, কৃত্রিম মিথ্যাচার, অবৈধ উপায়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থতা।” গৃহস্থ ও উদাসীন উভয়েরই জিহ্বা, উদর ও উপস্থবেগের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া অবশ্যই কর্তব্য। গৌরপার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত তৎকৃত ‘প্রেমবিবর্ত্তে’ ইহা আমাদিককে বিশেষভাবে জানাইয়াছেন।

ভক্তি অনুশীলন-সময়ে ষড়্বেগ আসিয়া অপেক্ষ সাধকের সাধনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সেই সময় ভক্ত অনন্যশরণাগতিদ্বারা শুদ্ধভক্তসঙ্গ প্রভাবে এবং শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় এই প্রতিবন্ধকতাও দূর করিতে সমর্থ হন। ভক্তগণ শুদ্ধবৈরাগ্যের অধিকারী নন বলিয়া তাহারা বিষয়কে ত্যাগ না করিয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করেন। ষড়্বেগজয়ী আত্মানুগত ব্যক্তি পৃথ্বীজয়ী হন—ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। বিধিপথে সাধনভক্তির প্রভাবে ভাবরাজ্যে উপনীত হইলে অনর্থ-নিবৃত্তিক্রমে রুচিপ্রধান পথের পথিক হওয়া যায়। তখন বাগ্বেগ এবং জিহ্বা, উদর ও উপস্থ প্রভৃতি কায়িকবেগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া জীব জড়প্রীতি ও জড়বিরাগরূপ মানসবেগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। কায়, মন ও বাক্যের বেগ প্রশমিত হইলে জীবের সকল অনর্থ দূরীভূত হয়। কৃষ্ণসেবায় রুচি-প্রভাবেই উহা সম্ভবপর।

—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

## ভক্তির লক্ষণ

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৪০০ পৃষ্ঠার পর ]

নারদভক্তিসূত্রের ভক্তির লক্ষণ যথা,—

‘সা কন্মৈ পরমপ্রেমরূপা’—সেই ভক্তি কাহারও প্রতি পরম প্রেমস্বরূপ। শাণ্ডিল্য সূত্রের লক্ষণ—‘যথা সা পরানুরক্তিরীশ্বরে’ (২য় সৃঃ)। দ্বৈশ্বরে পরা আনুরক্তিই ভক্তি।

শ্রীগোস্বামিপাদ স্বীয় ভক্তিলক্ষণ নির্দ্ধারিত করিয়াই প্রমাণস্বরূপ নারদপঞ্চরাত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরহেন নির্মলম্।

হৃষীকেশ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরূচ্যতে।। (নারদপঞ্চরাত্র)

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশের সেবনকেই ‘ভক্তি’ বলে। সেই সেবন সকল উপাধি হইতে বিনির্মুক্ত, ভগবৎপরায়ণতায়ুক্ত এবং নির্মল।

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তম।

সালোক্য-সান্ধি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।।

দীয়মানং ন গৃহুস্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।

স এব ভক্তিয়োগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ ॥ (ভাঃ ৩।২৯।১৩-১৪)

অর্থাৎ পুরুষোত্তমে যে ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা এবং যে ভক্তিতে ভক্তজন, সালোক্য, সান্ধি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং একত্ব দান করিলেও আমার সেবা ব্যতিরেকে উহাদের কোনটিই গ্রহণ করে না। তাহাই আত্যন্তিক ভক্তিয়োগ নামে উদাহৃত হয়।

এক্ষণে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ভক্তিলক্ষণের প্রত্যেকটি পদের সহিত এই সকল লক্ষণ মিলাইয়া দেখা যাউক।

নারদ ও শাণ্ডিল্য সূত্রে এই বিশেষণ স্পষ্টীকৃত হয় নাই। অন্যান্যভিলাষ-বর্জিত বুঝাইবার নিমিত্ত পঞ্চরাত্রে ‘সর্বোপাধিবিনির্মুক্তম্’ এবং ভাগবতে ‘অহৈতুকী’ বিশেষণ-দ্বয় প্রযুক্ত হইয়াছে। স্বতন্ত্রপ্রবৃত্ত হইয়া সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদান করিলেও ভক্তগণ ভগবৎসেবা ছাড়িয়া তাহা গ্রহণ করেন না। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তির অন্যান্যভিলাষশূন্যতা এবং মোক্ষলঘুকৃৎস্বের চরম উদাহরণ দিয়াছেন। ‘জ্ঞানকর্মান্যনাবৃত্তম্’ নারদভক্তিসূত্রে জ্ঞান কর্মান্দি হইতে ভক্তির প্রাধান্য কথিত হইয়াছে, যথা,—“স তু কৰ্মজ্ঞান-যোগেভ্যোহপ্যধিকতরা।” (৪র্থ অনুবাদ)। ভক্তি কৰ্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতে ও অধিক।

শাণ্ডিল্যসূত্রে ও তদনুরূপ প্রাধান্য নিম্নলিখিত সূত্রগুলিতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।—

জ্ঞানমিতি চেম দ্বিষতোহপি জ্ঞানস্য তদসংস্থিতে । ৪।

তয়োপক্ষয়াচ্চ । ৫।

তদেব কৰ্ম্ম-জ্ঞানি-যোগিভ্য আধিক্যশব্দাৎ । ২২।

অর্থাৎ ভক্তি জ্ঞান নহে, কারণ দ্বৈষযুক্ত ব্যক্তির জ্ঞানে ভক্তি সম্ভাবনা নাই এবং ভক্তির দ্বারা জ্ঞান ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ৪-৫।

শাস্ত্রে ভক্তকে কৰ্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। ২২।

উভয় সূত্রেই জ্ঞান, কৰ্ম্ম ও যোগ হইতে ভক্তির প্রাধান্য প্রতিপাদিত হইলেও ভক্তি যে জ্ঞান-কৰ্ম্মাদি আবরণ হইতে সম্পূর্ণ অনাবৃত্ত হওয়া আবশ্যিক তাহা স্পষ্টীকৃত করা হয় নাই। বক্ষ্যমাণ লক্ষণ বুঝাইবার নিমিত্ত নারদপঞ্চরাত্রে ‘নির্মলম্’ এবং শ্রীমদ্ভাগবতে ‘অব্যবহিতা’—এই দুই বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু উভয়ই অস্পষ্ট। কিকি বিজাতীয় ভাবদ্বারা ভক্তি মলিনতাপ্রাপ্ত ও ব্যবহিত হইতে পারে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

‘আনুকূল্যেন’ :—শাণ্ডিল্যসূত্রে এই ভাব স্পষ্ট লক্ষিত হইয়াছে, যথা—“দ্বৈষ-প্রতিপক্ষভাবে রসশব্দাচ্চ রাগঃ।” ৬।—ভক্তি দ্বৈষের প্রতিপক্ষভাব। শ্রুতিতে ইহাকে রস শব্দে উল্লিখিত করায় ইহা অনুরাগ।

নারদপঞ্চরাত্রের ‘তৎপরত্বেন’-শব্দ আনুকূল্যভাবদ্যোতক, কিন্তু নারদসূত্রে ও শ্রীমদ্ভাগবতে যথাক্রমে পরম ‘প্রেম ও ভক্তি’—এই পদদ্বয়ের অর্থ নিহিত অনুকূলভাব পরিস্ফুট করা হয় নাই।

‘কৃষ্ণানুশীলন’ :—অনুশীলন—নারদ ও শাণ্ডিল্যসূত্রে অনুশীলনরূপ কার্যাত্মক চেষ্টার কোন উল্লেখ নাই, কেবল কারণাত্মক ভাবরূপ ‘পরমপ্রেম’ ও ‘পরানুরক্তি’রই অবতারণা করা হইয়াছে। ভক্তিসিদ্ধান্তে প্রেম ও রাগ পারিভাষিক শব্দ। সাধন ও সাধ্য-ভেদে ভক্তি দ্বিবিধ। সাধনভক্তি আবার দুই প্রকার :—বৈধী ও রাগানুগ। সাধ্যভক্তিও ভাব ও প্রেম-ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে প্রেমই ভক্তির পরাকাষ্ঠা, প্রেমের অঙ্কুরাবস্থাকে ভাব বলে। নারদভক্তিসূত্রে কেবল পরমপ্রেমকেই ভক্তিস্থানীয় করায় অন্যান্য নিম্নসোপানগুলি উপেক্ষিত হইয়াছে এবং শাণ্ডিল্যসূত্রে অনুরাগ বা রাগানুগার সহিত ভক্তির সমীকরণ করায় কেবলমাত্র ভক্তির একদেশ গ্রহণ করা হইয়াছে। উভয় সূত্রেরই ভক্তিলক্ষণে ভক্তি-শব্দের তাৎপর্য ক্ষুণ্ণ ও সঙ্গীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের ‘সেবন’-শব্দে অভিধাবৃত্তির দ্বারা অপ্রাকৃত দেহাদিব্যাপার রূপ সেবার কথাই আসিয়া পড়ে। নারদ পঞ্চরাত্র ত’ স্পষ্টই বলিতেছেন,—‘অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেবা।’ নারদপঞ্চরাত্রে ও শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত ভক্তিই ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে স্পষ্টই অভিহিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ-ভক্তির পূর্ণ লক্ষণে ভক্তির আলম্বনস্বরূপ উপাস্য ইষ্টদেবের উল্লেখ না থাকিলে সে লক্ষণ নির্দোষ হইতে পারে না। নারদসূত্রের অনির্দিষ্ট “কস্মৈ” \* শব্দে হৃদয়ের কোন তারে আঘাতপড়ে না, কোন সুকুমারবৃত্তি স্পন্দিত ও উদ্দীপিত হইয়া উঠে না। শাণ্ডিল্যসূত্রের “ঈশ্বর শব্দ” হইতে নারদ পঞ্চরাত্রের “হৃষীকেশ” শব্দ; শ্রীমদ্ভাগবতের “পুরুষোত্তম” শব্দ এবং গোস্বামিপাদের “কৃষ্ণ” শব্দ অধিকতর উপাদেয় ও পূর্ণতাব্যঞ্জক। শ্রীকৃষ্ণই ভক্তির শ্রেষ্ঠ আলম্বন। আকর্ষণার্থক কৃষ্ণ-ধাতু হইতে কৃষ্ণ- শব্দের ব্যুৎপত্তি। তিনি প্রেমময়, মহাপ্রেমে আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত সকলকেই আকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীবিষ্মমঙ্গল বলিয়াছেন,—“সম্ভাবতার্য বহবঃ পুঙ্করনাভস্য সর্বতোভদ্রাঃ। কৃষ্ণদন্যঃ কো বা লতাং পৈ প্রেমদো ভবতি।।”—অর্থাৎ পদ্মনাভের সর্বমঙ্গলপ্রদ বিবিধ অবতার থাকুন কিন্তু কৃষ্ণ ভিন্ন এমন কেই বা আছেন, যিনি লতাপর্য্যন্তকেও প্রেমদান করিয়া থাকেন।

ভক্তির আলম্বন প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগের প্রথমা লহরীতে শ্রীপাদ গোস্বামী বলিয়াছেন,—“নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্। যত্র নিত্যতয়া সর্বৈ বিরাজন্তে মহাশুভাঃ।।”

তিনি ষড়ৈশ্বর্যশালী পূর্ণ ভগবান্। তিনিই সর্বকারণ এবং পরমতত্ত্ব।

বংশীবীভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ পীতাম্বরাদরূপবিস্বফলাধরৌষ্ঠাৎ।

পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে।।

মাধুর্য্যের দিক দিয়া দেখিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ অশেষ মাধুর্য্যের আকর।

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।

মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।।

\* কোন কোন সংস্করণে “কস্মৈ” শব্দের পরিবর্তে “তস্মিন্” পাঠ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাতেও এই অসম্পূর্ণতাদোষের খণ্ডন হয় না।

শ্রীপাদ গোস্বামীর ভক্তিলক্ষণ যে অন্যান্য লক্ষণ অপেক্ষা পূর্ণতর এবং অধিকতর মাধুর্যাগুণ-সমন্বিত এই পর্যালোচনায় তাহাই দেখাইবার কথঞ্চিৎ প্রয়াস পাইয়াছি। এইরূপে যত নিষ্পেষণ করা যাইবে, দেখা যাইবে, গোস্বামিপাদের লক্ষণে ততই মাধুর্য্য অধিক। ভক্তিতত্ত্বের অপরূপ রহস্য একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠুপ্ শ্লোকে নিহিত করিবার সামর্থ্য শুধু অমানুষী প্রতিভার কার্য্য নহে, ইহা একমাত্র ভগবৎ-প্রেরণাতেই সম্ভব।

পূজ্যপাদ ভক্ত্যাচার্য্যগণের কৃত ভক্তিলক্ষণসমূহের তুলনায় সমালোচনারূপ গুরুতর কার্য্য নির্দোষভাবে সংসাধন করার সামর্থ্য আমার নাই। ভক্তগণ আমার অসংখ্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

—শ্রীঅম্বুজাম্ফ সরকার

## ভক্তের ভগবান্

শ্রীধর

নিত্যকাল ধরিয়া শ্রীভগবান্ ভক্তসঙ্গে নানারঙ্গে লীলা করিয়া থাকেন। কেন করিয়া থাকেন তাহার উত্তর নাই। তবে এই লীলাই তাঁহার আনন্দসার। ইহাতে তাঁহার মাধুর্য্যের মধুরবিকাশ। ভক্তও শ্রীভগবানের সেবাসুখে আত্মহারা। ভক্ত জানেন—ভগবান্ তাঁহারই, শ্রীভগবান্ দেখেন তিনি ভক্তের হৃদয়েই চিরদিন বাঁধা।

যথা ঃ—“ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।

গোবিন্দ কহেন,—মম বৈষ্ণব-পরায়ণ॥”

শ্রীভগবান্ নিজ ভক্তের সমুদয় বোঝা নিজেই বহন করিয়া থাকেন। তিনি শ্রীগীতোপনিষদে বলিয়াছেন,—

“অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥”

নিত্যসিদ্ধ প্রভুপরিকর শ্রীধর পসারির অবস্থা অতি হীন ছিল। নবদ্বীপের বাজারে তিনি প্রত্যহ খোড়, মোচা, কলা ও পাতা বিক্রয় করতেন। শ্রীধরের বসতবাটি নবদ্বীপের শঙ্খবণিক পল্লীর দক্ষিণে ছিল। ঐরূপ সামান্য খোড় মোচা ইত্যাদি বেচিয়া যাহা সামান্য আয় হইত তদ্বারা অতি সামান্যভাবে শ্রীধরের শ্রীভগবানের সেবাকার্য্য চলিত। তাঁহার স্বভাবটা অতিশয় বিনয়ী ছিল। কিছু উদ্ধৃত হইলে তদ্বারা নিষ্কপটে সাধু-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করিতেন। বিষ্ণুসেবায় তাঁহার পরম আনন্দ ছিল। স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া তিনি ঠাকুরের ভোগ লাগাইতেন, তৎপর শ্রীগোবিন্দের প্রসাদ-অন্নদ্বারা শ্রীগঙ্গা, তুলসী ও অন্যান্য দেবতাকে নিবেদন করিতেন। শ্রীধরের বয়স যখন যৌবনের শেষসীমায় নীত, তখন শ্রীল গৌরসুন্দর প্রকট হইলেন। বহু পূর্বেই শ্রীধর-গৃহিণী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। কোন সন্তানসন্ততিও রাখিয়া যান নাই। পরম বৈষ্ণব শ্রীধরের মুখে দিব্যানিশি উচ্চৈঃস্বরে পরম পুলকে কৃষ্ণনাম স্মৃতি পাইতেন। পাড়ার অনেক ভব্যলোক ইহাতে অতিশয় বিরক্ত হইয়া অনেক সময় শ্রীধরের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিতেন, কিন্তু তাহাতে স্ফটিক প্রস্তরের

উপর বারিবর্ষণের ন্যায় কৃষ্ণনাম-পান-প্রফুল্ল সদা কৃষ্ণৈকশরণ, সদা হাস্যময় শ্রীধরের কিছুই করিতে পারিত না।

শ্রীগৌরসুন্দর যৌবনলীলায় এই শ্রীধরের দিকে আকৃষ্ট হইলেন। শ্রীধর নবদ্বীপের বৃহৎ বাজারের এক কোণে পাতা, মোচা, খোড় ইত্যাদি লইয়া বসিতেন। ভক্তহৃদিরঞ্জন শ্রীনবদ্বীপ ইন্দু শ্রীনিমাই পণ্ডিতও প্রত্যহ বিষুণৈবেদ্য সংগ্রহ জন্য বাজারে গিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া শ্রীধর পসারির দোকানে আসিয়া উপস্থিত। শুধু তাহাই নয়, শ্রীধর যে দ্রব্যের যে দাম বলিতেন প্রভু অতি গম্ভীরভাবে তাহার অর্ধেক বলিয়া অমনি ঝুড়িতে উঠাইতেন। তখন শ্রীধর অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া কখনও বা মিনতি করিয়া বলিতেন,—“ঠাকুর, আমি তোমার কাছে লাভ চাই নাই—আমার কেনা মূল্যই বলিয়াছি। অর্ধেক মূল্য দিলে আমার চলিবে কি করিয়া? আমি অতি গরীব আমাকে ঠকাইও না, এই জোড় হাত করিয়া বলিতেছি আমাকে ঠকাইও না।”

শ্রীগৌরসুন্দর ত’ তাহাই চান। ভক্তের এই দীনতা দেখিতেই তাঁহার বড় আনন্দ, তাই তিনি হাসিয়া বলিতেন,—“তুমি ঠকিলে, না আমি ঠকিলাম শ্রীধর!” নিমাই পণ্ডিতের ভয়ে শ্রীধর প্রত্যহ বাজারের একস্থানে বসিতেন না, স্থান পরিবর্তন করিতেন। কিন্তু তাহাতে কি প্রভুর হাত হইতে নিস্তার আছে। ঠাকুর বাজারে গিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া সর্বত্র সেই শ্রীধরের দোকানে গিয়া উপস্থিত। শ্রীধরের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। “শ্রীধর, তোমার পাতা ফাউ লইলাম” বলিয়া ঠাকুর এক বোঝা পাতা জোর করিয়া উঠাইলেন, শ্রীধর কোপ করিয়া “হাঁ, হাঁ ঠাকুর কর কি, কর কি। ঠাকুর কর কি” বলিয়া কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়া বলিলেন,—“দোহাই ঠাকুর! কাড়াকাড়ি করিও না। তোমার পায়ে ধরি—অন্য দোকানে যাও। আমার ঘরের জিনিষ নয়, কেনা পাতা ফাউ দিতে পারিব না। প্রত্যহ অমন করিলে মাতা ঠাকুরাণীকে (শ্রীশচীদেবীকে) বলিয়া আসিব।”

প্রভুও ছাড়িবার পাত্র নহেন—হাসিয়া বলিলেন,—শ্রীধর আমার হাতের জিনিষ কাড়িবার সাহস কর? জাননা আমি কে? আমি ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত। কিন্তু হয়! প্রভুর ঐশ্বর্য দেখিয়া—তাঁহার সদাফুল্লবদনের প্রকটিকটলি কটাক্ষপাতে ভক্তেরা ত’ ভোলেন না। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সমগ্র বীৰ্য্য, ঐশ্বর্য, যশ ও শ্রী লইয়া শ্রীব্রজধামের এক প্রাণীকেও ভুলাইতে পারেন নাই। রাখাল বালকেরা পরমানন্দে ভাই কানাইকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইয়াছেন, কাঁধে চড়িয়া গোষ্ঠলীলা করিয়াছেন। শ্রীযশোদার হস্তে বন্ধনদশায় পতিত হইয়াছেন, আর নিত্যসিদ্ধদেহ ব্রজগোপীকাগণের ত’ কথাই নাই, তাই না ভক্ত বলিয়া থাকেন,—“মারবি রাখবি—যো ইচ্ছা তোহারা। নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকার।।”

তাই শ্রীধর বলিলেন,—“ঠাকুর! আমি তোমার ঠাকুরালী সব জানি।” প্রভু তখন ঐশ্বর্য রাখিয়া সরল হইয়া নিম্নস্বরে বলিলেন,—“শ্রীধর, তুমি ত’ তোমার ইষ্টদেবপ্রসাদ বিনামূল্যে শ্রীগঙ্গা-তুলসী প্রভৃতি দেবী ও দেবতাকে দাও। আমি তাহাদের স্বামী, আমাকে বিনামূল্যে দাও না কেন? তোমার জিনিষ না হইলে আমার ভোজন-তৃপ্তি নাই।” এখানে ভক্ত শ্রীধর সম্পূর্ণ পরাজিত আর তাঁহার কথাটা বলিবার উপায় নাই। তিনি ত’ গলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার স্বতন্ত্রতা নাই। ভক্ত শুনিয়া সুখী—শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন,—



“তোমার জিনিষ ভিন্ন আমার তৃপ্তি নাই।” হরি! হরি! এ কি কথা! তিনি আত্মহারা হইয়াছেন,—ভাবিতেছেন আমি তুচ্ছ, আমি হেয়, আমি দীন,—আমার কিছু নাই, আমার জিনিষে তুমি তৃপ্ত! হায়! হায়! এ তৃপ্ত কে? তুমি, না আমি ঠাকুর? আমার অযোগ্যতাকে তুমি এত বড় করিলে! ওগো জানি আমি তোমার কথা—“যেই কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেই কালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম।।”

তাই এইবার শ্রীধর হারিয়া গেলেন। অবিরল অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া করজোড়ে বলিলেন,—“একি কথা ঠাকুর, আমায় ভুলাইও না। আমি হার মানিলাম, আর কোনদিন কাড়াকাড়ি করিও না। তোমার ভোজনের জন্য প্রত্যহ কিছু খোড়, মোচা ও পাতা লইয়া যাইও।” প্রভু তখন আবার হাসিয়া বলিলেন,—“শ্রীধর, তোমার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিতে দিলে না, তবে আর রাখিলে কি!”

মহাভাগ্যবান্ শ্রীধর এইরূপে প্রভুর নিত্য সেবক ও একান্ত প্রিয়পাত্র হইলেন। নিত্যপ্রাণধন শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার হৃদয়কন্দরে স্থায়িত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় শ্রীধর সমস্ত বিষয় শ্রীকৃষ্ণ-সেবার অনুকূল-বোধে শ্রীগোবিন্দ-সেবায় নিয়োগ করিলেন। ইহাকেই যথার্থ যুক্তবৈরাগ্য বলে।—“অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথাহমুপযুক্তঃ। নিব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।।”

বাস্তবিক এ জগতের সমুদায় বস্তুই শ্রীহরিসেবার অনুকূল কিন্তু তাহা আমরা সদৃশ-চরণাশ্রয় ব্যতিরেকে, সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে দেহ-মনের বিচার আনিয়া—বিষয় বলিয়া ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকি।

শ্রীধরের দিন চলিতে লাগিল। প্রত্যহই শ্রীধর শ্রীজীবানের অযাচিত দর্শন পাইতে লাগিলেন। ভক্তের দ্বারা ত’ শ্রীভগবান্ নিত্যকালই বাঁধা, সেই জন্য অন্য কোন প্রয়োজন না থাকিলেও প্রত্যহই একবার করিয়া নিমাই পণ্ডিতকে বাজারে গিয়া শ্রীধরের দোকানে দাঁড়াইতে হইত।

“শ্রীধরের খোড় মোচা কলা পাতে প্রভুর সন্তোষ।”

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস-গৃহে বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া মহাপ্রকাশ হইলেন। মহাপ্রকাশ অর্থ এক, শ্রীগৌরসুন্দর অন্য দিবস অচৈতন্য অবস্থায় ভাব প্রকাশ করিয়া বিষ্ণু-খট্টায় বসিতেন এবং অতি অল্প সময় এই প্রকাশ থাকিত। কিন্তু এদিন আর তাহা নহে। প্রভাতে এক প্রহরের সময় প্রকাশ হইয়া পর দিবস সূর্য্যোদয়-কাল পর্য্যন্ত রহিলেন। সেই জন্য ইহাকে সপ্ত-প্রহর-প্রকাশ বা মহাপ্রকাশ বলে। ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে গাহিয়াছেন,—

“অন্য একদিন প্রভু নাচে দাস্যভাবে। ক্ষণে ঐশ্বর্য্য প্রকাশি’ পুনঃ ভাগে।।

সকল ভক্তের ভাগ্যে এ দিন নাচিতে। উঠিয়া বসিল প্রভু বিষ্ণুর খট্টাতে।।

আর সর্ব্ব দিন প্রভু ভাব প্রকাশিয়া। বৈসেন বিষ্ণুর খট্টা যেন না জানিয়া।

সাত-প্রহরিয়া-ভাবে ছাড়ি’ সর্ব্ব মায়া। বসিল প্রহর সাত প্রভু ব্যক্ত হইয়া।।”

সর্ব্বচিহ্নহারী শ্রীগৌরসুন্দর পরম শোভা ও তেজ বিস্তার করিয়া শ্রীবিষ্ণু-সিংহাসনে উপবিষ্ট, আর ভক্তগণ সম্মুখে বসিয়া অন্তরে বাহিরে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরমানন্দে ভাসিতেছেন।

“পরম-প্রকট-রূপ প্রভুর প্রকাশ!

দেখি পরমানন্দে ডুবিলেন সর্ব দাস।।”

সন্ধ্যায় শ্রীশচীদেবী আরতি করিলেন।

“পঞ্চদীপ জ্বালি তিঁহ আরতি করিল।

নিম্মঞ্জন করি’ শিরে ধান দুর্বা দিল।।”

শ্রীগৌরসুন্দর সকল ভক্তকে কহিলেন,—“শ্রীধরকে লইয়া এস।।” এই শ্রীধর কে? সকলে পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া চাহি করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন,—“শ্রীধর পসারি আমার পরম ভক্ত, প্রত্যহ আমার সুখসেবার জন্য থোড়, মোচা ও কলাপাতা দিয়া থাকে।”

তখন সকলে শ্রীধরের গৃহে ছুটিলেন। গিয়া ডাকিতেছেন,—“শ্রীধর উঠ, তোমাকে ভগবান্ ডাকিতেছেন, শীঘ্র এস।।” রাত্রিকালে শ্রীধর উচ্চৈশ্বরে শ্রীনাম-সংকীৰ্ত্তন করিতেন। প্রথমতঃ কোন উত্তর করিলেন না। তখন ভক্তগণ আরও উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—“শ্রীধর শ্রীশচী-গৰ্ভ-সিন্ধুতে ভগবান্ উদিত হইয়াছেন। শ্রীবাস-আচার্য্য-গৃহে অদ্য প্রকাশিত হইয়া তোমাকে ডাকিতেছেন, শীঘ্র বাহিরে এস।।” শ্রীধর চমকিত হইলেন। স্বয়ং ভগবান্ ডাকিতেছেন। যে অতি চঞ্চল পণ্ডিতটী প্রত্যহ বাজারে আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে তাহার পসারিতে গিয়া থোড়, মোচা, কলাপাতা, যাহা পাইতেন তাহা লইয়াই কাড়াকাড়ি করিতেন। শ্রীগয়াক্ষেত্র হইতে আসিয়া আর তিনি বাজারেও আসেন না বা তাহার দোকানে আর কাড়াকাড়িও করেন না। শ্রীধর আরও শুনিয়াছেন যে, তিনি পরম ভক্ত ও ভব্য হইয়াছেন। আবার ইহাও শুনিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণবস্ত্র। সেই কৃষ্ণ তাহাকে ডাকিতেছেন, তাহাও আবার কোথায়? বিদ্বজ্জন পরিপূর্ণ শ্রীবাস আচার্য্যের গৃহে। তৎকালীন নবদ্বীপসমাজে শ্রীধরের ন্যায় মুর্থ ও নীচ ব্যক্তির সেখানে কি স্থান হইতে পারে? যেখানে শ্রীমদু অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস, নরহরি, পুরুষোত্তম আচার্য্য, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, সারঙ্গ দেব প্রভৃতি বহু কৃতবিদ্যভক্ত বিরাজমান সেখানে শ্রীধর স্থান পাইবে কোন্ সাহসে? শ্রীধর ভীত হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন, আবার প্রভু ডাকিতেছেন—এই আনন্দের আতিশয্যে শ্রীধর মুচ্ছা গেলেন। তখন ভক্তগণ করেন কি? বিলম্বের সময় নাই দেখিয়া শ্রীধরের মুচ্ছিত দেহই ধরাধরি করিয়া প্রভুসমীপে উপস্থিত হইলেন।

প্রভু ডাকিতেছেন,—“শ্রীধর উঠ, দেখ আমি কে?” সে স্নেহমধুর কণ্ঠের ডাক শুনিয়া শ্রীধর চক্ষু উন্মীলন করিলেন। দেখিলেন, সেই চঞ্চল নিমাই পণ্ডিতই বটে, যিনি প্রত্যহ কোন্দল করিয়া থোড়, মোচা, কলাপাতা কাড়িয়া লইয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে আবার সেই চঞ্চল নিমাই পণ্ডিত পরমরমণীয় রসিকশেখর, ব্রজেশ-তনয় হইলেন। শ্রীধর দেখিলেন—কত শত ব্রহ্মা, কত শত শিব, কত শত ইন্দ্র, কত বায়ু, কত বরুণ, কত যম, কত চন্দ্র, কত সূর্য্য, কত অগণিত ঋষি, কত ভক্ত তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ঘোড়করে স্তব করিতেছেন। শ্রীধর এই দৃশ্য দেখিয়া আবার বাহ্য হারাইবার উপক্রম করিলে শ্রীভগবান্ বলিলেন,—“শ্রীধর ভীত হইও না—এই আমার মূর্ত্তি। আমার দর্শন নিম্বল নহে। তুমি ধন জন অন্য যাহা কিছু ইচ্ছা কর, আমার নিকট বর মাগ, তোমার দুঃখ রহিবে না।”

অশ্রুধারায় বক্ষঃ প্রাবিত করিয়া শ্রীধর কহিলেন,—“প্রভু আমি অতি মূর্খ, অধম, দীন, তোমার সঙ্গে কেমন করিয়া কথা কহিতে হয় জানি না, আমার দোষ লইও না। তোমার ত’ দোষ নাই, তুমি ত’ প্রত্যহই আমার কাছে তোমার পরিচয় দিয়াছ, বলিয়াছ তুমি তুলসীর স্বামী, গঙ্গার প্রভু, আমাকে দাও না কেন? আমি নিজ-দোষে নিজেই ফাঁকিতে পড়িয়াছি। তখন আমি চিনি নাই।” প্রভু করুণায় বিগলিত হইয়া বলিলেন,—“শ্রীধর তাহাতে দোষ কি? তুমি আমাকে চেন নাই—আমি কিন্তু ত্রৈলোক্যকে বরাবরই চিনি।” শ্রীধর গদগদ-কণ্ঠে বলিলেন,—“আমার খোলা বেচা সার্থক হইল। আমি থোড় কলাপাতা দিয়া তোমার অভয় চরণ দর্শন পাইলাম।”

তখন প্রভু হাসিয়া বলিলেন,—“শ্রীধর তোমার থোড় পাতা ত’ আমিই’ কাড়িয়া লইয়াছি। আমি জানি ইহাতে আমার নিত্যকাল অধিকার আছে এবং সেই অধিকার-বলেই আমি ভক্তদ্রব্য ঐরূপে জোর করিয়া লইয়া থাকি। এখন শোন—আর তোমাকে থোড়, মোচা বেচিতে হইবে না। আজ তোমাকে অষ্টসিদ্ধি দিতেছি। ইহাতে তোমার দারিদ্র্য ঘুচিবে।”

ভগবৎপ্রসাদে তখন শ্রীধরের কণ্ঠে তখন স্বয়ং সরস্বতী বিরাজমানা। তিনি বলিতেছেন,—“সিদ্ধাই লইয়া আমি কি করিব? আমি মহাজন পাইয়াছি, তুচ্ছ সিদ্ধাই লইব কেন?”

প্রভু কহিলেন,—“বেশ, তবে তোমার ধনৈশ্বর্য্য হোক, বেশ সুখে থাকিবে, কেমন?”

শ্রীধর উত্তর করিলেন,—“ঐশ্বর্য্য আমার বাঞ্ছনীয় নহে, তুমি ত’ সকল ধন হইতে প্রিয়।”

প্রভু—“তবে তুমি উত্তম স্ত্রী-পুত্র প্রার্থনা কর। সুখে সংসার করিবে, বংশ থাকিবে, এই সংসারে ইহাই ত’ সকলে কামনা করে।”

শ্রীধর হাসিয়া বলিলেন,—“আমি অমৃতসাগরে আসিয়া বিষ খাইব কি দুঃখে বল দেখি? ঠাকুর তুমি ত’ পুত্র হইতেও প্রিয়।”

প্রভু—“তবে রাজ্য লও। এক দেশের রাজা হও।”

শ্রীধর—“আমি প্রভুত্ব লইয়া কি করিব? নির্ভয় দাসানুদাসের প্রভুত্বে কী প্রয়োজন? প্রভুত্ব আমার সাজে না। কেন তুমি না বলিয়াছ,—‘আমি—বিজ্ঞ, সেই মূর্খে বিষয় কেনে দিব। স্ব-চরণামৃত দিয়া ‘বিষয়’ ভুলাইব।’ তবে আবার ওসব কি বলিতেছ?”

প্রভু—“তবে পরকালে অক্ষয় স্বর্গ, মুক্তি ইচ্ছা কর?”

শ্রীধর—“দোঁহায় ঠাকুর, তোমার ঠাকুরালি রাখ। আর কামনার ইন্ধন যোগাইবার ইচ্ছা নাই। আমি ত’ স্পষ্টই বলিতেছি, তোমার কাছে আমার আত্মেন্দ্রিয়প্রীতির জন্য প্রার্থনার কিছু নাই।”

তখন ঠাকুর কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—“শ্রীধর, আমার দর্শন বৃথা হইবার নয়, তোমাকে বর প্রার্থনা করিতেই হইবে।”

শ্রীধর বলিলেন,—“আমার ত’ কোন বরের আবশ্যক দেখি না, তবে পূর্বের মত যদি জোর করিয়া দাও তবে আর কি করিতে পারি। আজ আমাকে এই বর দাও যে, এককালে যে চঞ্চল প্রভূত শক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ আমার সহিত কোন্দল ও জোর করিয়া

থোড়, মোচা কাড়িয়া লইতেন, আজ আবার যিনি স্বয়ং প্রকটিত হইয়া সর্বসমক্ষে আমাকে নানা প্রলোভনে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তিনি যেন সেই চঞ্চলতা ও প্রলোভন দেখান পরিত্যাগ করিয়া এই অতি মুর্থ শ্রীধরের হৃদয়ে অচলভাবে তাঁহার রাতুল চরণপদ্ম স্থাপন করেন।”

ভক্তগণ এতক্ষণ শ্রীধর ও ভগবানের সমস্ত কথাই শুনিয়াছিলেন, এখন আবার শ্রীধরের এই প্রার্থনা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। সকলে শ্রীধরকে ধন্য ধন্য করিয়া মহানন্দে হরিধ্বনি করিলেন।

তখন আবার শ্রীভগবান্ কহিলেন,—“শ্রীধর তুমি বড়ই দরিদ্র, হেয়। আমি একে একে তোমাকে অষ্টসিদ্ধাই ধর্ম, অর্থ, মনোজ্ঞ স্ত্রী, পুত্র, অক্ষয় স্বর্গ ইত্যাদি দিতে চাহিলাম, তুমি কিছুই লইলে না। তুমি যে এসব কিছুই চাহ না তাহা আমি বিশেষ জানি। তবুও নিকাম, আমাতে সতত পরমপ্রীতিযুক্ত ভক্তের মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্যই তোমাকে এই প্রলোভনসমূহ দেখাইলাম। এখন আমি তোমার বাঞ্ছিত বর দিতেছি—তুমি আমার নিত্যদাস আমাতে তোমার প্রেম হউক।”

শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত এই বাক্য শ্রবণমাত্রই শ্রীধর ‘ধন্য হইলাম ! ধন্য হইলাম !’ বলিয়া ভূমিতে পড়িয়া মূর্ছিত হইলেন।

কাজীদলন-দিবসে কাজী উদ্ধার করিয়া স্বপার্ষদে শ্রীগৌরসুন্দর কীর্তনরঙ্গে চলিয়া তন্তুবায় পল্লী, কংসবণিক পল্লী, শঙ্খবণিকপল্লী অতিক্রম করিয়া শ্রীধরের অতি জীর্ণ কুটীর দ্বারা উপস্থিত হইলেন। দ্বারের সম্মুখেই এক অতি জীর্ণ লৌহপাত্রে জল ছিল। পাত্রের বর্ণনা,—“কত ঠাই তালি তার চোরেও না হরে।”

পিপাসার্ত হইয়া শ্রীগৌরভগবান্ সেই জল পান করিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীধর অতি সঙ্কোচিত হইয়া নিষেধ করিতে করিতে প্রভু সমুদয় জল পান করিলেন। শ্রীধর এই সৌভাগ্য সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্ছিত হইলেন। প্রভু তাঁহার অঙ্গে শ্রীহস্ত দিয়া চেতন করাইয়া বলিলেন,—“প্রভু বলে,—শুদ্ধ মোর আজি কলেবর।।”

“ভক্তি বুঝাইতে সে এমত পাত্রে জল। পরমার্থে বৈষ্ণবের সকল নির্মল।।

নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব। হেন দাস্য-ভাবে কৃষ্ণ কর অনুরাগ।।

অল্প হেন না মানিহ ‘কৃষ্ণদাস’-নাম। অল্প-ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্।।

\* \* \*

মুক্ত হইলে সেই হয় গোবিন্দের দাস।।

‘দাস’-নামে ব্রহ্মা, শিব হরিষ অন্তর।

ধরশ্রীধরেন্দ্র চাহে দাস-অধিকার।।

\* \* \*

উদর-ভরণ লাগি এবে পাপী সব।

লওয়ায় ঈশ্বর ‘আমি’—মূলে জরদাব।।”

—শ্রীকর্ণণাকর ব্রহ্মচারী

## শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতা

[ পূর্বপ্রকাশিত ৪৯শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯৩ পৃষ্ঠার পর ]

“মন পরিচ্ছিন্ন হলেও, তার নিষ্পলতা হলে অথবা ভগবৎপ্রসাদের উদয় হলে মনে ভগবদর্শনজনিত সুখ যে-পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়ে থাকে, সেই পরিমাণ মনও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়ে থাকে। মন ব্যতীত অন্য কোন ইন্দ্রিয়ই বর্দ্ধিত হতে পারে না; কারণ তারা সমস্তই বাহ্য। (অর্থাৎ শুদ্ধ চিত্তের সূক্ষ্ম-রূপতা-হেতু আত্মাকারতা প্রাপ্তির যোগ্যতা আছে। মন দৃশ্য বস্তু-বিষয়ের আকারতা প্রাপ্ত হলেই তদ্বিষয়ে জ্ঞানের উদয় হয়—ইহা প্রসিদ্ধ আছে। অন্য ইন্দ্রিয়গণে তা নেই; যেহেতু তারা বাহ্য, স্থূল ও সীমাবদ্ধ।” কোনটার থেকে কোনটা শ্রেষ্ঠ, গীতার মধ্যে এটুকু দেওয়া আছে মোটামুটি।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাছরিদ্ভিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।

মনসস্ত পরা বুদ্ধির্বুদ্ধ্যেঃ পরতস্তু সঃ ॥

‘ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাছ’—ইন্দ্রিয়ার থেকে শ্রেষ্ঠ কি?—মন। মন কি?—‘মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি’। ‘মনসস্ত পরা বুদ্ধিঃ’—মন থেকে শ্রেষ্ঠ হল ভগবদ্বিষয়িণী বুদ্ধি। ‘বুদ্ধ্যেঃ পরতস্তু সঃ’—বুদ্ধির থেকে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি হলেন ভগবান্। আত্মা, জীবাত্মা পরমাত্মার কৃপা লাভ করবেন। অতএব দেখা যাচ্ছে সবার উপরওয়ালা হলেন ভগবান্। তিনি মূল উপাস্য বস্তু। তাঁকে বাদ দিয়ে আমি সময় নষ্ট করি কেন?

“চাক্ষুষ-দেখা অপেক্ষা মানস-দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেও শ্রীভগবানের সহিত বর-প্রার্থনাদি কথোপকথনের পরমসুখ কেবলমাত্র চাক্ষুষ-দর্শনকালেই হয়ে থাকে। এর উত্তরে আবার বলছেন, ধ্যানের দ্বারা অন্তরে ভগবদর্শন হলে তাও সাক্ষাৎ অর্থাৎ চাক্ষুষ-দর্শনের ন্যায়ই হয়ে থাকে। এবং সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভুও তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে কৃপাবিশেষ বিস্তারপূর্ব্বক জ্ঞানভক্তগণকে বর প্রদানাদি করে থাকেন। তার প্রমাণ স্বয়ং পদ্মজ ব্রহ্মা—পদ্মযোনি ব্রহ্মা।

ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির জন্য ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে সমাধি লাভ করলে ভগবান্ তাঁকে দর্শন দান করেন। ব্রহ্মা তাঁকে নিজ সমাধিযোগে দর্শন করে দণ্ডবৎ-প্রণত হলে স্বয়ং ভগবান্ তাঁর হস্ত ধারণপূর্ব্বক বললেন,—আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছি (সাক্ষাৎ দর্শন দিলেন);—বর প্রার্থনা কর। তৎপর ব্রহ্মা বর প্রার্থনা করে ভগবানের নিকট চতুঃ শ্লোকী ভাগবত লাভ করেন।” এখানে কোন্ ভগবান্? যে ভগবান্ চতুঃ শ্লোকী ভাগবত বলছেন তাঁকে ত’ নারায়ণ বলা বলা হয়েছে। এখানে কোন্ নারায়ণ? নারায়ণ ত’ অনেক। নারায়ণের আবার Portfolio ভাগ করা আছে। যিনি এসে উপদেশ করছেন ব্রহ্মাকে চতুঃ শ্লোকী ভাগবত তিনি কোন্ ভগবান্? কৃষ্ণ স্বয়ং এসে বলছিলেন? কোন্ ভগবান্ হবেন তিনি? তিনি কারণোদশায়ী নারায়ণ, গর্ভোদশায়ী নারায়ণ, না ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ? ব্রহ্মার যে অধিকার সেই অধিকারের নারায়ণ। “এর দ্বারা সমাধিদশায় ভগবদর্শনের পর বর লাভ।” বর লাভ আগে হয়নি, তার জন্য তাঁকে তপস্যা করতে হয়েছে। ‘তপঃ তপঃ’—এই শব্দ উচ্চারিত হয়েছে। তিনি বুঝতে পারছিলেন না ঠাকুর কেন আমাকে সৃষ্টি করলেন। তারপরে

তখন দৈববাণী হল ‘তপঃ তপঃ।’ তুমি তপস্যা কর। দশ হাজার বৎসর তপস্যা করলেন তিনি। অদ্ভুত ব্যাপার। “সম্ভাষণ ও স্পর্শনাদি-রূপ পরম কারুণ্যই সেখানে ব্যক্ত হয়েছে।” আমাকে আগে চেষ্টা করতে হবে। আগেই দর্শন হয়নি, বহু চেষ্টার পর দর্শন লাভ হয়েছে। সর্বশ্রেষ্ঠরূপে প্রার্থনাহেতু সত্যব্রতমুনির প্রার্থনাও যে তাহাই এটা তৎকৃত এই স্তুতি হতে স্পষ্ট প্রতীত হচ্ছে। কি জিনিসটা? তিনি যে মূর্তি দর্শন করতে চাচ্ছেন সে মূর্তিটা হল—“ইদন্তে বপুর্নাথ গোপাল-বালম্”—তোমার এই যে নিত্য বালগোপাল মূর্তি—এটাই আমার নিত্যকাল দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছেন। এই আকাঙ্ক্ষা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি মধুর রসের উপাসক নন। বিশুদ্ধ বাৎসল্যরসের উপাসক। সেজন্য বালগোপাল মূর্তি দর্শন করতে চাচ্ছেন। তবে একথা অস্বীকার করলে হবে না, তিনি কিন্তু তত্ত্বদর্শন জানেন, তিনি তত্ত্বদর্শী। কেন না তত্ত্বজ্ঞান আছে বলে শেষকালে “নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়-প্রিয়ায়ৈ নমোহনন্ত লীলায় দেবায় তুভ্যাম্।” বলতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর চরমতত্ত্ব জানা আছে। তিনি রাধিকাকে দামোদরের সঙ্গে নিতে ভোলেন নি। একজনকে প্রণাম তিনি করেন নি, দুজনকে একসঙ্গে প্রণাম করেছেন। তাঁর তত্ত্বদর্শন জানা আছে, কিন্তু তাঁর সাধন-ভজনের যে অধিকার সেটা ঐ বিশুদ্ধ বাৎসল্যরস পর্য্যন্ত।

ইদন্তে মুখাভোজমব্যক্ত-নীলৈর্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধ-রক্তৈশ্চ গোপ্য।

মুহুশ্চুস্বিতং বিশ্ব-রক্তাধরং মে মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষ-লাভৈঃ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ :—“হে দেব! তোমার মুখপদ্ম অত্যন্ত শ্যামল ও লোহিতাভ-বর্ণযুক্ত কুটিল কেশসমূহদ্বারা আচ্ছাদিত এবং মাতা যশোদাকর্তৃক পুনঃ পুনঃ চুম্বিত; বিশ্বফলের মত রক্তবর্ণ অধরযুক্ত পরম মনোহর সেই বদনকমল আমার হৃদয়ে সর্বদা প্রকাশিত থাকুক। অপর লক্ষ-লাভেও আমার প্রয়োজন নেই।”

টীকানুবাদ :—“‘তত্র চ’—শ্রীবিগ্রহ-মধ্যেও আপনার পরম মনোহর শ্রীমুখকমলই বিশেষরূপে দেখতে ইচ্ছুক, এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থ বলছেন,—‘ইদন্তে’ ইত্যাদি।” বিগ্রহ দর্শন করতে চাচ্ছেন ভক্ত। তার মধ্যে ঐ মূর্তি দর্শন করতে চাচ্ছেন, অন্য মূর্তি নয়। কোন্ মূর্তি দর্শন করবেন ভক্ত ভগবানকে জানিয়ে দিচ্ছেন। তুমি আমায় দেখাও যেটা আমার পক্ষে দর্শনযোগ্য—এটা এক ধরনের বিচার। আর ভক্ত ঠিক করে রেখেছেন যে আমি এই মূর্তি দর্শন করব। যেখানে পরিষ্কার করে বলছেন যে আমি এই মূর্তি দর্শন করব, সেটা Suggestive। নিজেই ঠিক করে বলছেন। যদি বলেন এর ভিতরে আনুগত্যের অভাব হচ্ছে না কি? তা নয়, ও বুদ্ধিটুকু ভগবানেরই দেওয়া, সেই বুদ্ধি নিয়ে উনি বলছেন। যদি ভগবানের দেওয়া বুদ্ধি না দিয়ে তিনি কিছু বলেন তাহলে ভুল হবে। কিন্তু ভগবানের দেওয়া বুদ্ধি নিয়ে যদি কিছু বলেন তাহলে ঠিক আছে, তার সেটা সুসঙ্গত—এটাও বুঝতে হবে। আনুগত্যবিহীন যে-কোন জিনিসই অচল।

“কদাচিৎ নিজ ধ্যানযোগে ইষ্টের স্ফুর্তিদ্বারা তাঁর যে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যাদি অনুভব করেছিলেন, তাই ভাষায় ব্যক্ত করছেন এখানে।—আপনার ‘মুখমেবাভোজম্’—মুখই পদ্ম, অর্থাৎ প্রফুল্ল-কমল-খনি, নিখিল সন্তাপহারী এবং পরমানন্দরসময়। এই মুখপদ্ম আমার মনে পুনঃ পুনঃ প্রকট হউক।

সেই মুখপদ্ম কি- প্রকার? পুনরায় দেখাচ্ছেন,—পরম শ্যামল, স্নিগ্ধ, লোহিতাভ ও কুটিল কেশসমূহের দ্বারা যাহা আবৃত। অর্থাৎ কমল যেমন ভ্রমরগণের দ্বারা বেষ্টিত হয়, মুখপদ্মটাও সেইরূপ কেশসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছে। গোপী শ্রীযশোদা অথবা শ্রীরাধা যাতে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করছেন সেই শ্রীবদন-কমল মহাসৌভাগ্যশালিনী শ্রীযশোদা-কর্তৃক পুনঃ পুনঃ চুম্বিত হলেও আমার মনে যেন তা একবারের জন্যও প্রকট হয়।” কিরূপ বদন-কমল তার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন।

অথবা, পূর্ব শ্লোকস্থ ‘সদা’-শব্দের এই শ্লোকেও অনুবৃত্তিহেতু ‘সর্বদাই যেন প্রকট থাকে’—সব সময়ের জন্য, কখনও যেন ছাড় না হয়, ক্ষণেকের তরেও নয়—এরূপ তাৎপর্য্যও গ্রহণ করা যেতে পারে। ভক্তের এরূপ অবস্থা হয়?—হয়। “গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।। অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল’বে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে।।”

কি ব্যাপার। ‘সদা’-শব্দ লাগানো আছে যে। তাহলে ভক্ত কি খান না, ভক্ত কি নিদ্রা যান না? তাঁকে ত’ দু’চার দণ্ড বিশ্রাম নিতে হয়। কিভাবে বিশ্রাম নেবেন তিনি? যখন তিনি বিশ্রাম নেন তখন তিনি কিভাবে হরিনাম করেন? ২৪ ঘণ্টার ভিতরে ২৪ ঘণ্টা যিনি ভগবানকে স্মৃতিপথে রাখতে পারেন তিনি হলেন বৈষ্ণব, তিনি হলেন গুরু—একথা বলা আছে। আমাদের সকলের জন্য সেই উপদেশ দেওয়া আছে। আমরা কখনও কোন সময়ের জন্যও, এক মুহূর্তের জন্যও যেন ভগবানকে না ভুলি। “ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে।”—কিভাবে করব? মনটাই ত’ পাজি, মনটা অবশীভূত; তাহলে কি করে করব? স্বপ্ন দেখছি, স্বপ্নে রাধাগোবিন্দকে দেখতে হবে বলছেন। আমি ত’ সাপ, মাছ, বাঘ, ভাল্লুক ইত্যাদি দেখছি। ভগবান কোথায় আমার স্বপ্নে আসছেন? তাহলে কিরকম দর্শন হল? অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় স্মরণ কিভাবে হচ্ছে তাহলে? ভক্তের হচ্ছে, অভক্তের হচ্ছে না। Realised soul যিনি, তাঁর হচ্ছে। সেইরূপ চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট নিত্যসিদ্ধ, নিত্যমুক্ত মহাত্মা যাঁরা তাঁদের হচ্ছে। সবসময় লীলা দর্শন করছেন তাঁরা, সবসময় লীলা স্মরণ করছেন তাঁরা। সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

‘অষ্টপ্রহর যামসেবা’ কথাটা কার পক্ষে সম্ভব?—যাঁরা অষ্টপ্রহর ভগবানকে নিয়ে বসে আছেন; এক মুহূর্তের জন্যও ভগবানকে ছাড়েন নি, তাঁদের জন্যই যামসেবার কথা লেখা আছে। তাঁরা যামসেবা করবেন, তাঁরা স্মরণ করবেন। সে সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু শ্রবণ, কীর্তন ত’ আমার হয় নি। আমার শ্রবণ, কীর্তন যদি না হল তাহলে আমি স্মরণ করব কি করে। আমার শ্রবণ, কীর্তন ঠিক ঠিক হলে তবে স্মরণ হবে। সে অধিকার আসে নি আমার। প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর ‘মনঃশিক্ষা’য় ‘বৈষ্ণব কে?’ কবিতার মধ্যে বলছেন,—“কীর্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে, সে-কালে ভজন নিজ্জর্জন সম্ভব।।” এটা কার জন্য? কীর্তন-প্রভাবে স্মরণ আসবে, ওকে আলাদা করে আনতে হয় না। সাধন-ভজন করতে গেলে, কৃষ্ণোপাসনা করতে গেলে বৈরাগ্য যেমন আপনা থেকে এসে যায় ঠিক ঐরকম। কোন রকম ধরনের কৃত্রিম চেষ্টাদ্বারা আনতে হবে না। ওটা এমনিতেই এসে যাবে।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিয়োগে প্রযোজিতঃ ।

জনয়েত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥

এখানে বৈরাগ্য এবং জ্ঞান ভক্তির অঙ্গ নহে বলছেন। কিন্তু যিনি ভক্তিবিধান করবেন, তাঁর ওটা এসে যাবে—এই কথা বলেছেন। সুতরাং এটাও বুঝতে হবে আমাদের।

“সেই মুখকমলের বিশেষণান্তর বলছেন,—‘বিশ্ববদভাধরম্’—বিশ্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ ওষ্ঠযুগল যাতে, সেই মুখপদ্ম আমার মনে প্রকট হোক, তাহলে আমি কৃতার্থতা বোধ করব। নচেৎ, ‘লক্ষ-লাভেরন্যেঃ’—অন্য প্রকার লক্ষ লক্ষ লাভে, আমার কোনও প্রয়োজন নেই।” তাহলে সবথেকে বড় লাভ কি? আমরা কোন লাভের আশা না দেখলে ত’ কোন কাজ করি না। যে কোন বিষয়ে আমাদের লাভ চাই, তবে সেই ব্যাপারে অগ্রসর হব। ব্যবসার নিয়ম আছে এটা। আমি ব্যবসা করতে বসেছি, আমাকে লাভ করতে হবে, লোকসান দেব না আমি। এখন কি পরিমাণ লাভ হলে আমার চলবে, সেটা একটা চিন্তার মধ্যে থাকা দরকার আমার। কিন্তু লাভ আমার প্রয়োজন। শাস্ত্র বুঝিয়ে দিচ্ছেন, লাভ তুমি করতে পার, কিন্তু লাভ বললেই কি সবসময় লাভ হবে? লাভ করতে চাইলেও ব্যবসায়ে অনেক সময় লোকসান দিতে হয়, এটাও চিন্তা কর। শাস্ত্রে এ উপদেশও আছে। তাহলে কি করব? শাস্ত্র বলেছেন,—

‘উপায়ধিস্তয়েৎ প্রাজ্ঞস্তপায়মপিচিস্তয়েৎ’

উপায়টা যেমন চিন্তা করতে হবে; অপায়টাও তেমন চিন্তা করতে হবে। সবসময় ভালমন্দ দুটো দিক আগে থেকে ভাবতে হবে। তাহলে সেই যে অনুষ্ঠান সেটা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হবে, Perfect হবে, শাস্ত্রে বলা আছে সেকথা।

কৰ্ম্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহিত্যৈ সুখায় চ ।

পশ্যেৎ পাকবিৰ্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্ ॥

কৰ্ম্ম ত’ সবাই করছি আমরা সংসারে; কিন্তু ফলটা সবসময় সমান পাচ্ছি না সবাই। অনেক আশা করছি, অল্প পাচ্ছি; যতটুকু আশা করছি, ততটুকু পাচ্ছি না, তাহলে কি করব? কৰ্ম্ম করার উদ্দেশ্য কি? সবাই আমরা জানি দুটো ব্যাপারে আমরা কৰ্ম্ম করছি, দুটো ফল আমার পাওয়া দরকার। কি?—‘দুঃখহিত্যৈ সুখায় চ’—আমার দুঃখ-কষ্ট চলে যাক, আর আমি সুখ-শান্তি লাভ করি। এটা সবাই বুঝি আমরা। কিন্তু শাস্ত্র বুঝিয়ে দিচ্ছেন, না, ওটা চাইলেও সবসময় হচ্ছে না। ‘পশ্যেৎ পাকবিৰ্য্যাসম্’—এর ফলটা উদ্ভেদেও হতে পারে, আগেভাগে জেনে রাখ। বিরাট একটা আশা করছ, আর সেটা যদি না পাও, বহু লোকসান হয়ে যায়, তুমি Heartfail করে মরতে পার। অতএব তুমি মরো না, আত্মধৰ্ম্মী জীব তুমি, আত্মধৰ্ম্ম নিয়ে তুমি চল। আমরা মরবার জন্য আসিনি, বাঁচবার জন্য এসেছি। সে বাঁচাটা কি? ‘শৃঙ্খল বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ’—অমৃতের সন্তান মোরা। আমাদের বাঁচবার কথা আছে, মরবার কথা নেই। প্রশ্ন হয়—আমরা মরতে চাই না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর শাস্ত্রে দেওয়া আছে। ভগবান্ অজয়, অমর; জীবাত্মা অজর, অমর, সে-কারণে আমাদের মরবার ইচ্ছা নেই, মরতে ইচ্ছা করি না আমরা। কখনও কখনও রাগ করে—সংসারে দুঃখ-কষ্ট হয়, জালা-যন্ত্রণা হয়, তখন বলে ফেলি মরব আমি। “এইমাত্র ভিক্ষা



দাও হরি। আজ যেন একেবারে মরি।। ভাগ্যবান্ তাড়াতাড়ি মরে। অভাগারে যমে ভয় করে।।”—এইসব কথা বলে ফেলছেন কবি। ওটা শুধু মৌখিক, অন্তরের কথা নয়। অন্তরে কেউ মরতে চাই না আমরা। কেন চাই না? জীবাত্মা অজর, অমর, সেজন্য তার মরবার শখ নেই। আত্মহত্যার যে ঘটনা ঘটছে বাজারে সেটা তাৎকালিক। কোন মানুষের ইচ্ছা নেই মরবার জন্য।

এক বুড়িমা খুব কষ্ট করছিলেন মরবার জন্য। তাঁর কেউ ছিল না। বনে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রী করে যা পেত তা দিয়ে কোনরকমে ঠাকুরের ভোগ ইত্যাদি দিয়ে প্রসাদ পেতেন দিনান্তে। অনেক শুকনো কাঠ পেয়েছেন, বড় বোঝা বেঁধেছেন তিনি, কেউ আর তুলে দেওয়ার নেই বনাঞ্চলে। তখন জীবনের প্রতি ধিক্কার এল—এই রকম কষ্ট করে কি আর বাঁচতে পারা যায়! হা যম, তুমি কোথায় আছ, আমাকে নাও। দুবার, তিনবার অন্তর থেকে বলবার পর যমরাজ এসে হাজির হয়ে গেছেন। কি বুড়িমা, আমাকে ত’ কেউ ভালবাসে না, কখনও ডাকে না, তুমি আমাকে এত খাতির করে ডাকলে কেন? তখন বুড়িমা বলছেন,—বাপু! তুমি যখন এসেছ তখন আমার এই বোঝাটা তুলে দাও। এইজন্য ডেকেছ নাকি আমাকে? আমাকে ত’ এজন্য কেউ ডাকে না। আমাকে কেউ দেখতে পারে না দুই চক্ষুে। আমি কৃতান্ত। যাক্, তুমি যখন বলছ তখন বোঝাটা তুলে দিয়ে চলে গেলেন। বুড়িমা কি মরতে চেয়েছিলেন?—বুড়িমা মরতে চান নি। এ ধরণের বহু উদাহরণ রয়েছে শাস্ত্রে। কোন কবি অবশ্য উল্টো করে বলছেন,—‘মরণেরে তুহু মোর শ্যাম সমান।’ ‘মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।’

এসব কথাগুলো অনেকে বলেছেন, কিন্তু সত্যি সত্যি কারও মরবার ইচ্ছা নেই এই ভুবনে। কেন নেই?—আমরা অজর, অমর ভগবানের অংশ, অণুচৈতন্য জীবাত্মা। বৃহচ্চৈতন্য যে ভগবান্ তাঁরই অণুচৈতন্য। সেজন্য আমাদের মরবার ইচ্ছা নেই। ভগবানের সাধন-ভজন করব-একথা ঠিক, কিন্তু সেটা কিভাবে করব, কতভাবে করা যাবে, কত সংক্ষেপে হবে, সে-সব ব্যবস্থাগুলো আমাদের নিতে হবে। বিশেষতঃ কলিকাল। কলিকালে ব্যবস্থা শুধু নাম-সঙ্কীর্ণন।—

হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামেব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিন্ন্যথা।।

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে।

পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে।।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।

সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।।

এ ঘোর সংসারে, পড়িয়া মানব, না পায় দুঃখের শেষ।

সাধুসঙ্গ করি, হরি ভজে যদি, তবে অন্ত হয় ক্লেশ।।

ইতি শ্রীশ্রীদামোদরাস্তকের পঞ্চমস্কন্ধের শ্রীশ্রীল সনাতন-গোস্বামিকৃত

দিগ্দর্শিনী-নামক টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্মে

## ভক্তি-পুষ্পার্ঘ্য-নিবেদন

(১)

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তি বামন ।  
জয় গৌর-প্রেমদাতা, পতিত পাবন ॥  
দীনদয়াল প্রভু আশ্রিতবৎসল ।  
জয় ভব-ভয়হারী, সাধনের বল ॥  
অমানী মানদ প্রভু, গুণের সাগর ।  
দর্শনে পবিত্র কর সবার অন্তর ॥  
জয় জয় সকল-সহন শক্তিদারী ।  
শ্রীরূপ-শিক্ষাসারের আচার-প্রচারী ॥  
লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি চাহ নি কখন ।  
তবু তাহা তব পিছে ধায় অগুক্ষণ ॥  
শ্রীগুরুর মনোভীষ্ট করিতে পূরণ ।  
নিরন্তর নানাভাবে করিছ যতন ॥  
বেদান্তাদি শাস্ত্রে তুমি পরম পণ্ডিত ।  
তব বাণী শুনি' বিশ্ব মুগ্ধ ও বিস্মিত ॥  
জয় রাগাত্মিক জন— শ্রীগৌড়ীয়-গুরু ।  
জয় জয় গৌরভক্ত—বাঞ্ছাকল্পতরু ॥  
স্বরূপ-লক্ষণ আর তটস্থ-লক্ষণে ।  
ব্রজের মঞ্জরী তুমি জানে ভক্তগণে ॥  
রাধা-স্নেহাধিকা সখী বিনোদ-মঞ্জরী ।  
তুমি তাঁর বরিষ্ঠ-অন্তরঙ্গ অনুচরী ॥  
ব্রজ হ'তে আসিয়াছ এ মর জগতে ।  
ব্রজ-কথা তব কাছে শুনি ভালমতে ॥  
তুমি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা — বৈষ্ণব-প্রধান ।  
তোমাতেই কৃষ্ণকৃপা পূর্ণ বিদ্যমান ॥  
তোমার চরণপদ্ম করি সদা ধ্যান ।  
কৃপা করি' মায়া হ'তে কর পরিত্রাণ ॥

তুমি ত' আমার প্রভু, আমি তব দাস ।  
জন্মে জন্মে তব দাস্য করি অভিনাষ ॥

( ২ )

জয় জয় ব্যাসগুরু ভকতি ভাগুরী ।  
সংসার-তরণে তরীর তুমি কাণুরী ॥  
তব প্রকট-তিথিতে ব্যাসপূজা হয় ।  
তুমি প্রভু ব্যাসাভিন্ন—সর্ববশাস্ত্রে কয় ॥  
বৃত্তের কেন্দ্রস্থিত সরলরেখা যত ।  
জ্যামিতি-বিচারে 'ব্যাস'-নামে পরিচিত ॥  
ব্যাসের মধ্যে কেন্দ্রবিন্দুর অবস্থান ।  
কেন্দ্রবিন্দু ব্যাস নয়,—জ্যামিতি-প্রমাণ ॥  
গোলোকের কেন্দ্রবিন্দু ব্রজেন্দ্রনন্দন ।  
তাহার সম্বন্ধযুক্ত ব্যাস-নারায়ণ ॥  
ব্যাস কভু ব্রজেন্দ্রনন্দন নাহি হয় ।  
নন্দনন্দনও ব্যাস ছাড়া নাহি রয় ॥  
ব্যাস কভু অংশরূপে, কভু শক্তিরূপে ।  
শ্রীহরির আজ্ঞামত আসে এই ভবে ॥  
কৃষ্ণকৃপাশক্তিরূপে তোমার উদয় ।  
ব্যাস-গুরু বলি' তাই তব পরিচয় ॥  
ব্যাসাভিন্ন গুরু তুমি পরম করুণ ।  
শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় মোরে কৈলে নিয়োজন ॥  
কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিজ্ঞান তুমি জান সব ।  
পাতকী-তারণ-শক্তি তোমাতে সম্ভব ॥  
শ্রীকৃষ্ণভজনে যা'রা ছিল পরাজুখ ।  
তোমার কৃপায় তা'রা হৈল কৃষ্ণানুখ ॥  
আদি গুরু ব্রহ্মা হ'তে গুরু-পরম্পরা ।  
তোমারে পাইয়া ধন্যা হইল এ ধরা ॥  
ব্রহ্মা হ'তে শ্রীনারদ, তাঁর শিষ্য ব্যাস ।  
শাস্ত্রের সম্বন্ধান পাই ব্যাসের সকাশ ॥

ব্যাস-বাক্য তব বাক্য কভু ভিন্ন নয়।  
তুমি শ্রীগৌড়ীয়-গুরু আমার আশ্রয় ॥

(৩)

জয় জয় তত্ত্বদর্শী মহাভাগবত।  
তবাদর্শে আচার্য্যত্ব হৈল প্রকাশিত ॥  
ক্রিয়া-নৈপুণ্যাদি নহে আচার্য্য-লক্ষণ।  
ভক্তিসিদ্ধান্ত-নৈপুণ্য আচার্য্য-নিদর্শন ॥  
একদা শ্রীজীব প্রভু ডাকি' শ্রীনিবাসে।  
এক শ্লোকের রূপানুগ ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসে ॥  
শ্রীরূপের ভাবে তাঁর শ্লোক-ব্যাখ্যা স্মুরে।  
তাহাতে শ্রীজীব প্রীত হইলা অন্তরে ॥  
শ্রীনিবাস-শক্তি দেখি' সবে প্রশংসিল।  
“আচার্য্য”-পদবী তাঁ'রে শ্রীজীব দানিল ॥  
আচার্য্যত্ব-নির্ণয়ের হেন নিদর্শন।  
পরকাশে আচার্য্যের স্বরূপ-লক্ষণ ॥  
ক্রিয়া-নৈপুণ্য বা লোকরঞ্জন-দক্ষতা।  
আচার্য্য-পদ প্রাপ্তির নহেক যোগ্যতা ॥  
সকল ভক্তিসিদ্ধান্ত শোভিত তোমাতে।  
শ্রীগুরু-কেশব তাহা জানে ভালমতে ॥  
অন্তিম-সময়ে গুরু বিচারিয়া মনে।  
তোমারে বসা'য়ে দিলা আচার্য্য-আসনে ॥  
গুরু-আজ্ঞা শিরে ধরি' হৈয়াছ আচার্য্য।  
নিতি নবভাবে কর গৌর-সেবাকার্য্য ॥  
শ্রীহরির সেবক নিতি করিছ সৃজন।  
ইথে শ্রীহরির সুখ হয় সম্পাদন ॥  
ব্যবসাদারী চালে বহু শিষ্য আহরণ।  
হেন কার্য্য তুমি প্রভু কর নি কখন ॥  
অনেক গুরুজী রহে আচার্য্য্যভিমানী।  
তোমার মহত্ত্ব—তুমি সেবকাভিমানী ॥

যথার্থ আচার্য্য তুমি—অগতির গতি ।

এ ভক্তি-পুষ্পার্ঘ্যসহ লহ মোর নতি ।।

শ্রীব্যাসপূজা-বাসর  
ইং ২৩/১২/৯৭

}

শ্রীগুরু-কৃপাপ্রার্থী—

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

## স্বধামে শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, অরবিন্দ লেন, কোচবিহার নিবাসিনী শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী বিগত ১৩ই শ্রাবণ, ১৪০৪ ( ইং ২৯।৭।৯৭ ) মঙ্গলবার রাত্রে সজ্জানে শ্রীনামস্মরণ করিতে করিতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। গত ২৩শে শ্রাবণ (ইং ৮।৮।৯৭) শুক্রবার একাদশাহে সাত্তত-বিধানানুসারে তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়াদি সুসম্পন্ন হয়।

শ্রীসমিতির সন্ম্যাসী-ব্রহ্মাচারী-প্রচারকবৃন্দ পূর্ব হইতে উত্তরবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, মণিপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিতেন। পরবর্তিকালে সমিতির আচার্য্যদেব স্বয়ং ঐ সকল স্থানে বিশেষভাবে প্রচার করেন। কোচবিহার-সহরস্থ ব্যাঙচাতরা রোডের 'কোহিনুর বিড়ি ফ্যাক্ট্রী'র সত্বাধিকারী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রতি বৎসর তাঁহার গৃহে অবস্থানপূর্বক পক্ষকাল যাবৎ তাঁহার শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হরিকথা দ্বিধারাবাহিকভাবে কীর্ত্তন করিতেন। সেই সময়ে শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী প্রত্যহ নিত্যশ্রোতারূপে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীহরিকথা দ্বিধারাবাহিক শ্রবণ করিতেন। শেষের দিকে সমিতির অন্যতম প্রচারক ত্রিদিগ্বিস্তারী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত যতি মহারাজ ঐস্থানে হরিকথা দ্বিধারাবাহিক প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার নিকটই শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী প্রথম কোচবিহারে একটী ছোটখাট মঠ স্থাপনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার নিজস্ব বসতবাটী মঠস্থাপনকল্পে দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে নিঃশর্তভাবে উক্ত জমি দান করেন এবং তিনি নিজেও শ্রীনামদীক্ষাদি গ্রহণ করিয়া ভজন করিতে থাকেন।

যাহাতে কোচবিহার সহরে শ্রীমদ্ভাগবত-প্রবর্তিত সনাতন ধর্ম বিশেষভাবে প্রচারিত হয় তজ্জন্য তাঁহার খুব যত্নগ্রহ ছিল। মঠের প্রচারকগণ ও অপরাপর বৈষ্ণবগণ ঐখানে উপস্থিত হইলে তিনি খুব আদর-যত্নপূর্বক তাঁহাদের সেবা যত্ন করিতেন। সর্বোপরি তাঁহার অমায়িক সরল ব্যবহার মঠবাসী সকলকে মুগ্ধ করিত। তিনি বলিতেন—হরি-গুরু-বৈষ্ণব ব্যতীত এ সংসারে আমার অন্য কোন আশ্রয়-স্বজন নাই। তাঁহারাই আমার স্বজন-বান্ধব সবকিছু। তাঁহার সাধন-ভজনে নিষ্ঠা গুরু-বৈষ্ণবগণকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাসৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

শুভাবির্ভাব-শতবার্ষিকী

ও

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

( রেজিষ্টার্ড )

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ( নদীয়া )।

এস্.টি.ডি. : ০৩৪৭২ \* ফোন : ৪০০৬৮

২৯শে পৌষ, ১৪০৪ (ইং ১৪/০১/৯৮)

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈশ্চৈব নরোত্তমম্।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।।”

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাম্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৫১১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১লা ফাল্গুন, ১৪০৪ ( ইং ১৪/২/৯৮ ) শনিবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া-তিথি** ইহাতে ব্যাসাভিন্ন জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী** এই গোবিন্দ, ৩রা ফাল্গুন ( ইং ১৬/২/৯৮ ) সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদিপঞ্চক, আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরু-পঞ্চক ও তদ্ব্যপেক্ষের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাঙ্কব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সূকৃতি অর্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সভাবন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

## —ঃ অনুষ্ঠান-সূচী :—

৩০শে মাঘ ( ইং ১৩/২/৯৮ ), শুক্রবার—

ব্রাহ্মমুহূর্তে — মঙ্গলারতি ও কীর্তন।

অপরাহ্ণে — নগর-সঙ্কীৰ্তন শোভাযাত্রা।

সন্ধ্যায় — আরাত্রিকান্তে মহাজন-পদাবলী ও অধিবাস-কীর্তন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

১লা ফাল্গুন ( ইং ১৪/২/৯৮ ), শনিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্তে — মঙ্গলারতি ও কীর্তন।

প্রাতঃ — ৬টা হইতে ৭-৩০ মিঃ পর্য্যন্ত শ্রীগুরুমহিমাসূচক বন্দনাদি, মহাজন-পদাবলী কীর্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ।

পূর্বাহ্ণ — ৭-৩০মিঃ হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীগুরুপূজা ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান এবং ৯টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত বিশিষ্ট বক্তাগণের শ্রীশ্রীল গুরু-পাদপদ্মের অতিমর্ত্য চরিত্র ও অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বক্তৃতা।

মধ্যাহ্ণে — ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

সন্ধ্যায় — আরাত্রিকান্তে ধর্মসভা—“শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাসতত্ত্ব” সম্বন্ধে আলোচনা এবং শ্রীগুরুমহিমাসূচক ভক্ত্যঞ্জলিরূপ-প্রবন্ধাদি পাঠ।

২রা ফাল্গুন ( ইং ১৫/২/৯৮ ), রবিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্তে — মঙ্গলারতি ও কীর্তন।

মধ্যাহ্ণে — ভোগরাগ ও আরতি কীর্তন।

সন্ধ্যায় — আরাত্রিকান্তে ধর্মসভা—শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বৈষ্ণবীয় দয়া ও অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা।

৩রা ফাল্গুন ( ইং ১৬/২/৯৮ ), সোমবার—

ব্রাহ্মমুহূর্তে — মঙ্গলারতি ও কীর্তন।

পূর্বাহ্ণে — শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান।

মধ্যাহ্ণে — ভোগরাগ ও আরতি কীর্তন।

সন্ধ্যায় — আরাত্রিকান্তে ধর্মসভা—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্য চরিত্র সম্পর্কে ভাষণ ও বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ।

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে উক্ত সমিতির ‘সভাপতি-আচার্য্য’ অথবা ‘সম্পাদক’-এর নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

# শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

## শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

(রেজিষ্টার্ড)

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, পিন-৭৪১৩০২

এস্. টি. ডি. : ০৩৪৭২ \* ফোন : ৪০০৬৮

জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাশীর্বাদে ও সমিতির বর্তমান অধ্যক্ষ-সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীশ্রীমুক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের সেবানুগত্যে উপরিউক্ত ঠিকানায় আগামী ২৩শে ফাল্গুন (ইং ৮।৩।৯৮) রবিবার হইতে ২৯শে ফাল্গুন, ১৪০৪ (ইং ১৪।৩।৯৮), শনিবার পর্য্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে শ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন ও তত্ত্বস্থান মাহাত্ম্যকীর্ত্তন এবং নগর-সংকীর্ত্তনমুখে ষোলক্লেশ শ্রীধামপরিক্রমা হইবে।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাঙ্কবে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যনুখী সুকৃতি অর্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমাপঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৪

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে উক্ত সমিতির 'সভাপতি-আচার্য্য' অথবা 'সম্পাদক'-এর নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।



## শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ২৩শে ফাল্গুন (ইং ৮।৩।৯৮), রবিবার ;—(১) শ্রীগোক্রমদ্বীপ (কীর্তনাখ্য)  
—গঙ্গাস্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া  
স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র,  
নৃসিংহপল্লী; এবং (২) শ্রীমধ্যদ্বীপ (স্মরণাখ্য) —মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস,  
বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ২৪শে ফাল্গুন (ইং ৯।৩।৯৮), সোমবার ;—(৩) শ্রীকোলদ্বীপ (পাদ-  
সেবনাখ্য) —গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলের গঞ্জ,  
কোলের দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি; এবং (৪) শ্রীঋতুদ্বীপ (অর্চনাখ্য) —রাতুপুর।

৩। ২৫শে ফাল্গুন (ইং ১০।৩।৯৮), মঙ্গলবার ;—(৫) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বন্দনাখ্য)  
—জান্নগর (জহ্নুনিস্থান), বিদ্যানগর (সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পাট); এবং (৬)  
শ্রীমোদক্রমদ্বীপ (দাস্যাখ্য) —মামগাছি (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা  
বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ২৬শে ফাল্গুন (ইং ১১।৩।৯৮), বুধবার ;—(৭) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (সখ্যাখ্য)  
—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা; এবং (৮) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (শ্রবণাখ্য)  
—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চড়, বেলপুকুর; অতঃপর শহর নবদ্বীপস্থ  
শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা (প্রৌঢ়া-মায়াস্থান)।

৫। ২৭শে ফাল্গুন (ইং ১২।৩।৯৮), বৃহস্পতিবার ;—(৯) শ্রীঅন্তদ্বীপ (আত্ম-  
নিবেদনাখ্য) —শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন,  
শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য-ভবন), জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-  
মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারী গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে মঠে  
প্রত্যাবর্তন।

৬। ২৮শে ফাল্গুন (ইং ১৩।৩।৯৮), শুক্রবার ;—শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তীর উপবাস  
ও সঙ্কীৰ্তন-মহোৎসব।

৭। ২৯শে ফাল্গুন (ইং ১৪।৩।৯৮), শনিবার ;—সাধারণ মহোৎসব (মহাপ্রসাদ  
বিতরণ)।

---

জ্ঞাতব্যঃ—যাত্রিগণ হাঙ্কা থালা ও ঘটি এবং যাঁহারা মঠে রাত্রিবাসে ইচ্ছুক  
তাঁহারা মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন। ২২শে ফাল্গুন (ইং ৭।৩।৯৮)  
শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইতে হইবে; এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্বেই  
কেহ মঠে আসিলে থাকা ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর।

---

বিঃ দ্রঃ—“শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট” এর অনুকূলে প্রদত্ত যাবতীয়  
দান আয়কর মুক্ত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাসৌ জয়তঃ

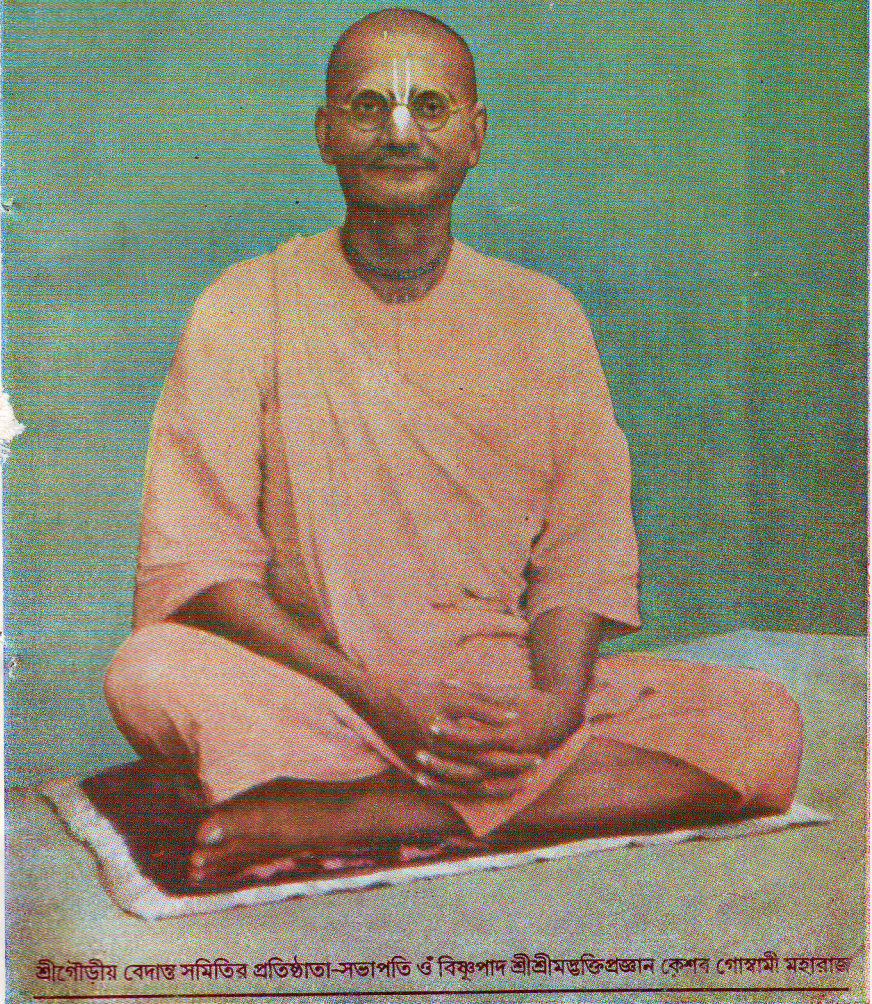
শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা (শতবার্ষিকী)

# শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

৪৯শ বর্ষ }

মাঘ, ১৪০৪

{ ১২শ সংখ্যা



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমুক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ  
যুগ্ম-সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমুক্তিবেদান্ত আচার্য মহারাজ  
কার্যালয়ঃ—শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ফোনঃ ৫৫৫-৮৯৭৩  
২৮, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৪



শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা (শতবার্ষিকী)

✠	স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।	✠
ধর্মঃ স্মৃতিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেন-কথাসু যঃ।		দোংপাদয়েদযদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।।
✠	অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।।	✠

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম।

অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিশ্বশূন্য।।

অন্য ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।

হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম।।

৪৯শ বর্ষ }

২ গোবিন্দ, গর্ভোদশায়ী, ৫১১ শ্রীগৌরান্দ  
৩০ মাঘ, শুক্রবার, ১৪০৪, ইং ১৩/২/৯৮

{ ১২শ সংখ্যা

জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী  
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ কী জয়

মঙ্গলাচরণ

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌর-প্রেষ্ঠায় ভূতলে।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে।।

নমস্তে গুরুদেবায় নিত্যানন্দ-স্বরূপিণে।

জীব-দুঃখে সদাভ্যর্থায় শ্রীনাম-প্রেম-দায়িনে।।

নমস্তে গুরুদেবায় আচার্য্য-ব্যাসরূপিণে।

বিশুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত-মুক্তবিগ্রহ-ধারিণে।।

গৌরনাম-গৌরকাম-গৌরধাম-জীবাতিবে।

গৌর-প্রেমার্ণবে সদা সন্তরণ-বিলাসিনে।।

বজ্রাদপি কঠোরায় চাপসিদ্ধান্ত-নাশিনে ।  
 নমস্তে গুরুদেবায় কৃষ্ণ-বৈভব-রূপিণে ॥  
 প্রভুপাদ-প্রিয়ৈষ্ণব 'কৃতিরতন'-ধারিণে ।  
 সত্যসার্থে নিভীকায় শ্রীরূপানুগ-বর্ত্তিণে ॥  
 সরস্বতী-মনোহীষ্ঠং সর্ববথা সুষ্ঠু-রক্ষিণে ।  
 শ্রীশ্রীমায়াপুর-ধান্নঃ সেবা-সমৃদ্ধি-কারিণে ॥  
 শ্রীধাম-পরিক্রমাди যে নৈব রক্ষিতঃ সদা ।  
 গুরোর্নির্দেশ-পালায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥  
 শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতেঃ স্থাপকায় চ ।  
 মায়াবাদ-তমোহ্মায় বেদান্তার্থবিদে নমঃ ॥  
 রাধাবিনোদ-লীলায়াং মঞ্জুরী-সখি-রূপিণে ।  
 তমহং সততং বন্দে শ্রীল-কেশব-স্বামিনে ॥  
 দেহি মে তব শক্তিস্তু দীনেনেয়ং সুযাচিতা ।  
 তব পাদ-সরোজেভ্যো মতিরস্তু প্রধাবিতা ॥

সানুবাদং

## শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারি-তত্ত্বাষ্টকম্

[ শ্রীকৃষ্ণস্য গৌর-কান্তি-প্রাপ্তি-হেতুঃ ]

[ পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যোণাষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমতা ভক্তিপ্রজ্ঞান  
 কেশব-গোস্বামি-মহারাজেন বিরচিতম্ ]

রাধাচিন্তা-নিবেশেন यस্য কান্তির্বিলোপিতা ।

শ্রীকৃষ্ণচরণং বন্দে রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহম্ ॥ ১ ॥

শ্রীমতী রাধারাগীর অভিমান হইলে তাঁহার বিরহে অত্যন্ত চিন্তা-নিবেশের দ্বারা  
 যাঁহার কৃষ্ণবর্ণ-কান্তি বিলুপ্ত হইয়া শ্রীরাধার ন্যায় হইয়াছিল, আমি সেই রাধাচিহ্নিত-  
 বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মকে বন্দনা করি। অথবা মানভঙ্গে শ্রীরাধা-কর্তৃক আলিঙ্গিত  
 শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের বন্দনা করি ॥ ১ ॥

সেব্য-সেবক-সম্প্রোগে দ্বয়োর্ভেদঃ কুতো ভবেৎ ।

বিপ্রলম্বে তু সর্বস্য ভেদঃ সদা বিবর্দ্ধতে ॥ ২ ॥

সেব্য অর্থাৎ ভোক্তা-ভগবান্ যখন ভোগ্য সেবকের সহিত মিলিত হইয়া  
 সম্যক্রূপে তাহাকে ভোগ করেন, তখন ভেদ কোথায় থাকে? (অর্থাৎ ভেদ থাকে না—

অভেদ বলিয়া গণ্য হয়)। পক্ষান্তরে, বিপ্রলম্ব অর্থাৎ বিরহ উপস্থিত হইলে কিন্তু সকলের মধ্যেই ভেদ সর্বদা বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে॥ ২॥

চিল্লীলা-মিথুনং তত্ত্বং ভেদাভেদমচিন্ত্যকম্।

শক্তি-শক্তিমতোরৈক্যং যুগপদ্বর্ততে সদা॥ ৩॥

শক্তি ও শক্তিমানের ঐক্য-স্বরূপ চিল্লীলা-মিথুন-তত্ত্ব নিত্যকাল অচিন্ত্য-ভেদাভেদরূপে যুগপৎ অবস্থিত। অর্থাৎ, পরতত্ত্ববস্তু কখনও নিঃশক্তিক নহেন। সেই তত্ত্বে শক্তি ও শক্তিমান একত্বরূপে নিত্য বর্তমান। তিনি পূর্ণ চেতনময় লীলাপুরুষোত্তম, স্বয়ং মিথুন-বিগ্রহ, অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের (শক্তি-শক্তিমানের) সম্মিলিত বিগ্রহ। সেই মিথুন-বিগ্রহই শ্রীরাধাকৃষ্ণ বা গৌরতত্ত্ব। তাহাতে ভেদ ও অভেদস্বরূপ এই বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে যুগপৎ নিত্য বর্তমান॥ ৩॥

তত্ত্বমেকং পরং বিদ্যাল্লীলয়া তদ্বিধা-স্থিতম্

গৌরঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ং হ্যেতদুভাবুভয়মাপ্নুতঃ ॥ ৪॥

পরতত্ত্বকে ‘এক’ বলিয়া জানিবে। কিন্তু সেই এক তত্ত্ববস্তু লীলাদ্বারা দুই প্রকারে অবস্থিত শ্রীগৌরই স্বয়ং কৃষ্ণ এবং উভয়ই উভয়তা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণসুন্দর হন এবং শ্রীকৃষ্ণসুন্দরও আবার শ্রীগৌরসুন্দর হন॥ ৪॥

সর্বের্ণ বর্ণাঃ যত্রাবিস্তাঃ গৌর-কান্তির্বিকাশতে।

সর্ব-বর্ণেন হীনস্ত কৃষ্ণ-বর্ণঃ প্রকাশতে॥ ৫॥

[ এস্থলে আধুনিক জড়-বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তদ্বারা শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-উপাস্য-তত্ত্বদ্বয়ের নির্দেশ করা যাইতেছে :— ] যে-স্থলে সমস্ত বর্ণের (রং-এর) একত্র সমাবেশ হয়, সে-স্থলে গৌর-কান্তির বিকাশ হইয়া থাকে। যেমন, সূর্য্যো যাবতীয় রং থাকায় তাঁহার বর্ণ গৌর। অপর পক্ষে, যে-স্থলে সমস্ত বর্ণের হীনতা বা অভাব হয়, অর্থাৎ কোনও রং-ই থাকে না, সে-স্থলে ‘কৃষ্ণ’ বা ‘কাল’ প্রকাশ হইয়া পড়ে। [ যেহেতু বৈজ্ঞানিক-মতে ‘কাল’ কোনও রং নহে। ] ॥ ৫॥

সগুণং নিগুণং তত্ত্বমেকমেবাদ্বিতীয়কম্।

সর্ব-নিত্য-গুণৈর্গৌরঃ কৃষ্ণে রসস্ত নিগুণৈঃ॥ ৬॥

[ উক্ত পূর্ববক্তার ‘বর্ণ’-কে এই শ্লোকে ‘গুণ’-শব্দের সহিত উপমা দিয়া বা তুলনা করিয়া শ্রীগৌর ও কৃষ্ণের তুল্য-উপাস্যত্ব প্রদর্শিত হইতেছে :— ] সগুণ ও নিগুণ-তত্ত্ব একই এবং অদ্বিতীয়। যাবতীয় নিত্য সদগুণের সমষ্টিদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর এবং নিগুণে অর্থাৎ সর্বপ্রকার গুণহীনতায় শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ। অর্থাৎ সেই বস্তু স্বয়ং রস ; রস নিগুণ অপ্রাকৃত। উহা কখনও প্রাকৃত গুণ নহে॥ ৬॥

শ্রীকৃষ্ণং মিথুনং ব্রহ্ম ত্যক্ত্ব তু নিগুণং হি তৎ।

উপাসতে মুষা বিজ্ঞাঃ যথা তুষাবঘাতিনঃ॥ ৭॥

শ্রীকৃষ্ণ বা গৌর মিথুন-ব্রহ্ম। তাঁহাকে (বা তাঁহার ভজন) পরিত্যাগ করিয়া

মিথ্যাঙ্গানিগণ বা অঙ্গগণ তুষ পেষণকারিগণের ন্যায় নিগুণ-ব্রহ্মের বৃথা উপাসনা করে। অর্থাৎ তগুল প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় তুষাবঘাতিগণ যেরূপ বৃথা শ্রম করে, সেইরূপ জ্ঞানিগণ কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করিয়া নিগুণ ব্রহ্মের বৃথা উপাসনাদ্বারা শ্রম স্বীকার করে; অর্থাৎ তদ্বারা প্রকৃত মোক্ষ কখনও হইবে না ॥ ৭ ॥

শ্রীবিনোদবিহারী যো রাধয়াঃ মিলিতো যদা।

তদাহং বন্দনং কুর্য্যাং সরস্বতী-প্রসাদতঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীবিনোদবিহারী কৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার সহিত মিলিত হন, শ্রীল সরস্বতী-প্রসাদে অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমি তখন যথাবিধি তাঁহাদের বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

ইতি তত্ত্বাষ্টকং নিত্যং যঃ পঠেৎ শ্রদ্ধয়াষিতঃ।

কৃষ্ণ-তত্ত্বমভিজ্ঞায় গৌরপদে ভবেন্মতিঃ ॥ ৯ ॥

যিনি এই তত্ত্বাষ্টক শ্রদ্ধাষিত হইয়া নিত্য পাঠ করিবেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইতে পারিবেন এবং শ্রীগৌরপদে তাঁহার মতি হইবে ॥ ৯ ॥

## সাধুসঙ্গ

**বিপদাক্রান্ত হইলে মোহাচ্ছন্ন জীব ভগবানকে স্মরণ করে**

জীব-হৃদয় মোহে আচ্ছন্ন। তাহারা শ্রীভগবানকে ভুলিয়া অনিত্য জগতেই ডুবিয়া থাকিতে ভালবাসে। শ্রীভগবৎ-প্রেম যে কি অপূর্ব, তাহার আশ্বাদন যে কি অমৃতময়, তাহা তাহারা বুঝে না। তাহারা স্বতঃই শ্রীভগবানের নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতে চায়। জীবের ত' এই অবস্থা, কিন্তু যখনই জীব কোনরূপ বিপদাক্রান্ত হয়, যখনই সংসারের কোনরূপ কঠোরাঘাতে তাহাদের হৃদয় ভগ্ন হইয়া পড়ে, তখনই শ্রীভগবানকে স্মরণ করে।

### সকাম সাধনার নিষ্কাম পরিণাম

সাধারণতঃ জীব কামনার বশবর্তী হইয়া ভগবৎ-সাধনা করিয়া থাকেন। কিন্তু—

কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে।

কাম ছাড়ি' দাস হইতে হয় অভিলাষে ॥ ( চৈঃ চঃ মঃ ২২। ৪১ )

কুব সিংহাসনাভিলাষে সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া শেষে নিষ্কাম ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

### সংসার-ক্লেশের উপলব্ধিই সাধুসঙ্গের কারণ

আর একটা কথা—জীব-হৃদয় সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে না শিখিলে অথবা কোনরূপ কঠোরাঘাতে ভগ্ন না হইলে তাহারা ভগবৎ-পথে প্রবিশ্ত হইতে ইচ্ছা করে না। যখন সংসারে সুখাশা দূর হইয়া সমুদ্র-বক্ষে বায়ু-বিতাড়িত তৃণ-কণার ন্যায় জীব সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়ায়, তখনই তাহারা ভক্তিরূপ ভেলার সাহায্যে জীবন-রক্ষার্থে উন্মুখ হয়। সেই অবস্থায় সাধুসঙ্গ বিশেষ মঙ্গলকর। স্পর্শমণির সংযোগে যেমন

অপকৃষ্ট ধাতুও স্বর্ণে পরিণত হয়, সাধুসঙ্গে জীবের মলিন চিত্ত সেইরূপ সমস্ত অপকৃষ্টতা দূর হইয়া 'সৎ'-নামের যোগ্য হয়।

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়ান্মুখ হয়। ( চৈঃ চঃ মঃ ২২।৪৫ )

তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়।। ( চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৯ )

### ভক্তিই সুখলভের উপায়

মানুষ স্বতঃই সুখের কাঙাল, কিন্তু জড় জগতের সেবা করিয়া সুখলাভেচ্ছা মরুভূমে নীর অন্বেষণবৎ বিফলমাত্র। প্রকৃত সুখ লাভ করিতে হইলে ভগবৎপথে প্রবিশ্ত হইবার একান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

‘সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।’ (১৮।৬৬)

দয়াল গৌরান্দ্র ও জীবকে পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণভক্তির জন্যই উপদেশ করিয়াছেন। অতএব ভক্তি ব্যতীত জীবের আর গতি কি?

### সাধুসঙ্গই ভক্তি-লাভের উপায়

যে-ভক্তি জীবের একমাত্র সম্বল, এখন তাহা লাভ হয় কিরূপে?

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।

গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ।। (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১)

সাধুসঙ্গই ভক্তিলাভের একমাত্র উপায়। সাধুসঙ্গ হইতেই শ্রবণ-কীর্তনাদিদ্বারা মানবের পাপ-মলিন চিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়া ভগবৎ-প্রেম-লাভের যোগ্য হয়। “মহৎ-কৃপয়ৈব ভগবৎ-কৃপালেশাৱা।” অর্থাৎ মহৎ কৃপা অথবা ভগবানের কৃপা হইতেই ভক্তি লাভ হয়। শ্রীগৌরান্দ্র বলিয়াছেন,—

মহৎ-কৃপা-বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়।

কৃষ্ণ-ভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়।। (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৫১)

সাধুসঙ্গে কিরূপ মধুর ফলোৎপন্ন হইয়া থাকে, মহাত্মা নারদ নিজ জীবনীদ্বারা ব্যাসদেবকে বলিতেছেন (১।৫।২৮ ভাগবতে)—

ইত্থং শরৎপ্রাবৃষিকাবৃত্ত হরেব্বিশ্বতো মেহনুসবং যশোহমলম্।

সংকীৰ্ত্তমানং মুনিভিমহাত্মাভিৰ্ভক্তিঃ প্রবৃত্তাশ্চরজস্তমোপহা।।

এইরূপ শরৎ ও প্রাবৃটকালে মহাত্মা মুনিগণকর্তৃক সংকীৰ্ত্তমান হরির অমল যশ প্রাতঃ কালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে শুনিতে শুনিতে আমাতে রজস্তম-নাশিনী ভক্তির উদয় হইল।

### সাধু নারদের কৃপায় ধ্রুবের ভগবৎ-প্রাপ্তি

বালক ধ্রুব সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া যদিও নিজ্জনে ভগবৎ-সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাচ সাধু-কৃপা অভাবে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হয় নাই, যে-মুহূর্ত্তে মহাত্মা নারদ আসিয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন, সেই মুহূর্ত্তে ধ্রুব ভগবৎ-কৃপা-লাভের যোগ্য হইয়াছিলেন। অতএব সাধুসঙ্গই ভক্তিলাভের প্রধান উপায়।

“ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়।।

তাঁর উপদেশ-মস্ত্রে পিশাচী পলায়।

কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়। (চৈঃ চঃ মঃ ২২। ১৪-১৫)

### সাধুসঙ্গে শান্তিলাভ ও সংসার ক্ষয়

সংসার-দন্ধ মানব-মন একমাত্র সাধু সংসর্গেই শান্তির বিমল ছায়া লাভ করিতে সমর্থ হয়।

জীবের কর্তব্য কি, জীবের উদ্দেশ্য কি, সাধুসঙ্গ হইতেই তাহা অনুভূত হইয়া থাকে।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।

ভক্তিরফল ‘প্রেম’ হয়, সংসার যায় ক্ষয়।। (চৈঃ চঃ মঃ ২২। ৪৯)

ভগবৎ-লীলা ও তদ্ভক্তের নিকট তৎ-কীর্তন-শ্রবণ—তাপ-দন্ধ-হৃদয়ে যেরূপ শান্তি প্রদান করিতে সমর্থ, সেরূপ আর কেহই পারে না। জড়জগতে বদ্ধজীব-মধ্যে কেহই প্রকৃত সুখী নহেন, সকলেই ‘আমার আমার’ করিয়া অস্থির। আর সেই আমিত্বই আমাদের যন্ত্রণার মূল হইয়া হৃদয়ের শোণিত শোষণ করিয়া থাকে। অতএব বদ্ধ জীবগণের বদ্ধ জীবের নিকট সহানুভূতি প্রত্যাশা না করিয়া, মহৎ-কৃপা-লাভ করিয়া মায়ামুক্ত হইয়া ভগবৎ-পদে আত্মসমর্পণ করিতে চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য।

### সাধু চিনিবার লক্ষণ

কিস্ত সাধু কাঁহার তাহা জানিব কিরূপে? তাঁহাদিগের লক্ষণ শ্রীগৌরাসঙ্গ বলিয়াছেন,— কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।

নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন।।

সর্ব্বোপকারক, শাস্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।

অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্গুণ।।

মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।

গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী।। (চৈঃ চঃ মঃ ২২। ৭৮-৮০)

আবার—যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ-নাম।

তাঁহারে জানিহ তুমি ‘বৈষ্ণব-প্রধান’।। (চৈঃ চঃ মঃ ১৬। ৭৪)

অতএব এইরূপ ভক্ত-সংসর্গ লাভ করিতে পারিলেই ভগবচ্চরণে রতি হইয়া জীবন ধন্য হয়।

### সার্বকালিক সাধুর অস্তিত্ব ও সাধুসঙ্গের নিত্য আবশ্যকতা

অনেককে বলিতে শুনিয়াছি “এখন আর সাধু নাই”—এই কথাটি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। আমরা বলি যে, সাধু অনেক আছেন, তবে এখন আমাদের সাধু-সন্দর্শনের প্রবৃত্তি নাই—ইহাই পার্থক্য মাত্র। কিস্কিন্দ্রাত্ম্য ব্যাকুল অন্তঃকরণে সাধু-সঙ্গ লাভের চেষ্টা করিলেই ভগবান্ সে-বাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। ভক্তি-লতা একবার উদযাত হইলে আর সাধুসঙ্গের আবশ্যক হয় না তাহা নহে,—



কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় ‘সাধুসঙ্গ’।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ।। (চৈঃ চঃ মঃ ২২। ৮৩)

অতএব সাধুসঙ্গ জীবের আজীবন কালই প্রয়োজনীয় বস্তু।

### অসৎ-সঙ্গ ভক্তির কণ্টক

অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।

‘স্বী-সঙ্গী’—এক অসাধু, ‘কৃষ্ণভক্ত’ আর।। (চৈঃ চঃ মঃ ২২। ৮৭)

স্বীলোকে আসক্ত ও কৃষ্ণের অভক্ত সহস্র-গুণ-সম্পন্ন হইলেও তাহাদিগকে অসাধু বুঝিয়া বৈষ্ণবগণ তাহাদিগের সঙ্গ সর্বদা পরিত্যাগ করিবেন। কারণ এসকল সঙ্গ ভক্তিলাভের কণ্টক-স্বরূপ।

### সাংসারিক অভাব-বোধ দূরীকরণের উপায়

সাংসারিক দুশ্চিন্তাও ভক্তিলাভের পক্ষে বিশেষ অন্তরায়। লোক-লজ্জা ও অভাববোধ দূরীকৃত হইলেই এই অন্তরায় দূরীকৃত হয়। স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে মানুষের অতি অল্প অভাবই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু অবোধ মানুষ নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে জানে না। “অমুক জিনিষ না হইলে লোকে নিন্দা করিবে”—এই লোকনিন্দার আশঙ্কা হইতেই আমরা শত শত দৃষ্টি করিয়া সেই যন্ত্রণানলে হৃদয় ভস্মীভূত করিতে থাকি। লোকাপেক্ষা দূর করিয়া নিজ অবস্থার সহিত অন্য দীন-হীন ব্যক্তির অবস্থা মিলিত করিয়া দেখিলেই অভাব-জনিত অশান্তি দূর হইয়া নিজ অবস্থায় সন্তুষ্টতা আসিয়া থাকে,—

“একদা ছিল না জুতো চরণ-যুগলে।

দহিল হৃদয়-বন সেই ক্ষোভানলে।।

ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে।

গেলাম ভজনালায়ে ভজন-কারণে।।

দেখি তথা একজন পদ নাহি তার।

অমনি জুতোর খেদ ঘুচিল আমার।।”

সত্যি অন্যের অভাবপ্রতি দৃষ্টি পড়িলেই নিজের অভাব দূর হয়।

### ধর্মবিরোধী পরত্রীকাতর বদ্ধ-জীবের নিন্দা, লাঞ্ছনাদি

#### উপেক্ষিত হইলেই ভগবৎ-প্রেম-লাভ

মানুষ যখন ধর্মরাজ্যে প্রবিষ্ট হইবার চেষ্টা করে, তখন সাধারণতঃ বদ্ধ জীবগণ তাঁহাকে সেই পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য নানারূপ উপায়াবলম্বন করিয়া থাকেন। সেই সময় জীবের নিতান্ত দৃঢ়তা আবশ্যিক, কিন্তু অনেক দুর্বল-চিত্তগণ সে-সময় প্রাণের দৃঢ়তা হারাইয়া লোক-নিন্দার আশঙ্কায় তাঁহাদের উত্তেজনায়া স্বীয় গন্তব্য পথ হইতে প্রত্যাবর্ত্ত করেন। কি দুর্দৈব! হরিদাস ঠাকুর হেন সাধুকেও বাইশ বাজারের দণ্ড পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাই বলিয়া কি তিনি সত্যপথ হইতে বিচলিত হইয়াছিলেন? দেখা যায়, প্রথমতঃ ভগবৎ উন্মুখ ব্যক্তিদিগকে সাধারণে বিস্তার লাঞ্ছনা করিয়া থাকেন, পরিণামে সত্যেরই জয় হয়। একদিন যঁাহাকে লোকে নিন্দা করে, পরিশেষে সেই নিন্দুক ব্যক্তিও তাঁহার চরণে লুপ্তি হয়। সামান্য লাঞ্ছনার ভয়ে কেহ কি সত্যের আদর করিবে

না? ধর্মের জন্য সংসারে কত মাহাত্ম্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই, তাহার তুলনায় ‘লোক-লজ্জা-উপেক্ষা’ অতি তুচ্ছাদপি তুচ্ছ নহে কি?

সংসারে এমন অনেক অজ্ঞ জীব আছেন, অন্যের মঙ্গল যাহাদিগের চক্ষুশূল। সেই সকল ঘৃণিত জীবের নিন্দার আশঙ্কায় যদি সত্যপথ হইতে বিচলিত হইতে হয়, তবে তাঁহার ন্যায় দুর্ভাগা আর কে? ভগবৎ-সম্মিলন অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? এ-হেন অমূল্য রত্নলাভের জন্য লোকে দুই চারিটা কথা বলিলেই বা ক্ষতি কি? ভগবৎ-প্রেম কি মুখের কথা? তাঁহার জন্য যদি দুইটা কথাই সহ্য করিতে পারিলাম না, তবে সে-অমূল্য প্রেমধন লাভ করিব কিরূপে?

“ডুবিলে অতল জলে, তবে প্রেম-রত্ন মিলে।”

### লোক-নিন্দার ভয়ে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজন ত্যাগ নিষিদ্ধ

লোক-নিন্দার ভয়ে যদি সাধুসঙ্গ করিতে পশ্চাৎপদ হই—মহাপ্রভুর আদেশ-সকল পালন করিতে কুণ্ঠিত হই, তবে আর ভগবৎ-সম্মিলন ঘটবে কিরূপে?

তাহাকে লাভ করিবার জন্য লোকে দুই চারি কথা বলে বলুক, তাহাতে ক্ষতি কি?

“তেরি মেরি দোস্তী লাগল লোক সব বদনামী কিয়া।

লোকসবকো বকনে দিজে তুমি হামনে কামকিয়া।।”

অর্থাৎ “তোমাতে আমাতে বন্ধুত্ব হওয়ায় লোকে নিন্দা করিতেছে, তাহাদের যাহা ইচ্ছা বলুক, আমাদের এরূপ দৃঢ়তা না থাকিলে ভগবৎ-প্রেম-লাভাশা বিড়ম্বনা মাত্র।

রাধিকার বিমল কৃষ্ণপ্রেম লইয়াও জটীলা উদ্ভুক্ত করিয়াছিলেন, তাই বলিয়া কি তিনি শ্রীকৃষ্ণে প্রেমার্পণে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন? তিনি বলিলেন,—

“ননদিগো বল্গে যা তুই নগরে,—

ডুবছে রাই কলঙ্কিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।”

এইরূপ তন্ময়-ভাব লইয়া ভগবৎ-পথে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। লোকে যাহা বলে বলুক, তাহা শুনিবার প্রয়োজন কি?

“লোকের কথায়, কিবা আসে যায়, পিবে সুখে প্রেম-মধু।”

### সাধুসঙ্গেই সর্বানর্থ নাশ

যিনি লোক-লজ্জার আশঙ্কায় সত্যপথে প্রবৃষ্ট হইতে কাতর, তাঁহার জীবন কেবল জগতের ভারস্বরূপ। সে জীবনে কখনও ভগবৎ-সম্মিলন ঘটে না। তুমি রাজা, জমিদার, যাহাই কেন হওনা, তাঁহার নিকট অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রমাত্র। অতএব তৎসম্মিলনের জন্য তোমার বংশ-মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করিবার নাই। তুমি কেবল তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত লোকাপেক্ষা দূর করিয়া তাঁহার কৃপা-লাভের জন্য তৎপথানুগমন কর। ইহাই জীবের শ্রেয়ঃ। সাধুসঙ্গগুণেই লোকাপেক্ষা প্রভৃতি সর্বানর্থ দূর হইয়া জীব তাঁহার বিমল প্রেমাদিকারী হইতে পারে। অতএব ভগবদ্ভাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সাধুসঙ্গ সর্বথা কর্তব্য।

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

# শ্রীগুরু-স্বরূপ

## অদ্বৈতবাদী বা ব্রহ্মজ্ঞানীর মত অশুদ্ধ

শাস্ত্রসকল তিনভাগে বিভক্ত। কৰ্মবিচার, জ্ঞানবিচার ও ভক্তিবিচারে শাস্ত্রার্থ বিভিন্নভাবে গৃহীত হয়। যাহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য জীবাদির স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান বা অনুভূতি স্বীকার করেন না, তাহাদের মতে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর অবস্থিতি নাই। এই নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানিগণ বস্তু-মাত্রকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। তাহাদের মতে ব্রহ্ম হইতে গুরু পৃথক্ নন। ইহারা উপাসনা বা ভক্তিমার্গ স্বীকার করেন না। কিন্তু মহাপ্রভু, ভক্তিমার্গ, শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বলিয়া জানাইয়াছেন।

## শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুরুতত্ত্বসহ ঘটতত্ত্বাত্মক

শ্রীমহাপ্রভুর মতে, তত্ত্ব অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত অর্থাৎ যাবতীয় বস্তু যুগপৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং ব্রহ্মেই অবস্থিত। ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই, কিন্তু শক্তিগত পার্থক্যে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পরিচয়ে পরস্পর পৃথক্ ধর্ম-বিশিষ্ট। মায়াবাদী জ্ঞানিগণ তত্ত্ববিষয়ে যে-ধারণা করেন, তাহাকে নির্বিশেষ জ্ঞান বলে। শ্রীমহাপ্রভুর প্রকাশিত তত্ত্বজ্ঞান সবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এক বস্তু হইয়া ছয়টি ভিন্ন তত্ত্বে প্রকাশমান,—১। গুরু-তত্ত্ব, ২। শ্রীবাসাদি ভক্ত-তত্ত্ব, ৩। অংশাবতার অদ্বৈত-তত্ত্ব, ৪। স্বরূপ-প্রকাশ নিত্যানন্দ-তত্ত্ব, ৫। গদাধরাদি নিজ শক্তি-তত্ত্ব, ৬। স্বয়ং ভগবৎ-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—এই ছয় তত্ত্বই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাহা হইলে গুরুতত্ত্বও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ স্বীকৃত হইলে ছয় তত্ত্বই ভগবান্, কিন্তু পরস্পর পৃথক্। শ্রীবাসাদি ভক্ত, শ্রীগদাধরাদি শক্তি, অদ্বৈত অংশাবতার, নিত্যানন্দ প্রকাশ-স্বরূপ এবং গুরুদেব—এই পঞ্চতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের সহিত অভেদ হইলেও এই পাঁচ তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে পৃথক্ দাস।

## শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রকাশ, প্রিয়তম ভক্ত,

## সুতরাং তদপেক্ষা বড়

শ্রীগুরুদেব চৈতন্যদেবের দাস হইলেও ভগবানের প্রকাশস্বরূপ, ভগবান্ই গুরুদেব। গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রকাশ হইলেও তিনি কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়তম দাস। শ্রীগুরুদেব মর্ত্য নহেন, অনিত্য নহেন, তিনি কৃষ্ণ হইতে দাসরূপে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অভিন্ন প্রিয় বস্তু। তিনি ভক্ত, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহার খর্ব্বতা করা হয়।

“কৃষ্ণস্যাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্য-আস্বাদন।”

“কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্ত পদ।।”

“ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে।

সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে।”

“নানা-ভক্তভাবে করেন, স্বমাধুর্য্য পুন।”

“আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান।।”

“সেই অভিমান সুখে আপনা পাশরে।”

“কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।

কোটি ব্রহ্মানন্দ নহে তার এক বিন্দু।।”

“মুই যে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ।

দাস ভাব সম নহে অন্যত্র আনন্দ।।”

“সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ—চৈতন্য-ঈশ্বর।

অতএব আর সব,—তঁাহার কিঙ্কর।।” (শ্রীচরিতামৃত)

এই সকল পদ্য কৃষ্ণ এবং গুরুদেব সম্বন্ধেও আলোচনা করিবেন।

### শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর শ্রীগুরুতত্ত্ব-বিচার

ভক্ত, কৃষ্ণ ও গুরুদেব কেবল অভিন্ন হইলে ভক্তিমার্গের অস্তিত্ব থাকে না, উহা নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান-মার্গ হইয়া যায়। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ ও শ্রীমন্নহাপ্রভু গুরুদেবকে মর্ত্যবুদ্ধি করেন নাই, কিন্তু ভগবদ্বুদ্ধি করিলেও তাঁহাকে ভগবানের সেবক ভক্ত জানিয়াছেন। কৰ্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তগণ সকলেই গুরুদেবকে ভগবদ্দৃষ্টি করিয়া থাকেন। কেহই প্রাকৃত দৃষ্টি করেন না। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তগণ গুরু ও ভগবানে অভেদ দৃষ্টি করিলেও গুরুদেবকে কৃষ্ণের প্রিয়তম জানেন। শ্রীকৃপানুগ আচার্য্যপ্রবর শ্রীজীব গোস্বামী অজাত-রুচি বৈধমার্গীয় ভক্তগণের মঙ্গলের জন্য ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—“শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদ দৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।” অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তগণ শ্রীগুরুর এবং শ্রীশিবের সহিত ভগবানের অভেদ-দৃষ্টি-ব্যাপারকে ভগবানের প্রিয়তমত্ব বলিয়া মনে করেন। প্রমাণ-স্বরূপ আমাদিগের আচার্য্য শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের প্রিয়তম জানিবার পরিষ্কার প্রমাণ দিয়াছেন; তাহা এই—

বয়স্তু সাক্ষাভুগবন্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমনে।

সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যোৰ্ভিষক্ তমং ত্বাদ্যগতিং গতাস্থা ॥

(ভাঃ ৪।৩০।৩৮)

তব যঃ প্রিয়ঃ সখা তস্য ভবস্য। অত্যন্তমচিকিৎস্যস্য ভবস্য জন্মনো মৃত্যোশ্চ ভিষক্ তমং সদৈদ্যং ত্বাং গতিং প্রাপ্তা ইত্যেষা। শ্রীশিবো হ্যেযাং বক্তৃগাং গুরুঃ শ্রীপ্রচেতসঃ শ্রীমদষ্টভুজং পুরুষম্ ॥ (ভক্তিসন্দর্ভ-২১৩)

প্রাচীনবর্হিতনয় প্রচেতাগণ শ্রীশিবের শিষ্য। প্রচেতাগণ রুদ্রগীত-দ্বারা ভগবান্ অষ্টভুজকে আবির্ভাব করাইয়া যে স্তব করেন, তাহার মধ্যে এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়। প্রচেতাগণ বলিলেন,—“হে ভগবন্! আমরা আপনার প্রিয় সখা শিবের অল্পকাল সঙ্গ প্রভাবে অত্যন্ত দুশ্চিকিৎস্য জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারের ভিষক্শ্রেষ্ঠ আদ্যগতি তোমাকে লাভ করিয়াছি।” এই শ্লোকে প্রচেতাগণ তাঁহাদের গুরুদেব শিবকে কৃষ্ণের প্রিয়সখা বলিয়া নির্দ্বারণ করিয়াছেন।

### শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর বিচার

আচার্য্যবর শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীকৃপানুগ-জনের রাগানুগ-মার্গীয় প্রধান আচার্য্য। তিনি বলেন,—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।

শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং

মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ।। (মনঃশিক্ষা, ২য় শ্লোক)

অর্থাৎ হে মন, তুমি বেদাদিষ্ট ধর্ম্মসমূহ বা বেদনিষিদ্ধ অধর্ম্মাদি কিছুই করিও না, ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যার এখানেই সাধন কর। শচীনন্দনকে ব্রজেন্দ্রনন্দন জানিবে ; গুরুদেবকে কৃষ্ণপ্রিয়তম জানিয়া সর্ব্বদা স্মরণ করিবে।

### শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্ত

শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।

তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।। (চৈঃ চঃ ১।১।৪৪)

এস্থানে শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্য না হইলেও চৈতন্যদেবের প্রকাশ। শুদ্ধভক্ত জগতের গুরু চৈতন্যদেবের প্রকাশ, নিত্যানন্দ প্রভু বিষ্ণুতত্ত্বের মূলবস্তু হইলেও দশ দেহ ধারণ করিয়া কৃষ্ণ-সেবা করেন।

### শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সিদ্ধান্ত

শ্রীপাদ ঠাকুর নরোত্তম প্রার্থনার মধ্যে লিখিয়াছেন,—

“সুবর্ণের ঝারি করি, রাধা-কুণ্ডে জল পুরি,

দৌহাকার অগ্রেতে রাখিব।

গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে,

চামরের বাতাস করিব।।”

হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,

দৃঢ় করি’ ধর নিতাইর পায়।

সে-সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,

সেই পশু বড় দুরাচার।। (প্রার্থনা—১১।৩)

### শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের শিক্ষা

শ্রীপাদ চক্রবর্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

“সাক্ষাদ্ভরিতেন সমস্তশাস্ত্রে-রুজুস্তথা ভাব্যত এব সত্ত্বিঃ।

কিন্তু প্রভোঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।

অর্থাৎ যদিও সকল শাস্ত্রে গুরুদেব ভগবান্ বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং তাহাই বৈষ্ণবগণ-কর্তৃক বিবেচিত হইবে, তথাপি গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেও ভগবানের প্রিয়, কৃষ্ণের প্রকাশ-স্বরূপ, তাঁহাকে আমি বন্দনা করি।

### শ্রীল ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর শিক্ষা

শ্রীগৌরপার্ষদ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপাল গুরু, তচ্ছিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী শুদ্ধভক্তের পরমাদৃত স্বীয় পদ্ধতি গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—“শ্রীমহাপ্রভু-শেষ

নির্মাল্যেন শ্রীবাসাদিপার্ষদান্ পূজয়েৎ। তথৈব তত্তত্তান্ শ্রীগুৰ্বাদীন্ ভক্তিতঃ ॥” অর্থাৎ শ্রীগৌরনির্মাল্য-দ্বারা শ্রীবাসাদি পার্ষদ ভক্তগণের পূজা করিবে। সেই প্রকার গৌরপ্রসাদদ্বারা শ্রীগুরুদেবপ্রমুখ ভক্তগণের ভক্তিসহকারে পূজা করিবে।

### শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপদেশ

শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

গুরুকে সামান্য জীব না জানিবে কভু।

গুরু—কৃষ্ণ-শক্তি, কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ, নিত্যপ্রভু ॥

গুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করা মায়াবাদীর মত ; শুদ্ধ বৈষ্ণবের মত নহে। সাধক-ভক্তগণ এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবেন। মায়াবাদ সূচাক্ষরে সাধন-মধ্যে প্রবেশ করিলে সমস্ত সাধন দূষিত করিবে।

### (শ্রীল প্রভুপাদের) নিজ উপদেশ

এ সম্বন্ধে পত্রান্তরে ১৩১০ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ এখানে উদ্ধৃত হইল—

শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত শ্রীবৈষ্ণবসন্দর্ভ-নামধেয় মাসিক পত্রের দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। এই পত্র-সম্বন্ধে কোন স্থলে বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়াছে—“ইহা পূর্বাচার্য্য গোস্বামিগণের অপ্রকাশিত অভিনব মাসিক সন্দর্ভ।” অত্রস্থ অদৃষ্টচর নবীন মত একটি আমাদের অদ্যকার আলোচ্য-বিষয়। কতিপয় শুদ্ধ বৈষ্ণব ব্যাখ্যিত হইয়া আমাদের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গুরুনিষ্ঠা (১) প্রবন্ধের চরম মীমাংসা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন। তাহা বাস্তবিকই পূর্বাচার্য্য গোস্বামিগণ জানিতেন না। তাহা এই—“সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ শচীনন্দন কি শিখাইলেন? শিখাইলেন—শ্রীগুরুই ঈশ্বর পরম স্বতন্ত্র বস্তু।” কিন্তু কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের আশ্বাসবাণী নিম্নলিখিত হইল দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। ভক্তিবিরোধী মন্ত্রজীবগণের বাগাড়ম্বরে পরমার্থ ভ্রষ্ট হইয়া অনেকে বঞ্চিত হন, ইহা চিন্তা করিলেও আমাদের দুঃখ হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শিখাইয়াছেন,—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।

যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥ ( চৈঃ চঃ ২।৮।১২৭)

সুতরাং বস্তুতঃ ঈশ্বর না হইয়াও ঈশদাসগণ কৃষ্ণতত্ত্ববিদ হইলে গুরু হন, জানা গেল।

### পারমার্থিক গুরু তিন প্রকার

পারমার্থিক শাস্ত্রে লিখিত আছে শ্রীগুরু তিন প্রকার,—শ্রবণ-গুরু, ভজন-শিক্ষাগুরু ও মন্ত্রগুরু। বর্ষ্যপ্রদর্শক গুরু বা শ্রবণ-গুরু অনেক স্থলে ভজনশিক্ষা-গুরু একই ব্যক্তি হন। শিক্ষাগুরু অনেক হইলেও আগম মন্ত্রশাস্ত্র-কুশল গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়। মন্ত্রগুরু যদি অবৈষ্ণব হন, তাহা হইলে তাঁহার স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে ত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্ত-গুরুর চরণাশ্রয় কর্তব্য। শ্রীগুরুদেবকে অতীষ্ট দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবেন। তত্ত্ববাদিগণ মায়াবাদিগণের ন্যায় চিদ্রস্তুতে বিশেষ নাই, স্বীকার করেন না। শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—

“তস্মিংশ্চিন্মাত্রাহপি বস্তুনি যা বিশেষাঃ স্বরূপভূতশক্তিসিদ্ধা ভগবত্তাদিরূপা বর্তন্তে তাংস্তে বিবেক্ষুঃ ন ক্ষমন্তে যথা রজনী খণ্ডিনি জ্যোতিষি জ্যোতির্মাত্রাহপি যে মণ্ডলাস্তব্বহিঃচ দিব্যবিমানাদি-পরস্পরপৃথগ্ ভূতরশ্মিপরমাণুরূপা বিশেষান্তাংশ্চক্ষুযী ন ক্ষমন্তে ইত্যদ্যন্তদ্বং। পূর্ববচন যদি মহৎকৃপা-বিশেষণ দিব্যদৃষ্টিতা ভবতি তদা বিশেষোপলব্ধিঃ চ ভবেৎ।” শ্রীগুরুদেবকে মায়াবাদ-বুদ্ধিতে দর্শন করিলে ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন হয়, কিন্তু বাস্তবিক (গুরুকৃপা) মহৎকৃপা বিশেষদ্বারা দিব্যদৃষ্টিলাভ হইলে ঈশ্বর বস্তুতে বিশেষ ধর্ম উপলব্ধি হয়। তখন ‘বন্দে গুরুন’ প্রভৃতি শ্লোকদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আনুগত্যভিলাষে রুচি হয়।

কৃষ্ণ, গুরুদ্বয় ভক্তাবতার প্রকাশ।

শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাস। (চৈঃ চঃ আঃ ১। ৩২)

এই মহাজনবাক্য হইতে জানা যায় যে শক্তিগত ভেদ নিত্য। তাহা ভাষা বিকাশ-কৌশলে চাপিয়া রাখিলে চলিবে না। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভু গুরুতত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার মানসে লিখিয়াছেন,—

যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।

তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১। ৪৪)

সূতরাং মূঢ় এবং নিপুণ উভয় পাঠকই সহজে বুঝিতে পারেন যে, বস্তুতঃ শ্রীগুরু ঈশ্বর নহেন, কিন্তু ভগবদাস। তাঁহার সহিত প্রাকৃত ব্যবহার করিলে কৃষ্ণপ্রসাদ কোন কালেই লাভ হইবে না। অপ্রাকৃত নিত্যরূপে গুরুদেবকে সর্বদা চিন্ময় বুদ্ধি করিবে।

### তাজ্য গুরুর পরিচয়

গুরুকে দূর্নৈতিক, অর্থলোভী, ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছাবান, যোষিৎসঙ্গী, কৃষ্ণভক্ত, কপট, জীব-হিংসাপর, লাভপূজা-প্রতিষ্ঠাসেবী, মদ্রজীবী, অবৈষম্য বলিয়া জানিতে পারিলে তাহার আশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে না। সেই অযোগ্য কপটকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করত কৃষ্ণতত্ত্ববিদ অমর্ত্য অপ্রাকৃত গুরুপ্রশ্রয় অবশ্য কর্তব্য। চতুর্দশভুবনবন্দ্য শ্রীভগবৎপার্বদবর আচার্য্য শ্রীমৎ প্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুগ বর্তমান এই ভাবী মহামহোদয় বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য। তিনি, স্বরূপদামোদর এবং শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুদ্বয়ের অনুগমনে যে গুরুদেবের তত্ত্ব মনঃশিক্ষা গ্রহে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে কাল্পনিক গগনভেদী চীৎকার কখনই সুফল উৎপন্ন করিবে না। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দের প্রেষ্ঠ পরম প্রিয়; সূতরাং মুকুন্দ নহে।

### আচার্য্যবর্গের মতের পুনরালোচনা

শ্রীল প্রভু নরোত্তমদাস তদীয় প্রার্থনায় ‘নিতাই-পদ-কমল’ প্রভৃতি গীতে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া শিখাইয়াছেন, তাহাতে তাত্ত্বিক বৈষ্ণবমাত্রেই বুঝিতে পারেন যে—গুরুদেব সন্ধিনী, হ্রাদিনী বা সন্ধিৎ শক্তিমূলে নিত্য বিরাজমান, কেবল সন্ধিৎ-শক্তি পরিচয় তাঁহার স্বন্ধে চাপাইতে গেলে মায়াবাদী বা বাউল সহজিয়া মত হইয়া যাইবে। যতীন্দ্র শ্রীমদ্ব্যনচন্দ্র গোস্বামিপাদ বিশুদ্ধ মহানুভব বৈষ্ণবগণের ব্যবহার হইতে তদীয় পদ্ধতিতে

যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে এই গ্রন্থের বিশেষ আদর আছে। যথা—

“শ্রীমহাপ্রভু-শেষ-নির্মাল্যেন শ্রীবাসাদি পার্শদান্ পূজয়েৎ। তথৈব তদ্ভক্তান্ শ্রীগুর্বাচীন ভক্তিতঃ।” এই সকল আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, স্বার্থাক্ষ হইয়া গুরু-সম্বন্ধে নবীন মত প্রচার করিলে একটি উপসম্প্রদায়ের নির্জীব ভিত্তি স্থাপন হইবে মাত্র। এই প্রকার উপসম্প্রদায়ের অভাব নাই। অবশেষে শ্রীগুরুদেব এই স্বার্থাক্ষগণকে নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।

—জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ

## বেদান্তে শব্দবাদ

ওঁ অজ্ঞান-তিমিরাক্ষস্য জ্ঞানাজ্ঞান-শলাকয়া।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

পূজ্যপাদ বৈষ্ণবমণ্ডলি! প্রাণপ্রিয় শ্রোতৃমণ্ডলি! আপনারা লক্ষ্য করিয়াছেন বস্তুমাত্রেরই ধর্ম আছে। আমরা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যত প্রকার বস্তুরই ধারণা করি না কেন, সমুদয় বস্তুরই ধর্ম আছে এবং আপনারা কলেজের পাঠ্যপুস্তকেও Substance & Attribute-এর কথা পড়িতেছেন। আমাদের পাঠ্যের মধ্যে আমরা যে Attribute-এর সর্ব্বদা আলোচনা করিয়া থাকি তাহার অপর নাম ধর্ম। দৃশ্যবস্তুসমূহের Attribute বা ধর্মের কথা আমরা বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া জানিলেও উহা ছাড়া স্বতন্ত্র ও অন্য প্রকার ধর্ম সম্বন্ধে জানিবার আমাদের একটা ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে। সেই ধর্ম সম্বন্ধেই আমার পূর্ব্ববর্তী বক্তা আপনাদের নিকট আলোচনা করিয়াছেন। আমি তদনুকূলে উক্ত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করিব।

শ্রোতৃমণ্ডলি! আপনারা সকলেই উচ্চশিক্ষিত। আপনারা আমার “পুনরাবৃত্তি দোষ” গ্রহণ করিবেন না, কারণ পাণিনি প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ বলেন,—“আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী।” এই মতের সর্বত্র আদর না থাকিলেও বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কারণ বক্তব্য বিষয়—এক বই দুই নহে।

আমি অদ্যকার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি আখ্যায়িকা আপনারদের সমক্ষে জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদের কথা শুনিয়া থাকিবেন। ‘হিরণ্য’-অর্থে কনক অর্থাৎ টাকাকড়ি, ধনরত্নাদি বুঝায় ; ‘কশিপু’-শব্দে বিছানা বা উত্তম শয্যা ; উত্তম শয্যা অর্থে কামিনীকে লক্ষ্য করে। সুতরাং ‘হিরণ্যকশিপু’-অর্থে কনক-কামিনী বুঝায়। প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি Embodiment of কনক-কামিনী অর্থাৎ কনক-কামিনী-বিগ্রহ ছিলেন। আমরা এখানে বহু পিতা ও বহু পুত্র উপস্থিত আছি। আমরা একটু ধীর-চিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিব যে, আমরাও অনেকেই কনক-কামিনী-লুব্ধ হিরণ্যকশিপু। আমরা জন্মাবধি পিতামাতার নিকট যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি বা



করিতেছি তাহার মূলে কনক-কামিনী সংগ্রহ ব্যতীত অন্য যুক্তি সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। শ্রবণের আবশ্যিকতা স্বীকার করার নামই গুরুকরণ স্বীকার। আধুনিক গতানুগতিক ধারণায় গুরুকরণের আবশ্যিকতা নাই। এমন কি কনক-কামিনী-বিগ্রহ হিরণ্যকশিপু এই শ্রবণের আবশ্যিকতারূপ গুরুকরণকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি তাহার অতি আদরের পুত্রের জ্ঞানোপার্জনের জন্য নিজ-গুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট শ্রবণ করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ‘শুক্রাচার্য্য’-শব্দে আমরা বুঝিতে পারি—যিনি শুক্র অর্থাৎ জননোপাদানের আচার্য্য। হিরণ্যকশিপুর মত ব্যক্তির গুরুদেব শুক্রাচার্য্য ব্যতীত আর কে-ই বা হইতে পারে? “কনক-কামিনীর গুরু” জননাচার্য্য। (শ্রোতৃমণ্ডলীর অট্টহাস্য)। সুতরাং হিরণ্যকশিপু তাহার পুত্রের জন্য ‘জননাচার্য্য’-কেই নিযুক্ত করিলেন। পিতা যে প্রকৃতির লোক, পুত্রকে তদনুকূল শিক্ষা দেওয়াই পিতার স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি। আমাদের এই শিক্ষা-মন্দিরে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা আমাদের পিতামাতার চিন্তবৃত্তির অনুকূল এবং পুত্রগণও তৎশিক্ষায় শিক্ষিত হইবে—এইরূপ আশা করিয়া আমাদের এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদের স্ব-স্ব পিতৃগণ আমাদের উক্ত শিক্ষা ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষার জন্য যত্নবান হইতে দেখিলে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। এমন কি, যে শিক্ষাতে কনক-কামিনী-সংগ্রহ-চেষ্টা নাই, এমন কোন শিক্ষামন্দিরে পুত্রকে যাতায়াত করিতে দেখিলে পিতার হৃদয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং পুত্রকে তৎপথ হইতে ফিরাইবার জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়া থাকেন এবং হাত-পা, কাপড়-চোপড় ধরিয়া জোর করিয়া টানিতে থাকেন। (শ্রোতৃমণ্ডলীর হাস্য)। প্রহ্লাদ মহারাজ পিতার আদেশে শুক্রাচার্য্যের নিকট অধ্যয়নের জন্য প্রেরিত হইলেন। অসুরকুল-গুরু শুক্রাচার্য্য দেবগণের এবং দৈবভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধাচারণের জন্য সর্বদাই চিন্তিত ও ব্যস্ত। তিনি অসুর-কুলাধিপতির আদরের পুত্রের শিক্ষার ভার তাহার আত্মজ ষণ্ড ও অমর্কের উপর ন্যস্ত করিলেন। যেমন শুক্রাচার্য্য জননাচার্য্য, তেমনই তাঁর পুত্রদ্বয় ষণ্ডামর্ক। ষণ্ডামর্ক অতি যত্নসহকারে রাজপুত্রের শিক্ষাপ্রদানে ব্যাপ্ত হইলেন। শিক্ষা-মন্দিরে কিছুকাল অতিবাহিত করিলে পর হিরণ্যকশিপু তাহার পুত্রের অধীত শিক্ষার পরিমাণ উপলব্ধির জন্য প্রহ্লাদকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বৎস প্রহ্লাদ, তুমি তোমার গুরুর নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছ, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিক্ষা যাহা, তাহা আমার নিকট কীর্তন কর।” প্রহ্লাদ মহারাজ তদুত্তরে—“শ্রবণং কীর্তনং বিশেষঃ স্মরণং পাদসেবনম্” শ্লোকটি কীর্তন করিলেন। কনক-কামিনী-লুপ্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষুণোম শ্রবণ-কীর্তনের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বিষবৎ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। তাই হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ষণ্ডামর্কের প্রতি পুত্রের এই প্রকার প্রবৃত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ষণ্ডামর্ক তাহাদের নিজ শিক্ষার পরিচয় দিয়া বলিলেন,—“আমরা ঐ প্রকার শিক্ষা কোন দিনই লাভ করি নাই এবং আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যও এরূপ নহে যে, কেহ বিষুণু-পরায়ণ হইয়া আমাদের আসুরিক প্রবৃত্তির পরিপন্থী হয়।” হিরণ্যকশিপু আশ্চর্য্যাব্বিত হইয়া প্রহ্লাদকে পুত্রস্নেহে সাময়িক ক্ষমা করিলেন।

ইহা অতি আনন্দের বিষয় যে, আপনাদের এই শিক্ষা-প্রচার-গৃহে প্রার্থনা-মন্দির

প্রতিষ্ঠিত আছে। আপনাদের নিকট আমার প্রার্থনা—আপনারা এই প্রার্থনা-মন্দিরে প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষা-বিষয়টা বিশেষরূপে আলোচনা করুন। প্রহ্লাদ মহারাজ সর্বপ্রথমেই বিষ্ণুর শ্রবণ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। তাহার কারণ—আমরা ভূমিষ্ঠ হইবার পর প্রথমেই শ্রবণ-অধিকার লাভ করিয়াছি। সুতরাং আমাদের ধর্মালোচনা করিতে গেলে শ্রবণেরই সর্বপ্রথম আবশ্যকতা। প্রহ্লাদ মহারাজ যেরূপ ষণ্ডমর্কের নিকট তাহার পিতার অভীক্ষিত বিষয়ের শিক্ষালাভের মধ্যে বিষ্ণু-তত্ত্বের শ্রবণ-কীর্তনই শিক্ষা করিয়াছেন, তদ্রূপ আমরা প্রার্থনা—আপনারা যে-শিক্ষার আলোচনা করিতেছেন, তাহার মধ্যে বিষ্ণু-তত্ত্বের বিষয় শ্রবণ-কীর্তন করুন। তদ্বিষয়ে আপনাদের কথঞ্চিৎ চেষ্টা আছে ইহাও আমরা লক্ষ্য করিতেছি। আপনারা প্রাকৃত-বস্তু-সকলের ধর্মের আলোচনা সর্বদা করিতে থাকিলেও তাহার মধ্যে উক্ত ধর্ম ব্যতীত অন্য প্রকার আর একটা স্বতন্ত্র-ধর্মের আলোচনা করার প্রবৃত্তি আপনাদের অন্তঃকরণের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি দেয় ও হৃদয়ের দ্বারে nock করিতে থাকে। তাই বলিতেছি, আপনাদের হৃদয়েতে ঐ ভাবটার অনুশীলন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রবণ-পথের অঙ্গীকার করুন। যে কোন বস্তুর জ্ঞান উপার্জন করিতে হইলোই শ্রবণেরই বিশেষ আবশ্যক। এই জন্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শ্রবণের গ্রাহ্যবস্তু শব্দকেই মূল ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

সম্প্রদায় বলিলে আমাদের হৃদয়েতে এক প্রকার সঙ্কোচের ভাব উদ্ভিত হয়। আমার পূর্ববর্ত্তী বক্তা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্ম-সম্বন্ধে বলেন নাই। আমাদের পিতামাতা আমাদের বাল্যাবস্থা হইতেই আমাদেরকে বলেন,—“তোমরা ভাল করিয়া লেখাপড়া না শিখিলে ভাল ঘরে তোমাদের বিবাহ হইবে না। অর্থোপার্জন করিতে না পারিলে নিজের ও বিবাহিতা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করিবে কেমনে?” (শ্রোতৃমণ্ডলীর অট্টহাস্য)। আপনারা সকলেই বুদ্ধিমান ও উচ্চ শিক্ষিত ; এখন একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন, এই শিক্ষাতে শুধু কনক এবং কামিনীকেই লক্ষ্য করিয়াছে কি না এবং পিতামাতার শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কনক-কামিনী সংগ্রহ করিয়া সুখে জীবন যাপনই আমাদের মূল উদ্দেশ্য হইয়াছে কি না? অবশ্য যাঁহাদের পিতামাতা পুত্রদের এই প্রকার শিক্ষাই দেন, আমি তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিতেছি। আমি আপনাদিগকে আরও ধীরভাবে এই বিষয়টা চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। আপনারা এখানে যে Attribute এর আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন তাহার মূলেও কনক সংগ্রহ ও বিবাহাদি দ্বারা সংসার-সৃষ্টি নির্বাহ করা।

আমাদের দেশে যে স্মৃতি প্রচলিত আছে, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে—“আত্মবৎ জায়তে পুত্রঃ”; সুতরাং হিরণ্যকশিপুর ন্যায় পিতার গুরসে প্রহ্লাদ মহারাজের আবির্ভাব হওয়া সম্ভব কিরূপে হইল? ‘প্রহ্লাদ’-শব্দে প্রকৃষ্ট হ্লাদ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট আনন্দ বুঝায়। প্রকৃষ্ট আনন্দ বলিলে ‘প্র’-উপসর্গেতে নিত্য অপরিবর্তনশীল জড়াতীত চিন্ময়-সত্তা-বিশিষ্ট বুঝা যায়। আমরা এ জগতে যে আনন্দের সত্তা উপলব্ধি করি তাহাতে এবং তাহার ফলে ও মূলে নিরানন্দই বর্ত্তমান। এই প্রাকৃত জগতে আনন্দের যে প্রতিমাই দেখা যাক না কেন, উহা নিরানন্দেরই প্রতিকৃতি। এ ক্ষেত্রে দার্শনিকভাবে বিষয়টা আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, নিত্যসত্তাবিশিষ্ট চিন্ময় আনন্দের অভাব

কুত্রাপি নাই এবং সম্ভবপর নহে। চিদানন্দের অধিষ্ঠানহেতুই অন্যপ্রকার আনন্দের উপলব্ধি হইতেছে। বিষ্ণু সর্বজগতে ওতপ্রোতভাবে বর্তমান থাকায় জগতের প্রতীতি হইতেছে। “কনক-কামিনী” হিরণ্যকশিপু হইতে যে আনন্দ সম্ভূত অর্থাৎ উদ্ভূত হয় তাহা অনিত্য ও অনুপাদেয়ই হওয়া সম্ভব ; তাহা আমরা উক্ত স্মৃতিবচনের দ্বারাই জানিতে পারি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রহ্লাদ মহারাজের অর্থাৎ নিত্যানন্দের আবির্ভাব হওয়ায় আমরা ইহাই শিক্ষা পাই যে, নিত্যানন্দের আত্যন্তিক অভাব কুত্রাপি নাই ও হইতে পারে না ; তিনি সর্বব্যাপী ও নিত্য সদ্ধর্ম-বিশিষ্ট।

আমরা সূতিকাগৃহের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারি যে, সম্ভ্রান্ত ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিই একসঙ্গে প্রস্থুতি হয় না। সর্বপ্রথম কণ্ঠেন্দ্রিয়ের বিকাশ হইয়া থাকে। এইজন্য আম্মাদের শ্রবণই আদি উপাদান। কোন বস্তুবিষয়ক জ্ঞান উপার্জন করিতে হইলে প্রথমতঃ শ্রুতি বা শ্রবণের সাহায্যই আবশ্যিক। প্রসঙ্গক্রমে আমি একটা বিষয় উল্লেখ করিতেছি। অনেকে শ্রবণের আবশ্যিকতা মনে না করিয়া নিজেরাই অনেক বিষয় আলোচনা করিয়া তার অভিজ্ঞতা-লাভে যত্নবান্। সে-প্রকার চেষ্টা-যত্নকে কখনই প্রশংসা করা হয় না।

—জগদগুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

পরমারাধ্যতম শিক্ষাগুরু এবং জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

শুভাবির্ভাব-শতবার্ষিকী উপলক্ষে

**আৰ্ত্তি-পুষ্পাঞ্জলি**

সুধীবৃন্দ! আমি পরমপূজ্যপাদ নিত্যলীলাপ্রবিশ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব-শতবার্ষিকী-পূর্তি উপলক্ষে তাঁহার অতিমর্জ্য গুণাবলী কীর্তনের আদেশ পাইয়াছি। আমি আমার নিজ জীবন পবিত্র করিবার জন্য অন্যান্য বিষয়ে প্রবেশ না করিয়া প্রত্যক্ষরূপে তাঁহার জীবনচরিতের যাহা কিছু দেখিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি, তন্মধ্যে কিছু প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতেছি।

আমি একাদশ বর্ষ বয়সে শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। ঐ সময় কলিকাতার ১নং উল্টাডিসি জংশন রোডের মঠে (ভাড়া বাড়ী) থাকিয়া পাঠশালায় পড়াশুনা করিয়াছিলাম। পরবর্তিকালে মায়াপুরে মঠে থাকিয়া শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছি। ঐ সময় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্তমান সভাপতি-আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজও আমার সহপাঠী ছিলেন। আমরা দুইজন একসঙ্গে থাকিয়া পড়াশুনা এবং মঠের সেবাদি করিতাম। অতএব ঐ সময় হইতে পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অত্যন্ত নিকটে থাকিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজকে তখন সকল

মঠবাসীগণ অত্যন্ত প্রীতিপূর্বক 'বিনোদ দা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আমিও তাঁহাকে 'বিনোদ দা' বলিয়া ডাকিতাম। তখন তাঁহার সন্ম্যাস হয় নাই। তিনি মায়াপুর এস্টেটের ম্যানেজাররূপে সবকিছু দেখাশুনা করিতেন। তিনি সর্বদা বিলাসবহুলভাবে থাকিতেন এবং অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণ ও খাজনা ইত্যাদি আদায় করিতে যাইতেন। তখন বিনোদদার এতই প্রভাব ছিল যে তাঁহাকে দেখিয়া আমি ভয়ে ভীত হইতাম। যদিও তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন তথাপি সকল সন্ন্যাসী ও জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদান করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয়সেবক পরমপূজ্যপাদ শ্রীনরহরি প্রভু তখন মায়াপুর মঠের মঠরক্ষক ছিলেন। তিনি সকলের নিকট মাতৃসমা ছিলেন। তাঁহাকে আমরা প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতাম। মঠবাসী ছোট বালকদিগকে তিনি অত্যন্ত প্রীতির সহিত লালনপালন করিতেন। তজ্জন্য আমরা সকলেই নিঃসঙ্কোচে তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিতাম। অত্যন্ত গম্ভীর স্বভাবের পূজ্যপাদ বিনোদদার সহিত অত্যন্ত সরল হৃদয়ের নরহরি প্রভুর পারমার্থিক মিলন এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং আশ্চর্যজনকও বটে। তাঁহাদের দুইজনের আদর্শ চরিত্র, আদর্শ গুরুনিষ্ঠা, গুরুসেবা এবং সাধন-ভজনের আদর্শের প্রতি আমরা সবাই অত্যন্ত অনুপ্রাণিত ছিলাম বলিয়া আজও পর্যন্ত ভজনরাজ্য হইতে চ্যুত হই নাই। তাঁহাদের দুইজনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল।

শ্রীপাদ নরহরিদা সারাদিন শ্রীমঠের সেবাকার্য্যে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও সর্বদা উচ্চস্বরে হরিনাম করিতেন। কিন্তু রাত্রে কি করিতেন তাহা আমি জানিতাম না। একদিন মধ্যরাত্রে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইলে দেখি তিনি তন্ময় হইয়া আর্তস্বরে “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।” মহামন্ত্র জপ করিতেছেন। আমি আরও আশ্চর্য্যাব্বিত হইলাম ইহা দেখিয়া যে, তিনি একটা দড়ি দিয়া খুঁটির সহিত তাঁহার শিখা বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন। তখন আমি তাঁহার মনোযোগ নষ্ট করা উচিত নয় চিন্তা করিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িলাম। প্রাতঃকালে তাঁহার শ্রীচরণকমলে দণ্ডবৎ-প্রণতিপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলাম,—‘প্রভো! আপনি রাত্রে ভজন করিবার সময় খুঁটিতে দড়ি দিয়া শিখা বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন কেন?’ তিনি আমাকে অত্যন্ত প্রীতিপূর্বক বলিলেন,—“তুমি এখন এসব বুঝিতে পারিবে না, যাও, লেখাপড়া কর। দেখ, সারাদিন মঠের বিভিন্ন সেবাকার্য্যে ব্যস্ত থাকার জন্য হরিনাম করিবার সময় পাই না, রাত্রে হরিনাম করিবার সময় আলস্য এবং নিদ্রা যাহাতে না আসে তজ্জন্য আমার শিখা খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখি।” সাধন-ভজনে তাঁহার এইরূপ অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল।

পূজ্যপাদ বিনোদদা অত্যন্ত গম্ভীর এবং উদার প্রকৃতির ভজন-পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রথম হইতে বেদান্তাদি শাস্ত্রে পারদস্ত ছিলেন। ভক্তিসিদ্ধান্তে তাঁহার দার্শনিক বিচার এবং অকাট্য যুক্তি শ্রবণ করিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া যাইতেন। শ্রীল মহারাজ পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশ) বরিশাল জেলার বানারিপাড়া গ্রামে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার পূর্বশ্রমে গিয়াছিলাম।

অত্যন্ত বালক হইলেও তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া চিন্তা করিতাম যে, এই ধরণের মাতা-পিতা, ভাই-বন্ধু, ধন-সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া কি-প্রকারে ভজনরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি অস্বদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি কায়-মন-বাক্যে শ্রীল প্রভুপাদে সমর্পিতায়া ছিলেন। প্রভুপাদের সেবায় তিনি নিজের প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রভুপাদের প্রকট-কালে তিনি তাঁহার সেবার জন্য সর্ব্বদা তৎপর ছিলেন এবং অপ্রকটের পরেও প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধভক্তিপ্রচারকেন্দ্র ও মঠসমূহে তাঁহার আদর্শ আচার-বিচার রক্ষার জন্য সতত যত্নশীল ছিলেন। নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন তাঁহাকে তাঁহার কর্তব্য হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারে নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে,—শ্রীগুরুপাদপদ্মের চরণকমল আমার মস্তকে বিরাজিত থাকিয়া সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করিবেন। এই আত্মবিশ্বাসের জোরে তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহীষ্ট সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার কোনরূপ ভয় ছিল না। তিনি একজন নিরপেক্ষ সত্যের নির্ভীক বক্তা ছিলেন। প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পর ‘শ্রীনন্দীয়া-প্রকাশ’, ‘শ্রীগৌড়ীয়’, ‘শ্রীভাগবত-পত্রিকা’ প্রভৃতি দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকাসমূহ বন্ধ হইয়া গৌড়ীয় মঠের প্রচার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তখন তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বাংলা মাসিক ‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা’, হিন্দী মাসিক ‘শ্রীভাগবত-পত্রিকা’ প্রকাশিত করিয়া সারা ভারতবর্ষে শ্রীল প্রভুপাদের শুদ্ধভক্তিধারা নির্ভীককণ্ঠে প্রচার করেন। শ্রীল প্রভুপাদের মনোহীষ্ট পূর্ণ করিবার জন্য তিনি কলিকাতাতে সর্ব্বপ্রথম ‘শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি’ স্থাপন করেন। পরবর্ত্তিতে শ্রীল প্রভুপাদের দীক্ষিত এবং সন্ন্যাসী শিষ্য, সতীর্থ গুরুভ্রাতা পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের নিকট হইতে কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে শ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত কোলদ্বীপস্থ নবদ্বীপ-শহরে ‘শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ’ স্থাপন করেন। সদগুরুর সকল লক্ষণ তাঁহার জীবনে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

আমিও তখন অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে মূলমঠ ছাড়িয়া কেশিয়াড়ীতে মঠ স্থাপন করি। তিনি কৃপাপূর্ব্বক এই মঠে একবার পদার্পণ করিয়া নির্ভীকভাবে কোন এক অপসম্প্রদায়ের শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ-বিচার খণ্ডন করেন। সভায় উপস্থিত কাহারও তাঁহার শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ও যুক্তিপূর্ণ বিচারের প্রতিবাদ করিবার মত সাহস হয় নাই। তাঁহার বিচার শ্রবণ করিয়া সকলে আশ্চর্য্যাব্বিত ও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—ষড়্রিপূর কোন লেশ কখনও তাঁহার জীবনে প্রত্যক্ষ করি নাই। তাঁহার মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী প্রচারের বৈশিষ্ট্যহেতু তিনি শুধু বাংলা নয়, সারা ভারতবর্ষে বহু প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে তাঁহার কৃপালব্ধ শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ সারা ভারতে তথা পাশ্চাত্য দেশেও প্রচারকেন্দ্র স্থাপনপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তি এবং শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র প্রচার করিতেছেন। ইহা দেখিয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইতেছে।

“কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা বাঘিনী, ছাড়িয়াছে যারে সেই ত’ বৈষ্ণব।”—কনক,



প্রদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি আমারও ৮৪ বৎসর বয়স হইয়াছে, এই সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার সময় আসিয়া গিয়াছে। অতএব এই পুণ্যতিথির শুভলগ্নে তাঁহার শ্রীচরণকমলে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করত আমার বক্তব্য সমাপন করিলাম।

কৃপাপ্রার্থী—

—শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত

## শ্রীল পরমারাধ্যদেবের অপ্রাকৃত মহিমা-শংসন

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিঃ) এই বৎসর তাঁহার প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্যপাদপদ্য নিতালীলাপ্রবিশিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিশ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-শতবার্ষিকী-পালনে ব্রতী হইয়াছেন। সাধারণতঃ শতবার্ষিকী-অনুষ্ঠান বলিতে জগতের কোন কন্মবীর, জ্ঞানবীর বা দানবীর প্রভৃতির দেহ-মনের সম্পর্কে ভোগবন্ধনে অবদানের স্মৃতিচারণ বুঝায়। ইহা দ্বারা বস্তুতঃ এ জগতে তাঁহারা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে দৃঢ় স্থান করিয়া নইবার ব্যবস্থাই করিয়া লহেন। সেই প্রকার ঘটনার সহিত আপাত সাদৃশ্যে শ্রীসমিতির আয়োজিত অনুষ্ঠানকেও তদন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিলে মহাবিবর্ত আসিয়া উপস্থিত হইবে।

কালধীন এ জগতে বাস করিয়া কালাতীত রাজ্যের সম্বন্ধে ধারণা অসম্ভব। ভগবান্ এবং তাঁহার পার্শ্বদগণ তজ্জন্য কাল-বহির্ভূত-তত্ত্ব হইয়াও এই কালপ্রবাহে ভাসমান জীবের কল্যাণ-চিন্তায় আকুল হইয়া প্রপঞ্চিত হন। মায়ামুগ্ধ জীব তৎকালে কালের মাপকাঠি লইয়া সেই তাঁহাদের “জন্ম-কন্ম” মাপিতে গিয়া বঞ্চিত হয়। শ্রীসমিতি জগজ্জীবের এই মহাভ্রম ঘুচাইতে তাঁহারা ভগবৎ পার্শ্বদের আবির্ভাব-শতবার্ষিকী-পালনের অভিনয়ে ভগবদ্ভক্তের স্বরূপ, তাঁহাদের জন্ম-কন্মের দিব্যত্ব, কালাতীতত্ব, অতিমর্ত্যত্ব প্রভৃতি আলোচনা কেই তাঁহাদের ব্রত করিয়াছেন। ইহা কালাতীত বস্তুকে কালধীন করিবার কিছু প্রয়াস নহে।

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যমস্তথঃ যন্নসৌ।

তস্যার্ণে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোক-বার্ত্তয়া।। (ভাঃ ২।৩।১৭)

সূর্য্যদেবের উদয়াস্ত গমনাগমন আমাদের সীমিত আয়ুষ্কালকে যে কিরূপে হরণ করিয়া লয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আবার বুঝিতে পারিলেও তাহা রোধ করিবার কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু যে ‘কাল’টা আমরা উত্তমশ্লোক শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার নিত্যপার্বদগণের বার্ত্তায় কালাতীতপাত করি, ‘বোধয়ন্তুম্ পরস্পরম্’ বিচারে তাঁহার কথা-কীর্ত্তনে তোষণ ও রমণপর হই, সেই বিশেষ ‘কাল’ তৎকালে আর অপহৃত হইতে পারে না। কালাতীত বস্তুর আলোচনায় কালান্তর্গত জীবও এইরূপে কালের করালগ্রাস হইতে মুক্ত হন। “স্মর্তুব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিষ্মর্তুব্যো না জাতুচিৎ”—বিচার অবলম্বনীয়

হইলে তথায় ভগবৎ এবং ভাগবতগণ নিত্য আবির্ভূত হইয়া থাকেন ; “আবির্ভাব-শতবার্ষিকী”—কনিষ্ঠাধিকারিগণের নিকট তাঁহার সেই সূচনা বিশেষ, মধ্যমাধিকারিগণের নিকট ভজনানুকূল, উত্তমাধিকারিগণের নিকট তাঁহার আরাধ্যের উদ্দীপন।

অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপিয়া লইবার চেষ্টাকেই মায়া বলে। বহিঃস্থ জগৎ অচিন্ত্য-শক্তিকে অস্বীকার করায় পাষণ্ডতা লাভ করে। জড়-সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, কবি, স্বদেশপ্রেমিক প্রভৃতি নিরীশ্বর-নৈতিক ব্যক্তিগণের চরিত্রালোচনা, জন্ম-কর্ম-বিবরণাদি প্রদান মায়িক বিচারদ্বারা সম্ভব, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণবের পরিচয় জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। অতিমর্ত্য ভক্ত-ভাগবত-চরিত্র যখন কোন সেবোন্মুখ জীবের শুদ্ধ হৃদয়ে প্রকাশিত হন, তখনই তাহা জানিবার সুযোগ-সৌভাগ্য হয়। অধোক্ষজ-বস্তুর প্রাকৃত জন্ম-মৃত্যু নাই, জড় জনক-জননী নাই ; গুরু-বৈষ্ণব অধোক্ষজ তত্ত্ব বলিয়া তাঁহারাও প্রাকৃত জন্ম-মৃত্যু, জার্ণ-বর্ণের অতীত।—“আবির্ভাব-তিরোভাব”—এই কহে বেদ।”

সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হন বলিয়া যে রূপ পূর্ব্বদিক সূর্য্যের জননী নহে, তদ্রূপ বৈষ্ণব যে-কোন কুল আশ্রয়পূর্ব্বক প্রপঞ্চ প্রকটিত হইলেও, তাঁহাকে প্রাকৃত জাতি-কুলের অন্তর্গত বলা চরম অপরাধজনক। অপৌরুষেয় ও ভগবৎ-নিঃশ্বসিত বাণী বেদ ও ভাগবতাদি শাস্ত্রিক অবতারসমূহেরও কোন স্রষ্টা নাই। তথাপি গবেষণা-কৌতূহলরূপ ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় বিতাড়িত হইয়া ভোগপর বিচারকগণ বেদ-ভাগবতাদির খণ্ডকালান্তর্গত জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ জড় প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অর্চা শালগ্রাম শিলার জন্মস্থান, শ্রীবিগ্রহ কোন ধাতুতে কাহার দ্বারা নির্মিত, মহাপ্রসাদের মূল্য ও উৎপত্তি-স্থান প্রভৃতি জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ইহারা কখনই অপ্রাকৃত বস্তুর স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। যাহারা বৈষ্ণবেরও প্রাকৃত কুল, জাতি নিরূপণ করিতে অগ্রসর হন, তাহারা অবর্চ্যচীন ও পাষণ্ড।

সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই জগতে আগমন করিয়া থাকেন এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রয়োজন মিটাইয়া প্রাকৃত জগৎ হইতে অপ্রাকৃত জগতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই আবির্ভাব ও তিরোভাবের মধ্যবর্ত্তী সময়টুকুই মহাজনগণের বিমল চরিত্র, জ্ঞান ও ক্রিয়াকলাপ সম্যক উপলব্ধির বিষয়বস্তু হইয়া থাকে এবং মনুষ্য-সমাজও তাহা অনুসরণপূর্ব্বক সাধন-ভজনের উদ্দেশ্য-প্রয়োজনীয়তা, জীবের স্বরূপ প্রভৃতি উপলব্ধি করিয়া লাভবান হন। পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ কখনও স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া, কখনও বা তাঁহার নিজজনগণকে এ ধরাধামে প্রেরণ করিয়া সাধুগণের পরিত্রাণ ও দূষ্তগণের বিনাশসাধনদ্বারা সনাতন-ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া থাকেন।

প্রেমাবতীরী শ্রীগৌরহরির নিঃসৃত ধারায় আদ্রীকৃত ‘গৌর-বাণী-বিনোদ’-বৈভবের সংরক্ষণকারীরূপে ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ বাংলা ১৩০৪ সনের ১২ই মাঘ, সোমবার, ইং ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৯৮ কৃষ্ণ তৃতীয়া-তিথিতে ইহ জগতে আবির্ভূত হন। তাঁহার জ্ঞান, কর্ম্মধারা, আচার-ব্যবহার, সত্যানুরাগ, মানব-গোষ্ঠীর প্রতি প্রীতি, স্নেহ-মমতা, তাঁহাদের আচরণ-বিধি, স্বরূপধর্ম্ম



পালনের উপদেশ-নির্দেশ, রীতি-নীতি ও ভাবধারা বিশ্লেষণ করিলে উপলব্ধি হয়, তিনি একজন ঐশী শক্তিসম্পন্ন ভগবৎপ্রেরিত মহাজন।

“মহাপ্রভুর ভক্ত যত বৈরাগ্য প্রধান। যাহা দেখি’ প্রীত হন গৌরভগবান্।।”— এই বাক্যে অনেকেই বঞ্চিত হইয়া ফল্গুবৈরাগ্যকেই অবলম্বনীয় বলিয়া বিচার করিয়া বসেন। কিন্তু পরমারাধ্যতম শ্রীল কেশব গোস্বামিপাদ আমাদের নিকট শ্রীমমহাপ্রভুর আশয় ব্যক্ত করিয়াছেন—বৈরাগ্যের অপর নাম কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাময় বিপ্রলম্ব। যে বৈরাগ্য ব্রহ্মজ্ঞানকে তুচ্ছজ্ঞান, সাযুজ্যাদি-মুক্তির প্রতি ঘৃণা, ভয় ও অনাদর প্রদর্শন করে, তাহাই কৃষ্ণসুখ-বাঞ্ছাময়ী বৈরাগ্য-বিদ্যা। সাধক-জীবের ক্ষেত্রে “কৃষ্ণপ্রীত্যর্থ্যে ভোগ-ত্যাগ”ই ‘বৈরাগ্য’ বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু মুক্তকুলের কৃষ্ণসেবা-পরায়ণতাই ‘বৈরাগ্য’ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিত নৈষ্কর্ম্য্যাকেই ‘বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরস’ বলিয়া জানাইয়াছেন। মায়াবাদীর চিদ্বিলাস-রাহিত্যকে কখনও ‘বৈরাগ্য’ বলা যাইবে না। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবানের ক্ষেত্রে বিশেষগুণরূপে যে ‘বৈরাগ্য’-শব্দের প্রয়োগ, তাহা মায়াধীশের স্বরূপ-সম্প্রাপ্ত অবস্থা। নির্জর্ন-ভজনকালে বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে গিয়া যে কৃত্রিম প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, তাহা দ্বারা কখনও ভক্তি লাভ হয় না। মুমুক্শু জীবের ত্যাগ বা বৈরাগ্য কখনও শুদ্ধভক্তি-লাভের কারণ হইতে পারে না। অতাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ স্থূলত্যাগকে ‘বৈরাগ্য’ বলিয়া মনে করেন, কিন্তু কৃষ্ণবিলাস-লালসার চরম অবস্থাই ‘বৈরাগ্য’ বলিয়া শাস্ত্রাদিতে বিবেচিত হইয়াছে। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের বা মায়াবাদিগণের ‘বৈরাগ্য’ বস্তুতঃ নিজকামনা-পূর্ত্তিযুক্ত কৈতব-পূর্ণ অনিত্য সাধনমাত্র। নিত্যসিদ্ধ মহাত্মগণের কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যপূর্ণ নিত্যসিদ্ধ-বৈরাগ্য ভক্তিনেত্রেই দর্শন বা অনুভবের বিষয় হয়।”

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেষ্ঠ নিজজন শ্রীল গুরুপাদপদ্ম বদ্ধজীবের নিত্যকল্যাণের নিমিত্তই “মায়াবাদের জীবনী” বা “বৈষ্ণব-বিজয়” গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অন্য্যভিলাষী, কুজ্ঞানী, কুযোগিগণের তত্ত্বমতবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক তিনি তাঁহাদের বাস্তব পরমার্থ-পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আদর্শ ত্রিদিগ্-গোস্বামিরূপে তিনি বিরোধী পাষাণগণেরও বাস্তব মঙ্গল কামনা করিতেন। আমরা বহুস্থলে তাঁহার সত্যসংরক্ষণে নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় পাই। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম চিজ্জড়-সমন্বয়বাদীকে কোনদিনই প্রশ্রয় দেন নাই। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ভোগময় বিচার গর্হণমানসে তিনি ঐ বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত প্রবন্ধাদি সঙ্কলনপূর্ব্বক “সহজিয়া-দলন” গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচার এবং যুগপৎ শুদ্ধাচার-পরায়ণ নির্দোষ জীবন-যাপনের আদর্শ প্রদর্শন করেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকার ও বহু মিশন-সঙ্ঘের অনিত্য দেহ-মনোধর্ম্মের ক্রেশ-নিবারণ-প্রচেষ্টা বা সমাজ-সেবামূলক অনুষ্ঠানের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শনপূর্ব্বক পারমার্থিক চিকিৎসালয় ও বেদান্ত-বিদ্যাপীঠাদি স্থাপন করেন। দুঃসঙ্গ বর্জ্জনে তাঁহাকে ‘ব্রজাদপি কঠোর’ ও ভক্তি-অনুকূল কর্ম্মে ‘কুসুমের ন্যায় কোমল’ মনে হইত। কর্ম্মজড়-স্বার্থ-সমাজের কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্যবস্থায় ‘জননাশৌচ-মরণাশৌচ’ ও মলমাসাদি-বিচারের প্রশ্রয় না দিয়া তিনি “শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত” পালনাদি-দ্বারা শ্রীনামভজনেই শুদ্ধিতা শিক্ষা দিয়াছেন।

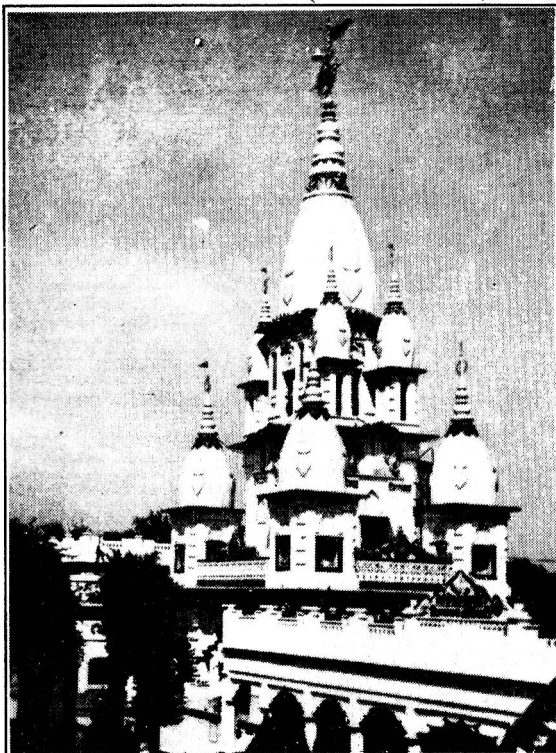
তাহার নিষ্কিঞ্চন ও সমর্পিতা হইয়া কৃষ্ণেচ্ছার উপর পূর্ণ নির্ভরশীল অর্থাৎ ‘ভগবদিচ্ছাই পূর্ণ হউক’ বা “ভগবদিচ্ছায় সব সম্ভব”—জীবনযাপনে সেবকগণ বিস্তৃত হইতেন। জীব-ব্রহ্মৈকবাদী, পাঁচমিশালী—পঞ্চপাসকী, বহীশ্বরবাদী, শূন্যবাদী, নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী প্রভৃতি অপ-উপ-ছল-ধর্মাদির বিচার শাস্ত্রযুক্তি-সিদ্ধান্তমূলে তীব্রভাবে খণ্ডন করিলেও তাহার চিত্তের সহজ-সরল-প্রশান্তভাব, নিরহঙ্কারীত্ব প্রভৃতি তাহার স্বাভাবিক ও নিত্য বৈশিষ্ট্যবতাই প্রমাণ করে।

শ্রীল পরমারাধ্যদেব কখনও নির্জর্জন-ভজনের নামে আলস্যের প্রশ্রয় দেন নাই, এবং কায়-মনোবাক্যে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণগনুশীলনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীহরিনামের দ্বারাই সর্বার্থসিদ্ধি ও কৃষ্ণপ্রেমে সমাধিলাভ হয়, তিনি ইহা স্বয়ং আচরণদ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা আদর্শ সঙ্গুরুরূপে তিনি তাহার অনুগতাভিমাত্রী জনগণকে অনর্থযুক্তাবস্থায় “অষ্টকাললীলা-স্মরণ ও সিদ্ধদেহ-ভাবনা” নিষেধ করিয়াছেন এবং জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের উপদিষ্ট “কীর্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে, সেকালে ভজন নির্জর্জন সম্ভব”—বাক্যের প্রতি সকলেরই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কোন ভক্ত একদিন রাসলীলা ও ভ্রমর-গীতাদির ব্যাখ্যা প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন,—“শুদ্ধসত্ত্ব-হৃদয়ে অনর্থ-নির্মুক্ত অবস্থায় শ্রীনামকীর্তনমুখে রাসাদিক-লীলাকথা শ্রবণের অধিকার আসে, নচেৎ শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপ্রাকৃত-লীলাকে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার ব্যাপার মনে করিয়া ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় মাত্র। সিদ্ধদেহেই রসোদ্ভাবনা সম্ভব, জড়-বদ্ধদেহে শৃঙ্গাররস ভাবনা অসম্ভব ; ইতর-বিষয়ে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত জাতরতি ব্যক্তিই সন্তোগ-রসালোচনায় অধিকারী।” ব্রজমণ্ডলাদি ক্ষেত্রে মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা জীবন-নির্বাহের অভিনয়কারিগণের অপচেষ্টাকে তিনি সর্বতোভাবে গর্হণ করিতেন এবং ঐরূপ বৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জিহ্বা-লাম্পট্যাদিতে আসক্তাবস্থায় ব্রজে বানর-কচ্ছপাদিরূপে জন্মগ্রহণের ভয়াবহ পরিণামের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেন। চিত্ত নিগুণাবস্থা লাভ না করিলে কাহারও “নিগুণ মাধুকরী ভিক্ষায়” অধিকার আসিতে পারে না—বলিতেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের অবৈধ অনুকরণ সেবা বা ভজন নহে, উহা পাষণ্ডতা বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর “পুরীষের কীট হইতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ” ও শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের “তবে লাখি মারো তার শিরের উপরে”—বাক্যদ্বয় প্রকৃতপক্ষে একই তাৎপর্য্যপূর্ণ ও উভয়েই আত্মকল্যানজনক বাস্তব দৈন্য—ইহা জানাইয়া শ্রীল মুকুন্দপ্রেষ্ঠ তাহার আশ্রিতবর্গকে অমানী-মানদর্শনে দীক্ষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন। উপাস্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তাহার স্বীয় ভজন-প্রণালীর উন্নততম গভীর ভাবসমূহ তাহাকে একাধারে ভজনানন্দী ও গোষ্ঠানন্দীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। হরিভজন-প্রয়াসীর কল্যাণার্থে তাহার মঠ-মন্দিরের দ্বার চির-উন্মুক্ত ছিল ; তিনি বৃদ্ধ হইউন, রোগাগ্রস্ত হইউন বা জাগতিক যোগ্যতাবিহীন হইউন, তাহাকে আশ্রয় প্রদানপূর্বক হরিভজনের সুযোগ দান করিতেন। তাহাদিগকে তিনি “কৃষ্ণপ্ৰীত্যর্থ অখিল ভোগত্যাগ”—ইহা নিজ আচরণমুখে বৈরাগ্যাভ্যাসের শিক্ষা প্রদান করিতেন।

ভিক্ষুকগণকে সেবানুকূল্য-সংগ্রহ-ব্যাপারে “তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত, সেও ত’ পরম সুখ।”—পদের সুষ্ঠু বিচার গ্রহণপূর্বক দেহারামীর আয়াসীর জীবন যাপন না করিয়া কষ্টসহিষ্ণু হইয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত থাকিবার নির্দেশ দিতেন। নিজস্ব ‘ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স’ রক্ষা করিয়া আখেরের শব্দোবস্তুকারী মঠবাসী সেবকাভিমানিগণকে কপট-বৈষ্ণববেষী, ভবঘুরে, ভগবদ্বিশ্বাসহীন, সুবিধাবাদী এবং নাস্তিক বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীল রূপানুগপ্রবর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল-পীঠভূমি শ্রীধাম-নবদ্বীপে অভ্যভেদী সর্বোচ্চতম মন্দির স্থাপন করত তাহাতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরান্দ-রাধা-



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র  
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের অভ্যভেদী শ্রীমন্দির

বিনোদবিহারীজীউর বিগ্রহ-চতুষ্টয়ের সহিত নবদ্বীপাত্মগত কোলদ্বীপ-ধামেশ্বর শ্রীশ্রীকোলদেব (বরাহদেব) বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাদ্বারা মূলতঃ অধর্ম, বিধর্ম, কুধর্ম, অপধর্ম, ছলধর্মাঙ্গাদি বিধ্বংস করিবার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,— “বড় বড় মন্দির-নির্মাণই বাণী-প্রচার নহে, ইহা অর্চনাস্ত; শ্রীরূপানুগত্যে কীর্তন-সেবারই প্রাধান্য। তথাপি নবদ্বীপের সর্বোচ্চতম শ্রীমন্দির ও বিরাট নাট্যমন্দির কেবল অর্চনা-সেবার প্রতিষ্ঠানস্বরূপ নহে।

ইহা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বা বেদান্তের উচ্চতম কীর্তনাখ্যা ভক্তি-প্রচারের প্রতীক। সিদ্ধান্ত-বাণী প্রচার করিতে গিয়া মহাজনানুশাসন হৃদয়ে ধারণপূর্বক আমি শ্রীগুরুমুখামৃত-দ্রবসংযুত অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম শ্রীনাম-সঙ্গীর্তনমুখেই এই মঠ-মন্দিরাদির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছি।” তাঁহার অকৃষ্ণ-শ্রীবিনোদবিহারী-মূর্তি প্রকাশ এবং উক্ত তত্ত্ব আলোচনা ব্যাখ্যামূলক “শ্রীরাধা-বিনোদবিহারি-তত্ত্বাষ্টকম্” শ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্মের নিত্য

ভগবৎপার্যদত্ত এবং ঔদার্য ও মাধুর্য—উভয় ভগবৎস্বরূপেরই নিত্য সেবকভূমিকা প্রকাশ করে।

শ্রীল সম্প্রদায়-সংরক্ষকবর গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে যুগান্তর আনয়নকারী, দার্শনিক বিশ্বে তত্ত্ববিষয়ক উন্নততম শিক্ষা-প্রদানকারী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রকাশিত “দশমূলতত্ত্ব”ই গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের ষড়্গোষ্ঠাস্বামীবর্গের যাবতীয় গ্রন্থের একমাত্র সারস্বরূপ এবং শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র “অমল শব্দ-প্রমাণ” ও ব্রহ্মসূত্রের “অদ্বিতীয় অকৃত্রিম ভাষ্য”ও শ্রীমদ্ভাগবতের নাম-প্রেমধর্মই বেদান্তের বিশেষ প্রতিপাদ্য ‘বিষয়’ ঘোষণামুখে বহু সুযুক্তিপূর্ণ ভাষণ এবং বলিষ্ঠ লেখনী প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অনুগত বলিয়া অভিমানকারী প্রাকৃত-সহজিয়াগণ সম্প্রতি কলির তাড়নায় “খোদার উপর খোদাগিরি” করিয়া “ব্রহ্ম-সম্প্রদায়”কে অস্বীকারপূর্বক “শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়” নামে এক পঞ্চম ও স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের আবাহন করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তাঁহার কিছু শিষ্যরূপ স্ব-স্ব গুরু-গৌরবিরোধি-স্বরূপ প্রকাশপূর্বক উক্ত প্রাকৃত সহজিয়াগণের পদাবলেহন করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বজ্রকণ্ঠে তাঁহাদের অশ্রীত-বিচারের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি তৎকালীন বৈষ্ণবরূপ-বর্ষ্য শ্রীযুত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের রচিত “অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ” ও শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের “বৈষ্ণব-দর্শন” গ্রন্থদ্বয়ের তীব্র সমালোচনা করিয়া সমগ্র শুদ্ধ বৈষ্ণব-সমাজকে উহাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন,—“শ্রীযুত নাথ মহাশয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ কোন সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহেন বলিয়া বিচার করিয়াছেন। ইহা তাঁহার দার্শনিক ঐতিহ্য-জ্ঞানহীনতার পরিচায়ক। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীমদ্ভাষ্যচার্য্য-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইহার বিরুদ্ধে যে-কোন গ্রন্থই প্রকাশিত হইবে, তাহা বৈষ্ণবগণের পাঠযোগ্য নহে। \* \* নাথ মহাশয় শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক আচার্য্যরূপে অস্বীকার করায় উক্ত আচার্য্য-পাদপদ্মে তিনি অপরাধী। তৃতীয়তঃ নাথ মহাশয় অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ-সম্বন্ধে যে-সকল বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কোন প্রকারে সুসঙ্গত হয় নাই। সুতরাং তাঁহার রচিত ও সংগৃহীত ‘গৌড়ীয়-দর্শন’-নামক গ্রন্থখানি কোন বৈষ্ণব পাঠ করিলে অথবা শ্রবণ করিলে তাঁহার সর্বনাশ হইবে বা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ হইতে চিরতরে বিদায় লইবেন।”

“কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে।”—অনন্ত গুণগণধাম শ্রীকৃষ্ণের পার্যদ-গণের গুণও অনন্ত। “আকাশ অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষীগণ। যার যত শক্তি, করে উর্দ্ধ-আরোহণ।।” অনন্তকাল ধরিয়া তাঁহাদের মহিমা-মাহাত্ম্য কীর্তন করিলেও তাঁহারা অতলস্পর্শী হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে যিনি যতখানি কীর্তন করিলেন এবং কীর্তনমুখে মনন করিলেন, মননপূর্বক ধারণ করিলেন, তিনি ততখানি নিঃশব্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ভগবৎ ও ভাগবত, কৃষ্ণ ও কার্ষ্য, বিষু ও বৈষ্ণব, শক্তি ও শক্তিমান, নিত্যসেবা ও নিত্যসেবক, বিষয় ও আশ্রয়, বিভূ ও অণু, অংশী ও অংশ, কারণ ও কার্য্য, আকর্ষক ও আকৃষ্ট—সব অদ্বয়জ্ঞানান্তর্গত তত্ত্ব। একের আলোচনায় সুতরাং অন্যের প্রসঙ্গ আসিতে বাধ্য। অদ্বয়জ্ঞানচ্যুত বদ্ধজীব সাক্ষাৎ দৃষ্টান্তস্বরূপে তজ্জন্য

ভক্তের আবির্ভাব ও তাঁহার ভগবৎসেবোন্মুখতা আলোচনার দ্বারা সেই অদ্বয়তত্ত্বাত্তরুজ্জ্বল হইবার সুযোগ লাভ করেন। শতবার্ষিকী-পালন—মুখ্য উদ্দেশ্য নহে ; মহাভাগবত ও তাঁহার স্বাস্থ্যঃস্থিত গদাভূতের কথা-কীর্তনই মুখ্য তাৎপর্য। পরিশেষে গৌরপার্বদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের সুবিখ্যাত ‘প্রেমবিবর্ত’ হইতে একটি অমোঘ-বাণী অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে করিতেছি,—

“গোরার আমি, গোরার আমি—মুখে বলিলে নাহি চলে।

গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল ফলে।।”

—ত্রিভক্তিস্বামী শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

নিতালীলাপ্রবিন্দ ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

আবির্ভাব-শতবার্ষিকী উপলক্ষে

**ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি**

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোসাঁই

কৃপা কর দয়াময়।

তব আবির্ভাবে আনন্দিত সবে

শোক-তাপ দূরে যায়।।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীপ্রিয়

প্রভু শ্রীবিনোদবিহারী।

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব নাম লৈয়া

হৈলা আচার্য্য কেশরী।।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপিয়া

রাধা-গিরিধারী-সেবা।

প্রকাশিয়া কৈলে জীব উদ্ধারণ

বর্ণিতে পারে বা কেবা।।

(সেবা) হেরিয়া মোদের আনন্দ বাড়িল

কহিতে পারি না আর।

মাধবেন্দ্র-সেবা শিখাইলে তুমি

প্রেমভক্তি সদা সার।।

শ্রীবেদান্ত সমিতি সদা ভরপুর

কৃষ্ণনাম-সঙ্কীৰ্তনে।

মুদ্রায়ত্ন স্থাপি' শিখাইলে জীবে  
 কৰ্ম, ভক্তি হয় গুণে ॥  
 সারস্বত-ধারা বহায়িছ তুমি  
 পরম যতন করি' ।  
 শুদ্ধ ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশন আর  
 ধাম-পরিক্রমা করি' ॥  
 বিশ্ব ভরি' তুমি মঠ প্রকাশিলে  
 গাহিলে প্রভুর জয় ।  
 প্রেমভক্তি আর সারস্বত-বাণী  
 সর্বত্র প্রচার হয় ॥  
 শ্রীনবদ্বীপ-ধামে শ্রীদেবানন্দ মঠে  
 তিন মহাজনে প্রভু ।  
 সন্ন্যাস প্রদান কৈলে হরিষে  
 (তাঁরা) সেবিতেন সদা বিভু ॥  
 শ্রীভক্তিবেদান্ত 'বামন', ত্রিবিক্রম'  
 'নারায়ণ' নাম দিলে ।  
 এ অধম তখন আনন্দে মগন  
 হয়ে ভাসে অশ্রুজলে ॥  
 ক্রমে ক্রমে আসি' ভক্তগুণে কত  
 তব পদে আশ্রয় লৈল ।  
 ব্রহ্মচারী হ'য়ে সেবা কৈলা তা'রা  
 কতক সন্ন্যাসী হৈল ॥  
 আজি শুভদিনে ভক্ত আগমনে  
 (কত) পূজার সস্তার আনি' ।  
 পূজিছে তোমার রাতুল চরণ  
 ষোড়শোপচারে মানি' ॥  
 আমি অভাজন সাধন-ভজন  
 কিছুই না আছে মোর ।  
 তোমার চরণে কৃপা ভিক্ষা মাগি  
 অশ্রুজলে হয়ে ভোর ॥

—শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

নিত্যলীলাপ্রবিন্দু ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী  
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভুতান কেশব গোস্বামী মহারাজের  
আবির্ভাব-শতবার্ষিকী-অনুষ্ঠানে

## তদীয় মহিমার কিঞ্চিৎ স্মরণ

শ্রীগুরুদেব! আপনার মহিমা এই পতিত অধম কীর্তন করিবার অযোগ্য। যাঁহারা আপনার অনুগ্রহে আপনার মহান্ স্বরূপ অবগত তাঁহারা যোগ্যপাত্র সন্দেহ নাই। তথাপি ‘বৈষ্ণবের গুণগান করিলে জীবের ত্রাণ’—বাক্যানুসারে আত্মশোধনেচ্ছায় পতিতের এই অন্যায় প্রয়াস।

আপনি নিজ আচরণদ্বারা সমস্ত পরমার্থপিপাসুকে শিক্ষা প্রদান করিয়া আচার্য্য রূপে অভিহিত। কৃষ্ণ যেরূপ তৃণাবর্তকে আশ্রয় করত আকাশে বিচরণ করিয়াছিলেন, আপনিও তদ্রূপ অতি শৈশবে বাজপক্ষীকর্তৃক আকাশে উন্নীত হইয়া আপনার অলৌকিকতার প্রকাশ করিয়াছেন। আপনি আকুমার ব্রহ্মচর্য্য পালনদ্বারা স্ত্রীসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পারমার্থিকগণের অকর্তব্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। যাঁহারা স্ত্রীসঙ্গী তাহাদের মুখে আপনার মহিমা-কীর্তন শোভা পায় না বলিয়া মনে করি। আপনি অতি অল্প বয়সে ধনী-গুণী পিতামাতাকে পরিত্যাগ করত সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুদেবের মনোহরীষ্ট পালনে ব্রতী থাকিয়া “অতঃ বুধ অভ্যজেষুং ভক্তৈক্যেশং গুরুদেবতাম্” —বাক্যের আচরণকারী। আপনার দক্ষতায় ও নিপুণতায় শ্রীগুরুদেব আপনাকে ‘কৃতিরত্ন’ উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছেন। আপনি রামানুজাচার্য্যের শিষ্য কুরেশাভিন্ন বলিয়া শিশুমণ্ডলে সুবিখ্যাত। নির্ভীকতায় আপনি তাৎকালিক শাসকগোষ্ঠীর নিকট ভয়ঙ্কর ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ পটুতার জন্য ‘আচার্য্য কেশরী’ বলিয়া আপনার পরিচয় আপনি সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয় ক্রোান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। আপনি শ্রীগুরুদেবের দ্বারা পরমানুগৃহীত বলিয়া কপদর্দকশূন্য হইয়াও শ্রীগুরুদেবের প্রচার ও আচারের সংরক্ষক ও পরম্পরার রক্ষাকর্তা। আপনার দিব্যকলেবর শ্রীগুরুদেবের প্রতীকতা প্রকাশ করে। আপনার রচিত ‘মায়াবাদের জীবনী বা বৈষ্ণববিজয়’ গ্রন্থখানি শঙ্কর-মতবাদকে সমাহিত (সমাধিস্থ) করিয়াছে বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। কোনও দেবীসাধক মনুষ্যকে ‘ভগবান্’ বলিলে নরকভাগী হইতে হয় বলিয়া বিদ্বৎসভায় প্রকাশ করত আপনি সত্যের ও শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষক। শ্রীগুরুসেবাচ্ছলে তাঁহার সহিত বেষ পরিবর্তন করিয়া আপনি শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সন্ন্যাস শিষ্য বলিয়াও অন্তরঙ্গ সেবকমধ্যে সুবিদিত। আপনার অনন্ত গুণরাশি কীর্তনে আমি সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য। তথাপি আপনার অনুগ্রহে মৎকৃত “মানুষই ভগবান্” প্রবন্ধটি আপনার ‘পঙ্গু লঙ্ঘয়তে গিরিম্’—বাক্যের সাক্ষ্য-স্বরূপ এবং এই প্রবন্ধটি “গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা” স্বরূপে ভবদীয় করকমলে স্থান লাভ করুক— ইহাই সকাতর প্রার্থনা।

## মানুষই ভগবান ?

আজকাল এই কথাটি প্রায় সকলের মুখেই শুনা যায়। বিশেষতঃ শিক্ষিতাভিমাত্রী ব্যক্তিগণের মুখেও এই কথা! তাঁহারা বলেন,—“জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।” বহুরূপে তিনিই আমাদের সম্মুখে বর্তমান। ভগবান্ আবার কে? মানুষই ভগবান্। কথাগুলি বর্তমানে রাষ্ট্রীয় মতবাদ বলিলেও মিথ্যা বলা হয় না। আরও একটু উন্নতবিচারে সকল মানুষের মধ্যে যাহারা দরিদ্র, তাহারা ভগবান্ বলিয়া আখ্যায়িত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। সকলের মধ্যে ভগবান্ থাকিলেও ধনী ব্যক্তিগণকে ভগবান্ বলা হয় না। ধনীব্যক্তির সেবাকে ভগবৎসেবা বলা হয় না; কেবলমাত্র দরিদ্রের সেবাই ভগবানের সেবা। দরিদ্র ব্যক্তিই নারায়ণ। দরিদ্রের সেবাই বর্তমানে পরমধর্ম বা পরমার্থ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

এই মতবাদের প্রবল প্রচলনে চিরন্তন শাস্ত্রব্যবস্থানুসারে শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহাদির সেবায় মানুষের ক্রমশঃ অনাস্থা প্রকাশ পাইতেছে। ভগবান্ বা নারায়ণের সেবাতেই মানবের চরম সদ্গতি—ইহাতে মানবজাতির বিশ্বাস নষ্ট হইতেছে। পরবর্তিকালে উদ্ভূত ব্রাহ্মধর্ম এবং মুসলমান ধর্ম্যানুসারে বিগ্রহসেবা নিষিদ্ধ। তাহাদের মতে ভগবানের রূপ স্বীকার করা দোষাবহ। বিগ্রহসেবাকে তাহারা আদর করে না। পরন্তু সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষের পক্ষে শ্রীবিগ্রহসেবা পরম মঙ্গলজনক এবং ইহাতে অবিশ্বাস সনাতন ধর্মের প্রতি নিষ্ঠার মূলে কুঠারাঘাতস্বরূপ। শ্রীনারায়ণের শালগ্রাম মূর্তিতে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহা সনাতন ধর্মের পক্ষে পরম অশুভ।

এই মতবাদ কতদূর সত্য বা কতদূর মিথ্যা তাহা চিন্তা করা বর্তমানে অধিকাংশ ব্যক্তি প্রয়োজন বোধ করেন না। প্রতিপক্ষীয় উক্তি বা যুক্তিগুলিতে কেহই কর্ণপাত করিতে ইচ্ছুক নহেন। প্রতিপক্ষ বিচারে সত্যতা প্রমাণিত হইলেও তাহাতে অনাদর করত মিথ্যাকে বহুমান করাই বর্তমান চিন্তাধারা। রাষ্ট্র-পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্র এবং রাষ্ট্র-রচিত ও প্রকাশিত পুস্তকগুলিতে এই মতের অনুকূলে ব্যবস্থা দৃষ্ট হইতেছে। বিদ্যালয়াদিতে এই অন্যায় বিচার অসঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস করিয়াও কিছু সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা বেতনভোগী বলিয়া এই অসার শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। তাঁহাদের অনেকেই ইহাতে বিশ্বাস ও নিষ্ঠা না থাকিলেও কর্তৃপক্ষের আদেশে এইরূপ সর্বনাশা শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে।

দার্শনিক বিচারে অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বই সুসত্য। মায়াবাদ বা নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ মিথ্যাবাদ—ইহা আচার্য্য শঙ্করেরই স্বীকারোক্তি।—

“মায়াবাদমসচ্ছাত্ত্বং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।

ময়েব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্তিনা ॥”(পদ্মপুরাণ)।



প্রত্যক্ৰম্মা ও নিরূপাধিক ব্রহ্ম স্বীকার করিলে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব রক্ষিত হয় না। তাহাতে ব্রহ্ম সবিশেষ হইয়া পড়েন। ইহাই শঙ্করাধ্বৈতের অসারতা। মুক্তব্রহ্ম ও বদ্ধব্রহ্ম স্বীকার করিলে ব্রহ্মের বিশেষত্ব ও ব্রহ্ম মায়াধীন স্বীকার করা হয়—নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারেন না ; স্বীকার করিলে সবিশেষবাদেই প্রতিষ্ঠা স্বীকৃত হয়।

নাস্তিক্যবাদের আলোচনার আশা করি প্রয়োজন নাই। কারণ এই মতবাদের মূলেরই প্রতিষ্ঠা নাই। ‘অস্তি’-শব্দই যদি মূল অবলম্বন, তবে ‘নাস্তির’ প্রতিষ্ঠা কোথায়? যাহার অস্তিত্ব নাই তাহা লইয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাথা ঘামাইবেন কেন? যাহা নাই তাহার নাম বা পরিচয় নাই। তাহার উল্লেখ সম্ভবপর নহে। পরমাণুবাদ ও কেবল শক্তিবাদাদিও নাস্তিক্যবাদের প্রকারভেদ। বুদ্ধের শূন্যবাদ ও আচার্য্য শঙ্করের নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ প্রচ্ছন্নভাবে ভিন্ন হইলেও বাস্তবে এক বলিয়া স্বীকৃত।

বেদাদি শাস্ত্রে ‘সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম’ বাক্যটি বর্তমান। ইহাতে কেবল মানুষকেই ব্রহ্ম বলা হয় নাই। চিদচিৎ মায়িক সকল বস্তুকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। এই বাক্যটিকে ভিত্তি করিয়াই ‘মানুষই ভগবান্’—এই মতবাদের সৌধ প্রতিষ্ঠিত। বেদ সনাতন ধর্মের মূল ও সর্বপ্রধান শাস্ত্র ; সুতরাং সনাতন ধর্মে ইহা অগ্রাহ্য হইতে পারে না। পরন্তু ‘অন্নময় ব্রহ্ম’ বলিলে যেরূপ সাধারণতঃ বিপত্তি হইয়া থাকে, ‘সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম’ বাক্যটিতেও তদ্রূপ বিপত্তি ঘটয়াছে। এই বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য ভিন্ন প্রকার বলিয়া উপনিষদ্ মন্ত্র প্রকাশ করে—

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,

যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিৎসাস্ব তদ্ব্রহ্মেতি”। (তৈঃ উঃ)।

যদ্যপি অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ববস্তুই ব্রহ্ম, পরমাশ্রা ও ভগবান্ বলিয়া কথিত হয়, তথাপি সূচুবিচারে ব্রহ্মবাদ—অসম্যক্, পরমাশ্রাবাদ—আংশিক এবং ভগবদ্বিচারকে পূর্ণদর্শন বলা হইয়া থাকে। ব্রহ্মে বিগ্রহ না থাকিলেও ভগবন্তত্বে রূপ, মূর্তি বা বিগ্রহ মিথ্যা নহে, তাহাই সর্বোত্তম, সত্য ও উপাদেয়। “ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যাস্য চ। শাস্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।।” “জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্” বাক্যেও ইহাই প্রকাশ পায়। “যস্য প্রভা প্রভবতো” বাক্যেও ইহাই ধ্বনিত। ভীষ্মবাক্যে পরমাশ্রাকে অংশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—“তমিমমহমজং শরীরভাজং হৃদি হৃদিধিষ্ঠিতম্” ও “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদেদেহেজ্জুন তিষ্ঠতি”—গীতাবাক্যে পরমাশ্রাতত্ত্বকে অংশ বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজকে সকলের মূল ও সৃষ্টিকর্তা ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।”

“অহং সর্বস্য প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।”

—ইত্যাদি বাক্যগুলি হইতে তত্ত্বত্রয়ের অসম্যক্ আংশিক ও পূর্ণ প্রকাশের জ্ঞান লাভ করা যায়। ব্রহ্ম রূপ-গুণহীন হইলেও পরব্রহ্ম বা ভগবন্তত্বে রূপ-গুণ-লীলাদি নিত্য বর্তমান। সেই পরব্রহ্মের উপাসনাই সর্বোত্তম—শ্রীমদ্ভগবদগীতার ১০ম অঃ চ- ১১ শ্লোকে ইহা স্পষ্টীকৃত।

মনুষ্য বা জীবতত্ত্বকে শ্রীকৃষ্ণের শক্তির অংশ বলা হইয়াছে। “মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ”—(গীতা ১৫।৭) শ্লোকটিতে এবং “অপরেয়মিতস্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্”—(গীতা ৭।৫) শ্লোকটিতে ইহাই ব্যক্ত রহিয়াছে। সুতরাং ভগবানের অংশের সেবা ও অংশীর সেবার ফলও অংশ এবং পূর্ণরূপে পার্থক্যযুক্ত। অর্থাৎ অংশী বা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যে ফললাভ হয়, কৃষ্ণের জীবশক্তির বা তটস্থ শক্তির ক্ষুদ্র অংশের সেবাদ্বারা সেই ফল লাভ করা যায় না। জীব নিজেই মায়াবদ্ধ থাকায় অন্যকে কি-প্রকারে মায়া হইতে মুক্তি বা তদুর্দ্ধ ফল প্রদান করিতে সক্ষম হইতে পারে? ভগবান্ মায়াতীত এবং মায়ার অধীশ্বর বলিয়া জীবকে মুক্তি ও প্রেমভক্তি প্রদান করিতে সমর্থ। ব্রহ্ম এবং পরমাত্ম তত্ত্বও প্রেমভক্তি প্রদান করিতে অক্ষম, জীবের কা কথা? অতএব ‘জীবের সেবাই ভগবানের সেবা’—ইহা অত্যন্ত দোষাবহ বা মিথ্যা। পরন্তু ভগবানের শক্তির ক্ষুদ্র অংশের সেবা বলাই সঙ্গত। এই অংশ ও অংশীর সেবার পার্থক্যও শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিয়াছেন।—“যাস্তি দেবব্রহ্মা দেবান্ পিতৃন্ যাস্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্য, যাস্তি মদযাজিনোহপি মাম্।।”—(গীতা ৯।২৫) শ্লোকটিতে ফলের পার্থক্য বিশেষভাবে বর্ণন করত ভগবান্কে পাইতে হইলে “মদযাজিনোহপি মাম্” বাক্যে ভগবানের সেবা করাই আবশ্যিক, তাঁহার অংশের সেবাদ্বারা তাহা হইবে না—স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে।

‘মানুষই ভগবান্’-কথার বিচারে দেখা যায়—মানুষের শক্তি, যোগ্যতা ও গুণাদি এবং ভগবানের শক্তি ও গুণাদি কোনও ক্ষেত্রে এক বা সমান নহে। ভগবান্ পূতনাপ্রদত্ত কালকূট বিষপান করিয়াও মৃত্যুগ্রস্ত হন নাই ; মনুষ্য কিন্তু এক বিন্দু বিষপান করিলে মৃত্যুদশা লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণ বা ভগবান্ অত্যন্ত বিষাক্ত কালীয় হ্রদে যথেষ্ট ক্রীড়া করিতে করিতে কালীয় সর্পের মস্তকোপরি নৃত্য ও পদাঘাত করত তাহাকে নির্জীব ও দমন করিয়াছিলেন ; কালীয়ের সহস্র ফণার দংশনে ও বিষে কৃষ্ণের মৃত্যু ঘটে নাই, কোনই অনিষ্ট হয় নাই। মনুষ্যের পক্ষে কালীয় হ্রদ ও কালীয়ের কথা দূরে থাকুক, একটী কেউটে সাপের দংশন সহ্য করা সম্ভবপর নহে ; তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্বতকে বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে সপ্তাহব্যাপী ধারণ করিয়াছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রনিষ্কিপ্ত বজ্রাদিতেও তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। কোনও মনুষ্যের কোনও কালে এই শক্তি হইতে পারে না। গোবর্দ্ধন ধারণ দূরের কথা, ‘দশমণ ভার ভূমি হইতে উত্তোলন করিতেও মানুষ অক্ষম। সুতরাং ‘মানুষই ভগবান্’ বলা কতদূর মূঢ়তা! কৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র পত্নীর পাণিগ্রহণ করত প্রত্যেক ক্ষেত্রে দশটি করিয়া পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন, আর মনুষ্য একটী মাত্র বিবাহ করিয়াই হিম্ শিম্ খাইতেছেন। পরিবার পরিকল্পনার কৃপায় জ্ঞানহত্যা করিয়াও অব্যাহতি পাইতেছেন না। সামান্য অধিকভাবে ভোগের পরিণামে ক্ষयरোগ বা এডস রোগাক্রান্ত হইতেছেন। সুতরাং মানুষকে ভগবান্ বলা কিরূপ মিথ্যা ও অন্যায় তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। কৃষ্ণ অত্যন্ত চরিত্রহীন, কামুক ও লম্পট ছিলেন। তিনি শতকোটি গোপীদের সহিত কামক্রীড়া ও বস্ত্রহরণাদি করায় তিনি কখনও পূজ্য হইতে পারেন না। তাঁহাকে ‘মনুষ্য হইতেও

অধম বলা উচিত। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে শিবাদি শ্রেষ্ঠ দেবতাবৃন্দ, সনকাদি যোগীন্দ্র ও ব্রহ্মচার্যব্রতচরণকারিগণ শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি লীলার কেন নিন্দা না করিয়া পরম আগ্রহসহকারে সেই লীলার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন? মহাযোগী শিবঠাকুর স্বয়ং সেই লীলাদর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিতে গোপীদের পরিহিত বেষভূষা ধারণ করত অতি সম্ভ্রমে সেই লীলা দর্শন করিলেন কেন? পরম সতী লক্ষ্মীঠাকুরাণী কেন শ্রীকৃষ্ণের রাসে যোগদান করিবার জন্য নারায়ণের সেবাত্যাগ করত বিশ্ববনে অদ্যাপিও তপস্যা করিতেছেন? বস্ত্রহরণ-লীলায় বিবস্ত্রা গোপকন্যাগণের সর্ব গুহ্যঙ্গ দর্শন করিয়াও কন্যাগণে উপগত না হইয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দেওয়া কি কামুকতা, না চরম জিতেন্দ্রিয়তা? মনুষ্যের পক্ষে এরূপ সুযোগ পরিত্যাগ করা সম্ভব হইবে কি? অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপরাধজনক উক্তিগুলি কিরূপ মূঢ়তা ও দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক! এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—“অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ।” তাঁহাকে মানুষ জ্ঞান করা অবজ্ঞা হয়। তাঁহার পরিচয় দিয়া বলিলেন,—“অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।” ‘হি’-শব্দে নিশ্চয় করিয়া বলিলেন,—“তিনি সমস্ত কিছুর মালিক ও ভোক্তা”। ভোগ করিবার অধিকার একমাত্র তাঁহারই আছে; অন্যের বা তাঁহার শক্তির ক্ষুদ্র অংশের নাই। পরীক্ষিত মহারাজকে শুকদেব এইজন্য উত্তর দিলেন,—“তেজীয়সাং ন দোষায় বহেঃ সর্বভুজো যথা।” কৃষ্ণই যদি সমস্ত কিছুর মালিক হন, তবে নিজের বস্ত্রকে যথেষ্ট ভোগ করিলে লাম্পট্য, অন্যায় বা চুরি করা হয় না। ‘পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়।’ নিজের দ্রব্য ভোগ করিলে চুরি করা হয় না। অতএব কৃষ্ণ চোর নয়। তাঁহার সমস্ত কার্যই সঙ্গত ও ধারণাতীত বলিয়াই—“জন্ম কৰ্ম্ম চ মে দিব্যম্” বলিয়াছেন। বিচিত্রবীর্য্য রাজা কাশীরাজের পরমা সুন্দরী একটা কন্যাকে অতিরিক্তভাবে ভোগ করত ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি গোপীকে যথেষ্ট ভোগ করিয়াও কোনও রোগাক্রান্ত হন নাই। এরূপ ক্ষমতা একমাত্র তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও আছে?

মনুষ্য ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বলিতে অক্ষম। কৃষ্ণ—সর্বজ্ঞ—“বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জ্জুন। ভবিষ্যানি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন।।”—কৃষ্ণ ত্রিকালজ্ঞ; মনুষ্যের সে শক্তি নাই। কৃষ্ণ সকলকে জানেন, কিন্তু কোন মনুষ্য কৃষ্ণকে জানিতে পারে না। তিনি কৃপাপূর্ব্বক যাহাকে যতটুকু নিজতত্ত্ব জানান তিনি ততটুকু মাত্রই তৎসম্বন্ধে জানিতে পারেন। অতএব মানুষকে ভগবান্ বলা কিরূপ অজ্ঞতা!

যদি ভগবান্ বলিয়া কোন তত্ত্ব না থাকে, তবে “মানুষই ভগবান্” বলা চলে না। ভগবান্ও মানুষ বলিলে ভগবানকে স্বীকার করা হয়। পরন্তু ভগবানকে মনুষ্য জ্ঞান করা মূঢ়তা। যাহারা ভগবানকে মানুষ মনে করে, তাহারা মূঢ় ও অজ্ঞ। মূঢ়গণ কৃষ্ণকে সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, মালিক বা নিয়ন্তা বলিয়া বুঝিতে পারে না। এরূপ মূঢ় ব্যক্তিদের জ্ঞান, কৰ্ম্ম এবং আশা ব্যর্থ ও অসার। তাহারা অসুর ও রাক্ষস প্রকৃতির এবং তাহারা বিবেকহীন বলিয়া বুঝিতে হইবে—“মোঘাশা মোঘকৰ্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা

বিচেতসঃ। রাক্ষসীমাসুরীধৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ।।” যাঁহারা মহান্ ও প্রকৃত জ্ঞানী তাঁহারা ভগবান্কে ( কৃষ্ণকে ) সকলের মূল এবং অবিনাশী অর্থাৎ মৃত্যুহীন বলিয়া জানেন।

“মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।

ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্।।”

ভগবান্কে জীবের বা মনুষ্যের ন্যায় জন্মগ্রহণ ও কৰ্ম্ম করিতে হয় না। জীব কৰ্ম্মফলবাধ্য, কৃষ্ণ কৰ্ম্মফলবাধ্য নহেন। এজন্য তাঁহার কৰ্ম্মকে লীলা বলা হইয়াছে। যে মনুষ্য কৃষ্ণকে প্রকৃতরূপে যথাযথভাবে জানিতে পারে তাহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না; মুক্তিলাভ করত ভগবদ্রাম বৈকুণ্ঠাদিতে গমন করেন। ‘ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম ভবতি’ বাক্যে ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্ম হইয়া যায় বলা হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণকে জানিলে কেহই কৃষ্ণ হইতে পারেন না—ইহাই সিদ্ধান্ত। গোপীদের সহিত কৃষ্ণের রাসাদি লীলা কামক्रीড়া নহে; তাহা কামগন্ধহীন। বদ্ধজীব ইহা ধারণা করিতে অক্ষম। মৃত্যুহীন হইয়াও কৃষ্ণের জরাব্যাধের বাণবিদ্ধ হইয়া দেহত্যাগ করা অসুরমোহন-লীলামাত্র (ম্যাজিক বিশেষ)। পরন্তু কৃষ্ণ স্বেচ্ছায় গোলোক হইতে পৃথিবীতে গমনাগমন করেন; তাহা জন্ম-মৃত্যু নহে। “যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্। অসংমূঢ়ঃ স মৰ্ত্ত্যেষু সৰ্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।” ব্রহ্ম হইতে কৃষ্ণ উৎপন্ন হইয়াছেন মনে করাও অজ্ঞতা।—“অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।” পরন্তু কৃষ্ণই ব্রহ্মের আশ্রয়—“ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্”—ইহাই কৃষ্ণের উক্তি। “মন্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সৰ্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।।”—ব্রহ্মসংহিতায় ইহাই সঠকভাবে পরিণীত।—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সৰ্ব্বকারণকারণম্।।

ব্রহ্ম ও আত্মন-শব্দের পূর্বে ‘পরম’-শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু ভগবৎ শব্দের পূর্বে ‘পরম’ প্রযুক্ত করিয়া তাহার সর্বোত্তমতা প্রকাশিত হয় না—ইহাই ভগবৎ তত্ত্বের পারতমত্বসূচক।

শ্রীমদ্মহাপ্রভুর শিক্ষা—“মায়াবীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।” ঈশ্বরের দেহদেহী ভেদ নাই। “প্রাকৃত করিয়া মানে বিষুকলেবর। বিষুগিন্দা আর নাহি ইহার উপর।।”

মায়াবাদী শঙ্কর বলেন,—‘যোগঃ গুণানাং যুক্তিঃ, ঘটনং, সা এব মায়া।’ অর্থাৎ গুণসমূহের সংযোগ সংঘটনই যোগ। যোগই মায়া। শঙ্করাচার্য্য মায়িক গুণ ব্যতীত অপ্রাকৃত বা মায়াতীত গুণের ধারণা প্রকাশ করেন নাই। ভগবন্তত্ত্ব ত্রিগুণাতীত অপ্রাকৃত বা সচ্চিদানন্দ বস্তু। ভগবন্তত্ত্ব মায়াগ্রস্ত হন না, তিনি মায়াবীশ; মায়া ভগবানের সেবিকা বা দাসী। আচার্য্য শঙ্করের ধারণার ব্রহ্মও মায়াবশযোগ্য এবং তখনই ব্রহ্ম জীব বা ঈশ্বর নামধেয় হয়েন—ইহা সত্যের পরিপন্থী। আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মও দুই প্রকার—মায়ামুক্ত ব্রহ্ম ও মায়াগ্রস্ত ব্রহ্ম। অতএব ইহাতেও অদ্বৈতবাদ রক্ষিত হয় না। অধিকন্তু ব্রহ্মের মায়াদ্বারা অভিভূত হওয়া স্বীকার করিলে ব্রহ্ম পরমতত্ত্ব না হইয়া মায়াই পরম

তত্ত্ব প্রকাশ পায়। নির্বিশেষ ব্রহ্ম সাধ্য হইলেও ভগবত্তত্ত্ব অপ্রাকৃত হওয়ায় ভগবৎ-কৃপাসিদ্ধ। “ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত” যাহারে। সেই ত’ ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে।।”

সম্প্রদায়-প্রবর্তক শ্রীব্রহ্মা নিজ জ্ঞান ও যোগ্যতাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে গিয়া অতীব মোহগ্রস্ত ও হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন। নিজ বিচারবুদ্ধিদ্বারা ধারণা করিতে অক্ষম ও বিভ্রান্ত হইবার পর শ্রীকৃষ্ণ অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাকে নিজতত্ত্বজ্ঞান প্রদান করায় ব্রহ্মা নিজকে ধিক্কার দিতে দিতে ভগবত্তত্ত্বের দুর্জয়ত্ব ও ভগবৎকৃপালভ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিনো ন চান্য একোহপি চিরং বিচিন্য়ন।।

অর্থাৎ—হে দেব, হে ভগবন, যিনি আপনার পাদপদ্মযুগলের করুণাকণাদ্বারা যে পরিমাণে অনুগৃহীত হইয়াছেন, একমাত্র তিনিই আপনার মহিমা ও তত্ত্ব তত পরিমাণে জানিতে সক্ষম হয়েন ; চিরকাল ব্যাপিয়া নিজ বুদ্ধিদ্বারা জানিতে চেষ্টা করিলেও আপনাকে জানা অসম্ভব। আচার্য্য শঙ্করের মতানুসারে নির্গুণ ব্রহ্মের অনুশীলনদ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মকে জানা যায় বা ‘ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম ভবতি’ বাক্যানুসারে নির্গুণ ব্রহ্মতা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু এতদ্বারা অপ্রাকৃত সগুণ ব্রহ্মের অনুভব হয় না। নির্গুণ ব্রহ্ম বিষয়নিবৃত্ত নির্মূল অন্তঃকরণের গোচরীভূত হইতে পারে। নির্গুণ ব্রহ্ম ভগবানের একটি মহিমা, তাহা বিষয়াকারশূন্য নির্বিকার ব্রহ্মাকারে পরিণত অন্তঃকরণে স্ফূর্তির বিষয় হইয়া থাকে। কিন্তু অপ্রাকৃত সগুণস্বরূপ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয় না। শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় লব্ধ অনুভবদ্বারা শ্রীভগবানকে শ্রীবিগ্রহের অপ্রাকৃতত্বের বর্ণনামুখে বলিতেছেন,—

অঙ্গানি यस্য সকলেদ্রিয়বৃত্তিমত্তি, পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।

আনন্দচিন্ময়সমুজ্জ্বল বিগ্রহস্য, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজন করি, যাঁহার বিগ্রহ—আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময়; সুতরাং পরমোজ্জ্বল। সেই বিগ্রহের অঙ্গসকল প্রত্যেকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি-বিশিষ্ট এবং চিদচিদ অনন্ত জগৎসমূহকে নিত্যকাল দর্শন, পালন ও নিয়ন্ত্রণ করেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ এই শ্লোকটির নিম্নলিখিত তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন।—

চিদাশ্বাদের অভাবে জড়জ্ঞানে আবদ্ধ ব্যক্তিদিগের একটি বিষম সংশয় উদ্ভিত হয়। কৃষ্ণলীলার বর্ণন শুনিয়া তাঁহারা মনে করেন যে, জড়গতভাব হইতে কল্পনাশক্তিদ্বারা পণ্ডিত লোকেরা কৃষ্ণতত্ত্বের কল্পনা করিয়াছেন। এই অনর্থজনক সংশয় ছেদন করিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মা এই শ্লোক ও ইহার পরবর্ত্তী আরও তিনটি শ্লোকে চিদচিৎ পদার্থদ্বয়কে তাত্ত্বিকরূপে পৃথক করিয়া শুদ্ধ-সমাধিপ্ৰাপ্ত কৃষ্ণলীলা বুঝাইয়া দিতে যত্ন করিতেছেন। ব্রহ্মার আশয় এই যে, কৃষ্ণবিগ্রহ—সচ্চিদানন্দময়, আর মায়িক সমস্ত প্রতীতিই জড়-তমোময়ী। তদুভয়ের বিশেষগত বৈলক্ষণ্য থাকিলেও মূলতত্ত্ব এই যে, চিদ্ব্যাপারই মূল পদার্থ, বিশেষ ও বিচিত্রতা তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান। তদ্বারা কৃষ্ণের চিন্ময় ধাম, চিন্ময় রূপ, চিন্ময় নাম, গুণ ও লীলা প্রতিষ্ঠিত। শুদ্ধ-চিদ্বুদ্ধিবিশিষ্ট ও মায়া-সম্বন্ধরহিত জনের

পক্ষেই সেই লীলা আশ্বাদনীয়। চিত্রাম, চিচ্ছক্তি প্রকাশিত চিন্তামণিগঠিত লীলাপীঠ এবং কৃষ্ণবিগ্রহ—সমস্তই চিন্ময়। চিচ্ছক্তির ছায়া যেরূপ মায়াশক্তি, মায়াগঠিত বিচিত্রতাও তদ্রূপ চিহ্নিচিত্রতার সাদৃশ্যই মায়িক জগতে লক্ষিত হয়। উভয় বিচিত্রতার সাদৃশ্য থাকিলেও উহার পরস্পর বিলক্ষণ। জড়ের হেয়তাই জড়ের দোষ, কিন্তু চিন্ত্তে সেই দোষশূন্য বিচিত্রতা আছে। কৃষ্ণের আত্মা ও দেহ পরস্পর পৃথক্ নয়। জড়বদ্ধ জীবের দেহ ও আত্মা পৃথক্ পৃথক্, চিৎস্বরূপে দেহ-দেহী, অঙ্গ-অঙ্গী, ধর্ম-ধর্মীর ভেদ নাই ; কিন্তু জড়বদ্ধজীবে তাহা আছে। কৃষ্ণ অঙ্গী হইলেও তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গই পূর্ণ কৃষ্ণ; সমস্ত চিহ্নিত্তি তাঁহার সমস্ত অঙ্গে আছে। সুতরাং তিনি অখণ্ড পূর্ণ চিন্ত্ত। জীবাত্মা ও কৃষ্ণ উভয়েই চিৎস্বরূপ, সুতরাং একপ্রকার, কিন্তু উভয়ে ভেদ এই যে,—ঐ সমস্ত চিদগুণসমূহ জীবাত্মাস্বরূপে অণুরূপে এবং কৃষ্ণে বিভুরূপে বর্তমান। জীব শুদ্ধচিৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইলে ঐ প্রকার গুণগণ তাহাতে অণুরূপে প্রকাশ পাইবে। কৃষ্ণকৃপাক্রমে চিদাহ্লাদিনীর বল আবির্ভূত হইলে জীবেরও আনন্ত্য-সাম্য-সিদ্ধি হয়, তথাপি কোন কোন বিশেষ গুণবশতঃ কৃষ্ণই সর্বোপাস্য হন। সেই বিশেষ গুণচতুষ্টয় পরব্যোমাধিপতি বা পুরুষাবতারে প্রকটিত হয় না; গিরীশাদি দেবতাতেও নাই,—জীবের কথা দূরে থাকুক। শ্রীভক্তিরসামুতসিদ্ধি-গ্রন্থে সেই গুণচতুষ্টয় যাহা শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য কোনও তত্ত্বে বর্তমান নাই, তাহার বর্ণনা—

১। সর্বাব্যুতচমৎকার-লীলাকল্লোলবারিধিঃ।

২। অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ।

৩। ত্রিজগন্মনসাকর্ষিমুরলীকলকুজিতঃ।

৪। অসমোদ্ধরূপশ্রীবিম্বাপিতচরাচরঃ।

লীলাপ্রেম প্রিয়াধিক্য মাধুর্য্যে বেগুরূপয়োঃ।

ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের

## অতিমন্ত্য চরিত্র

শ্রীভগবান্ যেরূপ প্রয়োজনমত সময়ে এই ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম-বিনাশন ও ধর্ম-সংস্থাপন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কখনও কখনও তিনি নিজ পার্শ্বদণকেও প্রেরণ করিয়া থাকেন। অস্মদীয় পরমারাধ্যতম পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য কুলমুকুটমণি শ্রীকৃষ্ণানুগাচার্য্যবর্য্য চিহ্নিলাস নিত্যলীলাপ্রবিন্দ ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তদ্রূপ একজন ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্শ্ব ছিলেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম পূর্ববাংলার অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল



পুত্র-কন্যাসহ স্নেহময়ী জননী, সৰ্বদক্ষিণে শ্রীবিনোদবিহারী, সৰ্ববামে শ্রীপ্রমোদবিহারী

—তঁহার দক্ষিণে জোষ্ঠা ভদ্রীসহ অন্যান্য আত্মগণ

জেলার বানারীপাড়া গ্রামে এক সমৃদ্ধ জমিদার বংশে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীশরৎচন্দ্র গুহঠাকুরতা ও মাতার নাম শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী। তিনি কিশোর বয়সেই গৃহত্যাগ করত বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীসৌভীষ্য মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিতালীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমুক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীচরণ-কমল আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং স্থায়ীভাবে শ্রীধাম মায়াপুরেই শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীগুরুগৌরাদেব-সেবায় নিযুক্ত হন। শ্রীল সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রকটকালে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশেষ বিশেষভাবে তাঁহার মনোহীষ্ট পূরণ করিয়াছেন। তৎপশ্চাৎ তিনি লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহ-সেবাপ্রকাশ, ভক্তি-সদাচার প্রবর্তন, দৈববর্ণাশ্রম সংস্থাপন তথা মুদ্রায়ন্ত্র অর্থাৎ বৃহৎমুদ্রদ্বারা ভক্তিগ্রন্থ-প্রকাশন ও সৰ্বত্র শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রেম প্রদান করত তদীয় শ্রীগুরুদেব ও ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচুর প্রীতিবিধান করিয়াছেন। এক্ষণে আমি তাঁহার শ্রীগুরুসেবার এক বিরল আদর্শের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছি।—

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর যখন অসিদ্ধান্ত-কুসিদ্ধান্ত-নিরাসপূর্বক বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তের বাণী প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময় শহর নবদ্বীপের জাতিগোষামিগণ শ্রীবিগ্রহ-ব্যবসা ও শ্রীভাগবত-ব্যবসায় রত ছিলেন। শ্রীবিগ্রহ-ব্যবসা বলিতে—শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্থের বিনিময়ে শ্রীবিগ্রহ-দর্শনের ব্যবস্থা, শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যবসা বলিতে অর্থচুক্তিতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করা। প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন,—শ্রীভগবান্ ও তদ্বিগ্রহ অভিন্ন বস্তু। সকলেরই শ্রীবিগ্রহ-দর্শনের অধিকার রহিয়াছে। পয়সার বিনিময়ে যাহারা শ্রীবিগ্রহ-দর্শনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন তাহারা ভগবচ্চরণে মহা-অপরাধী। আর যাহার অর্থ চুক্তি করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন তাহারাও তদ্রূপ অপরাধী। এইসব কথায় তখন জাতিগোষামিগণ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত ও অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্বেষ করিতে আরম্ভ করেন।

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর প্রতিবৎসরই জীবহিতার্থে বহু ভক্তজন লইয়া শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা বাহির করিতেন। পরিক্রমা করিতে করিতে যখন তিনি শহর নবদ্বীপে প্রবেশ করেন তখন পূর্ব বিদ্বেষবশতঃ জাতিগোষামিগণ তাঁহার ও পরিক্রমা-পার্টির উপর ইট-পাটকেল ও গরম জল ছুঁড়িতে আরম্ভ করেন। তখন প্রাণভয়ে সকলে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন কি যাঁহারা এতদিন নিজদিগকে শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাঁহাকে ছাড়িয়া স্ব-স্ব-প্রাণরক্ষার্থ দৌড়াইতে লাগিলেন। অস্বদীয় গুরুপাদপদ্ম কিন্তু নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে রক্ষার জন্য তন্নিকট অগ্রসর হইলেন এবং বহু কষ্ট স্বীকার করত তাঁহাকে জনৈক সজ্জন গৃহস্থের বাড়ীতে নিরাপদস্থানে আনয়ন করিলেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্ম উক্ত সজ্জন মহোদয়ের বাড়ীতে যখন পৌঁছেন তখন তাঁহার সহিত অত্যন্ত নম্রতাপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তখন শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে বলিলেন,—“তুমি যেমন দুষ্টের নিকট বজ্রাদপি কঠোর, তদ্রূপ শিষ্টের নিকট কুসুমাপেক্ষাও কোমল দেখছি। বৈষম্যবোধিত দীনতাও তোমার রহিয়াছে।” তৎপরে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে বলিলেন যে,—“প্রভো! বর্তমানে যে সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতি, তাহাতে আপনার এই সন্ন্যাসী বেধ নিরাপদ নহে। আপনায় ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইবে নচেৎ আপনাকে নির্ঝর্যে শ্রীধাম মায়াপুরে শুভবিজয় করাইতে পারিব না। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তখন ব্রহ্মচারী অবস্থা, শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিতেন। তাঁহার নাম তখন শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী। মঠে তদীয় গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাকে “বিনোদ দা” বলিয়া ডাকিতেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদকে বলিলেন,—“প্রভো! আপনার সন্ন্যাসবেশ আমায় দেন, আর আপনি কৃপাপূর্বক আমার ব্রহ্মচারীবেশ গ্রহণ করুন, যাহাতে সাধারণে আপনাকে সন্ন্যাসী সরস্বতী ঠাকুর বলিয়া চিনিতে না পারে।” এই প্রস্তাবে শ্রীল প্রভুপাদ সন্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

এদিকে প্রাণভয়ে পরিক্রমারত সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীবৃন্দ শ্রীধাম মায়াপুরে পৌঁছিলেও তাঁহারা প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তৎপরে নিজ শ্বেতবস্ত্রের দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদকে অতি সুন্দররূপে সজ্জিত



করিলেন যাহাতে সাধারণে তাঁহাকে চিনিতে না পারে। অতঃপর তিনি শত্রুপক্ষের চক্ষুতে ধূলি প্রদান করত শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে লইয়া নির্বিঘ্নে শ্রীধাম মায়াপুর পৌঁছাইতে সকলেই চিন্তামুক্ত হইয়া পরমানন্দে উল্লসিত হইলেন। গুরুভ্রাতাগণ পরম করুণাময় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্তন করত মুহুমুহ শ্রীল প্রভুপাদ-রক্ষাকারী আমাদের ‘বিনোদদা কি জয়! আমাদের বিনোদদা কি জয়!’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে জয়গান করিতে লাগিলেন। সকলে একবাক্যে বলিতে লাগিলেন, “শ্রীবিনোদদা আমাদের প্রাণস্বরূপ শ্রীল প্রভুপাদকে নির্বিঘ্নে এখানে আনিয়া আমাদের চির-ঋণপাশে আবদ্ধ করিলেন।” এই ঘটনার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, অসম্মদীয় গুরুপাদপদ্ম তদীয় গুরুদেব শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে কিরূপ প্রাণাধিক ভক্তি করিতেন। তিনি প্রাণপর্যন্ত তুচ্ছ করিয়া তদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্মের সেবা করিয়াছেন। এইজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ যখন শ্রীল গুরুপাদপদ্মকে ‘কৃতিরত্ন’ উপাধিতে ভূষিত করেন তখন তিনি মানপত্রে “শ্রীল প্রভুপাদ-অন্তরঙ্গ্য”-শব্দ লিখিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপ শ্রীগুরুসেবার আদর্শ জগতে অত্যন্ত বিরল। শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অনন্ত মহিমা। অনন্তদিন অনন্তহস্তে লিপিবদ্ধ করিলেও শেষ হইবার নহে। তাঁহার শুভ আবির্ভাব-শতবর্ষে তদীয় অনন্ত মহিমার এককণামাত্র আমি স্পর্শ করিলাম।

পরিশেষে পরমারাধ্যতম গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের এবং পরম গুরুপাদপদ্ম প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীচরণকমলে ভক্তিপূর্ণ অনন্তকোটি সান্ত্বনা দণ্ডবৎ-প্রণাম নিবেদন করত তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপাশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম।

—ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীভক্তিবেন্দান্ত পর্যটক

## শ্রীগৌড়ীয়-কেশবের দর্শনালোকে

### শ্রীব্যাসপূজা

“সাক্ষাদ্ধারিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সন্টিঃ।  
কিন্তু প্রভেদ্য প্রিয় এব তস্য, বন্দে গুরো শ্রীচরণাবিন্দম্॥  
যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদো, যস্যপ্রসাদান্ গতিঃ কুতোহপি।  
ধ্যায়ন্তবন্তস্য যশস্ত্রি-সন্ধ্যাং, বন্দে গুরো শ্রীচরণাবিন্দম্॥”

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈশ্চৈব নরোত্তমম্।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥”

শ্রীগুরুপূজার নামান্তরই শ্রীব্যাসপূজা। ব্যাসপূজা সাধারণতঃ শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিবাসরে, অথবা উদ্যোক্তার নিজের জন্ম-তিথিতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত আষাঢ়ী-পূর্ণিমা-তিথিতেও ব্যাসপূজার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। মূলতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মৃতিচারণ বা পূত অতিমর্ত্য চরিতাবলী স্মরণপূর্বক বিশেষভাবে ভক্তগণ ইহা উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, গুরুদেবের পূজা ত' নিত্য-নৈমিত্তিক বা সর্বকালীন। অথচ এইভাবে সুনির্দিষ্ট একটি বিশেষ দিন বা তিথিকে অবলম্বন করিবার সার্থকতা কোথায়? এবং প্রয়োজনই বা কি?

শ্রীব্যাসপূজা হইল প্রকৃতপক্ষে সাধকের আত্মশুদ্ধি ও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতিবিধান। গুরুদেবের প্রতি নিষ্কপট ভক্তি ও নিষ্ঠা না থাকিলে ইহা অনুভূত হয় না। কেহ কেহ স্ব-স্ব জন্ম-তিথিতে ব্যাসপূজার আয়োজন হইলে নিজের পূজাকেই গুরুত্ব দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উক্ত দিবসে পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার যে সুবর্ণ সুযোগ আগত হয় তাহা অবশ্যই অনুধাবনীয়। ‘ভক্তগণ আমার পূজা করিবে বা করিবেন’—এই অভিমান বর্জনপূর্বক নিজেই ‘পূজক’—এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিলে বা করিতে পারিলেই উভয়দিকের অনুষ্ঠান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও মঙ্গলপ্রদ হয়।

শ্রীব্যাসপূজা-তিথি সাধক-জীবনের সাধন-ভজনের হিসাব-নিকাশের একটি বিশেষ দিন, অর্থাৎ বর্ষকালব্যাপী সাধক শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় কতটুকু নিষ্ঠার সহিত ব্রতী হইয়াছেন বা হইতে পারিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিবার সুযোগ। নিজের চলার পথে যদি কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় তাহা হইলে তাহা পর্যালোচনাদ্বারা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপাপ্রার্থনাপূর্বক আত্মশোধনে ব্রতী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে বৈষ্ণবের যে ছাব্বিশটি গুণ বা লক্ষণের বর্ণনা রহিয়াছে, তন্মধ্যে কি কি গুণের বিকাশ ঘটিয়াছে বা উহার অন্তরালে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইয়াছে কিনা, তাহা আত্মসমালোচনার সন্ধিক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলে সাধকের কল্যাণ সুনিশ্চিত হয়।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদকে বিভাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস নামে প্রসিদ্ধ হন। বেদ অপৌরুষেয় বাণী অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবন্মুখনিঃসৃত। বেদ অসীম জ্ঞানভাণ্ডার; অধিকারিভেদে ইহার তাৎপর্য্য সুদূরপ্রসারী। ত্রিকালজ্ঞ এই ঋষিপ্রবর তাঁহার শিষ্য বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, পৈলকে ঋগ্বেদ, জৈমিনীকে সামবেদ এবং সুমন্তকে অথর্ববেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। বেদের বিভিন্ন ধারা বিভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হওয়ায় মুনি-ঋষিগণের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ মতবাদের সৃষ্টি হয়। ত্রিগুণাত্মিক প্রবহমান ধারায় কাল-কবলিত কৃষ্ণবিমুখ জীবনিচয় মুখ্য-গৌণ-রুচিভেদে তাহাদের সাধনার পন্থা বিস্তার করিয়া চলিয়াছেন। তজ্জন্য শ্রীল ব্যাসদেব তাঁহার অনবদ্য লেখনী মহাভারতে উল্লেখ করিয়াছেন,—

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ, নাসাবৃষ্যস্য মতং ন ভিন্নম্।

ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, মহার্জনো যেন গতঃ সং পন্থাঃ॥

ভক্তির আলোকে পূর্ণদর্শন সম্ভব। অন্যান্য দর্শনের ফল আংশিক বা খণ্ডদর্শনই প্রতিভাত হইয়া থাকে। ভক্তি সম্পর্কে শ্রুতি-বচনে পাওয়া যায়,—“ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো, ভক্তিরেব ভূয়সী।”—অর্থাৎ ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদর্শন করান। সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ, তজ্জন্য ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠা।

নিজের সীমিত জ্ঞানের ভাণ্ডার লইয়া বেদের অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের কতটুকু জানা সম্ভব? তাই সর্বক্ষেত্রে ঈশ্বর-নির্ভরতা প্রয়োজন। সবকিছুর কেন্দ্রই যখন পরমেশ্বর, তখন কেন্দ্রকে অবজ্ঞা করিলে ব্যাসের ব্যাসত্ব কোথায়?

শ্রীব্যাসপূজার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হইল গুরু-শিষ্য সম্পর্ক। এস্থলে সদগুরু ও সচ্ছিয়ের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রহিয়াছে। গুরুর গুরুত্ব যেমন আরোপিত হইয়াছে, শিষ্যের ভূমিকাও তদ্রূপ নিহিত রহিয়াছে। ইহার ব্যতিক্রম যদি পরিলক্ষিত হয়, তবে তাহা কল্যাণপ্রদ না হইয়া বঞ্চনায় পর্য্যবসিত হয়।

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।

স্বয়মাচরণে যস্মাদাচার্য্য স্তেন কীর্তিতঃ।।

শাস্ত্রার্থ অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্যগ্রূপে সংগ্রহ করিয়া অপরকে আচারে স্থাপন এবং স্বয়ং শাস্ত্রাদেশ আচরণ করেন বলিয়া আচারবান্ তত্ত্ববিৎ পুরুষ ‘আচার্য্য’ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহারই প্রতিধ্বনিক্রমে আমরা পাই—

আপনে আচরে, কেহ না করে প্রচার।

প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার।।

আচার-প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।

তুমি সর্বগুরু, তুমি জগতের আর্ঘ্য।।

শ্রীগুরুদেবের মহিমার কথা বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জগতের উদ্দেশ্যে শ্রীউদ্ধবজীকে বলিয়াছিলেন,—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কহিচিৎ।

ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ।।

অর্থাৎ গুরুদেবকে মৎ-স্বরূপ জানিবে। গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে না, গুরু সর্বদেবময়।

কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যেহেতু শাস্ত্রে গুরুদেবকে সর্বদেবময় বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেহ কেহ বলেন,—গুরুদেব যেহেতু সর্বদেবময় সেইহেতু আর কাহারও অপেক্ষা রাখিতে হইবে না। কিন্তু ‘আশ্রয়’ ও ‘বিষয়’-এর যে বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিলে শুদ্ধাভক্তির প্রতিধ্বন্ধক হইয়া যায়।

শিষ্যের ভূমিকা সম্পর্কে উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।

সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠম।।

তাৎপর্য্য এই যে, ভগবদ্বস্তুর বিজ্ঞান ( প্রেমভক্তিরূপ বিশেষ জ্ঞান ) লাভ করিবার জন্য মঙ্গলাকাজী ব্যক্তি সমিধ হস্তে লইয়া বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদগুরুর নিকট কায়মনোবাক্যে উপনীত হইবেন।

এক্ষেত্রে যিনি শিষ্য তাঁহার হৃদয়ে যদি অসন্তুষ্ট লুক্কায়িত থাকে, তাহা হইলে বঞ্চিত হওয়াই স্বাভাবিক। সেবা, সেবক, সেবা—এই তিনটি নিত্য সনাতন। সুতরাং গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক স্বচ্ছ ও নির্মল। উভয়ের ক্ষেত্রে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে শ্রীব্যাসপূজা-অনুষ্ঠানের সার্থকতা কোথায়!!

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈদান্ত আচার্য্য

## পাষাণগজৈকসিংহ—গোস্বামী শ্রীল কেশব

বাংলা ১৩০৪ সালের ১২ই মাঘ, ইংরেজী ১৮৯৮ সালের ২৪শে জানুয়ারী, সোমবার কৃষ্ণ-তৃতীয়া-তিথিতে প্রেমাবতারী শ্রীগৌরঙ্গমহাপ্রভুর ইচ্ছাপূর্তির নিমিত্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গগনে উজ্জ্বল ভাস্কররূপে ভবপারের তরণী ও কর্ণধারস্বরূপ বিশ্ববিশ্রুত মহাপুরুষ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ প মহংস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ আবির্ভূত হন। তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে ‘আচার্য্য কেশরী’ নামে পরিচিত। তাঁহার অন্তরঙ্গ সতীর্থ পরমপূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ তাঁহাকে ‘পাষাণ-গজৈকসিংহ’ উপাধিতে ভূষিত করিয়া উক্ত নামে সম্বোধন করিতেন। অমানী-মানদর্শন্যে অর্থাৎ ‘তৃণাদপি সূনীচ’ ধর্ম্যে অদীক্ষিত আমার ন্যায় সেবকাধর্মের পক্ষে প্রাকৃত চিন্তবৃত্তি লইয়া সেই মহাপুরুষের অতিমর্ত্য চরিতগাথা বর্ণনা অর্থাৎ তাঁহার দিব্যজীবন ও অপ্রাকৃত শিক্ষাধারা বর্ণনা ধৃষ্টতা মাত্র। অতি সামান্য ও সীমিত জ্ঞানভাণ্ডার লইয়া গুরু-বৈষ্ণবের অতিমর্ত্য চরিত ও বাণীর পরিমাপ করিতে গেলে অবশ্যই বিবর্তের ফাঁদে পড়িতে হয়—ইহা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। তথাপি এই সেবকাধম দুর্লভ মনুষ্যজন্ম সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য ‘সূর্য্যরশ্মির দ্বারা সূর্য্যদর্শনে’র ন্যায় মদীয় পরমগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী করুণার বারি প্রার্থনাপূর্ব্বক তাঁহার অসীম অনন্ত মহিমার কণামাত্র কীর্ত্তন করিবার প্রয়াস পাইতেছি।—

পরমগুরুদেব শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের অঙ্গজ্যোতি ও মুখশ্রী জ্যোৎস্নার ন্যায় হইয়াছিল বলিয়া পূর্ব্বাশ্রমে তাহার ডাক নাম ছিল ‘জ্যোৎস্না’, অপভ্রংশে ‘জোনা’ বা ‘জনাদর্দন’, ভাল নাম ‘শ্রীবিনোদবিহারী’। যৌবনের প্রারম্ভে গৃহত্যাগপূর্ব্বক যখন তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলেন তখন তাঁহার নাম হইল ‘শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী’। সর্ব্বোপরি সকলের নিকট তিনি পরম আদরের ‘বিনোদদা’ নামে পরিচিতি লাভ করেন। আপনি আচারি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়”—শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর সার্থক রূপকার শ্রীল কেশব গোস্বামী ছিলেন ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন ভগবৎপ্রেরিত মহাজন—তাহা তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে পরিষ্কার পরিস্ফুট হয়। জড়ভোগে আসক্ত, জড়বাদের গোলোকধাঁধায় ক্রিষ্ট নিরীশ্বর নীতিহীন কৃষ্ণবহিস্মুখ জীবের বাস্তব কল্যাণচিন্তাই ছিল তাঁহার ন্যায় পরদুঃখদুঃখী মহাত্মার জীবনের অন্যতম ব্রত। তিনি পূর্ব্বাশ্রমে সম্ভ্রান্ত জমিদারের পুত্র হইয়াও নিরভিমান ছিলেন এবং “ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে। ব্রজে রাখাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে।।”—ইহাকে বহুমাননপূর্ব্বক কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা ও জড়ভোগ-ত্যাগ ছিল তাঁহার লোকশিক্ষামূলক সাধনা ও একমাত্র লক্ষ্য। ইহ জগতের কোন বস্তুর প্রতি তাঁহার কোন আসক্তি ছিল না, ভোগবিলাসহীন জীবনে তিনি অত্যধিক আনন্দ লাভ করিতেন। তাঁহার সহজাত উদারতা, ত্যাগ ও বৈরাগ্যমূলক চিন্তবৃত্তি ছিল সকলের আকর্ষণের বিষয়। তাঁহার গুরুসেবার আদর্শ, অন্তরের স্নিগ্ধ শীতলভক্তি ও ভাবাবেশ যে কোন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির অনুসরণের বিষয়। গুরুনিষ্ঠা, বৈষ্ণবতা, হরিভক্তি,

শিষ্টাচার, পরদুঃখকাতরতা, আতিথেয়তা, সত্যানুরাগ, মধুর চরিত্র, কর্মতৎপরতা প্রভৃতি গুণের দ্বারা তিনি তাঁহার পরমারাধ্যদেব গুরুপাদপদ্মের মন জয় করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজ-শিষ্য ভক্ত কুরেশের ন্যায় তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া একবার আক্রমণকারীর হস্ত হইতে গুরুদেবকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া অন্তরঙ্গ বিশ্রান্ত গুরু-সেবানিষ্ঠার আদর্শ জগতে স্থাপন করিয়াছেন। স্নিগ্ধ ব্যবহারের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন উৎসবাদিতে বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বিশেষ ভক্তগণের আদর-যত্নের ভার তাঁহার এই প্রিয় সেবকের উপর ন্যস্ত করিতেন।

যাঁহাদের ভজনে নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা রহিয়াছে অর্থাৎ যাঁহারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন, প্রাকৃত জগতের অভাব-অভিযোগ, উদ্বেগ, দুঃখ, কষ্ট প্রভৃতি তাঁহাদিগকে উৎপীড়ন করিতে পারে না, ইহা প্রায়শঃ শ্রীবিনোদবিহারীজী সকলের নিকট উপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি আরও বলিতেন,—“কলিহত জীবের পক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দিষ্ট পথে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনই একমাত্র মঙ্গলকর ব্যবস্থা। মৎস্য-মাংসভোজী অপসম্প্রদায় প্রচারিত নানা মত কখনই সনাতন ধর্ম নহে। বৈষ্ণবগণ সর্বতোভাবে সদাচার পালন ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্তি সংরক্ষণে যত্নবান হইবেন।” “নায়ামাত্রা বলহীনেন লভাঃ” ও ‘ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ’ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা সকলকে জানাইয়াছেন যে,—“সর্বাপেক্ষা সাহসী বীরপুরুষগণই ধর্মজীবন যাপন করেন, ভীৰু কাপুরুষগণই আহার-নিদ্রা-ভয়-ইন্দ্রিয়তর্পণাদিতে আবদ্ধ থাকেন। রাজনৈতিকতা, অর্থনৈতিকতা, সমাজনৈতিকতা প্রভৃতিতে যাঁহারা আসক্ত, তাঁহারা সকলেই ভীৰু ও কাপুরুষ।” প্রাকৃত সহজিয়াগণের ভোগময় বিচার গর্হণমানসে তিনি শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত প্রবন্ধাদি সঙ্কলনপূর্বক ‘সহজিয়া দলন’ গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচারপূর্বক শুদ্ধাচারপরায়ণ নির্দোষ জীবনযাপনের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। শ্রীজন্মান্তমী, শ্রীএকাদশ্যাদি হরিবাসর, শ্রীগৌর-জয়ন্তী, শ্রীসিংহ-চতুর্দশী, শ্রীরাম-নবমী, শ্রীঅদ্বৈত-সপ্তমী, শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী প্রভৃতি ব্রতোপবাস পূর্ববিদ্যা ত্যাগপূর্বক বিশেষ নিষ্ঠার সহিত পালনের প্রয়োজনীয়তা তিনি বারংবার আমাদের জানাইয়াছেন। যাঁহারা চাতুর্মাস্য ব্রতপালনের যত্নগ্রহে অনীহা প্রকাশপূর্বক কেবলমাত্র উজ্জ্বলিত বা দামোদর-ব্রতে আদর প্রদর্শন করেন, তিনি তাঁহাদিগকে ফাঁকিবাজ বলিয়া গালাগালি করিয়াছেন। কার্তিকব্রতের সহিত চাতুর্মাস্য-ব্রতপালনও অত্যন্ত সমাদরের সহিত সর্বতোভাবে পালন করিবার জন্য সকল সাধকগণকেই আদেশ ও নির্দেশ দিয়াছেন। স্মরণাতীত কাল হইতে সকল সাধকগণ উভয়ব্রতই নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া আসিতেছেন, হরিসেবায় ক্রেশ স্বীকারে পরাজন্ম্য ব্যক্তিগণই চাতুর্মাস্য পরিত্যাগপূর্বক কার্তিকব্রতে অধিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইতে গিয়া ধর্মের নামে আহার-বিহার-লাম্পটাকেই প্রশ্রয় দেন, তাহা “তপো-বেশোপজীবন” উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন। কর্মজড়-স্মার্তগণের নিকট অধিমাস সংকল্পহীন ও ‘মলমাস’-নামে পরিচিত। পারমার্থিক শাস্ত্রে অধিমাস শ্রেষ্ঠ ও হরিভজনোপযোগী এবং ইহার ‘পুরুষোত্তম’ আখ্যাপ্রাপ্তি। কর্মকাণ্ডের পীড়ন না থাকায় অধিমাস ভক্তের প্রিয় ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পূজাই পুরুষোত্তম মাসের একমাত্র কৃত্য। বৈষ্ণব

ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেরই পুরুষোত্তম-ব্রত কার্তিক-ব্রতের ন্যায় পালন করা অবশ্যই কর্তব্য বলিয়া যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে উদাসীন হইতে তিনি সকলকে নিষেধ করিয়াছেন। শ্রীধামনবদ্বীপ-পরিক্রমাদি প্রবর্তনের দ্বারা তিনি তাঁহার গুরুপাদপদ্মের মনোহীষ্ট পূরণ করিয়াছিলেন।

পরমগুরুদেব শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ সেবার নামে কপটতা ও ভক্তির নামে ভণ্ডামি সহ্য করিতে পারিতেন না। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের অবৈধ অনুকরণ সেবা বা ভজন নহে, তিনি উহা পাশ্বেতা বলিয়া জানাইয়াছেন। তিনি কখনও নিজ্ঞন ভজনের নামে আলস্যের প্রশ্রয় দেন নাই, বরং কায়মনোবাক্যে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ভিক্ষুকগণকে সেবানুকূল্য-সংগ্রহ ব্যাপারে “তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত, সেও ত’ পরম সুখ।”—পদের সুষ্ঠু বিচার গ্রহণপূর্বক দেহারামী আয়াসীর জীবনযাপন না করিয়া কষ্টসহিষ্ণু হইয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত থাকিবার নির্দেশ দিতেন। ব্রজমণ্ডলাদি ক্ষেত্রে মাধুকরী ভিক্ষাদ্বারা জীবন নির্বাহের অভিনয়কারিগণের অপচেষ্টাকে তিনি সর্বতোভাবে গর্হণ করিতেন এবং এরূপ বৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জিহ্বা-লাম্পট্যাদিতে আসক্তাবস্থায় ব্রজে বানর-কচ্ছপাদিরূপে জন্মগ্রহণের ভয়াবহ পরিণামের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেন। বৈষ্ণবসেবার সার্থকতা ও ধর্মীয় জীবনযাপনে আহারশুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণের পক্ষে দেবদেবী পূজা নিষিদ্ধ এবং ইহা দশবিধ নামাপরাধের অন্যতম—ইহা ‘দেবদেবী পূজা কর্তব্য কিনা’ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যাকালে বিশেষ দৃঢ়তার সহিত স্থাপন করেন।

তিনি দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম সংস্থাপন, শ্রীধাম-পরিক্রমা, মুদ্রায়ন্ত্র-স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচার, ভক্তিসিদ্ধান্ত ও শ্রীনামহট্টের প্রচারাদিতে নিজকে সর্বতোভাবে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় মহাতেজস্বী নির্ভীক স্পষ্টবক্তা ও প্রচারক অত্যন্ত বিরল। হরিকথা প্রচারোদ্যমে তাঁহার শ্রীমুখে পরিশ্রম বা ক্লান্তির আদৌ কোন চিহ্ন কেহ কখনও লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহার অতিমর্ত্য বাণীর স্পন্দন লাভ করিয়া শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, ভূম্যধিকারী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্মের কথা সমগ্র বিশ্বের আপামর জনগণকে বিতরণের উদ্দেশ্যে ‘জীবন্ত মৃদঙ্গ’রূপ ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসিগণের এবং ‘বৃহৎ মৃদঙ্গ’রূপ মুদ্রায়ন্ত্র ও ছাপাখানার আশ্রয় লইয়াছিলেন। জীবন্ত মৃদঙ্গ ও বৃহৎ মৃদঙ্গের সাহায্যে তিনি বৈকুণ্ঠ বার্তাসহ ও শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত বাণীর মৌলিক গ্রন্থ—বেদান্ত-উপনিষৎ-গীতা-ভাগবত-গোস্বামি-গ্রন্থাদি প্রকাশ ও প্রচারপূর্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আত্মকল্যাণকর বাণী বিশ্বের দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র পারমার্থিক মাসিক ‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা’ ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচারের উদ্দেশ্যেই ‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস’ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি একই উদ্দেশ্যে ‘শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী’ ও ‘শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়’ স্থাপন করেন। ‘শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী’র প্রচার প্রসারের দ্বারা প্রাকৃত সহজিয়া কুলোদ্ধৃত বর্ণবহির্ভূত দানবীয় বিচার

বিদূরিত হইয়াছে। তাঁহার দার্শনিক বিচারপূর্ণ বক্তৃতা অতীব প্রশংসার্হ। তিনি ‘ধর্ম-জীবনই মনুষ্য জীবনের প্রধান কর্তব্য’, ‘বৈষ্ণব ধর্মই সনাতন ধর্ম’, ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-প্রভুর নাম-প্রেমধর্মই বেদান্তের প্রাপ্যবিষয়’, ‘শব্দব্রহ্মের উপাদেয়তা ও শব্দসামান্যের হেতু’, ‘ভক্ত ও ভগবান কাল ও মায়াতীত’, ‘সর্বধর্ম সমন্বয়ের অর্থ—সকল ধর্মই এক নহে’, ‘চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য শ্রীবিগ্রহ-দর্শন নহে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ভোগ-পিপাসা নিবারণ করিবার জন্যই শ্রীবিগ্রহের দর্শন’ প্রভৃতি শাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্তসমূহ বক্তৃতার মাধ্যমে জনগণকে অবগত করাইয়া তাঁহাদের বাস্তব কল্যাণসাধন করিয়াছেন। ষড়্‌দর্শনের মধ্যে বেদান্ত দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং একমাত্র ভক্তিই বেদান্ত-সূত্রাকারের হৃদয়িক অভিপ্রায়, ইহা তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ-যুক্তিমূলে স্থাপন করেন। গোড়ীয় বেদান্তই ভক্তিবাদ, ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভগবতেই ইহার তাৎপর্য প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তিনি ত্রিদণ্ডসম্মাসিগণকে ‘ভক্তিবাদ’ বিশেষণে বিভূষিত করিয়া শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছেন।

অন্যাভিলাষী, কুজ্জানী, কুযোগিগণের তত্ত্বমতবাদ খণ্ডনপূর্বক শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ তাঁহাদের বাস্তব পরমার্থ-পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা বহুস্থলে তাহার সত্যসংরক্ষণে নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় পাই। ‘সম্প্রদায়-সংরক্ষণই মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠসেবা’—ইহা বিশেষরূপে অন্তরে অনুভব করিয়া তিনি যে বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে অদ্বয়-ব্যতিরেকভাবে বাদ-প্রতিবাদমুখে তত্ত্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এক অদ্ভুত অলৌকিকতা পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার রচিত ‘শ্রীল প্রভুপাদের আরতি’, ‘শ্রীতুলসী-আরতি’, ‘শ্রীমঙ্গল-আরতি’ প্রভৃতি গীতির মধ্যেও তাঁহার অনুভব-প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছে। মায়াবাদী তথা শুদ্ধভক্তি-বিরোধীদের প্রতি তিনি চিরদিনই খড়্গহস্ত ছিলেন। শ্রীশঙ্করের অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদকে সমূলে উৎপাটন করিতে তিনি যে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পত্র, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ব্যাখ্যা, ভাষ্য, বিবৃতি, ভাষণাদির মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের অমূল্য গ্রন্থ ‘মায়াবাদের জীবনী’ মায়াবাদ বিনাশের তীক্ষ্ণধার কুঠারস্বরূপ। মায়াবাদ-নিরাসপত্র গ্রন্থ ও গীতিকাব্য, দার্শনিক প্রবন্ধাদি, বিভিন্ন সভায় প্রদত্ত গভীর তত্ত্বসিদ্ধান্তমূলক ভাষণাদি তাঁহার অতিমর্ম্মভব প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করে। শ্রীগোড়ীয় মঠ-মিশনের যাবতীয় মামলা-মোকদ্দমার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভারকে শ্রীরূপানুগ সারস্বত-গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ শ্রীরাধাধারণীর সেবারূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। তিনি নবদ্বীপধামস্থ কোলদ্বীপে যে অভভেদী সর্বোচ্চতম শ্রীমন্দির ও বিরাট নাট্যমন্দিরাদিসহ মঠ-মন্দির স্থাপন করিয়াছেন, তাহা কেবল অর্চাসেবার প্রতিষ্ঠানস্বরূপ নহে, তাহা ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী বা বেদান্তের উচ্চতম কীর্তনাক্ষা ভক্তি প্রচারের প্রতীক। তথায় শ্রীমূর্ত্তির প্রাণহীন পূজা হয় না, যাজকসূত্রে, পূজকসূত্রে শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্তিত ‘হরে কৃষ্ণ’ মহামন্ত্রের সপ্রাণ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি মঠ-মন্দিরাদি স্থাপনের দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের মনোহীণ পূরণপূর্বক তাঁহার মহিমা জগতে বিঘোষিত করিয়াছিলেন। “রাধাচিন্তা-নিবেশন যস্য কান্তির্বিলোপিতা। শ্রীকৃষ্ণচরণ বন্দে রাধালিপিত-বিগ্রহম্।।”—তাঁহার রচিত ‘শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারি-

তত্ত্বাষ্টকম্' এর প্রথম শ্লোকে তিনি তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় স্থান হইতে উদ্ভূত শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের অঙ্গকান্তির প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন।



শ্রীশ্রীল বৈষ্ণব গোপাল-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদ-দ্বিজবীজীউ

সত্যের সংরক্ষণের নিমিত্ত শ্রীল বিনোদবিহারী কৃতিরত্ন প্রভু অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করিয়া নীরব থাকিতেন না, তাহা তাঁহার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী হইতে পরিদৃষ্ট হয়। ১৯৫৬ সালের ২৭শে জুলাই 'হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসি-নিয়ন্ত্রণে' একটি বিল বা বিধান উপস্থিত করা হয়। উক্ত বিলের বিরুদ্ধে তিনি বাংলা, ইংরাজী, হিন্দী ভাষায় লক্ষ লক্ষ প্রতিবাদপত্র মুদ্রিত করিয়া সকল রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রধানগণের নিকট প্রেরণপূর্বক প্রবল আন্দোলন ও আলোড়ন সৃষ্টি করিলে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুজীর নির্দেশে লোকসভা উক্ত বিল বাতিল করিতে বাধ্য হন। ১৯৬৩ সালের ৩রা নভেম্বর রবিবার দৈনিক 'যুগান্তরে' প্রকাশিত হইয়াছিল,—“পুরীতে হাজারের অধিক টাকা মূল্যের ভোগ ভূ-প্রোথিত, অ-সেবায়োত স্পর্শদুষ্ট বলিয়া সুপকারের হট্টগোল।” শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে ‘ছুঁৎমার্গ’ সংবাদে প্রতিবাদে তিনি লিখিয়াছিলেন,—“শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ হইবার পর যখন সুপকারগণের পাচিত অন্ন মহাপ্রসাদ বলিয়াই শাস্ত্র নির্দেশ দিয়াছেন, সেই মহাপ্রসাদের কোন স্পর্শদোষ নাই।



কিন্তু ভোগ হইবার পূর্বে জগন্নাথদেবের সেবকগণ ব্যতীত অর্থাৎ যাহাদের ভোগ দিবার অধিকার আছে তাঁহারা ছাড়া অন্য কাহারও স্পর্শ করিবার অধিকার নাই। শেষোক্ত অস্পৃশ্য ব্যক্তিমাত্র ভগবানের ভোগের পূর্বে স্পর্শ করিলে তাহা আর কখনও ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেবকে দেওয়া চলিবে না, ইহাই শুদ্ধ বিচার।”

শ্রীনবদীপধাম পরিক্রমাকালে অন্তর্দীপ মায়াপুরস্থ শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির দর্শন ও বক্তৃতাকালে শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের দৈন্য-বিনয়োক্তিসহ অঝোর নয়নে আকুল ক্রন্দন তাঁহার বিশ্রুত গুরুসেবৈকনিষ্ঠা প্রকাশ করিত এবং অত্যন্ত পাষণ্ড-চিত্ত-ব্যক্তির পাষণ হৃদয়ও বিগলিত হইত। আশ্রয়-বিগ্রহ আরাধ্যদেবের শ্রীন্যমের আদ্যক্ষর ‘প্র’ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ভাব-বিহুল অবস্থায় তাঁহার বাক্য ও কণ্ঠ রুদ্ধ হইত। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পরে তাঁহার প্রেষ্ঠ শিষ্যাভিমানিগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁহার অপ্রাকৃত কলেবর নিমতলা শ্মশানে দাহ করিতে মনস্থ করিলে তিনি ‘সন্ন্যাসীর দেহ দাহযোগ্য নহে’ বলিয়া কঠোর প্রতিবাদে তাঁহাদিগকে বিরত করেন। পরে কলিকাতা হইতে স্পেশাল ট্রেনে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত কলেবর মায়াপুরে আনিয়া অভিন্ন গোবর্দন শ্রীরজপত্তনে ভক্তিবিজয় ভবন ও বৃহৎ শ্রীমন্দিরের মধ্যস্থলে সমাধিস্থ করা হয়। শ্রীপ্রভুপাদের সমাধির পরে কেহ কেহ স্মার্তমতে তাঁহার শ্রাদ্ধ করিবার কথা উত্থাপন করিলে তিনি তাঁহাদের প্রতি ক্রোধপ্রকাশপূর্বক স্মার্ত ও বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধের তাৎপর্য ও পার্থক্য বিশ্লেষণদ্বারা তাঁহাদিগকে সঙ্গুরুর নির্দেশিত পন্থায় চলিতে ও দৃঢ় নিষ্ঠাপ্রদর্শন করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন। “শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাবে বিরহ-স্মৃতি ও তিরোভাবে মিলন-মহোৎসব যুগপৎ সম্ভব” —এই তত্ত্বপ্রকাশপূর্বক তিনি “শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব ও তিরোভাব যে একতাৎপর্যপূর্ণ” তাহা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

পরমগুরুদেবের পারাবত-চড়ুই পাখীর প্রতি স্নেহ, মমতা, অহিংসনীতি ও বালক-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে সকলের প্রতি সরল সদয় ব্যবহার প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। অনর্থগ্রস্ত জীবের উদ্ধারমানসে তাঁহার অহৈতুকী করুণার পরিচয় পাওয়া যায়, হরিভজন-প্রয়াসীর কল্যাণার্থে তাঁহার মঠ-মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। তাঁহার মঠ-মিশনে কেহ হরিভজন করিতে আসিলে তিনি বৃদ্ধ, রোগগ্রস্ত, জাগতিক যোগ্যতাবিহীন যাহাই হউক না কেন, তাঁহাকে আশ্রয়প্রদানপূর্বক হরিভজনের সুযোগ দান করিতেন। ইহা নিঃসন্দেহে তাঁহার বদান্যতা, কৃপালুতা, পরদুঃখিতা ও কৃষ্ণেকশরণতার জ্বলন্ত আদর্শ ও দৃষ্টান্ত। সিংহ যেরূপ বহিঃশত্রুর প্রতি পরাক্রম প্রকাশ করে, কিন্তু নিজ সন্তানের প্রতি স্নেহযুক্ত; তদ্রূপ তিনি নাস্তিক পাষণ্ডিগণের নিকট সাক্ষাৎ দণ্ডধর কৃতান্তস্বরূপ, কিন্তু শিষ্য বা আশ্রিতজনের প্রতি সন্তান বাৎসল্যযুক্ত ছিলেন। তাহাদের শত দোষ-ত্রুটি মার্জ্ঞানাপূর্বক তাহাদিগকে সেবাসুযোগ দান করিতেন। তাঁহার সতীর্থ-গুরুভ্রাতাগণের প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতির পরিসীমা ছিল না। বৈষ্ণব সতীর্থগণকে উত্তমরূপে সেবা করাইয়া তিনি অত্যন্ত পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। তাঁহার অনেক গুরুভ্রাতা নিকটে আসিয়া ‘বিনোদদা’ বা ‘কেশব মহারাজ’ স্নেহ সম্বোধন করিলেই তিনি তাঁহাদের অবস্থা বুঝিয়া বিনা প্রত্যাশায়

যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্যাদি করিতেন। ইহা নিঃসন্দেহে তাঁহার সতীর্থের প্রতি বাৎসল্য-ভাব বলিতে হইবে। ইহা ‘গুরুদেবতাম্র’ শিষ্যের বিশেষ সদৃশ্যের পরিচায়ক।

বাংলা ১৩৭৫ সালের ১৯শে আশ্বিন, ইংরেজী ১৯৬৮ সালের ৬ই অক্টোবর, রবিবার রাত্রি ৬-১৫ মিনিটে শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গজন প্রয়োজনাবতারা শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যতা ও শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীর অপ্রাকৃত লীলামাধুর্য্য আশ্বাদনকারী নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবতোত্তম আচার্য্যকেশরী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ আমাদিগকে বিরহসাগরে নিমজ্জিত করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। শ্রীরূপানুগ সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই লোকোত্তর মহাপুরুষের নিকট সর্ববিষয়ে চিরঋণী আছেন ও থাকিবেন—এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সপার্ষদ পরমগুরুপাদপদ্ম নিত্যধাম হইতে আমাদিগকে প্রচুর কৃপাশীর্বাদ বর্ষণ করত তাঁহার চরণধূলি অর্পণ করুন—ইহাই আমাদের তাঁহার নিকট সাকাতর প্রার্থনা। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্ম জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবদাস্ত বামন গোস্বামী মহারাজ, শিক্ষাগুরুদ্বয় পরমপূজ্যপাদ ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবদাস্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ও ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবদাস্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুগত ত্রিদিগুপাদগণ ও সেবকগণের মধ্যে আমি তাঁহার করুণার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইতেছি। তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক এই সেবকধর্মকে এই আশীর্বাদ করুন যাহাতে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাতেই এই মূল্যহীন জীবন সর্ব্বতোভাবে উৎসর্গ করিয়া সাধক করিতে পারি।

—ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবদাস্ত বোধায়ন

শ্রীল গুরুমহারাজের শুভাবির্ভাব-শতবার্ষিকী-পূর্তি

## ব্যাসপূজা-স্মরণে

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-ইতি-নামিনে। †

শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর হইল শ্রীগুরুপূজা। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—ব্যাসাভিন্ন গুরুদেব। গুরুপূজা হইলে ব্যাসপূজা হইয়া যায়। নিজ জন্মতিথিতে অথবা গুরুদেবের জন্মতিথিতে ব্যাসপূজা করা যায়। যাঁহার জন্ম যে তিথিতে সেই তিথিকে কেন্দ্র করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গুরুদেবের পূজা হইলে তাহা ব্যক্তিগত বা ব্যষ্টিগত গুরুপূজা। গুরুদেবের জন্মতিথিকে কেন্দ্র করিয়া সম্মিলিতভাবে যে গুরুপূজা করা হয়, তাহা সমষ্টিগত গুরুপূজা। এই সমষ্টিগত গুরুপূজাই শ্রীব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়-সারস্বত-সম্প্রদায়ে প্রচলিত। স্মার্ত-সমাজ ব্যাসপূজা করেন না। তাঁহারা ব্যাসপূজা বাদ দিয়া দেবদেবীর পূজায় মত্ত হইয়াছেন। যিনি সমস্ত পৃথিবীতে পূজা-পদ্ধতি প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার পূজা সর্ব্বপ্রথমে করা দরকার। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্যাসপূজা করিবার আদেশ ও নির্দেশ দিয়াছেন। শ্রীবাসের গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর ব্যাসপূজা করাইয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর মধ্যে প্রকৃত ‘ব্যাসপূজার’ তাৎপর্য্য ও সন্ধান পাওয়া

যায়। কেবলমাত্র শ্রীব্যাসের পূজা, শ্রীকৃষ্ণ বা গৌরসুন্দরের পূজা, অথবা কেবল শ্রীগুরুপূজা প্রকৃত ব্যাসপূজা নহে। শুদ্ধ গৌড়ীয়গণের পূজাই প্রকৃত ব্যাসপূজা। শুদ্ধ গৌড়ীয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুদেব বা শ্রীব্যাসের পূজা হয় না। কারণ শুদ্ধ গৌড়ীয়শ্রেষ্ঠই শ্রীগুরুদেব। গৌড়ীয়ার মালিক শ্রীস্বরূপ-দামোদরভিন্ন প্রভুই শ্রীগুরুদেব। এজন্য শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতীর অনুগ সম্প্রদায়ের শ্রীব্যাসপূজা পদ্ধতিতে এইরূপ মন্ত্রদৃষ্ট হয়।—“শ্রীদামোদরস্বরূপ-শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীব-ভট্টয়ুগ-শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজাদি-শ্রীভক্তিবিনোদ-শ্রীমদ্ গৌরকিশোরদাস-শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-গোস্বামিপাদান্ত সর্বোভ্যো গুরুভ্যো নমঃ।” শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র ও পুষ্কর তীর্থ হইতে ‘শ্রীব্যাসপূজা পদ্ধতিঃ’ আহরণ করিয়াছিলেন।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার উন্নতোজ্জ্বল প্রেমধর্ম প্রচার করিয়া অপ্রকট হইলে ষড়্গোষামী, শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ প্রভু ও নরোত্তম প্রভু প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ এই ধারা রক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহাদের অপ্রকটের পর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই প্রবাহ স্তিমিতপ্রায় হইয়া যায়। কালক্রমে আউল, বাউল, সহজিয়াদি অপসম্প্রদায় প্রেমধর্মকে বিকৃত করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় শুদ্ধ প্রেমধর্মের বার্তা প্রচার করিবার জন্য যে কয়েকজন বৈষ্ণবাচার্য্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া অগ্রগামী হইয়া আসিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ এবং তদনুগত উপযুক্ত শিষ্যদের মধ্যে শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীল গুরু-মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিম্ব প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে ‘শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি’ স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীল গুরু-মহারাজ রাধাপক্ষীয়। যাঁহারা উন্নততম ভজনমার্গের বিপ্রলম্বরসে সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে একপ্রকার সকলোই কৃষ্ণের সহিত শ্রীমতী রাধারাগীর বিপ্রলম্বভাব চিন্তা করেন। কিন্তু অস্বদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীরাধারাগীর সহিত কৃষ্ণের বিপ্রলম্বভাব চিন্তা করিতেন। ‘শ্রীকৃষ্ণের রাধা’—অর্থে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় রাধা; আর ‘শ্রীরাধার কৃষ্ণ’—অর্থে শ্রীরাধা-সম্বন্ধীয় কৃষ্ণ। শ্রীরাধা-সম্বন্ধীয় কৃষ্ণই সর্বোৎকর্ষ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ‘রাধা-বিরহ’ অপেক্ষা ‘কৃষ্ণ-বিরহ’ই অধিক চিন্তা করিতেন। রাধারাগী কৃষ্ণের বিরহে দুঃখিতা মর্মান্বহতা, এইরূপ বিপ্রলম্ব ভাবের সিদ্ধি সাধারণ সাধকের অভীষ্ট। কিন্তু শ্রীল গুরুদেব ইহার ঠিক বিপরীত। কৃষ্ণই রাধারাগীর চিন্তায় গভীরভাবে নিমগ্ন থাকায়, তাঁহার অঙ্গকান্তি বিনুণ হইয়া ‘রাধালিঙ্গিত বিগ্রহ’ হইয়াছেন অর্থাৎ রাধারাগীর বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভু এই বিপ্রলম্ব-রসবিচার সর্বতোভাবে প্রচার করিয়াছেন ও শিক্ষা দিয়াছেন। কৃষ্ণই রাধারাগীর চিন্তা করুন—ইহাই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্দেশ্য। এই সমিতির যে যে স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে মন্দিরের মধ্যে স্বেতকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

আমরা সাধারণতঃ গুরুদেবের অপ্রকটে শিষ্যের বিরহ দেখি। শিষ্যের দেহরক্ষায়

গুরুদেবের বিরহ প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু গুরুপাদপদ্মে ইহা লক্ষিত হইয়াছে। অধিক বাৎসল্যই ইহার কারণ। শ্রীল প্রভুপাদের কতিপয় দীক্ষিত শিষ্য তাঁহার নিকট সন্ধ্যাস ও বাবাজীবেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অপ্রকট হইলে তাঁহাদের চরণে পুষ্প অর্পণ করিয়া শ্রীল গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম করিতে দেখিয়াছি। এই স্থলে তাঁহার ‘তৃণাদপি সুনীচেন’ বৈষণ্য ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তিনি ছিলেন নির্ভীক বক্তা। ‘সত্যং ব্রহ্মাৎ, প্রিয়ং ক্রিয়াৎ, মা ক্রিয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।’—ইহা নীতিবাক্য। তিনি বলিতেন, শাস্ত্রীয় সত্যকথা অপ্রিয় হইলেও বলিতে হইবে। তাহা হইলে শাস্ত্রের যথার্থ বিষয় বলা হইল।

তাঁহার অপ্রকটের কয়েক বৎসর পর কোন একসময় আমি মায়াপুরে গিয়াছিলাম। সর্বপ্রথমে পূজাপাদ শ্রীল মাধব মহারাজের মঠে প্রবেশ করিলাম। শ্রীল মহারাজের এক গুরুভ্রাতা নাট্যমন্দিরে বসিয়া হরিনাম করিতেছিলেন। আমি সেখানে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কাহার শিষ্য? তখন আমি আমার গুরু-মহারাজের নাম বলিলাম। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহারাজের প্রণাম মন্ত্ৰ কি? প্রণাম মন্ত্ৰ বলিলাম। তখন তিনি একটা অতীতের ঘটনা বলিলেন,—“একবার মহারাজ দক্ষিণভারত. পরিক্রমা করিয়াছিলেন। ঐ পরিক্রমায় আমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। একদিন উৎসবের জন্য আমাকে দুধ আনিতে বলিলেন। আমি ৪০সের দুধ আনিলাম। তিনি এই দুধ দেখিয়া আমাকে বলিলেন,—“ভোদাই, দুধ আনিয়াছ, না জল আনিয়াছ?” অতীতের এই প্রসঙ্গ মনে করিয়া তিনি “কে আর আমাকে ‘ভোদাই’ বলিবে” বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার সতীর্থ গুরুভ্রাতাগণের প্রতি তাঁহার স্নেহ, প্রীতি ও আন্তরিকতার পরিচয় পরিস্ফুট। তিনি নাস্তিক পাষণ্ডিগণের নিকট সাক্ষাৎ দণ্ডধর-স্বরূপ; কিন্তু আশ্রিতজনের প্রতি সন্তান বাৎসল্যযুক্ত। বৃদ্ধ, রোগী, জাগতিক যোগ্যতাহীন হইলেও কেহ যদি হরিভজনাগোষ্ঠী হইয়া মঠবাস করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, তিনি তাঁহাকে সেই সুযোগ প্রদান করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের আরতি, তুলসী আরতি, মঙ্গলারতি প্রভৃতি কীর্তন রচনার মধ্যে তাঁহার অভিনব প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি তাঁহার শ্রীবেদান্ত সমিতিতে একাদশী, জন্মাষ্টমী, গৌর-জয়ন্তী, শ্রীন্সিংহ-চতুর্দশী শ্রীঅদ্বৈত-সপ্তমী, শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী প্রভৃতি ব্রতোপবাস পূর্ববিদ্ধা ত্যাগ-পূর্বক নিষ্ঠার সহিত পালনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু-প্রদর্শিত শ্রীনবদ্বীপ ও অন্যান্য ধামাদি পরিক্রমার ধারাকে তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। অদ্যাপিও সেই ধারা পূর্বস্রোতে প্রবাহমান। পারমার্থিক পত্রিকাদি ও বিভিন্ন গ্রন্থাদি প্রকাশনের জন্য বৃহৎ-মুদ্রা স্থাপন তাঁহার এক অনন্য কীর্তি। বঙ্কজীবের নিত্যকল্যাণের জন্য ‘মায়াবাদের জীবনী’ গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি মায়াবাদকে নিরসন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত সুগভীর সিদ্ধান্তমূলক বিভিন্ন দার্শনিক প্রবন্ধাদি ও ভাষণাদি তাঁহার অতিমন্ত্ৰ্য চরিত্রের প্রকৃষ্ট পরিচয়।

একটা ঘটনা উল্লেখ করিয়া আমি আমার বক্তব্য সমাপন করিতেছি—একদা আমি শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে নাট্যমন্দিরে বসিয়াছিলাম, এমন সময় কলিকাতা হইতে একজন উচ্চশিক্ষিত শ্রদ্ধালুবাক্তি শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন।

তিনি দীর্ঘক্ষণ যাবৎ শ্রীবিগ্রহগণকে দর্শন করিতেছিলেন। দর্শন সমাপ্ত হইলে আমাকে বলিলেন যে, যিনি এই শ্রীবিগ্রহগণকে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার নাম কি? তখন আমি গুরু-মহারাজের নাম বলিলাম। তিনি গুরু-মহারাজের প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, যাঁহার দ্বারা এই বিগ্রহগণ প্রকাশিত হইয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই মহান ও ভগবানের নিজজন হইবেন। এইরূপ সুন্দর শ্রীবিগ্রহ আমি কোনদিন দর্শন করি নাই। এই মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া আমি আমার জীবন সার্থক করিব। তিনি গুরূপাদপদ্যকে দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গুরূদেবের নিকট যাইলাম। তিনি একটু দূর হইতে প্রায় ১৫-১৬ মিনিট একাগ্রচিত্তে শ্রীগুরূপাদপদ্যকে দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহার পর কিছু না বলিয়া দূর হইতে প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—শ্রীবিগ্রহ মহাজন-কর্তৃকই প্রকাশিত হন। শ্রীবিগ্রহ-সম্বন্ধে তিনি বলিতেন যে,—অপ্রকটধামে প্রকাশিত ভগবানের নিত্যস্বরূপই শ্রীবিগ্রহ।

—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী

নিত্যলীলাপ্রবিন্দ ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমন্তভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

শুভাবির্ভাব-শতবার্ষিকী-উপলক্ষে

## ভক্তি-অর্ঘ্য

জয় পরমারাধ্যদেব,                      জয় জয় শ্রীগুরূদেব,  
জয় প্রভু শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব।  
“শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি” তব উজ্জ্বল বৈভব॥  
তব পদ মুই শিরে ধরি, আবির্ভাব-শতবর্ষ স্মরণ যে করি,  
মোর অনন্তকোটি প্রণাম লহ দেব।  
হে করুণাসিন্ধু ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব॥  
তব কৃপাপাত্র-জনে,                      তব বিশস্ত সেবকগণে,  
“শ্রীনিমানন্দ গৌড়ীয় মঠ” করিল স্থাপন।  
দিকে দিকে তব বৈভব বিদিত সর্ববর্জন॥  
বিশ্ব-মানবের কল্যাণ-তরে, এসেছিলে এই অবনীপরে,  
হে শ্রীগৌরপার্ষদ! তুমি গোলোকের গণ।  
আবির্ভাব-শতবর্ষে করি বিশেষ স্মরণ॥  
মায়াবাদে জড়বাদে,                      নাস্তিকতা অপরাধে,  
নিত্য-সনাতন ধর্ম লুপ্তপ্রায় যখন।  
“গোলোকের বিনোদ” অবতীর্ণ হৈলা তখন॥

জীবের নিত্য-ধর্ম যাহা, নরলোকে জানা'তে তাহা,  
জীবের সনাতন ধর্ম করিতে সংরক্ষণ।  
শ্রীকেশব করেছিলেন “মায়াবাদ খণ্ডন”।।

কর্মফলে ভোগিছে যত, জীবসকল অবিরত,  
মায়ার শৃঙ্খলে দুঃখে ভরা যত মানব।  
মুক্ত ক'রতে এসেছিলেন ঠাকুর কেশব।।

গোলোকের সুদুর্লভ, শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ,  
পাদপদ্মে ক'রলেন যিনি সেবা-শিক্ষা দান।  
জগদগুরু ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব প্রধান।।

শ্রীগুরু করিলে প্রকাশ, আত্মতত্ত্বের ইতিহাস,  
জীবাত্মার ধবংস নাই, স্বাস্থ্যত সনাতন।  
জীবাত্মার স্বরূপ-ধর্ম—শ্রীকৃষ্ণ-সেবন।।

দেহে করে যে আত্মবুদ্ধি, জীবাত্মার হয় দুঃখ বৃদ্ধি,  
কৃষ্ণসেবা ত্যজি' মানব হয় আত্মঘাতী।  
জড়কর্মে ব্যস্ত সবে মায়াগ্রস্ত-মতি।।

মায়াগ্রস্ত যত জন, উদ্ধারিতে হল মন,  
গৌরপার্ষদ রাধিকা-মঞ্জরী হলেন আবির্ভাব।  
ধরাধাম্মে নাম তাঁ'র শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব।।

মো হেন পাপী অতি, মো হেন দুর্জ্ঞান ব্যক্তি,  
এ জগতে কভু দ্বিতীয় নাহি আর।  
হে কেশব ঠাকুর! মোরে করহ উদ্ধার।।

কি দিয়ে পূজিব হায়, কি দিয়ে তুষিব তোমায়,  
কি দিয়ে করিব তব মহিমা কীর্তন।  
ইহ-পরকালে তুমিই মোর আপন।।

তোমার গুণ-মহিমা, বেদে দিতে নারে সীমা,  
তুমি হও গুণধর অসীম-সিদ্ধ।  
জগদগুরু তুমি বিশ্বের পরমবন্ধু।।

লভি' তব কৃপাবিন্দু, অনায়াসে তরে ভবসিদ্ধি,  
তুমি হেন দয়ানিধি কে আছে ধরাতে।  
তব পদে চিরঞ্চণী না পারি শোধিতে।।

কত জন্ম-জন্মান্তর,                      দুঃখ পাইনু বিস্তর,  
 কেহ না পারিল লৈতে উদ্ধারের ভার।  
 তব কৃপা-কণা লভি' হইব উদ্ধার॥  
 কত জন্মে কত মাতা,                      পেয়েছি বা কত পিতা,  
 তোমা হেন পরমবন্ধু পিতা নাহি পাই।  
 মাতা-পিতা-ব্রাতা তুমি, তব কৃপা-ভিক্ষা চাই॥  
 মহামুক্ত-পুরুষ তুমি,                      কৰ্ম্মফলে বদ্ধ আমি,  
 মুই ভক্তিহীন অতি পাপিষ্ঠ দুৰ্জ্জন।  
 কেমনে করিব তব মহিমা-কীর্তন॥  
 তুমি গোলোকের দূত,                      তুমি মহা-ভাগবত,  
 তব কৃপা-কণা মোর পরম সম্বল।  
 তব কৃপা-রেণু পেয়ে জন্ম মোর সফল॥  
 আবির্ভাব-শতাব্দী-দিনে,                      মহিমা প্রকাশি' যতনে,  
 গৌড়ীয়-পতাকা বিশ্বে রাখিলে উড্ডীয়মান্।  
 সারা বিশ্বে ভক্তগণ-কণ্ঠে তব জয়গান॥  
 ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী,                      তাঁর নিজজন অতি,  
 প্রভুপাদের আশা তুমি করিলে পূরণ।  
 সমগ্র জগতে স্থাপিলে বৈষ্ণব-দর্শন॥  
 জীবের নিত্যধৰ্ম্ম যাহা,                      নির্ভয়ে প্রকাশিলে তাহা,  
 সৰ্ব্বজীবে তুমি কৃপা-বারি করেছ বর্ষণ।  
 অখিল বিশ্বে বৈকুণ্ঠ-বার্তা করিলে জ্ঞাপন॥  
 সারা বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণ-বাণী,                      বহন করে দিয়েছেন যিনি,  
 ভবপারের কাণ্ডারী মদীয় শ্রীগুরুদেব॥  
 আবির্ভাব-শতবার্ষিকী-অর্থ্য লও হে কেশব॥  
 আবির্ভাব-শতবর্ষে তোমায় করি স্মরণ।  
 অপরাধ ক্ষমি' ভক্তি-অর্থ্য করহ গ্রহণ॥

দাসানুদাসাভিমানী—

—শ্রীশ্যামসুন্দর দাস ব্রহ্মচারী

## শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগুরু-মহিমা-কীর্তন

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাজ্ঞান-শলাকয়া ।  
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥  
নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষায়-ভূতলে ।  
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-ইতি-নামিনে ॥  
শ্রীসরস্বতীভীষিতং সর্বথা সুষ্ঠু-পালিনে ।  
শ্রীসরস্বতীভিনায় পতিতোক্কার-কারিণে ॥  
অতিমর্ত্য-চরিত্রায় স্বাশ্রিতানাঞ্চ-পালিনে ।  
জীব-দুঃখে সদার্ত্ত্যয় শ্রীনাম-প্রেম-দায়িনে ॥

অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শততম শুভাবির্ভাব-তিথিপূজায় শ্রীগুরুদেবের অনন্ত অপার মহিমার কিঞ্চিৎ কীর্তন করিয়া আত্মশোধনে যত্নশীল হইতেছি।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ গুরু-বন্দনা প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার ১ম পরিচ্ছেদে ১ম শ্লোকেই উল্লেখ করিয়াছেন,—

বন্দে গুরুনীশভক্তনীশমীশাবতারকান্ ।  
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তিঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥ (১।১)

\* \* \*

মদ্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ ।  
তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥  
শ্রীকৃষ্ণ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ ।  
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥  
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার ।

তাঁ সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥ (৩৫-৩৭)

মহাজনগণের পাদপদ্মানুসরণ করিয়া প্রত্যেক শিষ্যের কর্তব্য নিত্যকাল শ্রীগুরু মহিমা কীর্তন। মহাজন পদাবলীতে পাই—

আশ্রয় করিয়া বন্দৌ শ্রীগুরু-চরণ ।  
যাহা হৈতে মিলে ভাই কৃষ্ণপ্রেমধন ।

\* \* \*

গুরুপাদপদ্মে রহে যার নিষ্ঠা ভক্তি ।  
জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি ॥  
হেন গুরুপাদপদ্ম করহ বন্দনা ।  
যাহা হৈতে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রণা ॥  
গুরুপাদপদ্ম নিত্য যে করে বন্দন ।  
শিরে ধরি' বন্দি আমি তাহার চরণ ॥



মহাজনগণের বাণীই শ্রদ্ধাবানজনকে শ্রীকৃষ্ণভজনে উদ্দীপনা দান করেন। অতএব, আমাদের সর্বদাই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের গুণকীর্তন করা অবশ্য কর্তব্য। অস্মদীয় গুরু-পাদপদ্মের উপদেশাবলীতে পাই—“শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই গুরুসেবা।” শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন,—গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান,—তিনের স্মরণ।

তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন॥

অনয়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীবৈষ্ণবগণ আমাদের দ্বারদেশে শ্রীগুরুদেবের শুভ আবির্ভাব-তিথিপূজার বার্তা পৌঁছাইয়া দিয়া আমাদেরকে বেদ-পুরুষের বাণী স্মরণ করিয়া দিতেছেন,—উত্তীর্ণত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরতয়া।

দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥ (কঠ ২।৩।১৪)

শ্রীব্যাসপূজা বা গুরুপূজায় শ্রীগুরু-আশ্রিত ভক্তগণের হিসাব-নিকাশ বা পরীক্ষার দিন। মাদৃশ অধমের জমার খাতা একেবারেই শূন্য। হে করুণাসাগর, হে সেবকবৎসল আচার্য্যদেব, মাঘী-কৃষ্ণ-তৃতীয়া-তিথিতে আমার হৃদয়ের অভিব্যক্তি কিভাবে প্রকাশ করিব? এমতাবস্থায়, শিশুমতি দুর্বল হৃদয়ে শ্রীমহাজনগণের বাণীই আমার জীবাভূ হউক।

হরি হে!

তোমারে ভুলিয়া, অবিদ্যা পীড়ায়, পীড়িত রসনা মোর।

কৃষ্ণনাম-সুধা, ভাল নাহি লাগে, বিষয়-সুখেতে ভোর॥

\*

\*

\*

প্রভু হে! শুন মোর দুঃখের কাহিনী।

বিষয়-হলাহল, সুধাভানে পিয়লু, আব্ অবসান দিনমণি॥

খেলারসে শৈশব, পড়ইতে কৈশোর, গোঁয়াওঁলু, না ভেল বিবক।

ভোগবশে যৌবনে, ঘর পাতি' বসিলু, সূত-মিত বাড়ল অনেক॥

বৃদ্ধকাল আওল, সব সুখ ভাগল, পীড়াবশে হইলু কাতর।

সর্বেন্দ্রিয় দুর্বল, ক্ষীণ কলেবর, ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর॥

হে গৌরপ্রের্ত গুরুপাদপদ্ম, মাদৃশ অধমের ন্যায় মূর্খ ভোগপর আর যাহার আছেন, তাহাদের জীবনচিত্র বৈষ্ণবগণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কৃপাপূর্বক বর্ণন করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই মহাজন-বাণীই গাঁথা থাকিবে।

“জনম বিফল, হইল আমার, এখন কি করি হরি॥”

আমি ত' পতিত, পতিতপাবন, তোমার পবিত্র নাম।

সে-সম্বন্ধ ধরি', তোমার চরণে, শরণ লইলু হাম॥”

শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসবের পূজা-পদ্ধতি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিশ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের অপ্রকটের পরেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আদি আকরমঠ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে সর্বপ্রথম পুনঃ প্রচলন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে মাঘী-কৃষ্ণ-তৃতীয়া-তিথি হইতে মাঘী-কৃষ্ণ-পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত বৈষ্ণব-স্মৃতি-বিধানানুযায়ী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিদ্রিষ্ট “শ্রীব্যাসপূজা-

পদ্ধতিঃ” অনুসারে শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্বহস্তেই শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, শ্রীব্যাস-পঞ্চক, শ্রীমধ্বাদি পঞ্চক, আচার্য্য-পঞ্চক, শ্রীসনকাদি-পঞ্চক ও শ্রীগুরুপঞ্চক প্রভৃতি পূজাপঞ্চক এবং তত্ত্বপঞ্চকের



ষোড়শোপচারে পূজা ও ভোগরাগ সম্পাদন করেন।

শ্রীগুরু পাদ পদ্ম তাঁহার সতীর্থগণের অনুরোধে, নিজ শিষ্যবর্গের ভবিষ্যৎ কল্যাণ-বিধানের নিমিত্ত এবং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সংরক্ষক-রূপে ৪৬৬ শ্রীগৌরান্দে ‘শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ’ স্বয়ং সম্পাদনা ও প্রকাশকের কার্য্য করেন।

শ্রীব্যাস পূজার প্রচলন শ্রীব্যাসদেবের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। শ্রীব্যাস-

চুড়া মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

পূজার নামান্তরই গুরুপূজা। অস্মদীয় গুরুপাদপদ্মের বাণীতে পাই—“ব্যাসপূজা অর্থে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের পূজা নহে, ইহা তদনুগত গুরুবর্গের পূজাকেও লক্ষ্য করে।”

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নবদ্বীপ-লীলাকালে একদিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট ব্যাসপূজার প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলেন। এই প্রসঙ্গে ব্যাসাভিন্ন শ্রীবৃন্দাবনবাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে গৌর-নিত্যানন্দের যে কথাপোকথন উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।—

দেখিয়া আনন্দ মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর। নিত্যানন্দ প্রতি কিছু করিলা উত্তর।।

“শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদগোসাঞি। ব্যাসপূজা তোমার হইবে কোন্ ঠাঞিঃ?

কালি হইবে পৌর্ণমাসী ব্যাসের পূজন। আপনে বুঝিয়া বল, যারে লয় মন।।”

নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর ইঙ্গিত। হাতে ধরি’ আনিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত।।

হাসি’ বলে নিত্যানন্দ,—“শুন বিশ্বম্ভর। ব্যাসপূজা এই মোর বামনার ঘর।।”

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীবাসপূজা সম্বন্ধে গৌড়ীয় ভাষ্যে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহার কথঞ্চিৎ বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য উল্লেখ করিতেছি,—

“যদিও পঞ্চোপাসক বা মায়াবাদিগণের মধ্যে গুরুপূজা বা ব্যাসপূজা-প্রথা প্রচলিত আছে, তথাপি তাদৃশ ব্যাসপূজনে অহমিকার বিচারই প্রবল। শুদ্ধভক্তি অভাব-নিবন্ধন তাহাদিগের দ্বারা শ্রীব্যাসপূজা কখনই সাধিত হইতে পারে না। \* \* শ্রীব্যাসপূজা চারি আশ্রমেই বিহিত অনুষ্ঠান; তবে তুর্য্যাশ্রমিগণ ইহা যত্নের সহিত বিধান করিয়া থাকেন। আর্য্যাবর্তে শ্রীব্যাসদেবের অনুগত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ বেদানুগ-সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ।

তাহারা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব-জন্মদিনে পূর্বগুরুর পূজা বিধান করেন। পূর্ণিমা-তিথিই যতিধর্ম গ্রহণের প্রশস্ত কাল। যতিগণ সবিশেষ বা নির্বিশেষবাদি নির্বিশেষে সকলেই গুরুদেবের পূজা করিয়া থাকেন।

শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর ‘শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাদ্যার্পণ’ বা ইহার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের মনোহীষ্ট যে সৃষ্ট ভগবৎ সেবন, তাহাই উদ্দিষ্ট হয়। তজ্জন্যই আমাদের শুভানুধ্যায়ী নিয়ামক, পূর্বগুরু শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শ্রীকৃপানুগরূপে আদিগুরুকে অর্ঘ্য-প্রদানোদ্দেশে বলিয়াছেন,—

“শ্রীচৈতন্যমনোহীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।

স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদাস্তিকম্॥”

পরমকৃপাপরবশ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান-লীলা, যাহা শ্রীকৃপা তাঁহার অনুগণের জন্য নিত্য সেবা-বৈমুখ্যরূপ ব্যাধিমোচনের নিমিত্ত ঔষধ ও পথ্যরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই গোড়ীয়ার ব্যাসপূজার উপায়নাদর্শ।”

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের মনোহীষ্ট পূরণকারী শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীর নিকট যে আবেগময়ী বাণী ‘শ্রীব্যাসপূজা’ উপলক্ষে পরিবেশন করিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ উল্লেখ করিয়া আমি আমার গুরুপাদপদ্মে পাদ্যর্ঘ্য অর্পণ করিতেছি,—

“শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সমগ্র ভারতবর্ষে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে বিশুদ্ধ ব্যাসপূজার পুনঃ প্রবর্তন করেন। শাক্ত-সম্প্রদায়েও আমরা ব্যাসপূজার প্রচলন লক্ষ্য করিয়া থাকি। কিন্তু তাহা ব্যাসপূজার পরিবর্তে ব্যাসপূজার ভাণমাত্র। পূজ্যবস্তুকেই আমরা পূজা করিয়া থাকি এবং নির্বিচারে নিষ্কপটে তাঁহাকে ভ্রম-প্রমাদাদিশূন্য জানিয়া তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশ পালন করি। যে-স্থলে তিনি ভ্রম-প্রমাদাদি দোষে দুষ্ট—এই বিচার ও সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, সে-স্থলে পূজ্যবুদ্ধি কোথায়? আচার্য্য শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—‘ব্যাস ভ্রান্ত বলি’ সেই সূত্রে দোষ দিয়া। বিবর্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া।” (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৭২)।

আমি ব্যাসকে মানিব, তাঁহার পূজা করিব, অথচ তাঁহার বিচারকে স্বীকার করিব না, এইরূপ অসম্ভব। শ্রীগুরুদেব ও শ্রীব্যাসদেবে মর্ত্যবুদ্ধি ও সংশয়ই জীবের অধোগতির কারণ এবং উহাই জীবকে নরকগামী করায়। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—“ন মর্ত্যবুদ্ধাসুয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ”, “সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।” শঙ্কর স্বয়ং ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিয়াছেন। সুতরাং যাহাদের ব্যাসের বিচারকের ভ্রান্ত বলিয়া ধারণা, তাহাদের পক্ষে ব্যাসপূজা বিড়ম্বনা মাত্র।

বিশুদ্ধভাবে ব্যাসপূজা প্রচলনে আমাদেরকে সর্বতোভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। আপনারা সকলেই ব্যাসপূজার অনুগত হউন ও ব্যাসপূজায় আত্মনিয়োগ করুন। দেখিবেন, ইহাতে কোন অভাব, অসুবিধা থাকিবে না, সংশয়ের যাবতীয় অমঙ্গলরাশি বিদূরিত হইবে। \* \* আপনারা ব্যাসের লিখিত শাস্ত্রানুযায়ী ধর্ম আচরণ করিয়া ধর্মপথে চলুন, দেখিবেন সকল অভাব-অভিযোগের সমাধান হইয়া গিয়াছে।

ধর্মই ভারতের অস্তিত্ব, ধর্মই ভারতের গৌরব, ধর্মই ভারতের শান্তিদাতা এবং সেই সর্বোত্তম সনাতন ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতা শ্রীব্যাসদেবই আমাদের সর্বকালের সর্ববিষয়ে পথ-প্রদর্শক—ইহা ভারতবাসী যেদিন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিবে, সেই দিন হইতে তাহাদের শৃঙ্খলমুক্ত হইতে আরম্ভ করিবে ও তাহারা পরাশান্তির সন্ধান পাইবে। ধর্মই ভারতের বৈশিষ্ট্য, তাই খৃষ্টিয়ান ধর্মাবলম্বী Reverend Bishop স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন—“India guided by God can lead the world back to sanity.” তাই আপনাদিগকে সকলকেই শ্রীব্যাসানুগত্যে সনাতন ধর্মের অনুসরণ করিতে অনুরোধ ও আহ্বান জানাইতেছি। শুধু আপনাদিগকে কেন সমগ্র বিশ্ববাসীকে এই সনাতন ধর্ম গ্রহণ করিয়া নিত্যশান্তিলাভে আহ্বান করিতেছি।”

বাঙ্গা-কল্পতরুভাষ্য কৃপাসিদ্ধুভা এব চ।

পতিতানাং পাবনোভ্যো বৈষ্ণবোভ্যো নমো নমঃ॥

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিবূষণ

## বিনোদ এবং বিনোদবিহারী

একটু গোড়া হইতেই আলোচনা করা যাক্। অবশ্য ‘গুরু’ এবং গোড়া ব্যাপারটাই বিশেষ্য এবং বিশেষণের মত। তাই ‘গোড়ার’ আলোচনাতে গুরু-প্রসঙ্গ আসিতে বাধ্য। তাই বলিয়া একেবারে “কৃষ্ণ হইতে চতুর্ন্থুখ” করিয়া আরম্ভেরও ইচ্ছা নাই। ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের ব্রহ্মঘোষ-স্বরূপ যে গৌড়ীয়-গোত্র, তাহারই গোড়া হইল বর্তমান প্রসঙ্গের প্রসূতিক্ষেত্র।

পাষণ্ডদলন আর প্রেম-প্রচারণ।

দুই কার্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥ ( চৈঃ ভাঃ )

অবধূত যেমন অদ্ভুত, তেমনই অলৌকিক। মস্তিষ্ক-বিকারবশতঃ যে বাতুলতা কিংবা কোন প্রতিষ্ঠাভিক্ষকের যে পাগল-অভিনয়, তাহা কোন অলৌকিকতা নহে—বিকৃত লৌকিকতা। “এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা”—ভাগবত (১১।২।৪০)-বাক্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তনে তীব্র-অনুরাগবশতঃ অবধূত উন্মত্তের ন্যায় লোকাপেক্ষা-শূন্য হইয়া কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চীৎকার, কখনও বা মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহার জাত-অনুরাগের বাহ্যপ্রকাশই বঞ্চনাকর ভূমিকারূপে প্রাকৃত-দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়া থাকে। আমাদের গৌড়ীয়-গোত্রের মূল অবধূত—শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু সেইরূপ বঞ্চনা না করিয়া বরং পাষণ্ডদলন ও প্রেম-প্রচারণেরই নিযুক্ত ছিলেন। এই লীলায় তিনি হল ও মুষলধারী না হইলেও উঁহাদের ক্রিয়া কখনও বন্ধ ছিল না। মুষল (মুকার)-দ্বারা পাষণ্ডের দলন এবং হলদ্বারা নিজের নিকট আকর্ষণ—এই ভূমিকাতেই শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু নিত্য বিরাজিত। হলদ্বারা আবার জীবের হৃদয়রূপ ভূমি কর্ষণ করিয়া ভক্তিলতা-বীজ বপন করিবার বিচারটীও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য। যে-প্রকারেই হউক—ইহা তাঁহার সেই ‘প্রেম-প্রচারণ’ ভূমিকারই অন্তর্গত বিষয়।

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের গুরুবর্গের অবধৌতাই এই প্রকার। কেবল আশ্বাদন নয়—প্রচারণ; উলুবনে মুক্তা ছড়ানো নয়—ক্ষেত্র তৈরী করিয়া বীজ বপন। আবার কেবল পাষাণ্ড দলন নয়—প্রেম-প্রচারণ; যেমন, শুধু শাসন নয়—স্নেহও।

আমাদের আলোচনীয় যে অবধূত, তাঁহার আসল নাম ‘বিনোদ’। নিরুপাধিক সেই বিনোদই এই উপাধিময় জগতে ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ। আশ্রম-বিচারে সর্বোচ্চ যে সন্ন্যাস-উপাধি, তাহাকে তিনি অলঙ্কৃত করিয়াছেন, ধন্য করিয়াছেন। সহজেই যিনি সকল বর্ণাশ্রমের অতীত, পরমহংস, ‘অবিধিগোচর’। সেই তাঁহার পক্ষে বর্ণাশ্রম-অবলম্বন, বিধির বন্ধন স্বীকার—আত্মকল্যাণার্থে নিশ্চয়ই নয়, জগতের কল্যাণবিমুখ গোষ্ঠীর কল্যাণ-কামনায়—ইহা বুঝিতে পারিলেই কল্যাণ আমাদের করতলগত।

জগতে যতপ্রকার পাষাণ্ডতা আছে, তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান—মায়াবাদ—শ্রীশঙ্করাচার্যের বহুল প্রচারিত বিষয়, কিন্তু হৃদয়ের ধন নহে। প্রেমই যাঁহার স্বরূপগত বিষয়, সেই প্রেমময়ের হস্তকমল, পদকমল-সকল জড়যুক্তির ছুরিকাদ্বারা ব্যবচ্ছেদ করিয়া, অনন্তর যাহা-অবশিষ্ট বলিয়া বিবেচনায় আসিল, তাহাতেই আবার লীন হইয়া যাইবার যে হীনমন্যতা, উহাই ‘মায়াবাদ’। হীনমন্যতা এই কারণে যে, সচ্চিদানন্দ-ঘন শ্রীমূর্তি যদি এতই অপাংক্তেয় হইল, তাহা হইলে তাহাতে লীন হইবার অভিল্যাই বা কেন? আশ্রমের রূপে আকৃষ্ট হইয়া পতঙ্গেরা ঝাঁপাইয়া পড়ে—সেই রূপই যদি অস্বীকৃত হইল, তবে তাহাতে ঝাঁপাইবার কারণও থাকে কি? ‘গরু মারিয়া জুতা দান’—ইহা অপেক্ষাও কি বড় কিছু?

শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভু সর্বপ্রথমে মায়াবাদকেই প্রেম-প্রচারের প্রধান অন্তরায়রূপে বিবেচনা করিলেন। মায়াবাদের অর্কচীনতা ও অপ্রাচীনতা লইয়া তাঁহার গবেষণামূলক গ্রন্থ “মায়াবাদের জীবনী” নিঃসন্দেহে নিত্যকল্যাণ-কামীদের জন্য এক আলোকবর্তিকা হইয়া থাকিবে। বর্তমানে ‘অদ্বৈতবাদ’, ‘ব্রহ্মবাদ’ প্রভৃতি বলিতেই প্রায় সকলে একবাক্যে শ্রীশঙ্করাচার্যের প্রকাশিত ‘কেবলাদ্বৈতবাদ’ বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু উক্ত ‘মায়াবাদের জীবনী’-গ্রন্থ পাঠ করিলে সেই বিবর্তের আবর্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব পূর্ব ব্রহ্মবাদিগণের অদ্বৈতমত ও শ্রীশঙ্করের মায়াবাদ কদাপি এক নহে। ব্রহ্মবাদীদের চরমগতি জ্যোতির্ময় ব্রহ্মলোক; কিন্তু মায়াবাদিগণ—অপরাধী, তাহারা যমযাতনার পাত্র। “শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত’ পাষাণ্ডী। অদৃশ্য, অস্পৃশ্য—সেই হয় যমদণ্ডী।।” (চৈঃ চঃ)। ‘মায়াবাদ’ শ্রীবুদ্ধদেবের ‘শূন্যবাদেরই’ এক সংস্করণ মাত্র—‘শূন্য’-শব্দস্থানে কেবল বৈদিকশব্দ ‘ব্রহ্ম’ প্রয়োগ করিয়া মূলতঃ উভয়ে একই উদ্দেশ্যে তৎপর হইয়াছেন। তজ্জন্য ইহাকে পদ্মপুরাণে ‘প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ’ এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ‘বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ’ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীমদ্ভগবত-ব্যাখ্যায় জানাইয়াছেন যে, কর্মের কর্তৃত্ব বজায় রাখিয়া যে বেদানুশীলন, তাহা অপরা-বিদ্যারই অন্তর্গত। আবার কর্মমাত্রই দুঃখের কারণ—বিবেচনা করিয়া জড়বিরাগ-বশতঃ যে ‘অপরোক্ত’-বিদ্যার অনুশীলন, উহাতে জীবী স্বরূপধর্মের উদ্বোধন হয় না বলিয়া উহাকেও পরা-বিদ্যা বলা যাইতে পারে না।

অপরোক্ষ-বিচারে কেবল একত্বের সমাধান আছে—‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’, কিন্তু বহুত্বের মীমাংসা নাই। সে-স্থলে সেই এক ও অদ্বিতীয় তত্ত্ববস্তু—শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরের বিচিত্রতায় যে বহুত্ব, তাহা ‘অপরোক্ষ’-অনুশীলনকারীদের চিন্তাশ্রোতে রুদ্ধ হইয়া যায়। পরম পুরুষার্থ—‘প্রেম’ সেইকালে ‘দূর অন্ত’ হইয়া পড়ে।

‘অধোক্ষজ’-তত্ত্বের আলোচনাতেই চিদ্বৈচিত্র্যের অনুশীলন আরম্ভ হয়। বদ্ধজীবের অক্ষজ (ইন্দ্রিয়জ) জ্ঞানের সকল কসরতকে অধঃকৃত করিয়া অর্থাৎ পরাভূত করিয়া যিনি সর্বক্ষণ লীলারত, তিনিই অধোক্ষজ। তাই জীব যখন তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়কে সেই ক্রেশকর অনুশীলন হইতে নিবৃত্ত করিয়া ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীহৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত করেন, তখনই সেই অধোক্ষজ বস্তু স্বেচ্ছাক্রমে জীবের ইন্দ্রিয়গম্য হন। তিনি যদি নিজকে সর্ববাদি বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়বৃত্তির ভোগময় ভূমিকা হইতে পৃথক্ না রাখিতেন, তবে জড়ভোগ্যবস্তুরই অন্যতম হইয়া পড়িতেন। সে-কালে জীবের সেবোন্মুখ-বৃত্তির বিকাশ অসম্ভব হইয়া যাইত।

কিন্তু ইন্দ্রিয়াধিপতির ইন্দ্রিয়তর্পণ ‘অধোক্ষজ’-অনুশীলনেও চরমভাবে ঘটে না। সর্বপূজ্য ও সর্বপালক হইয়াও শাসিত ও পালিত হইবার মধ্যে সেই পরাংপর-বস্তুর যে আনন্দ বিধান হয়, তাহা বেদস্ততিতেও লাভ হয় না। ‘অধোক্ষজ’ এবং ‘অপ্রাকৃত’ শব্দ দুইটা সমার্থক হইলেও উহাদের পরস্পর ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য্য। প্রকৃতির অতীত হইয়াও সেই অধোক্ষজ-তত্ত্ব যখন প্রাকৃতবৎ প্রতীত হয়, তখন তাহা ‘অপ্রাকৃত’-তত্ত্বরূপে চরম বিশেষতা লাভ করে। সেইকালে ভগবান্ মাতৃক্রেড়ে আরাঢ় হইতে ক্রন্দন করেন, সখাগণের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া উচ্ছ্বসিত হন, গোপীগণের দুর্জয়-মান দর্শনে ভীত হইয়া পড়েন।

সেই ‘অপ্রাকৃত’-তত্ত্বও আবার মাধুর্য্যপর ও ঔদার্য্যপর—বৈশিষ্ট্যদ্বয়ে দ্বৈতপ্যমান। মাধুর্য্যপর শ্রীকৃষ্ণলীলা ও ঔদার্য্যপর শ্রীগৌরলীলা বলিতে কেবল মাধুর্য্য বা কেবল ঔদার্য্যের বিচার নহে—মাধুর্য্যের প্রাচুর্য্যে ঔদার্য্য এবং ঔদার্য্যের প্রধানতায় মাধুর্য্য। গৌড়ীয় অবধূতগণ অপরোক্ষ-অনুশীলনকে ধিক্কার দিয়া, অধোক্ষজ-অনুশীলনকেও অপর্য্যাপ্ত বিবেচনা করিয়া, সর্বপরাকাষ্ঠা-স্বরূপ অপ্রাকৃত-অনুশীলনকেই তাঁহাদের জীবাতুরূপে জানাইয়াছেন। শ্রীল কেশব গোস্বামী প্রভু তাঁহার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অপ্রাকৃত-অনুশীলনের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাঁহার হৃদয়ধন—‘শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীর’ সেবাপ্রকাশের দ্বারা। তাঁহার সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যময় প্রেম-প্রচারণ-লীলাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

শ্রীল কেশব গোস্বামী প্রভু ‘শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীর’ তত্ত্ব-বর্ণনের প্রথমেই তাঁহাকে বন্দনা করিতে বলিয়াছেন,—

রাধাচিন্তা-নিবেশেন যস্য কান্তির্বিলোপিতা।

শ্রীকৃষ্ণচরণং বন্দে রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহম্।।

বস্তুতঃ ইহাই যুগপৎ শ্রীরাধাবিনোদ-বিহারী ও শ্রীগৌরচন্দ্রের পরিচয়। ‘রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহ’ বলিতে প্রথমতঃ শ্রীরাধাসহ নিজকান্তি-বিলুপ্ত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অর্থাৎ ‘শ্রীরাধাবিনোদ-বিহারী’ বুঝায়। শ্রীবরাহসংহিতায় এই প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। একসময় অভিমানভরে

শ্রীমতী রাধা নিজগণসহ রাসস্থলী পরিত্যাগ করিলে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রাধা-বিরহে ব্যাকুল হইয়া পড়েন। চতুর্দিকে অন্বেষণ করিতে করিতে বিরহ-জঙ্জরিত হইয়া তিনি যমুনা-তটে ইমলি-বৃক্ষের নীচে রাধাচিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। সেই গভীর অভিনিবেশবশে শ্রীমতী রাধার গৌরবর্ণে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত হওয়ায় তিনি ‘শ্রীরাধার কৃষ্ণ’-রূপে চিহ্নিত হইলেন। অপরদিকে শ্রীরাধাও সগণ শ্রীকৃষ্ণ-অন্বেষণে সেইস্থানে আসিয়া তাঁহাকে গৌরকান্তিবিশিষ্ট দেখিয়া পরম চমৎকৃত হইলেন। শ্রীবিনোদমঞ্জরী শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই পরমোদ্ভূত মিলন দর্শন করিয়া তিনি শ্রীকেশব গোস্বামীরূপে সেই অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি ভুলোকে প্রকাশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ ‘রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহ’ বলিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহস্বরূপ শ্রীগৌরচন্দ্র বুঝায়। ইহার ইঙ্গিত শ্রীজয়দেব গোস্বামী দিয়াছেন,—“গাঢ়মাল্লিষ্টো নির্ভেদমাপ্তো”। শক্তি ও শক্তিমানের গাঢ় আলিঙ্গনজনিত যে পয়ঃপরের অভেদ-অবস্থা—তাহাই শ্রীগৌরবিগ্রহ। ইহাকে শ্রীল কেশব গোস্বামী এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন,—“চিল্লীলা-মিথুনং তদ্বৎ ভেদাভেদমচিন্ত্যকম্।” অর্থাৎ চিল্লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-শক্তি-শক্তিমানের মিথুনবিগ্রহ-স্বরূপ শ্রীগৌরচন্দ্ররূপে ‘অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বের’ এক মূর্ত্তিবিগ্রহ।

তৃতীয়তঃ ‘আলিঙ্গিত’ (আঙ্ + লিঙ্গিত)-শব্দের ‘আঙ্’-অর্থে ‘সম্যক্’, ‘সীমা’, ‘অবধি’, ‘ব্যাপ্তি’, ‘বিস্তৃতি’ প্রভৃতি বুঝায়,—‘রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহ’-অর্থে শ্রীরাধার গৌরকান্তি শ্রীকৃষ্ণের আপাদমস্তক ব্যাপ্ত হইয়া অতঃপর শ্রীরাধার ভাবও তাঁহার হৃদয় অবধি বিস্তৃত হওয়ায় তিনি যে পৃথক্ বৈশিষ্ট্যে লিঙ্গিত অর্থাৎ চিহ্নিত হইয়াছেন, তিনিই শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি।

‘শ্রীরাধা-বিনোদবিহারী’—শ্রীবিগ্রহের বিশেষ চমৎকারিতা আলোচনার জন্য আমরা প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করিতেছি। গোপালতাপনী-উপনিষৎ ইহাতে এক বিশেষ সংবাদ লাভ হয় যে,—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মচারী। পার্থিব বিচারে ‘ব্রহ্মচারী’-পর্য্যায়টি চারি আশ্রমের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম, অত্যন্ত পবিত্র, নিষ্কলুষ ও জড়কাম-রহিত অবস্থা। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের এই ব্রহ্মচারীত্বে ব্রজগোপীগণের পরম পবিত্র, নির্দোষ ও কামগন্ধহীন প্রেমেরই মহিমা জ্ঞাপিত হয়—“সহজ গোপীর প্রেম—নহে প্রাকৃত কাম।” “অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম, সেই প্রেমা নুলোকে না হয়।” ( চৈঃ চঃ )—সুতরাং এই নুলোকের জড়বিচারে অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মচারীত্বের অনুভব কখনই হয় না।

ব্রহ্মচার্য্য কেবল কামশূন্যতা নহে। পরব্রহ্মের নাম-রূপ-গুণ-লীলায় যিনি সদা বিচরণ করেন, তিনিই মূলতঃ ব্রহ্মচারী, পারমার্থিক ব্রহ্মচারী। সেই বিচারে পরম নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী চতুঃসন ইহাতেও ব্রজবাসিগণের কোটিগুণ অধিক ব্রহ্মচার্য্য এবং তন্মধ্যেও সর্ব্বোৎকর্ষ মধুররসে স্বেবারতা ব্রজগোপীগণ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই যে-স্থলে স্বয়ং পরব্রহ্ম, সে-স্থলে তাঁহার ব্রহ্মচার্য্য কি-প্রকার? ইহা সমাধানের এক দিগদর্শন ‘শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে’ দেখিতে পাওয়া যায়,—

“যথা ব্রহ্মস্বরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।

তথা ব্রহ্মস্বরূপশ্চ রাধিকা প্রকৃতেঃ পরা॥

শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ প্রকৃতির অতীত পূর্ণব্রহ্ম বিষয়তত্ত্ব, শ্রীমতী রাধা সেরূপই প্রকৃতির অতীত পূর্ণব্রহ্ম আশ্রয়তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণের আত্মারাম ও লীলারাম—উভয় অবস্থাই নিত্য ও যুগপৎ। অপ্রকাশিত স্বরূপশক্তিতে যে রমণ, তাহা তাঁহার আত্মারাম অবস্থা। স্বরূপ-শক্তির প্রকটপূর্বক যে রমণ, তাহা তাঁহার লীলারামতা—“এইমত জগতের সুখে আমি হেতু। রাধিকার রূপ-গুণ আমার জীবাছু।।” (চৈঃ চঃ)। সুতরাং উভয় অবস্থায়ই ‘ব্রহ্মস্বরূপা’ ও স্বরূপশক্তি শ্রীরাধিকা তাঁহার সর্ব রমণের বিষয়, বিচরণের বিষয়—অতএব শ্রীকৃষ্ণ নিত্য ব্রহ্মচারী। শক্তি-পরিচয়ের অতীত শক্তিমানের পরিচয় অনুভব করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ শক্তির অধ্যক্ষ হইলেও তিনি সর্বদা শক্তিপিহিত—ইহাই তাঁহার ব্রহ্মচারীত্ব।

সেই লীলারামতার পরাকাষ্ঠা হইতেছে ব্রজের ‘পারকীয়’ বিচার। ‘উপপতি’-শব্দে যেরূপ ‘পতি’-শব্দ নিহিত, সেরূপ পারকীয়তায় স্বকীয়তা স্বাভাবিকভাবে ক্রোড়ীভূত, কিন্তু স্বকীয়তায় পারকীয়তার অভাব—তজ্জন্যই পারকীয়-বিচার পূর্ণতম। এই কারণেই পূর্ণতম-বিষয় শ্রীকৃষ্ণ ও পূর্ণতম-আশ্রয় শ্রীমতী রাধা পূর্ণতম-বিচার ‘পারকীয়-ভাব’ স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ পারকীয়তা ব্রজগোপীগণের প্রেমের কারণ নহে, তাহা তাঁহাদের নিত্য ও অসমোদ্ধ প্রেমের জ্ঞাপক। সেই ‘পারকীয়-ভাবে’ আগ্রত হইতে হইতে শ্রীকৃষ্ণ ‘বিষয়জাতীয় বিনোদ’ অপেক্ষাও ‘আশ্রয়জাতীয় বিনোদের’ আধিক্য অনুভব করিলেন,—“বিষয়-জাতীয় সুখ আমার আশ্বাদ। আমা হইতে কেটিগুণ আশ্রয়ের আশ্বাদ।।” বলাবাহুল্য ‘শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়তায়’ এইপ্রকার অনুভূতি দেখা যায় না। সেই অনুভূতির আতিশয্যে তিনি সেই ‘আশ্রয়-বিনোদ’ আশ্বাদন করিতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন,—“আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়। যত্নে আশ্বাদিতে নারি কি করি উপায়।। বিচার করিয়ে যদি আশ্বাদ উপায়। রাধিকা-স্বরূপ হইতে তবে মন ধায়।।” (চৈঃ চঃ)। এইপ্রকার লোভ প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সেই ব্রহ্মচর্য্যেরই চরম ফল। ‘রাধাবিনোদ কি-প্রকার’—এই লোভ হইতেই সেই ‘রাধাবিনোদে’ বিহার করিতে গিয়া যিনি নিজ ভাব ও কান্তিহারা হইয়াছেন, সেই শ্রীরাধাবিনোদবিহারীই শ্রীগৌরচন্দ্র।

“শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়েবা-

স্বাদো যেনাঙ্কুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।

সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ

তদ্ভাব্য্য সমজনি শচীগর্ভসিদ্ধৌ হরীন্দুঃ।।”

শ্রীল কেশব গোস্বামী প্রভু জগতে নির্বিশেষ-ধারণাপর ব্রহ্মচর্য্যের বিচারকে নিরস্ত করিয়া সকলকে অপ্রাকৃত-ব্রহ্মচর্য্য অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করিতে “শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীর সেবাপ্রকাশ ঘটাইয়াছেন। ইহা দ্বারা তিনি জগৎবাসীকে ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ বিচারানুসারে বৃথা-অভিমান লালন করিতে নিবৃত্ত করিতেছেন, জীবের ‘ব্রহ্ম’ হইবার বাসনা করিয়া পরংব্রহ্মে লয় হইবার প্রয়াস নিষ্পয়োজন, তাঁহারা মূল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধাধারণীর আনুগত্যে বরং স্বরূপানুবন্ধি আশ্রয়জাতীয় আনন্দেই মগ্ন হউন—যে আনন্দ আশ্বাদন করিতে স্বয়ং পরব্রহ্মও প্রলুপ্ত।

‘শ্রীরাধামদনমোহন’, ‘শ্রীরাধাগোবিন্দ’, ‘শ্রীরাধাগোপীনাথ’—এই সম্বন্ধ-অভিধেয়-



প্রয়োজনাত্মক শ্রীবিগ্রহত্রয় এবং তাঁহাদেরও মিলিতরূপ বলিয়া খ্যাত ‘শ্রীরাধারমণ’ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কেবল ‘বিষয়-বিনোদ’ আশ্বাদনেই নিমগ্ন। এমনকি শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহের যে প্রেমবিগলিত-রূপ, তাহা রাধাবিরহবশতঃ হইলেও ‘রাধা-বিনোদ’-আশ্বাদনজনিত নহে। এ কারণে “শ্রীরাধা-বিনোদবিহারী” সমগ্র গৌড়ীয় সমাজে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য বরণীয় হইয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তন্মধ্যেও কোন কোন গৌড়ীয়কৃষকে নিজ মুঢ়তা ও মাৎসর্য্য-মত্ততায় বলিতে শুনিয়াছি,—‘শ্রীকৃষ্ণের রাধাভাবে গৌরবর্ণ-ধারণ এক তাৎকালিক ঘটনা, তাই সেই প্রকারে নিত্যসেবার প্রকাশ ঘটিতে পারে না।’ “দুর্ভাগার এই ত’ লক্ষণ।” এইপ্রকার অক্ষজ-জ্ঞানের বশবর্তী হইয়া ভগবল্লীলার যুগপৎ নবনবায়মানতা এবং নিত্যতা কখনও উপলব্ধি হয় না। ‘শ্রীরাধা-দামোদর’-সম্পর্কিত দামবন্ধন-লীলাও তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট তাৎকালিক বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং শ্রীজীব গোস্বামীর পক্ষেও সেই শ্রীবিগ্রহের সেবাপ্রকাশ অনুচিতই বলিয়া তাঁহারা ভাবিয়া থাকিবেন। তাঁহাদের স্বল্পবুদ্ধিতে শ্রীরাধামদনমোহন নিত্যসেবিত হইলে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার নিত্যত্ব যুগপৎ সম্ভব হয় না। বিভিন্ন লীলাবশে বিভিন্ন শ্রীমূর্তির নিত্যত্ব—তাঁহাদের জ্ঞানগোচর হয় না। শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে সুপ্রাচীন টোটা-গোপীনাথের উভয়পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণা শ্রীমতী রাধা ও শ্রীমতী ললিতার উপস্থিতি, কিংবা ব্রজধামের নন্দগ্রামে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের পার্শ্বস্থিত কৃষ্ণবর্ণা শ্রীবলদেব—তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। বস্তুতঃ ভগবল্লীলাকে মায়িক অথবা তাৎকালিক জ্ঞান ‘মায়াবাদ’-বিচারবশতঃই হইয়া থাকে। “মায়াবাদ-দোষ যার হৃদয়ে পশিল। কুতর্কে হৃদয় তা’র বজ্রসম ভেল।”

গোলোক বৃন্দাবনে ‘কৃষ্ণপীঠ’ ও ‘গৌরপীঠ’—এই দুইটা পৃথক্ প্রকোষ্ঠ আছে। এই উভয়পীঠেরই একচ্ছত্র অধিপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। শ্রীল কেশব গোস্বামী প্রভু সেই পরতত্ত্বের দ্বিধা-স্থিতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—“তত্ত্বমেকং পরং বিদ্যাল্লীলয়া তদ্দিধা-স্থিতম্। গৌরঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ং হ্যেতদুভাবুভয়মাপ্নুতঃ।।” ‘সন্তোগ-লীলা’বশে সেই পরতত্ত্ব কৃষ্ণপীঠে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন এবং ‘বিপ্রলম্ব-লীলা’-পরবশ হইয়া তিনি গৌরপীঠে শ্রীশচীনন্দন। এই ‘সন্তোগ’ ও ‘বিপ্রলম্ব’ উভয়ই উভয়কে পুষ্টি করে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর উভয়ই উভয়তা প্রাপ্ত হন। ইহাকে কোনপ্রকার কষ্টকল্পনাদ্বারা অনুভব করা যাইবে না। এই উভয়লীলাই যুগপৎ নিত্য, এবং ‘শ্রীরাধা-বিনোদবিহারী’-প্রসঙ্গ এই উভয়লীলার এক যোগসূত্র-স্বরূপ। তজ্জন্য শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীর সেবায় যুগপৎ উভয়লীলার স্ফুর্তি লাভ হওয়ায় কৃষ্ণপীঠ ও গৌরপীঠ—উভয় প্রকোষ্ঠেরই সেবাসুখ প্রাপ্তির সুযোগ থাকে। “সাধনকালে যাঁহারা কেবল গৌরোপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কেবল গৌরপীঠে সেবা করেন; সাধনকালে যাঁহারা কেবল কৃষ্ণোপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কৃষ্ণপীঠ অবলম্বন করেন।” কিন্তু শ্রীরাধাবিনোদবিহারীর সেবা আশ্রয় করিলে সাধক সিদ্ধিকালে উভয়পীঠেই বর্তমান থাকিয়া শ্রীশ্যামসুন্দর ও শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাসুখে মগ্ন হন। ইহাই শ্রীশ্রীল কেশব গোস্বামী প্রভুর প্রেমপ্রচারণ-ভূমিকার বিশেষ চমৎকারিতা। রূপানুগ ভজন-পদ্ধতির ইহাই রহস্য এবং চরমতম প্রাপ্তি।

—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী

## শ্রীগুরু-মহিমা কণা

জয় জয় প্রভুবর শ্রীকেশব ঠাকুর,  
জয় অগতির গতি, পরম করুণ।  
তব পাদপদ্ম ধ্যান করি নিরন্তর,  
তোমার কৃপায় মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন॥ ১॥

তব শুভ আবির্ভাব-শতবার্ষিকীতে,  
তোমার মহিমা কিছু হ'তেছে স্মরণ।  
তা'র এক কণামাত্র লিখিয়া সংক্ষেপে,  
তোমার চরণপদ্ম করিছি স্মরণ॥ ২॥

হে মহান্! তব যশ শুনি' দেশে দেশে,  
তোমারে হেরিতে সাধ উপজিল মনে।  
মোর আৰ্ত্তি হেরি' তুমি অতি স্নেহাবেশে,  
দিলে দেখা চুঁচুড়ায় শ্রীমঠ-অঙ্গনে॥ ৩॥

তব পদ পরশিয়া প্রণমি যখন,  
হৃদয়ে আমার তবে জাগিল পুলক।  
পরশমণির সম তব পরশন,  
এ লৌহ-কণাকে কৈল নিম্নল কনক॥ ৪॥

বহু গুরুর সান্নিধ্য পেয়েছি জীবনে,  
কোথাও আমার চিত্ত ভরেনি এমত।  
সেইদিন মঠাঙ্গনে তোমার দর্শনে,  
তুমি মোর ইষ্ট বলি' হইল প্রতীত॥ ৫॥

অল্প বয়সী মোরে নেহারি' সেদিনে,  
শুনাইলে হরিকথা করিয়া যতন।  
যত শুনি তত আগ্রহ বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে,  
তোমার ভাষণে হেন ছিল আকর্ষণ॥ ৬॥

প্রথম সংলাপে তব পাইনু যে প্রীতি,  
সে প্রীতি আমারে কৈল তব বশীভূত।  
গৃহে থাকিয়াও মন ধায় তব প্রতি,  
তব আকর্ষণ প্রভু এমত অদ্ভুত॥ ৭॥

একদিন তব পদে জানাইয়া নতি,  
 হরিনাম-দীক্ষা লাগি' করিনু প্রার্থনা।  
 নেহারি' আমার হেন প্রাণের আকুতি,  
 হরিনাম দিলে মোরে করিয়া করুণা॥ ৮॥  
 তোমার করুণা-কণা অদ্ভুত অপার,  
 শান্ত্র কুলোদ্ভূত মোরে করিলে বৈষ্ণব।  
 জানাইলে রাধাকৃষ্ণ সর্ববতত্ত্ব সার,  
 গৌর না ভজিলে তৎপ্রাপ্তি অসম্ভব॥ ৯॥  
 গুরুরে' মনুষ্যবুদ্ধি করে যেই জন,  
 গুরুর স্বরূপ তা'র হয় না দর্শন।  
 গুরু-কৃপা পেতে নারে সেই মুঢ় জন,  
 হেন শাস্ত্রমৰ্ম-বাণী কহে মহাজন॥ ১০॥  
 মহাভাগবত তুমি কৃষ্ণ-প্রিয় জন,  
 পাতকী তারণশক্তি তোমাতে সম্ভব।  
 গৌর-কৃপাশক্তি রূপে তব প্রকটন,  
 আচারে-বিচারে তুমি বলদেবানুগ ॥ ১১॥  
 সেদিন কথার মাঝে কহেছিলে মোরে,—  
 “শ্রীপ্রভুপাদের কথা বড় মূল্যবান্।”  
 ততক্ষণে তব আঁখি ওঠে জলে ভরে,  
 শ্রীগুরু-ভক্তিতে তুমি মহা মহীয়ান্॥ ১২॥  
 একদা উদ্ধারণ মঠে রথযাত্রা-দিনে,  
 রথ বেড়ি' ভাবাবেশে করিলে নর্ত্তন।  
 সাষ্টাঙ্গ প্রণতি যবে কৈলে শ্রীবামনে,  
 তোমার সমাধি-প্রাপ্তি দেখেছি তখন॥ ১৩॥  
 ভক্তমধ্যে শ্রেষ্ঠ বলি' 'কৃতিরত্ন' নাম,  
 গুরুদেব প্রভুপাদ দানিলা তোমারে।  
 পুরিলে জীবনে সদা গুরু-মনস্কাম,  
 তব সম গুরু-ভক্ত নাহি চরাচরে॥ ১৪॥  
 তোমার গুরুত্ব হেরি' শ্রীল প্রভুপাদ,  
 'উপদেশক'-উপাধি করিয়া প্রদান ;—

জানাইলা আচার্য্যত্ব তোমাতে সম্ভব,  
 সেই তুমি মোর প্রভু,—বৈষ্ণব-প্রধান॥ ১৫॥  
 লিখিয়া মহান্ গ্রন্থ—‘বৈষ্ণব-বিজয়’,  
 মায়াবাদের বিচার ক’রেছো খণ্ডন।  
 শুদ্ধোদন-সুত বুদ্ধ,—ভগবান্ নয়,—  
 শাস্ত্র-প্রমাণে তাহা কৈলে নিরূপণ॥ ১৬॥  
 বেদান্তের ভক্তি-ব্যাখ্যা কৈলে উদ্ভাবন,  
 তাহাতে শঙ্কর-ভাষ্য হইল অসার।  
 তোমার ‘বেদান্ত সমিতি’র ন্যাসিগণ,  
 বেদান্ত-মাহাত্ম্য সদা করিছে প্রচার॥ ১৭॥  
 তব আশীর্ব্বাদ-পুষ্ট ‘বেদান্ত সমিতি’,  
 শুনাইছে গৌর-বাণী দেশে ও বিদেশে।  
 তোমার মহিমা ইথে ব্যক্ত নিরবধি,  
 পূজিত হ’তেছ নিতি সর্ব্ব দেশে দেশে॥ ১৮॥  
 কৃষ্ণেচ্ছায় গুরুরূপে আসি’ এ ভুবনে,  
 মায়ামুগ্ধ জনগণে করিলে উদ্ধার।  
 শ্রীরূপের শিক্ষা পুনঃ দিলে ভক্তগণে,  
 জগদ্গুরুরূপে তুমি পূজ্য সবাকার॥ ১৯॥  
 তুমি ত’ আমার প্রভু আমি তব দাস,  
 ধন্য আমি পে’য়ে তব রাতুল চরণ।  
 তব দত্ত নাম ভজি করি কৃপা-আশ,  
 অন্তকালে পাই যেন তোমার দর্শন॥ ২০॥  
 তব প্রেষ্ঠ ‘শ্রীবামন গোস্বামী’ মহারাজ’,  
 দিকে দিকে তব বাণী করিছে প্রচার।  
 তিনি মোর মন্বদাতা গুরু-মহারাজ,  
 তাঁ’র দাস্যে থাকি’ সদা নমি বারংবার॥ ২১॥

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

# শ্রীব্যাসপূজা

ব্যাসের পূজা—ব্যাসপূজা, আবার ব্যাস-কর্তৃক পূজা—ব্যাসপূজা ইহাও হয়।  
বি-অস্ + ঘঞ্ = ব্যাস। ইহা কর্তৃকারক ও করণ কারক উভয়ই হয়। ব্যাস-শব্দে  
বিস্তার। জ্যামিতিক পরিভাষায় যে সরলরেখা বৃত্তের বা কোন গোলাকার বস্তুর কেন্দ্রবিন্দু  
ভেদ করিয়া উভয়দিকে পরিধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাকে ব্যাস বলে। এই ব্যাস  
সমাসবদ্ধ পদ, করণকারক। দ্বিতীয় প্রকার ব্যাস ‘কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস’। দ্বাপরযুগে  
পরশর ঋষির ঔরসে মৎস্যগন্ধার গর্ভে একটি দ্বীপের মধ্যে ঐর জন্ম হয়। দ্বীপের  
মধ্যে জন্ম এবং গায়ের রঙ কৃষ্ণ ছিল বলিয়া ইনি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন। বেদকে বিভাজন  
বা বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া ইনি বেদব্যাস। পাতঞ্জল দর্শনের অসাধারণ টীকা রচনা  
এবং বিভিন্ন গ্রন্থে সমস্ত রকমের অসাধারণ রচনামূলক দেখিয়া অনেকে মনে করেন  
যে, বহু প্রতিভাবান্ মনীষী বিভিন্ন সময়ে রচিত তাঁহাদের গ্রন্থ ব্যাসদেবের নামে প্রচার  
করিয়াছেন। কিন্তু ‘অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানে।’ বেদব্যাস শ্রীভগবানের  
আবেশাবতার বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। “শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণ  
স্বয়ম্।” আবার শ্রীগুরুপূজাকে ব্যাসপূজা বলা হয়। এই সূত্রে ব্যাস-শব্দে শ্রীগুরুদেবকেও  
বুঝায়। সাধারণতঃ এই তিন প্রকার ব্যাসের পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। সমাসতঃ  
অর্থাৎ সংক্ষেপে ব্যাস-শব্দের এইরূপ বিশ্লেষণ হইলেও, ব্যাসতঃ অর্থাৎ আর একটু  
বিস্তৃতভাবে ব্যাস-শব্দের বিশ্লেষণ করা যাউক।

ব্যাস একটি সরলরেখা, যাহা একটি বৃত্তকে সমদ্বিখণ্ডিত করে। একটি বৃত্তের  
মধ্যে অসংখ্য সরলরেখা হইতে পারে যাহা বৃত্তকে খণ্ডিত করিতে পারে, কিন্তু ইহার  
ব্যাস নহে। ব্যাস হইল সর্ববৃহত্তম সরলরেখা, যাহা বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুর উপর দিয়া  
উভয়দিকে পরিধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেইরূপ বেদাদি শাস্ত্রের বিশ্লেষণ অনেকেই করিতে  
পারেন, কিন্তু বেদব্যাস একজন—‘ব্যাসো নারায়ণ স্বয়ম্’। অধোক্ষজ ভগবানের কথা  
অক্ষজ জ্ঞানের দ্বারা বর্ণনা করা সম্ভব নহে, তজ্জন্যই ব্যাসাবতারের প্রয়োজনীয়তা।  
‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ পরাৎপর তত্ত্ব সর্বকারণের কারণ, অনাদির ও আদি সেই গোবিন্দই  
সমস্ত কিছুর মূল কেন্দ্রবিন্দু। অতএব সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই বিস্তৃত  
হইয়াছে—ইহাই তত্ত্ব। শ্রীভগবান্ তাঁহার অসমোদ্ধ মাধুর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট করিয়া ও অভিকর্ষ  
বলের দ্বারা চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা ও সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিজ অভিমুখে সর্বদা আকর্ষণ  
করিতেছেন, তাই তিনি কৃষ্ণ। কৃষ্ণ রসস্বরূপ—‘রসো বৈ সঃ।’ রসস্বরূপ কৃষ্ণতত্ত্বকে  
বিচারপূর্ব্বক প্রদর্শন করানই শ্রীগুরুদেবের কর্তব্য। তজ্জন্য তাঁহাকে নিরপেক্ষ বলা  
হয়। ‘কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই ‘গুরু’ হয়।।’  
(চৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৮)। কোন একটি বিশেষ রসে আবিষ্ট হইয়া থাকিলে রসময়  
ভগবানের সাক্ষিক বিশ্লেষণ সম্ভব হইবে না, তজ্জন্য তাঁহাকে তটস্থ হইতে হইবে—  
ইহাই নিরপেক্ষতা। “কিন্তু যাঁর যেই রস, সেই সর্বোত্তম। তটস্থ হইয়া বিচারিলে,  
আছে তর-তম।” (চৈঃ চঃ মঃ ৮।৮৩)। এইভাবে ব্যাস-গুরু, বেদব্যাস এবং জ্যামিতিক-  
ব্যাস সমার্থক হইল।

জ্যামিতিক-ব্যাস শুধু একটি প্রতীক বা রূপকমাত্র। ভগবান ব্যাসদেবের অনুরাগী ও অনুগামী গুরুই ব্যাস-গুরু। সেইরূপ গুরুপূজাই শুধুমাত্র ব্যাসপূজা বলিয়া গৃহীত হইবে, অন্য কোথাও নহে। বৃন্তের মধ্যে ব্যাস ব্যতীত যেমন অসংখ্য ছেদক সরলরেখা থাকে; এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেও তদ্রূপ অসংখ্য গুরু থাকিবে ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যাসের ন্যায় ইহারা কেহই একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত নহে বলিয়া ইহাদের কাহারও দর্শন সম্যক্ ও নিরপেক্ষ হইতে পারে না। ইহাদের মধ্যে যে সরলরেখা বা যে গুরু কেন্দ্রবিন্দু বা কৃষ্ণতত্ত্বের যত নিকটে অবস্থিত তাঁহার মর্যাদা বা গুরুত্বও ততোধিক।

ব্যাস-গুরু চিৎ ও অচিৎ উভয় জগতের মধ্যবিন্দুতে অবস্থান করেন বলিয়া তিনি উভয় জগৎকেই সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। অচিৎ জগতের তমাস্কার বা অজ্ঞান মোহকে নাশ করিয়া তিনি চিদালোক প্ৰদান করেন বলিয়া তাঁহাকে মহাস্ত গুরুও বলা হয়। চিজ্জগতের সর্বোন্নত স্থানে যাঁহুর প্রবেশাধিকার, তিনিই মহাস্ত গুরু। উভয় জগৎকেই বিচারপূর্বক দর্শন করাইয়া তিনি সমস্ত সংশয় ছেদন করাইয়া থাকেন।

একটি বাড়ীর ভিতরে যাঁহারা অবস্থান করিতেছেন তাঁহারা বহির্জগতে কি ঘটিতেছে তাহার কোনও খবর রাখেন না, আবার বহির্জগতের লোক সেই বাটিকাভ্যন্তরে কি আনন্দ বা কি দুঃখের স্রোত বহিতেছে তাহারও খবর জানেন না। কিন্তু সেই বাড়ীর পরিচারিকা বাড়ীর অভ্যন্তরের সমস্ত ঘটনার অনুভূতির সাক্ষ্যস্বরূপ আছেন আবার বহির্জগতের সমস্ত আনন্দ ও নিরানন্দের কথাও তিনি বাড়ীর ভিতর নিবেদন করিতে পারেন। কারণ তাঁহার সর্বত্র অবাধ যাতায়াতে কোনও বিধি-নিষেধ নাই। ব্যাসগুরুও তদ্রূপ। এই পরিচারিকা সাধারণ নহে। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ কেমন পরিচর্যা প্রার্থনা করিয়াছেন?—“যৎ কিঙ্করীষু খলু বহুশঃ কাकुবাণী নিত্যং পরস্য পুরুষস্য শিখণ্ডমৌলে। তস্য কদা রসনিধেঃ বৃষভানুজায়া স্তৎ কেলিকুঞ্জ-ভবনাস্তন মাজ্জনী স্যাম্।”

এই প্রসঙ্গে আর একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হইবে। যদ্রূপ কোনও একটি মিউজিয়াম বা চিড়িয়াখানা অথবা অনুষ্ঠান গৃহ পরিদর্শনের জন্য একটি দল আসিয়াছে। সেই দলের যিনি দলপতি তিনি যাঁহাদের লইয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের ভিতরে প্রবেশ করাইবার সময় অনেক ভীড়ের মধ্যেও তিনি প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইয়া একে একে সকলকে চিনিয়া লইয়া বলিবেন এইগুলি আমার লোক। তাহার পর তাঁহাদের সকলের প্রবেশাধিকার দিয়া নিজে সর্বশেষে প্রবেশ করিয়া সকলকে সবকিছু দেখাইয়া বুঝাইয়া দিবেন, কারণ তিনি উক্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তদ্রূপ হতভাগা জীব আমরা তম মোহান্ধকারে আচ্ছাদিত দৃষ্টি আমাদের। হতচেতন আমাদের চিজ্জগতে কোনও প্রবেশাধিকার নাই। অণুচেতন্য মায়াবদ্ধ জীবের সচ্চিদানন্দময় বিভূ ভগবানের নিকট যাওয়া ত' দূরের কথা, তাঁহার করুণা গ্রহণ করিবার যোগ্যতাটুকুও নাই। বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ লইয়া আমরা সরাসরি আলো জ্বলাইতে পারি না। ট্রান্সফরমার-রূপী শ্রীগুরুদেব সেই অসীম শক্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া, যাহার যতটুকু প্রয়োজন তাহাকে ততটুকু সেইভাবে প্রদান করিয়া জগজ্জীবের মঙ্গলসাধন করেন।

আজ আমরা সমস্ত জগৎবাসী এক ক্রান্তিক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। পিছন ফিরিয়া একমুহূর্ত তাকাইয়া আমাদের নিজদেরকে সংশোধন করিবার ও কৈফিয়ৎ দাখিল করিবার দিন। এই অবক্ষয়ের যুগে সমস্ত সমাজ সংসারে যখন মাৎস্যন্যায় চলিতেছে, তখনই ওইরূপ একজন মহান্ত গুরুর আবির্ভাব-শতবার্ষিকী-ব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে। তিনি হইলেন শ্রীকৃষ্ণানুগবর শ্রীব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদানুকম্পিত একান্ত প্রেষ্ঠ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুর। আজ তাঁহার আবির্ভাব-শতবার্ষিকী-তিথিবাসরে কিছু পূজা দেওয়া বিধেয়। ভক্তি ও ভাবের দ্বারাই পূজা দেওয়ার বিধি; কিন্তু মাদৃশ কপট চপলমতির হস্তে পূজা দেওয়ার মত কোনও উপায়নই নাই। তজ্জন্য তাঁহার অপরিসীম গুণাবলী ও অনন্ত কার্যাবলীর বর্ণনা করিতে যাওয়াও ধৃষ্টতা ও বিভ্রমের মাত্র।

যতক্ষণ হৃদয়ে ভাবভক্তি না আসে ততক্ষণই বাহ্যিক নানা উপচারদ্বারা পূজা করিবার বিধি, যদিও তাহা প্রেমভক্তি মিশ্রিত না হইলে সুস্বাদু হয় না। “নানোপচার-কৃতপূজনমার্তবন্ধোঃ প্রেমণৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিক্রতং স্যাৎ। যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা। তবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ-পেয়ে।।” (পদ্যাবল্যাম্ ১৩)। অর্থাৎ যেমত জঠরে যে-পর্যন্ত তীব্র ক্ষুধা থাকে, ততক্ষণই ভক্ষ্য-পেয় বস্তুসকল সুখদায়ক হয়, সেইরূপ আর্দ্রবন্ধুর নানা উপচারে পূজা হইলেও তাহা প্রেমযুক্ত হইলেই ভক্তগণের হৃদয় আনন্দে গলিত হয়।

“সাক্ষাদ্ধরিতেন সমস্ত-শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সত্তিঃ। কিন্তু প্রভোঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্।।” হরিত্বহেতু হরির প্রিয় সেই গুরুর হরির সমস্ত গুণই প্রবেশ করে। “কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকলি সঞ্চারে।।” (চৈঃ চঃ) গর্হণমুখে তিনি যেমন এই মায়িক জগতের জড় সুখের অসারতা প্রদর্শন করিয়াছেন, অপরদিকে তেমনই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের উন্নতোজ্জ্বল রসের কথাও জগতে প্রচার করিয়াছেন। সেই অনর্পিতচর প্রেম-প্রদাতা রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে তিনি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—“রাধাচিন্তা-নিবেশেন যস্য কাণ্ডির্বিলোপিতা। শ্রীকৃষ্ণচরণং বন্দে রাধালিপ্তিত-বিগ্রহম্।।” অর্থাৎ শ্রীমতী রাধারাবীর বিরহে অত্যন্ত চিন্তাভিনিবেশদ্বারা যাঁহার কৃষ্ণবর্ণ-কাণ্ডি বিলুপ্ত হইয়া শ্রীমতী রাধার ন্যায় হইয়াছিল, সেই রাধাচিন্তিত-বিগ্রহ অথবা শ্রীরাধা-কর্তৃক আলিপ্তিত শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের বন্দনা করি।

কলিহত জীব আমরা, ধ্যান, যজ্ঞ, পূজার্চন কিছুই নাই আমাদের, সবকিছু হারাইয়া নিঃস্ব হইয়াছি। আজ এই পুণ্যলগ্নে তাঁহার চরণে এই প্রার্থনা করি, আমরা যেন ওইরূপ মহাপুরুষের তৈলবাট হইবায় যোগ্যতা লাভ করি। তাহা হইলেই সব পাওয়া যাইবে। “যন্মামশ্রুতিমাত্রেন পুমান্ ভবতি নিম্নলঃ। তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে।।” (ভাঃ ৯।৫।১৬) অর্থাৎ—যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রেই জীব নিম্নল হন, সেই তীর্থপদ ভগবানের যাঁহার দাস, তাঁহাদের আর কি-ই বা অবশিষ্ট প্রাপ্য থাকে?

রাজপরিবারে জন্মস্বীকার করিয়াও যিনি নেড়া মাথা, ছেঁড়া কাঁথা, দুচোখে জল, মুখে হরিবোল, লোটো কন্ডল সম্বলপূর্বক ভিক্ষাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তদনুগতজন হইয়া আজ আমরা আঁচল পাতিয়া নিষ্কপটে যেন বলিতে পারি ‘বাবুগো দুটো ভিক্ষা দিন।’ আমরা সব হারাইয়াছি, আমাদের কিছুই নাই। তবে হয়ত’ টাকাটা, আধুলিটা, সিকিটা আমাদের ঝুলিতে পড়িতে পারে। আজ দিন আসিয়াছে, আসুন আমরা সকলে মিলিয়া সেই প্রতিজ্ঞা করিয়া আন্তরিক চীৎকার করি—“বাবুগো কিছু ভিক্ষা দিন।” তবে মহাজনের পকেট হইতে আমাদের শূন্য ঝুলিতে কিছু আসিতে পারে। তাঁহার আবির্ভাব-শতবার্ষিকী ব্যাসপূজা-বাসরে এই প্রার্থনাই তাঁহার প্রতি আমাদের পুষ্পাঞ্জলি হউক, এই নিষ্কপটতাই গুরুদক্ষিণা হউক। তবে তাঁহার অহৈতুকী করুণায় আমরা কখনও হয়ত’ উদ্ধব মহারাজের সেই প্রার্থনার অধিকারী হইব—

“আসামহো চরণরেণু-জুষামহং স্যাৎ

বৃন্দাবনে কিমপি গুণ্মলতৌষধীনাম্।।”

আজ এই পুণ্যতিথিতে তাঁহার চরণে আমাদের এই সকাতির প্রার্থনা—তিনি আমাদের কাণ্ডারী হইয়া সেই দলপতির ন্যায় ‘এরা আমার লোক’ বলিয়া যেন সেই বৃন্দাবনে প্রবেশাধিকার দিয়া অনন্ত যুথের মধ্যে তাঁহার যুথে স্থান দেন। ইহাই আমাদের পরম প্রসাদ।

— শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

## শ্রীগুরুপূজা

আজ আমাদের গুরুপূজা। শ্রীগুরুপূজা, শ্রীব্যাসপূজা, শ্রীআনন্দ্যপূজা ও শ্রীআচার্য্যপূজা একই তাৎপর্য্যপূর্ণ। গুরুই ব্যাস, ব্যাসই গুরু। যাঁহারা চিহ্নিলাস স্বীকার করেন, তাঁহারাশ্রী গুরুপূজার অধিকারী। গুরুর নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর সবই আছে। আবার গুরুদেব নিজে শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর এবং শ্রীকৃষ্ণলীলার পরম সহায়। গুরুকে লইয়াই কৃষ্ণের যত বিলাস। শ্রীগুরুদেব নর নহেন, তিনি চিহ্নিলাস—বিষ্ণুপাদ বা ভগবৎপাদ। গুরুদর্শনে তটস্থ-দর্শন নাই। যেখানে তটস্থ-দর্শন সেখানে জীবদর্শন। শ্রীগুরুদেব জীব নহেন, তিনি কপটমানব বা ভগবৎপরিকর। শ্রীগুরুদেব সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ; তাঁহার তনু অপ্ৰাকৃত। তিনি আশ্রয় জাতীয় কৃষ্ণবিগ্রহ। তিনি সর্বজ্ঞ ; কৃষ্ণ তাঁহার প্রেমবাধ্য। শ্রীগুরুপূজায় সর্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয়, তবে গুরুপূজায় অধিকার লাভ হয়। সমর্পিতায়া, শরণাগত, দীন সরল ব্যক্তিই গুরুসেবা পায়। দাস্তিক, কপট ও স্বতন্ত্র ব্যক্তি গুরুসেবা দূরের কথা, গুরুর দর্শনই পায় না।

যাঁহারা ভক্তিপথের পথিক, গুরুপূজা তাঁহাদের নিত্যকৃত্য। তাঁহারা প্রতিদিনে, প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি মিনিটে, প্রতি সেকেন্ডে সর্বক্ষণ গুরুসেবা করেন। তাঁহারা অনুক্ষণ গুরুস্মৃতি বা গুরুদর্শনানন্দে ভরপুর। তাঁহারা জানেন, গুরুপূজা ব্যতীত গৌরান্দ্রপূজা



ও কৃষ্ণপূজা হয় না। কারণ শ্রীগুরুপাদপদ্মই শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগোবিন্দকে দিতে পারেন। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ। কৃষ্ণকে দান করিবার জন্যই তাঁহার এজগতে অবতরণ। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—“সাক্ষাৎ ভগবানকে যেরূপ বিচার ক’রবে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক’রবে, কোন অংশেই কম মনে ক’রবে না। সাধুসকল—পণ্ডিতসকল—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণসকলের কর্তব্য হ’চ্ছে ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—পূজা করা, সেবা করা, যদি তা’ না করেন, তবে শিষ্যস্থান হ’তে ভ্রষ্ট হ’য়ে যা’বেন। মহাস্ত গুরুদেবকে ভগবান হ’তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশমূর্তি না জা’নলে কোনওদিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ’বে না। ভগবান নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমার গুরুদেবের তুল্য প্রিয় ভগবানের আর কেহ নাই। তিনি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।”

গুরুর প্রসন্নতাই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়। নিজের চিকিৎসা নিজে করিতে না গিয়া সাধুগুরুর চরণে শরণাগত হইয়া তাঁহাদের নির্দেশানুসারে জীবনযাপন করাই স্বাস্থ্য লাভের একমাত্র উপায়। গুরুকৃপাই সুবিখ্যাত ও বলবান্। কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, গুরুপ্রসাদই কি কেবল বলবান্, না শ্রবণাদিরূপ শিষ্যপ্রযত্নই বলবান্? তদুত্তরে বলিতেছেন,—গুরুপ্রসাদ কেবল ইতি-কর্তব্যতা মাত্র, শিষ্যপ্রযত্নই বলবান্, ইহা বলা যায় না। বাস্তবিক গুরুপ্রসাদই বলবান্। যেহেতু আচার্য্যকৃপার বলবত্তাতেই সিদ্ধি। সত্যকাম ঋষভাদির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করিয়াও গুরুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার উপদেশে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। যদি শ্রবণাদি সাধন বলবান্ হইত, তাহা হইলে ঋষভাদির নিকট শ্রবণমাত্রেই সত্যকামের ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইত, গুরুর নিকট পুনর্ব্বার কৃপাপ্রার্থনা ও পরিপ্রশ্নের প্রয়োজন থাকিত না। আবার উপকোশল অগ্নির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করিয়াও মহাস্ত আচার্য্যের নিকট অভিগমনপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান লাভের দীক্ষা ও উপদেশ প্রার্থনা করেন। আচার্য্য সত্যকাম উপকোশলকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করেন, তাহাতেই উপকোশলের ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হয়। ইহাতে আচার্য্যের নিত্যত্ব ও তাঁহার প্রসাদের প্রাবল্য নিত্যকালই স্বীকৃত হয়। তবে এখানে আরও একটা কথা এই যে, যদিও আচার্য্যপ্রসাদের প্রাবল্য আছে, তথাপি শ্রবণ-মননাদি করিতে হইবে। বরাহপুরাণ বলেন,—গুরুকৃপাই বলবান্, তাহা হইতে বলবত্তর সাধন আর কিছুই নাই, তথাপি মোক্ষসিদ্ধির জন্য শ্রবণাদি একান্ত কর্তব্য।

শুদ্ধ সঙ্কীর্তনযজ্ঞই গুরুপূজা-মহোৎসব। কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণের অবতার হয়। সেই নামরূপী কৃষ্ণকে যিনি কৃপা করিয়া দান করেন, তিনিই গুরু। এই গুরুদেবের পূজা মনুষ্যপূজা নহে, পরন্তু তাহা কৃষ্ণশক্তির পূজা—কৃষ্ণপ্রেরণার পূজা এবং তাহাই প্রকৃত কৃষ্ণের পূজা। আমরা দুর্বল, আর শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলদেব—বলদাতা। বলদেবের বল না পাইলে দুর্বল জীব সবল হইতে পারে না। সবল হইতে না পারিলে সেবা বা কৃষ্ণের চাকরীও হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত বললাভ হয় না, কিছুতেই দুর্বলতা যায় না। ‘গুরুর আমি’ই কৃষ্ণভজন করিতে পারেন। তাঁহার জাগতিক অভিমান বা ভোগত্যাগ-স্পৃহারূপ দুর্বলতা বা ছিদ্র নাই। শ্রীবলদেবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিই

সবল, শরণাগতই বলী। অশরণাগত বা স্বতন্ত্রই দুর্বল। গুরুসেবক স্বতন্ত্র নহেন, তিনি চিরকালই অধীন বা অনুগত।

আচার্য্যকে ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ বা সেবক-ভগবান্ বলিয়া জানাই শুদ্ধভক্তি ও মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়। গুরু ও ভগবানে যাঁহার অভিন্ন বুদ্ধি আছে, শাস্ত্রার্থ তাঁহারই হৃদয়ঙ্গম হয়। সেই আশ্রয়বিগ্রহ আমার নিত্যারাধ্য নিত্যপ্রভু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব। আজ সেই করুণাময় প্রভুর শ্রীচরণার্চনের দিন। এই প্রভুই বর্তমানে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-আচার্য্যরূপে প্রকটিত থাকিয়া মাদৃশ হতভাগ্যকে সর্বক্ষণ রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার সহজ পরমহংসত্ব ও নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যত্ব অকপট সজ্জনগণের হৃদয়ে স্বতঃই প্রকাশিত আছে, হইয়াছে ও হইতেছে। যাঁহারা তাঁহার স্নেহকৃপায় তাঁহার সাক্ষাৎ সঙ্গ-লাভের সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যকলাপের মধ্যে কৃষ্ণসেবাময়ত্ব ও গুরুবৈষ্ণব-নিষ্ঠা ও হরিভজনে অসাধারণ দৃঢ়তা ও পরদুঃখদুঃখিতা লক্ষ্য করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। বাল্যকাল হইতেই তিনি শ্রুতিধর। তিনি যাহা একবার শ্রবণ করেন, তাহা কখনও বিস্মৃত হন না। অতি অল্প বয়সেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহে তাঁহার অসাধারণ অধিকার অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি বেদান্ত ও শ্রীমদ্ভাগবতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তাঁহার ন্যায় বেদান্তেরও শ্রীমদ্ভাগবতের পণ্ডিত বিশ্বে আর নাই, একথা সকল গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ স্বীকার করেন। তাঁহার ক্ষণকাল সঙ্গ হইলেও হরিভজনের একটা প্রেরণা স্বতঃই পাওয়া যায়। তাঁহার দেবদুর্লভ সঙ্গের অপরিসীম প্রভাব অকপট সঙ্গপ্রার্থীমাট্রেই লক্ষ্য করিয়াছেন। অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের মূর্ত্তবিগ্রহ তিনি। তিনি শ্রীগান্ধর্ব্বার প্রেষ্ঠজন। তিনি কাহারও দীক্ষাগুরুদেব, আবার কাহারও শিক্ষাগুরুদেব। যাঁহারা সত্যসত্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট যাইতে চান, তাঁহাদিগকে প্রভুপাদপদে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য তাঁহার অকপট যত্নগ্রহ, চেষ্টা ও দয়া অবগনিয়, অতুলনীয়।

এই মহাপুরুষের কথা ও মহিমা কীৰ্ত্তন করিবার যোগ্যতা মাদৃশ নগন্য কীটাদিমের নাই। তাই এই গুরুপূজা-বাসরে অকপটে পুনঃ পুনঃ তাঁহার কৃপা ভিক্ষাই করিতেছি। সকলে আমায় অমায়ায় কৃপা করুন, যেন আমি তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণ ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবায় আত্মত্যাগ প্রদান করিতে পারি। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তিবিনোদধারার সংরক্ষক। আমি যেন সরলভাবে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বাক্য সযত্নে পালন করিতে পারি। আমি যেন গুরুর আজ্ঞা ছাড়িয়া—শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দেশ ভুলিয়া আর কাহারও কথা না শুনি বা অন্য কোন পথে না চলি। দয়ার সাগর করুণাময় প্রভু মাদৃশ হতভাগ্যের ক্রুটি ও অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করিয়া অমায়ায় কৃপা করুন—নিজ অযোগ্য ভৃত্য বলিয়া গ্রহণ করুন—ইহাই শ্রীগুরুপূজা-বাসরে প্রভুপাদপদে কাতর প্রার্থনা।

## পুষ্পাঞ্জলি ও প্রার্থনা

মহানন্দে গাওরে সবে

গুরু-গুণ গান রে।

গুরু-গুণ গানে ভরা

বেদবাণী সব রে॥

শ্রীগুরু-মতে হলে স্থিতি

অতেই বুদ্ধি, অতেই সিদ্ধি।

অতেই পাবে পরাশ্রয়

ব্যতিক্রমে বিফল রে॥

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি

পঞ্চরাত্র বিধান বিধি।

অপেক্ষা রাখে না সিদ্ধি

শুদ্ধাশুদ্ধ কল রে॥

সেবাধর্ম পরম ধর্ম

বেদানুগ শাস্ত্রমর্ম।

শ্রীগুরু-অনুগত কর্ম

সর্বধর্ম সার রে॥

কর্মবন্ধন আছে কর্মে

বন্ধনমুক্তি সেবাধর্মে।

গুরু-আদেশে কর্মে মর্মে

জীবন-মুক্ত হয় রে॥

শুভদিনে শুভক্ষণে

সভাবন্দী যত জনে।

প্রণামি সর্বজনে

মায়া-মুক্ত সঙ্গীরে॥

শুদ্ধভক্ত চরণ-ধূলি

ভজন অনুকূল বলি'।

জীবনপ্রাপ্তে ব্রজধূলি

অঙ্গ ভূষণ মাথে রে॥

ভক্তবৎসল অতি দীন

মতি বুদ্ধি অতি ক্ষীণ।

ধূলির আশে গুণে দিন

অন্তে চরণ আশে রে॥

— শ্রীভক্তবৎসল দাস, নৌকাঘাট (শিলিগুড়ি)

## অর্দ্ধশত না পূর্ণশত

‘বলি, স্বাধীনতা-৫০’ না সাধীনতা-অনন্ত?’—নির্ব্বোধ কানাইদার নিরুত্তাপ প্রশ্ন। কিন্তু হাজার সেন্টিগ্রেড তাপের আস্ত এক বাজ যেন মাথায় ভেঙ্গে পড়ল। কোনরকমে খেই না পেয়ে তখন চোখে আতসবাজীর ফুলঝুরি। ‘স্বাধীনতা কাকে বলে? কি তার লক্ষণ?’—আবার সেই! তাড়াতাড়ি পা জড়িয়ে হাউমাউ করে উঠলাম, ‘বিশ্বাস কর কানাইদা, ওসব নেতারা জানে। আমি হলাম গিয়ে ভবঘুরে—মানে, জনগণের মধ্যে একেবারে অন্ত্যজ। আমাকে এভাবে ঘায়েল করা কেন?’

‘ঘায়েল? তোকে? দুর্, তুই হ’লি আমার ইন্টারন্যাশানাল রিপোর্টার। মানে যা স্টক করেছিস, তা খালাস ত’ কর।’ ‘ওঃ তাই বল,—ভাবলাম, বেচারি পথচারীর মাথায় বুঝি বেমক্কা রাজদণ্ড!’ হাঁফ ছেড়ে কয়েক সেকেণ্ড স্বাধীনতার বাতাস পুরে নিয়ে মাঠে নেমে পড়লাম।—‘এই গত কয়েক মাসে যেসব ‘ইণ্ডোর-স্বাধীনতা’, ‘আউটডোর-স্বাধীনতা’ করলাম, তাতে এক নেতাদের স্বাধীনতা ছাড়া জনগণের স্বাধীনতাটা খুব একটা মাথায় ঢুকলো না। মনে হ’ল, স্বাধীনতাটা কারও উইল করে পাওয়া প্রপাটী—এই দয়া-দাক্ষিণ্য করে কিছু কিছু হরিলুট দিচ্ছে মাত্র। কানাইদা! তোমরা হ’লে গিয়ে গৌড়ীয় মঠের শিষ্য—তোমাদের চশমাই আলাদা। কিন্তু আমাদের এই জেনারেল বগির চশমায় যা দেখি, তাতে স্বাধীনতার টেস্ট যদি পেতে হয়, তবে নেতা হতেই হবে। আর জনগণ যা পায়—তা হ’ল গিয়ে সেই হাওয়াই লাড্ডু।’

কারেঙ্ক!—টেবিলে চাপড় মেরে কানাইদা পিলে চমকানো সায় দিলেন।—‘এদের কাছে স্বাধীনতা মানে নীরেট স্বেচ্ছাচারিতা। কিন্তু আমাদের আগের আগের যাঁরা অর্জিনাল ইণ্ডিয়ান—সেই তাঁদের ভাষায়, স্বাধীনতা মানে ভববন্ধন হতে রিলিজড হওয়া। এখন বল—তা হয়েছে? এক বৈষ্ণব-কবি ত’ সেই স্বাধীনতার বছরেই প্রোটেস্ট করে উঠেছিলেন—

“স্বাধীন ভারত আজি, শতকোটি কণ্ঠে  
উঠে ‘জয়হিন্দ’-ধ্বনি ! আনন্দে প্রমত্ত  
সবে, স্বরূপ ডুলিয়া! কিন্তু হায়, কোথা  
স্বাধীনতা? হয়েছে কি জীব মুক্ত ভব-  
কার হতে? খসি’ কি পড়েছে জীবের  
মায়ার শৃঙ্খল?”—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই যে ইণ্ডিপেন্ডেন্স গোল্ডেন জুবিলি নিয়ে কি না মাতামাতি! আমি বলি—এটা ফুলস্ প্যারাডাইস্। মহা অষ্টমীর রাত পেরোনোর সাথে সাথে কচি পাঁঠা দুটো, বুঝলি মহানন্দে শিস্ মেরে ড্যান্স শুরু করে দিল; তখন ওদের মা বিরক্তিতে খঁকিয়ে উঠল—‘এই না হলে পাঁঠা। ওরে, সামনেই যে মা-চণ্ডীর কাল্-অমাবস্যা—তা মনে আছে?’ তাই বলছি—ব্রিটিশরাজ আমাদের ছেড়ে দিলে কি হবে, যমরাজ ত’ ছাড়েননি। এটা কেন দেশের হেডগুলো বুঝে না? বলত’ ভবা!’

ভবঘুরে বলে আমাকে তিনি শটে এ ‘ভবা’ বলেই ডাকেন। আমার পৈত্রিক নামটা তাঁর ফেভারিট্ হলেও উনি ভবার ভাবে পড়ে আছেন। কি আর করা, মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললাম,—‘ব্যাপারটা হল কি, স্বাধীনতার অর্থটা যার যেমন বোধে এসেছে, সে তেমনই করছে। আমি অবশ্য আনন্দের মধ্যে অসুবিধা কিছু দেখি না। ‘আনন্দময় অভ্যাসাৎ’—না কি যেন, তোমরাই ত’ বল।’

‘বা-বা-বা-বাঃ! স্বয়ং ব্যাসদেবেরও যে আক্কেলগুডুম্ করে দিবি! দেখ—বর্ষায় ব্যাঙগুলো যখন আনন্দে কনসার্ট করে, তখন সাপের বলত’ কত সুবিধে! তাদের এই আনন্দের অভ্যাসে যম মহারাজের আইডেণ্টিফাই করে নিতে সুবিধে হয়—এই যা।’ কিছুক্ষণ হস্ট করে কানাইদার আবার পাণ্টা বক্তব্য,—‘আনন্দে আমাদেরও কোন অসুবিধা নাই—আনন্দ সববাই চায়। কিন্তু সেটা ত’ বাস্তব হওয়া চাই। আমোদ-ফুর্তির ঢল লাগিয়ে কেবল নিজেদের অপকীর্তিগুলো ঢেকে রাখার যে চেষ্টা—সেই বোকাকরণের ব্যাকরণ কি আর বুঝি না!

হঠাৎ কি মন হতেই কানাইদা ঝুঁকে মেঝের উপর টাল করা খবরের কাগজের মধ্য থেকে একটাকে মুক্ত করে মেলে ধরলেন,—‘এই দেখ, এবারের ১৫ই আগস্টে রাষ্ট্রপতিজীর ভাষণ,—‘সাম্প্রতিককালে সমাজের সর্বস্তরের অবক্ষয় আমাকে ব্যথিত করে। যে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ আমাদের সভ্যতার প্রাণস্বরূপ,—দেখলি আগারলাইন কর্—‘যে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ আমাদের সভ্যতার প্রাণস্বরূপ, তা ক্রমেই সমাজ ও রাজনীতি থেকে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। নিছক সুযোগসম্মানী মনোবৃত্তি ও ক্ষমতার রাজনীতি নির্বাসনে পাঠিয়েছে নীতি ও আদর্শবোধকে’—ইত্যাদি প্রভৃতি। এই হল আমাদের স্বাধীনতার ‘সুবর্ণ’ ফসল—গ্রি চিয়াস্ ফর্ গোলেন্ড্ জুবিলি!’

না, এসব ভাবতে আর ভাল লাগে না। সেই অখণ্ড ভারতবর্ষের কথা এখন স্রেফ ইতিহাস মাত্র। হঠাৎ কোথেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল কতগুলো লালমুখো; শেষে ‘ডিভাইড্ এণ্ড রুল্’—থিওরীতে বাদরের পিঠে ভাগ করে কেটে পড়ল। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা যেন একটা প্রহসন! ‘ভাই ভাই ঠাই ঠাই’—সেই হ’ল শুরু। আগে ত’ এইপ্রকার ছিল বলে মনে হয় না। ব্যক্তিগত স্বার্থই যেন তখন রাজনীতির রূপ নিয়েছিল।

‘এর সাথে আমি আর একটা কথা জুড়বো’—কানাইদা ফোড়ন কাটলেন।—সেটা হল নাস্তিকতা। ‘হরাবভক্তস্য কুতো মহদগুণাঃ’—একেবারে শাস্ত্রের কথা।

‘আঃ কানাইদা! এসব রাজনীতির মধ্যে অযথা ধর্মকে নিয়ে টানাটানি কেন?’—ছোটখাট প্রতিবাদ, কিন্তু মুখ ফুঁড়ে স্বাধীন হয়ে গেল।

‘অযথা!’—কানাইদা হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।—‘রাষ্ট্রপতিজী যেভাবে আমাদের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের অবক্ষয়কে চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন, এর পরেও ‘অযথা’! রাজর্ষিদের শাসিত এই ভারতে ধর্মনীতিকে বলিস্ ‘অযথা’! তোরা ‘নীতি’-জিনিষটাকে ধর্ম থেকে কিভাবে আলাদা করিস্!—বুঝি না। নীতির মূলেই ত’ ধর্ম। আজ এই ‘স্বাধীনতা-পঞ্চাশ’ মার্কী ভারতের যে নাজেহাল অবস্থা—তার মূলে তোদের এই, এই ধর্মছাড়া নীতি। ধর্ম না থাকলে নীতির দুর্নীতি হতে কতক্ষণ, বলত’?

কানাইদার একটা বর্ণও যে ফেলবার নয়, তা বুঝি। ‘অপটিমাম্ দুর্নীতি’ নিয়ে আজকাল কেমন প্রকাশ্যে সেমিনার, গবেষণাই না চলছে! ‘অপটিমাম্ দুর্নীতি’—বাঃ, কি দারুণ পরিভাষা!—মানে দুর্নীতি কতদূর পর্য্যন্ত পার্বমিট্ করা যায়। ঘুষ খাও—কিন্তু প্লিজ, বেইমানী কর না—অর্থাৎ ইমানদার ঘুষখোর হয়। পরলোক, কর্মফল, জন্মান্তর—মুনি-ঋষিদের এসকল বিচারকে তুবড়িতে উড়িয়ে দিলে এসব গণদুর্নীতি ত’ অবশ্যম্ভাবী। বিশ্বপিতার স্বীকার নাই, ওদিকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের জন্য নাকি কান্না। তা সেই বিশ্বভ্রাতৃত্বের আওয়াজ কতদিন ধোপে ঢেকে ? সবাই যখন বিশ্বভ্রাতাই, তখন ‘সংখ্যালঘু’, ‘সিডিউল্ কাস্ট্’—কথাগুলি বা আসে কোথেকে! আর তাদের জন্য দরদ-

প্রদর্শনের যে প্রতিযোগিতা—তাতে বর্ণবৈষম্য বাড়ে বই ত' কমে না। যোগ্যতার বিচার না করে যোগ্যতার লেবেল সাঁটানো—এক ভারত-নেতাদের নীতিতেই সম্ভব। ধর্মধ্বজীদের স্বার্থান্ধতাই যখন প্রমাণিত হল, তখন ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে আবার সেই অপস্বার্থেরই চরিতার্থকরণ—সেটাই বা কোন্ ভারতের নীতি? রাজনীতি উইদাউট কেলেকারী—এ ত' এখন রীতিমত অমাবস্যার চাঁদকেও টপকাতে চলেছে। এই প্রকার নীতিতে শুধু পঞ্চাশ কেন, শত-সহস্র স্বাধীনতা পার হলেও কল্যাণের বিল্কুল চান্স নেই।

‘কিরে, মনে মনে কি ভাঁজহিস্ বলত? সেই কখন থেকে স্পিক্ টি নট!’ কানাইদার কথায় গোঁফের তলা থেকে এক চিলতে হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বললাম,—‘ধর্মের হীনা পলেটিঙ্ক্ সমান’। আঃ, কানাইদা যেন নেচে উঠলেন,—এতক্ষণ বুঝি এই ভাবছিলি! গ্রেট! আচ্ছা দেখ, ভারতের যে পতাকা, তাতে সবার উপরে কোন্ রং?—গৈরিক রং। এর মানেটা কি?—মানে এই যে, এই ভারত সাধু-অধ্যুষিত ভারত—আধ্যাত্মিক ভারত। সেই আধ্যাত্মিকতাকেই সর্বোপরি রেখে ভারতের নীতি নির্ধারণ হয়। অথচ ভারতের এখন টপ্ টু বটম্ সবাই একথা ভুলে আছে! কি আশ্চর্য্য!’

হাতাশায় যেন চেয়ারে মিশে যেতে চাইছেন, কিন্তু হঠাৎ কি মনে পড়তেই ‘দাঁড়া, আসছি’—বলে কানাইদা ভিতরের ঘরে দৌড়। সেকি! কি হল! প্রকৃতির ডাক হবে হয়ত—এইরকম যখন ভাবছি, তার আগেই ততোধিক স্পীডে একটা বই নিয়ে কানাইদা হাজির। ‘দেখ, ভবা দেখ, ভারতের পতাকার আসল অর্থ—ব্যাখ্যা করেছেন একজন পিওর সাধু,—‘প্রাণের প্রতীক ‘সবুজ’ বরণ নয়নের মণি তাই।

‘প্রাণ আছে তার সেহেতু প্রচার’—এইমাত্র সদা গাই।।

‘সন্ন্যাসকৃৎ’ ঈশ্বর-সাধিত ভারত কথিত ত্যাগের বেষ।

সর্ব উর্দ্ধে রহে ‘গৈরিক’ বরণ, ভারত শিখাবে সকল দেশ।।

অজ্ঞান-তমের বিনাশ যেরূপ রবির ‘শুভ্র’ কিরণ ছটায়।

সনাতন-ধর্ম কুদর্শন নাশে ‘অশোক চক্র’ সুদর্শন তায়।।”

দেখেছি! সাধু ছাড়া সাধুদের ভারতকে কে ব্যাখ্যা করবে, বল?’

বইটা টেনে নিয়ে এবার নিজে পড়লাম, আবার পড়লাম—আবৃত্তি করলাম, আবার, পুনরায়—প্রশংসার সার্টিফিকেট আমার সামর্থ্যকে পরওয়া না করে নিজেই বেরিয়ে পড়ল—‘দারুণ! কানাইদা—সুন্দরের থেকেও সুন্দর! কে লিখেছেন বলত?’

‘ইনি আমার পরমগুরুদেব’—কানাইদার চোখ আনন্দে চকচক করে উঠল।—শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ। এই গ্রন্থটা তাঁরই জীবনী—আমার গুরুদেবের লেখা। আর এই যে তাঁর চিত্রপট—দেখেছি! কি রকম ড্যান্সিং স্পিরিট্, না? সেই সময়কার স্বাধীনতা-আন্দোলনে ওঁরও এক ভীষণ এ্যাক্টিভ্ পাট্ ছিল। ব্যাস, কিছুদিনের মধ্যে তাঁর উপর ব্রিটিশ সরকারের সরোষ নজর। অমনি তিনি নিরুদ্দেশ হলেন। আর এর মধ্যেই হল তাঁর শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের সাথে সাক্ষাৎ। জহুরী জহর চেনে—আর তখনই তাঁকে পাকড়িয়ে ফেললেন। এক ব্রিটিশ-রাজের কোপ-নজর এড়িয়ে, আর এক রাজাধিরাজের নেক-নজরে—‘অশোক-অভয়-অমৃতপদ’। ওয়ের মাছি ত' নয়, এয়ে ভ্রমর—পদ্মফুলের সন্ধান পেলে এঁরা সব ভুলে যায়।’

‘তার মানে—সেই স্বাধীনতার আন্দোলন থেকে অবসর?’—মনে যেন ভীষণ একটা চোট পেলাম।

‘কখনও না।’—কানাইদার রেডি জবাব।—‘তবে বুঝতে হবে, স্বাধীনতার আন্দোলন বলতে আসলে কি বুঝায়। যদি বলিস, পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করার লড়াই। তবে বলি—ভারত ইজ্ ভারত। ভারত কখনও পরাধীন ছিল না—আত্মমহিমায় সর্বদা জুলজুল করছে। সমগ্র বিশ্বকে যদি ভগবানের বাড়ী বলা যায়, তবে ভারত হল তাঁর শয়নঘর। সুতরাং ভারতের অপার মহিমার ধারে কাছেও কেউ আসে না। তবে যে দেখা যায়, ঘন ঘন বিদেশী-শক্তির আক্রমণ। এর মধ্যেও আছে এক পারমাণবিক রহস্য। আগুনকে ভোগ করতে এসে পোকামাকড় নিজেরাই চিতায় উঠে। আর যাদের বোধশক্তি কিছু বেশী, তারা আগুনের ক্ষমতা বুঝে তাকে সমীহ করা শুরু করে। তেমনি ভারতকে ভোগ করতে এসে তারা ভারতের অসমোদ্ধ মহিমায় আপ্ত হয়েছ—কৃতকৃতার্থ হয়েছে। সারা বিশ্বে ভারত বলতে একবাক্যে যে মাথা নত করে, সে নিশ্চয়ই ভয়ে নয়—ভক্তিতে। “What India thinks today—the whole world thinks tomorrow”—কথাগুলি সেই যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য-দার্শনিকদেরই। বিশ্বের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভারতের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সাহিত্য, সর্বোপরি আধ্যাত্মিকতা—এসবের উপর ‘Indology’ বলে রীতিমত ডিপার্টমেন্ট চালু হয়েছে। বৃটিশরাজ গেছে স্বরাট্ ভগবানের বিশেষ ইচ্ছাতেই। এতে তর্কিকরা বাহাদুরিটা নিজেদের ঘাড়ে নেওয়ার জন্য কোমর বেঁধে লাগুক—কিছু এসে যায় না। কিন্তু তত্ব তত্বই। হনুমানজী রাবণের সৈন্যদের কাছে ধরা পড়েননি—ধরা দিয়েছেন—আর তা লঙ্কা দহনের জন্যই। এও ঐরকম।’

কথাগুলি বলে কানাইদা যখন চুপ করে গেলেন, তখন চারিদিকে কেমন থমথমে ভাব। এর আগে ত’ এমন সব কথা কখনও শুনিনি। মনে মনে ভারতের প্রতি এক সুগভীর শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল। ভারতবাসী বলে একটা গর্ব আপনা থেকে এসে ভিতরে ঠাই করে নিল। সুনসান্ নীরবতা ভাঙতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, কিন্তু নির্বিকল্প সমাধিতেও ত’ অভ্যস্ত নই, তাই নিজেই ধ্যানে ভঙ্গ দিলাম,—‘তা না হয় বুঝলাম, কানাইদা—ভারত কখনও (তত্ত্ববিচারে) পরাধীন ছিল না। ‘অসহযোগ আন্দোলন’ বলে তথাপি যে একটা ব্যাপার সে-সময় দেখা গিয়েছিল, তা সেই ভারতেরই একান্ত নিজস্ব। সেটাও এখন বুঝছি। কিন্তু ঐ যে বলছিলে—তোমার পরমগুরুদেব স্বাধীনতা-আন্দোলন থেকে কখনই অবসর নেননি—সেটা তাহলে কি-প্রকার?’

ফিক্ করে কানাইদা হেসে দিলেন।—‘সেই পয়েন্টেই ত’ আসছি—ভারতই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রসূতি-সদন। আমরা যে আসলে পরাধীন—অনাদিকাল থেকে পরাধীন, তা ভারতে সাধুদের সঙ্গ হলে জানা যায়। তাঁরাই তখন বাতলে দেন স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি। রিভলিউশান্ ছাড়া কোন পজিটিভ্ এ্যাক্টিভ্‌মেন্ট হয় না। এর ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। কিন্তু জেনারেলি—আন্দোলন। এ সবই মায়ার প্রভাব—ঐর অধীনতাই পরাধীনতা। কৃষ্ণচন্দ্র—ঐ সেই কালো ছেলোটাই হচ্ছেন একমাত্র সর্বস্বাধীন। যে যতই পাকামি করুক, ওঁর কাছে স্যারেগার হলোই তবে স্বাধীনতার প্রশ্ন; আমরা সেই স্বাধীনতা চাই। আমার পরমগুরুদেব সেই স্বাধীনতা-আন্দোলনের ধারক এবং বাহক। ‘সো কল্ড্’ স্বাধীনতার নামে তিনি নিজেও মোহিত হননি, অন্যকেও

তাতে প্ররোচিত করেননি। ‘অমৃতস্য পুত্রাঃ’—আত্মবিস্মৃত পুত্রদেরকে সেই অমৃতের কাছে নিয়ে যাওয়াই তাঁর আন্দোলন। এরই নাম পরোপকার।—‘ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যাঁর। জন্ম সার্থক করি’ কর পর উপকার।।’ আর তারই একজাম্পল হিসেবে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি তিনি স্থাপন করলেন—সেই আন্দোলনের ধারাকেই ধরে রাখতে। আর যারা এর থেকে দুর্ভাগ্যের তাড়নায় বঞ্চিত—তারাই ‘স্বাধীনতা-পঞ্চাশের’ ছেলেভুলানো লজেন্সে লটকে আছে। কি যে তার স্বাদ—তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এতক্ষণে যেন খোলতাই হল—কানাইদার ফুল মোটিভটা। হয়ত’ এর উপরে অনেকেই তর্কের অবকাশ পাবেন। অবশ্য সব বিচারই যে সবার মাথায় ঢুকবে—এমনও নয়। নতুবা রহস্যের আর মহিমা কোথায়! কিন্তু এতক্ষণ কানাইদা যা বললেন—তা বিগ্রেড গ্রাউণ্ডের ভাষণ নয়—কিংবা হকারদের লেকচার নয়—এসব সেই আদি ভারতেরই অনাদি-কথা—এতে আমি নিঃসংশয়াত্মা। আর তারই পরিচয় দিতে বলে উঠলাম,—‘হুঁ, ভারি একটা লজেন্স, নাই বা চুষলাম!’

কানাইদা হো হো করে বিজয়ের হাসি হেসে উঠলেন,—‘ভেরি’ গুড! ভবা! কনগ্রাচুলেশন্! লজেন্স ছাড়লি ত’! এবার তাহলে অমৃত দিচ্ছি। এই যে ১৯৯৭ সাল—এটা আমার সেই পরমগুরুদেবেরই আবির্ভাব-শতবার্ষিকী। কেমন কাকতলীয় ঘটনা, বলত’! তাই আমাদের কাছে—নট অর্দ্ধশতবার্ষিকী, বাট্ শতবার্ষিকী। Let all the Indians rejoice on this most auspicious Centenary of this century !

হে ভারতবাসী! এক আনন্দ-সংবাদ—  
অবধান হই’ শুন—ছাড়িয়া বিবাদ।  
শতবর্ষ পূর্বে এক ভাগবত জন।  
গোলোক-সন্দেশ করিবারে বিতরণ।।  
প্রপঞ্চে এলেন এক পুরুষ তেজস্বী।  
সেই শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী।  
আনন্দ কর সবে সেই পূত-স্বরগে—  
আবির্ভাব-শতবার্ষিকীর আগমনে।।  
‘স্বাধীনতা পঞ্চাশের’ মোহানন্দ ছাড়ি’।  
শতবর্ষ পালহ ভাই! সকল বিচারি’।।  
কল্যাণের খনি তাহা—ওহে কৃষ্ণদাস!  
স্বাধীনতা-পালনে না খণ্ডে ভবপাশ।।  
বিচারে দেখ,—শতমধ্যে পঞ্চাশ আছে।  
অতএব সর্বলাভ পাবে শত-মাঝে।।  
অর্ধের কি কাজ ভাই! পূর্ণ বিদ্যামানে?  
‘পূর্ণ পূজে পূর্ণ লভি’—কহে বুদ্ধিমানে।।

কানাইদার আনন্দ দেখে কে! আর তাঁর আনন্দের জোয়ার আমাদেরও ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এ নিশ্চয়ই সেই আসল স্বাধীনতারই আনন্দ। আপনারা কি বলেন!



শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের

## উপদেশাবলী

- ১। জ্ঞান-কর্মাদি অন্যাভিলাষশূন্য কেবলা ভক্তিই আমাদের প্রাণ।
- ২। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশ্রু-সেবাদ্বারাই ভক্তি লাভ করা যায়।
- ৩। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাই গুরুসেবা।
- ৪। কীর্তনাখ্যা-ভক্ত্যঙ্গই সর্বশ্রেষ্ঠ।
- ৫। কীর্তনের দ্বারাই ভক্তির অন্যান্য অঙ্গ সাধিত হয়।
- ৬। দুর্জ্ঞান-সঙ্গ ত্যাগই নির্জ্ঞান ভজন, অর্থাৎ সাধুসঙ্গই নির্জ্ঞানতা।
- ৭। সর্বদা হরিকথা-প্রচারই হরিকীর্তন।
- ৮। সর্বদা হরিকথা বলা বা শ্রীহরির সেবাময় কথায় নিমগ্ন থাকাই মৌনাবস্থা।
- ৯। নিরপরাধে নাম-ভজনই বা শ্রীনামের সংখ্যাত-অসংখ্যাত শুদ্ধ উচ্চ-কীর্তনই লীলাস্মরণ।

১০। শ্রীরূপানুগত্যে গৌর-ভজনই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিপ্রলম্ব ভজন, ইহাই শ্রেষ্ঠ।

১১। ‘বাসুদেব’ বলিলে আমরা নন্দতনুজ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝি ; তজ্জন্য বাসুদেবের আবির্ভাব, জন্ম নহে। বাসুদেবের নাড়ীছেদাদি জাতকর্ম হয় নাই, কিন্তু কৃষ্ণ যশোমতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। জন্ম ও আবির্ভাবের মাধুর্য্যময় পার্থক্য কেবলমাত্র শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবগণই অনুধাবন করিতে সমর্থ ; কাষ্যগণের নিকট আমাদের শ্রীরূপানুগতাই প্রাথনীয়।

১২। চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য শ্রীবিগ্রহ-দর্শন নহে। ‘আমি শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া সুখী হওয়া অপেক্ষা শ্রীবিগ্রহ আমাকে দেখিয়া সুখী হইলে’ পরম মঙ্গল হয়। ভগবান্ প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন।

১৩। ঈশ্বরের আকার নাই, কোন রূপ নাই, কোন গুণ নাই, কোন শক্তি নাই, আছে কেবল অলীক কল্পনা ; এই অলীক কল্পনার মধ্যেই বৌদ্ধের শূন্যবাদ বা বেদবিরুদ্ধ নাস্তিক্যবাদ। পরন্তু ঈশ্বরের নিত্য আকার বা স্বরূপ স্বীকার করাই আস্তিক্যবাদ ; যাঁহারা এই ‘নিত্যরূপের’ অস্বীকার করেন, তাঁহারা নাস্তিক।

১৪। জড়শক্তির প্রাবল্যই আমাদের শ্রীজগন্নাথসেবায় বাধা প্রদান করে। জগদদর্শন—প্রাকৃত দর্শন থাকা পর্য্যন্ত আমাদের অপ্রাকৃত জগন্নাথ-দর্শনে রুচি জন্মে না। সমগ্র জগৎকে জগন্নাথের সেবায় নিযুক্ত করাই রথযাত্রা উৎসবের তাৎপর্য্য।

১৫। গুরুর আজ্ঞা যাঁহারা সর্বতোভাবে পালন করেন, তাঁহারা শিষ্য ; যাঁহারা তাহা অস্বীকার করেন, তাহারা গুরুপরম্পরা-বিরোধী, পথভ্রষ্ট এবং গুরুব্রুব।

১৬। শ্রীগুরুপাদপদ্ম মৃত নহেন, প্রকট-অপ্রকটে তাঁহার সমান অস্তিত্ব প্রমাণিত।

তঁাহার আবির্ভাব-তিরোভাব একতাৎপর্য্যাপর ; সুতরাং আবির্ভাবে বিরহ-স্মৃতি ও তিরোভাবে মিলন-মহোৎসব যুগপৎ সম্ভব।

১৭। দীক্ষাগুরুর পূজা সর্ব্বাগ্রে কর্তব্য। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায়,—মহাদাতা গুরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যিনি দীক্ষাগুরুর সেবাসিক্ষা প্রদান করেন, তিনিই শিক্ষাগুরু। যিনি দীক্ষাগুরুর সেবাসিক্ষায় বিমুখ, তিনি শিক্ষাগুরু-পদবাচ্য নহেন। তিনি বৈষ্ণবই হইতে পারেন না ; কারণ তিনি দীক্ষাগুরুর মর্য্যাদা দিতে শিক্ষা করেন নাই।

১৮। বাংলা-সাহিত্য সংস্কৃত-সাহিত্যের একান্ত আনুগত্য করিয়া সমগ্র ভারতে সর্ব্বোত্তম ভাষারূপে আদৃত। দুঃখের বিষয়, বাংলা-ভাষাকেও সংস্কৃত-ভাষার আনুগত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহার মূলে সংস্কৃত-ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা ও ভারতীয় বেদ-উপনিষদ ও পুরাণাদির চিন্তাধারার প্রতি অবহেলাও বুঝিতে হইবে।

১৯। রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই ঋষিনীতি অবলম্বিত হইলেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে। ঋষিনীতি অবলম্বন করিতে হইলে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থরাজি আলোচনা ও অধ্যয়ন করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে শিক্ষা-বিভাগের ওদাসীন্দ্য পরিহার করা প্রয়োজন।

২০। যে-কোন বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান উপার্জন করিতে হইলে প্রথমতঃ শ্রুতি বা শ্রবণের সাহায্যই আবশ্যিক ; তজ্জন্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শ্রবণের গ্রাহ্যবস্তু শব্দকেই মূল ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

২১। যাঁহারা চাতুর্মাস্য-ব্রত পালন না করিয়া কেবলমাত্র ‘উর্জ্জাদর’ করিয়া থাকেন, তাঁহারা চাতুর্মাস্যের ভক্তিফল সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারে না। ইহার দ্বারা চাতুর্মাস্যের প্রতি অনাদরই প্রকাশ পায়।

২২। বদ্ধজীবের কোন শুদ্ধবৈষ্ণব-সঙ্ঘের আনুগত্যে থাকিয়াই ভজনের প্রয়োজন। গোষ্ঠানন্দী ও ভজনানন্দী কেহই নির্জ্জন-ভজন করেন না। বিবিজ্ঞানন্দী গোষ্ঠানন্দীর শ্রীনাম-প্রেম-প্রচারের সহায়করূপে অনুকূলভাব পোষণ ও তাঁহার সহায়তা করিয়া থাকেন।

২৩। প্রত্যেকের গৃহ এক একটি আশ্রম। তথায় ভগবদনুশীলনের জন্য আমরা অবস্থান করিব। কেবলমাত্র আহার-নিদ্রাদির জন্য যে গৃহে বাস করা হয়, তাহা নরকের দ্বার-স্বরূপ। তামসিক দ্রব্যাদি আহারের দ্বারা জীবের চিন্তা অধিকভাবে ভগবদবৈমুখ্য লাভ করে, সুতরাং তাহা একান্ত বর্জনীয়।

২৪। আমরা সন্ন্যাসী—সমাজ-সংস্কার ধর্ম্ম-সংস্কারের আনুসঙ্গিক মনে করিয়া গ্রহণ করিয়াছি। শিক্ষিত সমাজকে তাঁহাদের অনধিগত ব্যাপারগুলি নিবেদন করিবার অধিকার আমাদের আছে। বাস্তব-সত্য প্রচার করিতে গেলে কাহারও কাহারও অন্তরে আঘাত লাগিতে পারে।



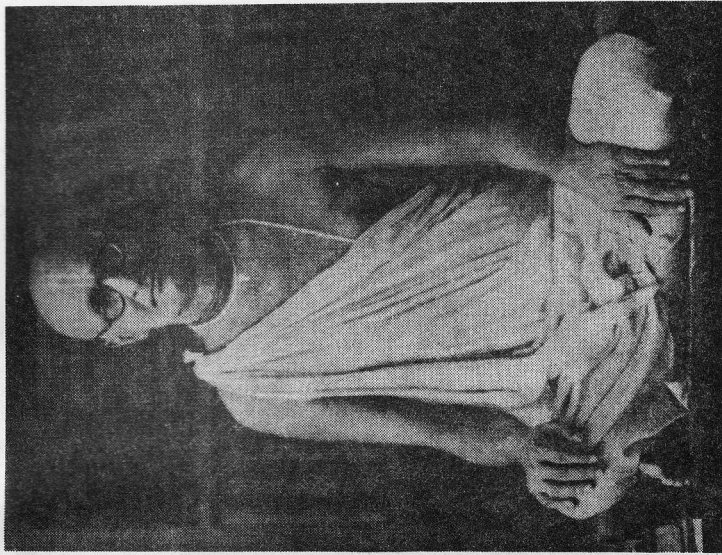
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি  
ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ



পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

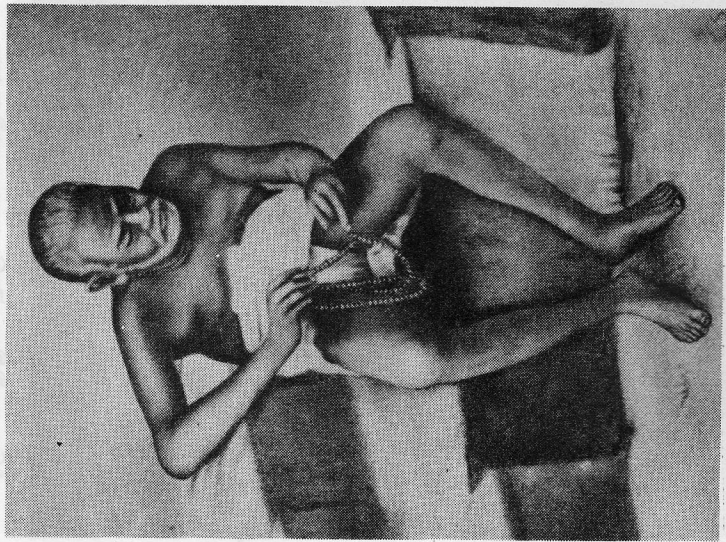


ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ

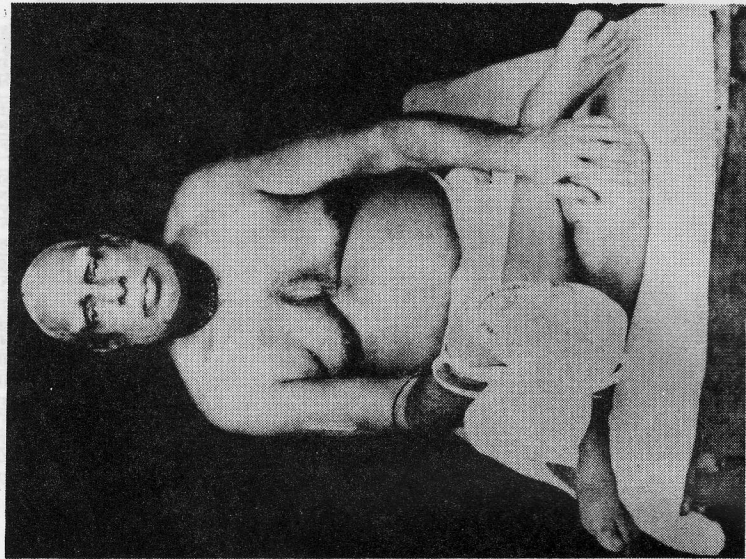


ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমন্ত্ৰিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ



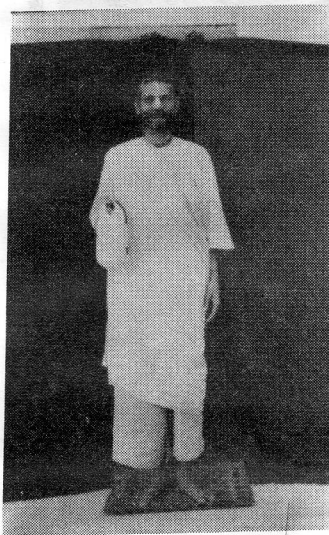


ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ



ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের  
বিভিন্ন কালের আলেখ্য



প্রফুল্লানন সৌম্য-শান্তমূর্তি  
শ্রীল গুরু-মহারাজ



জীবকল্যাণ-চিন্তামগ্ন পরদুঃখদুঃখী শ্রীল গুরুপাদপদ্ম



শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল আচার্য্যদেব



উজ্জ্বলব্রতকালে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে  
শ্রীল গুরুপাদপদ্ম

সত্যেন্দ্রনাথ বসু (সত্যেন্দ্রনাথ বসু) নামের ব্যক্তি  
 গণ্যমান্য চিত্রশিল্পী

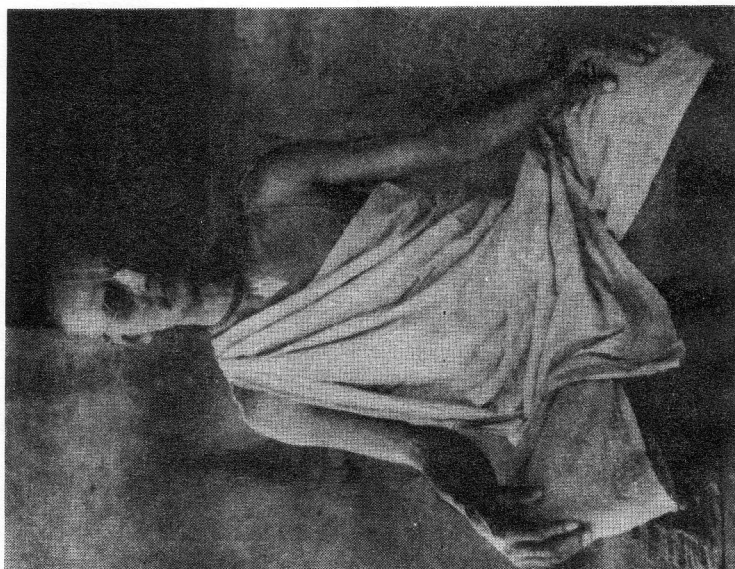


নবদীপ মঠের শ্রী ভজন-কুটারে ভজনরত শ্রীল গুরু-মহারাজ

সত্যেন্দ্রনাথ বসু (সত্যেন্দ্রনাথ বসু) নামের ব্যক্তি

গণ্যমান্য চিত্রশিল্পী

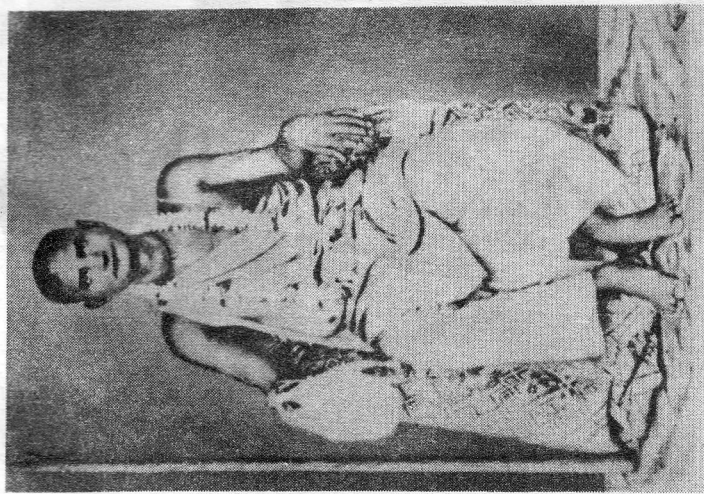
সত্যেন্দ্রনাথ বসু (সত্যেন্দ্রনাথ বসু) নামের ব্যক্তি



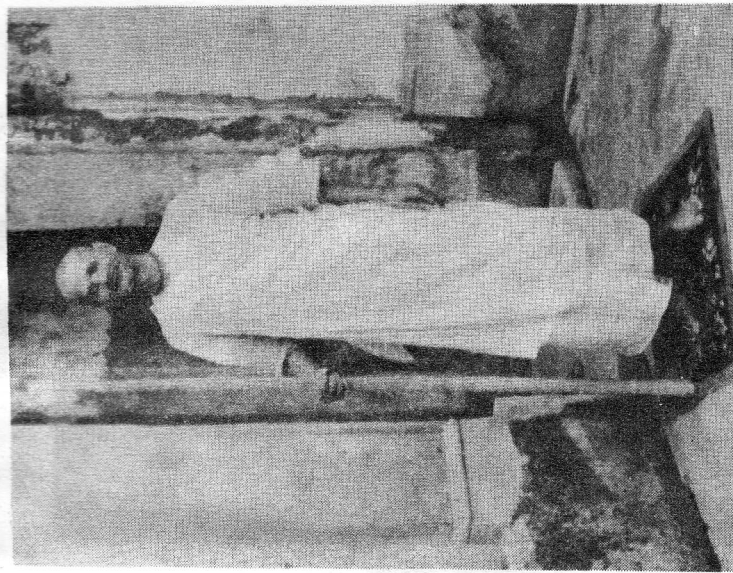
শ্রীকেশবজী গোড়ীয় মঠে শ্রীল গুরু-মহারাজ

সত্যেন্দ্রনাথ বসু (সত্যেন্দ্রনাথ বসু) নামের ব্যক্তি

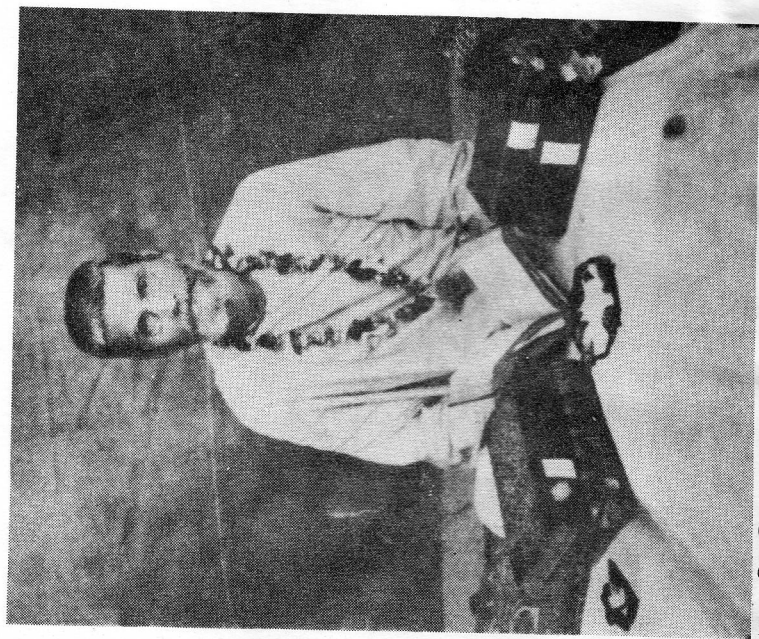




হুগলীর বৈচিত্র্যে প্রচারকালে শ্রীল আচার্যদেব



গুরু বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ



নবদ্বীপ শ্রীদেবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠে বেদান্ত-ব্যাখ্যারত শ্রীল আচার্যদেব

৬ ব্রহ্মসংস্কৃতিকেন্দ্রের চেয়ারম্যান শ্রীমতী সত্যবতী



সবিকণা শ্রীমতী সত্যবতী

## শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণীসভা-প্রদত্ত শ্রীশ্রীগৌরাশীর্বাদ-পত্র

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার ৩৮তম বার্ষিক অধিবেশনের দ্বিতীয় দিবস—৮ই চৈত্র ১৩৩৮, ইং ২৯শে মার্চ ১৯৩২ সালে (৪৪৬ গৌরাব্দ) উক্ত সভার সভাপতি শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ দায়িত্বশীল সেবাকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারীকে গৌরাশীর্বাদ-স্বরূপ ভক্তিসূচক যে ‘কৃতিরত্ন’ উপাধি প্রদান করেন, তাহা উদ্ধৃত হইল :—

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্  
শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ  
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্বাদ-পত্রম্  
শ্রীমহাপ্রভু-সেবার্থং শ্রীধাম্নিভূমিরক্ষকঃ ।  
প্রজাপালন-দক্ষো যঃ শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিতঃ ॥  
শ্রীবিনোদবিহার্য্যাক্য ব্রহ্মচারিবরায় চ ।  
প্রভুপাদান্তরঙ্গায় সর্বসদৃগুণশালিনে ॥  
ধামপ্রচারিণী-সংসংসভ্যোস্তস্মৈ প্রদীয়তে ।  
“কৃতিরত্ন” ইতি খ্যাতমুপাধি-ভূষণং মুদা ॥  
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে ।  
শ্রীমায়াপুরধামস্থ-যোগপীঠ-মহত্তমে ॥  
গুণেষু-বসু-শুভ্রাংশু-শকাদেহস্মিন্ শুভাশ্রয়ে ।  
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥

—(স্বাঃ) শ্রীভক্তিচন্দ্রোত্তর সরস্বতী  
সভাপতিঃ

[ শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীবিনোদবিহারী-নামক ব্রহ্মচারীবর—যিনি শ্রীমহাপ্রভুর সেবা-নিমিত্ত শ্রীমায়াপুর-ধামের ভূমি-সংরক্ষক, প্রজাপালন-নিপুণ, শ্রীল প্রভুপাদান্তরঙ্গ ও সর্বসদৃগুণশালী, তাঁহাকে শ্রীধামপ্রচারিণীসংসং-সভ্যবৃন্দ-কর্তৃক গঙ্গার পূর্ব্বতটে শ্রেষ্ঠ নবদ্বীপস্থলে শ্রীধামমায়াপুরস্থ মহত্তম যোগপীঠে ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরের শুভলগ্নে সানন্দে ১৮৫৩ শকাব্দে ‘কৃতিরত্ন’-উপাধি-ভূষণে বিভূষিত করা হইল । ]

বাংলা ১৭ই ফাল্গুন ১৩৪০, ইং ১লা মার্চ ১৯৩৪, বৃহস্পতিবার— শ্রীচৈতন্য মঠের অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার ৪০তম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ সভার কার্যকরী সমিতির সভ্যপদ নির্বাচনের পর অন্যান্য সেবকগণের সহিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয়কেও “উপদেশক” উপাধিদানে বিমণ্ডিত করেন।—

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

**শ্রীশ্রীগৌরানীকবাদ-পত্রম্**

সবর্বাঙ্গনা শ্রীগুরু-গৌরসেবা-

সম্পাদকঃ শুদ্ধমতির্নয়ন্তঃ।

মদাশয়ে মন্তব্যংইথেবসগী

গুরুপ্রিয়োহয়ং কৃতিরত্নবর্য্যঃ॥

শ্রীবিনোদবিহার্য্যাত্মো ব্রহ্মচারিবরো মুদা।

উপদেশক ইত্যেতদুপনাম্না বিমণ্ডিতঃ॥

গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।

শ্রীমায়াপুরধামস্থে-যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥

বাণেশু-বসু-শুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।

ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে॥

—(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

সভাপতিঃ

[ সর্ব্বাঙ্গকভাবে শ্রীগুরুসেবা-সম্পাদনকারী, শুদ্ধদ্বী, নীতিপরায়ণ, সদাশয়, সত্যপথানুরাগী, গুরুপ্রিয় কৃতিরত্নশ্রেষ্ঠ শ্রীবিনোদবিহারী-নামক ব্রহ্মচারীবরকে শ্রীধামপ্রচারিণী-সংসং-সভ্যবৃন্দ-কর্তৃক গঙ্গার পূর্ব্বতটে শ্রীনবদ্বীপোত্তমস্থানে শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রেষ্ঠ মঙ্গলালয়ে যোগপীঠাশ্রয়ে ফাল্গুনী-পূর্ণিমায় শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ১৮৫৩ শকাব্দে সানন্দে উপদেশক—এই উপনামে পরিশোভিত করা হইল। ]

# শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।
- ২। সাধারণ ডাকযোগে “শ্রীপত্রিকা” গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইলে বার্ষিক ভিক্ষা ৩০.০০ টাকা ও ষাণ্মাসিক ১৭.০০ টাকা এবং আজীবন সদস্যপক্ষে ১০০১.০০ টাকা অগ্রিম প্রেরিতব্য। ভারত ও বিদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রা দেয়। ভি. পি. তে লইতে হইলে অতিরিক্ত খরচ গ্রাহকগণের স্বীকার্য।
- ৩। যে কোনও সময়ে “শ্রীপত্রিকা”র গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হয়।
- ৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোস্টকার্ড বাঞ্ছনীয়।
- ৫। “শ্রীপত্রিকা”র কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।
- ৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। স্বর্ভামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি “শ্রীপত্রিকা”য় প্রকাশিত হইবে না। সং-আলোচনা সর্বদা আদরণীয়া।
- ৭। কোন কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে ‘কার্য্যাধ্যক্ষ’ অথবা ‘প্রকাশক’ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়, শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ; ২৮, হালদার বাগান লেন; কলিকাতা-৭০০ ০০৪ ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

## শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

- ১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২। সিদ্ধাস্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্), ৩। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক, ৪। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ, ৫। মায়াবাদের জীবনী, ৬। শরণাগতি, ৭। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী-চরিত, ৮। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ও পরিক্রমা-গ্রন্থাবলী, ৯। জৈবধর্ম (বাংলা ও হিন্দী), ১০। সংক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা, ১১। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ১৩। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী, ১৪। শ্রীদামোদরষ্টকম্, ১৫। অর্চন-দীপিকা, ১৬। শ্রীগৌরাস্ত, ১৭। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা, ১৮। শ্রীএকাদশী-ব্রতকথা, ১৯। শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, ২০। উদ্ধারের পথ, ২১। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ, ২২। শ্রীমনঃশিক্ষা, ২৩। শ্রীউপদেশামৃতম্, ২৪। তত্ত্বমুক্তাবলী (যুক্তিমল্লিকাসহ), ২৫। শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী, ২৬। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য, ২৭। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-কণ্ঠহার, ২৮। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব, ২৯। প্রেম-প্রদীপ, ৩০। শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্ররত্নমালা, ৩১। মাধুর্য্য-কাদম্বিনী, ৩২। Shri Chaitanya Mahaprabhu, ৩৩। The Bhagavat, ৩৪। Nam-Bhajan, ৩৫। Life Story of Impersonalism (Mayabad) or Victory of Vaishnavism (Vaishnava Vijaya), ৩৬। The Vedanta, ৩৭। Vaishnavism, ৩৮। Rai Ramananda, ৩৯। Relative World, ৪০। A Few Words on Vedanta।

## শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্রসমূহ

- ১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ — তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
- ২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ — চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)।
- ৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ — কংসটীলা, পোঃ মথুরা (মথুরা) ইউ.পি.।
- ৪। শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ — দানগলি, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা) ইউ.পি.।
- ৫। শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠ — রাণাপতঘাট, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা) ইউ.পি.।
- ৬। শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ — সম্যাস রোড, পোঃ কঞ্চল (হরিদ্বার) ইউ.পি.।
- ৭। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ — গৌরবাটসাহি, পোঃ পুরী (পুরী) উড়িষ্যা।
- ৮। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ — ২৮, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪।
- ৯। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ — পোঃ গোলোকগঞ্জ (ধুবড়ী) আসাম।
- ১০। শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ — পশ্চিম খাগড়াবাড়ী, পোঃ কোচবিহার (কোচবিহার)।
- ১১। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র — পোঃ রান্দিয়াহাট (বালেশ্বর) উড়িষ্যা।
- ১২। শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ — শক্তিগড়, পোঃ শিলিগুড়ি (জলপাইগুড়ি)।
- ১৩। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ — পোঃ আশুতিয়াবাড় (মেদিনীপুর)।
- ১৪। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ — সিধাবাড়ী, পোঃ রূপনারায়ণপুর (বর্ধমান)।
- ১৫। শ্রীকামদেব গৌড়ীয় মঠ — পোঃ বাসুগাঁও (কাকড়াবাড়) আসাম।
- ১৬। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ — পোঃ তুরা (ওয়েস্ট গারো হিলস) মেঘালয়।
- ১৭। শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ — মিলনপল্লী, পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জিলিং)।
- ১৮। শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠ — পোঃ মাথাভাঙ্গা (কোচবিহার)।
- ১৯। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গৌড়ীয় মঠ — শ্রীচৈতন্য এভিনিউ, দুর্গাপুর-৫ (বর্ধমান)।
- ২০। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ — রংপুর, শিলচর-২ (কাছাড়) আসাম।
- ২১। শ্রীদুর্বাসাঋষি গৌড়ীয় আশ্রম — ঈশাপুর, পোঃ মাঠবন (মথুরা) ইউ.পি.।
- ২২। শ্রীমাধবজীউ গৌড়ীয় মঠ — ১/১, কালীতলা লেন, পোঃ বৈদ্যবাটী (হুগলী)।
- ২৩। শ্রীনিমানন্দ গৌড়ীয় মঠ — গাড়ীখানা রোড, পোঃ বিদ্যাপাড়া (ধুবড়ী) আসাম।
- ২৪। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী — মণিপুর, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
- ২৫। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম — গদখালি, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
- ২৬। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয় — দেয়ারাপাড়া রোড, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

BOOK POST  
To

SL. NO.

From :-

Ph.: 555-8973

SHRI GOUDIYA-PATRIKA OFFICE  
SHRI BINODE BEHARI GOUDIYA MATH  
28, HALDER BAGAN LANE,  
CALCUTTA-700 004